Talkes delivered by Swami Samarpanananda on ***Kathopanishada***
before the students of Indian Spiritual Heritage Diploma Course at
Ramakrishna Mission Vivekananda University, Belur Math.
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

হিন্দু ধর্মের মূল গ্রন্থ বেদ। বেদ মূলতঃ সব সময় বেদেরই দুটো জিনিষকে বোঝায়। ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব বেদকে যেমন বেদ বলা হয় আবার এই চারটি বেদের মধ্যে যে জ্ঞানরাশি আছে সেই জ্ঞানরাশিকেও বেদ বলা হয়। তবে ঠিক ঠিক বেদ বলতে জ্ঞানরাশিকেই বেদ বলা হয়। আচার্য শঙ্করও উপনিষদের ভাষ্যে বলছেন উপনিষদের মধ্যে যে জ্ঞানরাশি রয়েছে সেটাই উপনিষদ, ওর শব্দরাশি উপনিষদ নয়।

পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে বহির্জগত থেকে ক্রমাগত অনুভূতি আমাদের ভেতরে আসছে, তার মধ্যে যদিও চোখ দিয়ে বেশি অনুভূতি আসে, কিন্তু ঠিক ঠিক বলতে গেলে শব্দের সমুদ্রে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি। সকাল থেকে শুরু করে ঘুমন্ত অবস্থায়ও আমরা শব্দরাশির মধ্যে ডুবে থাকি। যা কিছু পড়ছি, শুনছি সবই শব্দরাশি, কিছু পড়ছি না, শুনছি না, শুধু চিন্তা করে যাচ্ছি সেটাও শব্দরাশি, ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছি সেটাও শব্দরাশি। শব্দের আবার দুটো রূপ। ঋষিরা যেমন বাক্য, বাক্যালাপকে শব্দ বলছেন, তার সাথে প্রত্যেক বাক্যের পেছনে যে বিচার থাকে তাকেও শব্দ রূপে দেখতেন। যেমন বেদ গ্রন্থাকারে বেদ আবার জ্ঞান রূপেও বেদ। শব্দ তাই সব সময় দুটো রূপে থাকে, বাইরে তার একটা ব্যক্তিত্ব আর ভেতরে তার সার। শব্দ বলতে জ্ঞানও বোঝায় আবার কর্ণে শব্দ প্রতিহত হওয়ার পর মস্তিষ্কে যে অনুভূতি তৈরী হয় আর সেই অনুভূতি থেকে একটা সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেটাকেও শব্দ বলে। এমনকি শাস্ত্রও বলছে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বহির্জগৎ থেকে যা যা অনুভূতি ভেতরে আসছে সবটাই শব্দ। এই বিশাল শব্দরাশির মধ্যে আমরা সবাই হাবুডুবু খাচ্ছি। বেশির ভাগ শব্দই আমাদের কাছে অনর্থক, জীবনে কোন কাজেই আসে না। তার কারণ আমাদের মন এতই ভাসা ভাসা আর এতই চঞ্চল, যা কিছু বহির্জগত থেকে অনুভূতির দ্বারা উপলব্ধি করি সবটাই ভাসা ভাসা। কাউকে কিছু বলছি সেটাও ভাসা ভাসা। পুরো ব্যাপারটাই খুব বাহ্যিক, এর মধ্যে কোন সচেতনতা ও অন্তর্মুখীন গভীরতা নেই। এর মূল কারণ সব কিছুতেই আমাদের সচেতনার বড় বেশি অভাব আর আমাদের নিজেদের মধ্যেও ভাবের গভীরতার প্রচণ্ড অভাব।

শব্দের পেছনে যে শক্তির যোগান থাকবে তার জন্য দরকার সুগভীর চিন্তন। সাধারণ মানুষ আবার চিন্তন করতে পারে না, কারণ মানুষের মন এতই দুর্বল যে এই দুর্বল মন নিয়ে গভীর কিছু চিন্তন করতে গেলে তার মস্তিষ্ক বিদির্ণ হয়ে যাবে। টাকা-পয়সা, খাওয়া-দাওয়া, শোওয়া-পড়া এই জিনিষগুলোর চিন্তন মানুষ খুব সহজেই করে নিতে পারে, এগুলোকে আবার চিন্তন বলা যায় না, এগুলো মূলতঃ চিন্তা। চিন্তন মানে একটা বিচারকে খুব গভীরে নিয়ে গিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে একটা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকেই চিন্তন বলা যায়। গভীরে যাওয়ার পরেই মানুষের চিন্তার জগৎ খুলতে শুরু করে। চিন্তার জগৎ খুলতে শুরু হওয়ার পর যে শব্দগুলো বেরিয়ে আসে সেই শব্দেরই ঠিক ঠিক দাম থাকে। লেখক, কবিদের মধ্যে যাঁদের চিন্তন যত গভীর তাঁদের রচনা তত মর্মস্পর্শী। এদের লেখাই আমাদের বারবার পড়তে ইচ্ছে করে। হাল্কা ধরণের ভাসা ভাসা লেখা প্রথমবার পড়তে খুব মজা পাই, কিন্তু দ্বিতীয়বার পড়তে ইচ্ছে করবে না। খবরকাগজ, ম্যাগাজিন একই জিনিষ, একবার পড়া হয়ে যাওয়ার পর আমরা সের দরে বিক্রী করে দিই। কিন্তু গীতা, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারতের মত গ্রন্থকে কখনই রদ্দি দামে ফেরিওয়ালার কাছে কেউ বিক্রী করবে না। কারণ এর জ্ঞানরাশিকে সে সহজে আয়ত্ত করে নিতে পারে না, আয়ত্ত করে নেওয়ার মত মস্তিষ্কের সেই ক্ষমতাও নেই। আর যত দিন এই জ্ঞানরাশির আয়ত্ত করতে না পারছে তত দিন তার কাছে এর গুরুত্ব থাকবে।

জ্ঞানরাশি যদি আয়ত্ত করে নেয় তাহলে সে কি করবে? যেমন ঠাকুর, তাঁর জ্ঞান হয়ে গেছে এবার তিনি বেদ, উপনিষদ, গীতা ফেলে দেবেন? একটা জিনিষের কাজ হয়ে যাওয়ার পর সেটা আমরা ফেলে দিই, খবরকাগজ, ম্যাগাজিন, বটতলার উপন্যাস একবার পড়া হয়ে যাওয়ার পর আমরা ফেলে দিই। কিন্তু যেসব গ্রন্থ গভীর জ্ঞানরাশিতে সমৃদ্ধ এবং জানি এই জ্ঞানরাশিকে আয়ত্ত করা আমার সাধ্যের অতীত, সেইজন্য সেই বইয়ের প্রতি একটা সম্মান থাকে। শাস্ত্র এবং ধর্মীয় পুস্তক পাঠ হয়ে যাওয়ার পর এখনও অনেকে লাল শালু দিয়ে মুরে খুব যত্ন ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তুলে রাখেন। কিন্তু যাঁর জ্ঞান হয়ে গেছে তিনিও ধর্মীয় গ্রন্থকে সম্মানের ভাব নিয়ে সযত্নে আগলে রাখেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরেও অনেক ধর্মীয় পুস্তক রাখা থাকত। নরেনাদি ভক্তরা

যখন দক্ষিণেশ্বরে যেতেন তখন তিনি মাঝে মাঝে তাঁদের পড়ে শোনাবার জন্য বলতেন। নিজের জন্য গ্রন্থের আর কোন প্রয়োজন না থাকলেও গ্রন্থের প্রতি তাঁদের সম্মানটুকু থাকে। গীতাতে ভগবান লোকসংগ্রহের কথা বলছেন, লোকেরা যখন দেখবে ঠাকুরের কাছে এই ধরণের গ্রন্থ রাখা আছে তখন তাদের মনে হবে এই গ্রন্থ পড়লে আমারও মঙ্গল হবে। ঠাকুর বলছেন, সন্ন্যাসীর কাছে আর কিছু না থাকুক একটি গীতা থাকবে। গ্রন্থের প্রতি জ্ঞানীদের এই সম্মানটা কখনই যায় না। বক্তব্য হল জ্ঞান যেটা আসে সেটা আসে চিন্তন থেকে।

চিন্তনের আবার বিভিন্ন স্তর ও গভীরতা আছে। সব বস্তুরই একটা জ্ঞান আছে, কিন্তু বস্তুর এই জ্ঞান অনেক আবরণ দিয়ে আবৃত হয়ে আছে। চিন্তন মানে এই আবরণকে সরানো। পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মত একটার পর একটা আবরণকে যেন সরানো হচ্ছে। আবরণ সমূহ যত সরতে থাকে তত যেন জ্ঞানের নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হতে থাকে। ঠাকুরও পেঁয়াজের উপমা নিয়েছেন। কিন্তু উপমার প্রধান সমস্যা হল, উপমার সাহায্যে একটা যে বিষয়কে বোঝান হচ্ছে সেই বিষয়ের দিকে মন যেতে চায় না। কোন বিচারের উপর থেকে শব্দের আবরণকে অনাবৃত করার সময় অন্যান্য অনেক দিকও উন্মোচন হতে শুরু হয়। ঐ দিকগুলিই লেখার মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর সেই লেখাই কালজয়ী হয়ে যায়। কিন্তু এর পরের ধাপে একটা তৃতীয় অবস্থা আছে, যেখানে একজন সাধক বা সিদ্ধ পুরুষ চিন্তনের গভীরতার এমন স্তরে পোঁছে যান যেখানে তখন আর খোলস ছাড়ানোর ব্যাপারটা থাকে না। খোলস ছাড়ানোর মধ্যে এমনিতেই একটা নিজস্ব প্রচেষ্টা জড়িয়ে থাকে। কিন্তু এই স্তরের গভীরতায় চলে যাওয়ার পর চিন্তনকে দিয়ে আর কোন খোলস ছাড়ানো হয় না, তখন মনের নিজের খোলসটাই যেন সম্পূর্ণ ভাবে সরে যায়। মনের খোলস যখন সম্পূর্ণ ভাবে সরে যায় তখন এই জগৎ আর এই জগতের পেছনে যে সত্যগুলি রয়েছে সেগুলো যেন উদ্ভাসিত হতে শুরু হয়ে যায়।

ভারতের বাইরে এগুলোকে নিয়ে বেশি চিন্তন করা হয়নি, কিন্তু হিন্দু ধর্মে এর উপর প্রচুর বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিদেশী চিন্তাবিদরা দুটি সত্তাকে পুরোপুরি আলাদা করে দেখেন। প্রথম সত্তা হল ‘আমার’ যে সত্তা, আমার নিজের সত্তাকে আমরা সবাই বিচার করে দেখতে সক্ষম হব যে আমি এই শরীর নই। এই শরীরের পেছনে একটি মন আছে, এই মন যেমনটি শরীরকে চালাচ্ছে শরীর তেমনটি চলছে। কিন্তু যাঁরা সাধনা করে আরও গভীরে যান, তাঁরা দেখেন মনের পেছনেও একটি পৃথক সত্তা আছে, যে সত্তাকে ওনারা আত্মা বা অনেক সময় জীবাত্মাও বলেন বা অন্তর্যামী বলেন। বিচার করলে আমার যে সত্তা তার তিনটে স্তর এসে যায়, বাহ্যিক শরীর, বাহ্যিক শরীরের পেছনে মন আর মনের পেছনে আত্মা। যাঁরা যোগী, যাঁরা সাধনা করেছেন, তপস্যা করেছেন তাঁরা দেখেন এই শরীরটা জড়। শুধু তাই না, মনকেও তাঁরা দেখেন জড়। মনের পেছনে যে চৈতন্য সত্তা, এটাই আসল সত্তা। আমার আসল আমি হল এই চৈতন্য সত্তা।

যোগীরা এই ‘আমি’কে বিশ্লেষণ করার সাথে সাথে তাঁরা এই জগতকেও বিচার বিশ্লেষণ করেন। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পেছনেও একটা ভৌতিক রূপ রয়েছে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মিলিয়ে একটাই ভৌতিক রূপ। এরপর যোগীরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই ভৌতিক রূপেরও খোলস ছাড়াতে ছাড়াতে দেখেন – আরে তাই তো! এই ভৌতিক রূপের পেছনেও একটা মন রয়েছে, যাঁকে তাঁরা বলছেন বিশ্বমন। পাশ্চাত্য জগতের বড় বড় দার্শনিকরাও এই তত্ত্বের উপর প্রচুর আলোকপাত করেছেন, তাঁরাও World Mindএর কথা বলছেন। পাশ্চাত্যদের কাছে mind আর soul একই জিনিষ হওয়াতে ওনারা এটাকে World Soulও বলেন। ভারতের ঋষিরা কিন্তু এখানে থেমে না গিয়ে চিন্তনের আরও গভীরে গিয়ে দেখেন ঐ বিশ্বমনের পেছনেও আবার আরেকটি চৈতন্য শক্তি রয়েছে। সেই চৈতন্য শক্তিকে তাঁরা ঈশ্বর বলছেন। এই চৈতন্য শক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন নামে সম্বোধিত করছে। চিন্তার গভীরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আবরণগুলিকে সরিয়ে সরিয়ে যোগীরা দেখেন এই পার্থিব জগতের পেছনেও রয়েছে এক মনের জগৎ, আর ঐ মনের জগতের পেছনে রয়েছে এক অখণ্ড চৈতন্য পুরুষ।

যাঁরা নিজের উপর ধ্যান করেন, সাধারণ ভাবে তাঁদের যোগী বলা হয়। যোগীরা নিজের মনের উপর ধ্যান করে করে নিজের স্বরূপকে জেনে যান। আর যাঁরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ে চিন্তন বা ধ্যান করেন তাঁদের অনেক সময় ভক্ত বলে, কখন জ্ঞানীও বলা হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, ভক্তি পথেই যান বা যোগ পথেই যান, একটা অবস্থায় গিয়ে সবাই দেখেন চৈতন্য সত্তার যে জ্যোতি তাঁর ভেতরে আছে, সেই একই চৈতন্য সত্তা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পেছনেও রয়েছে। আবার যাঁরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পেছনে সেই চৈতন্য সত্তাকে দেখছেন তিনি

সাথে সাথে দেখছেন সেই চৈতন্য সত্তা আমার ভেতরেও রয়েছে, দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যাঁরা প্রথমে নিজেকে দেখছেন তাঁরা দেখছেন আমি একজন আর ঈশ্বর আরেকজন। আর যাঁরা প্রথমে ঈশ্বরকে নিয়ে সাধনা করছেন তাঁরাও দেখেন ঈশ্বর একজন আমি আরেকজন। কিন্তু আরও গভীরে গিয়ে দেখেন এটাও যা ওটাও তাই, দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

যত শাস্ত্রই আমরা পড়ে থাকি না কেন, মুখে আমরা যাই বলি না কেন, আমরা সবাই জানি খিদে পেলে আমাদের কষ্ট হবে, শরীরে ছুঁচ ফুটলে ব্যাথা লাগবে, দুটো মন্দ কথা বললে মনে আঘাত লাগবে, দুটো ভালো কথা বললে বেলুনের মত ফুলে উঠব, এগুলো থেকে আমরা কখনই বেরিয়ে আসতে পারব না। গীতা এবং অন্যান্য শাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞানীদের ব্যাপারে অনেক বর্ণনা করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ঠাকুরের জীবনী পড়লে আমরা দেখছি তিনিও রেগে যাচ্ছেন, কষ্ট পাচ্ছেন। ঠাকুরের মতের বিরুদ্ধে কিছু আপত্তি করলে ঠাকুর বলতেন – ও এখনকার মত পাল্টে দিতে চাইছে। ঠাকুর বলছেন 'হাজরা উল্টোপাল্টা কথা বলে, আমি রেগে গিয়ে খুব গালমন্দ করি'। কিন্তু তারপর ঠাকুর যা করছেন, এখানে এসেই ঠাকুর আর আমাদের মধ্যে তফাৎ হয়ে যায়। ঠাকুর রেগে যাচ্ছেন, গালমন্দও করছেন কিন্তু আবার বলছেন 'রাত্রিবেলা মশারির ভেতরে গিয়ে ভাবছি হাজরাকে গালমন্দ করেছি কিন্তু দেখছি তার ভেতরেও সেই ঈশ্বরেরই চৈতন্য সত্তা, তখন আবার মশারি থেকে বেরিয়ে হাজরাকে গিয়ে নমস্কার করে আসি'। জাগতিক আর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর এটাই তফাৎ। জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মানুষকে গালমন্দ করলে, দুঃখ-কষ্ট দিলে সে বলবে, জীবনে আর তার মুখ দেখব না। জ্ঞানীরও রাগ হয়, বাইরে সেই রাগকে তিনি প্রকাশও করেন কিন্তু ঐ রাগ কারুর ক্ষতি করতে পারে না। কারণ কারুর উপর যখন তিনি রেগে যান তখনও তিনি দেখেন আমার মধ্যে যে ঈশ্বরের সত্তা তার মধ্যেও সেই এক ঈশ্বরের সত্তা বিদ্যমান। জগৎ থেকে আমরা অনেক কিছু পেতে চাই, যেটা আমার পাওয়ার নয় সেখানেও মনটা লাগিয়ে রাখি। যতই মানুষ ধর্মাচরণ, ধর্মানুষ্ঠান করুক না কেন, যতই শাস্ত্রের আলোচনা শুনুক কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, এগুলো থেকে মানুষ বেরিয়ে আসতে পারে না। ঠাকুর বলছেন, টিয়া পাখি যতই রাম রাম করুক বেড়ালে ধরলে মুখ দিয়ে সেই ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দই বের হয়। আমাদেরও যখন বেড়াল ধরে, অর্থাৎ কাম ক্রোধাদি গ্রাস করে তখন আমরাও ট্যাঁ ট্যাঁ করি, তখন শরীর বোধ, মনের বোধ এসে যায়।

কিন্তু যোগীরা চিন্তনের গভীরে গিয়ে অথবা একটা বস্তু বা একটা বিচারকে ধরে নিয়ে যখন তার খোলসগুলিকে ছাড়াতে শুরু করেন তখন তাঁদের কাছে নতুন নতুন তত্ত্ব যেন ভেসে আসতে থাকে। যত গভীরে গিয়ে সেই তত্ত্বগুলিকে নিয়ে লেখাজোখা করা হয় তত সেই লেখার দাম বাড়তে থাকে। একটু গভীরে গিয়ে যদি কিছু লেখেন সেটাই হয়ত একটা কবিতা হয়ে যাবে। তার থেকে আরেকটু গভীরে গিয়ে লেখলে তখন সেটাই আরও উচ্চমানের একটা কবিতা হয়ে যাবে। কিন্তু এরপর আরও যদি গভীরে চলে যান, যেখানে সেই চৈতন্য সত্তার জ্যোতি একটু লিক্ লিক্ করতে শুরু করেছে, মানে একটু আবরণ এখনও থেকে গেছে, সেখান থেকে লিখিত আকারে যা কিছু বেরিয়ে আসবে সেটাই ভক্তিশাস্ত্র হয়ে যাবে। কিন্তু ঐ শেষ আবরণটাও সরে যাওয়ার পর শব্দ রূপে যা আসবে সেটাই হয়ে যাবে বেদ। এটাই শুদ্ধ জ্ঞান, এই শুদ্ধ জ্ঞানে আর কোন আবরণ নেই। শুদ্ধ জ্ঞানের উপর যেমন যেমন আবরণ সরে যাবে আর সেখান থেকে যেমন যেমন তাঁর কথাগুলো বেরোবে সেই অনুসারে কথাগুলোর নাম পাল্টে যায়। শুদ্ধ জ্ঞানের উপর একটু আবরণ পড়ে গেল তখন সেখান থেকে মহাভারত হয়ে গেল বা ভক্তিশাস্ত্র হয়ে গেল, আরও আবরণ পড়ে গেল সেখান থেকে তখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা হয়ে গেল, আরও আবরণ হয়ে গেল তখন কোন উচ্চমানের উপন্যাস হয়ে গেল, আরও আবরণ হয়ে গেল তখন আমার আপনার জন্য খবর কাগজের কোন লেখা হয়ে গেল। সেই একই জ্ঞানরাশি কিন্তু তার উপর শুধু আবরণের পর আবরণ পড়ে যাচ্ছে। বেদ মানেই সেই শুদ্ধ জ্ঞানরাশি, হয় আমাদের অন্তর্জ্যোতির ব্যাপারে বলছেন নয়তো যিনি সেই বিশ্বাত্মা তাঁর ব্যাপারে বলছেন। আর কখন কখন শুদ্ধ চৈতন্যের উপরে প্রথম আবরণের পর যাঁকে দেখা যাচ্ছে তাঁর ব্যাপারে বলবেন, এর নীচে আর কোন ব্যাপারেই বলবেন না। বেদকে ইতিহাস রূপে বা অন্য রূপে দেখাটা একেবারেই ভুল, বেদ একটাই কাজ করে যাচ্ছে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানরাশিকে আমাদের সামনে তুলে ধরছে। এই হল বেদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

ঋষিদের জাগতিক কোন চাহিদাই ছিল না। কথামৃতে ঠাকুর বর্ণনা করছেন, আগেকার দিনের ঋষিরা কত খাটতেন, সেই ভোরবেলা কুঠিয়া থেকে জঙ্গলে চলে যেতেন, সেখানে সারাদিন তপস্যা করে সন্ধ্যার পর

কুঠিয়ায় ফিরে একটু ফুলমূল খেয়ে থাকতেন। ভোগবিলাস না থাকাতে অর্থেরও কোন প্রয়োজন ছিল না, অর্থের প্রয়োজন না থাকাতে কর্মচেষ্টারও কোন দরকার হত না, কর্মচেষ্টা না থাকাতে প্রচুর সময় পেতেন। সময় প্রচুর থাকলে দুটো জিনিষই হবে, হয় আলতুফালতু চিন্তন করবে আর তা নাহলে গভীর উচ্চ চিন্তন নিয়ে পড়ে থাকবেন। এনারা শুধু চিন্তন করতেন। গভীরে গিয়ে চিন্তন করার জন্য জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে অগাধ জ্ঞানরাশি তাঁদের কাছে আসত। তাঁদের সন্তান বা শিষ্য যাঁরা থাকতেন তাঁদেরকে ওনারা সেটা বলে দিতেন। শিষ্যদের মধ্যে আবার যাঁদের মধ্যে প্রতিভা থাকত, তাঁরা সেটাকে কবিতার আকারে ছন্দোবদ্ধ করে দিতেন। কিন্তু পরম্পরার হিন্দুরা এই তথ্যকে কখন মানবেন না, তাঁরা বলেন শব্দ আর শব্দ যার প্রতীক এই দুটোর জন্ম একসাথেই হয়। এটা আবার একটি স্বতন্ত্র বিরাট আলোচ্য বিষয়। যেমন ঘট, ঘট বলতে আমরা একটি বস্তুকে বুঝি, ঘট বলতে আমরা একটা বিচার বুঝি আবার ঘট বলতে আমরা একটা শব্দ বুঝি। পুরোপুরি হিন্দু মতে বলবে ঘট মানে একটা বিচার, এই বিচারই পরে দুটো রূপে প্রকাশিত হচ্ছে, একটা শব্দ রূপে আরেকটা বস্তু রূপে। যদি সব বস্তুকে নাশ করে দেওয়া হয় তার বিচার কিন্তু কোন দিন নাশ হয়ে যাবে না। যেমন ঘট, বিশ্বের সব ঘটকে যদি নাশ করে দেওয়া হয় তাও কিন্তু ঘট একটা বিচার রূপে থেকে যাবে। আমাদের চোখের সামনেই কত বস্তুকে বিলীন হয়ে যেতে দেখেছি। কথামৃতে কত রকম বস্তুর নাম পাই তার মধ্যে পাল্কীও যেমন আছে আবার সটকা কল, হুকোর কথাও আছে, এই বস্তুগুলি আগে ছিল এখন উঠে গেছে। কিন্তু বস্তুর বিচার থেকে গেছে, বিচার কোন দিন যাবে না। ভাব বা বিচারের সব সময় দুটি রূপ, একটা শব্দ, শব্দ দিয়ে আমরা এক অপরকে বস্তুর ব্যাপারে বোঝানোর চেষ্টা করি। দ্বিতীয় বস্তু, গরুকে আপনি যে নামেই ডাকুন সে গরুই থাকবে, গরু একটা বস্তু আরেকটি হল বিচার। ভগবান যখন সৃষ্টি করেন তখন বিচার, বস্তু আর শব্দ এই তিনটে একই সঙ্গে ফুটে ওঠে। মানুষ কোনটাকে আগে ধরবে আর কোনটাকে পরে ধরবে বলা মুশকিল। কখন বিচারকে আগে ধরে বস্তুকে পরে ধরে, আবার কখন শব্দকে আগে ধরে বস্তুকে পরে ধরে, বিচারকে আরও পরে ধরে। সাধারণতঃ আমাদের জীবনে বস্তু আগে আসে আইডিয়া পরে আসে। এই কারণেই আমাদের মনে নানা রকমের সংশয়ের জন্ম হয়।

ঈশ্বরের ব্যাপারে ঠিক তাই হয়, ঈশ্বরের ক্ষেত্রে বস্তু নেই কিন্তু তার আইডিয়াটা আমাদের বলে দেওয়া হয় বলে কোন আকার ধারণ করতে পারছে না। মানুষের মন এতই স্থূল যে, বস্তুকে সে আগে নেবে আইডিয়াকে পরে নেবে। আমাদের জীবনে আইডিয়া আগে বস্তু পরে এর ভালো দৃষ্টান্ত হল $E=MC^2$, এটাই এ্যটম বোমার আইডিয়া, এ্যটম বোমার আইডিয়াটা আগে এসেছে আর বস্তুটা পরে এসেছে। কেউ জানতই না এ্যটম বোমাটা কি জিনিষ, এ রকম যে কিছু হতে পারে কল্পনাও করতে পারেনি। আইনস্টাইন শুধু গাণিতিক ভাবে গণনা করে করে এমন জায়গায় গেলেন যে তিনি নিজেও জানতে পারেননি এমন জিনিষ হতে পারে। অন্য বিজ্ঞানীরা বার করে দেখালেন এই রকম হতে পারে। পরে গিয়ে তাঁরা দেখছেন জিনিষটা ঠিক তাই। এই রকমই আরেকটি জিনিষ আছে বিজ্ঞানে যাকে positron বলছে। বিজ্ঞানীরা গাণিতিক হিসাব করে বার করে দেখছেন এই রকম একটা পার্টিকেলসকে থাকতে হবে। তার অনেক দিন পরে বিজ্ঞানীরা দেখলেন বাস্তবিকই positron আছে। আইডিয়া আগে এসেছে আর বস্তু পরে এসেছে সাধারণতঃ এই ধরণের জিনিষ আমাদের জীবনে হয় না। আমাদের বুদ্ধি এতই ভোঁতা যে বস্তুকে নেওয়ার পরেও তার পেছনে যে বিচার আছে সেটা পরিষ্কার হয় না। ঠাকুর খুব সহজ করে বলছেন, সন্দেশ গলার নীচে চলে গেলে সন্দেশের আর কোন বোধ থাকে না। সন্দেশের আবার দুটো ভাব, একটা তার মিষ্টত্ব আরেকটা হল ভালো লাগা। এই ভালো লাগা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি না, কারণ জিভে যতক্ষণ আছে ততক্ষণই সন্দেশের ভালো লাগা, এই আইডিয়াকে আমরা নিতেই পারছি না। যার ফলে জীবনে আমরা প্রচুর দুঃখ-কষ্ট পাই, ঘাত-প্রতিঘাত আসতে থাকে। বস্তুই আমাদের কাছে বার বার আসতে থাকে, কিন্তু বস্তুর পেছনে যে বিচার আছে আমরা সেটাকে নিতে পারি না। আর শুধু বিচার থেকে বস্তুতে চলে যাব, আমাদের পক্ষে তা একেবারেই অসম্ভব। বাংলায় নামকরা প্রবাদ আছে, কেউ দেখে শেখে, কেউ শুনে শেখে আর কেউ ঠেকে শেখে, আবার কেউ আছে বার বার ঠেকেও শেখে না। আমরা হলাম শেষোক্ত শ্রেনীর, বার বার ধাক্কা খেয়েও আমাদের হুঁশ আসে না। আমরা নিজেদের খুব সেয়ানা মনে করি, নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করি। ঠাকুরও তাই বলছেন, কাক খুব সেয়ানা কিন্তু অপরের বিষ্ঠা কফ খেয়ে মরে। আমাদের বুদ্ধি আছে, কিন্তু এই বুদ্ধিটা একেবারে স্থূল বুদ্ধি। স্থূল বুদ্ধি হওয়ার জন্য বস্তু

যদি আমার কাছে খুব স্থূল রূপে আসে তবেই আমরা ধরতে পারি, স্থূল বস্তুর পেছনে যে সূক্ষ্ম জিনিষগুলো রয়েছে সেগুলোকে ধরতে পারি না।

হিন্দু মতে এই তিনটে জিনিষ, শব্দ যেটা আমরা শ্রবণ করছি, তার বিচার বা আইডিয়া আর তার বস্তু, এই তিনটে জিনিষই একটি ও একই জিনিষ, one and the same। কোনটাকে আগে ধরবে আর কোনটাকে পরে ধরবে তা নির্ভর করে ব্যক্তির মানসিক গঠনের উপর। সৃজনশীল পুরুষ বা বড় বিজ্ঞানীর বিশেষত্ব হল তাঁদের মন এত সূক্ষ্ম যে যেখানে কোন বস্তু নেই সেখানেও বস্তুকে ধরে ফেলেন। বাচ্চারা যেমন অনেক উদ্ভট রকম কল্পনা করতে থাকে, পাগলরা যেমন আবোল-তাবোল কথা বলতে থাকে, বাস্তবিক ক্ষেত্রে একজন বিজ্ঞানীকেও লোকেরা এই রকম পাগল মনে করতে পারে, কারণ বস্তু আকার ধারণ করার আগে তিনি তার বিচারটা ধরে ফেলেন। এক গভীর রাজ্যে চলে গিয়ে সেখান থেকে তিনি যে ধরণের কথা বলেন আমরা তার কিছুই বুঝতে না পেরে সেগুলোকে পাগলের প্রলাপ বলে মনে করি। বড় বড় বিজ্ঞানীরা চিন্তন জগতে এমন জায়গায় চলে যান যেখানে বস্তু আকার ধারণ করার আগে তিনি তার বিচারটা ধরে ফেলেন।

আমাদের কাছে অনেক কিছু শব্দ রূপেই থেকে যায়, যেমন যে কোন দিন বাঘ দেখেনি তার কাছে বাঘ একটা শব্দ মাত্র। ঈশ্বরও আমাদের কাছে শব্দ মাত্র। কিন্তু ঈশ্বর এমন একজন যাঁকে সাক্ষাৎ করা যায়, সেখান থেকে ঈশ্বর আবার একটা বিচার। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষের কাছে ঈশ্বর শব্দ মাত্র। ঈশ্বর শব্দের পেছনে যে বিচার আছে, প্রচুর ধ্যান তপস্যাদি করলে তবেই ঐ বিচারটা পরিষ্কার হয়। আর সেই বিচারের পেছনে তিনি যে সত্তা রূপে আছেন, তিনি যদি নিজে কৃপা করেন তবেই সেই সত্তার সাক্ষাৎকার হয়। হিন্দু দর্শনে এই তিনটে জিনিষই এক, তিনটের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, বস্তুও যা, বিচারও তাই আর শব্দও তাই। ভগবান যখন সৃষ্টি করেন তখন এই তিনটেকে একই সাথে সৃষ্টি করেন। সেইজন্য এর নামই হল শব্দব্রহ্ম। ঐ শব্দ বস্তু রূপে এলেও যা, বস্তু রূপে না এলেও তাই। ঠাকুর গৃহস্থদের বলছেন, কলিতে মনের পাপ পাপ নয়। তার মানে গৃহস্থ বিচারে যদি পাপ করে তাতে তার কোন দোষ নেই, বস্তুতে যদি পাপ করে তখন তার পাপ হবে। সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম কখনই চলবে না, সন্ন্যাসী যদি মনেও কোন পাপ করে থাকে সেটাও পাপ। কারণ বিচারের জগৎ আর বাস্তবিক জগতে কোন তফাৎ নেই। বস্তুকে নিয়ে কিছু করা আর বস্তু ছাড়া কিছু করা, দুটো একই জিনিষ। শুধু মুখে বলে দিল ঐ লোকটিকে একটা চড় মারলে হয়, চড় মারাও আর 'একটা চড় মারলে হয়' এই চিন্তা করা দুটো একই জিনিষ। কারণ মনের জগতে তাকে চড় মেরে দেওয়া হয়েছে। উচ্চ অবস্থায় বাহ্যিক ক্রিয়ার আর কোন দাম থাকে না।

বেদ হল সেই জ্ঞানরাশি যে জ্ঞানরাশি ভগবান খুলে দিয়েছেন, অর্থাৎ যা দিয়ে তিনি সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টিকে তিনি যখন গুটিয়ে নেন পুরো শব্দব্রহ্ম তখন তাঁর ভেতরে চলে যায়। সেই যে বিশ্বমন বা বিশ্বাত্মা যাঁকে আমরা ঈশ্বর বলছি, তাঁর ভেতরে চলে যায়। তিনি যখন আবার সৃষ্টি করেন ঐ শব্দব্রহ্ম রূপেই তখন সব বেরিয়ে আসে। শব্দব্রহ্ম রূপে বেরিয়ে আসা মানে শব্দ, বিচার আর বস্তু এই তিনটিই এসে গেল। আমাদের কাছে কখন একটা থাকে তো আরেকটি থাকে না, যেমন এটিএম কার্ড, কোন প্রত্যন্ত জঙ্গলে আদিবাসীদের গ্রামের লোকেদের এটিএম কার্ড দিলে বুঝতেই পারবে না এটা কি বস্তু, এটা দিয়ে কি কাজ হয়। তার কাছে বস্তু এসে গেছে কিন্ত বস্তুর পেছনে বিচার, বস্তু দিয়ে কি কাজ হয় এগুলোর ব্যাপারে কিছুই বুঝতে পারবে না। ঋষিদের মতে এই সমগ্র বেদরাশি ভগবানের সৃষ্টি। কখন তিনি সৃষ্টি করলেন? ঠিক যখন সৃষ্টি হল। ঋষিরা ধ্যানের গভীরে গিয়ে এই তত্ত্বগুলিকে ধরে নেন। কিন্তু সমগ্র তত্ত্বকে কেউ কোন দিন ধরতে পারবেন না, কারণ তাহলে ঈশ্বরের যে মন সেই মনকেও তিনি জেনে যাবেন। ঈশ্বরের মনকে কেউই কোন দিন পুরোটা জানতে পারবে না। তাই যে কোন জ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞানের জ্ঞান হোক, রসায়ন শাস্ত্রের জ্ঞান হোক কিংবা অধ্যাত্ম শাস্ত্রের জ্ঞান হোক, যেখানেই এই জ্ঞান যুক্ত থাকবে সেটাই বেদ। কারণ এই জ্ঞান ভগবানের মনে আছে বলেই এসেছে। নিউটন দেখলেন গাছ থেকে আপেল পড়ল, দেখার পর তিনি মাধ্যাকর্ষণের সূত্র বার করলেন, এই যে মাধ্যাকর্ষণের সূত্র এটাও কিন্তু ভগবানেরই তৈরী। নিউটন মাধ্যাকর্ষণের নিয়মকে প্রতিপাদ্য করে দিলেন এখন এটাই ঠিক কিনা আমরা জানি না। যদি ভগবান সত্যিই ঐ ভাবেই মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের প্রতিপাদ্য দিয়ে থাকেন তাহলে ওটাই সত্যি হবে, ভগবান যদি সেভাবে না দিয়ে থাকেন তখন দেখা যাবে কোন একটা অবস্থায়

গিয়ে এই মাধ্যাকর্ষণের নিয়মও কাজ করছে না। যদি এটাই ঠিক ঠিক ঈশ্বরের বিধান হয়ে থাকে তাহলে প্রত্যেক অবস্থাতেই এই নিয়ম কাজ করবে। যদি ভগবানের বিধান না হয়ে থাকে আর আমাদের মন দিয়ে রঞ্জিত হয়ে যদি কিছু আসে তখন তাতে কিছু দোষ থাকবে। পরের দিকে থিয়োরী অফ রিলেটিভিটিতে নিউটনের থিয়োরীকে একটু পরিবর্তন করতে হচ্ছে, কোয়ান্টাম ফিজিক্সেও একটু পরিবর্তন করতে হচ্ছে, কারণ ওটা আসল সত্য নয়। বেদে ঋষিরা যা কিছু বলছেন, তাঁরা তত্ত্বকে যেমনটি দেখেছেন তেমনটি বর্ণনা করছেন। তাই বলে সব তত্ত্ব বেদে রয়েছে তা নয়, এনারাও বলেন বেদের বেশির ভাগ অংশই হারিয়ে গেছে। হারিয়ে যাওয়ার থেকেও বড় হল বেদের বেশির ভাগ অংশ আবিষ্কৃতই হয়নি। আবিষ্কৃত হওয়ার কথাও নয়। যে কেউ যদি ধ্যানের গভীরে চলে যান আর তত্ত্বগুলো যদি মনের মধ্যে ভেসে ওঠে, তখন জানবেন তিনি বেদের একটা নতুন জ্ঞান পেয়ে গেলেন। এই জ্ঞানও সেখান থেকে আসছে, ভগবান যখন সৃষ্টি করেছিলেন তখনই এই তত্ত্বটাকে তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন, তিনি এখন ধ্যানের গভীরে সেটাকে ধরতে পারলেন।

হিন্দু শাস্ত্রে ঋষিদের বলা হয় দ্রষ্টা। দ্রষ্টা মানে যিনি বেদের এই মন্ত্রকে দেখেছিলেন বা এই তত্ত্বকে যিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। এমনও হতে পারে অন্য কোন ঋষিও এই তত্ত্ব পেয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁর পরম্পরাটা পাচ্ছি না। যাঁরা মন্ত্র দ্রষ্টা তাঁদেরকেই ঋষি বলা হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্বগুলিকে বা সত্যগুলোকে মন্ত্র বলা হয়। ঋষি আর দ্রষ্টা শব্দ একই ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ দেখা। বর্তমানে ফিজিক্স, মেডিকেল সাইন্স এত এগিয়ে গেছে যে, কোন একজনের পক্ষে সব কিছু জানা সম্ভব নয়। চিকিৎসার ক্ষেত্রেই এখন কত রকমের বিশেষজ্ঞ এসে গেছে। জ্ঞানের পরিধি এত বিস্তারিত হয়ে গেছে যে একজনের পক্ষে সব কিছু মাথায় রাখা সম্ভব নয়। এই সমস্যা বেদের ক্ষেত্রেও হয়েছিল। ঋষিদের ধ্যানের গভীরে এত তত্ত্ব ভেসে আসা শুরু হল যে একজনের পক্ষে সব কিছুকে ধরে রাখা সম্ভব নয়। তখন ওনারা একটা শ্রেনীর কথা ভাবলেন যারা শুধু বেদকেই সারা জীবন ধরে রাখবে। যেমন ডাক্তাদের এখন একটা শ্রেনী এসেছে, ইঞ্জিনিয়ারদের একটা শ্রেনী এসেছে। তবে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারদের ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা হল, মাধ্যমিক পাশ করে নানা রকমের প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়ে ডাক্তারীতে ঢুকতে হচ্ছে, তারপর পাঁচ বছর ধরে পড়তে হয়, এতে জীবনের অনেকটা সময়ই চলে যাচ্ছে। বেদের ঋষিরা এই জিনিষটা করতে দিলেন না, এই তো এতটুকু জীবন, তাই জন্ম থেকে এতেই ওদের লাগিয়ে দাও। পাঁচ বছরে উপনয়ন করিয়ে দিয়ে গুরুর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হত আর তারপর শুধু বেদ মুখস্ত করতে থাকল। আগামী পনের বছর তাঁরা শুধু এতেই লেগে থাকলেন, তারপর তাঁরা সমাজের কাজে লাগতেন। ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিংএর ক্ষেত্রেও যদি এই প্রথা থাকত তাহলে এই বিদ্যাকে তারা অনেক বেশি রপ্ত করতে পারত। যদিও এভাবে বললে জাতিপ্রথার কথা চলে আসবে। জাতিপ্রথার নিজস্ব কিছু দোষত্রুটি থাকলেও অনেক সুবিধাও আছে। সব থেকে বড় সুবিধা হল বাচ্চা বয়স থেকে একটা পরিবেশে যখন সে বড় হচ্ছে তখন সে ঐ জিনিষটাকে খুব ভালো করে রপ্ত করতে পারে।

বেদরাশি এত বৃহৎ হয়ে গেল যে ওনারা দেখলেন একটি মাত্র মস্তিস্ক দিয়ে এই বিশাল বেদরাশিকে সামলানো যাবে না। আজ থেকে পনেরশ কি দু হাজার খৃষ্টপূর্বে, যদিও আমাদের জানা নেই সঠিক কবে হয়েছিল, ব্যাসদেবের আবির্ভাব হল। ব্যাসদেব দেখলেন এই বিশাল বেদরাশিকে কেউ একা মুখস্ত করে ধরে রাখতে পারবে না, তখন তিনি বেদকে চারটে ভাগে ভাগ করে দিলেন। বেদের যে মন্ত্র দিয়ে দেবতাদের স্তুতি করা হয় সেই মন্ত্রগুলিকে একটা বেদের মধ্যে সংকলন করে রাখলেন, তার নাম দিলেন ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদেরই যে মন্ত্রগুলিকে বীণার উপরে গান করা যায় সেটাকে বললেন সামবেদ। সামবেদের মন্ত্রগুলিকে গান করা হত, এর নামই হল সামগান, এর আরেকটা নাম উদ্গীত। আর যে মন্ত্রগুলি যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হত তার নাম দিলেন যজুর্বেদ। যজন মানে করা, যজ্ঞ, যজু, যজন একই ধাতু থেকে এসেছে। এই তিনটের বাইরে বেদে বাকি যা কিছু ছিল সবটাকে সংগ্রহ করে একটার মধ্যে রেখে দিলেন, তার নাম দিলেন অথর্ব বেদ। প্রথম তিনটে বেদই ঠিক ঠিক যজ্ঞে লাগে সেইজন্য এই তিনটে বেদকে ত্রয়ী বলা হয়। কিন্তু অথর্ব বেদের পুরোহিতকেও যজ্ঞে সুপারভাইজারীর কাজ করতে হত, তাঁকে ব্রহ্মা বলা হয়। ব্যাসদেব বেদকে এই চারটি ভাগে ভাগ করে নিজের চারজন শিষ্যকে বলে দিলেন তোমাদের কাজ হল এই চারটে বেদকে মুখস্ত রাখা আর এই চারটে বেদে যা কিছু আছে সব তোমাদের দায়ীত্বে থাকবে। এই হল চারটে বেদের ভূমিকা।

প্রত্যেকেটি বেদে স্পষ্ট ভাবে চারটে করে ভাগ আছে। প্রথম ভাগে আসে প্রার্থনা, যা কিনা যজ্ঞে বেশি দরকার। বেদের এই অংশের নাম মন্ত্র, মন্ত্র এখানে একটা পরিভাষা, মন্ত্র এখানে একটা গ্রন্থের নামের মত। মূল মন্ত্রের সাথে বেদের এই মন্ত্র অংশের যাতে কোন সংশয় না হয় তাই এর আরেকটা নাম সংহিতা। সংহিতার অর্থ সংগ্রহ, প্রার্থনা গুলোকে সংগ্রহ করে এক জায়গায় সঙ্কলন করা হয়েছে, একে তাই মন্ত্র–সংহিতাও বলা হয়। শুধু মন্ত্র দিয়েই তো যজ্ঞ সম্পন্ন হবে না, যজ্ঞ করতে হলে কিভাবে যজ্ঞ করতে হবে, যজ্ঞের বেদী কেমন হবে, হোমের কুণ্ড কেমন হবে, যজ্ঞের কাঠ কিভাবে সাজাতে হবে এগুলোও জানতে হবে। এটিও একটা সম্পূর্ণ বিদ্যা, এই বিদ্যাকে বলা হয় ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণের সাথে বর্ণ ব্রাহ্মণের কোন সম্পর্ক নেই, বেদের চারটি অংশের যে অংশে যজ্ঞ বিধির বর্ণনা করা হয়েছে সেই অংশকে বলছেন ব্রাহ্মণ।

মন্ত্র আর ব্রাহ্মণের পর তৃতীয় অংশকে বলে আরণ্যক। বেদের সময় চতুরাশ্রম প্রথা ছিল, ব্রহ্মচর্য, গার্হ্যস্থ, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ব্রহ্মচারীরা সংহিতা নিয়েই থাকত আর পুরো সংহিতা তাদের মুখস্ত করতে হত। গৃহস্থরা যজ্ঞ-যাগ করতেন, সেইজন্য তাঁদের কাছে ব্রাহ্মণ অংশের খুব গুরুত্ব ছিল। গার্হস্থ ধর্ম পালন করার পর যাঁরা মনে করতেন অনেক ধর্ম কর্ম করা হয়েছে এবার আমরা সংসারের দায়ীত্ব থেকে মুক্ত হয়ে উপাসনা নিয়ে থাকব, এনারা আরণ্যক অংশকে নিয়ে থাকতেন। আরণ্যকে বাহ্যিক ভাবে আর যজ্ঞাদি করতে হয় না, কিন্তু চিন্তনের দিকে বেশি করে চলে যান। কর্মকাণ্ডীদের কাছে শুধু মন্ত্র আর ব্রাহ্মণই বেদ, আরণ্যক ও উপনিষদ বেদ নয়। কিন্তু তা নয়, সবটা মিলিয়েই বেদ। বেদের চতুর্থ অংশকে বলা হয় উপনিষদ। মন্ত্র অংশ হল ঠিক ঠিক বেদ, মন্ত্রকে বেদের প্রাণ বলা যায়। কিন্তু ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদে এসে আমরা কিছু কিছু রূপান্তর দেখতে পাই। ব্যাসদেব তাঁর চারজন শিষ্যকে চারটি বেদের দায়ীত্ব দিয়ে দিলেন। ঐ চারজন শিষ্যরা আবার তাঁদের শিষ্যদের পরম্পরায় শিক্ষা দিতে থাকলেন। অনেক সময় দেখা যেত কোন ব্রাহ্মণ একটা পরম্পরাতে বিদ্যা নেওয়ার পর আরেকটা পরম্পরাতেও বিদ্যা নিতেন, এইভাবে তাঁরা চারটে বেদকেই মুখস্ত করে নিতেন। কিন্তু যখন যজ্ঞের বিধি অনুসরণ করতেন তখন তাঁরা কোন একটা পরম্পরাকে অনুসরণ করতেন। যজ্ঞ করার সময় আরও কিছু আনুষাঙ্গিক বিদ্যা লাগত, যেমন জ্যোতিষ বিদ্যা, উচ্চারণ বিধি জানার বিদ্যা, এগুলোকে বলা হয় বেদাঙ্গ, আমাদের ছয়টি বেদাঙ্গ। বেদের যে বিভিন্ন পরিবার ছিল তাঁরা মন্ত্র অংশটাকে একটাই ধরে রাখলেন, যেমন ঋগ্বেদ, যাঁরাই ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণ তাঁদের কাছে সেই ঋগ্বেদ আছে, মন্ত্র অংশ ওটাই থেকে গেল কিন্তু যজ্ঞ বিধিতে এসে কিছু পরিবর্তন হয়ে যেত। এই পরিবর্তন কেন হল, কি করে হল এগুলো ইতিহাসের গর্ভে হারিয়ে গেছে। কিন্তু আমরা জানি একই বেদের বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি হল। যাঁরা ঋগ্বেদ রক্ষণাবেক্ষণ করছেন, সেই ঋগ্বেদেরই অনেকগুলো শাখা দেখা যেতে শুরু হল। শাখা আলাদা হলেও ঋগ্বেদের মন্ত্র অংশ একই থাকবে কিন্তু ব্রাহ্মণ অংশে এসে অনেক কিছু পাল্টে গেছে। আর আরণ্যক অংশ ও উপনিষদ অংশটাও পাল্টে গেছে। কিন্তু ঐ শাখার পরম্পরাতে সবটাই অভিন্ন থাকবে। এইভাবে একটা সময় প্রায় দুই তিন হাজার বছর আগে শাখাগুলো সব নির্দিষ্ট হয়ে গেল, এরপর আর নতুন কোন শাখার জন্ম হয়নি।

যজুর্বেদের পেছনে আবার একটা মজার কাহিনী আছে। যজুর্বেদ দেওয়া হয়েছিল বৈশম্পায়ন ঋষিকে। বৈশম্পায়ন খুব উচ্চমানের ব্রাহ্মণ আর বিরাট তপস্বী ছিলেন। তাঁর এক কৃতী ছাত্র ছিলেন যাঁর নাম যাজ্ঞবল্ক্য। যজ্ঞবল্ক্যও খুব বিরাট ঋষি ও প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। গুরু বৈশাম্পয়ন মুনির সাথে যাজ্ঞবল্ক্যের কোন একটা কারণে মত বিরোধ হয়ে যায়। মতের অমিল হতেই গুরু তাঁকে সব বিদ্যা ফেরত দিয়ে দিতে বললেন। যাজ্ঞবল্ক্যও খুব তেজস্বী শিষ্য, সেও রেগে গিয়ে বমি করে সব বিদ্যা গুরুকে ফেরত দিয়ে দিল। বৈশম্পায়ন দেখলেন এই বিদ্যাটা হারিয়ে যাবে, কারণ যাজ্ঞবল্ক্যই সব বিদ্যাটা জানতেন। বৈশাম্পয়ন তখন তাঁর বাকি শিষ্যদের বলে দিলেন তোমরা তিতির পাখি হয়ে এই বিদ্যাটা খেয়ে নাও। শিষ্যরা সঙ্গে সঙ্গে তিতির পাখি হয়ে ঐ বমিটা খেয়ে নিয়েছে। এদিকে যাজ্ঞবল্ক্য খুব বিরক্ত হয়ে বলে দিল আর আমি মানুষ গুরু করব না। আমরা যতই বলি গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান করবে, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের মত ঋষিও গুরুকে মানুষ রূপেই দেখছেন। যাই হোক, উনি বলে দিলেন আর আমার মানুষ গুরু লাগবে না। এবার তিনি নদীর তীরে গিয়ে সূর্যের উপাসনা শুরু করলেন। অনেক দিন উপাসনা করার পর সূর্যদেব যাজ্ঞবল্ক্যকে আবার নতুন করে বেদের শিক্ষা দিলেন। এই কাহিনীর কি তাৎপর্য, এর কি অর্থ আমাদের জানা নেই। মূল হল, পরম্পরাতে আমরা যে কাহিনী পাই তাতে এটাই পাই যে যাজ্ঞবল্ক্যের পর থেকে যজুর্বেদের দুটো ভাগ হয়ে গেল। যে বিদ্যা যাজ্ঞবল্ক্য সরাসরি

সূর্যদেবতার কাছ থেকে পেলেন তার নাম হয়ে গেল শুক্লযজুর্বেদ, বলা হয় বাজসনীয় শুক্লযজুর্বেদ, বাজসনীয় মানে শক্তি, তেজ। আর যাজ্ঞবল্ক্য বমি করে যে বিদ্যাটা ফেরত দিয়েছিলেন তার নাম হল কৃষ্ণযজুর্বেদ। বেদের দৃষ্টিতে দেখলে এর কোন দাম নেই, কারণ দুটো যজুর্বেদর মন্ত্রগুলো প্রায় এক, শুধু মন্ত্রগুলিকে সাজানোর মধ্যে সামান্য একটু পার্থক্য আছে, কিছু মন্ত্র আগে পরে হয়ে গেছে। এছাড়া শুক্লযজুর্বেদের মন্ত্র বা সংহিতা অংশে যা আছে কৃষ্ণযজুর্বেদের মন্ত্র অংশেও তাই আছে। কিন্তু বাকি গুলোতে এসে পুরোটাই আলাদা হয়ে যায়।

কৃষ্ণযজুর্বেদ খুব গুরুত্বপূর্ণ বেদ, এতে খুব নামকরা তৈত্তেরীয় ব্রাহ্মণ রয়েছে আর রয়েছে তৈত্তেরীয় উপনিষদ, তিতির থেকে তৈত্তেরীয়। শুক্লযজুর্বেদের খুব নামকরা উপনিষদ হল ঈশাবাস্যোপনিষদ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ। আমরা যে কঠোপিনিষদ অধ্যয়ন করতে যাচ্ছি এই উপনিষদ কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত। কৃষ্ণযজুর্বেদের একটি খুব নামকরা শাখা হল কঠ। কঠ নামে হয়ত কোন ঋষি বা মুনি ছিলেন যাঁর সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না, তাঁর নামে এই শাখা। কঠ শাখার উপনিষদ তাই এর নাম কঠোপনিষদ। কঠোপনিষদ আমাদের পরম্পরাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপনিষদ। সাধারণত উপনিষদে কবিত্বের অভাব থাকে, কিন্তু কঠোপনিষদ খুব উচ্চমানের কবিতা। কঠোপনিষদ এতই গুরুত্বপূর্ণ উপনিষদ যে এর কিছু কিছু মন্ত্র সরাসরি গীতাতে ব্যবহার করা হয়েছে। কঠোপনিষদে যেভাবে আত্মতত্ত্বকে আলোচনা করা হয়েছে গীতাতেও ঠিক সেভাবেই আত্মতত্ত্বকে রাখা হয়েছে। কঠোপনিষদের বংশতালিকা হল বেদ, চারটি বেদ, চারটি বেদের যজুর্বেদ, যজুর্বেদের আবার দুটি প্রকরণ, শুক্ল আর কৃষ্ণ, এর বেদ হল কৃষ্ণযজুর্বেদ, কৃষ্ণযজুর্বেদের অনেক শাখার মধ্যে একটি নামকরা শাখা হল কঠ, কঠোপনিষদ এই কঠ শাখা থেকে এসেছে।

আচার্য শঙ্কর এগারোটি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেছেন। ভাষ্যগুলিতে তিনি এমন কিছু কিছু উপনিষদের নাম উল্লেখ করেছেন, যে উপনিষদের উপর তিনি কোন ভাষ্য দেননি। আচার্য যে উপনিষদ গুলির ভাষ্য দিয়েছেন আর যে উপনিষদের শুধু নাম উল্লেখ করেছেন, এই কটি উপনিষদকেই আমাদের মূল উপনিষদ বলা হয়। সব উপনিষদের মধ্যে কঠোপনিষদের আবার একটা বিশেষ স্থান আছে। কারণ উপনিষদের যে বিষয় বস্তু, সেটাকে এখানে খুব গূঢ় ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সব উপনিষদের একটাই বক্তব্য বিশ্বাত্মা আর আমাদের সবার ভেতরে যে আত্মা আছেন এই দুটো এক। দুটোকে আলাদা করে বোঝাবার জন্য আমাদের ভেতরে যিনি আছেন তাঁকে বলা হয় জীব বা জীবাত্মা আর সর্বব্যাপী যে আত্মা তাঁকে ব্রহ্ম বলা হয়। এর সাধারণ নাম হল আত্মা, ভেতরে যিনি আছেন তাঁকেও আত্মা বলে আর বাইরে সর্বব্যাপীর রূপে যিনি আছেন তাঁকেও আত্মা বলা হয়, সংশয় যাতে না হয় তাই ভেতরের আত্মাকে আত্মা বলে আর বাইরের আত্মাকে ব্রহ্ম বলে, কিন্তু মূল বক্তব্যই হল আত্মাই ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি। যখন অহং বলছেন তখন আত্মার কথাই বলছেন, যখন ব্রহ্ম বলছেন তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে আত্মা তাঁর কথা বলছেন। প্রত্যেকটি উপনিষদের মূল বক্তব্য এটাই। মূল বক্তব্যকে এনারা চারটি মহাবাক্যে রেখে দিয়েছেন। মহাবাক্য মানে বলতে চাইছেন, উপনিষদের কি বক্তব্য। যার প্রথম কথাই অহং ব্রহ্মাস্মি, আমিই সেই ব্রহ্ম। প্রত্যেকটি উপনিষদের এটাই মূল বক্তব্য। এটাকেই আবার অন্য ভাবে বলছেন তত্ত্বমসি বা সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম বা প্রজ্ঞাবানাম্ ব্রহ্ম আবার অয়মাত্মাও বলেন। বিভিন্ন ভাবে একই জিনিষ বলা হচ্ছে। মূল হল তোমার ভেতরে যে চৈতন্য সত্তা, সবার ভেতরেও সেই একই চৈতন্য সত্তা আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পেছনেও সেই একই চৈতন্য সত্তা। আর তোমার চৈতন্য সত্তা আর আমার চৈতন্য সত্তার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। তোমার আর বিশ্বের চৈতন্য সত্তার মধ্যেও কোন তফাৎ নেই। এই জিনিষটাকেই উপনিষদ বিভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপনা করছেন। তার সাথে কিছু সাধনার কথা বলা হয়, সৃষ্টির বর্ণনাও করা হয় কিন্তু মূল বক্তব্য একটাই।

কঠোপনিষদ আলোচনা করার আগে, উপনিষদ কি জানা দরকার। জগতের জ্ঞান মানুষ ইন্দ্রিয় দিয়েই লাভ করে। আবার বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে করতে বুদ্ধিই একটা জ্ঞানের আভাস দিয়ে দেয়। কিন্তু মানুষ যখন জগৎ থেকে মুখ ঘুরিয়ে অন্তর্মুখী হয়ে নিজের মনের ভেতরকার চিন্তনগুলিকে বোঝার চেষ্টা করে তখন তাকে বলে অনাবরণ করা। যেমন একটা মানুষকে দেখলাম, এবার তাকে বোঝার চেষ্টা করছি এই লোকটি কে, লোকটি কি রকম। এটাকেই তখন বলে বিশ্লেষণ বা বিচার করা। বিচার করে বোঝার চেষ্টা করছি এই লোকটি এভাবে কেন আচরণ করছে। যখন বুঝে গেলাম লোকটি কেন এই ধরণের আচরণ করছে, তখন আমরা শান্ত

হয়ে যাই। বুঝে গেলাম লোকটি পাগল, লোকটা বদমাইশ, লোকটি ভালো, মন্দ ইত্যাদি, জেনে যাওয়ার পর শান্ত হয়ে গেলাম। এটাই হল একটা জিনিষকে বিচার করে করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছান। এভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছান একমাত্র বাহ্যিক জগতেই হয়ে থাকে। আইনস্টাইন বা নিউটন, এনারা যখন কিছু জিনিষকে নিয়ে খুব গভীরে চিন্তন করছেন তখন তাঁরা বোঝার চেষ্টা করছেন জিনিষটা এই রকম কেন। বহির্জগতের কোন জিনিষকে নিয়ে তাঁরা বিচার করে করে গভীরে গিয়ে সেই জিনিষটা যে সিদ্ধান্ত বা তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেই তত্ত্বটা পেয়ে যান। ঠিক তেমনি অন্তর্জগতে মনের কোন চিন্তাকে নিয়ে যখন গভীর ভাবে বিচার করা হয়, বোঝার চেষ্টা করা হয় এর পেছনে তত্ত্বটা কি তখন তাকেই বলা হয় চিন্তন করা বা ধ্যান করা।

সাধারণ মানুষের কাছে তার শরীরটাই সব কিছু। বাচ্চারা নিজের শরীরকেই সব কিছু বলে জানে। একটু বড় হওয়ার পর সে দেখে শরীরটাও গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু শরীরের থেকে মনই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যাঁরা ধ্যানের গভীরে যান তাঁরা দেখেন শরীরের কোন ভূমিকাই নেই, মনটাই আসল। কিন্তু এই মনের পেছনে যে আরেকটি চৈতন্য সত্তা রয়েছে, সেই চৈতন্য সত্তার কাছাকাছি যখন চলে যান তখন দেখেন আত্মাই সব। ঠিক তেমনি প্রথমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধ্যান করে বিচার করতে করতে যখন এগোচ্ছেন সেখানেও শেষে দেখছেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পেছনে আত্মা রয়েছেন। ভেতরের চৈতন্য সত্তাকে বলে আত্মা আর বাইরের চৈতন্য সত্তাকে বলে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম। উপনিষদের বিষয় আত্মা আর ব্রহ্মের ঐক্য। Oneness শব্দটাও ঠিক নয় কারণ oneness বলতে বোঝায় এক। কিন্তু জিনিষটা সেই অর্থে এক নয়। সেইজন্য এনারা এই শব্দটা ব্যবহার করেন – *ন অনেকত্ব*, এটাকেই আরও স্পষ্ট শব্দ রূপে বলেন অদ্বৈত।

দ্বৈত মানে যেখানে দুটো আলাদা সত্তা আছে। জন্মগত ভাবে আমরা সবাই দ্বৈতবাদী, আমি জানি আমি আলাদা আপনি আলাদা। কিন্তু এর উপরে আরেকটি তত্ত্ব আছে যাকে বলে একত্বম্। আমরাও যখন বলি ঈশ্বরই সব কিছু বা মুসলমানরা বলে আল্লাই সব, খ্রীষ্টানরাও বলে God is everything, তখন এখানে একত্ব বোধ রয়েছে। এই একত্ব বোধকে বলে একেশ্বরবাদ যেখানে এক ঈশ্বরের কথা বলা হয়। এই এক ঈশ্বর মতবাদের ধারণা মধ্য এশীয়ার অর্থাৎ ইরান, ইরাক, আরব এই সব জায়গার লোকেদের একটি বিচিত্র ধারণা। একেশ্বরবাদ মূলতঃ এখান থেকেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। যার জন্য পার্সিদের ধর্ম একেশ্বরবাদের উপর দাঁড়িয়েছে, এমনকি জহুদি, ইসলাম ও খ্রীষ্টানদের মধ্যেও একেশ্বরবাদ প্রসার লাভ করেছে। এই চারটে ধর্ম ভাই ভাই। অন্য দিকে ভারতের চারটে ধর্ম – হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ আর জৈন ধর্ম এরাও ভাই ভাই। একমাত্র পার্সি ধর্মের সাথে হিন্দু ধর্মের সংযোগ রয়েছে। পার্সি ধর্মের শেকড় হিন্দু ধর্মে রয়েছে কিন্তু তার পুষ্টি এসেছে মধ্য এশিয়ার ধর্মগুলির প্রভাব থেকে। খ্রীষ্টান, ইসলাম আর জুদাইজিম্ সম্পূর্ণ আলাদা, এদের সাথে হিন্দু ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। একেশ্বরবাদ প্রথম আমরা পাই পার্সিদের মধ্যে আর জহুদিদের মধ্যে। সেখান থেকে এই একশ্বরবাদ প্রসার লাভ করে ইসলাম আর খ্রীষ্টান ধর্মের মধ্যেও এসে যায়। হিন্দুদের মূল ধারণা কখনই একেশ্বরবাদ নয়, হিন্দুদের মূল ভাব অদ্বৈত, অর্থাৎ যেখান দুই নেই, *ন দ্বৈত*। তাহলে কি আছে? কি আছে মুখে বলা যাবে না। ঠাকুর খুব সুন্দর উপমার সাহায্যে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, আকাশে একটি সূর্য আছে আর নীচে জলপূর্ণ দশটি পাত্র আছে, দশটি পাত্রে দশটি প্রতিবিম্বিত সূর্য দেখা যাচ্ছে আর আকাশে একটি আসল সূর্য মোট এগারোটি সূর্য আছে। একটা একটা করে প্রতিবিম্বিত সূর্যের পাত্রকে ভেঙে দেওয়া পর শেষে একটি পাত্র থেকে গেল, এখন নীচে একটি প্রতিবিম্বিত সূর্য আর আকাশে একটি সূর্য মোট দুটি সূর্য রইল। এবার ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন, এই শেষ পাত্রটিকেও যদি ভেঙে দেওয়া হয় তাহলে কটি সূর্য থাকবে। একজন উত্তর দিলেন একটি সূর্য থেকে যাবে। ঠাকুর বলছেন, না, কি আছে আর মুখে বলা যাবে না। একটা জিনিষকে যখন বোধ করা হবে তার জন্য মন দরকার, মন ছাড়া কখনই কোন জিনিষকে জানা যায় না।

সব ধর্মের এটাই সমস্যা, বিশেষ করে পপুলার ধর্মগুলি মনকে সব সময় রেখে দেয়, তারা যত যাই উচ্চ তত্ত্বকে সামনে নিয়ে আসুক সব জায়গাতে তাদের মনটা থেকে যাচ্ছে। মন থেকে যাওয়ার জন্য সব সময় কোন না কোন ভাবে ওটাকে দুই দেখায়। মুখে যতই বলুক ঈশ্বর এক, গড্ এক, আল্লা এক সবাই দ্বৈতবাদী। ঠিক ঠিক অদ্বৈত, যেখানে মনেরও লয় হয়ে যায় তখন বলছেন খবর দেওয়ার জন্য সেখানে কেউ নেই। তার মানে subject আর objectএর মাঝখানে divisionটা মুছে যায়। Subject-objectএর division যদি

মুছে যায় তাহলে কি আছে বলবেটা কে! বলার জন্য তো কাউকে থাকতে হবে। এই ঘরে একজন লোকও যদি থাকে তাহলে সে বলতে পারবে ঘরে কি হচ্ছে, কিন্তু ঘরে কেউ নেই, ঘরের দরজা জানলা বন্ধ হয়ে গেছে এরপর কে খবর দেবে ঘরের ভেতর কি হচ্ছে? এর উল্টোটাও নেওয়া যায়, ঘরে এত লোক আছে কিন্তু পুরো ঘরটাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, বাইরের থেকে সব সংযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। তখন বাইরে কি আছে, কি হচ্ছে, কে বলবে? জানার কোন পথ নেই। আমরা এগুলো তত্ত্বগত ভাবে যুক্তি দিয়ে আলোচনা করে যাচ্ছি ঠিকই কিন্তু এর কোন দাম নেই, কারণ আরেকজন কেউ এসে ভালো যুক্তিতর্ক দিয়ে এগুলোকে কেটে দেবে। ঋষি মুনিরা ধ্যানের গভীরে ঠিক এই জিনিষটাকেই প্রত্যক্ষ করেছেন, সেইজন্য তাঁরা বলেন অদ্বৈত, যেখানে কোন দ্বৈত নেই। সব উপনিষদের বক্তব্য এই অদ্বৈত। এই অদ্বৈতকেই ওনারা বিভিন্ন উপনিষদে বিভিন্ন ভাবে বলেছেন, কখন বলছেন *অহং ব্রহ্মাস্মি*, আবার কখন বলছেন *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*।

উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের একটি হল আত্মা আর ব্রহ্মকে নিয়ে আলোচনা করা। আলোচনা করে করে শেষ অবস্থায় নিয়ে গিয়ে বলবেন আত্মা যা ব্রহ্মও তাই। ব্রহ্মের শাব্দিক অর্থ বিচার করলে দেখা যাবে বৃ ধাতু থেকে ব্রহ্ম শব্দ এসেছে, বৃ মানে বৃহৎ। এখন কোনটাকে বৃহৎ বলা হবে? ঋষিরা এর বিচার করতে নেমে চিন্তন করে করে তাঁরা এক একটা জিনিষকে ধরছেন, ধরে বলছেন এটাই ব্রহ্ম, অর্থাৎ বলতে চাইছেন এটাই আসল। মানুষ যদি শরীরকেই আসল দেখে তাহলে এই শরীরকে চালানোর জন্য দরকার অন্নের, সেইজন্য বলছেন *অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ*, অন্নকেই ব্রহ্ম জানবে। বাস্তবিকই অন্নকে ব্রহ্ম রূপে জানা হয়। কিন্তু আরও বিশ্লেষণ করার পর দেখছেন অন্নই বৃহৎ নয়, অন্ন থেকেও বড় হল তার পেছনে যে প্রাণশক্তি আছে, যে প্রাণশক্তি এই শরীরকে চালায়। তখন বললেন প্রাণকেই ব্রহ্ম রূপে জানবে। এরপর আরও বিচার বিশ্লেষণ করে মনকে ব্রহ্ম বলছেন। এইভাবে বিচার করে করে শেষে গিয়ে বলছেন *আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ*। শুধু শুদ্ধ আনন্দ, এই শুদ্ধ আনন্দের পর আর ব্রহ্মের ব্যাপারে কিছু বলা যায় না, শুধুমাত্র শুদ্ধ আনন্দই রয়েছে।

এই সত্যকে উপনিষদ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করছেন। উপস্থাপন করার সময় ওনারা ব্রহ্মকে দু ভাবে উপস্থাপন করেন, নির্গুণ ব্রহ্ম আর সগুণ ব্রহ্ম রূপে। মন দিয়ে যখন সেই পরম সত্তাকে জানছেন কিংবা যেখানে মন একটু থেকে যায় তখন সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দকে বলছেন সগুণ ব্রহ্ম। মনবুদ্ধির পারে গিয়ে যখন সেই পরম সত্তাকে বোধে বোধ করেন তখন তাকে বলছেন নির্গুণ ব্রহ্ম। আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বলছেন যদিও উপনিষদে কোথাও কোথাও সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার কথা আছে বা কোথাও কোথাও সগুণ ব্রহ্মের আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু সগুণ ব্রহ্ম কখনই উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। উপনিষদের একমাত্র বক্তব্য নির্গুণ ব্রহ্ম, যেখানে সব কিছু শান্ত হয়ে যায় আর ঐ জিনিষটা কি মুখ দিয়ে আর ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ যিনি বলবেন তিনি নিজেও সেই পরম সত্তার সাথে এক হয়ে গেছেন।

উপনিষদ হিন্দু ধর্মের প্রাণ। ঠাকুর বেলের উপমা দিয়ে বলছেন, বেলের খোসা, বেলের বীচি আর বেলের শাঁস সবটা মিলিয়েই বেল, কিন্তু বেলের আসল বস্তু হল ঐ শাঁসটুকু। হিন্দু ধর্মের ঐ শাঁসটুকুকে যদি টেনে নেওয়া হয়, সেটাই হয়ে যাবে উপনিষদ। স্বামীজী গীতাকে উপনিষদেরও উপরে স্থান দিয়েছেন কারণ গীতাতে ভক্তির কথা আছে। কিন্তু এই জিনিষটাকে আচার্য শঙ্কর আগেই আলোচনা করে বলে দিচ্ছেন যে সগুণ ব্রহ্মের কথা উপনিষদেও এসেছে কিন্তু এটা কখনই উপনিষদের বক্তব্য নয়। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, ভারতবর্ষই যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে এই বিশ্বে কে বেঁচে থাকবে! আর ভারতবর্ষ যদি বেঁচে থাকে তাহলে এই সংসারে কার আর নাশ হবে, কারুরই নাশ হবে না। আরেক জায়গায় স্বামীজী বলছেন, হিন্দু জাতির অনেক দোষ থাকা সত্ত্বেও ভগবান এই জাতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, কারণ এই জাতির কাছে ব্রহ্মবিদ্যা আছে। সেইজন্য ভারতের মাটিতে যখনই কোন অবতারের আবির্ভাব হয় তখন সেই অবতারের একটাই কাজ থাকে, ব্রহ্মবিদ্যাকে রক্ষা করা। ব্রহ্মবিদ্যা একমাত্র হিন্দুদের কাছে থাকার জন্য হিন্দুদের কোন মতেই ধর্মান্তর করা যাবে না। আইনস্টাইন, নিউটনের মত শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের কোন সাধারণ কাজে লাগিয়ে দেওয়ার মত ব্যাপার হয়ে যাবে। মানুষকে যখন মাপা হয় তখন তার শ্রেষ্ঠতম কীর্তি দিয়ে মাপা হয়। এই যে ব্রহ্মবিদ্যা, যেটা মানবজাতির highest thought process হতে পারে, এই বিদ্যাকেই আমরা উপনিষদে আলোচনা করতে যাচ্ছি। হিন্দুরা এই ভারত ভূখণ্ডের মূল বাসিন্দা আর এই ব্রহ্মবিদ্যা এই ভূখণ্ডেই ফুলে ফলে ডালপালায় মুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। সেইজন্য বিশ্বে এই তিনটে বস্তুর মূল্য অপরিসীম, কোন কিছু দিয়েই এর মূল্যকে মাপা

যায় না, এই তিনটে হল – ব্রহ্মবিদ্যা, হিন্দু ধর্ম আর ভারতবর্ষ। স্বামীজী তাঁর বক্তৃতা, লেখা, আলোচনায় শুধু এই তিনটে জিনিষকে নিয়েই বলে যাচ্ছেন। ঠাকুর স্বামীজীর মত যুগপুরুষদের আবির্ভাবের একটাই উদ্দেশ্য ব্রহ্মবিদ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করা। স্বামীজীই প্রথম ব্রহ্মবিদ্যাকে বিদেশে নিয়ে গেলেন, তাঁর আগে কেউ ব্রহ্মবিদ্যাকে ভারতের বাইরে নিয়ে যাননি। এখন অনেকেই নিয়ে যাচ্ছেন। ফিজিক্সে যেমন থিয়োরী অর রিলেটিভিটি বা কোয়ান্টাম মেকানিকসকে highest achievement বলে মনে করা হয়, ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক জগতে ব্রহ্মবিদ্যাই highest। অন্যান্য ধর্ম থেকে হিন্দু ধর্মের মহত্ত্বকে যদি বিচার করতে হয় তাহলে এই ব্রহ্মবিদ্যাই হিন্দু ধর্মকে মহত্ত্বে নিয়ে গেছে। এই ব্রহ্মবিদ্যা অন্য কারুর কাছে নেই। বাকি সবার কাছে আছে সগুণ ব্রহ্মবিদ্যা কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যা কারুর কাছে নেই। বৌদ্ধ ধর্মেও আছে কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মও ঠিক এই উচ্চতায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাতে পারেনি। ওনারা শূন্যবাদে নিয়ে গিয়ে জিনিষটাকে একটু অন্য রকম করে দিয়েছেন।

ম্যাক্সমূলারও ঠিক এই কথা বলছেন। শ্যোপেনহাওয়ারের কাছে ঘুরে ঘুরে এই ব্রহ্মবিদ্যা পৌঁছাবার আগে উপনিষদ পার্সি ভাষায় অনুবাদ করা হয়, পার্সি ভাষা থেকে আবার জার্মান ভাষায় অনুবাদ করা হয়, সেই উপনিষদকে পড়ে তিনি বলছেন, জগতে এর থেকে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা আর কিছু হতে পারে না। উপনিষদকে উনি জার্মান ভাষায় পড়ে বলছেন, এর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কি হতে পারে? উপনিষদই হবে, কিন্তু মূল সংস্কৃতে হতে হবে। তিনি আরও বলছে, এই বিদ্যাকে ধরেই আমি জীবন চালাচ্ছি, মৃত্যুর সময় এটাই আমাকে শান্তি দেবে। শ্যোপেনহাওয়ারের মত একজন নামকরা জার্মান দার্শনিক উপনিষদ সম্বন্ধে এই মন্তব্য করছেন, তাও আবার দুটো ভাষায় অনুদিত হওয়ার পর – সংস্কৃত থেকে পার্সিয়ান, পার্সিয়ান থেকে জার্মান ভাষায়। জার্মান ভাষায় পড়েই তিনি অভিভূত হয়ে গেছেন। একটা জাতি চিন্তা-ভাবনাকে কত উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে ভাবাই যায় না! অথচ আমরা উপনিষদের নামই শুনিনি, তাও এদিক ওদিক ক্লাশ হচ্ছে বলে ইদানিং কিছু কিছু লোক উপনিষদের কথা জানতে পারছে। আর সেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোথায় জার্মান, সেখানকার একজন দার্শনিক উপনিষদ পড়ার পর বলছেন, এর চিন্তা ভাবনাই আমার জীবনকে চালিত করছে আর মৃত্যুর সময় এই চিন্তা-ভাবনাই আমাকে শান্তি দেবে। বিশ্বের যে কোন বিশ্বাবিদ্যালয়ে দার্শনিক বিভাগে শ্যোপেনহাওয়ারের দর্শন ছাড়া চলবে না, সেই মানুষটি মাথা নত করে বলছেন এর থেকে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা আর কিছু হতে পারে না। ঠাকুর বলছেন, সাপের মাথায় মণি আছে কিন্তু সে মরা ব্যাঙ খেয়ে মরে। আমাদের জাতির মাথায় উপনিষদের মত মণি অথচ আমরা মরা ব্যাঙ খেয়ে যাচ্ছি, সারা দিন নিউজপেপার আর ম্যগাজিন পড়ছি আর অমুক নেতা কি করল, তমুক নেতা কি করল এই নিয়ে পড়ে আছি।

কঠোপনিষদ নচিকেতার একটা ছোট্ট কাহিনী দিয়ে শুরু হয়, এর নামই যম-নচিকেতা সংবাদ। আচার্য শঙ্কর গীতা বা উপনিষদের ভাষ্য রচনা করার শুরুতে একটা ভূমিকা দেন, যাকে উপোদ্ঘাত বা সম্বন্ধ ভাষ্য বলা হয়। সম্বন্ধ ভাষ্যে আচার্য সংক্ষেপে বলে দেন এই গ্রন্থ কি, গ্রন্থের বিষয়বস্তু কি, এই গ্রন্থের প্রয়োজন কি। জর্জ বার্ণাড'শ পরের দিকে যত নাটকাদি রচনা করেছেন তাতে তিনি যে ভূমিকা দিয়েছেন সেই ভূমিকা মূল নাটকের থেকেও বড়। উচ্চমানের লেখকদের ভূমিকাগুলিও পড়ার মত। অনেকে আবার ভূমিকা ছাড়াই তাঁর মূল রচনা লিখে দেন। ভূমিকাতে তিনি বলে দেন কেন তিনি জিনিষটা রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন, দ্বিতীয় রচনা বিষয়বস্তু কি, তৃতীয় এটা কেন দরকার। দশটি উপনিষদের ভাষ্য রচনার পূর্বে আচার্য যদিও সম্বন্ধ ভাষ্যকে বিভিন্ন ভাবে উপাস্থাপনা করছেন কিন্তু মূল বিষয়টা একই থাকে। কঠোপনিষদের শুরুতেও আচার্য সম্বন্ধ ভাষ্যে বলে দিচ্ছেন কঠোপনিষদের বৈশিষ্ট্য কি আর কেন উনি এর ভাষ্য রচনা করছেন।

ভূমিকার শুরুতে আচার্য প্রণাম নিবেদন করছেন – *ওঁ নমো ভগবতে বৈবস্বতায়*। নচিকেতার বাবা নচিকেতাকে বলে দিলেন – আমি তোমাকে যমরাজের কাছে দান করে দিলাম। যমরাজের কাছে নচিকেতা চলে গেলেন, যমরাজের কাছে যাওয়া মানে নচিকেতা মারা গেলেন। যমরাজ তখন বাড়িতে ছিলেন না। তিন দিন নচিকেতা অপেক্ষা করে থাকলেন। তিন দিন পর যমরাজ বাড়ি ফিরে সব শুনে নচিকেতাকে তিনটে বর দিতে চাইলেন। তিনটে বরের মধ্যে তৃতীয় বরে তিনি যমরাজের কাছে ব্রহ্মবিদ্যার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। যমরাজ প্রথমের দিকে রাজী হচ্ছিলেন না, পরে রাজী হওয়ার পর নচিকেতাকে ব্রহ্মবিদ্যা দিলেন। যমরাজ প্রথম এই বিদ্যা নচিকেতাকে দিলেন, পরে নচিকেতা থেকে এই কঠোপনিষদ দাঁড়িয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে

যমরাজ এই বিদ্যাটা কোথা থেকে পেয়েছিলেন। যমরাজ সূর্যের সন্তান। হিন্দু ধর্মে কেউ যদি হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলে আমি এই বিদ্যা ধ্যানে পেয়েছি, সেই বিদ্যাকে হিন্দু ধর্মের কেউই সম্মান দেবে না। সম্প্রদায় বিদ্যা না হলে সেই বিদ্যাকে কেউ দাম দেবে না। সম্প্রদায় বিদ্যা মানে, এই বিদ্যা যেন ভগবানের কাছ থেকে এসে থাকে। সব বিদ্যা ভগবান থেকেই আসে। মুসলমানরাও বলে, কোরানে যা কিছু আছে সব আল্লার মুখ থেকে বেরিয়েছে। আজকের দিনেও এটাই আমাদের কাছে সত্য হয়ে আছে, যদি কোন বিদ্যার পেছনে সম্প্রদায় না থাকে তাহলে আমরা এই বিদ্যাকে মানব না। কঠোপনিষদেরও কোন দিন সম্মান হবে না, যদি এর পেছনে কোন সম্প্রদায় না থাকে। এই সম্প্রদায় সব সময় শুরু হতে হবে ঈশ্বরের কাছ থেকে। আচার্য তাই শুরু করছেন – *ওঁ নমো ভগবতে বৈবস্বতায় মৃত্যবে ব্রহ্মবিদ্যাচার্যায় নচিকেতা চ*। সূর্যপুত্র যমরাজকে আমি প্রণাম করি, যমরাজ যে নচিকেতাকে এই বিদ্যা প্রদান করলেন সেই নচিকেতাকেও আমি প্রণাম করি। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে বলছেন, আমি এই বিদ্যা প্রথমে সূর্যকে দিয়েছিলাম। বলা হয় যে, যত সম্প্রদায় বিদ্যা সব সূর্য থেকে আসে। যাজ্ঞবল্ক্য সরাসরি সূর্যের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছিলেন। কিন্তু এখানে আমরা ঘুরে পাচ্ছি, ভগবানের কাছ থেকে সূর্য পেয়েছেন, সূর্য থেকে যমরাজ পেয়েছেন আর যমরাজ থেকে নচিকেতা পেয়েছেন, এইভাবে পরম্পরায় বিদ্যা চলতে চলতে আমাদের কাছে এসেছে। কিন্তু শুক্লযজুর্বেদে যাজ্ঞবল্ক্য সব সময় বলবেন আমি এই বিদ্যা সরাসরি সূর্য থেকে পেয়েছি। প্রথম যাঁর কাছে থেকে এই বিদ্যা পেলেন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রণাম নিবেদন করছেন।

তারপর বলছেন, *অথ কঠোপনিষদ্বল্লীনাং সুখার্থপ্রবোধনার্থম্*। আচার্য শঙ্কর গীতাতেও এই কথা বলছেন আর কঠোপনিষদেও বলছেন, এখানে এক একটি ছোট ছোট যে অধ্যায় আছে এর নাম বল্লী, এই উপনিষদে যে অধ্যায়গুলি আছে এগুলোর আমি ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি। কিন্তু ব্যাখ্যা করার সময় বলছেন না যে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব, বলছেন *সুখার্থপ্রবোধনার্থম্*, যাতে মানুষ সহজে এর অর্থ বুঝতে পারে। কঠোপনিষদ আর গীতার মধ্যে একটা বড় পার্থক্য আছে। কঠোপনিষদে এমন কয়েকটি মন্ত্র আছে যে মন্ত্রগুলিকে গীতাতে সরাসরি নিয়ে আসা হয়েছে। আর গীতাতেও আচার্য বলছেন *সুখার্থপ্রবোধনার্থম্*। কেন বলছেন? গীতাতে তিনি অন্য কারণ দেখাচ্ছেন, সেখানে বলছেন গীতাতে এত আপাত বিরোধী ভাব রয়েছে যে ভাষ্যকাররা গীতার অর্থ করতে গিয়ে অনেক বিপরীত ভাব সৃষ্টি করে সংশয় তৈরী করে দেন, গীতার যাতে একটা সুসংহত অর্থ বের হয়ে আসতে পারে সেইজন্য আমি গীতার ভাষ্য লিখতে যাচ্ছি। কিন্তু কঠোপনিষদে এখানে কোন ধরণের সংঘাত নেই, এখানে আগাগোড়া একটাই তত্ত্ব চলে। উপনিষদ যা বলার সরাসরি বলে দিচ্ছে আর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা দর্শনকে নিয়েই চলে, কোন ধরণের আপাত বিরোধী ভাব পাওয়া যাবে না। সেইজন্য বলা হয়, উপনিষদকে নিয়ে আলোচনা করা সহজ। কিন্তু মহাভারত বা গীতা বা ভাগবত বোঝা খুব কঠিন। তার কারণ ওর মধ্যে অনেক রকম চিন্তা-ভাবনা চলে, অনেক রকমের চিন্তা-ভাবনাকে সামঞ্জস্য করে একটা সুসংহত ভাবের মধ্যে নিয়ে আসা অনেক কঠিন কাজ হয়ে যায়। অন্য দিকে উপনিষদ এত উচ্চমানের ভাবকে নিয়ে চলে যে সাধারণ মানুষ এই ভাবকে ধারণাই করতে পারে না। সাধারণ মানুষ ধারণা করতে পারবে না, তাই সবার উপযোগী করে আচার্য এর ব্যাখ্যা করছেন।

ঠাকুর নিজেকে বলছেন – আমি হলাম এক ডেলে গাছ। এক ডেলে গাছ মানে সোজা উপরে উঠে গেছে, কিন্তু এত উঁচুতে চলে গেছেন যে তাঁর নাগাল পাওয়া কঠিন। উপনিষদেও ঠিক তাই, এর শাখা-প্রশাখা নেই, অর্থাৎ কোন ধরণের সংশয়মূলক বক্তব্য নেই, কোন বিরোধী বক্তব্যও নেই। কিন্তু এত উচ্চতায় চলে গেছে যে খেই পাওয়া যায় না। আচার্য তাই বলছেন মানুষ যাতে সহজে বুঝতে পারে সেভাবে আমি এর ভাষ্য রচনা করলাম। উপনিষদের উপর অনেকের ভাষ্য আছে কিন্তু আচার্য শঙ্করের ভাষ্যই পণ্ডিত সমাজে বেশি সমাদৃত। এর প্রধাণ কারণ, আচার্য শঙ্কর একটা মূল ভাবকে নিয়ে এগিয়ে গেছেন। উপনিষদের বক্তব্য একটাই, আত্মাই ব্রহ্ম। এরপর উপনিষদের যে মন্ত্রই আসুক, সব মন্ত্রকে সামঞ্জস্য করে করে দেখাচ্ছেন, সবার বক্তব্য এক। অন্যান্য আচার্যরা এই জিনিষটাকে খুব বেশি সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হননি। যখন কোন মন্ত্রকে সামঞ্জস্য করতে যাচ্ছেন তখন পরিষ্কার বোঝা যায় যে তিনি যেন গায়ের জোরে টেনে হিঁচড়ে এর অর্থ বার করতে চাইছেন। আচার্য যখনই কোন সামঞ্জস্য করছেন তখনই তিনি প্রত্যেকটি অর্থকে একটা বলিষ্ঠ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। সেইজন্য বলছেন *সুখার্থপ্রবোধনার্থম্*।

আর বলছেন *অল্পগ্রন্থারবৃত্তিরারভ্যতে*, আচার্য কিন্তু নিজে ভাষ্য না বলে বলছেন বৃত্তি। একটা গ্রন্থকে কেন্দ্র করে যখন কোন একটা দর্শনকে দাঁড় করান হয় তখন সেটাকে ভাষ্য বলা হয়। আর গ্রন্থের শুধু অর্থটুকু যখন বলে দেওয়া হয় তখন তাকে বৃত্তি বা টীকা বলা হয়। কঠোপনিষদের ক্ষেত্রে আচার্য তাঁর রচনাকে ভাষ্য না বলে বৃত্তি বলছেন। কারণ কঠোপনিষদের দর্শন এতই পরিষ্কার যে এখানে আর নতুন করে কোন দর্শন বার করার কোন সুযোগই নেই। তাই তিনি বলছেন বৃত্তি বা টীকা, সহজ ভাবে এর অর্থটা বলা হচ্ছে।

এরপর তিনি উপনিষদ শব্দকে নিয়ে আলোচনা করছেন। উপনিষদ শব্দের সন্ধি ভেঙে বলছেন – উপ+নি+সদ্, সদ্‌কে ব্যাখ্যা করে বলছেন, এটা হল সদ্ ধাতু। সংস্কৃত ব্যাকরণে কয়েকটি ছোট ছোট ধাতু রয়েছে, এই ধাতু দিয়ে শব্দ তৈরী হয়, ধাতু মানে শব্দের বীজ। বীজের সামনে (উপসর্গ) আর বীজের পেছনে (প্রত্যয়) যখন কোন শব্দকে লাগানো হবে তখন যে শব্দ হবে সেটাই একটা অর্থবোধক শব্দ হয়ে বেরিয়ে আসবে। উপনিষদ শব্দের ধাতু হল সদ্ ধাতু। ব্যাকরণের ধাতুপাঠে ধাতুর অর্থটাও দেওয়া থাকে। আচার্য এখানে বলছেন *সদের্ধাতোর্বিশরণগত্যবসাদন্*, সদ্ ধাতুর অর্থ হল *বিশরণ গতি অবসাদন্*। সদ্ ধাতুর তিনটি অর্থ, বিশরণ মানে নাশ করা, গতি মানে নিয়ে যাওয়া আর অবসাদন্ মানে শিথিল করা। আচার্যের পাণ্ডিত্যের এটাই বৈশিষ্ট্য, তিনি উপনিষদ শব্দের অর্থ করতে গিয়ে সদ্ ধাতুকে নিচ্ছেন, ধাতুপাঠে সদ্ ধাতুর যে তিনটে অর্থ দেওয়া হয়েছে তিনটে অর্থকেই নিচ্ছেন, নেওয়ার পর দেখাচ্ছেন উপনিষদ শব্দে এই তিনটে অর্থই প্রযোজ্য আর তিনটেতে ওর একটাই অর্থ বেরিয়ে আসে। এতে তিনি যে শব্দের জাল তৈরী করছেন, কোন রকম চালাকি করছেন তা নয়, খুব স্বাভাবিক ভাবে বলছেন।

এবার সদ্ ধাতুতে প্রথম উপসর্গ লাগছে 'উপ'। উপ মানে একটা জিনিষের দিকে এগিয়ে যাওয়া। সংস্কৃত ভাষার সব থেকে বড় সমস্যা হল, শব্দগুলিকে ভাঙার সময় বিভিন্ন পণ্ডিতরা শব্দকে বিভিন্ন ভাবে ভাঙেন আর বিভিন্ন ভাবে অর্থ বার করেন। এইভাবে অনেকে উপনিষদের অর্থ বার করে বলেন, গুরুর কাছে বসে যা শ্রবণ করা হত সেটাই উপনিষদ। এই জায়গাতে আচার্য বলছেন 'উপ' মানে কাছে যাওয়া। 'নি'কে বলা হয় ক্বিপ্ প্রত্যয়, এটাও সংস্কৃত ব্যাকরণের একটা নিয়ম। 'নি' মানে হয় নিঃশেষে। বিশরণের কাছে নিঃশেষে নিয়ে যাবে, গতির কাছে নিঃশেষে নিয়ে যাবে আর অবসাদনের কাছে নিঃশেষে নিয়ে যাবে। এখান থেকেই উপনিষদ শব্দের মূল অর্থটা বেরিয়ে আসে। সংস্কৃতে সাপ মানে সর্প। সর্প শব্দ আসে সৃপ্ ধাতু থেকে। সৃপ্ মানে স্লাইড করে যাওয়া, সাপ পেটে ভর করে পিছলে পিছলে সরে যায় তাই এর নাম হয়ে গেল সর্প। ঠিক তেমনি গম্ ধাতুর অর্থ যাওয়া। গম্ ধাতু থেকে গরুও হয়, গম্ ধাতু থেকে আবার জগতও হয়। সৃপ্ ধাতু থেকে আবার সংসারও হয়। গম্ ধাতু থেকে জগত, জগতের ধর্ম চলতে থাকা, সৃপ্ থেকে সংসার মানে সংসারটা স্লাইড করে সরে সরে যাচ্ছে। সংসার, জগৎ এই শব্দগুলো দুমদাম্ করে আসেনি। সংস্কৃতের প্রত্যেকটি শব্দের পেছনে একটা অকাট্য যুক্তি আছে। জগৎ শব্দের পেছনে গম্ ধাতু রয়েছে, সংসার শব্দের পেছনে সৃপ্ ধাতু রয়েছে। ঠিক তেমনি উপনিষদ শব্দের পেছনে সদ্ ধাতু রয়েছে। সদ্ ধাতুর তিনটে অর্থ – বিশরণ, গতি আর অবসাদন্। এই তিনটের কাছে নিয়ে যাওয়া মানে উপ। কেমন ভাবে নিয়ে যায়? নিঃশেষে নিয়ে যায়, কোন ডানদিক বামদিক নেই। এবার আচার্য আলোচনা করবেন কিভাবে নিঃশেষে বিশরণের দিকে নিয়ে যায়, কিভাবে নিঃশেষে গতির দিকে নিয়ে যায় আর কিভাবে অবসাদনের দিকে নিঃশেষে নিয়ে যায়। এই তিনটের দিকে কে নিয়ে যাবে? যে বিদ্যা নিয়ে যাবে, সেই বিদ্যা হল উপনিষদের বিদ্যা। আচার্য বলতে চাইছেন এই কঠোপনিষদ গ্রন্থ বা যে কোন উপনিষদের গ্রন্থে যে বিদ্যা আছে এই বিদ্যাই আসল, এর text কখনই আসল নয়। কোন কিছুর যখন আলোচনা করা হয় তখন তার দুটো রূপ থাকে, একটা হল শব্দ, যা তার বাহ্যিক রূপ আর তার আন্তরিক রূপ হল জ্ঞান। অন্যান্য জিনিষের শব্দ আর জ্ঞান আলাদা, যেমন ফিজিক্স, ফিজিক্স বলতে তার শব্দটা আলাদা আর ফিজিক্সের যে জ্ঞান সেটা আলাদা। কিন্তু উপনিষদের ক্ষেত্রে তা নয়, উপনিষদের শব্দও যা জ্ঞানও তাই। উপনিষদ বলতে কখনই বই বা গ্রন্থ বোঝায় না। উপনিষদ বলতে বোঝায় সেই জ্ঞান যে জ্ঞান আমাকে বিশরণ গতি অবসাদনের কাছে নিঃশেষে নিয়ে যাবে। কিসের গতি, কিসের বিশরণ্ আর কিসের অবসাদন্? এটাকে নিয়ে আচার্য পরে আলোচনা করছেন।

উপনিষদ বলতে দুটো জিনিষ, একটা এর গ্রন্থ আরেকটি এর বিষয়বস্তু। কিন্তু এখানে উপনিষদ বলতে গ্রন্থকে বোঝায় না, এর বিষয়বস্তু, এর প্রতিপাদ্য বিষয়কেই উপনিষদ বোঝায়। যে বিষয়কে নিয়ে আলোচনা

করা হচ্ছে উপনিষদে সেটারই গুরুত্ব, অন্য কোন কিছুর এখানে গুরুত্ব নেই। এর ফলে কঠোপনিষদও যা, ঈশোপনিষদও তাই আর মুণ্ডকোপনিষদও তাই। আমরা কখনই বলতে পারবো না যে এই উপনিষদ আলাদা আর ঐ উপনিষদ আলাদা। বেদ বলতে সব সময় বেদের যে বিদ্যা তাকেই বেদ বোঝায়। কিন্তু ধনুর্বেদ যখন বলছি, তখন তা আলাদা হয়ে যাবে। বেদের যা প্রতিপাদ্য বিষয়, বেদ অধ্যয়ন করলে ভেতরে যে জ্ঞানের উন্মেষ হয়, ধনুর্বেদ অধ্যয়ন করলে সেই জ্ঞান হবে না। সেইজন্য বিদ্যা সব সময় দুই প্রকার, মুণ্ডকোপনিষদে বলছেন পরা বিদ্যা আর অপরা বিদ্যা। পরা বিদ্যা সব সময় ব্রহ্ম বিষয়ক বিদ্যা। যদিও গ্রন্থের নাম উপনিষদ, উপনিষদ বলতে আমরা এই গ্রন্থকে বুঝি, পরে এই নিয়ে আবার আলোচনা করবেন। আচার্য তখন বলবেন গ্রন্থের কোন দাম নেই, এই গ্রন্থ যে বিদ্যাকে নিয়ে আলোচনা করছে সেই বিদ্যাটাই গুরুত্বপূর্ণ, গ্রন্থের গুরুত্ব নেই। উপনিষদ গ্রন্থে যে বিদ্যার কথা বলা হচ্ছে, এই বিদ্যা কি করে?

এই বিদ্যা কিভাবে এই তিনটে বিশরণ, গতি আর অবসাদনের সঙ্গে যুক্ত সেই নিয়ে এবার আলোচনা করছেন। *যে মুমুক্ষবো দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণাঃ সন্তঃ, দৃষ্ট* আর *অনুশ্রবিক* হওয়ার জন্য কি হয়েছে? *বিষয়বিতৃষ্ণাঃ সন্তঃ*। ঠাকুর বলছেন সবাই কামিনী-কাঞ্চনের দাস। তার মানে এই জগতের পেছনে যে সুখ, এই সুখের পেছনে সবাই দৌড়াচ্ছে। কিন্তু উপনিষদ কামিনী-কাঞ্চন শব্দের ব্যবহার করছে না, তখনকার দিনে মানুষের নৈতিকতা আরও উঁচু ছিল, এখন নৈতিকতা বলে কিছুই নেই। তখন কামিনী-কাঞ্চনের বদলে ছিল পুত্রৈষণা, আমার একটি সন্তান হোক। বিত্তৈষণা, সন্তান হলে টাকা-পয়সা লাগবে আর লোকৈষণা, মৃত্যুর পর আমি যেন স্বর্গে যেতে পারি। পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা আর লোকৈষণা এই তিনটেকে পূরণ করতে লাগবে টাকা, লাগবে একজন স্ত্রী, লাগবে কামভোগ আর তার সাথে লাগবে ধর্ম অর্থাৎ তীর্থ করা, যজ্ঞ করা, দান করা ইত্যাদি। সেইজন্য হিন্দুরা এই চারটে পুরুষার্থ দিয়ে দিলেন – ধর্ম, অর্থ, কাম আর মোক্ষ। লৌকিক জীবনের যত সুখ, জগতের যত সুখ এই সুখভোগ হয় অর্থ আর কাম দিয়ে। মৃত্যুর পরের যে সুখ সেই সুখ হয় ধর্ম দিয়ে। যজ্ঞাদি, তীর্থাদির দ্বারা পারলৌকিক সুখ হয়। তার মানে, যখন উপনিষদাদি রচিত হয়েছিল তখনকার দিনের মানুষরা এই দুটোর পেছনেই লেগে থাকত – এই জগতের সুখ আর পরলোকের সুখ। এটাকে এনারা বিভিন্ন ভাবে বলেছেন, যেমন বেদান্তসারে বলছেন *ইহামুত্রফলভোগবিরাগ*, *ইহ* মানে এই জগতে, *অমুত্র* মানে মৃত্যুর পর যে লোক। আচার্য বলছেন *দৃষ্ট অনুশ্রবিক*, এর মানে যেটাকে শ্রবণ করা হয়েছে। কিভাবে শ্রবণ করা হয়েছে? বেদ দিয়ে শ্রবণ করা হয়েছে। কারণ স্বর্গাদির কথা বেদেই পাওয়া যায়। বেদের এই স্বর্গাদির বিবরণের কথা শুনে শুনে মানুষ যখন বিশ্বাস করে সেটার দিকে এগোতে চায় তখন তাকে বলছেন *অনুশ্রবিক*। কিন্তু তার আগে বলছেন *দৃষ্ট*, অর্থাৎ যেটা মানুষ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ অনুভব করছে, এই জগতকেই মানুষ প্রত্যক্ষ অনুভব করছে। মানুষ শেষ পর্যন্ত এই দুটো সুখই চায়, হয় আমার এই জগতের সুখ চাই আর তা নাহলে মৃত্যুর পর স্বর্গের সুখ চাই। এই দুটো জায়গা ছাড়া তো সুখ আর কোন কিছু থেকে আসবেও না। এই দুটো সুখের কোন একটা সুখের বাসনা যদি থাকে তাহলে উপনিষদ তার জন্য নয়। তাই আচার্য, শুধু আচার্যই নন, আমাদের সব ঋষিরাই পরিষ্কার বলে দেবেন উপনিষদ তোমার জন্য নয়। স্বামীজীর বৈশিষ্ট্য হল, যদিও এখানে পরে অন্য ভাবে বলা হবে, স্বামীজী বলছেন তোমরা উপনিষদ পাঠ কর। উপনিষদের একটাই বাণী – অভিঃ, ভয় থেকে তুমি বেরিয়ে এস। স্বামীজী চাইতেন সবাই উপনিষদ পড়ুক, কারণ এই অভীঃ, নির্ভিকতার বাণীই উপনিষদ বারবার আমাদের শুনিয়ে যাচ্ছে। আচার্য শঙ্কর যেখানে আত্মা আর ব্রহ্মের ঐক্যের কথা বলছেন, সেখানে এর পরিণাম কিন্তু সব সময়ই নির্ভিকতায় গিয়েই দাঁড়াবে। আপনি যখন জেনে গেলেন এই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনিই হয়ে আছেন তখন আপনি কাকেই বা ভয় করবেন আর কেনই বা ভয় করতে যাবেন! সবটাই যদি আপনার হয় তাহলে আপনি কোনটাকে নিয়ে লোভ করবেন, কি নিয়ে মোহ করবেন! যার লোভ নেই, মোহ নেই তার আর ভয় কিসের! স্বামীজী একটু অন্য ভাবে, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে চাইতেন মানুষের মধ্যে যাতে কোন ভাবে শক্তির জাগরণ হয়। শক্তির জাগরণ হলে মানুষের ভেতরে আর কাপুরুষতা আসবে না। মানুষ যেন এই কাপুরুষতার আবরণ থেকে বেরিয়ে আসে। স্বামীজী মনে করতেন উপনিষদ পড়লে সবার মধ্যে যে শক্তি আসবে সেই শক্তি দিয়ে সে জগতকে জয় করতে পারবে।

কিন্তু আচার্য শঙ্কর উপনিষদের ভাষ্য লিখতে গিয়ে প্রথমেই বলছেন, ভাই! এর শেষ কথা হল, যদি তুমি এই সংসারে এখনও এতটুকুও কোন সুখের আশা কর বা মৃত্যুর পর স্বর্গের কোন সুখ পাওয়ার ইচ্ছে

থাকে তাহলে কিন্তু এই বিদ্যা তোমার কোন কাজে দেবে না। সত্যিই কি বিদ্যা তাহলে তাদের একেবারেই কাজে দেবে না? তা নয়, আচার্যও পরে বলবেন, কাজে দেবে, নিকৃষ্ট রূপে কাজে দেবে। নিকৃষ্ট বলছেন কেন? মার্ক টোয়েনের নামকরা একটা গল্প আছে, তাতে এক রাজকুমার আর ভিখারির ছেলে নিজেদের মধ্যে একবার জায়গা বদল করে ভিখারির ছেলে রাজকুমার হয়ে গেছে আর রাজকুমার ভিখারি হয়ে গেছে। পরে যখন রাজকুমার তার পদ ফেরত চাইছে তখন ভিখারির ছেলে আর রাজী হচ্ছে না। বুড়ো মন্ত্রী বুঝতে পেরে ভেতরে গিয়ে রাজদণ্ডটা বার করে এনে আসল রাজকুমারকে জিজ্ঞেস করেছে 'এটা কি'। রাজকুমার বলে দিয়েছে এটা রাজদণ্ড। নকল রাজকুমারকেও জিজ্ঞেস করেছে 'এটা কি'। গরীব ভিখারির ছেলে বলছে 'এটা দিয়ে আখরোট ভাঙা হয়'। সে জানেই না যে এটা রাজদণ্ড, রাজদণ্ড দিয়ে কি হয় তাও জানে না। অথচ আসল রাজকুমার ছোটবেলা থেকেই জানে এটা রাজদণ্ড। তখন সবাই বুঝে গেলে কে আসল রাজকুমার। আমাদেরও একই দুরবস্থা, হাতে সবার রাজদণ্ড কিন্তু তাই দিয়ে আমরা আখরোট ভেঙে যাচ্ছি। আচার্য এটাকেই আটকাতে চাইছেন, এরকমটি করো না। তুমি রাজকুমার, তোমার মধ্যে এই জগতের সম্রাট হওয়ার উত্তরাধিকারত্ব, তুমি রাজকুমারের ভূমিকাটাকে কাজে লাগাও, সাধারণ কাজে লাগিও না। কিন্তু আমরা আমাদের বর্তমান অবস্থাকে ছাড়ব না, দিব্যি খেয়ে রেখেছি। আমি রাজকুমার কিন্তু কাঙালী ভিখারী হয়ে অপরের কাছে হাত পাতছি আর রাজদণ্ড দিয়ে আখরোট ভেঙে যাচ্ছি। কিন্তু তুমি যদি তোমার আসল সত্তাকে কাজে লাগাতে চাও তাহলে তোমাকে ঠিক সেই রকমই আচরণ করতে হবে সত্যিকারের রাজকুমার যেমনটি আচরণ করেন, কাঙালী ভিখারীর মত এখানে তোমার প্রবেশ করার অধিকার নেই।

অন্য কাহিনীতে আছে, রাজমহলে এক বিরাট উৎসব চলছে। সেখানকার রাজকুমার কখন খেলা করতে করতে পেছনের গোপন রাস্থা দিয়ে রাজমহলের বাইরে চলে এসেছে, কেউ টেরও পায়নি। এরপর পথ হারিয়ে সে এদিকে সেদিক ঘোরাঘুরি করে অনেকদিন পর রাজমহলের কাছে এসে নিজের জায়গা চিনতে পেরে ভেতরে প্রবেশ করতেই দ্বারপালরা ওকে দ্বারের কাছে আটকে দিয়েছে। কারণ ততদিন তার রাজপোষাক সব জীর্ণ হয়ে গেছে, রাজপোষাকের বদলে তার গায়ে এখন সাধারণ পোষাক। দ্বারপালরা তাকে আটকে দিয়ে বলছে – এই পোশাকে এখানে প্রবেশ করা যাবে না। রাজকুমার অনেক কষ্টে আরেকটা ভালো পোষাক জোগার করে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, তখনও তাকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। অন্য ধরণের একটা পোষাক পড়ে এসেছে, এবারেও তাকে ঢুকতে দিচ্ছে না। তখন এক বুদ্ধিমান লোক তাকে বলে দিল – তুমি রাজার বেশ ধারণ করে এস, কারণ রাজার বেশ ধারণ না করা পর্যন্ত তুমি ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না। রাজার বেশ জোগার এমনিতে করা যাবে না, তাকে এখন প্রচুর খাটতে হচ্ছে। অনেকদিন খেটে খুটে একটা রাজার বেশ তৈরী করে সেটাকে পরিধাণ করে এবার যখন রাজমহলের প্রধান ফটকের কাছে হাজির হয়েছে তখন তাকে দেখা মাত্রই দ্বারপালরা চিনতে পেরেছে, সঙ্গে সঙ্গে রাজফটক তার জন্য খুলে দিয়ে সসম্মানে আপ্যায়ন করতে শুরু করে দিয়েছে। রাজমহলে ঢুকতে হলে রাজকুমারের সাজ ধারণ করতে হবে, রাজকুমার হলেও আপনাকে ঢুকতে দেবে না। রাজকুমারের সাজপোশাকই চাই। আপনি সেই পূর্ণব্রহ্ম হতে পারেন আপনি সেই শুদ্ধ আত্মা হতে পারেন কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে আপনাকে কখনই ঢুকতে দেওয়া হবে না, যতক্ষণ না আপনি পূর্ণব্রহ্ম বা শুদ্ধ আত্মার বেশ ধারণ না করছেন। পূর্ণ আত্মার বেশ কি? মনে কোন চাহিদা থাকবে না। জগতে সবাইকে বস্ত্র পরিধাণ করতে হয় কিন্তু এনারা সম্পূর্ণ বিবস্ত্র, তাঁর মন সম্পূর্ণ বস্ত্রহীন। মন বস্ত্রহীন মানে মনে কোন চাহিদা নেই, মনের উপর কোন উপাধির আবরণ নেই। ইহলোকের কোন সুখের চাহিদা নেই আর পরলোকের কোন সুখের চাহিদা নেই। এটাকেই ওনারা কেতাবী কাহিনীতে উপস্থাপনা করেন। কোন রকম চাহিদা আছে মানে, you are in wrong dress। কঠোপনিষদেই পরে এক মন্ত্রে বলবেন, আমার ব্রহ্মজ্ঞান হোক, আমার ঈশ্বর দর্শন হোক এই ইচ্ছাটুকুও যদি থাকে, এটাও একটা ইচ্ছার মধ্যে এসে গেল, তার মানে এখনও তোমাকে অনেক দিন বাইরে অপেক্ষা করে থাকতে হবে। মনকে সম্পূর্ণ রূপে চাহিদাশূন্য হতে হবে। ঠাকুর অবশ্য বলছেন ভক্তি কামনা কামনার মধ্যে নয়, যেমন মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়। ঐ মন্ত্রের যখন আলোচনায় আসবে তখন এই বিষয়কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। উপনিষদ আর ঠাকুরের কথা দুটো ভিন্ন অর্থে বলা হচ্ছে। মনে কোন ধরণের চাঞ্চল্যতা থাকবে না, মনের চাঞ্চল্যতা মানেই you are in wrong dress। You are in wrong dress মানে রাজমহলে প্রবেশাধিকার নেই। এটাকেই আচার্য বলছেন *দৃষ্টানুশ্রবিক*।

দৃশ্য জগৎ আর যে জগতের কথা আমরা জানি না, কিন্তু শাস্ত্র থেকে, বেদ উপনিষদ থেকে শুনছি, মানে স্বর্গ, এটাই *অনুশ্রবিকা*, রামকৃষ্ণলোকেও যাবার ইচ্ছা থাকবে না। প্রথম শর্ত হল *মুমুক্ষবো*, মুমুক্ষু হতে হবে। একজন বলছে, আমি স্বর্গেও যেতে চাই না আর এই জগতের সুখও চাই না, মুক্তিতে আমি বিশ্বাস করি না। তার কি হবে? কদিন পর আত্মহত্যা করবে। আত্মহত্যা যারা করে, তাদের না আছে পরলোকে বিশ্বাস, না আছে ইহলোকে বিশ্বাস আর মুমুক্ষুও নয়। মুমুক্ষু হলে জিনিষটা অন্য রকম হয়ে যাবে। যে মুমুক্ষু বলছে ইহলোকে আমার কিছু লাগবে না, পরলোকেও আমি কিছু চাই না, সে এবার উপনিষদ জানার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। প্রথম শর্ত যে *মুমুক্ষবো*, তুমি কি মুক্তিকাঙ্খী? মুক্তিকাঙ্খী যদি হও আর এই ভাব যদি তোমার থাকে তাহলে এবার তুমি প্রস্তুত। একজন বলছে আমি রামকৃষ্ণলোকে যেতে চাই। সে কোথা থেকে রামকৃষ্ণলোকের কথা জানল? সে দীক্ষা নিয়েছে, অনেক ভক্তসঙ্গ করেছে, আজ তাই এই বিশ্বাস এসেছে। কিন্তু যে রামকৃষ্ণলোক মানে না, স্বর্গলোকেও বিশ্বাস নেই, এবার তার কাছে থেকে গেল ইহলোক। এই ইহলোকও যদি না থাকে তাহলে সে কোথায় যাবে? গলায় দড়ি দেবে। মুমুক্ষু ছাড়া এই ভাব যদি কারুর এসে যায় তাহলে তাকে মানসিক ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

আমি স্বর্গসুখও চাই না আর ইহলোকের সুখও চাই না তার সাথে মুক্তির আকাঙ্খা এসেছে, এবার আচার্য বলছেন, এরপর উপনিষদ শব্দের যা বাচ্য, যা পরে ব্যাখ্যা করা হবে, আর বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত বিদ্যা, যা এই পুরো উপনিষদ জুড়ে চলতে থাকবে সেটাকে সে এবার ধারণা করার উপযুক্ত বিবেচিত হবে। উপনিষদ মানে বিদ্যা, এই বিদ্যাই ব্রহ্মবিদ্যা, যে বিদ্যাকে নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা হল, যে বিদ্যা ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য। যখন এই ব্রহ্মবিদ্যাকে পেয়ে গেল। কি করে পেয়ে গেল? এই বিদ্যার কাছে গিয়ে, সেইজন্য প্রথমেই বললেন উপ। উপ মানে কাছে যাওয়া, গুরুর কাছে, শাস্ত্রের কাছে, এই কাছে যাওয়া নয়, বিদ্যার কাছে যেতে হবে, বিদ্যার কাছে না গেলে কিন্তু কিছুই হবে না। দীক্ষা নিয়ে মন্ত্র যাতে ভুলে না যাই সেইজন্য কোন রকমে দিনে দুবার একশ আট বার জপ করে যাচ্ছি, এভাবে কোন দিন হবে না। বিদ্যার কাছে যেতে হবে। বিদ্যার কাছে যাওয়ার পর কি করতে হবে? আচার্য তখন বলছেন *তন্নিষ্ঠতয়া নিশ্চয়েন*, নিষ্ঠাপূর্বক আর নিশ্চিত হয়ে। পঁচিশ বছর, তিরিশ বছর জপ ধ্যান করার পরেও যদি আপনাকে চিন্তা করতে হয় আমাকে সকাল-বিকাল এক ঘন্টা করে জপ করতে হবে, তাহলে তো আপনার জীবনটা বৃথা হয়ে গেল। পঁচিশ বছর তিরিশ বছর আপনার সাধনা করা হয়ে গেছে, এখন আপনার হবে *তন্নিষ্ঠতয়া নিশ্চয়েন*, তার মানে এখন আপনার একশ ভাগ শুধু এটাই থাকবে, অন্য কিছু নেই। যা আছে নিশ্চিত ভাবে শুধু এটাই আছে। তখন কি হবে? *তেষামবিদ্যাদেঃ সংসারবীজস্য বিশরণাদ্ধিংসনাদ্*। এই বিদ্যা বিশরণ মানে নাশ করে। কিসের নাশ করে? আচার্য এখানে দুটো জিনিষের নাশের কথা বলছেন, একটা হল সংসার আরেকটা সংসারের বীজ অর্থাৎ অবিদ্যা।

ইহলোক আর পরলোক এই দুটো লোকের সুখের প্রতি আসক্তি চলে গেছে, কিন্তু তার সাথে মুমুক্ষু হতে হবে, তা নাহলে পাগল হয়ে যাবে। আর যখন ঐ বিদ্যার কাছে নিশ্চিতপূর্বক, নিষ্ঠাপূর্বক যাচ্ছে এবং শুধু উপনিষদ পাঠ করে যাচ্ছে না, তার সাথে বিদ্যার অনুশীলন করে যাচ্ছে, তখন এই বিদ্যা সংসারের যে অবিদ্যা রূপী বীজ এই অবিদ্যাকে নাশ করে দেয়। কে নাশ করতে পারে? তাকেই নাশ করতে পারে যাকে সে জন্ম দিয়েছে, যাকে জন্ম দেয়নি তার নাশ সে করতে পারে না। যেমন বলা হয় জল থেকে অগ্নির জন্ম, আবার বলা হয় অগ্নি থেকে জলের জন্ম। অগ্নি নির্বাপিত হয় জলের দ্বারাই। অবিদ্যার জন্ম বিদ্যা থেকে, অবিদ্যার নাশ তাই বিদ্যাই করতে পারে। এই ব্রহ্মবিদ্যা অবিদ্যাকে নাশ করে। যে কোন অজ্ঞানতাকে নাশ করার জন্য জ্ঞান দরকার। কিন্তু যে অজ্ঞান সংসারের মূলে রয়েছে, যে অজ্ঞানতার জন্য এই সংসার আরামসে দাঁড়িয়ে আছে, সেই অজ্ঞানকে নাশ করার জন্য যে অস্ত্র দরকার সেই অস্ত্রকেও তত শক্তিশালী হতে হবে, এই অস্ত্রই হল ব্রহ্মবিদ্যা। অবিদ্যার বীজকে নাশ করে একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যা। অবিদ্যা বীজ কেন বলছেন?

সমাধির গভীরে তাঁরা দেখেন ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই, তাহলে এই জগৎ কোথা থেকে এল? কিংবা যদি বলে এই জগৎ আছে না হয় মানলাম, কিন্তু জগতের সৃষ্টির তো কোন কারণ থাকতে হবে। ওনারা খুব সংক্ষেপে বলেন এটাই অবিদ্যা। অবিদ্যা মানে অজ্ঞান। আমরা সবাই আনন্দস্বরূপ, কিন্তু আমাদের উপর একটা অজ্ঞানের আবরণ এসে গেছে। অজ্ঞান আবরণের জন্য আমাদের জীবন দুঃখময়, শুধু

কষ্ট আর কষ্টই। এই অজ্ঞান কোথা থেকে এসেছে? কোথা থেকেও আসেনি, আমার মন থেকেই এসেছে। নিজের মনের ভেতরেই নানা রকম কল্পনার জাল বুনে চলেছি। একজন সারা মাস কাজ করে পঞ্চাশ হাজার টাকা রোজগার করছে, কিন্তু তাও তার দুঃখ-কষ্টের অবসান হয় না। আরও বেশি টাকা চাই বলে তার কোন কষ্ট নেই, তার কষ্ট ওর থেকে কম প্রতিভাবান হয়ে অন্যরা ওর থেকে বেশি টাকা কি করে উপার্জন করছে! নিজের কোন দরকার নেই, অপরে কেন বেশি পাবে। প্রথমে আমার আরও চাই, আরও চাইএর পর আসে আমার থেকে নিকৃষ্ট হয়ে অপরের আয় কেন বেশি হবে। তৃতীয়, নিকৃষ্টই হোক আর শ্রেষ্ঠই হোক আমার থেকে কেন বেশি পাবে! এটাই সংসার। আপনি আনন্দস্বরূপ কিন্তু দুঃখের কারণগুলি আপনি নিজেই জুটিয়ে নিচ্ছেন, এটাই অজ্ঞান, এটাই অবিদ্যা। ব্যক্তিস্তরে এই অজ্ঞানকে বলা হয় অবিদ্যা আর এটাই যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্তরে থাকে তখন তাকে বলছেন মায়া। অজ্ঞান, অবিদ্যা, মায়া এদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলছে, সংসার চলছে, সংসার মানে জগতরূপী সংসার নয়, আমাদের মনের সংসার, যেখানে সুখ-দুঃখ আছে, শোক-মোহ আছে, হাসি-কান্না আছে, কত হাজার রকমের ইমোশানের খেলা, কোথা থেকে চলছে? এই অবিদ্যা থেকেই চলছে। গরু-মোষ এরা কখন কাঁদে না, হাসেও না, এদের তুলনায় কুকুর আরও একটি অনুভূতি প্রবণ। কিন্তু মানুষ কাঁদে হাসে, যে মানুষ যত অনুভূতিসম্পন্ন সেই মানুষ তত হাসে তত কাঁদে। শোক আর দুঃখের ব্যাপারে শাস্ত্র বারবার বলছে, দুঃখ সবারই হতে পারে। যাকে ভালোবাসে সে মারা গেল, সেখানে দুঃখতো হবেই। অনেকে আবার বলে আমার মৃত্যুর জন্য কোন চিন্তা নেই, কিন্তু যারা আমার সাথে আছে তারা যদি মারা যায় সেই নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত। আবার অনেকে ভাবে আমি মরে গেলে এদের কে দেখবে। এটাই সংসার। দুঃখ সবারই হবে এবং সবারই জীবনে দুঃখ আসবে, কিন্তু সেই দুঃখ থেকে যদি শোক এসে যায় তাহলেই অবসাদ আসবে, অবসাদ মানেই অজ্ঞানের আবরণটা আরও মোটা হয়ে গেল।

মোহের ব্যাপারেও একই জিনিষ। সবারই কিছু না কিছু চাহিদা থাকবে, জীবন চালাতে গেলে অনেক কিছুই প্রয়োজন, টাকা-পয়সার দরকার, ঘরবাড়ি দরকার। কিন্তু কোন কিছু প্রতি মোহ থাকা মানেই বিপদ। ঠাকুরও বলছেন, আমারও স্ত্রী আছে, ঘটিবাটি আছে, আমারও টাকার চিন্তা হয়। ঠাকুরেরও প্রয়োজন অনুভব হচ্ছে কিন্তু মোহটা নেই। দুঃখ ঠাকুরেরও হচ্ছে কিন্তু শোক নেই। শোক আর মোহই সংসার। সংসারের কারণ অবিদ্যা। যাঁরা প্রখর সংবেদনশীল তাঁরা একটুতেই প্রচণ্ড আঘাত পান। গুডউইন মারা যাওয়ার পর স্বামীজীকে প্রচণ্ড কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। গুডউইনকে নিয়ে কবিতা লিখছেন, চিঠিতে ওঁর কথা বলে খুব দুঃখ প্রকাশ করছেন। গভীর বেদনা অনুভব করছেন ঠিকই, কিন্তু এটা দুঃখ, শোক নয়। শোক হল – আমি হলাম অভাগা, আমার মত অভাগা আর কে আছে, আমার সব শেষ, হে ঠাকুর! আমার কি হবে! মোহ হল, আমার নেই ওর কেন হবে, আমার থেকে ওর আয় বেশী, আমার গাড়ী নেই, ওর গাড়ী আছে, গাড়ীটার এ্যাকসিডেন্ট হলে ভালো হয়, এগুলোই মোহ। যাঁদের মধ্যে একটু আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ হয়েছে, যাঁদের মন খুব অনুভূতি সম্পন্ন তাঁরাও প্রচণ্ড দুঃখ পান, কিন্তু এটাই আশ্চর্যের যে তাঁরা কখনই শোক আর মোহগ্রস্ত হন না। যাঁদের মধ্য সৃজনী প্রতিভা থাকে তাঁরা যদি দুঃখ বেদনা পান তাঁরা ঐ দুঃখ বেদনাকে সৃজন শক্তিতে রূপান্তরিত করে দেন, কিন্তু শোক মোহ নিয়ে কখনই পড়ে থাকেন না। সৃজনশীলদের দুঃখ বোধ থাকে, কারণ তাঁদের মন খুব সংবেদনশীল, কিন্তু শোক মোহ থাকে না। শোক মোহ তাদেরই থাকে যারা সংসারী। পশুপাখিদের মধ্যে এখনও সেই সংবেদনশীলতা আসেনি। কিন্তু তাদেরও দুঃখ যন্ত্রণা অনুভব হয়, পাখির বাসা থেকে ডিম পড়ে গেলে তাদের মস্তিষ্কের এমন প্রক্রিয়া আছে যে তাতে তারও মনে কষ্ট হয়, ছটফট করতে থাকে।

এই দুঃখ, কষ্ট, মোহ, তারজন্য শোক আর তার থেকে ছটফটানি, এগুলো কিসের জন্য হয়? অবিদ্যা হেতু। কিসের অবিদ্যা? আমরা নিজেদের স্বরূপ জানি না। সাধারণ মানুষ সত্যিই সে তার নিজের স্বরূপ জানে না, তারা কিন্তু ধর্মটা ভালো জানে। একজন স্ত্রী, তাঁর স্বামী মারা গেছে, তার একটি সন্তান, সে এবার কি করবে? প্রথম কিছু দিন সে কাঁদবে কিন্তু এক দিন দুদিন পরেই সন্তানের জন্য তাকে রান্না ঘরে যেতে হবে। এটাই ধর্ম, ধর্ম মানে sense of responsbility। এই কর্তব্য বোধ যখন সাধারণ মানুষের মধ্যে এসে যায় তখন কর্তব্য বোধই তাকে শোক-মোহের মাঝখান দিয়ে চিড়ে নিয়ে চলে যায়। যাঁরা উচ্চস্তরের, শোক মোহ তাঁদের ধারে কাছেই আসতে পারে না, বাতাসে উড়ে যায়। বাকিরা শোক মোহের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে।

ধর্মের মধ্যে যারা পড়ে আছে তাদের আবার অন্য ধরণের সমস্যা, ভালো কর্মে পূণ্য ফল, খারাপ কর্মে পাপের ফল ভোগ এসবে তাদের দুশ্চিন্তা লেগেই থাকে, আর পাপ-পূণ্যের বিচার করতেই তাদের জীবনটা অতিবাহিত হয়ে যায়। এই জন্মে একটা ধর্মবোধ নিয়ে চলছে, পরের জন্মে হয়ত এমন জায়গায় জন্ম হল যেখানে তার আর ধর্মবোধটুকুও থাকল না। জন্ম-মৃত্যু চক্রে এরাও ধর্ম আর অধর্মের মধ্যে ঘুরপাক করতে থাকে। ধর্মাধর্মের এই চক্র মানুষের যেন থামতে চায় না। এর মূলেও সেই অবিদ্যা, নিজের স্বরূপকে না জানা।

আচার্য বলছেন, এই শোক-মোহের বীজ, সংসারের এই বীজ বাইরে কোথাও নেই, আমাদের মনের মধ্যেই গিজগিজ্ করছে। বিভিন্ন কাজকর্মে যাওয়ার জন্য সকাল থেকেই ঠাণ্ডার মধ্যে প্রস্তুতি নিতে হয়, স্নান করতে হচ্ছে, তাড়াহুড়ো করে খেতে হচ্ছে। তারপর দু-তিন ঘন্টা বাসে ট্রেনে করে কর্মস্থলে যেতে হচ্ছে। আবার ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরছে, পরের দিন একই রুটিনে সব কিছু চলতে থাকে। সবাই কিসের জন্য ছুটছে? জীবনে কেউই অশান্তি চায় না, সবাই সুখ চাইছে আর এই সুখের পেছনেই মানুষ দিবারাত্র ছুটে চলেছে। তাও মানুষের দুঃখ-কষ্টের শেষ নেই। প্রত্যেকটি দুঃখ আমরা নিজেরাই আহ্বাণ করে আনছি। কেউ কাউকে দুঃখ দিচ্ছে না। কেন এই দুঃখ? আমাদের মনের মধ্যে অবিদ্যার বীজ স্তুপাকার হয়ে আছে। এই বীজরাশিকে যতক্ষণ না পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে ততক্ষণ আগাছার জন্ম দিতেই থাকবে। অবিদ্যা বীজসমূহের নাশ করে একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যা। যোগশাস্ত্রেও বলছে দগ্ধবীজবৎ। যোগের পদ্ধতি ও উপনিষদের পদ্ধতি আলাদা হলেও শেষে একই ফল, অবিদ্যার মূলে যেটা রয়েছে, যেটা দিয়ে সংসার চলছে, যেটা দিয়ে শোক-মোহ চলছে, সেটাকে ব্রহ্মবিদ্যা পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছে। এটাই হল বিশরণ, অবশ্য যদি উপ অর্থাৎ যদি বিদ্যার কাছে যায় আর নিশ্চিত পূর্বক নিষ্ঠা নিয়ে অনুশীলন করে। উপনিষদের ব্যাখ্যা যখন শুনি তখন আমাদেরও কিছুক্ষণের জন্য মন একটা উচ্চ অবস্থায় চলে যায়, আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসার একটু পরেই আবার সংসারের কচুরিপানা এসে সব ঢেকে দেবে। এখানে তাই বলছেন, যখন নিশ্চিত পূর্বক অনুশীলন করবে। আমাদের সব কিছুই পার্টটাইম, এটাও করছি আবার ওটাও করছি। আমাদেরও কিছু করার নেই, সব দিকেই আমাদের মন দিতে হয়। কিন্তু আচার্য শঙ্কর এই ব্যাপারে কোন আপোষ করছেন না, যদি নিশ্চিত পূর্বক কর একমাত্র তাহলেই হবে, তার আগে কিছুই হবে না।

এখন কেউ আচার্যকে প্রশ্ন করতে পারে, আপনি এই থিয়োরীটা কোথায় পেলেন? আচার্যও জানেন কারুর কারুর মনে এই প্রশ্ন আসবে। তখন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কঠোপনিষদের মন্ত্রকেই উদ্ধৃতি দিয়ে আচার্য বলছেন *'নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে'*, এই ব্রহ্মবিদ্যাকে জেনে গেলে মানুষ মৃত্যুর মুখ থেকে অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। আচার্যের রচনার শৈলীটাই পুরো অন্য ধরণের, যেখানেই ওনার কিছু বিতর্কমূলক মনে হবে, বিবাদ হতে পারে, আচার্য সেখানে একটা ছোট্ট উদ্ধৃতি দিয়ে *ইতি শ্রুতেব*, শ্রুতিতে অর্থাৎ বেদে এ রকম কথা বলা আছে বলে বেরিয়ে যাবেন। আমি যা বলছি এসব আমার কোন নিজস্ব চিন্তাপ্রসুত বা কাল্পনিক কিছু নয়। বক্তারাও ভাষণের দেওয়ার সময় বলেন, ঠাকুর এই রকম বলেছেন বা গীতায় এই রকম বলা আছে। বক্তা যদি নিজের কথা বলেন শ্রোতারা বিশ্বাস নাও করতে পারেন। স্বামীজীকেও তাঁর গুরুভাইরা বলছেন 'নরেন ভাই! তুমি তো এটা নিজের মত বানিয়ে বলছ'। শ্রীমার কাছে ভক্তরা গিয়ে বলছেন স্বামীজী এসব কী বলছেন! শ্রীমা স্বামীজীর কথার উপর অনুমোদন করে দিচ্ছেন, তখন এটাই শ্রুতি বাক্য হয়ে যাচ্ছে, ঐ কথা মান্যতা পেয়ে গেল।

দ্বিতীয় গতির ব্যাপারে বলছেন *পূর্বোক্তবিশেষণান্মুমুক্ষূন্ বা পরং ব্রহ্ম গময়তি ইতি*, মুমুক্ষুরা যখন এই বিদ্যার অনুশীলন করেন তখন এই বিদ্যা তাঁকে পরব্রহ্মের কাছে বা পরমাত্মতত্ত্বের কাছে পোঁছে দেয়। বিশরণ আর গতির মধ্যে একটা সামান্য পার্থক্য আছে। বিশরণ অবিদ্যাকে নাশ করে দিল। সংসার বা অবিদ্যার নাশ করে দেওয়া হলে কি থাকবে? বৌদ্ধরা বলছেন শূন্য, কিছুই থাকবে না। এনারা উপমা নেন, প্রদীপ জ্বলছে, সেই প্রদীপের শিখা থেকে আরেকটা প্রদীপ জ্বলছে, তার থেকে আরেকটা প্রদীপ। প্রদীপ নিভে গেল আর কিছুই থাকছে না। উপমা দিয়ে এই জিনিষটাকে কখনই বোঝান যায় না, একটা উপমা দিলে আরেকটা উপমা নিয়ে আসবে। ঋষিরা নিজের উপলব্ধি থেকে এই কথা বলছেন। শুধু বিশরণকে রাখলে জন্ম-মৃত্যুর চক্রটা শেষে হয়ে গেল, এরপর আর কিছুই থাকছে না। তা কখন হবে না, তাই দ্বিতীয় নিয়ে আসছেন গতি, পরব্রহ্ম সেই আনন্দস্বরূপের সাথে এক করে দিচ্ছেন। ঐ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে যেখানে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করছে।

ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার যখন হচ্ছে তখন সে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, মনের সব অবিদ্যার নাশ হয়ে যাচ্ছে। এই বিদ্যা, যে বিদ্যা মানুষকে পরব্রহ্মের কাছে নিয়ে যায়, এটা এর আরেকটা অর্থ। আচার্য শ্রুতি বাক্য নিয়ে আসছেন *'ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্‌বিমৃত্যুঃ'*, ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করে মানুষ বিরজঃ হয়ে যায়। রজ মানে ধুলোবালি, অশুদ্ধি, বিরজ মানে অশুদ্ধি শূন্য, মানুষ অশুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়ে যায় আর অমর হয়ে যায়। এখানে বলছেন, *ব্রহ্মপ্রাপ্তো*, এই শ্রুতিবাক্যও কঠোপনিষদ থেকে নিচ্ছেন। আমরা যখনই প্রাপ্তি শব্দ নিয়ে আসি তখন মনে হবে আমি একজন সে আরেকজন, দুজন দু জায়গায় ছিল, আর এখান থেকে ওখানে গিয়ে প্রাপ্তি হল। ব্রহ্মপ্রাপ্তি এই অর্থে হয় না। কিন্তু জাগতিক দৃষ্টিতে যদি দেখা হয়, তাহলে মনে হবে আমি একটা অবস্থায় ছিলাম, সেই অবস্থা থেকে যেন অন্য একটা অবস্থায় গেছি। এখানে কোথাও যায় না, কিছুই আসে না, একটা আপেক্ষিকতার দৃষ্টিকোণ দিয়ে জিনিষটাকে বোঝানোর জন্য বলা হল ব্রহ্মপ্রাপ্তো বা ঈশ্বর লাভ করেন। এখানে লাভ করার তো কিছু নেই, ঈশ্বর তো কোন বস্তু নন যে তাঁকে কোথাও রাখা আছে আপনি গিয়ে তাঁকে প্রাপ্ত বা লাভ করলেন। তিনি তো সর্বব্যাপী, তাই তাঁকে লাভ করা বা প্রাপ্ত করা বলা যায় না। কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে বলার সময় এভাবেই বলা হয়, যেমন এখান বলছেন গতি। কি রকম গতি? আমাদের এখন আত্মকেন্দ্রিক জীবন, আত্মকেন্দ্রিক জীবন থেকে সরে গিয়ে আত্মাকেন্দ্রিক জীবন হয়ে যায়। আধ্যাত্মিক জীবন আর জাগতিক জীবনের মাঝখানে শুধু একটা 'আ'কারের ব্যবধান। আত্মকেন্দ্রিক জীবন থেকে আত্মাকেন্দ্রিক জীবনে উত্তরণ। আত্মকেন্দ্রিক জীবন মানে আমাদের এই শরীর, মন, অহঙ্কারকে জড়িয়ে যা কিছু করছি। সেখান থেকে সরে গিয়ে আত্মাকেন্দ্রিক হয়ে যাওয়াটাই আধ্যাত্মিক জীবন। অবিদ্যার 'অ' যখন খসে গেল তখন বিদ্যার সংসার হয়ে গেল। বিদ্যার সংসার মানে যেখানে কেন্দ্র আত্মা হয়ে গেলেন, যিনি সর্বব্যাপী আত্মা তাঁকে কেন্দ্র করে যখন সব কিছু চলে সেটাই তখন বিদ্যার সংসার। অবিদ্যা থেকে বিদ্যাতে উত্তরণ এটাকেই বলছেন গতি।

তৃতীয় বলছেন *অবসাদন্*। অবসাদন অর্থের আচার্যের ব্যাখ্যাকে আমাদের পক্ষে একটু জটিল মনে হতে পারে। এখানে আচার্য বিশেষ ভাবে নাচিকেতস্ অগ্নির কথা নিয়ে আসছেন, কঠোপনিষদে পরে যার বর্ণনা আসবে। নচিকেতাকে যমরাজ তিনটে বর দিতে চাইলেন। প্রথম বরে নচিকেতা চাইলেন, বাবার রাগ যেন শান্ত হয়ে যায়। তৃতীয় বরে তিনি ব্রহ্মবিদ্যা জানতে চাইলেন। কিন্তু তার আগে দ্বিতীয় বরে নচিকেতা এক বিশেষ যজ্ঞের ব্যাপারে জানতে চাইলেন, যে যজ্ঞ করলে মানুষ স্বর্গে অমর হয়ে অনেক দিন থাকতে পারে, সেই বিদ্যাটা জানতে চাইলেন। যমরাজ তাঁকে সেই যজ্ঞের বিদ্যাটা বলে দিলেন। এই যজ্ঞের প্রথা এখনও আছে, যার নাম নচিকেতা অগ্নি। আচার্য এখানে খুব সুন্দর ভাবে বলছেন *লোকাদির্ব্রহ্মযজ্ঞঃ যোঽগ্নিঃ তদ্‌বিষয়ায়া বিদ্যায়া*, দ্বিতীয় বরে নচিকেতা যে বিদ্যাটা চেয়েছিলেন এই বিদ্যা ব্রহ্মা থেকে উৎপন্ন আর ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিনটে লোকের যে কথা বেদে পাই, সেটা থেকে এটা স্বতঃসিদ্ধ হয়ে যায়। আচার্য এখানে খুব সুন্দর যুক্তি দিচ্ছেন, বেদে ভূলোক, স্বঃ মানে স্বর্গলোক আর ভূঃ আর স্বঃ এই দুটোর মাঝখানে ভুবলোক আছে, এই তিনটে লোকের কথা যখন আনা হয়েছে তাহলে পুনর্জন্ম হচ্ছে। পুনর্জন্ম যখন হচ্ছে, মৃত্যুর পর একটা দেহ থেকে আরেকটা দেহে যাচ্ছে আর এই লোক থেকে সেই লোকে যাতায়াত হচ্ছে তখন কিছু তো একটা শক্তি থাকতে হবে যেটা তাকে এই লোক থেকে সেই লোকে নিয়ে যাবে। সেই শক্তিটা কি? সেই শক্তির ব্যাপারে আপনি এক রকম বলতে পারেন আমি এক রকম বলতে পারি। আমরা যেমন রামকৃষ্ণলোকের কথা বলছি, ঠাকুরের উৎসবাদিতে খিচুড়ী খেলেই কি রামকৃষ্ণলোকে চলে যাবে? না যাওয়া যাবে না। তাহলে এটা কে বলেছে? এই কথা ভক্তরা বলেছে। কিন্তু তাতে তো হবে না। এখানে বলছেন যে, এই কথা ব্রহ্মা বলছেন, যে বাক্য ব্রহ্মা থেকে যমরাজ হয়ে নচিকেতার কাছে আসছে। কি কথা আসছে? স্বর্গে যাওয়ার জন্য যে যজ্ঞ করতে হয় সেই যজ্ঞ করলে স্বর্গে যেতে পারবে। এই উপনিষদে সেই যজ্ঞের কথা আছে। যদি আপনি এই যজ্ঞ করে স্বর্গে চলে যান তাহলে কি হবে? এই যে তোমার বারবার জন্ম মৃত্যু হচ্ছে এটাকে কিছুটা শিথিল করবে। কি শিথিল করবে? পাঁচ হাজার বছর আপনি স্বর্গে গিয়ে থাকতে পারবেন। পাঁচ হাজার বছরের জন্য বারবার জন্ম মৃত্যু হওয়াটা জন্য বন্ধ থাকবে। এটাকেই বলছেন অবসাদন। এখানে সেই বিদ্যার কথা বলা হচ্ছে যে বিদ্যাটা জানা থাকলে মানুষ স্বর্গলোকে যেতে পারে, জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বার বার ঘোরাটা কিছু দিনের জন্য বন্ধ থাকে।

এখানে একটা ব্যাপার আছে। সব উপনিষদে যজ্ঞের কথা বলা নেই, কিন্তু অবসাদনের এই নিয়ম সব উপনিষদেই প্রযোজ্য। ঈশোপনিষদে বলছেন, *ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ*, যাঁরা শুধু বিদ্যার

উপাসনা করেন, অর্থাৎ উপনিষদকে যাঁরা শুধু তত্ত্বতঃ জানেন তাঁরা আরও অন্ধকার লোকে গমন করেন। এই ভাব আমাদের পরম্পরাতে অনেক জায়গাতেই পাওয়া যাবে, আমি উপনিষদ অধ্যয়ন করলাম, চিন্তন করলাম কিন্তু আমার কোন উপলব্ধি হল না, তখন আমার কি হবে? এবারে আমরা এখানে আচার্য যে নচিকেতঃ অগ্নির কথা বললেন সেটাকে সরিয়ে রাখছি, কারণ সব উপনিষদে যজ্ঞের কথা থাকে না, কিন্তু কঠোপনিষদে যজ্ঞের কথা এসেছে। অথচ মুণ্ডকোপনিষদে যজ্ঞের কথা নেই, ঈশোপনিষদেও নেই, তাও সেখানে অবসাদনের নিয়ম প্রযোজ্য হবে। অন্য দিকে ব্যাপারটাকে এভাবেও দেখা যেতে পারে, স্বাধ্যায়কেও অনেক জায়গায় যজ্ঞ রূপে দেখা হয়, উপনিষদ নিয়মিত পাঠ করা হচ্ছে, চিন্তন করা হচ্ছে, এতেও আমাদের জীবনধারায় অনেক সদার্থক পরিবর্তন আসে। জীবনধারা উন্নত হলে পুনর্জন্ম থেকে পুরোপুরি মুক্তি না হলেও কিছুটা শিথিল হয়। তার মানে উপনিষদ দুই ভাবে অধ্যয়ন করা হচ্ছে, একটা নি পূর্বক মানে নিশ্চিত ভাবে, এটাই তাঁকে মুক্তির দিকে নিয়ে চলে যাবে, দ্বিতীয় নিশ্চিত পূর্বক না হয়েই পাঠ করা হচ্ছে, অর্থাৎ পুরোদমে উপনিষদেই লেগে থাকছে না বা উপনিষদের কোথাও কোথাও যে যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে সেই যজ্ঞগুলো করে যাচ্ছে বা উপনিষদ শুরু করার আগেই যে যজ্ঞগুলোর কথা বলা আছে সেই যজ্ঞ করছে, এগুলো করলে তাকে মুক্তি দেবে না ঠিকই কিন্তু জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘোরাটা একটু শিথিল করে কিছু দিনের জন্য শান্তি দেবে। এইভাবে করতে করতে তাঁদের মধ্যেও উপনিষদের বিদ্যার কাছে যাওয়ার সংস্কার তৈরী হয়। যাঁরা উপনিষদ অধ্যয়ন করবেন তাঁদের এই তিনটে জিনিষ হবে, প্রথম অবিদ্যার নাশ, দ্বিতীয় বস্তু লাভ আর তৃতীয় যদি জ্ঞান লাভ নাও করতে পারে তাতেও তাঁর একটা অভ্যুদয় হবে।

বিদ্যা আর গ্রন্থের মধ্যে কি তফাৎ এই নিয়ে আমরা এর আগে আলোচনা করেছি। সংবাদপত্র যেমন শুধু মাত্র কতকগুলি তথ্য দিয়েই খালাস, কিন্তু বেদ বা উপনিষদের ক্ষেত্রে এসে জিনিষটা পুরো অন্য রকম হয়ে যায়। একজন শিষ্য আচার্যকে প্রশ্ন করতে পারেন যে, আমরা যে উপনিষদ অধ্যয়ন করতে যাচ্ছি উপনিষদ বলতে কি উপনিষদ গ্রন্থকেই বোঝায়? আচার্য তখন বলছেন উপনিষদ মানে কোন গ্রন্থ নয়। উপনিষদ মানে বিদ্যা, তার কারণ উপনিষদ গ্রন্থ কখনই অবিদ্যার নাশ করতে পারবে না, উপনিষদ গ্রন্থ কখনই কাউকে স্বর্গে নিয়ে যেতে পারবে না। উপনিষদ গ্রন্থের মধ্যে যে বিদ্যা আছে ঐ বিদ্যাই অবিদ্যার নাশ করতে পারবে বা স্বর্গে নিয়ে যেতে পারবে। এই জিনিষটাকে আমাদের খুব ভালো করে বুঝতে হবে। আমাদের যত গ্রন্থ আছে তার প্রত্যেকটির নাম আলাদা, আর ঐ গ্রন্থ কি কাজ করে সেটা গ্রন্থের নামেই বলা আছে। যেমন বেদ মানে বিদ্যা বা জ্ঞান, সমগ্র জ্ঞানসমূহকে বলা হয় বেদ। কিন্তু আমি যখন বলছি আমি বেদ অধ্যয়ন করছি, তখন ওর কোন দাম নেই, আমি শুধু গ্রন্থই পড়ছি। গ্রন্থের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত বিদ্যা আছে সেটাই বেদ। ঠিক তেমনি উপনিষদ গ্রন্থের নামের অর্থ বলে দিচ্ছেন উপ পূর্বক নি পূর্বক সদ্ ধাতু। উপ মানে কাছে নিয়ে যাওয়া। কিভাবে কাছে নিয়ে যায়? নিষ্ঠাপূর্বক আর সদ্ মানে বিশরণ গতি অবসাদন্। যে বিদ্যা অধ্যয়ন করলে এই তিনটের (বিশরণ্ গতি অবসাদন্) মধ্যে কোন একটা হয়। আসলে তিনটে একই জিনিষ, কিন্তু বোঝার জন্য তিনটেকে আলাদা নেওয়া হল। এই তিনটের মধ্যে একটাও যদি না হয় তাহলে কিন্তু আপনি উপনিষদ অধ্যয়ন করেননি। অনেক আগে বেলুড় মঠে পণ্ডিত রেখে উপনিষদ অধ্যয়ন করান হত। একদিন পণ্ডিত অধ্যয়ন করিয়ে চলে যাচ্ছেন, সেই সময় ওখানে ঠাকুরের পার্ষদদের মধ্যে একজন ছিলেন, তিনি পুরো পাঠ শোনার পর বলছেন – এই কথা শোনার পর যদি মুক্তি না হয় তাহলে এগুলো শোনা বৃথা।

উপনিষদের দুটো জিনিষ, একটা হল উপনিষদ গ্রন্থ, যেখান থেকে আমরা অধ্যয়ন করছি, মুখস্ত করছি। কিন্তু সত্যিকারের উপনিষদ বলতে বোঝায় উপনিষদ বিদ্যা। উপনিষদ মানে বিদ্যা, বেদ মানে যেমন সমগ্র জ্ঞানরাশি। সেই রকম পুরাণ মানে, পুরনো কাহিনী হয়েও যে কাহিনী আজও নতুন, আজকের দিনেও যা প্রাসঙ্গিক। ঠিক তেমনি ইতিহাসেরও একটা অর্থ আছে, আগেকার দিনে মহাপুরুষদের নিয়ে যে কাহিনী হয়ে গেছে, সেই কাহিনীকে আধার করে যখন ধর্ম, অর্থ, কাম আর মোক্ষ এই চারটে পুরুষার্থের কথা বলা হয় তাকেই ইতিহাস বলা হয়। স্মৃতিশাস্ত্র, স্মৃতি মানে যেটাকে বার বার শরণ করতে হয় আর শ্রুতি মানে, যেটাকে সব সময় ধারণ করা হয়, সব সময় মাথায় ধরে রাখতে হয়। অর্থাৎ বেদের জ্ঞান যেন কখনই মাথা থেকে বেরিয়ে না যায়। আমাদের যত শাস্ত্র আছে, তার প্রত্যেকটি শাস্ত্র একটা বিশেষ বিদ্যাকে ইঙ্গিত করে, শাস্ত্রের নামও যা বিদ্যাও তাই। আমি যদি বলি, আমি পুরাণ অধ্যয়ন করছি। এখানে পুরাণ মানে যে কোন পুরাণই

হতে পারে, পুরাণ মানে একটি বিদ্যা, পরম্পরাতে যে পুরাতন কাহিনীগুলি যুগে যুগে চলে আসছে, যে কাহিনী এখনও প্রাসঙ্গিক, শুধু মনোরঞ্জনের জন্য নয়, যে কাহিনীকে আধার করে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটি পুরুষার্থের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। ঠিক তেমনি শাস্ত্র মানে যিনি শাসন করেন, আমাদের পথ দেখিয়ে চারটে পুরুষার্থের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। উপনিষদ শাস্ত্রের অর্থ হল আমাদের ভেতরে যে অবিদ্যা আছে সেই অবিদ্যাকে নাশ করে দেয়। আমাদের যত শাস্ত্র আছে, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র যাই বলা হোক না কেন, এর মধ্যে একমাত্র উপনিষদই অবিদ্যাকে নাশ করে, উপনিষদের শাব্দিক অর্থ থেকেই এই অর্থ বেরিয়ে আসছে। গীতার নামের সাথে একটু তফাৎ হয়ে যায়, কারণ গীতার নামের সাথে গ্রন্থের বিষয়বস্তুর কোন মিল নেই। কারণ গীতা গ্রন্থ যে বিদ্যাকে ধারণ করে আছে গীতা নাম দিয়ে সেই বিদ্যাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। সেইজন্য আচার্য গীতার ভাষ্যে বলছেন, *অস্য গীতাশাস্ত্রস্য প্রয়োজনঃ*, কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রের ব্যাখ্যার সময় তিনি নাম দিয়েই বুঝিয়ে দেন যে শাস্ত্রের নাম আর বিদ্যা এক। আসলে গীতা তো আলাদা শাস্ত্র নয়, গীতা মহাভারতের অঙ্গ। আচার্য তাই বলছেন উপনিষদের মূল অর্থ হল বিদ্যা। উপনিষদ অধ্যয়ন করা মানে বিদ্যার অধ্যয়ন করা। আর কেউ যদি বলে উপনিষদের বিদ্যাকে ধারণা করার ক্ষমতা নেই, তার মানে সে তখন উপনিষদ গ্রন্থ পাঠ করছে।

এরপর আচার্য সম্বন্ধ চতুষ্টয়কে নিয়ে আলোচনা করছেন। যখনই কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে বলা হবে তখনই আমি জানতে চাইব এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করে আমার কি লাভ হবে। দ্বিতীয় জানতে চাইব এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু কি, আর গ্রন্থের সাথে বিষয়বস্তুর কি সম্বন্ধ। এগুলোকে নিয়ে আলোচনা করার সময় চতুর্থ একটা বিষয়কে নিয়ে আলোচনা করা হয়, তা হল এই গ্রন্থ পাঠের অধিকারী কে? সম্বন্ধ চতুষ্টয়ের প্রথমটাকে বলে অধিকারী, কে এই গ্রন্থ পাঠের উপযুক্ত। দ্বিতীয় বিষয়, গ্রন্থের বক্তব্য বিষয়বস্তু কি। তৃতীয় প্রয়োজন, এই বিদ্যাকে জেনে আমার কি লাভ আর চতুর্থকে বলে সম্বন্ধ, অর্থাৎ এই গ্রন্থ আর তার বিষয়ের সাথে কি সম্পর্ক আছে! আচার্য এখানে বলছেন আমরা প্রথমেই বলে দিয়েছে এর বিষয় হল *সদিধাত্বর্থস্য*, উপনিষদ শব্দ দিয়েই বোঝা যাচ্ছে এর বিষয়বস্তু কি। যে বিদ্যা বিশরণ, গতি আর অবসাদন্ এই তিনটে জিনিষকে করে অর্থাৎ অবিদ্যাকে সমূলে নাশ করে বা যে বিদ্যা ব্রহ্মতত্ত্বের দিকে নিয়ে যায় বা জন্ম-মৃত্যুর চক্র, যেখানে বারবার জন্মাচ্ছে মরছে, যাকে মৃত্যুধর্মা বলে তাকে শিথিল করে দেয়। একটু পরেই মৃত্যুধর্মাকে নিয়ে বলবেন, যেমন ধান, গমের বীজ বপন করা হল, গাছ হল তাতে শস্য হয়ে পুষ্ট হল, কেটে দিল বা ওখানেই পড়ে আবার গাছ হয়ে গেল। ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াগুলি যেমন জন্মাচ্ছে মরছে, জন্ম-মৃত্যুর এই চক্রকে এই বিদ্যা শিথিল করে দেয়। এটাই এর বিষয়। এই গ্রন্থের প্রয়োজন কি? আমি শোক-মোহ থেকে বেরিয়ে যেতে চাই, এটাই এই গ্রন্থের প্রয়োজন। আর সম্বন্ধের ব্যাপারে বলছে, যদি এই বিদ্যাকে অনুশীলন করা হয় তাহলে বস্তু লাভ হয়। এই যদি বিষয়, প্রয়োজন আর সম্বন্ধ হয় তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই তার অধিকারী হলেন যিনি এই বিদ্যাকে চাইছেন। উপনিষদ পাঠ করার অধিকারী কে বলতে গিয়ে আচার্য কোন শর্ত দিচ্ছেন না। মাঝে মাঝে এদিক সেদিক থেকে বলা হয় যে, মেয়েদের বেদ পাঠের অধিকার নেই, গায়ত্রী মন্ত্রের উচ্চারণ করার অধিকার নেই, আচার্য কিন্তু কোথাও এই ধরণের কোন শর্ত দিচ্ছেন না। ওনার একটাই শর্ত, তুমি কি এই সংসারচক্র থেকে বেরোতে চাও? তুমি কি শোক-মোহ থেকে বেরোতে চাও? তুমি কি অবিদ্যার নিবৃত্তি চাও? এই যে তোমার বারবার জন্ম হচ্ছে মৃত্যু হচ্ছে এর থেকে কি তুমি একটু রেহাই পেতে চাইছ? যদি চাও তুমি এই গ্রন্থ পাঠের অধিকারী। অন্যান্য গ্রন্থে যেমন বলা হয়, এই গ্রন্থ পাঠ করলে তোমার অমুক হবে, তমুক হবে, এগুলো আসলে গ্রন্থস্তুতি। বাচ্চাদের যেমন লোভ দেখিয়ে অনেক কিছু করিয়ে নেওয়া হয় গ্রন্থস্তুতিও অনেকটা সেই রকম। আচার্যের কাছে টোপ-ফোপ খাওয়ানোর কোন প্রশ্নই নেই। তিনি একেবারে পরিষ্কার। এই উপনিষদ অধ্যয়ন করলে আমার কি হবে? কিছুই হবে না। যদি বিদ্যা চাও তাহলে অবশ্যই তোমার হবে। ঠাকুর, স্বামীজীরও এই একই ভাব ছিল। প্রথমেই কেউ গেলে বলে দিতেন, তুমি যদি রোগ ভালো করতে চাও তো অন্য জায়গায় যাও, এখানে নয় কিন্তু তুমি যদি বিদ্যা পেতে চাও, ঈশ্বরে কিভাবে ভক্তি হবে, ঈশ্বরকে কিভাবে পাওয়া যাবে জানতে চাও তাহলে অবশ্যই তুমি আসবে।

গ্রন্থস্তুতি আর বিদ্যাস্তুতিতে অনেক তফাৎ। শাস্ত্র দুই রকমের, এক ধরণের শাস্ত্রে গ্রন্থের স্তুতি করা হয় আরেক ধরণের শাস্ত্রে বিদ্যার স্তুতি করা হয়। আমরা আগেই বলেছি গ্রন্থ আর বিদ্যা দুটো আলাদা। হনুমান-চালিশাতে হনুমানজীর বর্ণনা আছে, সেটা জেনে আমার কী হবে! কিন্তু বর্ণনা তো করতে হবে, নাসৈ রোগ হরৈ

সব পীরা। ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিদিন হনুমান চালিশা পাঠ করে যাচ্ছে কজনের সব রোগ ভালো হয়ে গেছে আর কার জীবনের সব দুঃখ দূর হয়ে গেছে? আসলে কারুরই কিছু হয় না। তাহলে এগুলো পাঠ করতে কেন বলা হয়? এগুলো না করতে বললে মানুষ তো কিছুই করতে চাইবে না। মানুষকে টোপ খাইয়ে আগে এদিকে নিয়ে আসতে হবে। তাতে কি লাভ? এইভাবে অনেক দিন করতে করতে হঠাৎ একদিন দেখবে হনুমানজী যেভাবে শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করতেন আমাকেও ঐ ভাবেই ভগবানের প্রতি দাসভক্তি করতে হবে বা স্বামীজী বলেছেন মানব সেবা করতে হবে, এই চিন্তা যখন একবার এসে যাবে তখনই সে ভগবদমুখী হয়ে যাবে। হাজারটি লোকের মধ্যে নশ লোক তো শাস্ত্রের দিকে তাকাবেই না, তারা বলবে যত ধুর্ত, বদমাইশরা ধর্মের দিকে যায়। চার্বাকরাই বেদের নামে বলত, যারা ভ্রষ্ট, ধুর্ত আর রাক্ষস, তারাই ভাত-মাংস খাওয়ার লোভে আর মোটা মোটা দক্ষিণা পাওয়ার জন্য এই বইগুলো লিখেছে। বাকি একশজন দুঃখ-কষ্টে বিপর্যস্ত হয়ে কোন সাধুবাবার কাছে গেছে, সাধুবাবা তখন তাকে বলে দিলেন – দ্যাখো বাবা! এই ছোট্ট বই হনুমান চালিশা রোজ স্নান করার পর পাঠ কর, দেখবে কিছু দিনের মধ্যে তোমার সব দুঃখ-কষ্ট চলে গেছে। এইভাবে টোপ খাইয়ে তাকে ধর্মের দিকে নিয়ে আসা হল। এখান থেকেই সে ধীরে ধীরে আরও ভেতরের দিকে এগোতে থাকবে। কিন্তু উপনিষদকে কখনই এভাবে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া হত না। উপনিষদ সব সময়ই ছিল কয়েকজন মুষ্টিমাত্র বাছাই করা লোকের জন্য। যাঁরা নিজে থেকেই স্থির করে নিয়েছেন আমি সব কিছু ছেড়ে দিতে প্রস্তুত, ইহলোকে আমার কিছু চাই না, পরলোকে স্বর্গসুখও চাই না, অহঙ্কার পর্যন্ত ত্যাগ করতে রাজী আছি। এখানেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, গ্রন্থস্তুতি আর বিদ্যাস্তুতি দুটো পুরোপুরি আলাদা জিনিষ। আচার্য বলছেন এই যে উপনিষদের আলোচনা চলছে এখানে বিদ্যার আলোচনা করা হচ্ছে।

সম্বন্ধ ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর তিনটে জিনিষকে নিয়ে আলোচনা করছেন। একটা হল উপনিষদ শব্দের অর্থ কি। দ্বিতীয় বলছেন, উপনিষদ বলতে এই গ্রন্থকে বোঝায় না, এর বিদ্যাকেই বোঝায়। কারণ গ্রন্থ কোন দিন অবিদ্যার নাশ করবে না। একটা টিয়া পাখি যদি উপনিষদ মুখস্ত করে নেয় তাহলে কি তার অবিদ্যা নাশ হবে? কোন দিনই নাশ হবে না। কার অবিদ্যা নাশ হবে? যিনি এই বিদ্যার কাছে যাচ্ছেন, নিষ্ঠাপূর্বক বিদ্যার অনুশীলন করছেন। কিন্তু উপনিষদ শুধু পাঠ করে গেলে যে কিছুই হবে না তা নয়, একটা শুভকর্ম তৈরী হচ্ছে, এই শুভকর্ম জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বন্ বন্ ঘোরা থেকে একটু রেহাই দেবে, পুরো অবিদ্যার নাশ হবে না কিন্তু এই ঘোরা থেকে একটু বিশ্রাম দেবে। কিভাবে শিথিল করবে একটু পরেই বলবেন, কিন্তু মজার ব্যাপার হল সেখানে আবার একটা যজ্ঞের কথা বলছেন। অথচ যজ্ঞের কথা অন্যান্য উপনিষদে নেই। এখানে বক্তব্য হল এই ধরণের যজ্ঞ করে মানুষ যখন স্বর্গে যায় তখন সে যেন একটু রেহাই পেল। কেনোপনিষদ বা ঈশোপনিষদ বা অন্যান্য উপনিষদে যে এই ধরণের কোন যজ্ঞের কথা বলা হয়নি অথচ নাম উপনিষদ, সেইজন্য তার অর্থ এটাই হতে পারে যে যারা এইসব উপনিষদ যখন পাঠ করছেন, শ্রবণ করছেন, চিন্তন করছেন তখন এটাও এক ধরণের যজ্ঞ হয়ে যাচ্ছে, আর এই যজ্ঞ অনুশীলন করার ফলে বারবার জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘোরাটা একটু কমে যায়। আর শেষে সম্বন্ধ চতুষ্টয়কে নিয়ে আলোচনা করছেন। এই হল আচার্যের কঠোপনিষদের সম্বন্ধ ভাষ্য, এরপর আমরা কঠোপনিষদের মূল মন্ত্রের আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি।

শান্তিপাঠ

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

পরমাত্মা আমাদের উভয়কে সমভাবে রক্ষা করুন এবং উভয়কে সমান ভাবে বিদ্যাফল দান করুন, আমরা যেন সমভাবে সামর্থ্য অর্জন করতে পারি, আমাদের উভয়ের লব্ধ বিদ্যা সফল হোক, আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

প্রথমোহধ্যায়ঃ

প্রথমা বল্লী।
ওঁ উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ববেদসং দদৌ।
তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস।।১/১/১।।

(বাজশ্রবার পুত্র বিশ্বজিৎ যজ্ঞে ফল কামনা করে সর্বস্ব দান করেছিলেন। নচিকেতা নামে তাঁর একটি পুত্র ছিল)

আচার্য প্রথমেই বলছেন *তত্রাখ্যায়িকা*, এটি একটি আখ্যায়িকা, আখ্যায়িকা মানেই নচিকেতা মৃত্যুর পর যমরাজার বাড়ি কিভাবে গিয়েছিলেন, এই ধরণের কোন প্রশ্ন করা যাবে না। *বিদ্যাস্তুত্যর্থা*, আখ্যায়িকার মাধ্যমে একটা বিদ্যার স্তুতি করা হচ্ছে। এখানে নচিকেতা ও যমরাজার কোন গুরুত্ব নেই, মর্ত্যলোকেরও কোন গুরুত্ব নেই, একমাত্র গুরুত্ব হল উপনিষদের বিদ্যা। স্তুতির এখানে আরেকটি অর্থ হল যমরাজার মত একজন দেবতা এই বিদ্যার কথা নচিকেতাকে বলছেন, নচিকেতাও পরবর্তি কালে একজন খুব নামকরা ঋষি হয়েছিলেন, বেদে নচিকেতা অগ্নি নামে যজ্ঞের বর্ণনা আছে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন সংবাদে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মত একজন অবতার পুরুষ অর্জুনের মত একজন বীর যোদ্ধার মধ্যে যখন কোন সংলাপ হয় তখন এটাই একটা বিদ্যার স্তুতি হয়ে যায়। গীতার কথা সাক্ষাৎ ভগবান নিজের মুখে বলেছেন, এটাই গীতা শাস্ত্রের মাহাত্ম্য। কাকে বলছেন? তখনকার দিনের সব থেকে বড় যোদ্ধা অর্জুনকে। উপনিষদ নিজেই মহৎ, কিন্তু এখানে স্তুতির জন্য বলছেন স্বয়ং যমরাজ, যিনি সূর্যপুত্র তিনি এই বিদ্যা নচিকেতা নামে একজনকে দিয়েছিলেন, যিনি পরে একজন খুব বড় ঋষি হয়েছিলেন। সেইজন্য এই বিদ্যার সাংঘাতিক দাম। ঠাকুর যে কথাই বলছেন সেই কথারই দাম আছে। কিন্তু ঠাকুর বৃন্দে ঝিকে যে কথা বলছেন তার থেকে অনেক দাম যে কথা তিনি নরেনকে বলছেন। নারায়ণ ঋষি নর ঋষিকে এই কথা বলছেন, এটাই বিদ্যার বিরাট স্তুতি হয়ে গেল। এখানেও ঠিক সেই রকম, যমরাজার মত বক্তা নচিকেতার মত শ্রোতাকে বলছেন, এটাই বিদ্যার স্তুতি। আখ্যায়িকা এই বিদ্যার জন্যই।

সংস্কৃতে *হ বৈ* বললে বোঝায়, এমনটি শোনা যায় বা অনেক আগে এই রকম হয়েছিল। অতি প্রাচীন কোন কাহিনীকে বলার জন্য *হ বৈ* এই দুটো শব্দ দিয়ে বলা হয়। পুরাকালে কোন ঋষি বা ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁর নাম ছিল বাজশ্রবস। বাজশ্রবস আবার বাজশ্রবার পুত্রকেও বোঝায়। বাজশ্রবা নামের ব্যুৎপত্তি করলে অর্থ হয় যিনি এক সময় এক যজ্ঞ করেছিলেন এবং সেই যজ্ঞে তিনি প্রচুর অন্নাদি দান করেছিলেন, সেখান থেকে তাঁর উপাধি হয়ে গেল বাজশ্রবা। বাজশ্রবার সন্তান ছিলেন বাজশ্রবস, তিনিও ব্রাহ্মণ কিন্তু পুরোপুরি ঋষি নন। বাজশ্রবস ঠিক করলেন আমি এমন একটা যজ্ঞ করব, যে যজ্ঞে আমি সব কিছু দান করে দেব। আচার্য এখানে উল্লেখ করছেন, স্বর্গ কামনা করে যে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করা হয় তাতেও সব কিছু দান করে দেওয়া হয়। স্বর্গ কামনা করলে ইহজগতের সব কিছু ত্যাগ করে দাও, বিশ্বজিৎ যজ্ঞেও তাই সব কিছু দান করে দেওয়া হত।

পরবর্তি কালে হর্ষবর্ধনও এই ধরণের যজ্ঞ করতেন। যদিও বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করেননি কিন্তু তাতে তিনি সব কিছু দিয়ে দিতেন। একবার সব দিয়ে দেওয়ার পর শেষ মুহুর্তে একজন ব্রাহ্মণ আসেন। হর্ষবর্ধনের কাছে দানের মত আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, তখন নিজের পরিধেয় বস্ত্র তিনি সেই ব্রাহ্মণকে দান করে দেন, ভগ্নির ওড়না দিয়ে তাঁকে লজ্জা নিবারণ করতে হয়েছিল। বেদের যজ্ঞ মানেই ফলাকাঙ্খা। মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়ে সুখ ভোগ করার আকাঙ্খা। বেদের ঋষিরা জানতেন মানুষ তার স্বার্থ, লোভ, মোহ ছাড়া কিছু ভাবতে পারে না। ঋষিরা তাই টোপ দিতেন। ইহলোকে যদি দান কর তাহলে তুমি স্বর্গে যাবে। গরীবলোক না খেয়ে মরছে কেউ তাকে একটা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে যাবে না, সেখানেও যদি বলা হয় গরীব কাঙালীকে দান করলে তুমি স্বর্গে যাবে, তখন দান করতে নেমে যাবে। যে কোন জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য চাঁদা তুলতে গেলে লোকেরা

টাকা দিতেই চায় না, কিন্তু যদি বলেন মন্দির তৈরীর জন্য এই অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে তখন প্রচুর লোক দান করতে এগিয়ে আসে, ভাবে মন্দিরের জন্য টাকা দিলে আমার স্বর্গে যাওয়া নিশ্চিত হয়ে যাবে। বেদের ঋষিরা এটা জানতেন তাই তাঁরা প্রচুর যজ্ঞের বিধান নিয়ে এসেছেন। বিশ্বজিৎ যজ্ঞের ফল সত্যিই হয় কি হয় না তা শাস্ত্রই জানেন। আচার্যও বলছেন শাস্ত্র যখন বলে দিয়েছেন তখন আর প্রশ্ন করা যাবে না, শাস্ত্রে যেমনটি আছে তেমনটি মেনে নিতে হয়।

বাজশ্রবস ঠিক করলেন আমি বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করব। *তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস*, বাজশ্রবসের সন্তান নচিকেতা, বাজশ্রবার সন্তান বাজশ্রবস, বাজশ্রবসের সন্তান নচিকেতা। এখানেও আবার *হ* শব্দ আসছে, অর্থাৎ শোনা যায় যে নচিকেতা নামে তাঁর এক পুত্র ছিল, *আস* মানেই অনেক কাল আগে। নচিকেতার পিতামহ বাজশ্রবা বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করে খুব খ্যাতিমান হয়েছিলেন, নচিকেতার বাবা বাজশ্রবসও খ্যাতি লাভ করার জন্য এক যজ্ঞ করতে যাচ্ছেন। তারপর বলছেন –

তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু।
শ্রদ্ধাবিবেশ, সোহমন্যত।।১/১/২।।

(ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দেওয়ার জন্য গবাদিপশু নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন অল্প বয়স্ক বালক নচিকেতার মনে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হল, তিনি বিচার করতে লাগলেন।)

যজ্ঞ সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর এবার বিশ্বজিৎ যজ্ঞের নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণদের সব কিছু দান করে দিতে হবে, সর্বস্ব না হলেও খুব ভালো ভাবে দান দিতে হবে। মহাভারতেও বর্ণনা আছে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন, রাজসূয় যজ্ঞেও প্রচুর অর্থের দরকার। কারণ যত ব্রাহ্মণ আসবে সবাইকে একটা করে গরু তার সাথে দুটো করে সোনার মোহর দিতে হবে। যাঁরা উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাঁদের আরও বড় দান দিতে হবে। এর জন্য প্রচুর অর্থের দরকার। এত বিপুল পরিমাণ অর্থ কোথা থেকে আসবে? সেইজন্য তাঁরা দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়তেন। তাঁরা সরাসরি গিয়ে অন্যান্য রাজাদের বলতেন, আমার দাদা রাজসূয় যজ্ঞ করতে যাচ্ছেন, তার জন্য আমাদের প্রচুর অর্থের দরকার, আপনার কাছে তাই অর্থ চাইছি। যদি না দিতে চান তাহলে যুদ্ধ করে ফয়সালা হয়ে যাক। বন্ধুস্থানীয় রাজারা এমনিই দিয়ে দিতেন, কেউ ভয়েই দিয়ে দিতেন, বাকিরা যুদ্ধ করত। জুলুম করে, গায়ের জোরে আদায় করতেন, তা নয়। ওনাদের যুক্তি হল, রাজসূয় যজ্ঞ সেই করতে পারেন যিনি রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমি দেখাতে চাই যে, আমি সবার উপরে। এখানে লুকোচুরির কিছু নেই। যদি তুমি আমার শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে নাও তাহলে আমাকে রাজশুল্ক দাও। যদি তুমি আমার বশ্যতা স্বীকার না কর তাহলে আমি তোমাকে বশে এনে দেখিয়ে দিচ্ছি। রাজসূয় যজ্ঞের পেছনে এই ভাবটাই ছিল। রামায়ণ মহাভারতের ইতিহাসে কোথাও এনারা লোভের জন্য কিছু করতেন না। বিদেশীরা সরাসরি যে কোন দেশে লুণ্ঠন করতে নেমে যেত। এরাই নৃশংস বদমাইশ। বিদেশীদের অন্য দেশের উপর লুঠতরাজ করা, ধর্মীয় নির্যাতন করার পেছনে রয়েছে অর্থনীতি, তারা নিজেদের দেশকে ঠিক রেখে অপর দেশ থেকে যত পারত লুট করে নিয়ে আসত। হিন্দুরা এই প্রশিক্ষণ পেয়েছিল যে, আমার যতটুকু আছে আমি ততটুকুতেই চালিয়ে নেব। অন্যান্য ধর্মে এই শিক্ষাটা ছিল না। সেইজন্য এনারা কখনই হিন্দু ধর্মের নামে কিছু করতেন না। তাও কখন সখন কোন রাজা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দেখানোর জন্য দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে যেতেন। সেখানেও একটা যজ্ঞকে সামনে নিয়ে এগোতেন, যজ্ঞ দিয়ে আমি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করতে চাইছি, আমি কোন লোভের জন্য চাইছি না। তার উপর বিশ্বজিৎ যজ্ঞের মত কোন যজ্ঞ করলে তাঁর তো সব কিছু দানেই বেরিয়ে যেত, কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। হিন্দু ধর্মের সাথে ও অন্যান্য ধর্মের এটা একটা প্রধান পার্থক্য। বাজশ্রবস তো যজ্ঞ করলেন, কিন্তু যজ্ঞের সময় তাঁর মনে লোভ উদয় হল। যে ভালো গরুগুলো দানে দেওয়ার কথা সেগুলোকে রেখে যে গরু দিয়ে কোন কিছুই হবে না, পরে সেই গরুর বর্ণনা করা হবে, সেগুলোকে দক্ষিণা রূপে দান করতে শুরু করলেন। যজ্ঞের সময় বাজশ্রবসের মনে কার্পণ্যতার ভাব এসে গেল। দক্ষিণা দেওয়ার সময় সবার এই রকমই হয়ে থাকে, নিজের জন্য ভালোটা বাঁচিয়ে রাখতে চায়। বিশ্বজিৎ যজ্ঞে এই জিনিষ করা যাবে না।

কঠোপনিষদ আর গীতা দুটোই কার্পণ্যতা থেকে শুরু হয়। কঠোপনিষদে কার্পণ্য হল পয়সার আর গীতাতে কার্পণ্যতা স্বভাবের। যেখানে মন উদার হওয়ার কথা সেখানে অর্জুনের মনে কার্পণ্য এসে গেছে, মনটা

ছোট হয়ে যাচ্ছে আর ভগবান বুদ্ধি দিয়ে অর্জুনের কার্পণ্যতাকে সরিয়ে মনকে উন্মুক্ত করে দিচ্ছেন। এখানে কার্পণ্যতা অন্য ধরণের, নচিকেতার বাবার মনে কার্পণ্য এসেছে, এই কার্পণ্যতা দিয়ে কঠোপনিষদ শুরু হয়। কঠোপনিষদ আর গীতার এখানে মিল দেখা যায়। ধর্ম সেখান থেকেই শুরু হয় যেখানে দুঃখ-কষ্ট থেকে একটা নেতিমূলক ভাব এসে যায়। গীতা যে ভাব থেকে শুরু হয় কঠোপনিষদও সেই ভাব থেকেই শুরু হচ্ছে। গীতাতে মূল পাত্র অর্জুন, তাঁর মনে শোক আর মোহ এসে গেছে। কঠোপনিষদে বাবার কার্পণ্যতা দেখে নচিকেতার মনে দুঃখ এসেছে, আমার বাবা এটা কী করছেন! বেলুড় মঠে একজন যুবক ব্রহ্মচারী হয়ে এসেছেন। খুব বড়লোক বাড়ির ছেলে। একজন মহারাজ ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞেস করলেন 'তুমি এত বড়লোক বাড়ির ছেলে আর তোমাদের সম্প্রদায়ে ঠাকুর, মা, স্বামীজীর ভাবধারাও নেই, কিন্তু তোমার মন এই দিকে কি করে এল'? ব্রহ্মচারী বলছেন 'বাড়ির লোকদের দেখে আমার বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছিল'। ব্রহ্মচারীর মামার বাড়ির লোকদের এত টাকা যে বস্তাভর্তি করে টাকা রাখতে হয়। ব্রহ্মচারী বলছেন 'টেলিফোন বুথে কয়েন দিলে যেমন কথা বলার জন্য লাইনের সাথে সংযোগ হয়ে যায় আমার মাও সেখানেই কথা বলবে যেখানে কথা বললে কিছু টাকা-পয়সার আমদানি হবে। আপনার কাছ থেকে যদি টাকা-পয়সা না বেরোয় তাহলে আর কথা বলবে না। আমার মা হলেন, কয়েন ফেলো কানেকশান করো। এইসব দেখে ছোটবেলা থেকেই আমার বিতৃষ্ণা এসে গেছে'। এটাই জগতের বাস্তব চিত্র, এই চিত্র দেখে তাঁর মনে ঘেন্না এসে গেছে। অনেক হয়েছে আর নয়, আমি এই জগতের আর কিছুতে নেই। আধ্যাত্মিক পথের যাত্রা এখান থেকেই শুরু হয়। আধ্যাত্মিকতা কোথা থেকে শুরু হয়? স্বামীজী বলছেন, from tremendous dissatisfaction from the present state of affairs। আমি বর্তমানে যে পরিস্থিতিতে আছি এই পরিস্থিতি থেকে আমি একেবারে তিতিবিরক্ত হয়ে গেছি। বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি একটুও মনে হয় আমি ভালো আছি, কিছুর উপর যদি সামান্যতম ভালো লাগার স্বাদ অনুভব হয়, ধর্ম তার জন্য নয়। ঠাকুর বলছেন অশ্বত্থ গাছ কেটে দিলে পরের দিনই একটু ফেকড়ি বেরিয়ে আসবে। অহংকারও আজ কেটে দিলে কালই একটু ফেকড়ি বেরিয়ে আসবে। সংসারের কোন কিছুর প্রতি যদি সামান্য একটুও ভালোবাসা থাকে, ধর্ম তার জন্য নয়। সংসার থেকে পুরোপুরি বিতৃষ্ণা এসে গেছে বা কোন একটা জিনিষ এমন বিতৃষ্ণার জন্ম দিয়েছে যে, যার জন্য মনে করছে আমার সব কিছুই চলে যাক, আমি আর কিছু চাই না। ঠাকুর আবার বলছেন, পায়ের উপর পা দিয়ে গোঁফে তা দিয়ে যাচ্ছে, এদের দ্বারা ধর্ম হয় না। যখন সব কিছু ভালো চলছে, ভালো খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে, খেলে হজম হয়ে যায়, ঘুম ভালো হয়, লোকেরা ভালো লোক বলে খুব সম্মান করছে, বুঝে নিন এদের দ্বারা ধর্ম হবে না। ধর্ম যে হবে না তা নয়, মন্দিরে যাবে, প্রসাদ খাবে, গঙ্গা স্নান করবে, সবই করবে কিন্তু মুক্তির পথে চলা শুরু হতে অনেক দেরী আছে। যখন মনে হবে জগতে ঈশ্বর ছাড়া আমার আর কেউ নেই তখন ঈশ্বরের দিকে যাওয়া শুরু হবে। ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন ছুঁচে সুতো ঢোকানর সময় সুতোতে একটুও যদি আঁশ থাকে, ছুঁচে সুতো ঢুকবে না। জগতে কারুর প্রতি একটুও যদি ভালোবাসা থাকে, কোন কিছুর প্রতি সামান্য দুর্বলতা থাকলে এ জন্মে ঈশ্বরের পথে চলা শুরু হবে না। জগতের সব কিছু থেকে বিরক্ত হতে হবে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে অর্জুন দেখছেন এসব কি হচ্ছে! এই সাম্রাজ্যের জন্য নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করতে যাচ্ছি! তখনই তাঁর সব কিছুর প্রতি বিতৃষ্ণা এসে গেছে, আমি কিছুই চাই না, কৌরবরাই রাজ্যসুখ ভোগ করুক আমি না হয় ভিক্ষা করে খাব।

নচিকেতারও ঠিক তাই হচ্ছে। বাবা এ কী করছেন! কটি টাকা বাঁচাবার জন্য বাবা এই জঘন্য পাপ কার্য করছেন! এই তীব্র বিতৃষ্ণা থেকেই মানুষের ভেতরে একটা অদম্য শক্তি জেগে ওঠে। জীবনে যদি বিরাট এমন ধাক্কা না এসে থাকে, যে ধাক্কা থেকে মনে হবে এই জগৎ নিপাত যাক, ধর্ম তার দ্বারা হবে না। আর তা নাহলে ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে থাকবে, যেখানে তার কোন কিছুতেই কোন স্বার্থ নেই, আর এই সংসারটা তার কাছে বিরক্তের। ঠাকুর খুব সহজ ভাবে বলছেন, সংসারকে যখন পাতকুয়া মনে হবে আর আত্মীয়দের কালসাপ মনে হবে তখনই ঈশ্বরে ভক্তি আসে। অথবা সব কিছুই ঠিকঠাক চলছে কিন্তু হঠাৎ জীবনে একটা বড় বিপর্যয় নেমে এল, সেখান থেকে তার জগৎ ভুল হয়ে গেল আর মনটা অন্য দিকে ঘুরে গেল। নচিকেতার উপর এখন এই ধাক্কা এসেছে, অর্জুনেরও এই ধাক্কা এসেছিল। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ভাবে সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা ভাব থেকে বৈরাগ্য আসে। আবার জীবনে অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা আঘাত আসার পর জগতের প্রতি বিতৃষ্ণার ভাব থেকে কারুর জীবনে আধ্যাত্মিকতার ভাব চলে এলেই যে সে একজন মহৎ আধ্যাত্মিক পুরুষ

হয়ে যাবেন তা নয়। মহাভারতে কিছু কিছু যে বর্ণনা পাই তাতে দেখা যায় জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা ভাব এলেও আর আধ্যাত্মিক জ্ঞান আসা সত্ত্বেও অর্জুন কিন্তু তাকে পুরোপুরি কাজে লাগাননি। উচ্চ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী কেউ হতেও পারে আবার নাও হতে পারে কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞানটা পেয়ে যান। যাই হোক, নচিকেতার মধ্যে এখন সেই অবসাদ এসে গেছে। অর্জুনের ক্ষেত্রে শোক আর মোহ ছিল আর নচিকেতার মধ্যে দুঃখ এসেছে, তাও নিজেকে নিয় নয়, বাবাকে নিয়ে।

তং হ কুমারং, নচিকেতা তখন কুমার, অল্প বয়স, আচার্য বলছেন *প্রথমবয়সং*, বারো বছরের এখনও হননি। আচার্য আরও স্পষ্ট করে বলছেন *সন্তমপ্রাপ্তপ্রজননশক্তিং*, তখনও নচিকেতার সন্তানোৎপত্তি করার শক্তি হয়নি। এখানে যদিও পরিষ্কার করে বলছেন না কত বয়স, কিন্তু বলছেন তাঁর বয়স অল্প, কুমার অর্থাৎ সন্তান উৎপত্তির ক্ষমতা এখনও তার হয়নি। কিন্তু আমরা মেনেই চলছি যে তাঁর বয়স বারো বছরের নীচে দশ এগারো বছর হবে, কারণ তিনি এখন বেদ অধ্যয়ন করছেন, সেইজন্য শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের ব্যাপারে তাঁর একটা ধারণা এসে গেছে। যজ্ঞ সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর দেখছেন বাবা দক্ষিণা দেওয়ার জন্য যে গবাদি পশুগুলিকে নিয়ে যাচ্ছেন সেগুলো দিয়ে গ্রহীতার কোন কাজেই আসবে না। পরের মন্ত্রেই এই গবাদি পশুদের বর্ণনা করবেন। তখন নচিকেতার মনে *শ্রদ্ধাবিবেশ*, তাঁর মনে শ্রদ্ধার উদয় হল আর *সোহমন্যত*, তিনি চিন্তা করতে শুরু করলেন। নচিকেতার মধ্যে কিসের জন্য শ্রদ্ধার উদয় হল? আচার্য ভাষ্যে বলছেন, *পিতুর্হিতকামপ্রযুক্তা*, বাবার মঙ্গলের কথা চিন্তা করে তাঁর মনে *শ্রদ্ধাবিবেশ*।

স্বামীজী তাঁর বক্তৃতায় প্রচুর শ্রদ্ধার কথা বলছেন আর তার সাথে সব সময় নচিকেতার শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করছেন। শ্রদ্ধা ঠিক কি? আচার্য শ্রদ্ধাকে বলছেন, *আস্তিক্যবুদ্ধিঃ*। শ্রদ্ধা মানে আস্তিক্য বুদ্ধি। আস্তিক্য আসে অস্তি থেকে, অস্তি মানে যেটা আছে। কি আছে? বলছেন, পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে এই যে জগৎ, এই জগতের পেছনে এক পারমার্থিক শক্তি কাজ করে চলেছে, এই পারমার্থিক শক্তির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস। সেইজন্য শ্রদ্ধাকে আমরা কখনই ইংরাজী বা বাংলায় অনুবাদ করতে পারবো না। আর এই বিশ্বাসটাই intuitive, intuitive মানে যাঁর এই বিশ্বাস আছে তিনিই বোঝেন, যার নেই তার নেই। হৃদয় হৃদয়কে বোঝে, এর মধ্যে কোন যুক্তি থাকে না। লোকের মুখে শুনে, কোন প্রমাণ দিয়ে বা বিচার করে শ্রদ্ধা হয় না। যার শ্রদ্ধা হয় তার ভেতর থেকেই শ্রদ্ধা হয়। আস্তিক্য বুদ্ধি মানেই বিশ্বাস। কিসে বিশ্বাস? জগতের পেছনে এক পারমার্থিক শক্তি কাজ করছে, তাঁকে ভগবানই বলি আর যাই বলি না কেন তার কোন দাম নেই, ঐ পারমার্থিক শক্তির প্রতি বিশ্বাস। ঈশ্বর আছেনই আছেন এই বিশ্বাস যদি কারুর মধ্যে এসে যায় তাঁর জীবন পুরোপুরি অন্য রকম হয়ে যাবে। আমাদের কথা যদি বলতে হয় তাহলে আমরা অবশ্যই বলতে পারি যে, এখানে নচিকেতার যে শ্রদ্ধার কথা বলা হচ্ছে আমাদের মধ্যে সেই শ্রদ্ধা নেই। আমরা সবাই গুরুমুখে শুনেছি, তার আগে বড়দের কাছে শুনেছি আর এতদিন জপ-তপ করছি বলে মনের মধ্যে একটা প্রচলিত ধারণা হয়ে গেছে কিন্তু শ্রদ্ধা নেই। কেন শ্রদ্ধা নেই? ঠাকুর খুব সহজ ভাবে বলছেন, চোর যদি একবার জেনে যায় পাশের ঘরে সোনা লুকনো আছে সে কি আর রাত্রিবেলা শান্তিতে ঘুমোতে পারবে! চোরের আর ঘুম আসবে না। রাতের অন্ধকারে একটা দড়ি দেখেই আমরা কত চিৎকার চেঁচামেচি করছি। যেখানে 'কুকুর হইতে সাবধান' লেখা থাকে সেখানে আমরা কত সাবধানে প্রবেশ করি। সেখানে যার একটু বিশ্বাস হয়ে গেছে ঠাকুর আছেন, এরপর সে কি আর কোন অন্যায় কাজ করতে পারবে! এরপর সে কি আর মিথ্যে কথা বলবে, চুরি করবে, অপরকে কষ্ট দেবে? কখনই করবে না। এর থেকেও বড় হল, সে কি আর জগতের প্রতি দৃষ্টি দেবে? প্রশ্নই নেই। যার এই আস্তিক্য বুদ্ধি আছে, এই শ্রদ্ধা যার আছে সে কখনই আর জগতের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারবে না, সম্ভবই নয়। জগতের কোন কিছুর প্রতি এখনও দৃষ্টি আছে তার মানে তার মধ্যে কিছু একটা নেই। কি নেই? ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি মৌলিক বিশ্বাসটাই নেই। আমরা মুখে যতই বলি, ঠাকুরকে আমি বিশ্বাস করি বলেই তো বেলুড় মঠ থেকে দীক্ষা নিয়েছি, ঠাকুরকে ভালোবাসি বলেই তো সব কিছু ত্যাগ করে মঠের সন্ন্যাসী হয়েছি, ঠিকই বলছি কিন্তু এই আস্তিক্য বুদ্ধি, এই শ্রদ্ধা আমাদের মধ্যে এখনও আসেনি। কারণ এই আস্তিক্য বুদ্ধি, এই শ্রদ্ধা যদি কারুর মধ্যে এসে যায় তার ফলস্বরূপ নচিকেতার মত তার জীবন সম্পূর্ণ ভাবে পাল্টে যাবে।

গীতায় ভগবান তিন রকম শ্রদ্ধার কথা বলছেন, সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা, রাজসিক শ্রদ্ধা আর তামসিক শ্রদ্ধা। আমরা এখানে গীতার শ্রদ্ধার মধ্যে ঢুকছি না। শ্রদ্ধা মানে আস্তিক্য বুদ্ধি, আস্তিক্য বুদ্ধি মানে পারমার্থিক সত্তাতে

বিশ্বাস। আমাদের শরীর, মন এর পেছনেও এক পারমার্থিক শক্তি আছে, যাঁকে আমরা আত্মা বলছি বা অন্তর্যামী বলছি, এই অন্তর্যামীর প্রতি বিশ্বাস। আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পেছনেও এক পারমার্থিক শক্তি কাজ করছে। পারমার্থিক সত্তাতে যখনই বিশ্বাস হয়ে যাবে তখনই স্বাভাবিক ভাবে দ্বিতীয় আরেকটি বিশ্বাস জন্ম নেবে। শাস্ত্রে বিশ্বাস এসে যাবে। আমরা বলতে পারি, আমার তো গীতা উপনিষদে বিশ্বাস আছে। কিন্তু ঈশ্বরে যদি আমাদের ঠিক ঠিক বিশ্বাস থাকে তখন আমাদের জীবনটাই অন্য রকম হয়ে যাবে। আমরা মনে করছি যে আমাদের বিশ্বাস আছে, কিন্তু সেই শ্রদ্ধাটা নেই। নচিকেতার শ্রদ্ধা যদি কারুর মধ্যে এসে যায় সে আর কোন কিছুর দিকে তাকাবে না, ভগবান লাভের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে। শাস্ত্রের পর তৃতীয় যে বিশ্বাসের জন্ম হয় তা হল সদ্গুরুর উপর বিশ্বাস। গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছি, গুরু একটি মন্ত্র দিয়ে বলে দিলেন শিবই ঈশ্বর, গুরুর এই বাক্যে বিশ্বাস, শিব ঈশ্বর, তিনি ভগবান এটাই সদ্গুরুর উপর বিশ্বাস। তার মানে তিনটে জিনিষের প্রতি আমার বিশ্বাস এসে গেল। প্রথম বিশ্বাস বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পেছনে এক পারমার্থিক সত্তা আছে, দ্বিতীয় শাস্ত্রে বিশ্বাস আর যিনি গুরুর উপর বিশ্বাস। শাস্ত্র, গুরু আর ঈশ্বর এটাকেই ঠাকুর বলছেন ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান। এই তিনটের উপর যে বিশ্বাস এটাই শ্রদ্ধার ব্যাপার। ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা, ভাগবত, যে শাস্ত্র সেই ভগবানের কথা বলছে তাতে শ্রদ্ধা আর তাঁর যিনি একান্ত ভক্ত তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা। ঠাকুর আবার বলছেন গুরু, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব, একই কথা, বিভিন্ন ভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছেন। এই কথাগুলো তাঁরাই একমাত্র বলবেন যাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধার উদয় হয়েছে। আমরাও গুরুকে কত শ্রদ্ধা করছি, গুরুর নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করি না।

ঠিক ঠিক শ্রদ্ধা হল, positive affirmative belief compare to negative and skeptical attitude, অর্থাৎ নাকারাত্মক আর তার সাথে সংশয় বা সন্দেহপ্রবণতার বাতিক এর বিপরীত একটা সাকারাত্মক বাস্তব সন্দেহাতীত বিশ্বাস। সচরাচর দেখা যায় গুরুর প্রতি, শাস্ত্রের প্রতি আমাদের একটা নেতিমূলক মনোভাব থাকে, বিশেষতঃ একটা সন্দেহপ্রবণতা থাকে, তিনি সত্যিই কি আমাকে রক্ষা করবেন! তিনি কি সত্যিই আমাকে দেখছেন! আচ্ছা তিনি যদি আমাকে দেখছেন তাহলে আমার এত কষ্ট কেন। ঠাকুর যদি এতই কৃপাবান তাহলে আমার এই দুরবস্থা কেন! এই ধরণের মনোভাব আমাদের সবারই মধ্যে কম বেশি দেখা যাবে। এখান থেকেই আমাদের মধ্যে সন্দেহপ্রবণতা এসে পড়ে, এটাই শ্রদ্ধার অভাব। গীতা, উপনিষদ অধ্যয়ন করে যাচ্ছি, এই পর্যন্ত সব ঠিক আছে কিন্তু এই যে বিদ্যা, বিদ্যাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ, যে বিদ্যা আমাকে ঈশ্বর পর্যন্ত নিয়ে যাবে, সেই বিদ্যার প্রতি বিশ্বাস নেই। গুরুর প্রতি এই জন্যই আমাদের শ্রদ্ধা আছে কারণ গুরুর কাছে আমাদের থাকতে হয় না। তিন দিন গুরুর সঙ্গ করতে গেলে আমরা হাঁপিয়ে উঠব। ঠিক ঠিক শ্রদ্ধা কি জিনিষ বোঝাবার জন্য এই কথাগুলো বলা হচ্ছে। শ্রদ্ধা আর সন্দেহবাতিক দুটো বিপরীত প্রান্তিক। পাড়ার মস্তানরা, যুক্তিবাদীরা সব কিছুকে উড়িয়ে দিচ্ছে এরা সন্দেহপ্রবণতার একেবারে চূড়ান্ত প্রান্তে অবস্থিত, আর অন্য দিকে নচিকেতার মত শ্রদ্ধাবান মানুষরা শ্রদ্ধার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন, এই দুটো প্রান্তকে একটা লাইন দিয়ে যদি জুড়ে দেওয়া হয়, আমরা সবাই এই লাইনের বিভিন্ন পয়েন্টের কোন একটা জায়গায় অবস্থান করে আছি, কেউ নচিকেতার কাছাকাছি কেউ পাড়ার চ্যাংড়াদের কাছাকাছি।

শ্রদ্ধা কখনই গতানুগতিক নয়। আমাদের যে বিশ্বাস এই বিশ্বাস গতানুগতিক। বড়দের কাছে শুনেছি, গুরুর কাছে শুনেছি বা যুক্তি বিচার করে একটা বিশ্বাস এসেছে, একটু ভরসা আছে, এই নিয়েই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। এটাকে শ্রদ্ধা বলা যায় না, কারণ এই বিশ্বাস গতানুগতিক, শ্রদ্ধা কখনই গতানুগতিক হয় না। নচিকেতার শ্রদ্ধাও এর আগে পর্যন্ত গতানুগতিক ছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তে নচিকেতার শ্রদ্ধা সাকারাত্মক, সন্দেহাতীত হয়ে গিয়ে তাঁকে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। প্রকৃত শ্রদ্ধা আর গতানুগতিক শ্রদ্ধাতে এই তফাৎ। নচিকেতার শ্রদ্ধা যখন আসছে তখন পাঁচজনের কাছে শুনে বা যুক্তি বিচার করে আসছে না, এই শ্রদ্ধা সরাসরি আসছে, এবার আমি করব। লেকচার শুনে, কিছু বই পড়ে আমরাও বলছি ঠাকুর হলেন ভগবান। ঠাকুর যে ভগবান এটাকে যিনি জেনে গেলেন তিনি তো মুক্ত হয়ে গেলেন। আমরা কি জানি না যে শিব ভগবান, বিষ্ণু ভগবান? সত্যি সত্যি যে মুহূর্তে আমরা জেনে যাব শিব ভগবান, বিষ্ণু ভগবান, শ্রীরামচন্দ্র ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান সেই মুহূর্তে তৎক্ষণাৎ আমাদের মুক্তি হয়ে যাবে। আমরা জানি শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান, এই জানাটাকে আত্মীকরণ করা, অনুভব করাটাই সাধনা। আর এই সাধনা শুরু হয় শ্রদ্ধা থেকে, আস্তিক্য বুদ্ধি থেকে, এই দৃঢ় বিশ্বাস এটাই সত্য। কিন্তু এটাই আশ্চর্যের যে মানুষ d-o-gকে ভয় পায়,

কোথাও Beware of Dog লেখা থাকলে আমাদের বিশ্বাস আছে যে কুকুর কামড়ালে ইঞ্জিকশন নিতে হবে, আমাকে কত সতর্ক থাকতে হচ্ছে। কিন্তু এটাকে উল্টে দিলে যে G-o-d হয়, তাঁকে কেউ ভয় পায় না, Beware of Godকে কেউ বিশ্বাসই করবে না। ভগবানে বিশ্বাস থাকলে কেউ কি কখন মিথ্যা কথা বলতে পারবে, সে কি চুরি, জোচ্চুরি করতে পারবে? কখনই করতে পারবে না, সম্ভবই নয়। নিজের শরীর, ইন্দ্রিয়, শরীরের ক্ষুধা, তৃষ্ণা এগুলোর উপরই মানুষের বেশি বিশ্বাস। খবরের কাগজে একটা স্ক্যাণ্ডাল ছাপলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করে নিই। যে যেটা বলবে সবটাই মানুষ বিশ্বাস করে নেবে, একমাত্র ঈশ্বরের ব্যাপারে কিছু বললে বিশ্বাস করবে না। কারণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করার জন্য প্রথমে দরকার আস্তিক্য বুদ্ধি। জগতের পেছনে এক পরম সত্তা আছে, এই পরম সত্তাতে বিশ্বাস আসা খুব কঠিন। আস্তিক্য বুদ্ধিতে একটা সাকারাত্মক অনুভূতি হয় যেখানে কোন ধরণের গতানুগতিক অনুভূতি থাকে না। এই সাকারাত্মক অনুভূতিতে শাস্ত্র বাক্যে ও গুরুবাক্যে পুরোপুরি বিশ্বাস এসে যায়। তখন শাস্ত্রের প্রতি, গুরুর প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি সত্যিকারের বিনয় জন্মায়, হ্যাঁ! আমাকে এই রকমটিই করতে হবে। তখন আপনা থেকেই ভেতরে একটা সাকারাত্মক নিষ্ঠা, ধৃতির উদয় হয়।

একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। একই ঘরে সেই সন্ন্যাসীর সাথে অন্য একজন কনিষ্ঠ সন্ন্যাসীও থাকতেন। দুজনে রাত এগারোটা পর্যন্ত গল্পগুজব করার পর শুয়ে পড়তেন। অল্প বয়সী সন্ন্যাসী একদিন রাত দুটোর সময় ঘুম ভেঙে গেছে, হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল উনি বিছানায় বসে ধ্যান করছেন। রাত দুটো হল ঘুমোবার প্রকৃষ্ট সময় আর উনি এই সময় ধ্যান করে যাচ্ছেন। একবার দুজনকেই তাঁদের হেডকোয়ার্টারসে কোন কাজে আসতে হয়েছিল। যথারীতি দুজনকে এক ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছে। অল্প বয়সী সন্ন্যাসী সকাল হতেই মঠের এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্তে অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সাথে দেখা করার জন্য দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। নটার সময় ঘরে এসে দেখেন উনি বিছানায় পা ঝুলিয়ে ধ্যান করে যাচ্ছেন। দেখে অবাক হয়ে গেছেন, আমার রুমমেটের এত ঈশ্বর-কেন্দ্রিক জীবন! কৌতুহল নিয়ে উনি সেই সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করলেন – মহারাজ দিনে আপনি কত জপ করেন? উনি বলছেন 'আমি তো কোন জপ করি না'। 'কেন গুরুদেব তো বলে দিয়েছেন জপ করতে'। 'যারা কোন জপ-তপ করে না তাদের জন্য বলে দেন দিনে একশ আটবার জপ করতে'। উনি প্রত্যেকটি কাজে একনিষ্ঠ, সুন্দর গান-বাজনা করেন, বেশি বইও পড়েন না, বাইরের লোকেরা তাঁকে বেশি জানেও না। কিন্তু অল্প বয়স থেকেই তাঁর খুব নাম। গুরুর নিয়ম রক্ষার জন্য উনিও একশ আটবার জপ করেন কিন্তু সব সময় ধ্যান করে যাচ্ছেন। ওনাকে যদি বলা হয়, মহারাজ সবাই যখন ঘুমোয় আপনি তখন জপ-ধ্যান করেন, ঘুমোন কখন? উনি হেসে উত্তর দেন – ঘুম না হলে কি করব, তাই ধ্যান করি। ওনার যে অনিদ্রা রোগ তাও নয়, মন এত সাত্ত্বিক হয়ে গেছে যে ঘুমের কোন প্রয়োজন হয় না। তাঁর মনে কোথাও একটা শ্রদ্ধা জন্মে গেছে, এটাই আস্তিক্য বুদ্ধি। আর কোন কথাকেই বেশি গুরুত্ব দিতেন না। একবার তাঁর রুমমেট জিজ্ঞেস করছেন 'মহারাজ! আপনি নিশ্চয়ই ঠাকুরের স্বপ্ন-টপ্ন দেখেন'। উনি সঙ্গে সঙ্গে হেসে বলছেন 'কেন অন্য স্বপ্নও তো দেখি'। তার মানে, তিনি এগুলোকে কোন গুরুত্বই দিচ্ছেন না। ওনার কাছে একটাই জিনিষ। ঠাকুর যেমন বলছেন বউমা অন্তঃসত্ত্বা হলে শাশুড়ি তার কাজ কমিয়ে দেয়, আর সন্তান হয়ে গেলে তাকে নিয়েই নাড়াচাড়া করে। ইনিও এখন একটাকে নিয়েই নাড়াচাড়া করে যাচ্ছেন, অন্য কি হচ্ছে, কি হচ্ছে না তাঁর কাছে এগুলোর কোন গুরুত্বই নেই। এটাই সম্পূর্ণ ঈশ্বর-কেন্দ্রিক জীবন, তার পেছনে আছে আস্তিক্য বুদ্ধির উদয়। আস্তিক্য বুদ্ধির উদয় মানুষের হতে চায় না। মানুষের দুঃখ হলে মদ খাবে, আনন্দ হলে মদ খাবে, বৃষ্টি পড়ছে মদ খাবে, বৃষ্টি পড়ছে না মদ খাবে, বন্ধু চলে গেল মদ খাবে, বন্ধু এসেছে মদ খাবে। যেটাই হোক, মনকে নেশার মধ্যে প্রমত্ত করে রেখেছে। আমরাও সবাই নেশার মধ্যে মনটা রেখে দিয়েছি, সিনেমা দেখছি, সিরিয়াল দেখছি, উপন্যাস পড়ছি, ম্যাগাজিন পড়ছি, গ্রাম্য কথা বলছি, কিছু না হোক কাজ করে যাচ্ছি। কাজ না থাকলে কাজ জুটিয়ে নিচ্ছি। কাজ না জুটলে অপরের মঙ্গলের জন্য নেমে পড়ছি। নিজের মঙ্গল করতে পারছি না, অপরের মঙ্গল করতে ঝাঁপিয়ে পড়ছি। কারণ কিছু না করে আমরা থাকতে পারি না। শুধু ঈশ্বরের উপর মনকে ফেলে রাখার কাজটাই মানুষ করতে পারে না। কারণ আস্তিক্য বুদ্ধির উদয় হয়নি। নচিকেতার আস্তিক্য বুদ্ধির উদয় হয়েছে। আস্তিক্য বুদ্ধি অর্থাৎ শ্রদ্ধাবিবেশ যখন হয়ে গেছে, এরপর ওর আর কোন কিছুর সমস্যা হবে না।

এই শ্রদ্ধা এলে কি হয়? শ্রদ্ধা এসে গেলে সবার আগে হৃদয়ে সব কিছুর প্রতি বিনয়ের ভাব এসে যাবে। যিনি জেনে গেলেন ঈশ্বর আছেন বা ঐ বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা এসে গেল তিনি বিনয়শীল হয়ে যান। দ্বিতীয়

আসবে নিষ্ঠা। বিনয় ও নিষ্ঠা এই দুটোর পর গীতাতে ভগবান যে দৈবী সম্পদের কথা বলেছেন সেই দৈবী সম্পদ একে একে এসে যাবে। কিন্তু এদের মধ্যে গুরুত্ব হল বিনয় আর নিষ্ঠা। কারণ নিষ্ঠা যদি না থাকে তাহলে শ্রদ্ধা যে আমাকে ঐ দিকে নিয়ে যাবে, সেই যাওয়াটা নিয়ে যেতে পারবে না। তার সাথে ধৃতি, আমি এটা করবই। শ্রদ্ধা এলে একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়। কোন কিছুর প্রতি শ্রদ্ধা যদি থাকে তখন মনে কোন ধরণের চাঞ্চল্য থাকবে না, চাঞ্চল্যতা না থাকলে ঐ বিদ্যার প্রতি একাগ্রতা এসে যাবে। তার আস্তিক্য বুদ্ধি এসেছে কিন্তু এখনও জ্ঞান হয়ে যায়নি, আস্তিক্য বুদ্ধির জোরে এবার কিন্তু সে সাংঘাতিক কিছু একটা করে দিতে পারবে। যাঁর ভেতরে শ্রদ্ধার জন্ম হয়ে গেছে তিনি এবার সুপারম্যান হয়ে গেলেন। ফলে যত রকমের বিঘ্নই আসুক না কেন, এবার সব বিঘ্নকে তিনি অতিক্রম করে এগিয়ে যাবেন। স্বামীজী খুব সুন্দর বলছেন, হিমালয়কে চূর্ণ করে দেব, সমুদ্রকে শুষ্ক করে দেব। মহাবীর হনুমান যখন সমুদ্রকে উল্লঙ্ঘন করছেন তখন তাঁর মধ্যে আস্তিক্য বুদ্ধি এসে গেছে, আমি শ্রীরামচন্দ্রের কাজ করছি। বিঘ্ন তখন আর বিঘ্ন থাকে না। ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন, গিন্নী যখন সব কাজ সেরে স্নান করতে যায় তখন ডাকলেও আর পিছনে ফিরে তাকাবে না। তার আগে পর্যন্ত সব কিছু করে দিচ্ছে। শ্রদ্ধা মানে এবার সে স্নান করতে বেরিয়ে গেল, এখন আর কোন কিছুই সে গ্রাহ্য করবে না। তার সন্তান আঁচল ধরে টানুক, স্বামী ডাকুক কিছুই আর সে শুনবে না। গিন্নীর মধ্যে এখন আস্তিক্য বুদ্ধির উদয় হয়ে গেছে। তার আগে পর্যন্ত কি ছিল? যা কিছু করছিল সবই গতানুগতিক ভাবে করে যাচ্ছিল। এগুলো উপমা, শ্রদ্ধা জিনিষটা ঠিক কি হতে পারে বোঝাবার জন্য এই উপমা। ঠাকুর আবার দুই চাষীর গল্প বলছেন। দুজন চাষী খাল কাটতে গেছে, খাল কেটে ক্ষেতে জল আনতে হবে। এক চাষীর বউ এসে বলছে, তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি, এত বেলা হয়ে গেছে, এই নাও তেল স্নান করে খেয়ে নাও। সেই চাষী বলছে, তুই যখন বলছিল তখন চল, স্নান করে খেয়ে নেওয়া যাক। আরেকজন চাষী সব শুনে বউকে তেড়ে এই মারতে যায় কি সেই মারতে যায়, তোকে আমি কেটেই ফেলব। তার মানে এই চাষীর মধ্যে আস্তিক্য বুদ্ধি এসে গেছে, আর সে কারুর কথা শুনবে না। যে ধরণের বাধাই আসুক না কেন কোন বাধাকেই সে তোয়াক্কা করবে না। ভালোবাসার বাধা আসলে বলবে, তোকে কেটে ফেলব। অন্য ধরণের কোন বিঘ্ন এলে বলবে, আমি পিষে ফেলব। সে আর কারুর কথাই শুনবে না, চুরমার করে সব বাধাকে ভেঙে গুড়িয়ে এগিয়ে যাবে। শ্রদ্ধার এই পরিণতি।

শ্রদ্ধার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি হল, মন থেকে সব ভয় দূরীভূত হয়ে যায়। জেহাদীদের আমরা নিন্দা করছি ঠিকই, কিন্তু এদের মন থেকে ভয় চলে যায়। সে জানে আমি এ্যকশানে মারা যাব, কিন্তু এই বিশ্বাস আছে মৃত্যুর পর আমি আল্লার কাছে যাব। এটাই শ্রদ্ধা, যদিও এখানে শ্রদ্ধার অপপ্রয়োগ করা হচ্ছে, এর মধ্যে অন্যান্য অনেক ব্যাপারও আছে। ধরা পড়ার পর ফাঁসির আদেশ দিয়ে বেশি দিন আটক করে রাখলে তখন আবার কান্নাকাটি করতে শুরু করে দেয়, যেমন আসগর অত দিন পড়ে থাকার পর পরের দিকে কাঁদতে শুরু করল। নচিকেতার মধ্যে তা নেই, he is ready to face death, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে সে প্রস্তুত, নচিকেতার মন থেকে সব ভয় মুছে গেছে। শ্রদ্ধাতে সব সময় একটা মহৎ উদ্দেশ্য থাকে। নচিকেতার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল আমার বাবাকে বাঁচাতে হবে, আচার্য বলছেন *পিতুর্হিতকামপ্রযুক্তা*, বাবাকে এই কাজ থেকে বিরত না করতে পারলে বাবাকে নরকে যেতে হবে। এই হল শ্রদ্ধার খুব সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ। *সোহমন্যৎ*, এবার তিনি চিন্তা করতে শুরু করলেন, বাবার কিভাবে মঙ্গল করা যেতে পারে! পরের মন্ত্রে সেটাই বলা হচ্ছে –

পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ।।১/১/৩।।

(যে সব গাভীর জীবনের মত জল পান করা হয়ে গেছে, তৃণ খাওয়া হয়ে গেছে, দুধ দেওয়া হয়ে গেছে, বাচ্চা দেওয়া হয়ে গেছে সেই সব গাভীকে যে যজমান দান করেন তিনি যেসব লোক দুঃখময় বলে প্রসিদ্ধ সেই সব লোকেই গমন করেন।)

উপনিষদে কোথাও কাব্যিক রস খুব একটা পাওয়া যায় না। কিন্তু কঠোপনিষদে উচ্চ তত্ত্বের সাথে কাব্যিক রসের মেলবন্ধন হয়েছে। কবিতা মানেই তাতে রস, অলঙ্কার থাকবে। এখানে কাব্যিক ভাব নিয়ে বলা হচ্ছে, সোজাসুজি শীর্ণ, দুধ না দেওয়া বুড়ো গরু না বলে একটু ঘুরিয়ে বলছেন, কবিতার এটাই বৈশিষ্ট্য, একটু ঘুরিয়ে বলা হয়। বলছেন *পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ। পীতদোকা, পীত-উদকঃ*, যে গরুর

জীবনের মত জল খাওয়া হয়ে গেছে, *জগ্ধতৃণা*, যে গরু শেষবারের মত ঘাস খেয়ে নিয়েছে, *দুগ্ধদোহা*, যে গরুর চিরদিনের মত দুগ্ধ দোহন হয়ে গেছে আর *নিরিন্দ্রিয়াঃ*, যে গরুর বাছুরের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে। মূল বক্তব্য ব্রাহ্মণদের যে গরু দক্ষিণা রূপে দেওয়া হচ্ছে সেই গরুগুলো আর কোন কাজে আসবে না। এটাই অলঙ্কৃত ভাষায় এখানে বলা হল। অকর্মণ্য, বয়স্কদের অনেক সময় ব্যঙ্গ করে বলা হয় – এই রকম নচিকেতার বাবার গরু দিয়ে কি করে সংসার চালানো যাবে, এদেরকে শাস্ত্রের কথা বলে কি হবে! বলছেন যারা এই ধরণের নিকৃষ্ট, ব্যবহারের অনুপযুক্ত বস্তু দান করে মৃত্যুর পর তারা অনন্দা নামে লোকে গমন করে। *অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি*, যে লোকে আনন্দ বলে কিছু নেই, *তা দদৎ*, যজ্ঞে এই ধরণের গরু দান করলে যজ্ঞের কোন ফলই হবে না উপরন্তু আপনি ঐ রকম লোকে যাবেন।

বৈদিক যুগে একটা প্রচলিত ধারণা ছিল, তুমি যত রকম কর্ম করছ, আর তোমার বিভিন্ন কর্মের বিশেষ শক্তির আধিক্য অনুসারে মৃত্যুর পর জীবাত্মা বিভিন্ন লোকে গমন করে। ঈশোপনিষদে বলছেন, কর্ম যদি খারাপ থাকে, আত্মজ্ঞান যদি না হয়ে থাকে তাহলে মৃত্যুর পর জীবাত্মা '*অসূর্যা নাম তে লোকা*', অসূর্য লোকে গমন করে। কিন্তু কঠোপনিষদে বলছেন *অনন্দা নাম তে লোকাঃ*। যদিও বেদে নরক বলে কিছু ছিল না, কিন্তু বিভিন্ন লোকের ধারণা ছিল। যেমনটি কর্ম করেছে আর সেই কর্মের প্রাধান্য যেমন যেমন হবে সেই অনুসারে সে তেমন তেমন লোকে যাবে। যেমনটি তুমি কর্ম করবে তেমনটি তুমি ফল পাবে। আপনি যদি দানে কার্পণ্য করেন, তার মানে আপনি অপরকে আনন্দ দেননি তাই আপনিও আনন্দ পাবেন না, মৃত্যুর পর এমন লোকে আপনি যাবেন যেখানে শুধু নিরানন্দ, *অনন্দা নাম তে লোকাঃ*, এই ধারণা বেদেই এসে গিয়েছিল। যিনি আত্মহন্তা, আত্মহন্তা শব্দকে আচার্য ব্যাখ্যা করে বলছেন, সারা জীবন যে অজ্ঞানের মধ্যেই ঘুর ঘুর করে গেছে, মৃত্যুর পর তারা অজ্ঞান লোকেই যাবে, অসূর্যা মানে তাই, যেখানে জ্ঞান নেই। ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলছেন – ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভাণবে বা যার আছে হেতা তার আছে সেথা, সব একই কথা। শাস্ত্রের কথাকেই ঠাকুর অন্য ভাবে বলছেন। গুবড়ে পোকাকে নারদ বৈকুণ্ঠে নিয়ে যেতে চাইলে গুবড়ে পোকা নারদকে জিজ্ঞেস করছে – ওখানে ভালো গোবর পাওয়া যাবে তো? আমরা সবাই মনে করছি মৃত্যুর পর আমাদের ভালো কিছু হবে। কিছুই হবে না, যা চলছে সেটাই চলতে থাকবে। যেখানে ছেড়ে যাচ্ছি আবার ওখান থেকেই শুরু হবে – Life is a continuation, there is no jump। তিল তিল করে আমাদের জীবনকে মহৎ তৈরী করতে হয়। কিছুটা তৈরী করার পর একটা বড় গোলমাল হয়ে যদি সেখান থেকে পতন হয়ে যায় তাহলে কি হবে? কিছুই হবে না, যতটা তৈরী হয়ে আছে ওখান থেকেই আবার চলতে শুরু করবে। ঠিক তেমনি দুনিয়ার খারাপ খারাপ কাজ করে গেছে, এরপর একটা খুব ভালো কাজ করেছে, এবার সে দুম্ করে একটা ভালো ফল পেয়ে যাবে। এখানেও কিছুই হবে না, ভালো কর্মফলের মেয়াদটা যেই শেষ হয়ে যাবে আবার সে ওখানে পড়ে যাবে, গীতাতেও ভগবান এই কথাই বলছেন, *ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*। আবার এও বলছেন – *পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোহপি সঃ*। কোন যোগী যদি কোন কারণে যোগভ্রষ্ট হয়ে যান তাতেও তাঁর কিছুই হবে না। কোন ভালো বংশে জন্ম নিয়ে কিছু দিন ভোগ করতে থাকবে। কিন্তু আগে যে এত সাধনা করেছে সেই সাধনার জোরে তাকে আবার এদিকে টেনে সাধন পথে নামিয়ে দেবে, জীবন মানেই এক নিরবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা, কোন কিছুই এখানে বৃথা পড়ে থাকবে না। জীবন আমাদের কোন বিশেষ সুবিধা নিতে দেবে না, একটু ভালো কিছু করেছি তার ফল অবশ্যই আমি পাবো, কিন্তু এই ফল শেষ হয়ে সেটাই আবার চলতে থাকবে সারা জীবন আমি যে রকমটি করে এসেছি। মানুষ বলে, আমি জীবনে কারুর কোন ক্ষতি করেনি আমার খারাপ কিছু হবে না। কিন্তু সবারই জেনে রাখা উচিৎ, সত্যিই আমি যদি কারুর ক্ষতি না চেয়ে থাকি, আমার স্বভাবেও কারুর ক্ষতি করার প্রবণতাই নেই, আমার কোন দিন কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু এটা আমার ভাল, এটা আমার ক্ষতি এগুলোকে নিয়ে যদি বিচার করতে থাকি, এই ভালো ক্ষতির জন্য অপর কেউ দায়ী নয়। ভালো লোক হলে কি জীবনে তার কোন নিকট লোক মারা যাবে না? এখানে আপনাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি রূপে বলা হচ্ছে, বাকি যা কিছু আছে সব কিছু আপনি নিজে জড়িয়ে নিয়েছেন, এগুলো আপনার নয়, আপনি বলতে আপনি। আপনার যা কর্ম তার ফল একমাত্র আপনিই পাবেন, আপনার আশেপাশের কেউ তার ফল পাবে না। এখন আপনি যে ফল ভোগ করছেন আপনারই কর্মের ফল ভোগ করছেন। কিন্তু চলতে চলতে আপনি আরও কয়েকজনের সঙ্গে একত্র হয়ে গেছেন। এবার আপনি তার মধ্যে কয়েকজনকে মনে মনে জড়িয়ে

নিয়ে ওর কর্মফলের সাথে নিজের কর্মফলকে মেলাতে চাইছেন। এখানে ভগবান কেন আপনার কর্মের জন্য দায়ী হতে যাবেন। ভগবান দায়ী আপনার কর্মের জন্য, ভগবান দায়ী তার কর্মের জন্য, এগুলো অত্যন্ত সস্তার ফিলজফি। একটু চিন্তা করলে সহজেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আমি কি নিয়ে দুঃখ করছি, কি নিয়ে আমার এত অহঙ্কার। আগে নিজে বিচার করে দেখুন আপনার মনের মর্মস্থলে প্রকৃত কি বিশ্বাস আছে, ঐ বিশ্বাসে কেউ আঘাত দিতে আসবে না যতক্ষণ ঐ বিশ্বাসের প্রতি আপনার নিষ্ঠা থাকবে।

এখানে এটাকেই অন্য ভাবে বলা হয়েছে। নচিকেতার বাবা দান করছেন, দান করা মানে ব্রাহ্মণদের তিনি সন্তুষ্ট করতে চাইছেন। কিন্তু দান দেওয়ার সময় কি ধরণের জিনিষ ব্রাহ্মণদের দিচ্ছেন? *পীতদোকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহ নিরিন্দ্রিয়াঃ*, ঘাটের মড়া জীর্ণ-শীর্ণ গরুগুলোকে দান করছেন। একেই গরু নিজের জায়গা ছেড়ে যেতে চায় না, তার উপর এই ঘাটের মড়া গরুগুলোকে ব্রাহ্মণরা টেনে টেনে কোথায় নিয়ে যাবেন! এই ব্রাহ্মণরা কী আর এখন নচিকেতার বাবাকে আশীর্বাদ করবেন, নাকি যজমানের মঙ্গলের জন্য স্বস্তিবচন করবেন। আপনাকে যদি আমি পাঁচশ টাকার একটা জাল নোট দান করি, ঐ জাল নোট নেওয়ার পর আপনি কি আমাকে আশীর্বাদ করবেন! এই গরু নিয়ে ব্রাহ্মণরা আশীর্বাদ তো করবেনই না, উল্টে কোন অভিশাপও দিয়ে দিতে পারেন। এই চিন্তা নচিকেতার মনকে বিক্ষুব্ধ করে দিয়েছে, আমার বাবার কী হবে! এবার নচিকেতার মধ্যে আস্তিক্য বুদ্ধি এসে গেছে, এবার সে যে কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে প্রস্তুত হয়ে গেছে। নচিকেতা বাবার কাছে গিয়ে বলছেন –

স হোবাচ পিতরং, তত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি।
দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং, তং হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি।।৪

(*নচিকেতা তখন পিতাকে বললেন 'বাবা, আমাকে কার কাছে অর্পণ করবেন'? দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও এই প্রশ্ন করলেন। তখন পিতা বললেন 'তোমায় যমকে অর্পণ করব'।*)

এটাই লেখা বা কথা বলার শৈলী। আমাদের ভাষায় এটি সম্পূর্ণ শ্লোকও নয়, কিন্তু এটুকুর মধ্যেই অনেক কিছু বলে দেওয়া হয়েছে। লেখকরা গল্প প্রবন্ধক যাই লিখুন না কেন ফেনিয়ে ফেনিয়ে এত বড় করবেন যে ফেনা সরিয়ে সার, বীজ কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। এখানে একটা বাক্যে অনেকগুলো ঘটনার বর্ণনা করে দেওয়া হচ্ছে। *স হোবাচ পিতরং*, নচিকেতা বাবার কাছে গিয়ে বলছেন *তত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি*, হে পিতা! আপনি আমাকে কার কাছে দান করছেন? *দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং*, একবার বলার পর বাবা দেখছে বাচ্চা ছেলে নিজের খেয়ালে কি না কি বলছে, কোন উত্তর না দিয়ে নিজের কাজে মন দিলেন, নচিকেতা দ্বিতীয় বার বললেন বাবা! আমাকে কার কাছে দান করলেন। বাবা দ্বিতীয়বারও ছেলের কথাকে গ্রাহ্য না করে চুপ করে থাকলেন, নচিকেতা তৃতীয়বার আবার একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন বাবা! আপনি আমাকে কার কাছে দান করলেন? বার বার একই প্রশ্ন করাতে, *তং হোবাচ*, বাবা এবার বিরক্ত হয়ে গেছেন, রেগে গিয়ে নচিকেতাকে বললেন, *মৃত্যবে ত্বা দদামীতি*, যাও! তোমাকে আমি যমকে দিলাম।

এখানে আচার্য তাঁর ভাষ্যে খুব সুন্দর বলছেন – *তদেবং ক্রতুসম্পত্তিনিমিত্তং*, এই যে যজ্ঞ হচ্ছে, এই যজ্ঞ ঠিক ভাবে নিষ্পাদন হচ্ছে না। গৃহস্থদের বাড়িতে বিবাহ, উপনয়নের মত যে অনুষ্ঠান হয় তাতে সাধারণ সাধারণ বিষয়গুলি নিয়ে সবাই হৈ চৈ শুরু করে দেয়, আসল নিয়ম-প্রথা বেশির ভাগ লোকেরাই জানে না, জানার কথা একমাত্র ব্রাহ্মণদের। স্বামীজী এর বর্ণনা দিচ্ছেন খাওয়ার সময় ঘটি যদি বাটির সঙ্গে লেগে যায় তখন ঘটি অশুদ্ধ হল, নাকি বাটি অশুদ্ধ হল এই প্রশ্নের বিচার নিয়েই তোমরা হাজার হাজার বছর কাটিয়ে দিচ্ছ, এটাই আমাদের দুর্ভাগ্য। আসলে আমাদের বুদ্ধি অত্যন্ত সীমিত, সাধারণ সাধারণ বিষয়ে আমরা বুদ্ধি লাগিয়ে রেখেছি। কিন্তু যাঁরা জানেন কি করতে হবে আর কি করতে নেই, তাঁরা একটু এদিক সেদিক হতে দেখলে আঁতকে ওঠেন, সব গোলমাল হয়ে যাবে ভেবে। যাজ্ঞবল্ক্যরও এই সমস্যা এসেছিল। গুরু বৈশাম্পয়ন একটা যজ্ঞ করবেন ঠিক করলেন। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর প্রধান শিষ্য। সব শিষ্যদের দায়ীত্ব দিয়ে যাজ্ঞবল্ক্যকে দেখতে বললেন সব যেন ঠিক ভাবে সম্পাদন হয়। যাজ্ঞবল্ক্য দেখছেন এই মুর্খ শিষ্যগুলি কি না কি গোলমাল পাকিয়ে দেবে তার কোন ঠিক নেই। গুরুকে বলে দিলেন, বাকিদের ছেড়ে আপনি আমাকে সব দায়ীত্ব দিন। গুরু শুনে খুব রেগে গেলেন। যাজ্ঞবল্ক্য সত্যিই খুব উদ্বিগ্ন ছিল, আমি আপনাকে সত্যি সত্যি ভালোবাসি,

আপনার প্রতি আমার সত্যিকারের শ্রদ্ধা আছে। আপনি যে যজ্ঞ করতে যাচ্ছেন এই যজ্ঞে সামান্য কোন ত্রুটি হয়ে গেলে আপনি এর কোন ফল পাবেন না, উল্টে গর্হিত ফল পেয়ে যেতে পারেন, আমি তাই আটকাতে চেয়েছি, এতে আমার কোন স্বার্থ নেই আর অহঙ্কারেরও কিছু নেই। সত্যিকারের কেউ যদি গুরু, মা-বাবার সেবা করতে চায়, তাহলে তাঁরা যেমন তেমনটিই তাঁদের সেবা করা উচিত। আমরা তা করি না, আমরা সেবা করছি কারণ সেবা করে আমরা কিছু পেতে চাই। একে সেবা বলে না। আস্তিক্য বুদ্ধি যখন নচিকেতার মধ্যে এসেছে তখন তিনি আর নিজের মত সেবা করছেন না, বাবার যেটাতে ভালো হবে সেই মত সেবা করছেন। দেখছেন বাবা সর্বনাশের দিকে যাচ্ছেন, যে যজ্ঞ সম্পাদন করছেন এতে বাবা কোন ফল পাবেন না, বিপরীত ফল নাও হতে পারে কারণ এখানে দোষের কিছু নয়, কিন্তু পুরো কার্যটাই বৃথা হয়ে যাচ্ছে। আচার্য বলছেন *আত্মপ্রদানেনাপি ক্রতুসম্পত্তিং কৃত্বা*, আপনার ভালোর জন্য বা আপনাকে বাঁচানোর জন্য আমি আত্মপ্রদান করতেও রাজী আছি। নচিকেতার কোন স্বার্থ নেই, বাবা ভুল কাজ করছেন সেই কাজ থেকে বাবাকে নিবৃত্ত করার জন্য নিজেকেও বলিদান দিতে প্রস্তুত, হে পিতা! আপনি আপনার সম্পত্তি দান করছেন, আমিও আপনার সম্পত্তি, আমাকে কার কাছে দান করেছেন? নচিকেতার বাবা দান করছেন কিন্তু *নীয়মানাসু*, উচ্চ ব্রাহ্মণদের এক রকম, যিনি ঋত্বিক ব্রাহ্মণ তাঁকে আরেক রকম, পুরোহিত ব্রাহ্মণদের আরেক রকম, যে ব্রাহ্মণরা স্তুতি পাঠ করছেন তাঁদের আরেক রকম। আপনি তো মোটামুটি সবই দান করে দিলেন, আমাকে কার কাছে দিলেন?

এইভাবে একবার, দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার বলার পর বাজশ্রবস্ রেগে গেছেন, *নায়ং কুমারস্বভাব ইতি ক্রুদ্ধঃ*। নচিকেতার এখন কুমার স্বভাব, সন্তানোৎপত্তির ক্ষমতা এখনও তাঁর আসেনি, কিন্তু নচিকেতা বাচ্চাদের মত ব্যবহার করছেন না। মানুষ যদি নিজের বয়সের ধর্ম অনুযায়ী না করে তখনই অশান্তির কারণ হয়। এখানে নচিকেতার বাবা রেগে গেছেন। কেন রেগে গেলেন? ভেতরে যদি কোন গুপ্ত পাপ থাকে আর কেউ যদি সেই পাপকে দেখিয়ে দেয় তখন স্বাভাবিক ভাবেই মানুষ ফোঁস করে উঠবে। যে পাপ কাজ সবাই বুঝতে পারে সেই কাজের ব্যাপারে আগে থাকতেই প্রস্তুতি নিয়ে নেয়। যে সরাসরি ঘুষ নেয় তাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস কর তুমি এত ঘুষ নাও কেন, সে তখন ঘুষ নেওয়ার পক্ষে একটা অজুহাত খাড়া করে দেবে। কিন্তু যে খুব কায়দা করে, লুকিয়ে-চুরিয়ে ঘুষ নেয় তাকে যদি আপনি কিছু বলতে যান সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস করে উঠবে। কারণ এই কাজের জন্য এমনিতেই সে খুব মানসিক অশান্তিতে আছে। একটা পাপ করছে, সেই পাপ কাজকে নিজের সামনেও নিয়ে আসতে পারছে না, মানে সে পাপটাকে ঢাকা দিয়ে রেখেছে, আপনি গিয়ে সেই ঢাকাটা সরিয়ে দিচ্ছেন। মানুষ কখনই নিজের সম্মুখীন হতে পারে না, অপরের সম্মুখীন হওয়া কঠিন কিছু নয়। অপরকে নিজের মুখ দেখাতে না পারার জন্য কখনই সমস্যা হয় না, কিন্তু নিজেকে নিজের মুখ দেখাতে না পারলে তখনই নানা রকম মানসিক সমস্যা তৈরী হয়। এখানে ঠিক তাই হয়েছে। বাজশ্রবসের ভেতরে কার্পণ্য এসে গেছে, নিজের সম্পদ বাঁচাতে চাইছেন, নচিকেতা পিতার ঐ মুখশোটা ধরে টান মেরেছে।

বাজশ্রবস তখন ছেলেকে যেন বিরক্ত হয়ে বলে দিলেন *মৃত্যবে ত্বা দদামীতি*, তোমাকে মৃত্যুকে দিলাম। মৃত্যুকে দেওয়া মানে যমকেই দেওয়া, তাহলে হঠাৎ কেন বললেন মৃত্যুকে দিলাম? বাজশ্রবসের এটা পুরোপুরি বিরক্তিসূচক নয়। যম নিজেই একজন সূর্যপুত্র, তিনি নিজেই একজন দেবতা। যজ্ঞে বিভিন্ন দেবতাদের আহুতি দেওয়া হয় কিন্তু যমের উদ্দেশ্যে কোন বিশেষ আহুতি থাকে না। যমরাজের বৈশিষ্ট্য একটু জটিল। আসলে যম পুরোপুরি দেবতা নন আবার তিনি যে সাধারণ কিছু তাও নন। বিভিন্ন ধর্মে যে মৃত্যুলোকের বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানকার জন্য একজন অভিরক্ষক রাখা হয়েছে, খ্রীষ্টান ধর্মে যেমন লুসিফার হলেন under worldএর দেবতা। এখানে যমরাজের ভূমিকাকে আরও বড় করে দেখানো হয়েছে। যমের ভূমিকাকে বড় করে দেখানোটা দুম্ করে হয়নি। পুরাণে আমরা যে বংশধারা পাই তাতে দেখানো হয়েছে ব্রহ্মার পুত্র মনু, মনুর পুত্র সূর্য আর সূর্যের পুত্র হলেন যম। যম হলেন দেবতা আর মানুষের মাঝখানের সীমারেখা। বেশির ভাগ পরম্পরাতে বলা হয় যম হলেন প্রথম যিনি মৃত্যুকে পেয়েছিলেন, অর্থাৎ যিনি প্রথম মারা গিয়েছিলেন। যিনি প্রথম মৃত্যুকে পেয়েছিলেন তাঁকেই মৃত্যুলোকের custodian করে দেওয়া হল। কিন্তু অন্য দিকে যম হলেন ধর্মরাজ। ধর্মরাজ মানে, তিনি কখনই ধর্ম থেকে চ্যুত হন না। যম সূর্যের পুত্র, সূর্য মানে জ্ঞান, সূর্য আবার মনুর পুত্র, মনু ব্রহ্মার পুত্র, সেইজন্য যম সব সময় ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। অন্য দিকে যমরাজের প্রভুত্ব শুধু যমলোকেই। যমলোক হল, মৃত্যুর পর মানুষ যেখানে যাচ্ছে আবার সেখান থেকে চলে আসছে।

সুখভোগের ব্যাপারটা একমাত্র স্বর্গলোকেই হয়ে থাকে। স্বর্গলোকের রাজা ইন্দ্র আর মৃত্যুলোকের রাজা যমরাজ, দুটো লোক পুরোপুরি আলাদা। বেদে আমরা দেবতাদের যেভাবে পাই যমরাজকে ঠিক সেইভাবে দেবতা রূপে পাওয়া যায় না, সেইজন্য যমরাজ পুরোপুরি দেবতা নন। কিন্তু অন্য দিকে খ্রীষ্টান পরম্পরাতে মৃত্যুলোকের দেবতাদের যেমন নেতিমূলক চরিত্র রূপে দেখানো হয়েছে, যমরাজ সেই রকম চরিত্রের নন। পরের দিকেও যমরাজকে নিয়ে অনেক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। যখন মৃত্যু আসে তখন মানুষের মনে অনেক দুঃখ হয়। মহাভারতে একটা কাহিনীতে দেখানো হচ্ছে ব্রহ্মা কৃত্যা নামে এক নারীকে সৃষ্টি করে মৃত্যুর দায়ীত্ব দিলেন। এখানে মৃত্যুর ব্যাপারটাকে দেখাশোনার জন্য দায়ীত্ব দেওয়া হল, যম কিন্তু মৃত্যুর দেখাশোনা করতে যান না। যমরাজ কখনই কাউকে মারেনও না, উনি তারই প্রাণ নেন যার সময় হয়ে গেছে। এই ব্যাপারটা তিনি ধর্ম দিয়েই চালান। তিনি শুধু মৃত্যুলোকের রাজা, আর তিনি কখনই ধর্ম থেকে চ্যুত হন না। যজ্ঞ ভাগ পাওয়া নিয়ে দেবতাদের মধ্যে অনেক অশান্তি হয়েছে, যেমন শিব আগে যজ্ঞ ভাগ পেতেন না, যার জন্য দক্ষযজ্ঞ হয়েছিল। ঠিক তেমনি আমরা যা যা মন্ত্র পাই সেখানে যমরাজের উদ্দেশ্যে কোন আহুতি পাই না। কিন্তু পরের দিকে এসে যমরাজকেও আহুতির ব্যাপারে অনেকে কিছু কিছু মন্ত্র যোগ করেছেন। যমরাজ একদিকে দক্ষিণার যোগ্য, কারণ সৃষ্টিতে তিনিই প্রথম যিনি মৃত্যুকে পেয়েছিলেন। দেবতারা মারা যান না, কিন্তু যমরাজের মৃত্যু হয়েছিল। যমরাজের বাকি যা কাজকর্ম, পদমর্যাদা সবটাই দেবতাদের মত। যমরাজের যে কালদণ্ড, এই কালদণ্ড থেকে কেউ রেহাই পায় না। রাবণ যখন যমলোকে আক্রমণ করেছে তখন যমরাজ এসে রাবণকে কালদণ্ড দিয়ে শেষ করে দিচ্ছিলেন, ব্রহ্মা এসে তখন হস্তক্ষেপ না করলে রামায়ণ রচিত হত না, ব্রহ্মা যমরাজকে বললেন, রাবণের উপর আমার বর আছে, তুমি রাবণের উপর কালদণ্ড চালিও না। এই কালদণ্ডের জন্য যমরাজকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না, কিন্তু ইন্দ্রকে যে কেউ হারিয়ে দিতে পারবে। সৃষ্টিতে যারই প্রাণন ক্রিয়া আছে তাদের সবার উপর যমরাজের প্রভুত্ব চলবে। এখন বাজশ্রবস যে যজ্ঞ করছেন এই যজ্ঞে যমরাজকে কোন আহুতি দেওয়া হবে না, এটাই স্বাভাবিক। কারণ বৈদিক যুগের যজ্ঞে যমরাজকে কোন আহুতিই দেওয়া হত না। সেইজন্য নচিকেতার বাবা বললেন, সবাইকেই সব কিছু দেওয়া হয়ে গেছে, যমরাজকে কিছু দেওয়া হয়নি তাই তোমাকে যমরাজকেই দিলাম। বাজশ্রবসের এই কথাকে সাধারণ অর্থে নিলে হবে, তুই মরে যা। কিন্তু এখানে তুই মরে যা এভাবে ঠিক বলা হচ্ছে না। একজন দেবতা বাকি থেকে গেছেন, ঠিক আছে নচিকেতাকেই তাহলে যমরাজকে দিয়ে দেওয়া যাক।

বাবার মুখে এই কথা শোনার পর নচিকেতা বুঝতে পারলেন কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে, বাবা রাগের মাথায় এই কথা বলেছেন। তার কারণ, নচিকেতা ভাবছেন যা কিছু দান করা হবে সেই জিনিষগুলো যেন দানগ্রহীতা কাজে লাগাতে পারেন, কিন্তু সেগুলো যদি কোন কাজেই না লাগাতে পারেন তাহলে এই ধরণের জিনিষ দান করার কোন সার্থকতাই থাকছে না। নচিকেতাকে যার কাছে দান করবেন নচিকেতা যেন তার কাজে লাগতে পারে। এখন যমরাজকে দান করে দেওয়ার কথা শুনে নচিকেতা মনে মনে ভাবছেন –

বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ।
কিং স্বিদ্ যমস্য কর্তব্যং যন্ময়াহদ্য করিষ্যতি।।১/১/৫।।

(নচিকেতা চিন্তা করছেন 'অনেকের মধ্যে আমি অগ্রণী এবং অপর অনেকের মধ্যে মধ্যম কিন্তু অধম কখনই নয়, সুতরাং যমের এমন কি প্রয়োজন আছে যা আমার দ্বারা পিতা সাধন করতে চাইছেন'?)

অনেকে এই মন্ত্রের অনুবাদ করেন অনেকের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ আবার অনেকের মধ্যে আমি মধ্যম, কিন্তু এই অর্থ ঠিক নয়। এখানে আচার্য *শিষ্যবৃত্তি* শব্দ নিয়ে এসেছেন। *শিষ্যবৃত্তি* বলতে বোঝায় শিষ্যের আচার, মেধা, নিষ্ঠা সব মিলিয়ে তার জীবনধারা কেমন। শিষ্যবৃত্তি তিন রকমের, উত্তম, মধ্যম আর অধম। উত্তম শিষ্যবৃত্তি হল, আচার্য কি চাইছেন বলার আগেই শিষ্য বুঝে নেয় আর সেই মত কাজ করে দেয়। মধ্যম শিষ্যবৃত্তি হল, শিষ্যকে আদেশ করার পর সে কাজ করে। আর অধম শিষ্যবৃত্তিতে আচার্য আদেশ করলেও কাজ করতে চাইবে না, করলেও ভুলভাল কাজ করে দেবে। এই নিয়ে ঠাকুরের অনেক মজার মজার গল্প আছে। শিষ্যকে গুরু তামাক সাজতে বললে বলবে 'আমি কি আপনার সেবা করার যোগ্য'! এগুলো অধম শিষ্যবৃত্তির লক্ষণ। এদের অধম শিষ্য বলা হচ্ছে না, কারণ তার মধ্যে অন্য কিছু গুণ আছে, যার জন্য তাকে

অধম শিষ্য বলা যাবে না। শিষ্যবৃত্তি শব্দের মানে, শিষ্যের কিছু কিছু গুণ থাকার কথা, বিশেষ করে সেবাদির ব্যাপারে যে তৎপরতা থাকার কথা, অধম শিষ্যবৃত্তিতে এই ব্যাপারে ঘাটতি থাকে। নচিকেতা ভাবছেন, *বহূনামেমি প্রথমো*, আশ্রমের শিষ্যদের মধ্যে আমারও অনেক ব্যাপারে উত্তম শিষ্যবৃত্তি আছে, অনেক ব্যাপারেই আমি আগেই বুঝে নিই আচার্য কি বলতে চাইছেন। *বহূনামেমি মধ্যমঃ*, আচার্য বলার পর বুঝে নিতে পারি কিন্তু অধম শিষ্যবৃত্তি আমার কখনই হবে না, আমাকে কিছু বলার পর আমি বিপরীত বুঝবো বা উল্টো কাজ করে বসব, এরকমটি আমার কখনই হয় না। তার মানে আমারও একটা উপযোগিতা আছে, আমি কোন কাজেই আসব না তা নয়।

যম কখনই কাউকে মারেন না, সেইজন্য তাঁর ঠিক ঠিক নাম হল ধর্মরাজ। যারা স্বর্গলোকে যাবে তাদের দেবতারা নিয়ে যান, কিন্তু যারা সুকর্ম করেনি, স্বর্গলোকে যাওয়ার মত যারা কোন কাজ করেনি, অত্যন্ত অধম যারা তারা মরছে আর জন্মাচ্ছে কিন্তু মাঝে যারা কিছু ভালো কাজ করেছে কিন্তু স্বর্গলোকে যাওয়ার মত যজ্ঞাদি করেনি তারা পিতৃলোকাদিতে যাচ্ছে, এদের থেকেও যারা নীচে তারা যমলোকে যাচ্ছে, এই রকম বিভিন্ন লোকের ধারণা আমরা বেদ থেকেই পাই কিন্তু নরকের ব্যাপারে তাঁদের কোন ধারণা ছিল না। বিভিন্ন লোকের অধ্যক্ষরা আবার বিভিন্ন ধরণের। যমলোকে সুখভোগ হয় না, আর ওখানে ভয়টা যায় না। স্বর্গলোককেই শ্রেষ্ঠ লোক বলা হয়। *কিং স্বিদ্ যমস্য কর্তব্যং*, নচিকেতা এখন তাই ভাবছেন যমলোকে গিয়ে আমি করবটা কী! আমাকে যে দক্ষিণা রূপে যমরাজকে দেওয়া হচ্ছে, আমাকে দিয়ে তো যমরাজের কিছু কাজে লাগতে হবে। আমি যদি যমরাজের কোন কাজেই না লাগি তাহলে যম আমাকে নিয়ে কী করবেন! পরোক্ষ ভাবে নচিকেতা এখানে বুঝতে পারছেন যে বাবা আমাকে রেগে গিয়ে এই কথা বলেছেন, আমাকে যে কারুর কাজে লাগাবেন সেই অর্থে বলেননি। কিন্তু নচিকেতা নিজে মনঃস্থির করে নিয়েছেন, বাবা যখন বলে দিয়েছেন তখন আমাকে যমের কাছেই যেতে হবে। অনেকের মনে হবে নচিকেতা খুব জেদী ছেলে। ঠিক এই কারণেই বাবা-মায়েরা কখনই ছেলের নাম নচিকেতা নাম রাখতে চায় না। কাজের বাড়িতে বাবাকে এক কথা বার বার বলে যাচ্ছে, বাবা রেগেমেগে কি বলে দিয়েছেন, ছেলেও সেটাকে ধরে জেদ করে মৃত্যুর কাছে চলে গেল। এখানে কিন্তু নচিকেতা বাবাকে বিরক্ত করতে চাইছিলেন না, তিনি বাবাকে একটা খারাপ কাজ করা থেকে বিরত করতে চাইছিলেন। এটাই শ্রদ্ধা, আস্তিক্য বুদ্ধি। প্রথমে বাবা গোলমাল করতে থাকলেন, যজ্ঞের দক্ষিণা দেওয়ার সময় আপনি কার্পণ্য করছেন, দ্বিতীয় গোলমাল করছেন আপনি কথা দিয়ে কথা রক্ষা করতে চাইছেন না, আমাকে মৃত্যুর কাছে দিয়ে দিয়েছেন এবার আমি তাই মৃত্যুর কাছেই চললাম। এখানে এসে অনেকগুলো ব্যাপার উঠে আসে, যেগুলোকে আমাদের বোঝা খুব দরকার।

প্রথম ব্যাপার উঠে আসে, কথা দিয়ে কথা রক্ষা না করা। শ্রীরামচন্দ্র না জেনেই বাবার আদেশ পালন করার জন্য অঙ্গীকার করে বসলেন, বাবার আদেশ পরে যখন শুনলেন তখন জানলেন ভরত রাজা হবে আর আমাকে চৌদ্দ বছরের জন্য জঙ্গলে যেতে হবে। শ্রীরামচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলে যেতে তৈরী হয়ে গেলেন। নচিকেতাও ঠিক তাই, বলুন আমাকে কাকে দিলেন? মৃত্যুকে দিলাম। আমি চললাম। আমি আপনাকে অধর্ম থেকে বাঁচাতে এসেছিলাম। আমার আত্মবলি দানেও যদি আপনার কল্যাণ হয় আমি তাই করব, আমি মৃত্যুকেও বরণ করে নিতে প্রস্তুত। দ্রৌপদীর বিবাহের সময়ও সেই একই ব্যাপার। কুন্তী না বুঝেই ভেতর থেকে বলে দিলেন, ভিক্ষায় যা পেয়েছ পাঁচ ভাই ভাগ করে নাও। পরশুরামের কাহিনীতেও একই ব্যাপার, বাবা রেগেমেগে পরশুরামকে আদেশ করলেন তাঁর মায়ের মুণ্ডু কেটে দিতে। এতই তিনি বাবার অনুগত যে সঙ্গে সঙ্গে পরশুরাম মায়ের মুণ্ডু কেটে দিলেন। বাবা খুব খুশী হয়ে গেলেন। খুশী হয়ে পরশুরামকে বললেন তুমি কি বর চাও বল। পরশুরাম বর চাইলেন মায়ের মুণ্ডুটা আবার লাগিয়ে দিন, আর মা যেন কিছু মনে না রাখে। এই ধরণের প্রচুর ঘটনা আমাদের শাস্ত্রে পাওয়া যাবে।

ধর্মপথে যাঁরা এগোতে চান, জীবনে যাঁরা মহৎ হতে চান তাঁদের ব্রত নিতে হয়। ব্রত মানে, আমি ঠিক করে নিলাম আমি এটা করব। ব্রত আবার দুই রকম – মহাব্রত আর অল্পব্রত। আমাদের শাস্ত্রে মহাব্রত হল অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য, অস্তেয় আর অপরিগ্রহ। অহিংসা মানে কোন প্রাণীকে কোন ভাবেই কষ্ট না দেওয়া, সত্য মানে যেমনটি আছে ঠিক তেমনটি রাখা, ব্রহ্মচর্য মানে অন্য দিকে দৃষ্টিপাত না করা, অস্তেয় মানে চুরি না

করা আর অপরিগ্রহ মানে কারুর কাছ থেকে দান, উপহার না নেওয়া। এই পাঁচটিকে বলা হয় মহাব্রত, এই পাঁচটি যেমনটি আছে তেমনটি পালন করতে হবে, এর মধ্যে কোন জল মেশানো চলবে না। যদি দুটোর মধ্যে দ্বন্দ্ব এসে যায় তাহলে পর পর যেমনটি সাজানো আছে, এর সব কটির সাথে আপোষ হতে থাকে। সত্য আর অহিংসার মধ্যে বিরোধ হলে আগে অহিংসাকেই রক্ষা করতে হবে। কারণ অহিংসাই পরমো ধর্ম, অহিংসার সাথে আর কোন ধর্মের তুলনা হবে না। সত্য আর অহিংসার মধ্যে বিরোধ হলে সত্যের সাথে আপোষ করা যাবে অহিংসার সাথে কখনই তা করা যাবে না। আমার মিথ্যে কথা বললে যদি কারুর প্রাণ রক্ষা হয় তখন আমি অবশ্যই মিথ্যা কথা বলব। এখন দু-ধরণের পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে, সত্যি কথা বললে একজনের প্রাণ যাবে, একদিকে সত্য রক্ষা আর অন্য দিকে একজনের প্রাণহানি, মানে জীবহিংসা হতে যাচ্ছে। এখানে সব সময়ই অহিংসাকেই বেছে নিতে হবে। একদিকে সত্য অন্য দিকে ব্রহ্মচর্য এই দুটোর মধ্যে যদি বিরোধ হয় তখন ব্রহ্মচর্যের সাথেই আপোষ করে নিতে হবে। অপরিগ্রহ এই পাঁচটি ব্রতের মধ্যে সবচেয়ে নীচে। একজন সন্ন্যাসীর অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য আর অস্তেয় এই চারটি ব্রত তখনই রক্ষা হবে যখন তাকে কিছু দান বা উপহার গ্রহণ করতে হয়। সন্ন্যাসী কোন উপার্জন করেন না, তাঁকে তো পেট চালাতে হবে, সন্ন্যাসীকে তাই অপরের কাছে হাত পাততেই হবে। তার জন্য আবার নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন, শরীর ধারণের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুই তিনি নেবেন, তার বাইরে কিছু নেবেন না। কিন্তু সেটাও তো পরিগ্রহ হয়ে গেল। এইটুকু পরিগ্রহ না করলে তাঁর বাকি চারটে ব্রতই নষ্ট হয়ে যাবে। এগুলোকে বলা হয় মহাব্রত।

মহাভারতে আবার কিছু কিছু কাহিনী আছে তাতে একটা বৃত্তির কথা বলা হয়েছে যার নাম শিলঞ্ছবৃত্তি। আগেকার দিনে কিছু ঋষি অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য, অস্তেয়তে এমন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন যে তাঁরা অপরিগ্রহতেও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাহলে তাঁদের শরীর চলত কীভাবে? তাঁরা ক্ষেতে খামারে ঘুরে বেড়াতেন। ফসল কাটার পর ক্ষেতে যে শস্যদানা পড়ে থাকত সেগুলোকে তাঁরা একটা একটা করে তুলে নিতেন। এরপর বাজারে যেতেন, গুদামে চাল-ডালের বস্তা নামানো ওঠানোর সময় এদিকে সেদিক যা দানা পড়ে থাকত সেগুলিকে তিল তিল করে তুলে নিতেন। এইভাবে পনের দিনে যা এক মুঠো দু মুঠো হত, সেটাকে রান্না করে খেয়ে শরীর ধারণ করতেন। এনারা খুব উচ্চমানের ঋষি, সাধারণ মানুষ এই ধরণের তপস্যা করতে পারবে না। সাধারণ মানুষ এই ব্রতগুলিকে নিজের মত সাজিয়ে নিয়ে এই ব্রতের সাথে সেই ব্রত, সেই ব্রতের সাথে এই ব্রতের আপোষ করে নেয়। এটাকে বলে অল্পব্রত বা ব্যবহারিক ধর্ম। ব্যবহারিক ধর্মে পাঁচটি মহাব্রতই পালন করা হয় কিন্তু নিজের সুবিধার মত। সাধারণ মানুষের জীবনে যতক্ষণ সব কিছু ঠিকঠাক চলে ততক্ষণ সব কটি ব্রতই পালন করতে থাকবে। কিন্তু যে মুহুর্তে কোন বিপদ বা কোন অঘটন জীবনে নেমে আসে তখনই সব ব্রত উল্টে পড়ে। ঋষিরা কোন অবস্থাতেই এই ব্রত থেকে চ্যুত হন না। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে সেইজন্য এটাকে বলা হয় ব্যবহারিক ধর্ম। মহাভারতে দুটোকেই, মহাব্রতকেও আলোচনা করা হয়েছে আবার অল্পব্রতকেও আলোচনা করেছে। সেখানে বলছেন পাঁচটি পরিস্থিতিতে মিথ্যা কথা বলতে হয়, কিন্তু এগুলো মহাব্রত নয়, এগুলোকেই অল্পব্রত বলা হয়। ঠাকুর বলছেন, সত্য কলির তপস্যা, কারণ এটিই মহাব্রত। সত্যের সাথে আপোষ একমাত্র হয় অহিংসার সাথে। কিন্তু এই মিথ্যার জন্য তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। অল্পব্রত পালন করলে মানুষ ভালো গৃহস্থ হয়। মহাব্রত পালন করলে মানুষ সাধক হয়।

জীবনে সাফল্য যদি পেতে চান তাহলে আপনাকে মহাব্রতী হতে হবে। মহাব্রতী না হলে জীবনে কখনই সাফল্য আসবে না। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একজন খুব বিখ্যাত মুসলিম শিল্পী ছিলেন, তাঁর জীবনের একটা ঘটনা আছে। উনি বেনারসে থাকতেন। সকাল সাতটার সময় একজন পরিচিত ভদ্রলোক ওনার সাথে দেখা করতে এসেছেন। বাড়িতে তাঁর যে সেবক থাকত সে এসে ভদ্রলোককে বসতে দিয়ে বলল 'সাহবনে অভি গুসল্ নহি কিয়া হ্যায়', সাহেব এখনও বাথরুমে যাননি। ভদ্রলোক বসে আছেন, তাঁকে চা-বিস্কুট দেওয়া হল। আটটা বেজে গেল, জানতে চাইলেন, সেবক এসে বলে দিল 'সাহবনে অভি গুসল্ নহি কিয়া হ্যায়'। নটার সময় আবার জিজ্ঞেস করলেন, সেই একই উত্তর, দশটা, এগারোটা, বারোটা, একটা বেজে গেল, কাজের ছেলেটি এসে বলে যাচ্ছে 'সাহবনে অভি গুসল্ নহি কিয়া হ্যায়', সাহেব এখনও বাথরুমে যাননি। দুটোর সময় এসে বলছে, 'অভি সাহবনে গুসলমে গয়ে'। তারপর কিছুক্ষণ পর উনি দেখা করতে এলেন। দেখা করার পর খুব আনন্দ প্রকাশ করে অভিবাদন করলেন। ওস্তাদজী তাঁকে বলছেন, 'আমার তো আসতে খুব দেরী হয়ে

গেল, কিছু খেয়েছেন তো’। ‘আপনি ও নিয়ে ভাববেন না, সব দিয়েছে। আপনার কি রাত্রে শুতে অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল?’ ‘না! না! টাইমেই শুয়েছিলাম’। ‘তাহলে দুপুর দুটোর সময় বাথরুমে যেতে হল’? ওস্তাদজী তখন বলছেন ‘মেরা ‘সা’ নহি নিকাল রহা থা’। তার মানে, উনি সকালে উঠে সা রে গা করবেন, কিন্তু যতক্ষণ ‘সা’টা ঠিক না বেরোবে ততক্ষণ তিনি বাথরুমে যাবেন না, দাঁত ব্রাশ করবেন না। সেই সকাল থেকে উঠে শুধু ‘সা’ করে যাচ্ছেন, ‘সা’টা ঠিক হচ্ছে না। একটা দেড়টা নাগাদ ‘সা’টা ঠিক ঠিক বেরোল, এরপর উনি বাথরুমে গেলেন, দাঁত ব্রাশ করলেন, স্নান করলেন তারপর বেরিয়ে এলেন। এবার তাঁর দিন শুরু হবে। ইনি হলেন মহাব্রতী। ঠাকুর খানদানী চাষীর গল্প বলছেন, খাল কেটে চাষী ক্ষেতে জল আনবে। যেমনি স্ত্রী এসে বলছে সব তাতে তোমার বাড়াবাড়ি, স্নান করে খেয়ে নাও। স্ত্রীকে চাষী বলছে কেটে ফেলব তোকে খেপী। এ হল মহাব্রতী। ক্ষেতে জল না আনা পর্যন্ত সে স্নান, খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। মহাব্রতী যতক্ষণ কেউ না হয় ততক্ষণ তার জীবনে কিছু হবে না। আমরা সবাই অল্পব্রতী, এই পাঁচটি ব্রতকে আমরা নিজেদের মত সাজিয়ে নিই। এগুলো ব্যবহারিক ধর্ম, ব্যবহারিক ধর্মে যত ভালো হবে সে তত ভালো গৃহস্থ হবে। এর থেকে যারা আরও নীচে তাদের কোন ব্রতই থাকে না। গৃহস্থ জীবনেও যদি আমরা কেউ সাফল্য পেতে চাই তাহলেও তাঁকে মহাব্রতী হতে হবে। বিদ্যার্জন করতে চাইছেন, যেমন আইনস্টাইনের মত ব্যক্তিত্ব, একটাতেই পুরো জীবনটা উৎসর্গ করে দিয়েছেন। এনারা যোগের মহাব্রত হয়ত নেননি কিন্তু কোন একটা জিনিষে পুরো জীবন ঢেলে দিয়েছেন। আধ্যাত্মিক সাধনার পথে যিনি এগোতে চাইছেন, সেখানে মহাব্রতী না হলে সাধনায় এগোন কোন ভাবেই সম্ভব হবে না। মহাব্রতী হওয়ার জন্য যে শক্তি দরকার, যে আঁট দরকার বেশির ভাগ মানুষের সেটা নেই। কেন শক্তি নেই? আস্তিক্য বুদ্ধি নেই। আস্তিক্য বুদ্ধি যতক্ষণ না আসে, শ্রদ্ধা যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ কেউ মহাব্রতী হতে পারবে না। আমরা যতই ধর্মকথা শুনে যাই না কেন, যত শাস্ত্র অধ্যয়ন করি না কেন, মুখে যাই বলি না কেন কিছুই তো আমাদের হয় না, কারণ আমাদের মধ্যে এখনও সেই আস্তিক্য বুদ্ধি উদয় হয়নি। ঠাকুর কথামৃতে যত কথা বলেছেন, সেই কথাগুলি পালন করার জন্য দরকার আস্তিক্য বুদ্ধি, শ্রদ্ধা। আস্তিক্য বুদ্ধি এসে গেলে আর সে ফিরেও তাকাবে না। ঐ একটা জিনিষকে নিয়েই এগিয়ে যাবে, তখন তাকে আর শাস্ত্রও অধ্যয়ন করতে হয় না, লেকচারও শুনতে হয় না। আমাদের সেই শক্তি নেই বলে এই শাস্ত্র সেই শাস্ত্রের মধ্যে ঘুর ঘুর করতে হয়। করতে করতে একদিন হঠাৎ আস্তিক্য বুদ্ধি এসে গেলে সে তড় তড় করে এগিয়ে চলে যাবে। এই আস্তিক্য বুদ্ধিই নচিকেতার ভেতর উদয় হয়েছে। বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে কার কাছে দান করেছেন। বাবা যেন খুব বিরক্ত হয়ে বলে দিলেন তোমাকে যমের কাছে দিলাম। তখন নচিকেতা ভাবছেন, *কিং স্বিদ্ যমস্য কর্তব্যং*। আমাকে যে যমরাজার কাছে পাঠাচ্ছেন, যমরাজ আমাকে নিয়ে কী করবেন! তাঁর কোন কাজে আমি লাগব! কিন্তু তাতে কি আছে, আমি অবশ্যই যমরাজার কাছে যাব। নচিকেতার দৃঢ়তা দেখে বাবার এবার টনক নড়ে গেছে, এতো উল্টে সর্বনাশ হয়ে গেল।

এর আগে কৃষ্ণযজুর্বেদ আর শুক্লযজুর্বেদ কিভাবে এসেছে তার আলোচনা করা হয়েছে। তৈত্তিরীয় শাখা কৃষ্ণযজুর্বেদের খুব নামকরা শাখা। তৈত্তিরীয় শাখার তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও নচিকেতার কাহিনী এসেছে। যজুর্বেদের পরম্পরাতেও যজ্ঞের এই কাহিনী আছে। এতেই বোঝা যায় যজুর্বেদের পরম্পরাতে নচিকেতা একজন কোন বড় ঋষি ছিলেন। ব্যাসদেব যখন বেদের বিভাজন করছিলেন তখনই এই কাহিনী বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল। অন্য দিকে এটাও প্রমাণিত যে কঠোপনিষদ বেদের প্রথম দিককার উপনিষদ, কারণ এতে সমসাময়িক কোন কিছুর বর্ণনা পাওয়া যায় না। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে যেমন নচিকেতার কাহিনী এসেছে অন্য দিকে কঠোপনিষদে নচিকেতাই মূল চরিত্র। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে নদীর ধারে নচিকেতাকে মৃত অবস্থায় দেখানো হয়েছে। কিন্তু এটি একটি আখ্যায়িকা, কাহিনীর সত্য মিথ্যা বিচার করার এখন কোন উপায় নেই। নচিকেতা চলে যাচ্ছেন, বাবার খুব মন খারাপ। শ্রীরামচন্দ্র যেভাবে কৌশল্যা, লক্ষ্মণ, বাবাকে সান্ত্বনা দিয়ে ঠাণ্ডা করেছিলেন, নচিকেতাও সেই ভাবে বাবাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলছেন –

অনুপশ্যযথা পূর্বে প্রতিপশ্য তথাহপরে।
সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবজায়তে পুনঃ।।১/১/৬।।

(বাবা! পূর্ব পূর্ব পিতৃপিতামহগণের এবং বর্তমান সাধুগণের সত্যনিষ্ঠার বিষয় আলোচনা করুন। মানুষ শস্যের ন্যায় জীর্ণ হয়ে মরে আবার শস্যের ন্যায় পুনরায় জন্মায়।)

ছেলে চলে যাচ্ছে, আর ফিরে আসবে না, কারণ তাকে মৃত্যুর কাছে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, দক্ষিণ দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। বাবার প্রচণ্ড মন খারাপ। বাবাকে নচিকেতা সান্ত্বনা দিচ্ছেন। *অনুপশ্যযথা পূর্বে*, হে পিতা! আপনি পেছনের দিকে তাকান। পিতামহ, প্রপিতামহদের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব কি রকম ছিল একবার দেখুন। এনারা ঋষি ছিলেন, মহৎ চরিত্রের ছিলেন। *প্রতিপশ্য তথাহপরে*, বর্তমান ঋষিদেরও দেখুন। তার মানে কঠোপনিষদ যখন রচিত হয়েছিল সেই সময় ভারতবর্ষে প্রচুর ঋষি ছিলেন। আগেকার ঋষি আর ইদানিং কালের ঋষিদের দেখুন, এনারা কোন অবস্থাতেই সত্যকে ছেড়ে দেননি। আচার্য এখানে খুব সুন্দর বলছেন *ন চ তেষাং মৃষাকরণং বৃত্তং বর্তমানং বা অস্তি*, তাঁরা কখনই মিথ্যা বৃত্তির আশ্রয় নেন না। এখানে মিথ্যা কথার আশ্রয় বলা হচ্ছে না, বলছেন মিথ্যা বৃত্তিকে আশ্রয় করে জীবন চালানো। তাঁরা যে কথা দিয়ে দেন সেই কথা থেকে কখনই পিছপা হন না। আগেকার ঋষিদের দেখুন আর ইদানিং কালের ঋষিদের দেখুন তাঁরা কখনই মিথ্যা বৃত্তির আশ্রয় নেন না। আগেকার ঋষিদের কথা নচিকেতা কেন বলছেন? শাস্ত্রে এমন কিছু কিছু জিনিষ আছে যার থেকে শাস্ত্রে অনেক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। মহাভারতে এই দ্বন্দ্বগুলিকে অনেক বেশি করে দেখানো হয়েছে। কোন ব্যাপারে দ্বন্দ্ব এসে গেছে, বিষয়ের মীমাংসা করা যাচ্ছে না, তখন তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে বলেন, তাহলে দেখা যাক এর আগে আগে একই পরিস্থিতিতে কি করা হয়েছিল, মহাজনরা যেটা করে গেছেন সেটাই পথ। দ্রৌপদীর বিবাহের সময়ও এই সমস্যা হয়েছিল। তখন যুধিষ্ঠির পূর্বদৃষ্টান্ত নিয়ে এলেন, *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ* প্রচেতারাও সাত ভাই মিলে একজন নারীকে বিবাহ করেছিলেন। ঐতিহ্যে এই রকম কোন দৃষ্টান্ত আছে কিনা দেখুন, যা তা মানুষের দৃষ্টান্ত নিলে চলবে না, মহাপুরুষরা এই পরিস্থিতিতে কি করেছিলেন দেখুন, মহাপুরুষদের দৃষ্টান্ত নিয়ে আসুন। আমরা সবাই তাই করি। উপনিষদে কোন লোকব্যবহার, ব্যবহারিক ধর্ম, অল্পব্রতের কোন সুযোগ নেই। উপনিষদ সব সময় একেবারে কাঠখোট্টা, মহাব্রত ছাড়া বলবেই না। আগেকার দিনের ঋষি আর ইদানিং কালের ঋষিদের মধ্যে এই ধরণের কোন মিথ্যা বৃত্তির আশ্রয় নেওয়ার দৃষ্টান্ত নেই।

কারণ, *সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবজায়তে পুনঃ*। আমাদের সবারই জীবন শস্যদানার মত। ধান, গম, যব চাষ করা হয়েছে, গাছ বড় হয়ে দানাগুল পরিপুষ্ট হয়ে গেল, এবার খাওয়ার জন্য শস্য কেটে নেবে। যদি নাও কেটে নেয়, ওখানেই ঝরে পড়বে আবার ওখানেই জন্মাবে। উভয় ক্ষেত্রেই মৃত্যু সুনিশ্চিত। মৃষা বৃত্তিকে যদি আমরা আশ্রয় করে থাকি, মিথ্যা আচরণই যদি করতে থাকি আমরা কি পাব? সাময়িক সুখ। এই ব্যাপারে কেউ সন্দেহ করবে না। এখানে নচিকেতা কিন্তু অল্পব্রতীদের কথা বলছেন না, মহাব্রতীদের কথা বলছেন, দৃষ্টান্ত নিয়ে আসছেন ঋষিদের। আগেকার ঋষিদের দেখুন, ইদানিং কালের ঋষিদের দেখুন, কেউ কি মিথ্যা আচরণ করেছেন? কেউই করেননি। কেন করেননি? যদি মিথ্যা আচরণ করে অজর অমর হয়ে যেতেন তাহলে করা যেত। ঠাকুর বলছেন, যদি জানতাম জগৎ সত্য তাহলে কামারপুকুরকে সোনা দিয়ে মুড়িয়ে দিতাম। মিথ্যা বৃত্তি, মিথ্যা আচরণ করে আপনি কী পাবেন? অজর অমর আপনি হবেন না। স্বামীজী বলছেন, চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ হয় না। মহৎ কাজ হবে না কেন, চালাকির দ্বারাও মহৎ কাজ হবে। কিন্তু কদিন দাঁড়াবে? আপনি বলবেন আমার মৃত্যু পর্যন্ত। অবশ্যই আপনার মৃত্যু পর্যন্ত। কিন্ত যেমনি আপনি বললেন আমার মৃত্যু পর্যন্ত, তার মানে আপনি চাইছেন I want to be safe, আমার মৃত্যু পর্যন্ত মানে I want to be good, তাহলে এগুলো দিয়ে কী হবে! মানুষ হল মৃত্যুধর্মা, *সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবজায়তে পুনঃ*, ধান গমের মত জন্মাবে আর মরবে। হে পিতা! আপনি কি এই রকম হতে চাইছেন? আপনি কি অল্পব্রতী? না। কেন না? কারণ আপনার আদর্শ হল আগেকার ঋষি এবং ইদানিং কালের ঋষিরা। স্বামীজী যেমন বলছেন হে ভারতবাসী! তোমার আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। আগে দেখ তোমার আদর্শটা কি। আমার আদর্শ হল পাড়ার মস্তান চ্যাংড়া ছোকরারা। তাহলে তুমিও তাদের মত আচরণ করুন। কিন্তু পাড়ার চ্যাংড়াদের কাহিনী কেউ পড়ে না, কাহিনী তাঁদেরই পড়ে যাঁরা মহৎ ব্যক্তি, যাঁরা এই রকম লড়াই করে করে দাঁড়িয়েছেন। মৃষা বৃত্তি করে কেউই অজর অমর হয়ে যায়নি। মৃষা বৃত্তি করে, চালাকি করে কারুর কোন কাজ পরে চিরদিনের মত প্রসিদ্ধি পেয়েছে? কোন দিন কেউই প্রসিদ্ধি পাইনি। সেইজন্য বাবা! আপনি মন খারাপ করবেন না। আপনার মুখ দিয়ে যে কথা নির্গত হয়ে গেছে সেই কথা সত্যে পরিণত হোক।

আমাদের পরম্পরার কাহিনী আর বর্তমান কালের উপন্যাস লেখার মধ্যে একটা বড় পার্থক্য হল, পরম্পরাগত কাহিনীতে একটা ঘটনা থেকে আরেকটা ঘটনাতে যাওয়ার সময় কয়েকটি মূল কথা বলে বেরিয়ে চলে যাবে, যেখানে ফাঁক থেকে যাবে সেখানে আমাদের নিজের মত পূরণ করে নিতে হবে, যে কাজটা ভাষ্যকাররা করে থাকেন। যার জন্য দেখা যায় উপনিষদের কাহিনীগুলি তিন চারটে বাক্যেই শেষ হয়ে যায়। উপন্যাসে প্রত্যেকটি ছোটখাটো জিনিষকে বর্ণনা করা হয়, চোখের চাহনির বর্ণনাই কয়েক পাতা ধরে চলবে। পরের দিকে সংস্কৃত সাহিত্যেও এই ধরণের বর্ণনার প্রয়োগ করা হয়েছে। এখানে নচিকেতা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এবার কোথায় গেলেন, কিভাবে গেলেন কিছুই বলা নেই। কিন্তু পরের মন্ত্রে গিয়ে আমরা জানতে পারছি নচিকেতা যমলোকে পৌঁছে গেছেন। তিনি হাঁটতে হাঁটতে যমলোকে গেলেন নাকি নদীতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিলেন এত কথা না বলে সরাসরি নচিকেতাকে যমলোকে নিয়ে হাজির করা হয়েছে। যমলোকে যাওয়ার পর সেখানে গিয়ে কি করলেন, কার সাথে দেখা হল কিছুই বলছেন না, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যমলোকে তখন যমরাজ ছিলেন না। যমরাজ কোথায় গেছেন, কেন গেছেন, নাকি দেবতাদের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন কিছুই বলা নেই। আর একদিন নয়, তিন দিন ধরে যমরাজ যমলোকে অনুপস্থিত। নচিকেতা যাওয়ার তিন দিন পর যমরাজ ফিরে এসেছেন। তখন যমরাজকে বলা হচ্ছে। এখানে কাহিনীর মধ্যে বিরাট বড় গ্যাপ। নচিকেতা বাবাকে বলে যমলোকের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। এরপর আর কিছু না বলে সরাসরি কাহিনীকে সেই জায়গাতে নিয়ে আসা হয়েছে যেখানে যমরাজকে বলা হচ্ছে, কারা বলছেন তারও উল্লেখ নেই। আচার্য কিন্তু বলছেন – *প্রোষ্যাগতং যমম্ অমাত্যা ভার্যা বা উচুর্বোধয়ন্তঃ*, যমরাজার মন্ত্রীরা বা তাঁর পত্নীদের কেউ একজন বললেন। এটা আচার্য নিজের তরফে যোগ করছেন। যমরাজার হৈতষীরা যমরাজকে বোঝাচ্ছেন –

বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্।
তস্যৈতাং শান্তিং কুর্বন্তি, হর বৈবস্বতোদকম্।।১/১/৭।।

(ব্রাহ্মণ অতিথি যেন অগ্নিরূপে গৃহে প্রবেশ করেন। পাদ্য, আসন দিয়ে শান্তি বিধান করুন, সুতরাং হে যমরাজ! জল নিয়ে আসুন।)

বিবস্বান সূর্যের এক নাম, তাঁর যে পুত্র তাঁর নাম হল বৈবস্বত। যে কোন লোকের একটা নাম থাকে, নামের সাথে গোত্রের নামটাও থাকে আবার গোত্রের নামের সাথে তার বাবার বা মায়ের নামও থাকতে পারে। সেইজন্য একই লোকের অনেকগুলো নাম হত। অনেক সময় তাই আমাদের সংশয় হয়, এই নামে ঠিক কার কথা বলতে চাইছে। যমরাজকে তাঁর বাড়ির লোকরা বলছেন হে বৈবস্বত! *বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্*, কোন অতিথি যদি গৃহস্থের বাড়িতে প্রবেশ করেন আর সেই অতিথি যদি ব্রাহ্মণ হয়ে থাকেন তখন তিনি অগ্নি রূপে বাড়িতে প্রবেশ করেন। ঐ অগ্নিকে শান্ত করার জন্য *হর*, মানে নিয়ে যাও। কি নিয়ে যেতে বলছেন? *উদকম্*, অর্থাৎ জল। এখনও বাড়িতে কেউ এলে তাকে প্রথমে এক গ্লাশ জল দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। কিন্তু আগেকার দিনে প্রথা অন্য রকম ছিল। ভারতবর্ষ চিরদিনই খুব গরমের দেশ, লোকেরা অনেক দূর থেকে পায়ে হেঁটে কারুর বাড়িতে এসেছেন, হাঁটার জন্য পায়ে ধুলো লেগে আছে, আর গরমে মেজাজও তিরিক্ষি হয়ে আছে, সেইজন্য গ্রাম দেশে প্রথাই ছিল কেই বাড়িতে এভাবে এলে এক ঘটি জল নিয়ে দৌড়ে এসে পা ধুয়ে দেন। কোন মানুষ যখনই কারুর বাড়িতে আসছে, আপনি না চাইতেই এসেছেন আর চেয়েছেন বলেই এসেছেন সেটা পরে দেখা যাবে, কিন্তু সে যখন আপনার কাছে এসেছে তখন তার শরীরে একটা ক্লান্তির ভাব থাকবে আর কোথাও মনের মধ্যে তার একটা অসন্তুষ্টির ভাব থাকবে। যে মানুষ নিজের জায়গায় সন্তুষ্ট থাকে সে কখন নিজের জায়গা ছেড়ে আপনার কাছে আসবে না। এই যে আমরা যে যার নিজের বাড়ি ছেড়ে এখানে একত্র হয়েছি, কোথাও আমাদের ভেতরে একটা অসন্তোষ আছে। কিসের অসন্তোষ? আমাদের মধ্যে যে বিদ্যা যে জ্ঞান আছে আমাদের মনে হচ্ছে এই জ্ঞান বা বিদ্যা পূর্ণ নয়, আমাদের আরও কিছু জানতে হবে। খুব ভালো করে দেখলে দেখা যাবে কোথাও আমাদের মানসিক অসন্তোষ জমে আছে। বাড়িতে যারা আছে, পাড়াতে যারা আছে তারা ভাবছে আমার সব কিছু জানা আছে, নতুন করে আর জানার কিছু নেই, এদের মধ্যে একটা সন্তুষ্টির ভাব এসে গেছে। এই সন্তুষ্টির ভাব তমোগুণ থেকেও আসতে পারে আবার সত্ত্বগুণ থেকেও আসতে পারে। কিন্তু যাদের মধ্যে এখনও রজোগুণের আধিক্য বা মানসিক অসন্তোষ আছে নিজের জায়গায় তারা বেশিক্ষণ স্থির হয়ে থাকতে পারবে না। এখানে বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে বলা হল। কিন্তু আমাদের কাছে যে আসছে, সে যেই হোক, কোথাও তার মধ্যে একটা মানসিক অসন্তোষ আছে। নিমন্ত্রণ করে তাকে ডেকে আনা হলে

সেখানে মানসিক অসন্তোষটা থাকছে না। কিন্তু এছাড়া আর সব ক্ষেত্রে কিছু না কিছু মানসিক অসন্তোষ থাকবেই। শরীরের যে ক্লান্তি সেতো আছেই, তা সে এসি গাড়িতেই আসুক, বাসেই আসুক, শরীরে ঝাঁকুনিটা তো হবে। শরীরের ক্লান্তি দূর করার জন্য তাকে বিশ্রাম দিতে হবে। ইদানিং কালে আমরা পাখা চালিয়ে দেব, কোল্ডড্রিঙ্কস নিয়ে আসব, এসি চালিয়ে দেব কিন্তু আগেকার দিনে এসব ছিল না, তখন ছিল জল।

জাগতিক দৃষ্টিতে একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হল। কিন্তু এর একটা পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ আছে। এই দৃষ্টিকোণ দিয়েই এখানে বলছেন, যিনি ব্রাহ্মণ অতিথি তিনি জ্বলন্ত অগ্নি রূপে বাড়িতে প্রবেশ করেন। শুধু অগ্নি রূপে বলছেন না, বৈশ্বানর রূপে বলছেন। বৈশ্বানর হল যজ্ঞের অগ্নি। এখানে দুটো জিনিষ জানার আছে। প্রথম হল, বেদে অগ্নি দেবতার একটা নাম হল অতিথি। কারণ প্রত্যেক গৃহে অগ্নি দেবতাকে আবাহন করা হয়। বৈদিক যুগে যজ্ঞ দিয়েই সব কিছুর পুর্তি হত, সেই যজ্ঞের জন্য অগ্নিকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হত। সেইজন্য অগ্নি প্রত্যেকে বাড়িতে অতিথি রূপেই আসেন। কিন্তু এখানে পুরো জিনিষটা উল্টে যাচ্ছে। অতিথিকেই এখানে অগ্নি বলা হচ্ছে। অগ্নি দেবতা আর অতিথি, এই দুটো পরস্পর পরিপূরক শব্দ। বেদের অগ্নি দেবতার অনেক নামের মধ্যে অতিথি একটি নাম আর এই মন্ত্রে অতিথিকে অগ্নি বলা হচ্ছে, একেবারে জ্বলন্ত অগ্নি বলছেন। তার মধ্যে আবার বলছেন শুধু অতিথি নয়, ব্রাহ্মণ অতিথি। গীতার ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলছেন আগেকার ব্রাহ্মণদের একটা বিশেষ শক্তি ছিল, সেইজন্য ইদানিং কালের ব্রাহ্মণদেরও সম্মান করা হয়। আচার্য অগস্ত্য মুনির দৃষ্টান্ত এনে বলছেন, অগস্ত্য মুনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি সমুদ্রকে পান করে নিয়েছিলেন, সেইজন্য বর্তমান কালের ব্রাহ্মণদেরও সম্মান করা হয়।

পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা ব্রাহ্মণদের সাথে পুরোহিতদের এক করে ফেলেন। ভারতবর্ষে আর্যরা অশিক্ষিত কখনই ছিল না। অন্য দিকে পুরোহিত শ্রেণীকে ভারত বরাবরই একটু নিচু দৃষ্টিতেই দেখে এসেছে। এখনও পুরুতগিরি করা বলাটা গালাগাল দেওয়ার মত মনে করা হয়। ব্রাহ্মণদের সম্মানের মূলে ছিল ব্রহ্মবিদ্যা। যে বিদ্যার অনুশীলনের দ্বারা ঈশ্বরের সাথে একত্ব স্থাপিত করা যায়, এই ব্রহ্মবিদ্যা একমাত্র ঋষিদের কাছে ছিল। ঋষিরা আত্মোপলব্ধির দিকে বেশি জোর দিয়েছিলেন, সেখান থেকে তাঁদের হাতে ব্রহ্মবিদ্যা এসে গিয়েছিল। ঋষিদের সন্তান বা শিষ্যদের মধ্যে আত্মজ্ঞান লাভ করার সেই ক্ষমতা হয়ত ছিল না, কিন্তু তাই বলে তাঁরা যে একেবারে কিছুই জানতেন না তা নয়। ব্রাহ্মণ রূপে শিষ্যদেরও সম্মান ছিল। পরে ঋষিদের সংখ্যা যেমন যেমন কমতে শুরু করেছে, মানুষের মন যত বহির্মুখী হয়ে গেল, ধীরে ধীরে এই ব্রহ্মবিদ্যাও জ্ঞান রূপে না থেকে শব্দ রূপে ব্রাহ্মণদের কাছে চলে গেল। যার জন্য গীতার সম্বন্ধ ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলছেন, ব্রাহ্মণদের রক্ষা করলেই এই বিদ্যার রক্ষা হয়ে যাবে। কারণ ব্রাহ্মণরাই ব্রহ্মবিদ্যাকে ধরে রেখেছিলেন। সমাজের মানুষ ব্রাহ্মণকে সম্মান করে না, সম্মান করে তাঁর বিদ্যাকে। আমি ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য চেষ্টা না করতে পারি, আমার হয়ত সেই ক্ষমতাও নেই কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যাকে যাঁরা ধরে আছেন তাঁদেরকে আমি অবশ্যই সম্মান করব। ব্রহ্মবিদ্যাকে আগে ঋষিরা ধরে রেখেছিলেন, পরে ব্রাহ্মণরা ধরে রেখেছিলেন আর ইদানিং কালে সন্ন্যাসীরা এই বিদ্যাকে ধরে রেখেছেন। সন্ন্যাসীরা পুরোপুরি ব্রহ্মবিদ্যাতে নিজেদের উৎসর্গ করে দিয়েছেন, এখন বর্ণ রূপে নষ্ট হয়ে যাওয়াতে ব্রাহ্মণরা আর ব্রহ্মবিদ্যাকে ধরে রাখতে পারছেন না।

এখানে বলছেন ব্রহ্মবিদ্যাকে ধরে রেখেছেন এমন বংশের এক ব্রাহ্মণ তোমার গৃহে অতিথি হয়ে যখন আসছেন তখন তিনি এক জ্বলন্ত অগ্নি রূপে আসেন। অতিথি মানেই সে শারীরিক আর মানসিক ভাবে অসন্তোষ ভাব নিয়েই কোন লোকের বাড়িতে আসেন, তার মধ্যে ইনি আবার ব্রাহ্মণ অতিথি। এখানে বলছে না যে নচিকেতাকে দেখেই মনে হচ্ছে সে এক ঋষিপুত্র বা সদ্বংশজাত। কিন্তু নচিকেতা আপনার অতিথি রূপে এসেছে, আর ওর তো কোন দোষ নেই। ওর বাবা আপনার কাছে পাঠিয়েছে, সে এসেছে কিন্তু আপনি বাড়ি নেই বলে তিন দিন অভুক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে জলগ্রহণ করতে বলা হচ্ছে কিন্তু সে কিছুই নিচ্ছে না। আরও যেটা বিচার্য বিষয় তা হল, নচিকেতা যে আপনার কাছে এসেছে, ওর কিন্তু যমলোকে আসার এখনও সময় হয়নি। যদি সময় হয়ে থাকত, তাহলে আপনার দূত বা আপনি নিজে গিয়ে ওকে ধরে নিয়ে আসতেন, তখন সে আর অতিথি হত না। কিন্তু নচিকেতা নিজে থেকে এসেছে, সে অতিথি। ভুলে আসুক আর যেভাবেই আসুক এসে গেছে, সে এখন আপনার অতিথি, আর তিন দিন আপনার জন্য অভুক্ত হয়ে অপেক্ষা করে আছে। সেইজন্য

বলছেন *হর বৈবস্বতোদকম্*, সে এখন জ্বলন্ত অগ্নি রূপে আপনার গৃহে প্রবেশ করেছে, হে যমরাজ! আপনি এক্ষুণি জল নিয়ে আসুন, ওকে ঠাণ্ডা করুন। এর আগে যমরাজার বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যমরাজ হলেন ব্রহ্মার পুত্র, সৃষ্টিতে ব্রহ্মার একটু পরেই এসেছেন, ফলে তাঁর মধ্যে ধর্মভাব খুব উচ্চ, সেইজন্য তাঁকে ধর্মরাজও বলা হয়, তিনি ধর্ম জিনিষটা ভালো জানেন।

এখানে যেমন অতিথি আর ব্রাহ্মণ এই দুটোকে নিয়ে বলা হল আবার অন্য দিকে পরম্পরাগত ভাবে একটা কথা চলে আসছে যে ব্রাহ্মণ যদি অভুক্ত থাকেন বা ব্রাহ্মণ যদি রেগে যান, তিনি কিন্তু তখন আপনার সব পূণ্য নাশ করে দিতে পারেন। এখনও, যেখানে বর্ণপ্রথা বলে কিছু নেই, যাঁরা ব্রাহ্মণ বংশের তাঁরাও কিন্তু অনেক সময় মনঃপূত কিছু না হলে রেগে যান। একজন ফিল্মস্টার কয়েকদিন ধরে এক প্রোডিউসারের কাছে ঘোরাঘুরি করছিল। প্রোডিউসারও তাকে কথা দিয়ে অনেকদিন ঘুরিয়ে শেষে আর সিনেমাতে নেয়নি। পরে ঐ ফিল্মস্টার খুব রেগে গিয়ে বলছে, আমিও ব্রাহ্মণ বংশের আমি যদি অভিশাপ দিয়ে দিই প্রোডিউসারের সব ছবি ফ্লপ করে যাবে। প্রোডিউসার নাকি ভয় পেয়ে পরে তাকে তার ফিল্মে রেখে দিয়েছিল। এই সংস্কৃতি, এটাই আমাদের ঐতিহ্যের একটা বিশেষ মূল্য। আমি যদি জেনে যাই আমি কোন বংশের, আমার পেছনে কি ঐতিহ্য আছে, তখন এটাই আমাকে একটা শক্তি দেবে। এই বিশ্বাসটা আমাদের মনে দৃঢ় ভাবে বসে আছে, যে ব্রাহ্মণদের কাছে ব্রহ্মবিদ্যা আছে, সেই বংশের কাউকে যদি অসন্তুষ্ট করা হয় তাহলে তার যত পূণ্য আছে সব নাশ হয়ে যাবে।

কেন বলছেন *হর বৈবস্বতোদকম্?* আচার্য এখানে বলছেন *যতশ্চকারণে প্রত্যবায়ঃ শ্রূয়তে*, শোনা যায়। কি শোনা যায়? অকরণে প্রত্যবায়। *অকরণে প্রত্যবায়ঃ*, এটি একটি খুব প্রসিদ্ধ শাস্ত্রীয় পরিভাষা। কিছু কর্ম আছে যে কর্মগুলি করলে আমাদের পূণ্য হবে, আবার কিছু কর্ম আছে, যেমন নিত্যকর্ম, নিত্যকর্ম হল *অকরণে প্রত্যবায়ঃ*, নিত্যকর্ম না করলে পাপ হবে। অতিথি সেবা হল অকরণে প্রত্যবায়, অতিথি সেবা না করলে পাপ হবে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলছেন *প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে*, কর্মযোগে প্রত্যবায় হয় না। যতটুকু কর্মযোগের অনুশীলন করা যাবে ততটুকুই ভালো হবে, কিন্তু কর্মযোগ যদি না করা হয় তাতেও কোন প্রত্যবায় হবে না। কিছু কিছু জিনিষ আছে যদি না করা হয় তাহলে পাপ হবে, যেমন ব্রাহ্মণরা যদি সন্ধ্যাবন্দনা না করেন, গায়ত্রী জপ না করেন তাহলে অকরণে প্রত্যবায় হবে। নিত্যকর্মের অর্থই হল অকরণে প্রত্যবায়, নিত্যকর্ম না করলে পাপ হবে। পঞ্চমহাযজ্ঞও অকরণে প্রত্যবায়। অতিথি সেবা এই পঞ্চমহাযজ্ঞের মধ্যে একটি যজ্ঞ, যাকে নৃযজ্ঞ বলা হয়। আচার্য এখানে *শ্রূয়তে* বলছেন, এই রকম শোনা যায়। এটাকেই বলা হয় ঐতিহ্য। পরম্পরাগত ভাবে যেটা শোনা গেছে, সেই বিদ্যার ততটাই মূল্য যতটা শাস্ত্রগত বিদ্যার মূল্য। শাস্ত্রে কোন কিছুকে জানার অনেকগুলো পথের কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে জানার সব থেকে ভালো পথ হল প্রত্যক্ষ, চোখ দিয়ে দেখছেন একটা লোক দেশলাই নিয়ে খেলছিল, সেখান থেকে আগুন লেগে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আপনি জেনে গেলেন আগুন লাগলে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। প্রত্যক্ষের মত আরেকটি পথ হল অনুমান, যেখানে যুক্তি বিচারের সাহায্যে জানা হয়। কিন্তু তৃতীয় পথ হল আগম প্রমাণ, শাস্ত্রে কিছু কিছু কথা আছে, যে কথাগুলো দিয়ে আমরা পরলোকের ব্যাপারে, ধর্মের ব্যাপারে আর মুক্তির ব্যাপারে জানতে পারি। এর মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই আর অনুমান জ্ঞানও থাকে না। যেমনটি শাস্ত্রে বলে দিয়েছে তেমনটি মেনে নিতে হবে। যদি কেউ শাস্ত্র না মানে? সেটা তার সমস্যা, তার উন্নতি হবে না। কিন্তু এখানে কোন যুক্তিতর্ক করা যাবে না, যেমনটি আছে তেমনটি নিতে হবে। অনেক সময় বলা হয় আগম প্রমাণের সাথে ঐতিহ্যের একটা সংযোগ জড়িয়ে থাকে। কিছু কিছু জিনিষ পরম্পরাগত ভাবে আমাদের ঐতিহ্যে চলে আসছে। কথামৃতে ঠাকুর অনেক গ্রাম্যকথা বলছেন, যেমন মুখ খোলসা ভেতর বুঁদ ইত্যাদি যে কথাগুলো বলছেন এগুলোই ঐতিহ্য। এই রকম শোনা গেছে যে যারা বেশি কথা বলে তারা সাধারণত গোলমেলে লোক হয়, আবার যাদের মুখ থেকে একেবারেই কথা বেরোয় না, ভেতরে গজ্‌গজ্ করে এরাও গোলমেলে। এই কথা শাস্ত্রের কোথাও পাওয়া যাবে না, কিন্তু *ইতি শ্রূয়তে*, এমনটি শোনা যায়। প্রচলিত কথা হলেই কি দাম দিতে হবে? অবশ্যই দাম দিতে হবে, প্রচলিত কথারও পুরো দাম আছে। এই যে বলছেন ব্রাহ্মণ অতিথি জ্বলন্ত অগ্নি রূপে গৃহে প্রবেশ করেন, তাঁকে সন্তুষ্ট না করলে সব পূণ্য নষ্ট করে দেবে। কি কি পূণ্য নষ্ট করে দেবে?

আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতাং
চেষ্টাপূর্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্বান্।
এতদ্বৃঙ্‌ক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো
যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে।।১/১/৮।।

(যে গৃহস্থের গৃহে ব্রাহ্মণ অতিথি অনাহারে বাস করেন, সেই গৃহকর্তার আশাআকাঙ্খা, সৎসঙ্গের ফল, প্রিয়বাক্য প্রয়োগের ফল, যজ্ঞের ফল এবং সাধারণের জন্য কূপাদি নির্মাণের মত ক্রিয়াজনিত ফল এবং পুত্র ও পশু সবই বিনষ্ট হয়।)

যমরাজার লোকেরা বলছেন, আমরা বড়দের কাছে শুনেছি, ব্রাহ্মণ যদি অতিথি রূপে গৃহে আসেন তখন তিনি জ্বলন্ত অগ্নি রূপে আসেন। কেন জ্বলন্ত অগ্নি বলা হয়? ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কাজ করেন, অগ্নিও পুরোহিতের কাজ করেন আর অগ্নিকে অতিথি বলা হয় এবং অতিথিকেও অগ্নি বলা হয়, তাই ব্রাহ্মণ অতিথি হলেন জ্বলন্ত অগ্নি। জ্বলন্ত অগ্নি যদি উনুনে না জ্বলে উনুনের বাইরে কোথাও জ্বলতে থাকে তাহলে বিপদ। আগুন মানেই তাকে সব সময় খুব সাবধানে, সতর্ক দৃষ্টিতে রাখতে হবে। ঠিক তেমনি ব্রাহ্মণ অতিথি এলে তাঁকেও খুব সামলে রাখতে হবে। ব্রাহ্মণ অতিথিদের সেবা করলে যে কোন পূণ্য হবে তাও নয়, হতে পারে যদি তিনি খুশী হয়ে কোন বর দিয়ে দেন। সমস্যা হল অকরণে প্রত্যবায়, সেবা যদি না করা হয় তাহলে একেবারে ভস্ম করে দেবে। গৃহস্থকে এই সেবা করতেই হবে। এখানে একবারও বলছেন না যে হে যমরাজ আপনি যদি করেন আপনার কিছু ভালো হবে, কিন্তু না করলে এই এই অনর্থ হয়ে যাবে।

প্রথম কি অনর্থ হবে? *আশাপ্রতীক্ষে*, মানুষ যে কর্মই করে, সেই কর্মের কিছু ফল পায়। কিছু ফল আছে যা ইতিমধ্যে পেয়ে গেছে, আর কিছু ফল আছে যা পরে পাবে। যে ফল পরে পাবে তার আবার দুটো ভাগ – আশা আর প্রতীক্ষা। আশা হল যে ফল কখন চোখে দেখা যায় না। আচার্য এর স্বর্গাদি অর্থ করছেন। মা ছেলেকে বড় করছে, মা আশা করে ছেলে বুড়ো বয়সে আমাকে দেখবে। আশা হল যে ফলটা ভবিষ্যতের অনেক দূরে রয়েছে কিন্তু মনে ভাবছে আমি এই ফল পাব। যজ্ঞাদি বা পূণ্য কর্ম করার সময় ভাবে মৃত্যুর পর আমার স্বর্গপ্রাপ্তি হবে। এটাকে বলছেন আশা, আচার্য একে বলছেন *অনির্জ্ঞাত*, যেটার ব্যাপারে জানা নেই। স্বর্গলোক, ব্রহ্মালোক, পিতৃলোক বলে কিছু আছে কিনা আমাদের জানার কোন উপায় নেই। আমি যতদিন বেঁচে আছি তত দিন আমার ছেলে বেঁচে থাকবে কিনা তার কি নিশ্চয়তা আছে! কিন্তু আমাদের একটা আশা থাকে।

প্রতীক্ষা, যেটার ব্যাপারে আমি জানি যে আমি এটা পেতে যাচ্ছি। আমি চাকরি করি, আমি জানি পয়লা তারিখ আমার ব্যাঙ্ক এ্যকাউন্টে এত টাকা ক্রেডিত হতে যাচ্ছে। লোকে চাষ-বাশ করেছে, ফসল কাটার সময় হয়ে গেছে, সে জানে আমি এই ফসল এবার পাব। এটা হয়ে গেল প্রতীক্ষা। কিন্তু চাষ করার শুরুতে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে কিগো ফসল এবার কেমন হবে, তখন বলে আশা করছি এই রকম ফসল হবে। কিন্তু ফল একেবারে প্রাপ্তব্য অবস্থায় চলে এসেছে, এবার হয়ে গেল প্রতীক্ষা। যখনই কোন কর্ম করা হয় তখন কর্ম দুটো আকার নিয়ে নেয়, একটা আশা, যে ফল আমি পাইনি আরেকটি প্রতীক্ষা, যে ফল আমি পেতে যাচ্ছি, আমি নিশ্চিত যে আমি এই ফল পাব। প্রথমে আসে আশা, তারপরে আসে প্রতীক্ষা। এটা হল জাগতিক দৃষ্টিতে, কিন্তু শাস্ত্রের দৃষ্টিতে আশা মানে যেটার ব্যাপারে কখনই জানা যায় না, যেমন স্বর্গপ্রাপ্তি আদি। কিন্তু জাগতিক জিনিষগুলো হয়ে গেল প্রতীক্ষা। আমি অপেক্ষা করে আছি কবে আমার ছেলে বড় হবে, এটাকে কখন আমরা আশা বলি কখন অপেক্ষা বলি। এই আশা আর প্রতীক্ষা দুটোই পুরো নষ্ট হয়ে যায়।

শুধু যে আশা আর প্রতীক্ষাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তা নয়। সাথে সাথে বলছেন *সঙ্গতং*, অর্থাৎ ঐ ফলগুলো পেলে যে আনন্দটা হওয়ার সেটা হবে না আর ওর সাথে যে ফলটি পাবে সেই ফল থেকে কোন সুরাহা হবে না। কোন কারণে আপনি হয়ত পেয়েও গেলেন, কিন্তু *সঙ্গতং*, ওর সঙ্গে ফলটা যে কাজে লাগাবে সেটা আর হবে না। একটা কাহিনী আছে, যে কাহিনী বিদেশীরা একভাবে বলেছে কিন্তু স্বামীজী অন্য ভাবে বলেছেন। স্বামীজী যেভাবে বলছেন তা হল, এক দম্পত্তির দুজনেরই নাক চ্যাপ্টা ছিল, দুজনই চাইছে কি করে নাকটা ঠিক হয়ে যায়। ওদেরকে তিনটে বর দেওয়া হল। প্রথম বরে চাইল আমার নাক যেন লম্বা হয়ে যায়। এবার তার সারা শরীরে লম্বা লম্বা নাক বেরিয়ে গেছে। সুন্দর নাক পেল ঠিকই কিন্তু একটা জিনিষের প্রাপ্তিতে যে আনন্দ হওয়ার কথা সেই আনন্দ তো হলই না উপরন্তু আরও সর্বনাশ হয়ে গেল, লোকেদের সামনে যেতেও

পারছে না। মহা সমস্যা হয়ে গেল। আরও দুটো বর বাকি আছে, তাই দ্বিতীয় বরে বলল আমাদের নাকটা যেন চলে যায়। নাক চলে যেতে বলতেই সব নাক চলে গেলে ঠিকই কিন্তু আসল যে নাকটা ছিল সেটাও তার সাথে উড়ে গেছে। শেষে একটা বর বেঁচে থাকল, তখন বলল যেমনটি ছিল তেমনটিই যেন হয়ে যায়। এরপর সেই বোঁচা নাকটাই আবার থেকে গেল আর মাঝখান থেকে তাদের তিনটে বরই বেকার হয়ে গেল। এটা একটা অন্য কাহিনী, কিন্তু এখানে বলছেন একটা জিনিষ যদি আপনি পেয়েও যান কিন্তু তার থেকে যে আনন্দ পাওয়ার কথা সেই আনন্দ আপনি পাবেন না। বিদেশী কাহিনীতেও ঠিক এই ধরণের একটা ঘটনার কথা বলা হয়েছে। একজন লোক মজা করে বলছে, দেখি তো এক ঘন্টার মধ্যে আমি লাখ টাকা পাই কিনা। আর ঠিক এক ঘন্টার ভেতরে কারখানার মধ্যে একটা বিকট শব্দ হতেই সাইরেন বাজতে শুরু হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে কারখানার কর্তৃপক্ষ এসে বলছে আপনার ছেলে কারখানার এই দুর্ঘটনায় মারা গেছে আর এই এক লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে আপনাকে দিয়ে গেলাম। এক লাখ টাকাটা পেয়ে গেল ঠিকই কিন্তু ছেলেটা তো মারা গেল, এক লাখ টাকা নিয়ে সে কি করবে! মা হাউ হাউ করে কাঁদছে আর বলছে আমার টাকা চাই না, টাকা চলে যাক আমার ছেলেকে ফেরত চাই। ছেলেকে ইতিমধ্যে কবর দিয়ে দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া এসে টেবিলে যে লাখ টাকার চেক রাখা ছিল সেটা উড়ে কোথায় চলে গেল জানা গেল না, আর তার মধ্যেই দেখছে কবর থেকে ছেলে এক বিকট চেহারা নিয়ে বাবা-মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আপনি পেয়ে গেলেন ঠিকই, কিন্তু পাওয়ার সাথে যে *সঙ্গতং*, বস্তুর সঙ্গ লাভে যে আনন্দ সেই আনন্দটা আর পেলেন না। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন, একজন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে, আমি যেন নাতিকে সোনার বাটিতে দুধ-ভাত খাওয়াতে পারি। এরপর আপনি নাতি পেলেন টাকা পেলেন না, টাকা পেলেন নাতি পেলেন না, আপনি একটা নিয়ে কী করবেন! এটাই *সঙ্গতং*, এই *সঙ্গতং* নাশ হয়ে যাবে।

সূনৃতাং চ, তার সাথে মিষ্টভাষী হওয়ার যে ফল সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। কিছু মানুষ আছে যারা সব সময় ক্যাট্ ক্যাট্ করে রুক্ষ ভাবে কথা বলে, বুঝতে হবে এদের পূণ্য নষ্ট হয়ে গেছে। যারই পূণ্য নষ্ট হয়ে গেছে তার কথায় মিষ্টতা থাকবে না, ব্যবহারেও মিষ্টতা হবে না। পূণ্য নাশ হয়ে গেছে বলে ওর স্বভাবটাও খিটখিটে হয়ে গেছে। খিটখিটে মানে তার মিষ্ট বাণী নষ্ট হয়ে গেছে, ব্যবহারের মধ্যেও মাধুর্য থাকবে না। মনের ভেতর আনন্দ থাকলে তবেই তো তার ব্যবহারটা ভালো হবে। যদি ব্যবহারে মাধুর্য থাকে, কথায় যদি মিষ্টতা থাকে, তাহলে বুঝতে হবে এর পূণ্য আছে। শ্রীমাকে একজন ভক্ত বলছেন, মা! আশীর্বাদ করুন ঈশ্বরের নাম নিতে নিতে আমি যেন পাগল হয়ে যেতে পারি। শ্রীমা তাকে বলছেন, সেকি বাবা! কত পাপ করলে মানুষ পাগল হয়। যদি দেখা যায় মস্তিষ্কে বিকৃতি এসে গেছে তার মানে তার অনেক পাপ কর্ম আছে। এই পর্যন্ত বলছেন যে কি কি নাশ হচ্ছে – তার আশা শেষ, প্রতীক্ষা তার শেষ, তার সাথে *সঙ্গতং* বা দুটো সঙ্গের জন্য যে আনন্দ হয় সেটা শেষ আর *সূনৃতাং*, মিষ্টি বাণী স্ফুরিত হওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

এই চারটের সাথে বলছেন *ইষ্টাপূর্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্বান্*। *ইষ্টাপূর্ত*, বাড়িতে উপনয়নের অনুষ্ঠানে আপনি একটা যজ্ঞ করলেন আর এই যজ্ঞের একটা ফল আছে, এই ফলকে বলে ইষ্ট। আর পূর্ত, লোকেদের জন্য পুকুর কাটিয়ে দেওয়া, রাস্তা তৈরী করে দেওয়া, বৃক্ষাদি রোপণ করা এই কাজগুলোকে বলা হয় পূর্ত। ইষ্টকর্মে কিছু পূণ্য ফল পায় আর পূর্ত কর্ম করলে তারও কিছু পূণ্য ফল পায়। ইষ্টা আর পূর্ত হল *আত্মনোমোক্ষার্থ*। স্বামীজী আসার পর আমরা এখন খুব সচেতন হয়ে বলছি সবার মঙ্গলের জন্য, দেশের মানুষের ভালোর জন্য আমাদের সমাজসেবা করতে হবে, কিন্তু ইষ্টাপূর্তের ধারণা প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। কিন্তু তখনকার সময় *আত্মনোমোক্ষার্থং* ঠিক অতটা উচ্চস্তরে ছিল না, কারণ তাঁদের কাছে স্বর্গপ্রাপ্তিই বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। কেউ যদি বলে আমার জন্য ইষ্ট হল আত্মজ্ঞান, তখন সে যা করছে সেটাই ইষ্ট। আর পূর্ত হল জগদ্ধিতায়, অপরের ভালোর জন্য। ইষ্টাপূর্ত খুব প্রাচীন ধারণা। স্বামীজী নতুন কিছু বলছেন না, কিন্তু এর প্রভাবকে আলাদা ভাবে রূপ দিলেন। ইষ্টাপূর্তকে জোর দিতে গিয়ে স্বামীজী নতুন যুগের জন্য, নতুন ভাবে, নতুন শক্তি দিয়ে, নতুন উৎসাহ নিয়ে সামনে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু বেদের সময় থেকেই ইষ্টাপূর্তের ধারণা চলে আসছে। ইষ্ট হল নিজের মঙ্গল আর পূর্ত মানে, যেটা দিয়ে অপরের মঙ্গল হচ্ছে কিন্তু তার ফল তুমিও কিছু পাচ্ছ। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন যে হাসপাতাল, ডিসপেন্সারী, স্কুল, বন্যাত্রাণ চালাচ্ছেন এই কাজগুলোকে স্বামীজী পূর্ত রূপে না নিয়ে শিবজ্ঞানে জীবসেবা রূপে নিতে বলছেন। শিবজ্ঞানে বললে এগুলো আর পূর্ত থাকছে না, কিন্তু জগদ্ধিতায়

বললে আবার পূর্ত এসে যাবে। একেবারে শুরুতে যারা এই ধরণের কাজ করে তারা ভাবে এতে লোকের কিছু ভালো হবে। কিন্তু যত আধ্যাত্মিক বিকাশ হতে থাকবে বা যদি কারুর ভেতর খুব বড় একটা আদর্শ রয়েছে তখনই সে শিবজ্ঞানে কাজ করার দিকে সেই ভাবে এগোতে থাকবে। কিন্তু যাঁরা আধ্যাত্মিক রাজ্যে অনেক এগিয়ে গেছেন তাঁদের কাছে ইষ্টাপূর্ত খসে গিয়ে একমাত্র শিবের পূজার ভাবটাই থাকে।

উপনিষদ বেদেরই অঙ্গ, বেদ মানেই শুধু যজ্ঞ আর যজ্ঞ। যজ্ঞে কিছু জিনিষ আশা রূপে আসছে, কিছু আবার প্রতীক্ষা রূপে আসছে, কিছু মৃদু রূপে আসছে, কিছু ইষ্ট রূপে আসছে আবার কিছু পূর্ত রূপে আসছে। এর সব ফল আর তার সাথে *পুত্রপশূংশ্চ*, পুত্র, পশুধন যা কিছু আছে সব নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু যিনি রাজা তাঁর কত জমি-জায়গা, কত রকমের পশু আছে, হাতি, ঘোড়া, গরু, মোষ আছে, ধীরে ধীরে সব নাশ হয়ে যাবে। কেন নাশ হয়ে যাবে? সাধারণ এক ব্রাহ্মণ, যিনি গৃহে অতিথি হয়ে এসেছেন, তাঁর সেবা যদি না করা হয়।

সব কিছুকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা বর্তমান কালে আমাদের একটা স্বভাব হয়ে গেছে, তুমি এমনটি করেছ তাই তোমার এই রকম হয়েছে। এর পেছনে একটা কারণই থাকে না, অনেকগুলো কারণ জড়িয়ে থাকে। কার অভিশাপ কোথা থেকে লাগছে আমরা জানি না। আপনি কাউকে কুপিত করে দিয়েছেন, কুপিত করাটা ঠিক হয়নি। ঐ কোপের জন্য অজান্তায় আপনাকে মেরে শেষ করে দিচ্ছে। সেইজন্য *ইতি শ্রূয়তে*। কেমনটি শোনা গেছে? আচার্য এখানে বলছেন *তস্মাদনুপেক্ষণীয়ঃ সর্বাবস্থাস্বপি অতিথিরিত্যর্থঃ*। তোমার যা দুরবস্থাই থাকুক সর্বাবস্থায় অতিথিকে সেবা করবে, অতিথিকে কখনই অবহেলা করবে না। মহাভারতেও এই কথা যুধিষ্ঠিরকে ঋষি বলছেন, অতিথিকে তুমি কোন অবস্থাতেই অবহেলা করবে না। বাড়িতে বসার কিছু নাও থাকে এক টুকরো কুশ দিয়ে তাকে বসতে দেব, জলও যদি দেওয়ার ক্ষমতা না থাকে দুটো মিষ্টি কথা বলবে। অতিথি যে অগ্নি রূপে তোমার গৃহে প্রবেশ করেছে এই অগ্নিকে যদি শান্ত না করতে পার তাহলে তোমার সব পূণ্য নাশ হয়ে যাবে।

এই কথাগুলো যমরাজকে বলা হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু কে বলছেন বোঝা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই যমরাজের হিতৈষী যিনি তিনিই এই কথা বলবেন কারণ তিনি যমরাজের মঙ্গল চাইছেন। হতে পারে তিনি অমাত্য বা মন্ত্রী বা যমরাজের স্ত্রীদের কেউ। যাই হোক এইসব কথা শুনে যমরাজ কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেছেন। আজ পর্যন্ত কেউই তাঁর রাজ্যে অপ্রত্যাশিত ভাবে উপস্থিত হয়নি। দেবতারা অনেক সময় অতিথি রূপে আসেন কিন্তু মনুষ্যলোক থেকে এভাবে কেউ এর আগে আসেনি, কিন্তু নচিকেতা সময় না হতেই অপ্রত্যাশিত ভাবে যমরাজার রাজ্যে হাজির হয়ে গেছেন। এবার আমরা কল্পনা করে নিচ্ছি, যমরাজ নচিকেতাকে ডাকলেন, ডেকে কাছে বসালেন, বসিয়ে বলছেন –

তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে মেহ
নশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যাঃ।
নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেঽস্তু
তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব।।১/১/৯।।

(যম বললেন – হে ব্রাহ্মণ! তুমি আমার অতিথি এবং নমস্য, অথচ তিন রাত্রি আমার গৃহে অনাহারে বাস করেছ। এর জন্য আমি তোমাকে নমস্কার করছি, আমার যেন মঙ্গল হয় আর প্রতি রাত্রির জন্য তুমি একটি করে তিনটি বর প্রার্থনা কর।)

যমরাজ নচিকেতাকে নমস্কার জানাচ্ছেন। যমরাজের কত বিনয়! অনেক বড় বড় অফিসার আছেন, তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়ে যদি কাউকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়, পরে এসে তিনি ক্ষমা চেয়ে নেন, আপনাকে এতক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। যমরাজ বলছেন, এই যে আপনি তিন দিন আমার বাড়িতে অভুক্ত অবস্থায় ছিলেন এতে আমার অমঙ্গল হবে, এই যে আপনাকে নমস্কার করলাম, আপনার সামনে বিনয়পূর্বক দাঁড়ালাম, আমি আশা করছি আপনার শুভদৃষ্টিতে আমার সব অমঙ্গল কেটে যাবে। যমরাজ আশা করছেন নচিকেতা তাঁকে ক্ষমা করে দেবেন। সব সময় যে সামনের লোক ক্ষমা করে দেবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই, কিন্তু ওটাকেই মেনে নিতে হয়, তখন কিছু করার থাকে না। আপনি হয়ত মনে করতে পারেন আমি ক্ষমা চাইলাম, নিজের ভুল স্বীকার করে নিলাম, তাও ক্ষমা করতে পারছে না! যান যান আপনাকে ক্ষমা করতে হবে না। আপনি কিন্তু এতেও বাঁচবেন না, যে করেই হোক তাঁকে শান্ত করতে হবে। অযৌক্তিক ভাবেই হোক আর

যে ভাবেই হোক সে যদি আপনার অশুভ চিন্তা করতে থাকে তাতে আপনার কিন্তু ক্ষতি হবেই। ঠাকুর বলছেন, যে ঈশ্বরের পথে এসে গেছে একমাত্র তারই কোন বিঘ্ন হবে না, বাকি সবারই বিঘ্ন হবে। সেইজন্য সবাইকে তুষ্ট রাখতে হয়। যমরাজও তাই খুব মিষ্টি করে বলছেন *তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃনীষ্ব*, আমি যে আপনাকে এভাবে নমস্কার করলাম, আমি যে বললাম আপনার প্রতি আমাদের অন্যায় হয়ে গেছে, আশা করি এতে আপনার কোপ শান্ত হয়ে যাবে। আপনার শান্ত ভাব অবলম্বনের জন্য আমার যে অশুভ হওয়ার সম্ভবনা তৈরী হয়েছিল সেটা নাশ হয়ে যাবে। কিন্তু এবার আমি আমার আনন্দের জন্য আপনি যে তিন রাত্রি এখানে অভুক্ত ছিলেন প্রত্যেকটি রাত্রির জন্য আপনাকে আমি তিনটে বর দিচ্ছি।

এখানে আবার দুটো জিনিষ আসছে। একটা হল আমার যে অমঙ্গল হতে যাচ্ছিল সেটা যেন কেটে যায়, আমি জানি আপনি খুশী হলে এই অমঙ্গল কেটে যাবে বা ইতিমধ্যে কেটে গেছে। এগুলো হল ভদ্রতাপূর্ণ উক্তি, যেমন বলা হয় – আমি জানি এই যে আপনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন তাতেই আমার যত পাপ হওয়ার ছিল সব নাশ হয়ে গেল। দ্বিতীয় হল, আমার আনন্দের জন্য, আমি আপনাকে কৃতার্থ করছি না, আমার নিজের আনন্দের জন্য আপনার ইচ্ছা মত আমার কাছে থেকে তিনটে বর চেয়ে নিন। শ্রীমা দক্ষিণ ভারতে গেছেন। সবাই জানেন শ্রীমা হলেন স্বামী বিবেকানন্দের গুরুপত্নী। ওখানকার রাজা শ্রীমাকে সব রকম ভাবে সেবা যত্ন করেছেন, যাতে কোন ত্রুটি না থাকে। তারপরেও রাজার প্রাণ যেন পরিতৃপ্ত হতে চাইছে না, আদেশ দিলেন, আমাদের খাজানাটা খুলে দেওয়া হোক, মা সব ঘুরে ঘুরে দেখুন আর ওনার যা পছন্দ হবে নেবেন। শ্রীমা বলে দিলেন আমার কিছু লাগবে না, রাধুর যদি কিছু পছন্দ হয় তো বলুক। রাধু তখন ছোট। বলার পর শ্রীমা ভয়ে কাঁপছেন, ঠাকুর হলেন ত্যাগের বাদশা, স্বামীজী তাঁর শিষ্য, এরা আবার স্বামীজীর মত লোকের শিষ্য, রাধু যদি কিছু চেয়ে বসে! হে ঠাকুর! রাধুর মনকে ঘুরিয়ে দাও, রাধুর মনে যেন কোন লোভ না আসে। রাধুর হঠাৎ মনে হল তার লেখার পেন্সিলটা হারিয়ে গেছে। রাধু সঙ্গে সঙ্গে বলছে – আমার লেখার পেন্সিলটা হারিয়ে গেছে, একটা পেন্সিল পেলেই আমার হয়ে যাবে। যমরাজার কাছে এখানে গুরুত্ব হল, আমি আমার তরফ থেকে সব করে দিয়েছি, আপনাকে বসালাম, নমস্কার জানালাম, জল দেওয়া হল, ক্ষমা চাইলাম, আমি জানি এবার আপনি প্রসন্ন হয়েছেন আর আপনি প্রসন্ন হওয়াতে আমার সব পাপ নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু আমার আনন্দের জন্য আপনার ইচ্ছানুযায়ী আপনাকে তিনটে বর নিতে হবে। এখানে গুরুত্ব হল আমার আনন্দের জন্য। মনুস্মৃতিতেও আছে, যখন কোন উপহার বা দান দেওয়া হয় তখন যিনি দিচ্ছেন তিনি কৃতজ্ঞ, কারণ যাঁকে দেওয়া হচ্ছে তিনি সেটা গ্রহণ করলেন। যখন কাউকে আমি কিছু দিচ্ছি তখন আনন্দটা আমার। আবার যাঁকে দেওয়া হচ্ছে তিনিও নিজেকে ধন্য মনে করেন, কারণ আপনি আমাকে দানের জন্য সৎপাত্র মনে করেছেন। এখানে নচিকেতা আর যমরাজের একই সম্পর্ক। কাউকে উপহার বা দান দেওয়ার সময় বা খাতির করার সময় এটাই ঠিক ঠিক পদ্ধতি। এবার আচার্য শঙ্কর নয় নম্বর মন্ত্রের সাথে দশ নম্বর মন্ত্রের যোগসূত্র স্থাপন করে বলছেন – *নচিকেতাস্তু আহ – যদি দিৎসুর্বারান্*, নচিকেতা বললেন, যদি আপনি আমাকে বর দিতে চান, তাহলে আমাকে এই বর দিন –

শান্তসঙ্কল্পঃ সুমনা যথা স্যাদ্-
বীতমন্যুর্গৌতমো মাহভি মৃত্যো।
ত্বৎ-প্রসৃষ্টং মাহভিবদেৎ প্রতীত
এতৎ ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে।।১/১/৯।।

(নচিকেতা বললেন – হে যমরাজ! তিনটি বরের মধ্যে আমি প্রথম এই বর চাইছি যে, আমার পিতা গৌতম যেন আমার সম্বন্ধে উৎকণ্ঠাশূন্য এবং আমার প্রতি প্রসন্নমান ও ক্রোধশূন্য হন; এবং আপনা-কর্তৃক বিনির্মুক্ত আমাকে তিনি চিনতে পেরে আমাকে সাদর সম্ভাষণ করেন।)

নচিকেতা বলতে চাইছেন যে, আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে আমার এখনও এখানে আসার সময় হয়নি, আপনি আমাকে আপনার সেবক রূপে না রেখে আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। আমাকে যদি বাবার কাছে ফেরতই যেতে হয় তাহলে আমি যাওয়ার আগেই পিতা যেন শান্তসঙ্কল্প হয়ে যান আর ক্রোধরহিত হয়ে যান। আর তাই না, আমি যখন ফেরত যাব তিনি যেন তখন আমাকে চিনতে পারেন আর আমার সাথে আগের মতই স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্তা করেন।

এই একটি মন্ত্রে অনেকগুলো ব্যাপার জড়িয়ে আছে। বলা হয়, মানুষের যে আনন্দের ভাব, খুশীর ভাব এর মধ্যে অনেক কিছু জড়িয়ে থাকে। উপনিষদে কাহিনী খুব সংক্ষিপ্তাকারে দেওয়া হয়, বেশি কিছু বলা হয় না, কিন্তু আমরা মেনেই চলছি যে, নচিকেতা বুঝতে পেরেছেন যে যমরাজ বুঝে গেছেন বাবা তাঁকে রাগবশতঃ বলে দিয়েছিলেন, সেইজন্য যমরাজ নচিকেতাকে যমলোকে না রেখে বাবার কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। আমাকে যদি বাবার কাছে ফেরত পাঠিয়েই দেওয়া হয়, আমি ফিরে গিয়ে বাবাকে কিভাবে দেখব আর বাবা আমাকে কিভাবে গ্রহণ করবেন। সেইজন্য নচিকেতা বলছেন, আমার প্রতি বাবার যে রাগ উৎপন্ন হয়েছিল সেই রাগ যেন আর না থাকে, তিনি যেন প্রসন্নচিত্ত ও ক্রোধশূন্য হয়ে যান, আমাকে যেন চিনতে পারেন আর আমার সাথে যেন কথা বলেন। আনন্দ বা প্রসন্নচিত্তের কত রকম রূপ হতে পারে এখানে তারই বর্ণনা করছেন।

প্রথমে বলছেন *শান্তসঙ্কল্পঃ*, মনের মধ্যে নানান রকমের সঙ্কল্প বিকল্প, নানা রকমের চিন্তা ভাবনা চলছে, আমি তো আমার ছেলেকে যমের কাছে পাঠিয়ে দিলাম, ছেলে এখন ওখানে কি করছে কে জানে। সঙ্কল্প-বিকল্প হওয়া মানে মনের মধ্যে একটা আলোড়ন চলছে, মন অশান্ত হয়ে আছে, বাবার এই অশান্ত মন যেন শান্ত হয়ে যায়। মানুষকে যদি কোন বর দেওয়া হয়, বা যদি কোন সুযোগ আসে সে তখন প্রথমেই চাইবে তার পারিপার্শ্বিকটা যেন ঠিকঠাক থাকে। আমরা সবাই চাই আমার আশে-পাশের সবাই যেন শান্ত থাকে, সুস্থ থাকে। ঠাকুর দুই সাধুর গল্প বলছেন, দুজন সাধু শহরে গেছে। এক সাধু শহরে এসে রোশনাই দেখে যাচ্ছে, আরেকজন সাধু তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন – বাসা পাকড়েছ? যেখানে তোমাকে বাস করতে হবে সেই জায়গাটার ঠিকঠাক ব্যবস্থা করেছ কিনা। বাসা পাকড়ানো মানে, যেখানে আমি আছি সেটা যেন ঠিক থাকে। নিজের বাসস্থানটা যদি অশান্তির আখড়া হয় তাহলে কোন কিছুই ঠিকঠাক চলবে না। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো, ঘরের খাচ্ছি কিন্তু জঙ্গলে গিয়ে মোষ তাড়াচ্ছি, আসলে বলতে চাইছেন আগে নিজের ঘরটাকে ভালো করে সামলাও, তারপর অন্য যা কিছু করার কর। হাজরা মশাই দক্ষিণেশ্বরে বসে জপ করছেন, অন্য দিকে দেশের বাড়িতে তার মা কাঁদছেন, বাড়িতে কতকগুলি দেনা আছে, তার কোন সমাধান করছেন না, এদিকে বসে বসে জপ করছেন। এভাবে ধর্ম হয় না, আগে নিজের ঘর সামলাতে হবে। তবে যিনি পুরোপুরি ঈশ্বরের পথে বেরিয়ে গেছেন তাঁদের আর কিছু ভাববার নেই, এরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন। আচার্য শঙ্করও বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় গর্ভধারিণীর চোখে জল দেখে বলছেন – মা! আমি কথা দিচ্ছি তোমার শেষ সময়ে আমি তোমার কাছে আসব। ঠাকুর যিনি ত্যাগের বাদশা, ঈশ্বর বৈ কিছু জানেন না তিনিও বৃন্দাবনে গিয়ে যখন ভাবছেন এখানেই থেকে যাবেন তখন তাঁর মনে পড়ল দক্ষিণেশ্বরে মা রয়েছেন, তিনি আর বৃন্দাবনে থাকলেন না। বাসা পাকড়ানোর মধ্যেই এগুলোই অন্তর্ভুক্ত। একবার ঠাকুর কলকাতায় আসছেন, আসার পথে দেখছেন লাটু মশলার বেটুয়া সঙ্গে আনতে ভুলে গেছেন। ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বলছেন আমি সব সময় সমাধিতে থাকি, কাপড়ের ঠিক থাকে না কিন্তু তাও কোন কিছুতে ভুল হয় না।

জীবনের এই মৌলিক ব্যাপারগুলিতে যে সচেতন নয় তাকে কোন ব্যাপারেই ভরসা করা যায় না। তুমি নিজের বাড়িকে সামলাতে পারছো না, নিজেকে সামলে রাখতে পারছো না, ঈশ্বরকে কী করে সামলাবে! নচিকেতা এখানে ঠিক তাই করছেন। উনি জানেন আমাকে এখন বাড়ি ফিরে যেতে হবে, তাই প্রথম কাজ হল বাড়িটা ঠিক করা। বাড়ি কিভাবে ঠিক করতে হবে? *শান্তসঙ্কল্পঃ সুমনা যথা স্যাদ্*। এখানে বাবার অনেক কিছু জড়িয়ে আছে। বাবা যেন ঠিক থাকে, দ্বিতীয় আমার উপর বাবার প্রভাব যেন ঠিক থাকে। আমার জন্য বাবা উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন, বাবা যেন শান্ত হয়ে যান। কখন শান্ত হবেন? এক্ষুণি, এই মুহুর্ত থেকেই উনি যেন আর কোন দুশ্চিন্তা না করেন। ছেলে প্রথম সাইকেল নিয়ে স্কুল যাচ্ছে। বাবা-মা উদ্বিগ্ন, 'স্কুলে পৌঁছেই একটা ফোন করবি'। যতক্ষণ ফোন না করছে ততক্ষণ বাবা-মার মনে সঙ্কল্প-বিকল্প চলছে। পৌঁছে ফোন করল। বাবা-মাও শান্তসঙ্কল্প হয়ে গেলেন। এখানেও নচিকেতা তাই করছেন, আপনি আমাকে বর দিন আমার বাবার মন যেন এক্ষুণি শান্তসঙ্কল্প হয়ে যায়। নচিকেতার বাবা সুখী নন, কারণ ছেলে কত দূরে চলে গেছে। নচিকেতা তাই বলছেন, বাবা যেন প্রসন্নচিত্ত হয়ে যান। আর বলছেন *বীতমন্যুঃ*, বাবা আমার উপর রেগে গিয়েই বলেছিলেন *মৃত্যবে ত্বা দদামীতি*। হে যমরাজ! বাবার রাগটা যেন প্রশমিত হয়ে যায়। কেউ যদি আমার উপর রেগে থাকে তাহলে বুঝতে হবে নিশ্চয়ই আমি কোন দোষ করেছি। এই দোষের জন্য সে যে আমার উপর রেগে আছে এর

ফলস্বরূপ আমার কিন্তু এবার অনেক কিছুই গোলমাল হতে শুরু করবে। কেউ যদি আমার উপর রেগে থাকে কাউকে যদি আমি কষ্ট দিয়ে থাকি, প্রথম কাজ হল তার রাগকে শান্ত করতে প্রয়াসী হওয়া। কেউ যদি আমার উপর অন্যায় ভাবে রেগে থাকে বা অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে তাহলে আরও বিপদ। কারণ কোন জন্মের কোন পাপ তার মাধ্যমে এখন ফোঁস ফোঁস করে বেরোচ্ছে আমাদের জানা নেই, এক্ষুণি প্রথমে গিয়ে তাকে শান্ত করতে হবে, তারপর ঠাকুরের কাছে গিয়ে মাথা ঠুকতে হবে, হে ঠাকুর! রক্ষা করো, রক্ষা করো। ঠাকুর বলছেন, তোমার উপর যদি কেউ অসন্তুষ্ট হয় একবার তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে মিটমাট করে নেবে। যদি মিটমাট না করতে চায় তাহলে তো আর কিছু করার নেই, আর সব শক্তি ওতেই তো লাগিয়ে দেওয়া যায় না। তবে এটা জানবেন, অকারণেও যদি কেউ আমার উপর রেগে থাকে তাহলে ওর রাগের মাধ্যমে আমার কোন পুরনো পাপকর্ম ফল হয়ে বেরোচ্ছে। যে করেই হোক ওকে শান্ত করতে হবে। যিশুও বলছেন, যদি কোন কারণে তোমার ভাই যদি তোমার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে আগে তাকে শান্ত কর, তারপর এসে প্রার্থনা কর। আপনার উপর পাঁচজন অসন্তুষ্ট হয়ে আছে এরপর মন্দিরে গিয়ে জপ-ধ্যান, প্রার্থনা করে কী আর হবে! তবে হ্যাঁ, যদি মনে করেন বিভিন্ন কারণে তার কাছে যাওয়া যাবে না, তাহলে ঠাকুরের কাছে মাথা ঠুকে ঠুকে ক্ষমা চাইতে থাকুন। কিন্তু এটা জানবেন, আপনি যতই মাথা ঠুকুন যতক্ষণ না সে ক্রোধরহিত হয়, বীতমন্যু না হচ্ছে ততক্ষণ আপনি কিন্তু সমস্যার মধ্যে থাকবেন। যমরাজের কাছে নচিকেতা তাই বলছেন বাবা যেন বীতমন্যু হয়ে যান। বীতমন্যু করার জন্য, রাগ কমানোর অনেকগুলো পথ আছে। আপনি তার পায়ে পড়ে যান, তাকে উপহারাদি দিন, তাকে আপ্যায়ন করুন, এই রকম পঞ্চাশ রকমের উপায় আছে। এত কিছু করার পরেও যদি রাগ না কমে তাহলে এইটুকুর জন্য ঠাকুরের কাছে মাথা ঠুকে ঠুকে প্রণাম করতে হবে, ক্ষমা চাইতে হবে। এরপর উনি যদি সুমতি দিয়ে মনকে ঘুরিয়ে দেন তাহলে মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যেতে পারে। ন্যায় ভাবে রেগে থাকুক আর অন্যায় ভেবে রেগে থাকুক, আপনি কিন্তু বিপদের মধ্যে পড়ে গেলেন।

তৎ-প্রসৃষ্টং, নচিকেতা জানেন আমি এখানে অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে পড়েছি, এখানে থাকা যাবে না। আপনার কাছে থেকে যখন আমি বাবার কাছে ফিরে যাব তখন *মাহভিবদেৎ প্রতীত*, আমাকে যেন তিনি চিনতে পারেন আর আমার সাথে তিনি যেন মিষ্টি করে সম্ভাষণ করেন। কিভাবে বাবা আমাকে চিনতে পারবেন? আচার্য বলছেন *প্রতীতো লব্ধস্মৃতিঃ*। নচিকেতার প্রথম আশঙ্কা, আমি যদি ফেরত যাই তাহলে বাবা ভাববেন, আরে নচিকেতা তো যমরাজের কাছে চলে গিয়েছিল, তাহলে এটা কি কোন প্রেত এসে গেল নাকি! এই ব্যাপারটা যেন না হয়, তিনি যেন চিনতে পারেন, আমার যে পুত্র যমরাজের কাছে চলে গিয়েছিল সেই পুত্রই ফিরে এসেছে। আর বলছেন *অভিবদেৎ*, আমার সাথে তিনি যেন মিষ্টি করে কথা বলেন। তিনি যেন না বলেন আমি তো তোকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি এখানে আবার কি করতে এলি? আমার প্রতি যেন তাঁর আগের মতই স্নেহ বাৎসল্য ভাব থাকে। এই যে বাসা পাকড়ানোর কথা বলা হল, আমার আশে পাশে যাঁরা আছেন তাঁরা সবাই যেন আমার প্রতি স্নেহযুক্ত হন। সবাই যদি আমার প্রতি স্নেহযুক্ত না হন তাহলে আমার জীবনে কিন্তু অনেক সমস্যা আসবে। হিংসুটে স্বভাব অনেকের মধ্যেই থাকতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সব কিছুর পরেও তাকে কিভাবে শান্ত রাখা যেতে পারে সেই ব্যাপারে আমাকেই চেষ্টা করতে হবে। মূল বক্তব্য হল *পরিতোষণম্*, বাবার যে সন্তুষ্টি এটাই হল আমার প্রথম বর। বাবার সন্তুষ্টি, বাবার পরিতোষ কিভাবে হবে তারই নানান দিক এই মন্ত্রে বলা হল। নচিকেতার কথারই পুনরাবৃত্তি করে যমরাজ পরের মন্ত্রে বলছেন –

যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীত
ঔদ্দালকিরারুণির্মৎপ্রসৃষ্টঃ।
সুখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যু-
স্ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্।।১/১/১১।।

(যমরাজ বললেন তোমার পিতা আরুণি উদ্দালক পূর্বে তোমার প্রতি যেরূপ স্নেহপরায়ণ ছিলেন, তোমাকে চিনতে পেরে ভবিষ্যতেও সেই স্নেহশীলই হবেন। মৃত্যুমুখ থেকে বিমুক্ত তোমাকে দেখে তিনি আমার আদেশে ক্রোধ ত্যাগ করবেন এবং বহুরাত্রি সুখে নিদ্রা যাবেন।)

যমরাজ বললেন, নচিকেতা তুমি যেমনটি বর চাইলে তেমনটিই হবে। *যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীত*, আগে যেমনটি ছিল এখনও তেমনটি হবে, অর্থাৎ তোমার প্রতি তাঁর আগের মতই স্নেহ থাকবে। তোমাকে চিনতে

পারবেন, তোমার প্রতি তাঁর যে ক্রোধ এসেছিল সেই ক্রোধ চলে যাবে। *ঔদ্দালকিরারুণির্মৎপ্রসৃষ্টঃ*, ঔদ্দালকি আর আরুণি এই দুটো শব্দ আমাদের কাছে অদ্ভূত মনে হতে পারে। প্রথমে নচিকেতার বাবার নাম বলেছিলেন বাজশ্রবস, আবার একটা নাম এল গৌতম, আর এখানে বলছেন ঔদ্দালকি আরুণি। ঔদ্দালকির ঠিক ঠিক অর্থ হল যিনি উদ্দালকের পুত্র। কঠোপনিষদ অনেক প্রাচীন উপনিষদ, এর ভাষা অনেক আগেকার বলে সব অর্থ পাওয়া যায় না, আবার অনেক সময় মনে হতে পারে নামটা সত্যিই এই রকম ছিল নাকি ছন্দ মেলানোর জন্য এভাবে বলা হয়েছে। আচার্য শঙ্করও এই ধরণের নাম উল্লেখের কয়েকটি সম্ভবনার কথা বলছেন। প্রথম সম্ভবনা হল বাজশ্রবার আরেক নাম উদ্দালক, তাঁকেই ঔদ্দালকি বলতে পারেন। আরুণি মানে অরুণের পুত্র। হয়ত এনার নামই ছিল উদ্দালক, বা উদ্দালক মুনির পুত্র। এখানে আচার্য একটা শব্দ বলছেন *দ্ব্যামুষ্যায়ণ বা*। *দ্ব্যামুষ্যায়ণ* বলতে বোঝায়, এনার দুজন অভিবাবক বা দুজন পিতা। দুজন পিতা বলা মানে, একটা তার বাবার নাম, যেমন এখানে উদ্দালক তার বাবার নাম আর তার ছেলের নাম ঔদ্দালকি। কোন কারণে ছেলেটিকে দেখে একজনের খুব পছন্দ হয়েছে, পছন্দ হওয়াতে তিনি বলে দিলেন – আজ থেকে এ আমার পুত্র। সংস্কৃতে এটাকে বলে *দ্ব্যামুষ্যায়ণ*। সেখান থেকে এবার সে দুটো পরিবারেরই সন্তান হয়ে গেল। মনুস্মৃতিতেও বলছে, কেউ যদি মাথায় হাত রেখে বলে দেয় আজ থেকে এ আমার পুত্র, তখন সে তার পুত্র হয়ে গেল। দুটো পরিবারের পুত্র হওয়াতে দুটো নামই তার চলে আসে, হয়ত সেই কারণেই এখানে ঔদ্দালকি আরুণি বলছেন। দুটো পরিবারেই শ্রাদ্ধাদির ক্রিয়াকর্মে তার অধিকার হয়ে যায়। বিদেশে যে গড ফাদারের ধারণা আছে, এটা কতকটা সেই রকম। নিজের বাবা আছে আবার একজন গড ফাদারও আছে। বিশেষ করে ইতালি আর অন্য অনেক দেশে এই গড ফাদারের ব্যাপারটা দেখা যায়। সেখান থেকে এখন গড ফাদার শব্দকে খুব নোংরা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু গড ফাদার শব্দটা খুব spiritual শব্দ। বাবাকে যেভাবে সন্তান দেখে গড ফাদারকেও ঠিক সেই ভাবেই দেখা হয়। *দ্ব্যামুষ্যায়ণ* শব্দ যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, দুজন বাবা, এটা পুরো শাস্ত্র সম্মত। শাস্ত্র সম্মত হওয়ার জন্য দুজন বাবারই পিতৃকর্ম তাকে করতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় দাদুর নিজের কোন ছেলে নেই, একটি কি দুটি মেয়ে আছে। সেই মেয়ের থেকে একটি সন্তান হয়েছে, সেই সন্তানের নিজের বাবা আছে আবার এই দিকে দাদু তার মাথায় হাত রেখে বললেন, এ আমার সন্তান। এখন দাদুর পিতৃকর্মেও তার অধিকার এসে যাবে।

যদিও এখানে কোন উল্লেখ নেই, মহাভারতের কাহিনীতে উদ্দালক আরুণি একজনকেই বলা হয়েছে। আচার্য কেন এখানে উল্লেখ করেননি বোঝা যায় না। ধৌম্য ঋষির আশ্রমে আরুণি নামে তাঁর এক শিষ্য থাকতেন। একদিন প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল। আশ্রমের সামান্য একটু জমি-জায়গা ছিল। ধৌম্য ঋষি আরুণিকে ডেকে বললেন ‘দেখতো আমাদের ক্ষেতের আল ভেঙে গিয়ে সব জল বেরিয়ে গেছি কিনা’। গুরুর আদেশে ক্ষেতে গিয়ে আরুণি তাঁর ছোট হাত দিয়ে মাটি দিয়ে জল আটকাবার অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু জল বেরিয়ে যাওয়া বন্ধ করতে পারছিল না। এদিকে সন্ধ্যে হয়ে আসছে, জল আটকাতে না পারলে সারা রাত জলের সাথে চাষের পলিমাটিও ভেসে চলে যাবে, চাষ হবে না। অন্য দিকে গুরুর আদেশ। আরুণি এবার আলের উপর শুয়ে পড়ল। শুয়ে পড়াতে শরীর দিয়ে জল বেরিয়ে যাওয়াটা বন্ধ করে দেওয়া গেল। বৃষ্টি এক নাগাড়ে হয়েই চলেছে। আরুণি শুয়েই থাকল, জলের সাথে মাটি এসে ওর গায়ের উপর জমে গেছে। সকালবেলা ধৌম্য ঋষি দেখছেন আরুণি নেই, কোথায় গেল সে! তাঁর মনে হল, ওকে ক্ষেতে পাঠানো হয়েছিল, পরে ওর খোঁজ নেওয়া হয়নি বলে হয়তো রাগ-টাগ করেছে। অন্যরা বলল আরুণি তো রাত্তিরে ফেরেনি। ধৌম্য তখন কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে ক্ষেতের কাছে গেছেন আরুণির খোঁজ নিতে। ক্ষেতের আশেপাশে কোথাও আরুণিকে দেখা যাচ্ছে না। ধৌম্য ঋষি তখন আরুণি আরুণি করে ডাকতে শুরু করলেন। ইতিমধ্যে ঠাণ্ডায় আরুণি ওখানে অচেতন হয়ে গিয়েছিল। কয়েকবার ডাক দেওয়ার পর আরুণি হঠাৎ গুরুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। তখনই সে জেগে গেছে। জাগা মাত্রই আরুণি যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। গুরু দেখছেন আরুণি যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। সেইজন্য তাঁর নাম দিলেন উদ্দালক। উদ্দালক শব্দের অর্থ, মাটি ফুঁড়ে যে বেরিয়ে এসেছে। তোমার নাম আরুণি কিন্তু আজ থেকে তোমার নাম হবে উদ্দালক আরুণি। এটা হল মহাভারতের কাহিনী।

এখানে শব্দটা হল *ঔদ্দালকিরারুণিঃ*, তার মানে বাজশ্রবসের বাবা তিনি হয়ত উদ্দালক আরুণি ছিলেন, বা এখানে যেমন বলছেন এরই নাম উদ্দালক ছিল। উপনিষদ কোন কাহিনীও নয় আবার ইতিহাসও নয়,

সেইজন্য নামের হিসাব করতে গেলে একটু এদিক ওদিক হয়ে যাবে। কোনটা গোত্রের নাম, কোনটা মায়ের নাম, কোনটা বাবার নাম, কোনটা ওনার নিজের নাম বা এমন কোন কৃতকর্ম করেছেন সেই কর্মকে আধার করে তাঁর এই নাম কিনা বলা মুশকিল। যদিও বাজশ্রবসই নচিকেতার বাবার নাম। যেহেতু এখানে ঔদ্দালকিরারুণি নাম নিয়ে এসেছেন, এর একটা ব্যাখ্যার দরকার তাই আচার্য একটা ছোট্ট ব্যাখ্যা দিয়ে বলে দিলেন, ঔদ্দালকি মানে উদ্দালকের পুত্র বা তার নিজের নামই ঔদ্দালকি আর অরুণের পুত্র বলে আরুণি বলছেন। কিন্তু মহাভারতে উদ্দালক আরুণি একজন ঋষিরই নাম। ঔদ্দালকিরারুণি বলে এখানে নচিকেতার বাবাকেই বলতে চাইছেন।

সুখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যুঃ, যমরাজ বলছেন, এই যে তুমি যমলোক থেকে ছাড়া পেয়ে যাবে, তার আগে এখনই তোমার বাবা *বীতমন্যু* হয়ে যাবেন, বাবার মনে যত ক্রোধ ছিল সব শান্ত হয়ে যাবে, আর উনি রাত্রিতে সুখে নিদ্রা যাবেন। মানুষের মনে যদি দুশ্চিন্তা, ক্রোধাদি থাকে তাহলে রাত্রে ভালো ঘুম হয় না। যারা পাপকর্ম করে তাদেরও ঘুম হয় না। মনের মধ্যে যদি কোন ধরণের আশঙ্কা, অনিশ্চয়তা বশতঃ চাঞ্চল্যতা থাকে, অবসাদ যদি থাকে তাহলে রাত্রে ঘুম হবে না। সেইজন্য বলা হয় রাত্রিবেলা যাদের ঘুম হয় না, বুঝতে হবে তাদের ভেতরটা অনেক গোলমেলে। মনস্তাত্ত্বিকরা প্রথমেই রোগীকে জিজ্ঞেস করেন রাতে ঘুম কেমন হয়। কিন্তু নচিকেতা, তোমার বাবার আগে যা হওয়ার হয়েছে এখন থেকে তিনি রাত্রিবেলা সুখে নিদ্রা যাবেন।

ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্, এখন নচিকেতা কত দিনে পৌঁছাবে, নাকি সঙ্গে সঙ্গে হাজির হয়ে যাবে, এসবের কোন বর্ণনা না করে বলে দিলেন, যেমনি তোমাকে বাবা দেখে নেবেন সঙ্গে সঙ্গে ওনার যত নেগেটিভ ইমোশান আছে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। তোমাকে প্রেতাত্মা ভেবে সন্দেহ করবেন না, তোমার প্রতি কোন কটূবাক্য প্রয়োগ করবেন না, তার সাথে ওনার নিজের মনও শান্ত হয়ে যাবে। এই যে আগে বাসা পাকড়ানোর কথা বলা হল, সেটা তোমার পুরোপুরি শান্ত হয়ে যাবে। তুমি তোমার পূর্ণ পরিতোষ চেয়েছিল, এই বরে তোমার বাবার পুরো পরিতোষ হয়ে যাবে। তুমি যেমনটি চেয়েছিলে তেমনটিই সব কিছু হয়ে যাবে। নচিকেতাও প্রথম বরে নিজের জাগতিক ঘর-সংসারটাকে গুছিয়ে নিলেন।

মানুষ নিজের ঘর-সংসার ঠিক হয়ে যাওয়ার পর পরলোকের চিন্তা করতে শুরু করে। এখানে একটা ছোট্ট আখ্যায়িকা দিয়ে প্রথমে বাসা পাকড়ানো দেখালেন। ইহলোকের বাসা ছেড়ে মৃত্যুর পর আমি যে বাসাতে যাব সেই বাসাটাকে এবার ঠিক করতে হবে। ধর্ম, অর্থ আর কাম, অর্থ আর কাম ইহলোকের জন্য আর ধর্ম পরলোকের জন্য। প্রথম বরে নচিকেতা ইহ জগতকে ঠিক করে নিলেন। ইহলোকের সব কিছু ঠিক করে নেওয়ার পর দ্বিতীয় বরে নচিকেতা বলছেন –

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি
ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বাহশনায়াপিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে।।১/১/১২।।

(নচিকেতা বলছে 'শুনেছি যে স্বর্গলোকে কোন ভয় নেই, আপনিও সেখানে নেই তাই সেখানে কেউ বার্ধক্যগ্রস্ত হয়ে শঙ্কিত হয় না, লোক ক্ষুধা ও তৃষ্ণা উভয়কেই অতিক্রম করে দুঃখাতীত হয়ে স্বর্গধামে আনন্দ উপভোগ করে।)

নচিকেতার বয়স খুব অল্প, আগেই বলা হয়েছে এখনও তার প্রজনন শক্তি আসেনি। সেই নচিকেতা বলছেন 'হে যমরাজ! এই রকম শুনেছি যে স্বর্গে নাকি ভয় বলে কিছু নেই আর জরা ও মৃত্যু এই দুটোর কোনটাই সেখানে নাকি নেই, বৃদ্ধাবস্থাও হয় না আর কেউ মারাও যায় না। সেখানে নাকি খিদেও পায় না আর পিপাসাও পায় না। তাই না, সেখানে সবাই নাকি শোককে অতিক্রম করে যায় আর আনন্দে থাকে'।

এখানে নচিকেতা স্বর্গলোকের কথা বলতে গিয়ে ব্রহ্মলোকের কথা বলছেন। এক একটা মন্ত্রকে আলাদা অর্থ করে দেখলে এর অর্থ এক রকম হবে কিন্তু উপনিষদের সামগ্রিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্য করে অর্থ করলে অন্য রকম অর্থ হয়ে যাবে। পরের দিকে যে মন্ত্র আসবে সেখানে গিয়ে এই মন্ত্রের অর্থ পরিষ্কার হয়। বর্তমানে আমরা হিন্দু ধর্মে যে অর্থে স্বর্গ নরকাদিকে জানি, সেই অর্থে বৈদিক যুগে স্বর্গ বা নরককে তাঁরা জানতেন না।

তাঁরা জানতেন জীব বা আত্মা বিভিন্ন জায়গায় বাস করে। যেমনটি তার কর্ম তেমনটি সে এগোতে থাকে। খুব সাধারণ পূণ্য হলে জীব স্বর্গলোকে যায়, বাজে কর্ম করা থাকলে পাতাল লোকে চলে যাবে। পুরাণে যেভাবে নরকের ধারণা এসেছে সেভাবে বেদে নরক বলে কিছু নেই, কিন্তু ঈশোপনিষদে অসূর্যালোক বা অনন্দালোকের কথা কঠোপনিষদে বলছেন এর বাইরে হল স্বর্গলোক। আমরা স্বর্গ বলতে বুঝি, যেখানকার রাজা ইন্দ্র, যেখানে অপ্সরারা নৃত্য করে, এই স্বর্গ কিন্তু সেই স্বর্গ নয়। ঐ স্বর্গেরই কথা যদি এখানে থাকত তাহলে সেই স্বর্গের ব্যাপারে নচিকেতা বিশেষ কিছু জিজ্ঞেষ করতেন না। কারণ নচিকেতার বাবা বেদের যজ্ঞাদি করেন, সেইজন্য তাঁর সেই স্বর্গের ব্যাপার জানাই আছে, নতুন করে সেই বিদ্যার ব্যাপারে নচিকেতা জানতে চাইবে না। এখানে নচিকেতা সাধারণ স্বর্গলোকের কথা জিজ্ঞেস করছেন না, আসলে তিনি উচ্চতম স্বর্গলোকের অর্থাৎ ব্রহ্মলোকের সম্বন্ধে জানতে চাইছেন। কঠোপনিষদে কোথাও কোথাও শব্দ যোগ না করলে অর্থ স্পষ্ট হয় না।

ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি, সেই লোকে আপনি নেই, মানে মৃত্যু নেই আর কেউ বৃদ্ধও হয় না। আচার্য বলছেন, *ন চ তত্র ত্বং মৃত্যো সহসা প্রভবসি*, সহসা কেউ মৃত্যু বা জরাতে পতিত হয়ে যায় না। সহসা বলতে আচার্য বোঝাচ্ছেন, পৃথিবীলোকে আমরা ধরে নিয়েছি নব্বুই কি একশ বছর হলে লোক মারা যাবে কিন্তু হঠাৎ কেউ সত্তর বয়সে বা আরও কম বয়সেও মারা যায়। আমরা এখন বলছি জন্ম, মৃত্যু আর বিবাহ ঈশ্বরের হাতে। হয়তো তাই, কিন্তু এখানে শব্দটা বলছেন সহসা, হঠাৎ করে মৃত্যু এসে গেল। স্বর্গলোকে কিন্তু মৃত্যুর খামখেয়ালী চলবে না। স্বর্গলোকেও লোকে মারা যায়, গীতায় বলছেন *ক্ষীণে পূণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*, যত বড় স্বর্গলোকই হোক না কেন, তুমি ভোগও করবে কিন্তু *ক্ষীণে পূণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*, সবাইকে ওখান থেকে পড়তে হবে, পড়া মানেই তো মৃত্যু এসে গেল। কিন্তু পৃথ্বীলোকের মত সহসা হবে না। স্বর্গলোকে গিয়ে যমরাজ কোন দেবতাকে যে বলবে তোমার সময় হয়ে গেছে এবার যমলোকে চল, যমরাজ এই কাজ করতে পারেন না। সেইজন্য নচিকেতা বলছেন *ন তত্র ত্বং*, আপনি সেখানে নেই। আর বলছেন *ন জরয়া বিভেতি*, মৃত্যু হয়তো হঠাৎ একদিন এসে যেতে পারে কিন্তু জরা অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থা ধীরে ধীরে আসে।

শ্রীমাকে একজন দেবতাদের মৃত্যু কিভাবে হয় জিজ্ঞেস করাতে শ্রীমা বলছেন, এই যেমন একটা বরফের মুর্তি গলে গেল। জগতে দুটো নিয়ম Law of Gravitation আর Law of buoyancy, বস্তু ভারী হলে নীচের দিকে চলে আসে আর হাল্কা হলে উপরের দিকে চলে যায়। আমাদের শরীর ভূমি তন্মাত্রা দিয়ে তৈরী বলে শরীরটা ভারী, শরীর ভারী হওয়ার জন্য আমরা পৃথিবী লোকে আছি। আমরা যদি এমন কর্ম করি যে কর্মের জোরে শরীরের পার্টিকেলস্ গুলো আরও ভারী হয়ে গেল, তখন আমরা পাতাল লোকে পৌঁছে যাব। যদি পূণ্য কর্ম করা হয় তখন ভূমি তন্মাত্রা কমে গিয়ে তেজ তন্মাত্রা বেড়ে যাবে। শরীরে তেজ তন্মাত্রা বেড়ে গেলে দেবলোকে চলে যাবে। দেবলোকে পূণ্য কর্মের কোটা শেষ হয়ে গেলে তেজ তন্মাত্রাগুলো ভূমি তন্মাত্রাতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। যেমন যেমন ভূমি তন্মাত্রা বাড়তে থাকবে তেমন তেমন সে নীচের দিকে পড়তে থাকবে। বাজে কর্ম করলে শরীরটা ভারী হয়ে কুকুর বেড়াল হয়ে যাবে, আরও ভারী হয়ে গেলে পাতাল লোকে চলে যাবে। এইভাবে ওঠা-নামা চলতে থাকে, তবে এরও একটা নিয়ম আছে। কিন্তু মৃত্যুলোকে সেই রকম কোন নিয়ম নেই। যমরাজ কেন এসে কাউকে ধরে নিয়ে যায় আমাদের জানা নেই, আর যমরাজ যদি না নিয়ে যান তাহলে জরা এসে গ্রাস করে নেয়, বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু স্বর্গলোকে জরাও নেই। মহাভারতে আবার দেবলোক থেকে পতনের অনেক বর্ণনা আছে। হঠাৎ তার শরীরটা ভারী হতে শুরু করে দেয় আর নীচের দিকে পড়তে থাকে। তারা চেঁচাতে থাকে, যাদের সাথে ছিল তাদের চিৎকার করে বলতে থাকে বাঁচাও বাঁচাও আমি পড়ে যাচ্ছি। কিন্তু যারা দেবলোকে থেকে গেল তারা ঐ চিৎকারকে কোন তোয়াক্কাই করে না। এগুলো দিয়ে পরিষ্কার বোঝা যায় যে নচিকেতা যে স্বর্গলোকের কথা বলছেন, সেখানে এই নিয়মগুলো প্রযোজ্য নয়, এখানে তাই ধরে নেওয়া যায় যে নচিকেতা ব্রহ্মলোকের কথা বলছেন।

অশনায়াপিপাসে, ওখানে কোন ক্ষুধা তৃষ্ণার অনুভূতি হয় না। কিন্তু স্বর্গলোকে দেবতারা সুরাপান করেন। তাই খাওয়া-দাওয়া, পান করার ব্যাপারটা শুধু ব্রহ্মলোকে নেই, যেখানে যেখানে যত যজ্ঞাদি হচ্ছে তার সার দিয়ে তাঁদের জীবন চলে যায়। শেষে বলছেন *শোকাতিগো*, ব্রহ্মলোকে কোন শোক নেই। কিন্তু সাধারণ স্বর্গলোকে প্রচুর শোক পেতে হয়। ইন্দ্র সব সময় শঙ্কাতে থাকেন এই বুঝি আমার ইন্দ্রত্ব চলে গেল। যারা

নেমে আসে তারা কান্নাকাটি করতে শুরু করে দেয়। আচার্য বলছেন *শোকাতিগঃ সন্ মানসেন দুঃখেন*, শোক মানেই মনের দুঃখ। মানুষের জীবনে সব সময় শোক লেগেই আছে, শৈশবে দাদু দিদিমাকে ভালোবাসতাম তাঁরা মারা গেলেন, শোক এসে গেল। পরীক্ষায় নম্বর কম এসেছে তার জন্য শোক। আমার থেকে অন্যের দামী পোশাক তার জন্য শোক। জীবনে কত নতুন নতুন সঙ্গী-সাথী এসে জুটছে আবার আলাদা হয়ে যাচ্ছে, তার জন্য শোক। পৃথিবীলোকে শোক আর দুঃখ ছাড়া কিছুই নেই। বিভিন্ন ধর্মে স্বর্গের বিভিন্ন রকম বর্ণনা করা হয়েছে। স্বর্গলোক থেকেও পতন হয় আবার পিতৃলোকে আরও কম সময়ের জন্য থাকতে পারে। স্বর্গলোকের যে সুখ, সেই সুখকে ছেড়ে যখন চলে আসতে হয় তখন তার কত শোক আর দুঃখ। একজন রিক্সাওয়ালা যেমন বড়লোকের কষ্ট বুঝতে পারে না, ঠিক তেমনি আমরা ইন্দ্রলোকের কষ্ট বা যাঁরা স্বর্গে আছেন তাঁদের মনে যে কী তীব্র কষ্ট কোন দিন বুঝতে পারবো না। কিন্তু যদি তুলনা করা হয় তাহলে দেখা যায় সব থেকে সুখ ব্রহ্মলোকে। ওখানে মনে কোন দুঃখ থাকে না। মনে কোন দুঃখ থাকে না বলে ঐ দিব্যলোকে সে প্রচুর আনন্দে থাকে। এরপর নচিকেতা বলছেন সেই স্বর্গলোক কীভাবে পাওয়া যেতে পারে আপনি আমাকে বলুন।

স ত্বমগ্নিং স্বর্গমধ্যেষি মৃত্যো
প্রব্রূহি তং শ্রদ্ধধানায় মহ্যম্।
স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্ত
এতদ্ দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ।।১/১/১৩।।

(হে যমরাজ! স্বর্গকামী যজমানরা যে অগ্নিবিদ্যা সহায়ে অমরত্ব প্রাপ্ত হন আপনি সেই বিদ্যা জানেন, আমি শ্রদ্ধাযুক্ত, আপনি আমাকে সেই বিদ্যার কথা বলুন – এটাই আমার দ্বিতীয় বরে প্রার্থনা করছি।)

বেদের অর্থ নিরূপণ করার জন্য ছটি নিয়ম অনুসরণ করা হয়, ছটি নিয়মকে একত্রে বলা হয় ষড়লিঙ্গ। ষড়লিঙ্গের প্রথম নিয়ম উপক্রম আর উপসংহার, যেটা দিয়ে শুরু করা হয়েছে সেটা দিয়েই শেষ করা হয়েছে কিনা। যদি শুরু একটা দিয়ে আর শেষ আরেকটা জায়গাতে, তাহলে বুঝতে হবে বক্তব্যে গোলমাল আছে। এখানে বারো আর তেরো নম্বর মন্ত্রে এক রকম কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু পরের অধ্যায়ে অন্য রকম কথা বলা হয়েছে। তার মানে উপক্রম আর উপসংহার এক রকম নেই। দু রকম কথা বলা আছে মানে অর্থটা ঠিক ভাবে বার করতে হবে, আর এমন ভাবে অর্থ বার করতে হবে যাতে অর্থের যেন ধারাবাহিকতা থাকে। এই ধারাবাহিকতাটা আচার্য যোগান দেন, যেখানে সামগ্রিক বক্তব্যটা দৃঢ় হয়ে যায়। বেদের অর্থ নিরুপণের সময় কখনই অসঙ্গতিপূর্ণ অর্থ করা চলবে না। শুধু বেদ কেন কোন শাস্ত্রেই অসঙ্গতি আনা যাবে না। যদি অর্থের কোথাও অসঙ্গতি থাকে তাহলে বলতে হবে এই জায়গাতে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। অসঙ্গতিপূর্ণ জায়গাতে ভাষ্যকাররা এমন একটা অর্থ নিয়ে আসেন যার ফলে পুরো বক্তব্যটাই সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে যায়।

বলছেন *স ত্বমগ্নিং*, হে যমরাজ! আমাকে সেই অগ্নির কথা বলুন। আমি কি রকম? *শ্রদ্দধানায় মহ্যম্*, আমি আপনার শ্রদ্ধাবান শিষ্য। প্রশ্নোপনিষদে দুজন ঋষি প্রশ্ন নিয়ে এক ঋষির কাছে গেছেন। ঋষি প্রথমেই তাঁদের বলছেন – তোমরা আগে এখানে এক বছর থেকে তপস্যা কর। তপস্যা করার পর আমাকে প্রশ্নটা করবে, আমি যদি প্রশ্নের উত্তর জানি তাহলেই বলব আর যদি না জানি তাহলে জানতে পারবে না। প্রশ্ন শোনা তো দূরের কথা প্রশ্ন করবে শুনেই বলছেন, আগে এক বছর এখানে থেকে তপস্যা কর, তপস্যা করার পর তুমি প্রশ্ন করবে। তপস্যা করা হয়েছে মানে এবার তার প্রশ্ন করার পাত্রতা হল।

আগের মন্ত্রে স্বর্গের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বলা হয়েছে, সেখানে ভয় নেই, মৃত্যু নেই, জরা নেই, খিদে নেই, তৃষ্ণা নেই, শোক নেই, শুধু আনন্দ আর আনন্দ, আচার্য যাকে বলছেন *এবংগুণবিশিষ্টস্য*, এই ধরণের গুণের বৈশিষ্ট্য যেখানে, যে লোককে প্রাপ্ত করলে এই রকমটি থাকা যাবে, এই লোক কিভাবে পাওয়া যেতে পারে আপনি আমাকে বলুন। যদিও এখানে বলছেন *অমৃতত্বং ভজন্ত*, অমৃতত্ব মানে অমর হয়ে যাওয়া, অমর হয়ে যাওয়া মানে আর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরতে হবে না, কিন্তু পরের দিকে যত মন্ত্র আসছে তার সাথে এই অর্থ খাপ খায় না। সেইজন্য আচার্য বলছেন, এই অমৃতত্ব হল দেবভাব, আমাদের ভাষায় আপেক্ষিক অমৃতত্ব। আপেক্ষিক অমরত্ব মানে, যেমন ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস এই জন্মাচ্ছে এই মরছে, সেখান থেকে যেমন যেমন বিবর্তিত হয়ে এগোতে এগোতে পশু, মানুষের শরীরে আসছে তখন তারা অনেক দিন বেঁচে থাকে, যেমন

কচ্ছপ অনেক দিন বেঁচে থাকে। সেই তুলনায় এমন একটা লোকে চলে গেল যেখানে কয়েক হাজার বছর বেঁচে থাকছে। কিন্তু এমন একটা লোকে যদি চলে যায় যেখানে সৃষ্টি যত দিন থাকবে তত দিন সেও বেঁচে থাকবে, এটাকেও অমরত্ব বলা যেতে পারে। নচিকেতা জানতে চাইছেন এই স্বর্গ কিভাবে পাওয়া যেতে পারে, পাওয়ার উপায়টা কি। আচার্য বলছেন *সাধনভূতমগ্নিং*, যে যজ্ঞ করলে, যে উপায়ে ঐ লোক পাওয়া যেতে পারে, হে যমরাজ আপনি সেই গুহ্য বিদ্যাটা জানেন, আপনি আমাকে সেই গুহ্য বিদ্যাটা বলুন। আমি কোন যা তা লোক নই, আমি শ্রদ্ধাবান, আর শ্রদ্ধা নিয়েই আমি জানতে চাইছি। তাছাড়া আপনিই আমাকে বর দিয়েছেন, আপনার থেকে বর পাওয়ার যোগ্যতা এসেছে আমার তিন দিন না খাওয়া আর না ঘুমনো থেকে।

এই যে এখানে বলছেন *স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্ত*, বেদান্তের বিভিন্ন দর্শনে এইসব মন্ত্রকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। বেদান্তের দৃষ্টিতে একমাত্র সচ্চিদানন্দই আছেন, সচ্চিদানন্দ ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু কোন কারণে সচ্চিদানন্দ তাঁর নিজের মায়া দিয়ে তাঁর জ্ঞানকে আবৃত করে দিচ্ছেন। জ্ঞান ঢেকে দেওয়ার পর যিনি সচ্চিদানন্দ, যিনি চিৎস্বরূপ তিনি এবার মায়ার আবরণ দিয়ে নিজেকে দেখছেন। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখার মত দেখেন না, নিজেকেই দেখছেন কিন্তু সামনে একটা আবরণ লাগিয়ে দিয়ে। মায়ার আবরণ না দিলে সচ্চিদানন্দকে দেখা যাবে না। নির্গুণ ব্রহ্মের উপর মায়ার আবরণ পড়ে গেলে তাঁর নাম হয়ে যায় সগুণ ব্রহ্ম। এখানে তিনটে জিনিষ আসছে, যিনি সচ্চিদানন্দ, যিনি একমাত্র বস্তু, তাঁরই জ্ঞান শক্তি দিয়ে নিজের জ্ঞানকে আবৃত করে দিলেন, এবার ঐ শক্তির দরুণ নিজেকেই যখন দেখছেন তখন পুরো জিনিষটা অন্য রকম দেখায়। কিন্তু তিনি সচ্চিদানন্দ, সর্বশক্তিমান, তাঁকে বলছেন সগুণ ব্রহ্ম, সৃষ্টি এখান থেকে শুরু হয়ে গেল। সগুণ ব্রহ্মের যে গুণ সেই সৎ চিৎ আনন্দ থেকেই বেরোয়, কিন্তু মায়ার দরুণ তার বিপরীত জিনিষগুলি এসে যায়। সৎ থাকে কিন্তু অসতের ভাব এসে যায়, জ্ঞান থাকে কিন্তু অজ্ঞানের ভাব এসে যাচ্ছে, আনন্দ আছে কিন্তু নিরানন্দের ভাব এসে যায়। এরপর এই তিনটে জিনিষের খেলা চলতে চলতে এই পুরো জগৎ দাঁড়িয়ে যায়। অদ্বৈত বেদান্ত কখনই এই জিনিষটাকে ঐ ভাবে সত্য বলে নেবে না, যেভাবে দ্বৈতবাদীরা সত্য বলে নেয়। অদ্বৈতবাদীরা বলবেন দ্বৈত বোধ দিয়ে কাজ চলে যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু এর বাইরে কিছু না।

সগুণ ব্রহ্মের অনেকগুলো নাম আছে। পুরাণাদিতে সগুণ ব্রহ্মকে **ব্রহ্মা** নামে বলা হয়। **হিরণ্যগর্ভ** সগুণ ব্রহ্মের আরেকটি নাম। সৃষ্টি যখন হতে যাচ্ছে তখন পুরো জিনিষটা যেন একটা ডিমের আকার ধারণ করে। কিন্তু সেই ডিম সুবর্ণের, সেইজন্য তাঁর নাম হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভ থেকে সৃষ্টি ফেটে পড়ছে। মায়ার যে বিভাজন রেখা, যার ওপারে যেন সচ্চিদানন্দ আর তার এপারে সৃষ্টি, ঐ বিভাজন রেখাটা যে জায়গায় ওরই নাম সগুণ ব্রহ্ম, ওরই নাম হিরণ্যগর্ভ, ওরই নাম ব্রহ্মা। সগুণ ব্রহ্মের আরেকটি নাম **সূত্রাত্মা**। এই জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে, সব কিছুর মধ্য দিয়ে তিনি যেন সূতো হয়ে মালার মত ধরে রেখেছেন, সেইজন্য তাঁর নাম সূত্রাত্মা। মা কালী গলায় মুণ্ডমালা দিয়ে সেই সূত্রাত্মাকেই দেখানো হচ্ছে, সৃষ্টিতে যা কিছু আছে সব মায়ের গলায় মুণ্ডমালা হয়ে আছে। মুণ্ডমালাকে আবার বর্ণরূপিণী দেখানো হয়, আমাদের বর্ণমালায় যত বর্ণ আছে সব মায়ের গলায় মুণ্ডমালা হয়ে আছে। মা কালীর গলার মুণ্ডমালাকে দুটো অর্থেই নেওয়া হয়। সগুণ ব্রহ্মের আরেকটি নাম **প্রাণ**। সচ্চিদানন্দের প্রাণন ক্রিয়া হয় না, কিন্তু যেখানেই বস্তু সেখানেই প্রাণন ক্রিয়া চলে। প্রাণ হল এনার্জি, সব কিছুতে প্রাণের প্রবাহ চলতে থাকে কিন্তু শুদ্ধাত্মাতে প্রাণের প্রবাহ হয় না। সচ্চিদানন্দের উপর যখনই মায়ার আবরণ আসে তখনই প্রাণন ক্রিয়া শুরু হয়। যেখানে প্রাণের প্রবাহ সেখানেই সৃষ্টি। সেইজন্য সগুণ ব্রহ্মের আরেকটি নাম প্রাণ। উপনিষদেও বলা হয়, *প্রাণং ত্বমেতি ব্যাজানাৎ*, এই প্রাণকেই ব্রহ্ম বলে জানবে। প্রাণ যেমন একদিকে প্রাণীদের শরীরে কাজ করছে আবার সমষ্টির স্তরে কাজ করছে। সমষ্টির স্তরে যে প্রাণ, সেই প্রাণই সগুণ ব্রহ্মের আরেকটি নাম। সগুণ ব্রহ্মের আরেকটি নাম **বিরাট**। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় যা কিছু আছে, বিশেষ করে ভৌতিক স্তরে যা কিছু আমরা দেখছি, তার যে সমষ্টি রূপ, তাঁকেই বলছেন বিরাট। প্রাণ আর বিরাটের মত সগুণ ব্রহ্মের আরেকটি নাম **অগ্নি**। অগ্নিকে সগুণ ব্রহ্ম রূপে দেখা বেদেই এসে গিয়েছিল। *অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং*, ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রেই অগ্নিকে সগুণ ব্রহ্ম রূপে স্তুতি করা হচ্ছে।

সগুণ ব্রহ্মের এত নাম হওয়ার জন্য বেদ, উপনিষদ বা অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করার সময় আমাদের অনেক সংশয় হয়। একটা জায়গায় প্রাণ বলছে, অন্য জায়গায় অগ্নি বলছেন, অগ্নি বলতে আবার অন্য জিনিষ

বুঝি, প্রাণ বলতেও আমরা আরেকটা বুঝি। নির্গুণ ব্রহ্মের একটাই নাম, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু বলা হয় না, অনেক সময় সচ্চিদানন্দ বলা হয় কিন্তু ব্রহ্মই ঠিক নাম। কিন্তু সৃষ্টি শুরু হয়ে যাওয়ার পর মূল বেদান্তে সগুণ ব্রহ্মের এত নাম এসে যায়। বেদে অনেক সময় শুদ্ধ আত্মাকে ইঙ্গিত করার জন্য পুরুষ বলা হয়। কিন্তু বেদে আদি পুরুষ বা পুরুষসূক্তে যে *সহস্রশিরসা পুরুষঃ* বলছেন এই পুরুষ আর সগুণ ব্রহ্ম আলাদা। সগুণ ব্রহ্ম হল সমষ্টি, সৃষ্টি যেটা হয়ে গেছে, সৃষ্টিতে যেটা সমষ্টি ভাব সেই সমষ্টি ভাবেরই এতগুলো নাম। কিন্তু সৃষ্টির ভেতরে যে চৈতন্য বা চেতন, তাঁর নাম কখন অন্তর্যামী, কখন পুরুষ হয়ে যায়। অনুভূতির স্তরের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে একেবারে শেষ দেখেন ঐ সচ্চিদানন্দ আর এই সমষ্টি বিশিষ্ট সগুণ ব্রহ্ম একই জিনিষ। সচ্চিদানন্দকে যখন মায়ার আবরণ দিয়ে দেখছে তখন ব্রহ্মা বলছে, সেই মায়া দিয়েই দেখার পর কেউ হিরণ্যগর্ভ বলছে, কেউ বিরাট বলছে। মায়ার আবরণকে সরিয়ে দিয়ে দেখলে সেই আদি পুরুষ সচ্চিদানন্দকেই দেখায়। কিন্তু পুরুষকে কখনই আমরা ব্রহ্মা, প্রাণ, হিরণ্যগর্ভ এসব বলতে পারব না। বেদান্তে এই মায়ার বিভাজন রেখা অত্যন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ। অহং ব্রহ্মাস্মি শুনতে শুনতে আমরা মনে করি সবই যদি ব্রহ্ম হয় তাহলে আমি আর ঠাকুর এক। এটাকে বেদান্ত আটকে দিচ্ছে, জীব ব্রহ্ম হতে পারবে কিন্তু কখনই ঈশ্বর হতে পারবে না। আমরা কখনই ঠাকুর হতে পারব না, কখনই আমরা স্বামী বিবেকানন্দ হতে পারব না। এনারা হলেন সমষ্টির মূর্ত রূপ। বিশ্বের বেশির ভাগ ধর্মই, বিশেষ করে ইসলাম বা খ্রীষ্টানদের যে আল্লা বা গড্, এরাও সেই সগুণ ব্রহ্মকেই আল্লা বা গড্ বলছে। হিন্দু ধর্মেও যে অবতারবাদ বা শ্রীকৃষ্ণকে বৈষ্ণব ধর্মে যেভাবে বর্ণনা করা হয় সেখানেও সেই সগুণ ব্রহ্মের ধারণারই বাহ্যিক রূপকে নিয়ে বলা হচ্ছে। অবতার মানেই সগুণ ব্রহ্ম।

সগুণ ব্রহ্মের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল একদিকে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি রূপ, আবার একই সাথে এর মালিকও। সগুণ ব্রহ্মের এই দুটো দিক। যদিও ইংরাজীতে এনারা immanent আর transcendent দুটো শব্দ বলেন, কিন্তু এখানে immanent transcendent নয় এখানে immanent and controller। তিনিই সব কিছু হয়েছেন, তিনিই এই সমষ্টি, তিনিই আবার এর মালিক। ঠাকুরই সব কিছুর মালিক, সেইজন্য আমি আপনি কখনই ঠাকুরের সঙ্গে এক হতে পারব না। এক হবে, যেখানে মায়ার আবরণ নেই। সেইজন্য সগুণ ব্রহ্ম আর জীবকে কখনই এক বলা যাবে না। এই জায়গাতে এসেই বেদান্তীরা অনেক রকমের গোলমাল করে বসেন। তোতাপুরীর সাথে ঠাকুরের যত সম্ভাষণ, সেখানেও তোতাপুরী ঠিক এই ভুলটা করছিলেন। কারণ বিচার করে যখন খুব গভীরে চলে যান তখন তাঁর মনে হয় যিনি সগুণ ব্রহ্ম, যিনি সাকার ঈশ্বর তাঁর আসল রূপ ব্রহ্মেরই রূপ, আর আমিও সেই ব্রহ্মের সঙ্গে এক। যদি $A=B$ হয় আর $B=C$ হয় তাহলে $A=C$ হবে, গাণিতিক নিয়মে তাই হওয়া উচিৎ। কিন্তু বেদান্তে এই নিয়ম চলে না। যেটা গাণিতিক নিয়মে প্রযোজ্য সেটা বেদান্তে প্রযোজ্য হবে না, বেদান্ত বলবে $A=B$ ঠিক, আর $B=C$ এটাও ঠিক কিন্তু $A=C$ কখনই হবে না। আপনি ব্রহ্ম, শ্রীরামকৃষ্ণ যিনি সগুণ ব্রহ্ম তিনিও ব্রহ্ম, কিন্তু আপনি শ্রীরামকৃষ্ণ নন। এই জিনিষটাকেই অনেক বড় বড় বেদান্তীরাও ধরতে পারেন না বলে মানতে চান না।

যদিও তিনি সব কিছুর সমষ্টি, সবটাই তিনি কিন্তু তাঁর আবার নিজস্ব লোক আছে। যেখানে শুধু তাঁরই আধিপত্য। সমস্ত জগতের আধিপত্য ভগবানেরই, ঠাকুরই সব কিছু করছেন। কিন্তু এখানে একজন প্রধানমন্ত্রীও আছেন আবার বিভিন্ন রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীরাও আছেন, নিজের নিজের এলাকায় তাঁদের অনেক রকম আধিপত্য আছে, যদিও এই আধিপত্য ভগবান এদের দিয়ে রেখেছেন, সেখানে তিনি নাক গলাতে যান না। কিন্তু তাঁর নিজস্ব লোকে আর কারও কোন আধিপত্য নেই একমাত্র তাঁরই আধিপত্য। যেমন জমিদারের অনেক কিছুই আছে, তার বাগানবাড়ি আছে, তালুক আছে আর সব জায়গাতে একজন করে নায়েব আছে কিন্তু তার যে বৈঠকখানা সেটার মালিক কিন্তু জমিদার নিজে। এই লোককেই আমাদের প্রচলিত ভাষায় বলা হয় ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মলোক হল পুরোপুরি সগুণ ব্রহ্মের, তিনিই সেখানে সব কিছু। ব্রহ্মলোককেই কৃষ্ণভক্ত বলে বৈকুণ্ঠ, শিবভক্ত বলে শিবলোক, ইদানিং ঠাকুরের ভক্তরা বলে রামকৃষ্ণলোক। এখানে কারুরই খবরদারি চলবে না। জয়-বিজয় বৈকুণ্ঠলোকের দ্বারপাল, সনক-সনন্দন ঋষিদের উপর ওনারা একটু খবরদারি করতে গেছেন, সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপ দিয়ে অসুর করে বৈকুণ্ঠ থেকে নামিয়ে দিলেন। বারো আর তেরো দুটি মন্ত্রে এই ব্রহ্মলোকের বর্ণনা করা হয়েছে। এই লোকে সব রকম শোক, দুঃখ, মৃত্যুকে পার করে যাবে কিন্তু এটা মুক্তি নয়। একদিকে অমর বলা যায়, কারণ সৃষ্টি যত দিন আছে তত দিন সে থাকবে। কিন্তু সেখানেও পূণ্যের ব্যাপার থাকে, পূণ্যের

একটু কম পড়ে গেলে সৃষ্টি শেষ হওয়ার আগের মুহুর্তেও মানুষ সেখান থেকে ফেরত চলে আসতে পারে। কিন্তু পরের দিকে যে আরও উন্নত চিন্তা-ভাবনা এসেছে সেখানে বলা হয়, যাঁরা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁরা সেই সগুণ ব্রহ্মের সাথেই থাকেন, অবতার যখন সৃষ্টিতে আসেন তখন তাঁর সাথে তিনিও চলে আসেন, ঠাকুর যাঁদের বলছেন ঈশ্বরকোটি। অবতারের সঙ্গে যাঁরা আসেন তাঁরা তাঁরই শরীরের অঙ্গ, সেইজন্য তাঁদেরকেও আবার আসতে হয়। ঠিক তেমনি সব কিছু লয় হয়ে যাওয়ার পর আবার যখন সৃষ্টি হবে তখন যাঁরা ব্রহ্মলোকে ছিলেন অথচ মুক্তি হয়নি তাঁদের সবাইকে আবার আসতে হবে, কিন্তু থাকবেন ঈশ্বরের সাথেই।

এই ব্রহ্মলোকে কারা যেতে পারেন? বেদ উপনিষদ বা পুরাণও বলছে, প্রথম যান যাঁরা একশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছেন। কিন্তু পরের দিকে একশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের সাথে ইন্দ্রপদ প্রাপ্তিকেও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। হিন্দু ধর্মের এমন অনেক কিছু আছে যেগুলোকে একটার সাথে আরেকটা মেলানো যায় না। যারা ভোগী তারা ইন্দ্রপদের দিকে তাকিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে আর যাদের মধ্যে ত্যাগ বৈরাগ্যের ভাব, ভক্তি ভাব বেশি তাঁদের লক্ষ্য ব্রহ্মলোক। মূল কথা, ব্রহ্মলোকে যাওয়ার তিনিই যোগ্য যিনি একশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছেন। দ্বিতীয় বলছেন, যাঁরা সগুণ ব্রহ্মের উপাসক, সগুণ ব্রহ্মের যাঁরা ধ্যান করেন তাঁরাও ব্রহ্মলোকে যান। আমাদের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে আমরা তাহলে কিসের উপাসনা করছি? বেদ, উপনিষদ, পুরাণে যত উপাসনার কথা আছে, আমরা তার কোন উপাসনাই করছি না। গুরু আমাদের মন্ত্র দিয়ে দিয়েছেন, মন্ত্র যাতে ভুলে না যাই সেইজন্য দিনে কোন রকমে একশ আটবার করে জপ করে যাচ্ছি। নির্গুণ ব্রহ্মের কথা ভুলে যান, সগুণ ব্রহ্মের কথাও ভুলে যান, ঠিক ঠিক সাধনা যখন শুরু হয় তখন মনে হবে কোন রকমে সাধনা করে যদি গরু ছাগল হয়ে জন্ম নেওয়া থেকে বেঁচে যাই তাতেই অনেক রক্ষা হয়ে যাবে। আমাদের ঠিক ঠিক সাধনা এখনও শুরুই হয়নি। এগুলো অনেক উঁচু কথা, তবে জেনে রাখতে হয়। ঈশোপনিষদে বলছেন *হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু, সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।।* জ্যোতির্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখটাকে আবৃত করে রেখেছ কেন, আবরণটা সরিয়ে দাও, আমি সত্যের মুখ দেখতে চাই। এখানেও সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা চলছে। আগেকার দিনে আরেকটি বিচিত্র ধারণা ছিল, কেউ যদি সন্ন্যাস না নিয়ে সারা জীবন ব্রহ্মচারী হয়ে থাকে, ব্রহ্মচারী মানে সে যজ্ঞ করবে, পূজা-পাঠ করবে কিন্তু বিয়ে করল না, আর খুব পবিত্র জীবন-যাপন করল, এরাও ব্রহ্মলোকে যাবে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা যাবে যে, কর্মের যে উচ্চতম কর্ম ব্রহ্মলোকে নিয়ে যাবে, উচ্চতম দেবতারূপী জ্ঞান ব্রহ্মলোকে নিয়ে যাবে আর উচ্চতম ভক্তিও ব্রহ্মলোকে নিয়ে যায়। অদ্বৈত বেদান্ত যখন বলে মুক্তি মানে সব কিছুর পারে যাওয়া তখন তাঁদের বিরোধীরা নানান ভাবে আক্রমণ করে। আচার্য পুরো জিনিষটাকে যেভাবে অকাট্য যুক্তির উপর ধাপে ধাপে দাঁড় করিয়েছেন আমরা সেটাই অনুসরণ করছি। সেখানে এর অর্থ একটাই, উচ্চতম কর্ম, উচ্চতম জ্ঞান আর উচ্চতম ভক্তি হলে মানুষ এই ব্রহ্মলোকে যায়। যে প্রশ্ন এই তেরো নম্বর মন্ত্রে নচিকেতা করছেন।

যারা একটু নীচে, হয়ত একশটা না করে তার থেকে কিছু কম অশ্বমেধ যজ্ঞ করল, তাদের জন্য উচ্চতম লোক হয়ে গেল চন্দ্রলোক বা তার থেকেও যারা কম পূণ্যবান তারা বিভিন্ন লোকে যায়। ফলে যেমন যেমন পূণ্য ক্ষয় হতে থাকে তেমন তেমন তারা আবার নীচে চলে আসে। কিন্তু যাঁরা আত্মজ্ঞানের পথ নিয়ে নেন, আমার আর কিছু লাগবে না, শুধু আত্মজ্ঞান চাই, তাঁরা এই ব্রহ্মলোকের পথ বা চন্দ্রলোকের পথ বা সূর্যলোকের পথে না গিয়ে সরাসরি আত্মজ্ঞানের পথে চলে যাবেন। সেই নির্গুণ ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্ম হন, যেটা এরা আগে আলোচনা করা হল। মায়ার আবরণের জন্য নির্গুণ ব্রহ্মকে আমরা নানান রূপে দেখছি। আত্মজ্ঞান ছাড়া এই মায়ার আবরণ যাবে না। কঠোপনিষদে পরে আসবে যেখানে বলবেন *মৃত্যোঃ স মৃত্যোমাপ্নোতি*, যারা নানান দেখছে, যত দিন নানা বোধ থাকবে, তত দিন সে মৃত্যু থেকে মৃত্যুকেই পেতে থাকবে। নানা বোধটা শেষ হয় আমি আর তুমিতে গিয়ে, আমি আর ঈশ্বর। এই জগতে কে আছে? হে প্রভু! তুমি ছাড়া এই জগতে আমার আর কেউ নেই। এই কথা কে বলছে? আমি বলছি, আমি আর ঈশ্বরে এসে আটকে গেল। উচ্চতম ভূমিতে ঠাকুর আছেন আর তাঁর মা কালী আছেন, সেখানে আর কেউ নেই। কিন্তু সেখানেও মৃত্যুর চক্র চলবে। আমি আর ঠাকুরই আছি, তার মানে মৃত্যু চক্র চলবে, এখানে কিছু করার নেই। শাস্ত্রই এই কথা বলছে। এই কথার শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ, শ্রুতি মানে একমাত্র বেদ থেকেই জানা যায় এগুলো কি।

ঠাকুর বলছেন যেমন ভাব তেমন লাভ। আপনি আমি যেমন ভাব নিয়ে সাধন করছি মৃত্যুর পর সেই ভাবকেই প্রাপ্ত করব। যে মনে করছে আমি বাবা-মা, প্রিয়জনদের সঙ্গে থাকতে চাই, মৃত্যুর পর সে ঐ লোকেই যাবে। যে বুঝে গেছে এসব লোক থেকে কিছু দিন পরেই ফিরে আসতে হবে, আমাকে আরও উচ্চলোকে যেতে হবে, তখন তাকে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা, অবতারের উপসনা করতে হবে। যারা অদ্বৈত উপাসক তারা আবার অবতারের উপাসনা যারা করে তাদের হেয় মনে করে। আমরা এখানে এই তর্কে যাচ্ছি না। বেলুড় মঠে দীক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে ঠাকুরের যে নির্গুণ নিরাকার রূপ, যেটা শেষ কথা সেই দিকের কথাও বলে দেওয়া হয়। তাই এখানে গীতা উপনিষদ অধ্যয়নের উপরেও জোর দেওয়া হয়। মানুষ সরাসরি নিরাকারের দিকে যেতে পারে না। কিন্তু একটা সময় সগুণ সাকারে ভালোবাসাটা এতই গভীর হয়ে যায় যে, সে তখন বলে আমার আর অন্য কিছু লাগবে না। যেমন রাধা, শ্রীকৃষ্ণকে এমন ভালোবাসছেন যে তাঁর কাছে শ্রীকৃষ্ণ সগুণ ব্রহ্ম না নিরাকার ব্রহ্ম তাতে তাঁর আর কিছু আসে যায় না, আমি তাঁকে ভালোবাসি, চিরদিন আমি তাঁর সাথেই থাকব, এখানেই সব শেষ। শ্রীকৃষ্ণ যদি আবার জন্ম নেন? তাতে কি আছে, আমিও তাঁর সাথে জন্ম নেব, তিনি যদি হাজার বার জন্ম নেন আমিও হাজার বার জন্ম নেব। এই ভাব খুব উচ্চমানের ভাব, আমাদের পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব। আমরা এখানে সগুণ ব্রহ্মের কত রকম নাম হতে পারে আলোচনা করছিলাম। তার মধ্যে যেমন একটা নাম বিরাট, ভৌতিক জগতে যাবতীয় যা কিছু সব কিছুর সমষ্টি মিলিয়ে বিরাট। এই বিরাটের যাঁর অনুভূতি হয়ে যায় তিনি দেখেন এই যে সমষ্টি এটা আমিই। সমষ্টির সাথে যাঁর একত্বের অনুভূতি হয়ে গেল, তিনি সব কিছুর মালিক হয়ে গেলেন। এই মন্ত্রে বা পরে যে মন্ত্র আসবে তাতে এই বিরাট পদের বর্ণনা করা হয়েছে। মায়ার রাজ্যে, প্রকৃতির রাজ্যে বিরাট পদের উপরে আর কিছু শ্রেষ্ঠ হতে পারে না।

প্রকৃতির পারে কিছু আছে কি নেই জানার জন্য সেই শ্রুতিই প্রমাণ। মায়ার এলাকা সবাই অতিক্রম করতে পারে না। আর যতক্ষণ মন, বুদ্ধির এলাকায় থাকবে ততক্ষণ উচ্চতম লোক হল *স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্ত*। এই অমরত্বের ভাব একমাত্র বিরাট লোককে নিয়েই হয়, এই বিরাট পদেই হয়। সেটাই এখানে নচিকেতা বলছেন *এতদ্ দ্বিতীয়েণ বৃণে বরেণ*, আপনি যে আমাকে দ্বিতীয় বর চাইতে বলেছেন, দ্বিতীয় বরে এই বিরাট পদ কীভাবে পাওয়া যেতে পারে বলুন। নচিকেতা এখানে সাধারণ স্বর্গের কথা জানতে চাইছেন না, সাধারণ স্বর্গের কথা নচিকেতা আগে থেকেই জানেন, কারণ তাঁর বাবাকে যজ্ঞাদি করতে দেখেছেন।

এর পরে পরে যে মন্ত্রগুলি আসবে সেখানে ব্যাখ্যা করা হবে এই বিরাট পদে পৌঁছানোর জন্য একটা বিশেষ সাধনা আছে। এমনি সরাসরি যজ্ঞ করে ওখানে পৌঁছান যায় না। নচিকেতার প্রশ্ন শুনে যমরাজ খুশী হয়ে বলছেন *মৃত্যোঃ প্রতিজ্ঞেয়ম্*, এখানে প্রতিজ্ঞা শব্দের অর্থ বাংলা প্রতিজ্ঞা নয়, এই প্রতিজ্ঞা মানে যমরাজ আশ্বাস দিচ্ছেন। কি আশ্বাস দিচ্ছেন –

প্র তে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ
স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্।
অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং
বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং গুহায়াম্।।১/১/১৪।।

(যমরাজ বলছেন 'হে নচিকেতা! যে অগ্নি দ্বারা স্বর্গলাভ হয় সেই অগ্নির স্বরূপ আমি জানি এবং তোমাকে তা বলছি, তুমি একাগ্র মনে আমার কাছ থেকে জেনে নাও। আর তুমি জেনো, এই অগ্নিই স্বর্গপ্রাপ্তির উপায় ও জগতের আশ্রয় এবং এই বিদ্যা বিদ্বানদের বুদ্ধিতে অবস্থিত।)

এর আগে বারো নম্বর মন্ত্রে নচিকেতা বর্ণনা করে বলে দিলেন আমার কি রকম স্বর্গ চাই। স্বর্গের বর্ণনা করে বললেন এই স্বর্গপ্রাপ্তির বিদ্যা আমার চাই। আচার্য সেখানে যোগ করছেন দেবত্ব, অর্থাৎ দেবতারা ঠিক ঠিক যে লোকের বাসিন্দা। যমরাজ সেই স্বর্গের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনিও সেই লোকের স্তুতি করছেন। স্তুতি করে অর্দ্ধেক উত্তরে বলছেন – তুমি যে লোকের ব্যাপারে জানতে চাইছ, আমি আশ্বাস দিচ্ছি যে আমি তোমাকে বলব, *তদু মে নিবোধ*, মন দিয়ে একাগ্র চিত্ত হয়ে শোন। যে কোন আচার্য কোন কঠিন বিষয়ে শিষ্যদের কাছে বলার সময় শিষ্যদের মনকে আকর্ষণ করার জন্য বলেন তোমরা মন দিয়ে শ্রবণ কর। একাগ্র চিত্ত হয়ে যদি না শোনা হয় তাহলে বিদ্যাটা মাথা থেকে বেরিয়ে যাবে। কারণ যমরাজ এখানে নচিকেতার

নিয়মিত আচার্য নন। রাস্তায় যেতে যেতে আপনি কাউকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি অমুক জায়গায় যেতে চাই, কিভাবে যাওয়া যাবে একটু বলে দেবেন? ভদ্রলোক এবার আপনাকে বলবেন 'আপনি মন দিয়ে শুনুন, এখান থেকে দশ পা এগিয়ে যাবেন, সেখানে ডান দিকে একটা গলি আছে, সেই গলি দিয়ে পাঁচ পা ফেলার পর বাঁ দিকে একটা গলি পাবেন'। আপনি মন দিয়ে যদি না শোনেন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে থেকে বারবার আপনাকে বলতে যাবেন না। আপনাকে তাই একাগ্র চিত্তে মন দিয়ে শুনে নিতে হবে। উনি বলে দিয়ে এবার নিজের মত চলে যাবেন। যমরাজও এবার নিজের লোকে থাকবেন আর নচিকেতাকে ফেরত চলে আসতে হবে, আবার কবে দুজনের দেখা হবে কোন ঠিক নেই। সেইজন্য বলছেন মন দিয়ে শোন।

স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্, নচিকেতা! তুমি যে অগ্নির কথা জিজ্ঞেস করলে, এই অগ্নিবিদ্যার আমি বিশেষজ্ঞ। কেন তিনি বিশেষজ্ঞ? যমরাজ সৃষ্টিতে প্রথম জাত, তাই তাঁর মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য আর সমস্ত জ্ঞান তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। *অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং*, অনন্তলোক অর্থাৎ যে লোকের কখন নাশ হয় না, যতদিন সৃষ্টি আছে ততদিন এই লোক থাকবে, *অথো প্রতিষ্ঠাং*, যার উপর এই অনন্তলোক দাঁড়িয়ে আছে। গীতায় যেমন ভগবান বলছেন *সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে* সম্মানিত ব্যক্তির যদি সম্মান চলে যায়, সম্মান মানে প্রতিষ্ঠা, এই প্রতিষ্ঠা চলে যাওয়ার থেকে তার মৃত্যু হয়ে যাওয়া ভালো। প্রতিষ্ঠা মানে স্থাপনা, ওর উপর তিনি স্থাপিত হয়ে আছেন। ঐ যে অনন্তলোক, যে ব্রহ্মলোকের কথা বলা হচ্ছে, সেই লোক যার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত? অগ্নির উপর, যজ্ঞের উপর প্রতিষ্ঠিত। নচিকেতা দ্বিতীয় বরে এই ব্রহ্মলোক কি করে পাওয়া যায় বলাতে যমরাজ এই কথা বলছেন। যে অগ্নি দিয়ে অর্থাৎ যে যজ্ঞ দিয়ে এই ব্রহ্মলোক পাওয়া যায় আমি তোমাকে বলছি। এই অগ্নি সাধারণ অগ্নি নয়, এই অগ্নি অগ্নিবিদ্যা, বিশেষ অগ্নি। *বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং গুহায়াম্*, পুরো জগতের যে প্রতিষ্ঠা, সেই অনন্তলোক যার উপর দাঁড়িয়ে আছে, তুমি জানবে সেই বিদ্যা প্রত্যেকটি মানুষের যে হৃদয়রূপী গুহা, তার মধ্যে লুকিয়ে আছে। গীতাতেও বলছেন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। পুরুষসূক্তেও একই কথা বলছে, সৃষ্টি যখন হয়েছিল তখন যিনি অধিপুরুষ তাঁকে যজ্ঞ রূপে বলি দেওয়া হয়েছিল, যেখান থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। মানুষ যে লোকেই যেতে চায় যজ্ঞ করলেই সেই লোকে যেতে পারে, এটাই বেদের দৃঢ় মত।

নচিকেতা সেই যজ্ঞের কথা জানতে চেয়েছেন। যমরাজও বলছেন, *স্বর্গ্যমগ্নিম্* সেই স্বর্গকে পাওয়ার জন্য যে অগ্নির প্রয়োজন, অথচ বলছেন *বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং গুহায়াম্*, তোমারই বুদ্ধির মধ্যে, হৃদয়রূপী গুহা মানেই বুদ্ধি, লুকিয়ে আছে। আচার্য বলছেন, *ত্বম্ নিহিতং স্থিতং গুহায়াং বিদুষাং বুদ্ধৌ*, যাঁরা তত্ত্বজ্ঞ বুদ্ধিমান পুরুষ তাঁরা জানেন তাঁদের বুদ্ধিতে অর্থাৎ বুদ্ধিরূপী গুহা, তার মানে অত্যন্ত গভীরে এই বিদ্যা লুক্কায়িত হয়ে আছে, যেখানে সাধারণ মানুষ পৌঁছাতেই পারবে না। যাঁরা বিরাট বিদ্বান পুরুষ একমাত্র তাঁরাই এই বিদ্যাকে জানতে পারেন। এই যে বিরাট পদ পাওয়ার যে বিদ্যা বা ব্রহ্মলোকে যাওয়ার যে বিদ্যা এই বিদ্যা কোথায় আছে? যমরাজ বলছেন, মনীষী যাঁরা তাঁদের বুদ্ধির গুহাতে। তার মানে, সবারই ভেতরে সেই ক্ষমতা আছে যে ক্ষমতায় মানুষ সেই ব্রহ্মলোককে প্রাপ্ত করতে পারে। শুধু প্রথমে তাঁকে মনীষী হতে হবে, গভীর চিন্তন করতে হবে, গভীর ভাবে সূক্ষ্ম বিচার করার ক্ষমতা থাকতে হবে। অন্তরতমে গিয়ে যখন ওটাকে বিচার করে করে ঐ জায়গাতে পৌঁছবে তখন বুঝতে পারবে – এই জ্ঞান হলে ব্রহ্মলোক পাওয়া যায়। কি রকম সেই জ্ঞান –

লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ
যা ইষ্টকা যাবতীর্বা যথা বা।
স চাপি তৎ প্রত্যবদদ্ যথোক্ত-
মথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ।।১/১/১৫।।

(যমরাজ তখন নচিকেতাকে সৃষ্টির আদিভূত অগ্নির বিষয়ে উপদেশ দিলেন, কি প্রকার এবং কত সংখ্যক ইষ্টক সংগ্রহ করতে হয় ও কিভাবে অগ্নি চয়ন করতে হবে সব বললেন। নচিকেতাও বুঝে নিয়ে যথাযথ ভাবে তার পুনরুক্তি করলেন। তখন যম নচিকেতার উক্তিতে তুষ্ট হয়ে পুনরায় বললেন)।

এখানে দুটো জিনিষ, একটা হল অগ্নি, অর্থাৎ যজ্ঞের ব্যাপার-স্যাপার আর যমরাজ বলছেন বুদ্ধিরূপী গুহা, সব মানুষের বুদ্ধির মধ্যে এই বিদ্যা লুকিয়ে আছে। একই সাথে জ্ঞান আর কর্মের কথা বলছেন। যমরাজ ছিলেন প্রথম শরীরি, মানে যিনি প্রথম মৃত্যুকে পেয়েছিলেন। তাছাড়া তাঁর মধ্যে সত্ত্বগুণ থাকাতে সব জ্ঞান তাঁর

মধ্যে রয়েছে। দেহধারীদের মধ্যে যমরাজের থেকে আর কেউ উচ্চতর হতে পারেন না, সেইজন্য তাঁর নাম ধর্মরাজ। প্রথম শরীর হওয়ার জন্য তিনি মূলা অগ্নি, মূলা শক্তি যে শক্তি দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে তিনি সেই অগ্নিকে জানেন। কারণ তিনি সেই অগ্নির সব থেকে কাছের, জন্ম থেকেই তাঁর এই জ্ঞান আছে। একদিকে ব্রহ্মা অশরীরি, সূর্য তিনিও অশরীরি কিন্তু যমরাজ হলেন শরীরি। ব্রহ্মা এই বিদ্যা জানেন, কিন্তু সেখান পর্যন্ত কেউ পৌঁছাতে পারবে না, সূর্যও জানেন তাঁর কাছেও কেউ পৌঁছাতে পারবে না, কিন্তু যমরাজের কাছে নচিকেতা পৌঁছে গেছেন। এখন নচিকেতাকে সেই বিদ্যার কথা যমরাজ বলছেন। যদিও এর আগে বললেন *বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং গুহায়াম্*, কিন্তু এই মন্ত্রে তিনি যজ্ঞের বর্ণনা করছেন। এখনও বেদে এই যজ্ঞের বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে বলা হয় সাতশ কুড়ি খানা ইষ্টক লাগে। বছরে তিনশ ষাটটি দিন আর তিনশ ষাটটি রাত হয়, এটাকেই প্রতীক রূপে সাতশ কুড়িটি ইটের কথা বলা হচ্ছে। এই সাতশ কুড়িটি ইট দিয়ে এক বিশেষ পদ্ধতিতে যজ্ঞের বেদি নির্মাণ করা হয়। এইভাবে যজ্ঞ বেদি নির্মাণ করে এই এই ভাবে যদি কেউ অগ্নি চয়ন করে তাহলে সে ব্রহ্মলোকে যাবে। এখানে নচিকেতা চাইছেন কেউ যদি একশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ না করতে পারে বা কেউ যদি ব্রহ্মচারীর জীবন পালন না করে তাহলে সে কিভাবে ব্রহ্মলোকে যেতে পারবে। এর কি কোন শর্টকাট মেথড আছে? যমরাজ বলছেন, হ্যাঁ আছে, যদি এভাবে যজ্ঞবেদী তৈরী করা হয়, আর এই এই ভাবে যদি যজ্ঞ সম্পাদন করা হয় তাহলে সে ব্রহ্মলোকে যেতে পারবে। ঠিক কি প্রক্রিয়াতে এই বিরাট পদকে প্রাপ্ত করেন পরে একটা জায়গায় আচার্য যখন এই ব্যাপারে বলবেন, তখন তিনি দেখাবেন জিনিষটা কিন্তু শর্টকাট নয়।

যমরাজের বর্ণনা নচিকেতা খুব একাগ্র চিত্তে শুনে গেলেন। তখন বলছেন *স চাপি তৎ প্রত্যবদদ্ যথোক্তম্*, যমরাজ যেমনটি বলেছেন তার পুরোটাই নচিকেতা ঠিক তেমনটি যমরাজকে শুনিয়ে দিলেন। নচিকেতার এই মেধা দেখে যমরাজ চমকিত হয়ে গেছেন। নচিকেতা তো বিরাট শ্রুতিধর, যা যা শুনেছে সব মনে রেখেছে। *অথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ*, যমরাজ অবাক হয়ে গেলেন, তুমি যে খুব জেদী তা নয়, তুমি শ্রুতিধর, তোমার মধ্যে শ্রদ্ধা আছে, তুমি খুব মন দিয়ে সব শুনেছ আর আমি যা যা বলেছি সবটাই তুমি মনে রেখেছ। তখন যমরাজ খুব খুশী হয়ে বলছেন –

তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা
বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ।
তবৈব নাম্না ভবিতাহয়মগ্নিঃ
সৃঙ্কাং চেমামনেকরূপাং গৃহাণ।।১/১/১৬।।

(যমরাজ খুব প্রীত হয় নচিকেতা বললেন 'আমার এই প্রীতির জন্য তোমাকে আরেকটি চতুর্থ বর দিচ্ছি। আজ থেকে এই অগ্নি তোমার নামেই প্রসিদ্ধ হবে। আর তুমি এই শব্দময় এবং বহুরত্নখচিত মালাও গ্রহণ কর)।

এর আগে বেদে এই অগ্নির কোন নাম ছিল না। উচ্চমানের ঋষিরা এই অগ্নির ব্যাপারে সব জানতেন। আমরা শুধু জানি নচিকেতা এই অগ্নিকে পৃথিবীলোকে নিয়ে এসেছেন। এর মধ্যে অনেক সময় পৌরাণিক চিন্তা ভাবনা থাকে, যেমন গ্রীক পুরাণে বলা হয় প্রমিথিউস স্বর্গ থেকে প্রথম পৃথিবীতে অগ্নি নিয়ে এসেছিল। ঠিক তেমনি এখানে অঙ্গিরস প্রথম অরণি কাঠ মন্থন করে কিভাবে যজ্ঞের অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করতে হয় সেই কৌশলটা আবিষ্কার করেছিলেন। ঠিক সেই রকম নচিকেতা যেন স্বর্গলোক থেকে এই বিদ্যাটা নিয়ে এলেন।

যমরাজ নচিকেতার ক্ষমতা দেখে খুব খুশী হয়ে গেছেন। খুশী হয়ে তখন যমরাজ বলছেন *তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ*, তোমাকে আমি তিনটে বর দেওয়ার কথা বলেছিলাম, কিন্তু আমি খুশী হয়ে অতিরিক্ত আরেকটি বর দিচ্ছি। কি বর দিচ্ছেন? *তবৈব নাম্না ভবিতাহয়মগ্নিঃ*, আজ থেকে এই অগ্নি, যার এখন পর্যন্ত কোন নাম নেই, তোমার নামে বিখ্যাত হবে, এই অগ্নির নাম হল নচিকেতাগ্নি বা নাচিকেতঃ অগ্নি। তাই না, তোমার প্রতিভা দেখে আমি উচ্ছ্বসিত। সেইজন্য *সৃঙ্কাং চেমামনেকরূপাং গৃহাণ*, এই বিচিত্ররূপা দিব্যমালা তোমাকে দিচ্ছি। আচার্য *সৃঙ্কাং* শব্দের অর্থ করতে গিয়ে বলছেন *সৃঙ্কাং শব্দবতীং*, এই দিব্য মালা যেন শব্দ করে। কি শব্দ হয় আমাদের জানা নেই, কিন্তু এই মালা স্বর্গের দিব্য মালা। *সৃঙ্কাং* শব্দের দ্বিতীয় অর্থ করছেন *সৃঙ্কামকুৎসিতাং গতিং কর্মময়ীং গৃহাণ*, অর্থাৎ যে কর্ম অনিন্দনীয় এবং প্রশংসিত। যদি সৃঙ্কাং শব্দের অর্থ

প্রশংসিত কর্ম হয় তাহলে এর অর্থ হয়ে যাবে, তোমাকে অগ্নির কথা বলা হল এর সাথে অগ্নির বিধি এবং আরও কিছু কিছু কর্মের স্তুতি তোমাকে বলতে যাচ্ছি।

এখানে এসে ব্যাপারটা একটু কঠিন হয়ে যায়। আমরা সাধারণতঃ মনে করি বেদের কর্ম মানেই যজ্ঞ, যজ্ঞে আহুতি দিলেই সব হয়ে গেল। জিনিষটা অত সহজ নয়। বেদের কর্ম মানেই যজ্ঞাদির কর্ম, এই পর্যন্ত ঠিক আছে। বেদের সময় যজ্ঞ কর্মের এতই গুরুত্ব ছিল যে কিছু শাস্ত্র শুধুমাত্র কর্মের স্তুতিতে পুরোপুরি উৎসর্গ করে দিয়েছিল। এমনকি বৃহদারণ্যক উপনিষদেও কর্মের স্তুতি করা হয়েছে। কয়েকজন মুষ্টিমাত্র লোক, যাঁরা সন্ন্যাসের পথে চলে যেতেন বা অদ্বৈত মতে সাধনা করতেন, তাঁদের ছাড়া বাকি সবার জন্য কর্মই প্রধান ছিল। *সৃঙ্কাং চেমামনেকরূপাং গৃহাণ*, এখানে এর একটা অর্থ হতে পারে নচিকেতাকে যমরাজ খুব সুন্দর শোভনীয় একটা দিব্যমালা দিলেন, যে মালা স্বর্গলোকেই থাকে, সাধারণ লোক যা কখন দেখতে পায় না। এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, কর্মের যে গহনা গতির দ্বারা মানুষ সাংসারিক জীবনে শ্রেষ্ঠতম অবস্থা পেতে পারে, কর্মের সেই গুহ্য উপদেশ তোমাকে আমি অতিরিক্ত হিসাবে দিলাম। আচার্য এখানে দুটো অর্থই করে দিলেন, কারণ পরের দুটি মন্ত্রে গিয়ে আবার কর্মের কয়েকটি বিধান এবং তার সাথে কর্মের স্তুতি করা হবে। এবার যমরাজ নচিকেতাকে কর্মবিধানের বিদ্যা, যার দ্বারা মানুষ ইহলোকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে, সেই বিদ্যাটা দেবেন।

ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং
ত্রিকর্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যু।
ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি।।১/১/১৭।।

(মাতা, পিতা ও আচার্য এই তিনের দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে যিনি তিনবার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করেন এবং ত্রিকর্ম (যজ্ঞ, দান ও বেদাধ্যয়ন) করেন, তিনি জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করেন, তিনি শাস্ত্রাদি সহায়ে হিরণ্যগর্ভ-সম্ভূত সর্বজ্ঞ, পূজনীয় ও জ্ঞানাদি-গুণসম্পন্ন বিরাটস্বরূপকে অবগত হয়ে তাঁকে আত্মস্বরূপে অনুভব করে এই স্বসংবেদ্য শান্তি সবিশেষরূপে প্রাপ্ত হন)।

উপনিষদ কখনই যজ্ঞের বর্ণনা করে না। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণেই শুধু যজ্ঞের বর্ণনা থাকে। উপনিষদে যখনই যজ্ঞের বর্ণনা আসে, বুঝে নিতে হবে এই বর্ণনার সাথে কোন না কোন ভাবে ধ্যানের ব্যাপার জড়িয়ে আছে। ধ্যানের ব্যাপার যদি একেবারেই না থাকে তাহলে উপনিষদে কখনই আসবে না। যদিও এখানে নাচিকেতঃ অগ্নির বর্ণনা চলছে কিন্তু এর সাথে যে ধ্যানের ভাব আছে, সেটা এই মন্ত্রে পরিষ্কার বোঝা যায়। এখানে যে বলছেন জন্মমৃত্যুর পারে যাওয়া, এই জন্মমৃত্যুর পারে যাওয়াটা relative immortality, কারণ সৃষ্টি যত দিন আছে তাঁকে আর জন্ম নিতে হবে না, যদিও বা জন্ম নিতে হয় তাও অনেক দিন পরে। আচার্য যদিও এই যুক্তি নেন, কিন্তু মাধ্বাচার্য এই মন্ত্রকেই যখন দ্বৈতবাদের নিরিখে প্রতিষ্ঠিত করেন তখন তিনি জিনিষটাকে পুরো উল্টো ঘুরিয়ে দেন। মাধ্বাচার্য অদ্বৈত ভাবকে ক্ষণিক ভাব বলেন, তাঁর মতে অদ্বৈত ভাব কখনই স্থায়ী ভাব নয়। স্থায়ী ভাব হল, আমি সেবক তিনি সেব্য, আমি দাস তিনি মালিক। ঘুমের মধ্যে যেমন জগতের লয় হয়ে যায়, ঘুম ভাঙার পর জগৎ আবার ফিরে আসে, ঠিক তেমনি সমাধিতে মন লয় হয়ে যায়, সমাধির পর আবার দ্বৈত ভাব এসে যায়। উপনিষদে যত অদ্বৈত ভাবের মন্ত্র রয়েছে, সব মন্ত্রকেই মাধ্বাচার্য relativeএর দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করেন। হাজার বছর, পনেরশ বছর ধরে এই উপর তর্ক-বিতর্ক চলে আসছে, এখনও এর কোন সমাধান নেই। সেইজন্য মাধ্বাচার্যের অনুগামীরা তাঁরা কঠোর ভাবে দ্বৈতবাদের ব্যাখ্যাকেই অনুসরণ করেন, অন্য দিকে শঙ্করাচার্যের অনুগামীরা আচার্যের ব্যাখ্যাকেই অনুসরণ করেন। *তরতি জন্মমৃত্যু*, জন্মমৃত্যুর পারে চলে যান, এই ভাব বিভিন্ন জায়গায় আসে। বিভিন্ন জায়গায় যখন বলা হয় তখন এই *তরতি জন্মমৃত্যু* হয় আত্মজ্ঞান থেকে, কিন্তু এখানে বলছেন উপাসনা থেকে বা যজ্ঞ থেকে।

এই জন্মমৃত্যুর পারে যাওয়াকে আচার্য বলতে চাইছেন, অনেক দিন তাকে আর জন্মমৃত্যুর চক্রে ঘুরতে হবে না। কি করলে তাকে জন্মমৃত্যুর চক্রে ঘুরতে হবে না? *ত্রিনাচিকেতঃ*, যমরাজ এক্ষুণি নাম দিলেন *নাচিকেতঃ অগ্নি*, বলছেন যিনি তিন বার এই নাচিকেত অগ্নির চয়ন করেছেন তিনি ব্রহ্মলোকে যাবার যোগ্য হবেন। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করে যদি কেউ ব্রহ্মলোকে যেতে চান তখন তাঁকে যে যজ্ঞ করতে হয় সেই যজ্ঞে বিশেষ কিছু বিধি আছে। এর আগে বলা হয়েছে যিনি একশ বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছেন তিনি ব্রহ্মলোকে

যাবেন, কিন্তু এখানে সহজ করে দেওয়া হল, যিনি মাত্র তিনবার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করবেন তিনি জন্মমৃত্যুর পারে চলে যাবেন, অনেকদিন তাঁকে জন্মমৃত্যুর চক্রে আসতে হবে না।

আচার্য এখানে নিজের থেকে কিছু জিনিষকে ব্যাখ্যা করছেন। *ত্রিণাচিকেতঃ* এই তিনবার এভাবেও হতে পারে, এক হল জিনিষটাকে জানলেন, দুই জানার পর জিনিষটাকে গভীর ভাবে অধ্যয়ন করলেন আর তিন শেষে এর অনুষ্ঠান করলেন। অথবা এও হতে পারে, যিনি তিনবার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করেছেন। এখানে একটা জিনিষ বোঝার আছে। জগতের কোন কিছুর প্রতি আকর্ষণ ভালোবাসা থাকা মানেই তার মন বৈষয়িক। বৈষয়িক মন কর্ম ছাড়া থাকতে পারে না। কিন্তু এদের থেকে একটু যারা উপরে উঠে গেছে, এরাও যে এর ওর সাথে নিজেকে জুড়ে রেখেছে, এই জুড়ে রাখাটাও ভাসা ভাসা, গভীর ভাবে কারুর সাথে জুড়ে নেই, তারা বুঝতে পারে কর্মের কোন দাম নেই। কর্মের পেছনে একটা বিচার, একটা শক্তি কাজ করছে, তারা জানে যে আমাকে এই মূল জিনিষটাতে জোর দিতে হবে। আচার্য সেইজন্য দুটোর কথাই বলছেন, পুরো বেদে যজ্ঞের কথাই বলা আছে, এখানে উপনিষদে এসেও তিনবার সেই যজ্ঞের কথা বলছেন। কিন্তু তাও সন্দেহ থেকে যায়, কারণ এটা উপনিষদের কাজ নয়। সেইজন্য তিনি বলছেন দুবার যদি মানসিক ভাবে করে, এই যজ্ঞের ব্যাপারে জানছে তখন একবার হয়ে গেল আর অধ্যয়ন অর্থাৎ গভীর ভাবে মনন-চিন্তন করছে, বোঝার চেষ্টা করছে তখন দ্বিতীয় বার হয়ে গেল আর অনুষ্ঠান করল, মোট তিন বার হয়ে গেল। *ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং*, আর তিনজনের সাথে সন্ধি, সন্ধি মানে সন্ধান বা জুড়ে যাওয়া, সন্ধান মানে আবার উপদেশ গ্রহণ করা। বলা হয় সন্ধান সব সময় তিনটে। *ত্রিসন্ধিং* মানে হয়, মা, বাবা ও গুরু, এই তিনজনের কাছ থেকে উপদেশ নেওয়া, সেখান থেকে এসে গেল ত্রিসন্ধ্যা। আসল হল জুড়ে যাওয়া। কিসের সাথে জুড়ে যাওয়া? জ্ঞানের সাথে। আচার্য বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন যথা *'মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্যমান্'*। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আলোচনা চলছে, শিক্ষা বা জ্ঞান কে দিতে পারেন? বলছেন মা, বাবা আর আচার্যের কাছে শিক্ষা পেয়েছে। মনুস্মৃতিতে আবার স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে মা, বাবা আর আচার্য এই তিনজনের কার কতটা স্থান। মনুস্মৃতিতে অবশ্য কখন মাকে আবার কখন আচার্যের স্থানকে উপরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাবা সব সময় মাঝখানে থাকেন। মা, বাবা আর আচার্যের কাছে যদি শিক্ষা না নিয়ে থাকে তাহলে কিন্তু এই বিদ্যা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এখানে বলে দিলেন *ত্রিভিরেত্য সন্ধিং*, কিন্তু পরিষ্কার করে বলছেন না কার সাথে এবং কিসের সাথে জুড়ে আছে। কিন্তু আচার্য বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাচ্ছেন বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই ভাবে বলে দেওয়া হয়েছে, যেখানে বলা হচ্ছে অধিকার তাদেরই হয় যারা এই তিনজন – মা, বাবা আর আচার্যের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যদিও এই কথা বলা হচ্ছে কিন্তু এই মন্ত্রে শুধু বলছেন *ত্রিসন্ধিং*, শিক্ষা তিনজনের সাথে জুড়ে রয়েছে।

তখন আচার্য বলছেন, এমনও হতে পারে *বেদ-স্মৃতি-শিষ্টৈর্বা*, বেদ, স্মৃতি আর শিষ্ট পুরুষের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছে। আচার্য খুব পরিষ্কার, তিনি বলছেন উপনিষদেই বলছেন সন্ধান তিনটে জায়গায় হয়, মা, বাবা ও গুরু। আবার সেটা নাও হতে পারে, কারণ এখানে পরিষ্কার করে বলছেন না। তাহলে এটাও হতে পারে সে বেদ থেকে জেনেছে, স্মৃতি শাস্ত্র থেকে জেনেছে, স্মৃতি থেকে জানা মানে মহাভারত, রামায়ণ, মনুস্মৃতি আদি শাস্ত্র থেকে জানতে পারে। তখনকার দিনে অবশ্য অন্য ধরণের শাস্ত্রও ছিল, রামায়ণ, মহাভারত পরের দিকে এসেছে, কিন্তু স্মৃতিমূলক শাস্ত্র চিরদিনই ছিল। মূল বেদের বাইরে যে শাস্ত্র ধর্মীয় উপদেশ আর ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের শিক্ষা দিত সেই শাস্ত্রকেই স্মৃতিমূলক শাস্ত্র বলা হত। বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের বাইরে ভারতে বেশির ভাগ ঋষিরাই স্মৃতিকার ছিলেন। স্মৃতিকারের অর্থ হল, পুরনো যে জিনিষগুলো রয়েছে সেগুলোকে সংগ্রহ করে একটা জায়গাতে সংকলন করে সুন্দর করে সাজিয়ে দেওয়া। আমরা অনেক সময় বলি পতঞ্জলি যোগসূত্র দিয়েছেন, কিন্তু যোগদর্শন পতঞ্জলি দেননি। ভারতে যোগের অনুশীলন আগে থেকেই হয়ে আসছিল, পতঞ্জলি যোগের সব কিছুকে সংগ্রহ করে একটা জায়গায় সুন্দর করে সাজিয়ে দিলেন। যেমন সংস্কৃতের ব্যাকরণ চিরদিনই ছিল, কিন্তু পাণিনি দেখলেন জিনিষগুলো বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে আছে, তাই তিনি সবটাকে একটা জায়গায় নিয়ে একটা নির্দিষ্ট প্রণালীর মধ্যে সাজিয়ে দিলেন, সেটাই পরে হয়ে গেল পাণিনির ব্যাকরণ। এর থেকেও বড় ব্যাপার হল, মনুস্মৃতিতে মনু নিজস্ব কোন বিধানই দেননি। এর আগে আগে স্মৃতিকাররা যা যা বলে গেছেন তাঁদের সব কিছুকে সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করে রেখে দিলেন, সেটাই হয়ে গেল মনুস্মৃতি। সেইজন্য

মনুস্মৃতিতে অনেক বিপরীত কথা দেখা যায়। যেমন এক জায়গায় বলছেন ব্রাহ্মণ মরে যাবে কিন্তু অপাত্রে কখনই বিদ্যা দান করবে না। কিন্তু অন্য জায়গায় আবার বলছেন, বিদ্যা এভাবে নষ্ট হয়ে যাবে, তার থেকে কাউকে শিখিয়ে দেওয়া অনেক ভালো। মনুস্মৃতি যদি একক কোন ব্যক্তির রচনা হত তাহলে এই ধরণের বিপরীত কথা থাকত না। যখনই আমরা বলি অমুক গ্রন্থকার, আসলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন স্মৃতিকার। যে জিনিষগুলো আগে থেকেই ছিল সেগুলোকে সংগ্রহ করে তাঁরা একটা জায়গায় গুছিয়ে রেখেছেন। স্মৃতি চিরদিনই ছিল, উপনিষদাদি রচনার সময়ও স্মৃতি ছিল। আর আচার্য যখন ছিলেন তখনতো অবশ্যই ছিল। এটাই আচার্য বলছেন, মা, বাবা ও আচার্য এই তিনজন ছাড়াও শিক্ষা এই তিন জায়গা থেকে নিয়ে থাকতে পারে – বেদ থেকে শিক্ষা নিয়েছে, স্মৃতি থেকে শিক্ষা নিয়েছে আর শিষ্ট পুরুষের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়ে থাকতে পারে। এখানে শব্দটা বলছেন শিষ্ট পুরুষ, শিষ্ট পুরুষ মানে দীক্ষা গুরু নন। শিষ্ট পুরুষ যে কেউ হতে পারেন, যাঁকেই মনে হবে এনার কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া যেতে পারে তাঁকেই শিষ্ট পুরুষ বলা যেতে পারে।

আচার্য আবার বলছেন ত্রিসন্ধি বলতে এমনও হতে পারে *প্রত্যক্ষানুমানাগমৈর্বা*, প্রত্যক্ষ, অনুমান আর আগম এই তিন প্রমাণের কথা বলছেন। প্রমাণ মানে যার দ্বারা আমরা একটা জিনিষকে জানতে পারি। বেদান্তে ছয়টি প্রমাণের কথা বলা হয়। সাধারণ মানুষের জীবন প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর চলে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দিয়ে যে জ্ঞান প্রাপ্ত করা হয়। যাঁরা একটু উন্নত তাঁরা অনুমান প্রমাণ দিয়ে জীবন চালান। বেশির ভাগ বিজ্ঞানীরা অনুমান প্রমাণের উপর দিয়ে চলেন। অনুমান প্রমাণ মানে যুক্তি দিয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসা। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কোন কাজ করে না, অনুমান প্রমাণও কোন কাজ করে না, একমাত্র আগম প্রমাণই কাজ করে, আগম মানে বেদ। প্রত্যক্ষ, অনুমান আর আগম এই তিনটেকে নিয়ে নিজের বিচারকে একেবারে পরিষ্কার করে বুঝে গেছেন আমাকে এই এই করতে হবে।

এবার তিনি কি করবেন? *ত্রিকর্মকৃৎ*, তিনটে কর্ম এবার তাকে করতে হবে। এই তিনটে কর্ম কি কি? যজ্ঞ, অধ্যয়ন আর দান। এখানে জিনিষটা কিন্তু খুব পরিষ্কার নয়। কারণ যদিও নচিকেতা যজ্ঞের কথা, অগ্নির কথা জানতে চেয়েছেন, তার উত্তরে যমরাজ বলে দিলেন *যা ইষ্টকা যাবতীর্বা যথা বা*, ইট কিভাবে সাজাতে হবে, যজ্ঞ কিভাবে করতে হবে সব বলে দিলেন। কিন্তু পরের মন্ত্রেই *ত্রিসন্ধি, ত্রিকর্ম* এই শব্দগুলো আসছে। ত্রিকর্ম পরিষ্কার তিনটে – যজ্ঞ, অধ্যয়ন আর দান। যতক্ষণ এই তিনটে কর্ম না হবে ততক্ষণ তার শুদ্ধিকরণ হবে না। নিয়মিত যজ্ঞাদি কর্ম করতে হবে, নিয়মিত অধ্যয়ন করতে হবে আর নিয়মিত দানাদি কর্ম করতে হবে, তা নাহলে চিত্তশুদ্ধি হবে না। আচার্যও বলছেন – *তেভ্যো হি বিশুদ্ধি প্রত্যক্ষা*, যাঁরা বেদ অধ্যয়ন করেন, স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন আর শ্রেষ্ঠ পুরুষের সঙ্গ করেন তাঁদের মধ্যে শুদ্ধির ভাব পরিষ্কার দেখা যায়। আমি নিয়মিত শাস্ত্র শুনছি, মূল গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করছি আর সাধুসঙ্গও করে যাচ্ছি, এরপর আমাকে আর কাউকে গিয়ে বলতে হবে না যে আমার ভেতরটা খুব শুদ্ধ হয়ে গেছে, আমাকে দেখেই প্রত্যক্ষ বোঝা যাবে আমার ভেতরটা শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেছে। এগুলো করার পরও যদি কারুর শুদ্ধি না হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে তার ভেতরে অন্য কিছু বড় গোলমাল আছে। তিনটে জিনিষ বলছেন, বেদ অধ্যয়ন, স্মৃতি অধ্যয়ন আর শিষ্ট পুরুষ।

ত্রিকর্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যু, যমরাজ বলছেন, এরা জন্মমৃত্যুর পারে চলে যায়। শুদ্ধি কিভাবে হয় বলতে গিয়ে এত কথা বললেন, *ত্রিণাচিকেস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং ত্রিকর্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যু*। যজ্ঞটা কিন্তু তাকে করতে হবে, যমরাজ যেভাবে নাচিকেত অগ্নির অনুষ্ঠান করতে বললেন সেভাবে করতে হবে, এখনও বেদে এই নাচিকেত যজ্ঞের বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু তার সাথে দুটো শর্ত – ত্রিসন্ধি আর ত্রিকর্ম। ত্রিকর্ম মানে, যজ্ঞ থাকতে হবে, অধ্যয়ন থাকতে হবে আর দানাদি কর্ম থাকতে হবে। আর ত্রিসন্ধি মানে তিন জায়গা থেকে যেন সে উপদেশ নিয়ে থাকে। তিন জায়গা থেকে উপদেশের কথা আমাদের বিভিন শাস্ত্রে বিভিন্ন রকম বলছেন, যেটা এর আগে আমরা আলোচনা করলাম। সব কিছু মিলিয়ে মূল ভাব হল, জ্ঞান যেন পরিষ্কার থাকে আর মন যেন একেবারে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যায়। মন শুদ্ধ পবিত্র করার জন্য এই উপদেশগুলো নেওয়া দরকার আর এই কর্মগুলি করা দরকার। জ্ঞান যেটা আসবে সেটা যেন পরিশ্রুত জ্ঞান আসে। এই পরিশ্রুত জ্ঞান প্রথম অবস্থায় মায়ের কাছ থেকে আসে, দ্বিতীয় বাবার কাছ থেকে আসে আর শেষে আচার্যের কাছ থেকে আসে বা এই জ্ঞান বেদ দেন, স্মৃতি দেন আর শিষ্ট পুরুষ দেন। একটা পরিকাঠামো তৈরী করে দেওয়া হল, এবার বলছেন তুমি চিত্তশুদ্ধি

কর। চিত্তশুদ্ধি কিভাবে হবে? দান কর, যজ্ঞ কর আর শাস্ত্রে রমণ কর। এবার তুমি এই নাচিকেত অগ্নির তিনবার চয়ন কর। এখানে অবশ্য স্থূল ভাবে তিন বার না করে জিনিষটাকে একবার জেনে নিলে, চিন্তন করে বুঝে নিলে আর তৃতীয় অনুষ্ঠান করা। অনুষ্ঠান কম করেও একবার তোমাকে করতেই হবে।

এই ত্রিনাচিকেত অগ্নি করলে কি হবে? তখন বলছেন *ব্রহ্মজজ্ঞম্*, মানে ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ জাত। আচার্য বলছেন *ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভাৎ জাতো ব্রহ্মজঃ*, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্ম থেকে যিনি জন্ম নিয়েছেন তাঁকে ব্রহ্মজ বলা হয়। ব্রহ্মজ মানে ব্রহ্মা থেকে যিনি জন্ম নিয়েছেন। এখানে উপক্রম উপসংহারের নিয়ম প্রযোজ্য, আমরা বলতে পারি ব্রহ্ম থেকে জন্ম, কিন্তু তাতে পুরো ছবিটা পরিষ্কার হয় না। কারণ ব্রহ্ম থেকে সব কিছুরই জন্ম হয়, আর এখানে ব্রহ্মজ বলতে বোঝায় যিনি ব্রহ্মার থেকে প্রথম সৃষ্ট হয়েছেন।

তার সাথে বলছেন *ব্রহ্মজশ্চাসৌ জ্ঞশ্চেতি ব্রহ্মজজ্ঞঃ*, তিনি শুধু যে ব্রহ্মার থেকে জন্মই নিয়েছেন তা নয়, তিনি ব্রহ্মাকে জানেন, সেইজন্য বলছেন *ব্রহ্মজজ্ঞম্*। একেই তিনি ব্রহ্মজ তার উপর ব্রহ্মাকেও জানেন। ব্রহ্মাকে জানা মানে তিনি কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ নন, এখানে আচার্য ব্রহ্মজ্ঞ শব্দ আনছেন না, বলছেন *সর্বজ্ঞো হ্যাসৌ*, অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মাকে জানেন তিনি সর্বজ্ঞ হয়ে যান, এই জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে তিনি তার সব কিছুকেই জানেন। এরা কারা? ইন্দ্রাদি দেবতারা, দেবতাদের বিশেষত্ব হল এনারা ব্রহ্মা থেকে উৎপন্ন হয়েছেন, অর্থাৎ প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মার পরেই এনাদের অবস্থান আর ব্রহ্মলোক এনাদের বাসস্থান। তার সাথে এনারা জ্ঞেয়, ব্রহ্মাকে জানেন, যেভাবে পুত্র পিতাকে জানে, তাই ব্রহ্মজজ্ঞের অর্থ সবটাই তিনি জানেন। আর *ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং*, দেবতাদের শরীর আলোকিত, সেইজন্য আচার্য বলছেন *দেবং দ্যোতনাৎ*। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের শরীরে ভূমির অংশ বেশি কিন্তু দেবতাদের শরীরে ভূমির অংশ অনেক কম, তেজ তত্ত্ব দিয়ে শরীর নির্মিত বলে দেবতাদের শরীরটা আলোময়। অন্য দিকে দেবতারা গুণবান, যদিও পুরাণাদির কাহিনীতে ইন্দ্রাদি অনেক দেবতাদের লম্পট দেখানো হয়েছে, কিন্তু তা নয় তাঁরা সবাই গুণবান। এত গুণবান যে সেইজন্য তাঁরা ঈড্য, ঈড্য মানে স্তুতির যোগ্য। দেবতারা হলেন ব্রহ্মজজ্ঞ, ব্রহ্মা থেকে জন্ম নিয়েছেন, দ্বিতীয় তাঁরা দ্যুতিমান আর শেষে বলছেন গুণবান, সেইজন্য দেবতারা হলেন স্তুতির যোগ্য, *দেবমীড্যং*।

এই জিনিষটা শাস্ত্রের দ্বারা ভালো ভাবে জেনে নিয়ে কি করতে বলছেন? *নিচায্য*, আচার্য *নিচায্য* শব্দের অর্থ করছেন আত্মভাবে দেখা। মন্ত্রের *নিচায্য* শব্দের জন্য বেদের পরম্পরা মত থেকে যেন এখানে একটু সরে আসছে। পরম্পরাতে বেদের স্তুতি মানে আমি আছি আর দেবতারা আছেন, আমি দেবতাদের স্তুতি করছি, তাঁদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে আহুতি দিচ্ছি। কিন্তু সাধনা করতে করতে এগিয়ে যাওয়ার পর আর বেদের মন্ত্র থেকে ব্রাহ্মণ অংশে এসে বা আরেকটু এগিয়ে আরণ্যক অংশে আসার পর মানুষের আত্মভাব আসতে শুরু হয়। স্তুতি করছেন কিন্তু আত্মভাব থাকছে, উপনিষদে এসে স্তুতিও থাকে না, একমাত্র আত্মভাব থেকে যায়। এখানেই সাধনার তিনটে স্তর পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, প্রথম স্তরে আমি আছি আর তিনি আছেন, আমি তাঁর সেবক আমি তাঁর স্তুতি করছি। দ্বিতীয় স্তরে আমি তাঁর স্তুতি করছি কিন্তু আত্মভাবে, তিনি আর আমি তত্ত্বতঃ এক, যে দেবতার আমি স্তুতি করছি তিনি আমার হৃদয়ে বিরাজমান। বর্তমান যুগের দর্শনে এটাই বিশিষ্টাদ্বৈত, যদিও কোথাও কোথাও একটু পার্থক্য থাকতে পারে। সাধনার এই দ্বিতীয় স্তর বেদের ব্রাহ্মণ আর আরণ্যকে বেশি করে এসে গেছে। তৃতীয় ও শেষ ধাপ হল উপনিষদ, উপনিষদে আমি তুমির ভাবটা চলে গিয়ে শুধু আত্মার ভাবটাই থেকে যায়। এটাই অদ্বৈত সাধনা, যা কিছু আছে সব আমারই রূপ। সেইজন্য উপনিষদে আর স্তুতি হয় না। এখানে যে *নিচায্য* বলছেন, এর ঠিক ঠিক অর্থ আত্মভাবে দেখা। অন্যান্য পণ্ডিতরা *নিচায্য* শব্দের ব্যাখ্যা অন্য ভাবে করতে পারেন কিন্তু আচার্য একেবারে পরিষ্কার, শাস্ত্র থেকে এই জিনিষগুলোকে জেনে নিয়ে আত্মভাবে দেখতে হবে। আত্মভাবে দেখে কি হবে? *নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি*, তাঁর আত্যন্তিক শান্তি হয়ে যাবে। আত্যন্তিক শান্তি নিজের বুদ্ধি থেকে আসে।

এতক্ষণ এই মন্ত্রের একটা ভাসা ভাসা ব্যাখ্যা দেওয়া হল, কিন্তু মন্ত্রের কয়েকটি অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আছে যেগুলোকে ভালো করে বোঝা দরকার। শুরুতে বলে দিলেন তোমাকে যজ্ঞ করতে হবে, এই যজ্ঞ করার জন্য কয়েকটি শর্ত দিলেন, শুদ্ধি থাকতে হবে, কর্মের দ্বারা শুদ্ধি হবে, জ্ঞান থাকা চাই, যে জ্ঞান ত্রিসন্ধি থেকে আসে। কিন্তু যেমন যেমন এগোচ্ছেন তেমন তেমন প্রেক্ষাপট পাল্টে যাচ্ছে। যেমন তারপরেই দেবতাদের কথা

বলছেন, যেহেতু এখানে স্বর্গের কথা চলছে সেইহেতু দেবতারা এসেছেন। এরপর বলছেন সেই দেবতাদের আত্মভাবে, আমিই সেই, এই ভাবে নিয়ে দেখতে হবে। ঈশোপনিষদে ব্রাহ্মণ খুব নিষ্ঠা সহকারে সাধনার দ্বারা অত্যন্ত পবিত্র ভাবে সারা জীবন অতিবাহিত করেছেন, সারা জীবন অগ্নির উপাসনা করে এসেছেন, মৃত্যুর সময় তিনি বলছেন *যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি*, সূর্যলোকে যে পুরুষকে দেখা যাচ্ছে সেই পুরুষ আমি, এটাই আত্মভাব। আত্মভাব যদি না হয় তাহলে সেই লোক প্রাপ্তি হবে না। যতক্ষণ একটা জিনিষের সঙ্গে আত্মভাব না হচ্ছে ততক্ষণ সেই জিনিষের প্রাপ্তি হবে না। ঈশোপনিষদেই আবার বলছেন *হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে*। এখানে দুটো জিনিষ বলছেন, *সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে,* আমি সত্য ও ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। আর দ্বিতীয় বলছেন *পূষন্নপাবৃণু,* তোমার মুখের উপর থেকে এই জ্যোতির্ময় আবরণ সরিয়ে দাও, আমি সেই পুরুষের মুখ দেখতে চাই, *যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি* আমিই সেই পুরুষ। ঈশাবাস্যোপনিষদে বিষয় অন্য তাই উপাদানগুলো অন্য, এখানে বিষয়টা অন্য বলে উপাদানগুলোও অন্য রকম। সংসারে যে কোন জিনিষ যখন কেউ পেতে চায়, তাকে এই আত্মভাব আনতে হবে। *সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে,* আমি সত্যে প্রতিষ্ঠিত, আমি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। কি ধর্ম? কি সত্য? আমি যে সূর্যের উপাসনা করছি আমি সেই ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। ঠিক তেমনি এখানে যিনি ব্রহ্মালোক প্রাপ্তি বা বিরাট পদ প্রাপ্তির করতে চাইছেন, বিরাটের সঙ্গে যিনি এক হতে চাইছেন, তার জন্য কয়েকটা শর্ত ঠিক করে দেওয়া হল। শেষ শর্ত হল আত্মভাব, আত্মভাব না হলে তোমার বিরাট পদ প্রাপ্তি হবে না। কিন্তু ঐ আত্মভাব পাওয়ার আগে তোমাকে আরও কয়েকটি জিনিষ করতে হবে। তোমাকে যজ্ঞ করতে হবে, ঠিক ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, ঠিক ভাবে কর্ম করতে হবে। কর্ম করে তোমার চিত্তশুদ্ধি হবে, এর সাথে শিক্ষা যেটা পেয়েছ সেটা যেন তোমার মনের মধ্যে বসে যায়। শুদ্ধি আর শিক্ষা যখন মনে বসে গেল তখন তোমার যে কর্ম হবে সেই কর্ম তোমাকে ব্রহ্মালোকে নিয়ে যাবে।

এই সব কিছু একত্র হয়ে যখন মিশে যায় তখন তাকে বলে জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয়। নচিকেতার দ্বিতীয় বর হল জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয়, যজ্ঞও আছে, স্তুতিও আছে তার সাথে আত্মভাবও আছে। এই জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয় পুরোটাই পৃথক বিশাল দর্শন। প্রাথমিক স্তরে যজ্ঞ থাকবে আর স্তুতি থাকবে আর উচ্চস্তরে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় হবে। এই জ্ঞান মানে দেবতা সম্বন্ধী জ্ঞান আর কর্ম মানে যজ্ঞ। অনেক বড় বড় পণ্ডিতরাও এই জ্ঞানকে উচ্চতম জ্ঞানের সাথে বা স্বামীজী জ্ঞানযোগে যে জ্ঞানের কথা বলেছেন তার সাথে এক করে ফেলেন। কিন্তু এখানে জ্ঞান মানে সব সময় দেবতা সম্বন্ধী জ্ঞান, দেবতার ব্যাপারে জ্ঞান। জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয় নিজেই এক বড় দর্শন। যার জন্য ঈশাবাস্যোপনিষদে এবং গীতাদিতে আচার্য আপত্তি করে বলছেন উপনিষদ বা গীতা জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয়ের জন্য নয়। কিন্তু এখানে আচার্য নিজেই বলছেন এই মন্ত্র জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয়ের মন্ত্র। জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয়ের প্রবক্তরা তখন দেখান শুধু এই মন্ত্রই নয়, এখানে ওখানে যা যা আছে সবই জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয়। তার মানে তুমি জপ-ধ্যানও কর কাজও কর। সাধারণ ভাবে আমরাও তাই মনে করি। আচার্য শঙ্কর পরে এর তীব্র আপত্তি করে বলবেন জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয় কখনই চলে না। কিন্তু আচার্য জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয় ন চলার কথা আত্মজ্ঞানের ক্ষেত্রে বলছেন। যিনি জেনে গেলেন আমি এখানকার মালিক তিনি কেন সেবকের মত আচরণ করবেন! ঠিক তেমনি তিনি যখন জেনে গেলেন ঈশ্বরের সঙ্গে আমার আত্মভাব আছে, তিনি তখন কেন ঈশ্বরের পূজো করতে যাবেন! আচার্য গীতার ভাষ্যে এই নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে এখনও আত্মজ্ঞানের আলোচনা শুরু হয়নি, একটা শব্দ শুধু এসেছে। বিরাট পদ যদি পেতে হয়, ব্রহ্মালোক যদি পেতে হয়, বিষ্ণুলোক যদি পেতে হয় তাহলে কিন্তু জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয়ের দরকার। জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয়ে সে যেমন দেবতার জ্ঞান অর্জন করছে, তেমনি তাকে কর্মটাও করতে হবে। একজন খুব ভক্তিভাবে পূজা-অর্চনা করতে করতে মন খুব উচ্চভাবে চলে গেল, উচ্চভাবে গিয়ে যখন ধ্যান করছে তখন এতদিন তার যে ভক্তি বৈধীভক্তি নিয়ে পড়ে ছিল, সেখান থেকে সরে গিয়ে তার ভক্তি পরা ভক্তিতে চলে গেল। পরা ভক্তি হয়ে যাওয়ার পর এবার সে আত্মভাবে দেখছে। শ্রীকৃষ্ণকে ঠিক ঠিক আত্মভাবে শ্রীরাধাই দেখেছেন। ঠাকুরের প্রতি আত্মভাব বলতে যেটা বোঝায় সেটা শ্রীশ্রীমা বা স্বামীজীরই ছিল। আত্মভাবে যখন দেখেন তখন তিনি বিরাট পদ বা ব্রহ্মালোককে প্রাপ্ত করেন। উপনিষদে যে দেবতা জ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে, আমরা ঠাকুরের যে ধ্যানের কথা বলি, এই দুটোকে গোঁড়া প্রাচীনপন্থিরা এক মানতে চান না। তাঁরা বলেন ইন্দ্রাদি দেবতা আর ঠাকুরের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। অবশ্যই তফাৎ আছে, কিন্তু যখন আত্মজ্ঞানের কথা চলে তখনই তফাৎ হবে ঠাকুরকে যদি সেই রূপে দেখে। কিন্তু আমরা

ঠাকুরকে কী রূপে দেখছি, আগে সেটা পরিষ্কার করতে হবে। যেমন গায়ত্রী মন্ত্রকে অনেক ভাবেই দেখা যায়। গায়ত্রী মন্ত্রের প্রথম ভাব হল, হে ভগবান! আমাকে খুব করে অন্ন দাও, আমার যেন প্রচুর টাকা-পয়সা হয়। দ্বিতীয় ভাব, হে সূর্য দেবতা! আমি এতদিন যত পাপকর্মে করে এসেছি আমার সব পাপকর্ম যেন নাশ হয়ে যায়, আমি যেন পূণ্যে প্রতিষ্ঠিত হই। তৃতীয় ভাব, হে ভগবান! হে ত্রিলোকের সৃষ্টি কর্তা! আমার বুদ্ধিকে এমন করে দাও যাতে আমি তোমার দিকে যেতে পারি। এবার কেউ যদি বলে, গায়ত্রী মন্ত্রে আমি নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরের আরাধনা করব, খুব ভালো। কেউ যদি বলে, গায়ত্রী মন্ত্রে আমি শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান করব, তাতেও খুব ভালো। কেউ যদি বলে গায়ত্রী মন্ত্র দিয়ে আমি আমার শিবের উপাসনা করব, তাতেও কোন দোষ হবে না। আবার যদি কেউ বলে আমার কোন ভগবান-টগবান লাগবে না, গায়ত্রী মন্ত্র জপ করছি কারণ আমার অনেক টাকা-পয়সা চাই, তাতেও কোন দোষ হবে না। গায়ত্রী মন্ত্র খুব নৈর্ব্যক্তিক মন্ত্র। ভর্গো শব্দের একটা অর্থ হয় অন্ন অর্থাৎ টাকা-পয়সা, যে টাকা-পয়সা চাইবে সে পাবে। সাধনা যেমনটি হবে তেমনটি সিদ্ধি হবে।

তোমাকে যদি বিরাট পদ পেতে হয়, ব্রহ্মপদ বা ব্রহ্মলোক পেতে হয়, সামীপ্য, সালোক্য, সারূপ্য যদি পেতে হয় তাহলে তোমাকে আত্মশুদ্ধি করতে হবে, জ্ঞান প্রাপ্তি করতে হবে, এই জ্ঞান আত্মজ্ঞান নয়, দেবতা সম্বন্ধী জ্ঞান, যে জ্ঞান মা, বাবা ও আচার্য থেকে পায় বা বেদাদি থেকে পায়। কিন্তু সাধনার সময় তাকে আত্মভাব রাখতে হবে, আত্মভাব যদি না রাখে তাহলে পুরো জিনিষটাই বিফলে চলে যাবে। এই ভাবটাই ঈশাবাস্যোপনিষদের ছটি মন্ত্রে কর্ম আর জ্ঞান এই দুটোকে সমন্বয় করা হয়েছে। শেষ মন্ত্রে বলছেন, *সম্ভূতিং চ বিনাশাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ, উভয়ং সহ*, জ্ঞান আর কর্ম দুটোকেই জানতে হবে। *বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা*, তখন আপেক্ষিক অমরত্ব আসে। বিষ্ণুলোক বা ব্রহ্মালোককে যদি প্রাপ্ত করতে হয় তাহলে শুধু দেবতা জ্ঞান দিয়ে, শাস্ত্র অধ্যয়ন করে হবে না, তার সাথে কর্মও করতে হবে। কিন্তু এর সাথে আত্মজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের জন্য ঠিক ঠিক পথ হল জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয়ের পথ। সমগ্র ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের যে দর্শন তা হল তুমি কর্ম করে যাও তার ফল তুমি পাবে, আরও উঁচু ফল যদি পেতে চাও তাহলে জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয় কর। কিন্তু তোমার সব কিছু হয়ে গেছে, জগতের কোন কিছুই তুমি আর চাও না, কোন ভোগ্যবস্তুর প্রতি তোমার কোন আকর্ষণ নেই এবার তুমি আত্মজ্ঞানের জন্য প্রস্তুত। আত্মজ্ঞান আর ঐ জ্ঞানের মধ্যে অনেক পার্থক্য, আচার্য এটাই বলছেন, *নিচায্য* মানে আত্মভাব। আত্মভাব যদি না আসে অনন্ত স্বর্গপ্রাপ্তি কখনই হবে না। যত গভীর হবে তত স্বর্গ উঁচু হবে বা তত বেশি দিনের জন্য হবে। কিন্তু যদি ব্রহ্মলোক, বিরাট পদ পেতে চাও, বিরাটের সঙ্গে একত্ব ভাব যদি পেতে চাও, পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আমি মালিক এই ভাব যদি পেতে চাও তাহলে তোমাকে আত্মভাবে সাধনা করতে হবে। বিরাটের সাথে একত্ব ভাব মানে সমষ্টির সাথে নিজেকে আত্মভাবে দেখা। এখানে উচ্চতম সাধকদের এক ধাপ নীচে যাঁরা আছেন তাঁদের বর্ণনা করলেন। কেউ আপত্তি করে বলতে পারেন এটা কেন উচ্চতম অবস্থা হবে না? তখন আবার একটা দীর্ঘ আলোচনা চলতে থাকবে। এই অবস্থাকে কেন শ্রেষ্ঠতম বলা হবে না বোঝার জন্যই শাস্ত্র অধ্যয়ন। শাস্ত্র অধ্যয়ন করার পর জিনিষটা বোঝা যায়। কিন্তু আমরা ওটাই নেব যেটা আমাদের গুরু বলে দিয়েছেন, তার বাইরে আর কিছু নেওয়া যাবে না। তবে আমরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি এই কারণেই যে, শাস্ত্রের কথা জেনে রাখা ভালো।

পরের মন্ত্রে এসে অগ্নি বিজ্ঞানের বিষয়টাকে ইতি করছেন, আচার্যও বলছেন *ইদানীমগ্নিবিজ্ঞান-চয়ন-ফলমুপসংহরতি*। যমরাজও নচিকেতার মেধা দেখে খুব খুশী হয়ে গেছেন, তখন তিনি বলছেন –

ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্ বিদিত্বা
য এবং বিদ্বাংশ্চিনুতে নাচিকেতম্।
স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে।।১/১/১৮।।

(যে ব্যক্তি পূর্বোক্ত যজ্ঞীয় ইটের স্বরূপ, সংখ্যা আর সাজানোর প্রণালী ও বিধি অবগত হয়ে এবং অগ্নিকে আত্মস্বরূপে জেনে তিনবার এই নাচিকেত অগ্নির চয়ন করেন তিনি দেহাবসানের পূর্বেই কাম-ক্রোধাদি সাংসারিক বন্ধন ছিন্ন করে, শোক-দুঃখ বর্জিত হয়ে স্বর্গলোকে আনন্দভোগ করেন)।

এখানে তিনটে জিনিষ জানার কথা বলছেন। প্রথম জানার হল ইটের ব্যাপার, কি রকম ইট হবে? এর আগে যমরাজ বলে দিয়েছেন *যা ইষ্টকা যাবতীর্বা যথা বা*, ইটের স্বরূপ অর্থাৎ ইটের আকার কি রকম, দ্বিতীয়

কটি ইট লাগবে। তৃতীয় জানার বিষয়, অগ্নিচয়ন কিভাবে করতে হবে। যজ্ঞ ব্যাপারটাই তখন একটা স্বতন্ত্র বিজ্ঞান ছিল। গুরু পরম্পরায় তাঁরা এই বিজ্ঞানকে জানতেন। প্রথমে এই তিনটে জিনিষকে বুঝতে হয়, বোঝার পর এই নাচিকেত অগ্নির চয়ন করবে। ক্রতু মানে যজ্ঞের অগ্নি, সেই অগ্নিকে আত্মস্বরূপ জানতে হবে। পরবর্তি কালে ধ্যানাদির ধারণা এখান থেকেই এসেছে। খুব স্থূল ভাবে যে যজ্ঞ হয় সেখানে তখন স্তুতি হয়, যখন আরেকটু সূক্ষ্ম হয় তখন ঐ বস্তুর উপর ভাব আরোপ করে তার ধ্যান করা হয়। আর শেষে কোন ভাবের আরোপ করতে হয় না, তখন সরাসরি ধ্যান হয়। যমরাজ নচিকেতাকে বলছেন, যখন পুরো বিজ্ঞানকে বুঝে নিয়ে অগ্নির চয়ন করবে, চয়ন করার পর যখন চিন্তন করলে, এই অগ্নি আমার আত্মস্বরূপ, ঐ অগ্নি আমারই ভেতরে বিরাজ করছেন, এইভাবে সব কিছু করলে তখন তুমি, *পুরতঃ*, শরীর ত্যাগের আগেই *মৃত্যুপাশান্*, জন্মমৃত্যুর বন্ধনকে এখানেই পার করে যাবে। এখানে ব্রহ্মলোকের ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলছেন জন্মমৃত্যুকে পার করে যায়, এটাই পরে পরে আরও উন্নত হয়ে যাঁরা আত্মজ্ঞান পান তাঁদের জন্মমৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি হয়, গীতাই এই কথাই বলছেন *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো*, এখানেই সমগ্র সৃষ্টিকে তিনি জয় করে নেন। যদিও বলছেন জন্মমৃত্যুর পারে চলে যায়, শোকাদির পারে চলে যায়, কিন্তু ঘুরে ঘুরে একটি লোকের কথাই চলছে। এই ব্যাপারটাই পরের মন্ত্রগুলিতে একটা বড় ভূমিকা নেবে। তিনি যেন জানেন, আমি উচ্চতম স্বর্গ জয় করে নিয়েছি। উপনিষদের অনেক ভাষা আমরা এখনও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রচুর ব্যবহার করি। যেমন খুব ভালো কাজ করার পর আমরা বলি – তুমি যা পূণ্য অর্জন করে নিলে, তুমি তো তরে গেলে। মাম-বাবাকে তীর্থে ঘুরিয়ে এনে মা-বাবাকে উদ্ধার করে দিল, এই ভাষাগুলো থেকে গেছে। এগুলো বোঝার জন্য মানুষকে মরতে হয় না, এখানেই বুঝতে পারে যে আমি ভালো লোকে পৌঁছে গেছি, আমার যা পাওয়ার পেয়ে গেছি।

শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে, এখানে থাকতে থাকতেই তাঁর মন থেকে সব দুঃখ-কষ্ট চলে যায়। কারণ নাচিকেত অগ্নির তিনবার চয়ন করতে গিয়ে এত যে পরিশ্রম, এত প্রস্তুতি আর এই পবিত্রতা এর জোরেই তার দৃঢ় বোধ এসে যায়ে যে, আমি সব কিছুকে অতিক্রম করে গেছি। এরপর যত দুঃখ-কষ্ট, মান-অপমানই আসুক না কেন, কোন কিছুই তাকে আর স্পর্শ করতে পারে না। পরিষ্কার বুঝতে পারে আমি সব কিছু পেরিয়ে গেছি, আমার জন্য স্বর্গের দ্বার খোলা। আগেকার দিনে ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধে গিয়ে নিজের স্ত্রী, পুত্র, মৃত্যুর কথা ভেবে চোখের জল ফেলত না, কোন ভয়, দুঃখ, হতাশা তাদের গ্রাস করতে পারত না। আমি যদি যুদ্ধে মারা যাই তাতে কী আছে! আমার জন্য স্বর্গের দ্বার খোলা, *স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্*। কিছু দিন আগে একজন কর্ণেল সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলা করতে নিজেই এগিয়ে গেছেন। অন্য দেশে এত বড় অফিসার সামনে যাবে না। সন্ত্রাসবাদীরা বলছে আমরা আত্মসমর্পণ করতে আসছি, কর্ণেল এগিয়ে গেছেন আর সেই সময় পেছন থেকে একে-৪৭ চালাতে শুরু করে দিয়েছে। কর্ণেলও মারা গেলেন সাথে কয়েকজন সৈন্যও মারা গেল। সবাই জানে, প্রত্যেকটা লড়াই মানে আমি বেঁচে ফিরব না। এর জন্য মনে কোন দুঃখ নেই। কর্ণেলকে যখন নিয়ে আসা হচ্ছে তাঁর স্ত্রী তখন তাঁকে ফোন করছিল। ফোনটা কর্ণেল তাঁর বন্ধুর দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন, নিজে কথা বলতে পারছেন না। তিনি জানেন আমি মরতে যাচ্ছি, এর জন্য কোন খেদ নেই, এক ফোঁটা অশ্রুপাত নেই। সে জানে আমি দেশের জন্য নিজেকে আহুতি দিলাম, মৃত্যু আর তাকে স্পর্শ করতে পারে না। ঠিক তেমনি এই ধরণের যজ্ঞ যাঁরা করেন, তাঁদের যে মানসিক প্রস্তুতি, তাঁদের যে শিক্ষা এরপর যে যজ্ঞাদি করছেন তখন পুরো ব্যাপারটা তাঁর মনকে এমন একটা স্তরে নিয়ে চলে যায় যেখানে জাগতিক কোন কিছুই ছুঁতে পারে না। মৃত্যুর আগেই সে জানে যে আমি সব কিছুকে অতিক্রম করে চলে এসেছি, আমার উদ্ধার হয়ে গেছে।

ব্রহ্মার বিভিন্ন নাম নিয়ে আলোচনা করার সময় আমরা দেখেছিলাম, সচ্চিদানন্দকে সৃষ্টির ভেতর দিয়ে দেখলে তাঁর যে উচ্চতম যিনি হতে পারেন তাঁকে আমরা বলছি সগুণ সাকার, যাঁকে আমরা ভগবান বিষ্ণু বা ব্রহ্মা বলছি বা শিব বলছি বা শ্রীরামকৃষ্ণ বলছি। যিনি এই ধরণের যজ্ঞ করছেন তিনি জেনে যান আমি এই বিরাটের সঙ্গে এবার এক হয়ে যাব। এই ভাবটাই পরের দিকে ভক্তিশাস্ত্রে সামীপ্য, সালোক্য, সারূপ্য এইসব নামে অভিব্যক্ত করা হয়েছে। দুটোতেই ভাব এক, কর্ম ও ধ্যান একটা বিশেষ ভাবে করার পর এটাই তার উচ্চতম পদ। ভক্তিশাস্ত্রের ঋষিরা বলবেন এটাই শেষ কথা। কিন্তু আচার্য শঙ্কর, যাঁর মত ও পথকে আমরা পরম্পরাতে অনুসরণ করে আসছি, তিনি বলবেন এটাই শেষ কথা নয়।

বিরাট পদকেই সাধারণ ভাষায় অনেকে বলেন পরমপদ। বিরাট পদ বা পরমপদ যাই বলা হোক এর অর্থ সব সময় হয় একত্ব ভাব। নিজেকে যার সাথে জুড়ে দেবে তার সাথে সে এক হয়ে যাবে। আমরা এখন নিজেকে জুড়ে রেখেছি শরীরের সঙ্গে, শরীরের সাথে জুড়ে রাখার জন্য এক ধরণের দুঃখ-কষ্ট। শরীর ছেড়ে যদি সবার সাথে নিজেকে জুড়ে নেয়, যেমন মা নিজের সব সন্তানদের সাথে নিজেকে জুড়ে রেখছেন, মায়ের আনন্দটাও সেই রকম। আর যে নিজেকে দেশের সাথে জুড়ে দিল, নিজের দেশ আর নিজেকে এক দেখছে, এরপর তার কাছে জীবনের আর কোন মূল্য থাকে না। এটাই যখন সাধনা করে করে সগুণ সাকার ঈশ্বরের সাথে অর্থাৎ ব্রহ্মার সাথে, শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে নিজেকে এক দেখছেন, কল্পনা করে দেখছেন না, এর আগে তাঁর যে সাধনা ছিল সেই সাধনা পুরো হয়েছে, তারও আগে এই সাধনার প্রস্তুতি ছিল, সেই সাধনার ফল রূপে সিদ্ধি পেয়ে যাওয়ার পর তিনি জানেন আমি ঠাকুরের সঙ্গে এক হয়ে গেছি, বিরাট পদ পেয়ে গেলেন। এখানে এসে তিনি আনন্দ পেতে শুরু করেন। সৃষ্টি যত দিন থাকবে, সমষ্টিতে যাবতীয় যা কিছু সব কিছুর সাথে আমি এক হয়ে গেছি। সব কিছুর সাথে এক হওয়াতে তিনি এবার এই সৃষ্টির মালিক হয়ে গেলেন, তাঁর উপর আর কারুর খবরদারি চলবে না। আর সাংসারিক যা কিছু আছে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা এগুলো কোন কিছুই তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। আমরা সীমিত বলেই এই সমস্যাগুলো হয়। যিনি অসীম হয়ে গেছেন তাঁর এগুলো কিছুই হবে না। যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে এক হয়ে গেছেন তাঁর মধ্যে অপূর্ণতার ভাব নেই, অপূর্ণতা নেই বলে তাঁর মধ্যে কোন কামনা নেই, কোন কামনা নেই বলে তাঁর কোন শোক-দুঃখও নেই। সেইজন্য বলছেন *শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে*। কিন্তু এর সবটাই আপেক্ষিক অমরত্ব। কারণ শাস্ত্রই বলছে সৃষ্টি শেষ হয়ে যাওয়ার পর আবার যখন সৃষ্টি হবে তখন তাঁকে আবার সেই সৃষ্টিতে আসতে হবে। পরের মন্ত্রে বলছেন –

এষ তেঽগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যো
যমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ।
এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাস –
স্তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব।।১/১/১৯।।

হে নচিকেতা! দ্বিতীয় বরে যে অগ্নিতত্ত্বের জ্ঞান প্রার্থনা করেছিলে এই সেই স্বর্গসাধন অগ্নিবিদ্যা তোমাকে দিলাম। লোকেরা এই অগ্নিকে তোমারই নামে অভিহিত করবে। এবার তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।)

এই মন্ত্রে অগ্নি বিজ্ঞানের উপসংহার করা হচ্ছে। এর আগে বলা হল এই অগ্নির অনুষ্ঠানে কি ফল হয়। তিনি এই শরীরে বেঁচে থাকতেই সমস্ত লোককে জয় করে নেন, বিরাটের সাথে তাঁর একত্ব বোধ হয়ে যায়। এই জগতে তাঁর পাওয়ারও কিছু নেই, কিছু হারাবারও নেই, এটাই বেদের শেষ কথা। বেদ মানুষকে এর থেকে উপরে নিয়ে যেতে পারে না। দ্বিতীয় বরে যমরাজ নচিকেতাকে উচ্চস্বর্গ পাওয়ার জন্য যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হবে সেই যজ্ঞের ব্যাপারে বলে দিলেন। তার সাথে নচিকেতার মেধা আর শ্রদ্ধা দেখে খুশী হয় আরেকটি অতিরিক্ত বর দিলেন, আজ থেকে এই অগ্নি তোমার নামেই পরিচিত হবে। এবার তুমি অবশিষ্ট তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। এই কথা বলার পর এই বিষয়টা এখানেই শেষ হয়ে যায়।

পরের মন্ত্র থেকে আচার্য মূল বিষয়ের মধ্যে ঢুকে যাবেন। মূল বিষয়ে ঢোকার আগে তিনি কয়েকটা কথা বলে নিচ্ছেন। প্রথমে তিনি অজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করছেন, অজ্ঞানের পর জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করছেন। এতক্ষণ দেবতা জ্ঞানের উপর আলোচনা চলছিল, এখান থেকে আত্মজ্ঞানের উপর আলোচনা শুরু হয়ে যাচ্ছে। তারও আগে আচার্য বলছেন – *এতাবদ্ধ্যাতিক্রান্তেন বিধি-প্রতিষেধার্থেন মন্ত্র ব্রাহ্মণেন অবগন্তব্যাম্,* ঊনিশ নম্বর মন্ত্র পর্যন্ত যে আলোচনা করা হল এটাই বেদের মন্ত্র আর ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তু। পরম্পরাগত ব্রাহ্মণরা বেদ বলতে শুধু মন্ত্র আর ব্রাহ্মণকেই মানেন, আরণ্যক আর উপনিষদকে বেদের মধ্যে গণ্য করেন না। পূর্বমীমাংসকরা বেদের সংজ্ঞাতেই বলে দেন মন্ত্র আর ব্রাহ্মণই বেদ। তাহলে বেদে আরণ্যক আর উপনিষদের অবস্থানকে কিভাবে নির্ণয় করা হবে? পূর্বমীমাংসকরা তখন বলেন, যজ্ঞের সময় যদি আরণ্যক আর উপনিষদের মন্ত্র পাঠ করা হয় তাতে যজ্ঞের শক্তিটা একটু বৃদ্ধি পায়, এছাড়া আর কিছু না। আগুন জ্বালিয়ে তাতে একটু নুন বা চিনি ফেলে দিলে যেমন আগুনের তেজটা বেড়ে যায়, আরণ্যক আর উপনিষদের ক্ষেত্রেও ঠিক এই ব্যাপার।

আচার্য বলছেন মন্ত্র আর ব্রাহ্মণের একমাত্র কাজ বিধি আর নিষেধকে নিয়ে আলোচনা করা। নিষেধকে প্রতিষেধও বলা হয়। এই দুটোর মধ্যে আবার বিধি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বেদের ধর্ম মানুষকে বিধি ও প্রতিষেধের দ্বারা কর্মের দিকে প্রেরিত করে। বিধি মানে তুমি এই এই জিনিষ করবে, যেমন প্রত্যহ সকালে অগ্নিহোত্র করবে, সন্তান প্রাপ্তির জন্য এই যজ্ঞ করবে, ধন-সম্পদ প্রাপ্তির জন্য এই যজ্ঞ করবে, এগুলোই বিধি। আবার প্রতিষেধ, এই এই জিনিষ যেন না করা হয়। বেদ শুধু বিধি আর প্রতিষেধের উপর চলে। উপনিষদ যদিও বেদের অঙ্গ কিন্তু বেদের কাজ শুধু বিধি আর প্রতিষেধ, আর উপনিষদের কাজ বিধি আর প্রতিষেধের বাইরে নিয়ে যাওয়া। দুটো বিপরীত ধর্মী কিন্তু উপনিষদকে বেদেরই অঙ্গ বলা হয়। বেদের প্রথম দুটি অঙ্গ, মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ শিক্ষা দেয় বিধি আর প্রতিষেধের। আরণ্যক আর উপনিষদ শিক্ষা দেয় বিধি আর প্রতিষেধের ঊর্ধ্বে কি করে যেতে হবে। আচার্য তাই বলছেন, এতক্ষণ যে মন্ত্রগুলির আলোচনা করা হল তাতে বিধি আর প্রতিষেধকেই খুব সংক্ষেপে বলে দেওয়া হয়েছে। একটা আখ্যায়িকার মাধ্যমে দেখিয়ে দেওয়া হল সাংসারিক সুখ কিভাবে হবে আর দ্বিতীয় মৃত্যুর পর স্বর্গসুখ কিভাবে পাওয়া যাবে। বেদের মন্ত্র আর ব্রাহ্মণও ঠিক এই কাজ করে। অর্থ আর কাম দিয়ে চলে এই জগৎ, ধর্ম দিয়ে চলে পরলোক, এই দুটোকেই খুব সংক্ষেপে এখানে দেখিয়ে দেওয়া হল।

বিধি প্রতিষেধ দিয়ে কখনই আত্মবিষয়ক জ্ঞান হয় না। বিধি আর প্রতিষেধ পুরোপুরি অজ্ঞান রাজ্যেই চলে। এর বিরুদ্ধে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠবে বিধি ও প্রতিষেধ অজ্ঞান রাজ্যে চলে এই কথা আপনি কি করে বলছেন? ব্রাহ্মণরা হাজার হাজার বছর ধরে শুধু মন্ত্র আর ব্রাহ্মণকে আধার করে এত কিছু করে আসছেন, মন্ত্র আর ব্রাহ্মণে যা কিছু আছে সবই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের কথা, আপনি এক কথায় এগুলোকে অজ্ঞান রাজ্যের বিষয় বলে দিলেই তো হবে না! আচার্য এবার যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করছেন। অজ্ঞানকে আচার্য বলছেন বহু, যেখানেই বহু সেখানেই অজ্ঞান, যেখানে অবহু সেটাই জ্ঞান। কঠোপনিষদে পরের মন্ত্রগুলিতে এই ব্যাপারটাই আসবে, যেখানে নানাত্বের নিষেধ করা হয়েছে।

আচার্য বলছেন *ক্রিয়া-কারক-ফলাধ্যারোপণলক্ষণস্য*, আচার্য এক এক করে যুক্তি এনে দেখাচ্ছেন বিধি ও প্রতিষেধকে কেন অজ্ঞান বলা হবে । প্রথম হল ক্রিয়া, কারক, ফল আর অধ্যারোপণ। পরে যে আত্মার কথা বলা হবে, সেই আত্মার উপর অজ্ঞানকে চাপিয়ে দিয়ে তাঁকে বেদ বলছে ক্রিয়া করতে, যজ্ঞ করতে। ক্রিয়া করলেই প্রথমা, দ্বিতীয়, তৃতীয়া এই রকম সাতটি কারক এসে যাবে, যেমন তার একজন কর্তা চাই প্রথমা, দ্বিতীয়া এসে যাবে যজ্ঞে আহুতি দাও, তৃতীয়া এসে যাবে অমুক জিনিষ দিয়ে আহুতি দিতে হবে, তারপর সম্প্রদান থাকবে, অপাদান থাকবে ইত্যাদি, পুরো কারকের বিস্তার এসে গেল। আর ক্রিয়া, তারও বিস্তার থাকে। যেখানেই ক্রিয়া সেখানে তার একটা ফল হবে। তার মানে পুরো ব্যাপারটাতে নটি অতিরিক্ত জিনিষ এসে যোগ হয়ে যাচ্ছে, সাতটি কারক, ক্রিয়া অষ্টম আর নবম হল তার ফল। কিছু না করেই এই নটি জিনিষ আমাদের জীবনের সাথে যোগ হয়ে যাচ্ছে। দৈনন্দিন জীবনেও একই জিনিষ চলে। আমাকে একটা দায়ীত্ব দেওয়া হল, ছেলেকে পড়াতে হবে, ছেলেকে পড়ানো মানেই একটা ক্রিয়া হয়ে গেল, আমি হয়ে গেলাম কর্তা, ছেলে দ্বিতীয়া, বই, খাতা, পেন্সিলের সাহায্য নিতে হবে, এইভাবে নানা রকম আনুষাঙ্গিক জিনিষের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। ছেলে পড়ানোর ফল ছেলে পরীক্ষায় পাশ করবে। এখন আমার মন ক্রিয়া-কারক-ফল এর আনুষাঙ্গিক বহু জিনিষের মধ্যে ঘুরছে। ক্রিয়া-কারক-ফল আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম নয়, অধ্যারোপ হয়ে আছে। অজ্ঞানের প্রথম লক্ষণই হল ক্রিয়া-কারক-ফলের নটি জিনিষ। অজ্ঞানের এই নটি প্রসার বা শাখা, গীতায় যেমন বলছেন *বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ*। এই শাখা থেকে আরও কত হাজারটা প্রশাখা ছড়িয়ে পড়ল। এটা বোঝার জন্য বেশি বুদ্ধি লাগাতে হয় না, দিনরাত আমরা এই জিনিষ দেখে যাচ্ছি। আমি আলাদা, তুমি আলাদা, সে আলাদা, আমি যা কিছু কথা বলছি সেখানে ক্রিয়া এসে যাচ্ছে, কারক এসে যাচ্ছে, আমি কর্তা তুমি দ্বিতীয়ার কর্ম, মুখ দিয়ে কথা বলছি তৃতীয়া হয়ে গেল। এটাই প্রথম *অধ্যারোপণলক্ষণস্য*। কিভাবে অধ্যারোপ হয়? যেটা এক ছিল সেটা বহু হয়ে গেল। এটাই সংসার বীজ, পরে দেখাবেন এই সংসার বীজ আসে অবিদ্যা, কাম ও কর্ম রূপে। অবিদ্যা আছে বলেই মানুষের মনে কামনার উদয় হয়, কামনার পুর্তির জন্য তাকে কর্ম করতে হয়। কর্ম করতে গেলেই ক্রিয়া-কারক-ফল বিভাজন এসে যায়। যত বেশি এতে জড়ায় তত অবিদ্যা বাড়ে। সেইজন্য বলছেন সংসার বীজ। আমাদের মনের মধ্যে সংসার ঢুকে আছে, এই সংসারের বীজ হল অজ্ঞান।

এটাকে বলছেন স্বাভাবিক, পুরো ব্যাপারটা স্বভাবেই আছে। সৃষ্টিতে যখন মানুষের জন্ম হল তখনই তার ভেতরে অজ্ঞান থাকে। এই অজ্ঞানকে উচ্ছেদ করে দেওয়া যায় না। সেইজন্য অজ্ঞানের একটা নামই হল স্বভাব। যে জিনিষের যেটা শক্তি সেই শক্তি দিয়ে সেই জিনিষকে কখনই নাশ করা যায় না। অজ্ঞানের শক্তি হল ক্রিয়া-কারক-ফল। তাই কোন ক্রিয়ার দ্বারা, কোন কারক দিয়ে অজ্ঞানকে উচ্ছেদ করা যাবে না আর কোন ফল দিয়েও তাকে উচ্ছেদ করা যাবে না। যেখানেই ক্রিয়া-কারক-ফল এসে গেল সেখান থেকে আর অজ্ঞানকে নাশ করা যাবে না, কারণ এটাই তার শক্তি। যেমন আগুনের শক্তি পেট্রল ডিজেল, পেট্রল ডিজেল দিয়ে কখনই আগুন নির্বাপিত করা যাবে না। আগুন নির্বাপিত করার জন্য তার বিপরীত ধর্মী জিনিষ নিয়ে আসতে হবে। অথচ এই জগতে ক্রিয়া-কারক-ফল ছাড়া অন্য কিছু নেই। সেইজন্য জগতের কোন কিছু দিয়ে অজ্ঞানকে নাশ করা যায় না। অজ্ঞান নাশ হয় একমাত্র জ্ঞান দিয়ে।

জ্ঞান মানে ব্রহ্মাত্মৈক্য, ব্রহ্ম আর আত্মা এক এই জ্ঞানই অজ্ঞানকে নাশ করে। আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে হবে একত্ব বা বহুত্বের নাশ। ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্যে সব কিছুর বিভেদ নাশ হয়ে যায়। অজ্ঞানকে নাশ করার এই একটাই পথ। কোন কর্ম দিয়ে তাকে নাশ করা যাবে না, কোন কারক দিয়ে নাশ করা যাবে না, যে যত বেশি শক্তিশালী তার অবিদ্যা তত বেশি হবে। যার মধ্যে কর্তার ভাব বেশি তার অবিদ্যা তত বেশি। ঠাকুর বলছেন গুরু, কর্তা, বাবা বললে আমার গায়ে কাঁটা বেঁধে। যেমনি কর্তা ভাব আসে তখনই কারকের প্রথমা এসে গেল, এখানেই তার শক্তি বেড়ে গেল। যখনই ক্রিয়া করতে যাবে তখনই তার শক্তিটা বেড়ে গেল। যেখানেই কোন স্বার্থ ভাব এসে গেল, স্বার্থ ভাব মানে অহং বোধ, তখনই শক্তি বেড়ে যাবে। তার মানে আগুনে ইন্ধন দেওয়া হল, ফলে অজ্ঞানের নাশ কোন দিন করা যাবে না। অজ্ঞানের নাশ হবে একমাত্র বহুত্বের নাশ দিয়ে। বহুত্বের নাশ মানে আমি আর ঈশ্বরই আছেন। এবার সে জগৎ থেকে যেন একটু সরে এল, কিন্তু তাতেও বহুত্বের নাশ হয় না। বহুত্বের পুরোপুরি নাশ মানে যখন দেখছে একমাত্র ঈশ্বরই আছেন বা আমার ভেতরে যিনি আত্মা আছে আর যাঁকে ব্রহ্ম বলে জানি, দুটো এক। এক বলতে ওটাই। মা ছেলেকে বলে আমরা এক, ঐ অর্থে এক নয়। যেমন শ্রীরামচন্দ্রের নাম রাম, আরেকজনের নাম জানকীনন্দন, রামও যিনি জানকীনন্দনও তিনি, ঐ অর্থে এক, কোন দ্বৈত নেই। যিনি রাম তিনিই জানকীনন্দন, যিনি আমার ভেতরে আত্মা তিনিই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মাত্মৈক্য ছাড়া অজ্ঞানের নাশ হয় না।

অজ্ঞানের ধর্ম যেমন ক্রিয়া-কারক-ফল, জ্ঞানের ধর্ম হল *অধ্যারোপণলক্ষণশূন্যম্*, অর্থাৎ কোন ধরণের ক্রিয়া থাকে না, কোন ধরণের কারক থাকে না আর কোন ধরণের ফল থাকে না। আমি ঈশ্বরের পূজো করছি, এই ক্রিয়াটাও থাকবে না। কারক থাকবে না মানে, কর্তা থাকবে না, আমি ধ্যান করছি, এই আমিটাও থাকবে না। ঠাকুর বারবার বলছেন, অহঙ্কারের লেশ মাত্র যদি থাকে তাহলে কিন্তু হবে না। কারণ কর্তা এসে গেলেই দ্বিতীয়ার কর্ম এসে যাবে। যেমনি দ্বিতীয়া এসে গেল তখন কর্তা কর্মের উপর কাজ করবেই। কাজ করলেই কাজের ফল এসে যাবে, এইভাবে পর পর ক্রিয়া-কারক-ফল সব এসে যাবে। জ্ঞানের প্রথম লক্ষণই হল কোন ক্রিয়া থাকবে না, কোন কারক থাকবে না আর কোন ফল থাকবে না। আমি ক্রিয়া-কর্ম-ফল বন্ধ করে দিতে পারি, ঘরের দরজা-জানলা সব বন্ধ করে হাত-পা গুটিয়ে ধ্যানে বসে গেলাম, মনে করছি সব ক্রিয়া-কর্ম-ফল বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু ঘরের ভেতরে কে ধ্যান করছে? আমি ধ্যান করছি। কর্তা তো এসেই গেল, আর বাকি থাকল কি! যতক্ষণ এই কর্তা ভাবের অর্থাৎ আমি ভাবের নাশ না হয় ততক্ষণ কিন্তু অজ্ঞানের নাশ হবে না। সেইজন্যই বলা হয় উপনিষদাদি অত্যন্ত কঠিন বিষয়। ঠাকুর মা কালীর পূজা করছেন, ঠাকুর কি দেখছেন? আমি আছি আর মা কালী আছেন। এটাই তো অজ্ঞান। সেখানেও তো আমি থেকে যাচ্ছে, আত্মরূপে করছেন। আপনি কাকে দেখছেন? মাকে দেখছি, দেখছি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মা ছাড়া কেউ নেই। কে দেখছেন? আমি দেখছি। আপনি তো অজ্ঞানেই পড়ে আছেন। আপনার জন্য উপনিষদ আর চলবে না। যার জন্য ঠাকুরকে দেখে তোতাপুরী আফশোষ করছেন 'আরে! এই রকম যার আধার সে কী সব করছে'! কিন্তু তারপরে ঠাকুরের যা কিছু চলছে, ঠাকুর যখন সমন্বয় করছেন, ওটাও যা এটাও তাই ঠাকুর বলছেন তখন তাঁর আমি কিন্তু থাকছে না। এগুলো আমাদের পক্ষে ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন। পরের দিকে ঠাকুর বলছেন, মাইরি বলছি আমি আমার আমিটা খুঁজে পাই না। কিন্তু তখনও তিনি মা কালীকে দেখছেন। প্রথমে দেখছেন আমি আর মা কালী, দ্বিতীয় যা দেখছেন তখন শুধু আত্মজ্ঞানে দেখছেন আর তৃতীয় যেটা দেখছেন সেটাও সেই আত্মাকেই তিনি দেখছেন

মা কালী সব কিছু হয়ে আছেন। তবে ঐ ভাবে থাকলে সংসার চলবে না। সংসারকে শিক্ষা দেওয়ার সময়, ব্যবহারের সময় আমি তুমি ভাবকে নিয়ে আসছেন, এই আমি তুমিটা যেন জলের উপর একটা রেখা মাত্র।

ক্রিয়াকে না হয় বন্ধ করে দেওয়া যাবে, ক্রিয়া না থাকলে ফলও থাকবে না, কিন্তু কারকটা কোথায় যাবে! আমাকে তো খাওয়া-দাওয়া করতে হবে, খাওয়ার সময় তো এই ভাবটা আছে আমি খাচ্ছি। ঠাকুরের এই ভাবটাও থাকত না, যার জন্য ঠাকুরকে জোর করে মাথায় মেরে মেরে খাইয়ে দেওয়া হত। হৃদয়রাম যদি সেই সময় ঠাকুরের কাছে না থাকত ঠাকুরকে আমরা আর পেতাম না। আচার্য তাই বলছেন যতক্ষণ ক্রিয়া-কারক-ফল আছে ততক্ষণ এই ঐক্য হবে না। এর একটু কণামাত্রও যদি থাকে বাকি সব কটা এসে যাবে।

বলছেন *আত্যন্তিকনিঃশ্রেয়স*, মানে complete freedom, এর মধ্যে কোন part freedom নেই, এই স্বর্গে যাওয়া, সেই স্বর্গে যাওয়া সেখান থেকে আবার ফেরত আসা, সব রকম যাওয়া আসা সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হয়ে যাবে। ঠিক আছে ব্রহ্মলোকই ভালো, কিন্তু শত কোটি বছর পরে ব্রহ্মার যখন নাশ হবে তখন আবার কোথায় আসতে হবে কে জানে! কোন শর্তাধীন মুক্তির ব্যাপার নেই। কোন ধরণের একটা সীমাও টেনে দেওয়া হচ্ছে না। *আত্যন্তিক*, চিরদিনের জন্য মুক্ত। আচার্য বলছেন, এই জ্ঞানেরই বর্ণনা এরপর থেকে শুরু হবে। আচার্য এখানে যোগ করে বলছেন, তৃতীয় বরে এই আখ্যায়িকার মাধ্যমে যেটা বলা হচ্ছে, এর বিনা দ্বিতীয় বর অকৃতার্থ হয়ে যায়। কারণ দ্বিতীয় বরে যে স্বর্গের বর্ণনা করা হচ্ছে এই স্বর্গ যদিও ব্রহ্মলোক কিন্তু মায়ার রাজ্যেরই অঙ্গ। ব্রহ্মলোক থেকেও আবার জন্মমৃত্যুর চক্রে ফিরে আসতে হবে। যে নচিকেতা এই দ্বিতীয় বর চাইলেন, সেই নচিকেতাও বুঝে গেছেন ব্রহ্মলোকই শেষ কথা নয়। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরই যদি শেষ কথা হত তাহলে এটা আর উপনিষদ না হয়ে মন্ত্র ব্রাহ্মণে চলে যেত। যিনি শুধু এই লোকের জন্য সাধনা করছেন তার কিন্তু পুরো ফল হবে না। প্রধান কারণ হল দ্বিতীয় বরেও যজ্ঞ রূপ ক্রিয়া থাকছে। কারণ অনেক ভাবে রয়েছে, একদিকে যজ্ঞ, যজ্ঞের আহুতি আবার আত্মভাবে ধ্যান। এতগুলো জিনিষ থেকে যাচ্ছে, তার মানেই এটা অজ্ঞানের এলাকা। অজ্ঞানের এলাকা বলে অকৃতার্থ থেকে গেল, শাস্ত্র অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। অদ্বৈত এখানে আসছে না, আমাদের ভাষায় একত্ব হচ্ছে না, বহুত্ব থেকে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বরে নচিকেতা যে স্বর্গ পাচ্ছেন, ক্রিয়ার ফল রূপে পাচ্ছেন। ক্রিয়া থাকার জন্য কারক এসে যাচ্ছে। উচ্চভাবের কথা, আত্মভাবের চিন্তন আসছে ঠিকই কিন্তু সেখানেও আমি থেকে যাচ্ছে। সেইজন্য দ্বিতীয় বরেও পূর্ণতা হচ্ছে না। অজ্ঞান আর জ্ঞানের এই সহজ যুক্তি আচার্য দেখিয়ে দিলেন। আত্মজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে পরিষ্কার দেখা যায় দ্বিতীয় বর অসম্পূর্ণ, ব্রহ্মলোকই জীবনের শেষ কথা হতে পারে না। ব্রহ্মলোক জীবনের শেষ কথা কেন নয়? আচার্য এখানে নিজে কোন উপদেশ দিচ্ছেন না, খুব সহজ যুক্তি এনে দেখাচ্ছেন, সাধনা দুই প্রকারের, একটা সাধনায় বহু থাকে আরেকটি সাধনায় অবহু। যেখানে অবহু সেখানে কোন অজ্ঞানের খেলা নেই, যেটা আমরা শাস্ত্র দেখেই বুঝতে পারি, দ্বিতীয় বরে বহুর খেলা আছে। বহুর খেলা মানেই শেষ কথা হতে পারে না। তাই রামকৃষ্ণলোক, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠলোক শেষ কথা হতে পারে না। কারণ এগুলো হল সেই সাধনার ফল, যে সাধনা আমিত্বকে রেখে করা হয়। আচার্য খুব সহজ যুক্তি নিয়ে আসছেন, যদিও ধারণা করতে আমাদের মাথা ঘুরে যায়, কিন্তু শাস্ত্রের দিক থেকে আচার্যের যুক্তি অত্যন্ত সহজ যুক্তি। উনি খুব সহজ ভাবে দেখিয়ে দিচ্ছেন অজ্ঞান মানে বহু আর জ্ঞান মানে অবহু অর্থাৎ বহুত্বের নাশ। বহুত্ব কি? ক্রিয়া-কারক-ফল। দ্বিতীয় বর প্রাপ্তি হবে ক্রিয়া-কারক-ফলের জন্য, যা কখনই শেষ কথা হতে পারে না। কিন্তু তৃতীয় বরের পর থেকে যা কিছু চলবে, সেখানে ক্রিয়া-কারক-ফল নাশ হয়ে যায়। এটাই ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান। আখ্যায়িকার মাধ্যমে এখানে তৃতীয় বরকে নিয়ে আসা হচ্ছে।

এর সাথে বলছেন *সাধ্য-সাধন-লক্ষণাদনিত্যাদ্বিরক্তস্য*, যাঁরা এই তৃতীয় বরকে আধার করে আত্মজ্ঞান পেতে চাইছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে বলছেন এই আত্মজ্ঞান তাঁদের পক্ষেই সম্ভব যাঁরা সাধ্য-সাধন-লক্ষণ, অনিত্য ফল আর কর্মবিষয়ক যাবতীয় যা কিছু আছে তার থেকে বিরক্ত। তার মানে যার জীবনে কোন কিছু পাওয়ার আশা আছে, এমনকি আমি মুক্ত হব এই ফলের আশাও যার আছে তার দ্বারা এই জ্ঞান হবে না। ঈশ্বর আমার প্রতি কৃপা করবেন, এই ভাব যার আছে তার দ্বারাও হবে না। সাধ্য-সাধন-লক্ষণ মানে আমাকে ঐ জিনিষটা পেতে হবে, ঐ জিনিষ পেতে গেলে আমাকে এই এই করতে হবে, এত জপ করতে হবে, এত ধ্যান করতে

হবে। যেখানেই এই সাধ্য-সাধন-লক্ষণ আছে, সেখানে এই জ্ঞান হবে না। এর থেকে যিনি বিরক্ত হয়ে গেছেন অর্থাৎ সাধ্য-সাধন-লক্ষণের উর্ধ্বে চলে গেছেন, তিনি এই জ্ঞান লাভের অধিকারী। এই জিনিষটাকে দেখানোর জন্যই পরে নচিকেতাকে প্রলোভনাদি দেওয়া হচ্ছে। যে কোন ধরণের সাধ্য-সাধন-লক্ষণ যেমন পুত্রাদিতে সাধ্য-সাধন-লক্ষণে আছে, টাকা-পয়সাতেও সাধ্য-সাধন-লক্ষণ পুরো মাত্রায়, টাকা-পয়সার কথা ছেড়ে দিন জপ-ধ্যান করছি সেখানেও প্রচুর সাধ্য-সাধন আছে, যেখানে উচ্চতম সাধনা হচ্ছে সেখানেও সাধ্য-সাধন আছে, এদের দ্বারা হবে না। আমরা মুখে বলি আমি ইহকাল পরকালের সব সুখ ছেড়ে দিয়েছি, ইহকালেও সুখ চাই না, পরকালেও সুখ চাই না, আমি সব কিছুর পারে। তাহলে কি আমার হবে? এতেও হবে না। কারণ, তখনও এই বোধ থেকে যাচ্ছে যে আমি ঠাকুরের ধ্যান করছি, ওখানেই সাধ্য-সাধন এসে গেল। যতক্ষণ সাধ্য-সাধন-লক্ষণ থেকে না বেরিয়ে আসছে ততক্ষণ জ্ঞান হবে না। এটাকে এবার কাহিনীর মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে যেখানে নচিকেতাকে প্রলোভন দেওয়া হচ্ছে। এই কাহিনী দিয়ে দেখানো হচ্ছে ঐ উচ্চতম আদর্শ কত কঠিন।

এরপর থেকেই ঠিক ঠিক উপনিষদ শুরু হয়। কিন্তু তার আগে একটা প্রস্তুতি নেওয়া হল। প্রস্তুতি আসলে দুটো। প্রথম প্রস্তুতি হল মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ, যেখানে শুধু বিধি আর প্রতিষেধ আসছে। যেখানেই বিধি ও প্রতিষেধ সেখানেই ক্রিয়া থাকবে, যেখানেই ক্রিয়া সেখানেই কারক, সেখানেই ফল। যে জিনিষে কোন বিধি ও প্রতিষেধ যদি থাকে বুঝতে হবে এটাই আত্মজ্ঞানের পথে অন্তরায়। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই নিয়ে অনেক সংশয় আসে। আচার্য এটাকেই এখানে তুলে ধরে বলছেন, কারুর মনে যদি এতটুকুও ক্রিয়া-কারকের ব্যাপার থেকে থাকে তার দ্বারা উপনিষদের জ্ঞান হবে না। প্রথম প্রস্তুতিতে বলা হল কর্ম থেকে তার নিবৃত্তি হয়ে গেছে। এবার দ্বিতীয় প্রস্তুতি হল মনের, মনের ভেতরটা পুরো পরিষ্কার হয়েছে কিনা। তার মানে কর্মের কোন প্রবৃত্তি তো থাকবেই না, মনের ভেতরেও কোথাও কোন লোভ বা প্রত্যাশা থাকবে না। এই জিনিষটাকে তুলে ধরার জন্য পরের প্রকরণ এখান থেকে শুরু করছেন। তখন নচিকেতা তৃতীয় বরে বলছেন –

যেয়ং প্রেতে বিচিকৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ।।১/১/২০।।

নচিকেতা বললেন "মানুষ মারা গেলে এই সংশয় হয় যে কেউ বলেন 'পরলোকগামী আত্মা আছেন', আবার কেউ বলেন 'আত্মা নেই' আপনার কাছে আমি এই আত্মার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব জানতে চাই। এটাই আমার তৃতীয় বর"।

তৃতীয় বরে নচিকেতা খুব সরল মনে জানতে চাইছেন। নচিকেতার বাসস্থান আশ্রম ছিল, সেখানে অনেকেই থাকতেন, শিষ্যরা আছেন, বাবা গৃহস্থ ধর্ম পালন করছেন, সাথে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানও করছেন। নচিকেতা সেখানে শাস্ত্রাদির অনেক কথাই খাপছাড়া ভাবে শুনেছেন, কিন্তু কোনটাই তাঁর কাছে পরিষ্কার ছিল না, কিন্তু এই ধারণাটা ছিল যে স্বর্গ বলে কিছু আছে, মানুষ সেইজন্য যজ্ঞ করে, আমাদের একটা সূক্ষ্ম শরীর আছে, মৃত্যুর পর যে শরীর বিভিন্ন লোকে যেতে থাকে। সূক্ষ্ম শরীর যে আছে নচিকেতা এই মুহুর্তে নিজেই দেখছে সে মারা গেছে আর সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে যমলোকে পৌঁছে যমরাজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

নচিকেতা বলছেন, *যেয়ং প্রেতে বিচিকৎসা মনুষ্যে*, *বিচিকৎসা* মানে সংশয় করা, কিসের সংশয়? *অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে*, কেউ কেউ বলেন মানুষ মারা গেলে পরলোকগামী সূক্ষ্ম শরীরের পেছনে আত্মা থাকে, আবার কেউ কেউ বলেন আত্মা বলে কিছু নেই, এই সংশয়। অর্থাৎ স্থূলের পেছনে যে সূক্ষ্ম শরীর সেই সূক্ষ্ম শরীরের পেছনে কোন আত্মা বা আরও কিছু আছে কিনা। এখানে কিন্তু আত্মা শব্দটা সরাসরি আনছেন না, বলছেন *যেয়ং প্রেতে বিচিকৎসা মনুষ্যে*, মৃত্যুর পর মানুষের স্থুল শরীরের পেছনে শুধু কি সূক্ষ্ম শরীরটা থাকে নাকি তার পেছনে আরও কিছু আছে। *এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহহং*, আমি মনে করি সূক্ষ্ম শরীরের পেছনে কিছু আছে কিনা এই ব্যাপারে আপনার থেকে আর কেউ নেই যিনি আমাকে ভালো শিক্ষা দিতে পারবেন।

ঠিক এই প্রসঙ্গটাই তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও আছে। কিন্তু তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে সরাসরি আত্মজ্ঞান প্রসঙ্গে প্রশ্ন ছিল, ওখানে নচিকেতা পরিষ্কার আত্মজ্ঞান চাইছেন। এখানে নচিকেতার প্রশ্ন মৃত্যুর পরে কিছু আছে কিনা। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এখানে পুরো আলাদা ভাবে শব্দ চয়ন করা হয়েছে। বেদান্তের মূল গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্র যেখানে

হিন্দু দর্শনের সব কিছুকে সমন্বয় করা হয়েছে, সেখানে এই মন্ত্রকে কেন্দ্র করে অনেকে অনেক রকম প্রশ্ন উত্থাপন করে আলোচনা করছেন বাস্তবিক জিনিষটা কি বলতে চাইছেন। আচার্য ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, এই প্রশ্ন আত্মার অস্তিত্বকে নিয় প্রশ্ন নয়। আত্মা আর ব্রহ্ম দুটো একই জিনিষ, সেইজন্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আর আত্মজিজ্ঞাসা দুটো একই জিনিষ। *যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে*, মানুষ বলে মৃত্যুর পরে কিছু আছে কি নেই, এই অর্থ করলে মনে হয় যে জীবাত্মা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু তা নয়, এখানে প্রশ্ন হল সূক্ষ্মের পেছনে কিছু আছে কিনা। যদিও এরপরে যে আলোচনা হবে সেটাও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নিয়েই হবে। নচিকেতা এখনও নাবালক, তাই তার শব্দ চয়ন ঠিক পরিষ্কার নয়, কিন্তু নচিকেতা যে জিনিষটা জানতে চাইছেন, ওর মনে যে প্রশ্নের উদয় হয়েছে, যিনি শিক্ষক তিনি সেটাকে ধরে ফেলেছেন।

শরীর, ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধির পারে কি কিছু আছে? আচার্য বলছেন, *অস্তি শরীরেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিব্যতিরিক্তো,* স্থূল শরীর চলে গেল আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই কিন্তু ভূত দেখা, মৃত্যুর পর স্বর্গে যাওয়া বা অন্যান্য লোকে যাওয়া, এই ধরণের নানা রকমের কথা যখন বলা হয় তখন সূক্ষ্ম শরীরের কথাই বলা হয়, যে সূক্ষ্ম শরীর ইন্দ্রিয়, মন আর বুদ্ধি এই কটি জিনিষ দিয়ে তৈরী। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এর বাইরেও কি কিছু আছে? নচিকেতা সূক্ষ্ম শরীরের ব্যাপারে যে প্রশ্ন করবেন না জানাই কথা, নিজের সূক্ষ্ম শরীরকে নিজেই দেখছেন। অনেকে বলেন হ্যাঁ আছে, আবার অনেকে বলেন নেই। পূর্বমীমাংসা বা বেদের কর্মকাণ্ডের দর্শন এই জায়গাতে এসে একটু গোলমেলে হয়ে যায়। কারণ একদিকে তাঁরা বেদান্তের ব্রহ্ম আর আত্মার ঐক্যকে মানেন না। বেদান্তের এই ব্রহ্মাত্মৈক্যকে না মানার জন্য একটা বিরাট সমস্যা হয়ে যায়। কর্মকাণ্ডীদের দর্শন দাঁড়িয়ে আছে গীতার এই শ্লোকের উপর – *জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ*, যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু হবে, যার মৃত্যু হয়েছে সে আবার জন্মাবে। একেবারে ঠিক বলছেন, কিন্তু এই অবস্থা কত দিন ধরে চলবে? গীতার শ্লোক হলেও *জাতস্য হি ধ্রুবো* কিন্তু গীতার মত নয়, এটাই ঠিক ঠিক পূর্বমীমাংসকদের মত। এই মতকে নিয়ে নচিকেতা প্রশ্ন করছেন। মানুষ মারা গেল, তার স্থূল শরীর থেকে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি বেরিয়ে এবার কোন লোকে গেল। সেখানে গিয়ে সেখানকার মত একটা স্থূল শরীর ধারণ করে নিল। আবার সেই লোক থেকে অন্য কোন লোকে গেল, এইভাবে ঘুরে ঘুরে আবার সে এই পৃথিবীলোকে এসে মনুষ্য বা অন্য কোন যোনিতে জন্ম নিল, এখান থেকে আবার একটা লোকে গেল। এই ঘোরাঘুরিটা কত দিন চলতে থাকবে? পূর্বমীমাংসকদের মতে অনন্ত কাল ধরে চলছে আর অনন্ত কাল ধরে চলবে। তাহলে তো সে চিরন্তন বন্ধনে পরে থাকল, জীবের কত অসহায় অবস্থা!

আরও সমস্যা হল আত্মার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে কিছু নেই, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দিয়ে আত্মাকে জানা যাবে না। অনুমান প্রমাণ দিয়ে অর্থাৎ যুক্তিতর্ক দিয়ে বিচার করেও আত্মাকে জানা যাবে না। অথচ পরমপুরুষার্থ, অর্থাৎ আত্যন্তিকনিঃশ্রেয়সতার ব্যাপারটা আবার এই আত্মজ্ঞানের মধ্যেই রয়েছে। যে ব্যক্তির আত্মজ্ঞান নেই সেই ব্যক্তি কোন দিন পরমপুরুষার্থ পেতে পারে না। বেদের ঠিক ঠিক যে দর্শন সেখানে ধর্ম, অর্থ আর কামের ব্যাপারে বলা হয়েছে, মোক্ষ পরে যোগ হয়েছে। পূর্বমীমাংসক বা কর্মকাণ্ডীদের কাছে ধর্মটাই শেষ কথা। ধর্ম মানে, যজ্ঞাদি করবে, যজ্ঞাদি করার ফলে সে উচ্চতম স্বর্গে যাবে, এখানেই তার সব শেষ। বেদান্ত আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলছেন পরমনিঃশ্রেয়স, এটাই মোক্ষ। এই পরমনিঃশ্রেয়স বা পরমপুরুষার্থ বা মোক্ষ আত্মজ্ঞানের মধ্যেই নিহিত। আত্মজ্ঞানের মধ্যে যদি নিহিত থাকে তাহলে আগে আত্মার ব্যাপারটা জানতে হবে, আত্মা আছেন কি নেই সেটাই জানা নেই। আত্মার ব্যাপারটা তাই খুব সংশয়যুক্ত, কেউ বলছে আছে কেউ বলছে নেই, অন্য দিকে আবার মুক্তির কথাও বলা হচ্ছে। আত্মার আবার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই, ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যাবে না, যুক্তিতর্ক দিয়েও জানা যাবে না। তাহলে কি দিয়ে জানা যাবে? একমাত্র শাস্ত্র দিয়েই জানা যেতে পারে। শাস্ত্র মানে যিনি খুব উচ্চমানের আচার্য তিনিই বলতে পারবেন। নচিকেতা তাই বলছেন 'হে যমরাজ! আপনি সূর্য পুত্র, আপনি ধর্মরাজ যাঁর কাছে সব জ্ঞান রয়েছে, যিনি পুরো জিনিষটাকেই জানেন, আপনার থেকে ভালো শিক্ষক আর কোথায় পাবো'! এটা কিন্তু নচিকেতার শিশুসুলভ একটা কৌতুহল, আত্মতত্ত্ব জানার জন্যই যে যমলোকে এসেছেন তা নয়, পুরো ব্যাপারটাই দৈবাৎ। বাবা যমলোকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, নচিকেতাও পৌঁছে গেছেন, দৈবাৎ সেই সময় যমরাজ যমলোকে ছিলেন না, তিন রাত্রি না খেয়ে না ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন, যমরাজ ফিরতেই বাড়ির লোকরা যমরাজকে সতর্ক করে দিলেন, ব্রাহ্মণ তিন রাত না খেয়ে

না ঘুমিয়ে অপেক্ষা করছে। যমরাজ তাঁকে তিনটে বর দিলেন। পুরো ব্যাপারটাই দৈবাৎ, যদিও এটা আখ্যায়িকা। ধ্রুবের সাথেও একই জিনিষ হয়েছিল, সে তপস্যা করতে চলে গেল যাতে বাবার সাম্রাজ্যের অধিকার পেতে পারে। ভগবান তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ধ্রুবকে ভক্তি দিয়ে দিলেন। ধ্রুব বলছে, কাঁচ কুড়াতে এসে যদি হীরে পেয়ে যাই তাহলে তাকে ছেড়ে দেব কেন! বাবার কোপভাজন হয়ে নচিকেতা চলে গিয়েছিল যমরাজার কাছে, সেখান থেকে ফিরে আসাটাই আনন্দের ব্যাপার, কিন্তু যমরাজ বললেন তুমি তিনটে বর নাও। দুটো বর নেওয়া হয়ে গেছে, তৃতীয় বরে কী চাইবে, তাহলে মৃত্যুর পরের ব্যাপারটা জেনে নেওয়া যাক, যেহেতু যম মৃত্যুরই দেবতা। তবে এগুলো আখ্যায়িকা ছাড়া আর কিছু নয়।

নচিকেতা জানেন যমরাজ হলেন সৃষ্টিতে প্রথম মানুষ যিনি মৃত্যুকে পেয়েছিলেন আবার অন্য দিকে সূর্যের পুত্র হওয়াতে ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত। নচিকেতা তো যমরাজাকে প্রশ্ন করে দিলেন, কিন্তু এরপর যমরাজ কি করবেন? ঠাকুরের কাছেও একজন এসে বলছে – মশাই! আমাকে সমাধিটুকু শিখিয়ে দিন তো। যমরাজ এখানে নচিকেতার সাথে খোশ গল্প করতে নামছেন না। তুমি যেভাবেই হোক এখানে এসে গেছ, তাই বলে তুমি যেমন তেমন কিছু একটা প্রশ্ন করবে আর আমিও তোমার সাথে বকর্ বকর্ করে তোমাকে মজা দেব, তা কখনই হতে পারে না। যমরাজ কারুকে মজা দেবার জন্য যমলোকে বসে নেই। কোথাও কিছু একটা শুনেছে যে আত্মা বলে কিছু আছে, যমরাজকে তাই জিজ্ঞেস করেছে। এগুলোকে বলে technical discussion, যেমন ঠাকুরের কাছে একটা বাচ্চা ছেলে এসে ঠাকুরকে বলছে 'তুমি কি পরমহংস'? ঠাকুর বলছেন 'হ্যাঁ তাই'। 'তুমি নাকি সবাইকে অনেক উপদেশ দাও, আমাকেও একটু উপদেশ দাও না'। রামলাল কাছেই ছিল, রামলালকে ডেকে ঠাকুর বলছেন 'রামলাল! ঐ তাকের উপরে কিছু উপদেশ রাখা আছে, একে দুটো উপদেশ দেতো'! রামলাল তাক থেকে দুটো সন্দেশ বার করে বাচ্চাটির হাতে দিল। সন্দেশ খাওয়া হয়ে গেলে ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন – 'উপদেশ কেমন লাগল'? 'খুব মিষ্টি'। 'এবার এসো'। বয়স কালে উনি খুব দুঃখ করে বলতেন 'দেখুন ঠাকুর আমাকে সন্দেশ দিয়ে কেমন ভুলিয়ে দিলেন'। যমরাজ এবার নচিকেতাকে সন্দেশ দিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করছেন – তোমার উপদেশ লাগবে নাকি সন্দেশ?

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা
ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব
মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্।।১/১/২১।।

(নচিকেতাকে পরীক্ষার জন্য যমরাজ বলছেন 'এই আত্মতত্ত্বের ব্যাপারে পূর্বে দেবতারাও সংশয়যুক্ত ছিল, কারণ এই আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ার জন্য সুবিজ্ঞেয় নয়, সুতরাং এই বর পরিত্যাগ করে তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর, এই নিয়ে তুমি আমাকে আর উপরোধ করো না')।

যার কাছ থেকে ধার নেওয়া হয় সে হয়ে যায় ধনী আর যে ধার নিচ্ছে সে হয়ে যায় ঋণী। ঋণ শোধ করার সময় ধনী ঋণীর গলায় গামছা দিয়ে ঋণ আদায় করে ছাড়বে। ইদানিং এই ধরণের কিছু হয় না ঠিকই, কিন্তু একেবারেই যে হয় না তা নয়। আগেকার দিনে গ্রাম দেশে জমিদাররা বেশি করত। ঠাকুর আবার অন্য ভাবে বলছেন, যে মেয়ে উপপতি করেছে, সেই উপপতি পরে যদি ঐ মেয়েকে না দেখে, তখন মেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসে জামার কলার টেনে বলে – তবে রে শালা! তোর জন্য আমি নষ্টা হলাম, ঘরবাড়ি ছাড়লাম, আমায় দেখবি না মানে! যমরাজ নচিকেতাকে এটাই বলছেন *মা মোপরোৎসীরতি*, আমি তোমার কাছে ঋণী ঠিকই, কিন্তু তাই বলে গলায় গামছা দিয়ে আমাকে টেনো না।

যমরাজ কেন বলছেন? *দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং*, 'তুমি যে সংশয়ের কথা বললে, এই সংশয় শুধু মানুষের মধ্যেই নেই, দেবতাদের মধ্যেও আগে এই ব্যাপারে সংশয় ছিল'। তাহলে দেবতাদেরও কেউ কেউ কি এই আত্মার ব্যাপারে জানেন? খুব জটিল ব্যাপার। কারণ কোথাও কোথাও দেখা যায় দেবতারা জানেন আবার কোথাও কোথাও বলছে দেবতারা জানেন না। সমগ্র শাস্ত্রে ব্যাপারটা এতই সংশয়মূলক যে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। শাস্ত্রে যেখানেই অমৃতের প্রসঙ্গ আসবে সেখানেই বুঝতে হবে যে আত্মজ্ঞানের ব্যাপারে বলা হচ্ছে। বলা হয় যে, আত্মজ্ঞান আগে অসুররা পেয়েছিল, যেহেতু অসুরদের গুরু শুক্রাচার্যের কাছে আত্মজ্ঞান

ছিল। কিন্তু এই জ্ঞানকে তারা কাজে লাগাতে পারেনি। মহাভারতে এই নিয়ে কাহিনী আছে। দেবগুরু বৃহস্পতি তাঁর পুত্র কচকে শুক্রাচার্যের কাছে পাঠালেন যাতে কায়দা করে সে শুক্রাচার্যের কাছ থেকে আত্মজ্ঞানের বিদ্যাটা নিয়ে আসতে পারে। এক লম্বা কাহিনী। কাহিনীতে একটা মন্ত্রের কথা বলা হয়েছে, যে মন্ত্র দিয়ে অসুররা অমরত্ব লাভ করেছিল। যাই হোক কচ কায়দা করে মন্ত্রটা আয়ত্ত করে চলে এসেছে। মানুষকে যদি অমরত্ব লাভ করতে হয় তাহলে *অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি* এই মন্ত্র ছাড়া আর কোন মন্ত্র হতে পারে না। পরের দিকে অসুরদের রাজা বৃষপর্বের মেয়ে শর্মিষ্ঠার সাথে শুক্রাচার্যের মেয়ে দেবযানীর ঝামেলা লেগেছিল তখন শুক্রাচার্য তাঁর মেয়েকে বলছেন 'দেখো মা! আমার কাছে আত্মজ্ঞানের সম্পদই একমাত্র সম্বল, এছাড়া আমার কাছে আর কিছুই নেই'। আত্মজ্ঞানই বিশ্বের সব থেকে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এখানেই পরিষ্কার বোঝা যায় অমরত্ব বলতে আত্মজ্ঞানকেই বোঝাচ্ছে। এটা যেমন একটা কাহিনীর মাধ্যমে আত্মজ্ঞানের কথা বলা হল আবার অন্য দিকে আমরা উপনিষদেই পাই যে, দেবতা আর অসুর দুজনেই ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বলছেন – আমাদের আপনি সেই বিদ্যাটা দিন যে বিদ্যা পেলে আমরা অমরত্ব পেয়ে যাব। ব্রহ্মা দুজনকে বলে দিলেন – তুমিই সেই। তাতেই অসুররা আনন্দে বলছে আমরা জেনে গেছি, আমিই সেই। সেইজন্য চল খাও পিও মস্ত কর। অসুররা আমি বলতে বুঝে নিল আমি শরীর। অসুররা এরপর খাওয়া-দাওয়া, আমোদ-আহ্লাদ করে ইন্দ্রিয় সুখের মধ্যেই ডুবে গেল। দেবতাদের রাজা ইন্দ্র খুব বুদ্ধিমান, সে কিন্তু সন্তুষ্ট না হয়ে আবার ব্রহ্মার কাছে গেল। এরপর আবার লম্বা কাহিনী, যাই হোক ইন্দ্রই শেষে আত্মজ্ঞান পেলেন। অন্য দিকে পরের কাহিনীগুলিতে ইন্দ্রকে এক লম্পট রূপে দেখান হচ্ছে। এইসব কারণে পুরো ব্যাপারটাই খুব সংশয় যুক্ত। ঋষিরা এগুলো রচনা করেছেন ঠিকই কিন্তু তাঁরাও পরিষ্কার করে বলছেন না যে আত্মজ্ঞান প্রথম কে পেয়েছিলেন। অথচ অন্য দিকে পুরাণাদি গ্রন্থে ব্রহ্মার চারজন মানসপুত্র সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার জন্ম থেকেই ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। পরিষ্কার কোথাও বলা নেই যে আত্মজ্ঞান প্রথম কার কাছে ছিল।

যমরাজও তাই নচিকেতাকে বলছেন – তুমি যে প্রশ্ন করেছ এর উত্তর দেবতাদের কাছেও পরিষ্কার নয়। একটা প্রচলিত কাহিনী আছে, ভগবান দেবতা, মানুষ সব সৃষ্টি করে সবাইকে বিভিন্ন রকম বৈশিষ্ট্য দিলে। মানুষকে তিনি আত্মজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য দিলেন। দেবতারা তখন ভগবানকে বলছেন, মানুষকে যে আপনি আত্মজ্ঞান দিলেন এরা পরে আমাদের জয় করে আমাদের উপরে চলে যাবে। ভগবান বললেন, ঠিক আছে আত্মজ্ঞানটা লুকিয়ে রেখে দাও। দেবতারা পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে রাখার পর দেখল এখানেও মানুষ পৌঁছে যাচ্ছে, সমুদ্রে, অন্তরীক্ষে যেখানেই লুকিয়ে রাখছে মানুষ সব জায়গাতেই পৌঁছে যাচ্ছে। এক কাজ করা যায়, আত্মজ্ঞানকে মানুষের ভেতরেই ঢুকিয়ে লুকিয়ে রাখা হোক। দেবতারা এবার নিশ্চিন্ত হয়ে গেল, কারণ মানুষ কখনই ভেতরের দিকে তাকায় না, সব সময় বহির্মুখী। কঠোপনিষদেই পরে বলবেন *তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্*, মানুষের স্বভাবই সব কিছু বাইরেই খুঁজে বেড়াবে। সুখের জন্য বাইরে ছুটছে, শান্তি চাই বাইরে ছুটছে, শক্তি চাই বাইরে ছুটছে। তোমা বিনু হয়ে আছি বাঁশবাগানের কানাডোম, ছেলে যে মেয়েকেই দেখে নিচ্ছে তাকে দেখেই গান করছে। ভক্ত যখন কোন দেবী দেবতা দেখছে তখনও এই গান করছে। প্রথম দিন থেকে এই একই অবস্থা চলে আসছে, কোন দিন এর পরিবর্তন হচ্ছে না। মেয়েকে দেখেও বাঁশবাগানের কানাডোম বলে, ভগবানকে দেখেও তাই বলে, স্ত্রীকে দেখেও তাই বলে, নাতিকে দেখেও তাই বলে, একই জিনিষ বলে যাচ্ছে। কিন্তু তোমার শক্তি, তোমার সুখ, শান্তি, আনন্দ সব তোমার ভেতরে। ধাক্কা জীবনে আসতেই পারে, কিছুক্ষণের জন্য তুমি হয়ত নড়ে যাবে, কিন্তু সেই ধাক্কা নিয়েই যদি সারা জীবন বসে বসে চোখের জল ফেল, তোমার কপালে দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি জুটবে! দেবতারা আত্মজ্ঞানটা মানুষের ভেতরে লুকিয়ে দিল, সেই থেকে মানুষ আর আত্মজ্ঞানের সন্ধান পাচ্ছে না। দেবতাদেরও সবাই আত্মজ্ঞানের ব্যাপারে জানেন না, যমরাজ তাই বলছেন *দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসং পুরা*। পরের দিকের শাস্ত্রগুলিতে তাঁরা খুব কঠোর ভাবে বলছেন দেবতারা আত্মজ্ঞান কখনই পেতে পারেন না। এটা আবার বিতর্কিত বিষয়। আসলে অনেক শাস্ত্র হয়ে গেলে, অনেক মুনির সমাবেশ হয়ে যায়, সেখানে এই ধরণের সমস্যা একটু হবেই, কিছু করার থাকে না। কেউ একটা আদর্শকে উঁচুতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এক ধরণের জিনিষ নিয়ে আসে, আবার আরেকজন অন্য একটা জিনিষকে তুলে ধরার জন্য অন্য কিছু নিয়ে আসে। যদি কঠোপনিষদকে আধার করা হয় তাহলে বলতে হবে কিছু দেবতারা জানেন আবার কিছু দেবতারা জানেন না। তার সাথে আবার বলছেন *বিচিকিৎসং পুরা*, অর্থাৎ প্রথমের দিকে দেবতাদেরও সংশয়

ছিল, তার মানে পরে দেবতারা এই জ্ঞান পেয়েছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে, প্রশ্ন উপনিষদে আমরা এই বর্ণনা পাই, যেখানে বলছেন দেবতারা ধীরে ধীরে এই জ্ঞান পেয়ে গিয়েছিলেন।

আর বলছেন *ন হি সুবিজ্ঞেয়ম্*, আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত দুরধিগম্য, আর *অণুরেষ ধর্মঃ*, এর ধর্ম অত্যন্ত সূক্ষ্ম। এই জ্ঞান সহজে, তুমি কেন, কারুর পক্ষেই বোঝা সম্ভব নয়। যদিও এখানে ধর্ম শব্দ ব্যবহার করছেন আর ধর্ম বলতে বোঝায় ধারণ করা। কিন্তু এখানে ধর্ম বলতে বোঝাচ্ছে আত্মার জ্ঞান, আত্মার স্বভাব। আত্মার ব্যাপারে বোঝার জন্য ধারণা করার ক্ষমতা থাকা চাই, কারণ আত্মার ধর্ম অত্যন্ত সূক্ষ্ম। ধর্মেরই গতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, আর আত্মার যে ধর্ম, আত্মার যে স্বভাব সেটা আরও সূক্ষ্ম। আর আত্মজ্ঞান স্বয়ং অত্যন্ত সূক্ষ্ম। শাস্ত্র অধ্যয়ন করার পর তার এক একটা মন্ত্রকে নিয়ে চিন্তন, মনন, মন্থন, নিদিধ্যাসন আর গভীর ধ্যান না করলে কোন ধারণা করা যাবে না। এখানে কিন্তু আত্মজ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে না, শুধু বলা হচ্ছে ধারণা করার কথা। আত্মজ্ঞান এই জিনিষটা কী, এই ধারণাটাই করা যায় না। সেইজন্য বলছেন, দেবতাদের মনেও এই ব্যাপারে সংশয় ছিল, কিন্তু এখন তাঁরা জানেন, তাই *পুরা* বলছেন। আত্মজ্ঞান কোন ছেলেখেলার বিষয় নয়, তুমি এখনও বাচ্চা, বাচ্চাদের জন্য এটা নয়। সেইজন্য বলছি এটা দিয়ে তোমার কোন কাজে লাগবে না, তাই *অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব*, নচিকেতা! তুমি আত্মার ব্যাপারে প্রশ্ন না করে অন্য কোন বর নিয়ে নাও।

মহাভারতে পরীক্ষিতের কাহিনীতে তক্ষক পরীক্ষিৎকে দংশন করতে যাচ্ছে তখন একজন ব্রাহ্মণও পরীক্ষিতের কাছে যাচ্ছিল। ব্রাহ্মণ তক্ষকের বিষ নামিয়ে দেওয়ার বিদ্যা জানত। তক্ষক জানতে পারল আমি দংশন করলে ব্রাহ্মণ পরীক্ষিতকে বাঁচিয়ে দেবে। সে তখন ছদ্মবেশ ধারণ করে ব্রাহ্মণকে গিয়ে বলছে 'শুনলাম আপনি নাকি তক্ষকের বিষ নামিয়ে দিতে পারেন'? ব্রাহ্মণ বলল 'হ্যাঁ পারি, তক্ষক পরীক্ষিৎকে যেই দংশন করবে আমি রাজাকে বাঁচিয়ে দেব'। 'ও! তাই'! তখন তক্ষক নিজের রূপ ধারণ করে সামনেই একটা বিশাল বৃক্ষ ছিল তাতে ছোবল মেরেছে, সঙ্গে সঙ্গে গাছটা ভস্ম হয়ে গেল। 'নিন! এবার গাছটাকে বাঁচান'। ব্রাহ্মণ কাছে গিয়ে কি একটা মন্ত্র পড়ে একটু জল ছিটিয়ে দিতেই আগের মত সঙ্গে সঙ্গে সবুজ পাতা নিয়ে গাছ দাঁড়িয়ে গেল। তক্ষক দেখল এতো মহা মুশকিল হল। তক্ষক তখন ব্রাহ্মণকে বলছে 'আপনি যে ওখানে যাচ্ছেন আপনি তো কোন সেবা ভাব নিয়ে যাচ্ছেন না, কিছু টাকা উপার্জনের উদ্দেশ্যেই জানছেন'? ব্রাহ্মণ বলল 'সত্যিই তাই'। তক্ষক সঙ্গে সঙ্গে বলছে 'আমি আপনাকে টাকা দিয়ে দিচ্ছি, আপনি আমার আর পরীক্ষিতের মাঝখান থেকে সরে দাঁড়ান'। যদি এমন হত যে রাজাকে বাঁচানো আমার ধর্ম বা একজন নির্দোষ মানুষ মরে যাচ্ছে তাকে বাঁচানো আমার সেবা, তাহলে ব্যাপারটা অন্য রকম হয়ে যাবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ বলছে, এর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি যাচ্ছি কটি টাকার জন্য, আমাকে যদি কেউ টাকা দিয়ে দেয় আমি কেন যাব! তক্ষকও টাকা দিয়ে ব্রাহ্মণকে সরিয়ে দিল। যমরাজও তাই করছেন, তোমার বর নেওয়া নিয়ে কথা, একটা জাগতিক বর পেলে, আরেকটা বরে পারলৌকিক সুখের রাস্থাটা জেনে নিলে এবার তুমি অন্য কোন বর নিয়ে নাও। আর আত্মার ব্যাপারটা খুব কঠিন জিনিষ, এটা জেনে তোমার কোন কাজেও লাগবে না।

কিন্তু নচিকেতা তার সঙ্কল্পে স্থির ও দৃঢ়, আমার এটাই চাই। একটা হতে পারে, নচিকেতার মনে একটা কৌতুহল ছিল, সেই কৌতুহলটা আরও বেড়ে গেছে। বাচ্চাদের স্বভাবই হল, কোন কিছু চাওয়ার পর যদি তাকে বলে দেওয়া হয় এটা তোমার জন্য নয়। ব্যস্ বাচ্চা আর ছাড়বে না, আমার ঐটাই চাই। নচিকেতা ইতিমধ্যে যমরাজার যা দেওয়ার ছিল সবটাই পেয়ে গেছে, কিন্তু একটা কৌতুহল জেগেছে সেটা আরও বেড়ে গেছে। যমরাজার মত কাউকে পরে পাওয়াও যাবে না, ঠিক আছে আমিও ছাড়ছি না। এরপর অধ্যায়ের বাকি অংশে দেখানো হবে যমরাজার সব প্রলোভনকে নচিকেতা কিভাবে প্রত্যাখ্যান করে দিচ্ছেন। তার মধ্যে এও দেখানো হচ্ছে একজন সাধকের সাধনায় কি কি প্রস্তুতির দরকার।

এখানে কয়েকটি কথা জানার আছে। যিনি আত্মবিদ্যার সাক্ষাৎ করেননি তিনি কখনই আত্মবিদ্যা নিয়ে কথা বলতে পারবেন না। যতই উপনিষদ অধ্যয়ন করুন, যতই সব মন্ত্র মুখস্ত রাখুন, যতই মন্থন করে থাকুন, যতক্ষণ আত্মানুভূতি, আত্মার সাক্ষাৎ না হয়ে থাকে ততক্ষণ কেউই আত্মার ব্যাপারে উপদেশ দিতে পারবেন না। যমরাজ এখানে আত্মবিদ্যাকে হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে যেভাবে খেলাচ্ছেন তাতে নিশ্চিত যে তাঁর কাছে এই জ্ঞান আছে। আর এও বোঝা যায় এই বিদ্যা যমরাজের কাছে যদি থাকতে পারে তাহলে অন্য দেবতাদের

কাছেও আছে। কিন্তু বিদ্যা থাকলেই যে তিনি কোন কর্ম করবেন না তা নয়। ঠাকুর বলছেন ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানবে। যমরাজের আত্মজ্ঞান হয়ে গেলেও তাঁকে যে কর্মের দায়ীত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি সেই কর্মই করতে থাকবেন। স্বামীজীর আত্মজ্ঞান ছিল তিনিও ভাষণ দিতেই থেকে গেলেন, শ্রীরামচন্দ্রের আত্মজ্ঞান ছিল তিনিও যুদ্ধ করলেন, অসুর বধ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ আত্মজ্ঞান নিয়ে কি করলেন? তিনি বারবার বলছেন আমার কাছে আত্মজ্ঞান ছাড়া অন্য কোন সম্বল নেই। শ্রীমা খুব সুন্দর বলছেন, ঈশ্বর দর্শন হলে কি দুটো শিং বের হয়? জগতের প্রতি এতদিন তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, সেই দৃষ্টিভঙ্গীটাই পাল্টে যায়। আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তিই ঠিক ঠিক ধার্মিক হতে পারবেন না। ধর্ম সব সময়ই পরিস্থিতি অনুযায়ী চলে, যখন সব কিছু ঠিক ঠিক চলতে থাকে, বাড়িতে কোন অসুখ বিসুখ নেই, কোন অভাব নেই, সবাই খুব সম্মান করছে, সকালে উঠছে, জপ-ধ্যান করছে, ঠাকুরের পূজো করছে আর সব সময় বলছে সব ঠাকুরের ইচ্ছা, আমি তো কিছুই করি না। তারপরে যেই দু চারটে ঝড় আসবে, ছেলে মারা যাবে, ঘটি-বাড়ি বিক্রী হয়ে যাওয়ার অবস্থায় চলে যাবে তখন ঠাকুরের উপর ভক্তিটা আস্তে আস্তে উবে যেতে শুরু করে দেবে। একমাত্র আত্মজ্ঞানীরই কখনই কোন অবস্থায় বেতালা পা পড়বে না। সেইজন্য বলা হয় আত্মজ্ঞান হলেই ঠিক ঠিক ধর্ম ভাবের আচরণ করতে পারে। যমরাজকে ধর্মরাজ এই কারণেই বলা হয়, তিনি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। তিনি একে মারছেন, তাকে তুলে আনছেন, সব কাজ তিনি কর্তব্য রূপে করে যাচ্ছেন, কোন কর্মই যমরাজকে তাই স্পর্শ করতে পারে না, তাই তাঁর কোন কর্ম বন্ধনও নেই। এগুলো দিয়েই বোঝা যায় যে দেবতাদেরও আত্মজ্ঞান ছিল।

আত্মজ্ঞান আবার দু রকমের, একটা তত্ত্বতঃ সব কিছু জেনে গেছেন, যেমন ইদানিং কথামৃত, স্বামীজীর রচনাবলী পড়ে অনেকেই আত্মজ্ঞানের তত্ত্বকে ধারণা করে নিয়েছেন। আর যার মন যত সূক্ষ্ম, তাঁর আত্মতত্ত্বের ধারণা তত পরিষ্কার। দেবতাদের মধ্যে অনেকেরই হয়ত ভালো ধারণা ছিল কিন্তু উপলব্ধি নাও হয়ে থাকতে পারে। উপনিষদেও বলা হয় যে দেবতারা এক শ্রেনীর প্রাণী। দেবতাদের শরীর, তাঁদের ক্রিয়াকলাপ অন্যান্য প্রাণীদের থেকে আলাদা। কিন্তু ব্রহ্মার সৃষ্টিতে দেবতারাও এক শ্রেনীর জীব। অসুরদের মধ্যেও অনেকের ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিভাব প্রবল ছিল, সেইজন্য তাদের মধ্যেও অনেকের কাছে এই জ্ঞান থাকতে পারে। কিন্তু একটা পুরো গ্রুপের সবারই মধ্যে যে এই জ্ঞান থাকবে সেটা ছিল না। অথচ ব্রহ্মার মানসপুত্র চার কুমারদের সবারই এই জ্ঞান ছিল, সপ্তর্ষি মণ্ডলের ঋষিদেরও এই জ্ঞান ছিল, কিন্তু সংখ্যাটা অত্যন্ত অল্প।

যমরাজের কথা শুনে নচিকেতার আগ্রহ অনেক বেড়ে গেছে। প্রথমে একটা কৌতুহল বশতঃ প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু সব শোনার পর তাঁর কৌতুহল আরও বেড়ে গেছে। দেবতারাও আগে এই বিদ্যাকে জানতেন না, তাঁদেরও আত্মার ব্যাপারে অনেক সংশয় ছিল, যমরাজের কথাকেই নচিকেতা যমরাজকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন –

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল
ত্বং চ মৃত্যো যন্ন সুজ্ঞেয়মাথ।
বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো
নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ।।১/১/২২।।

(নচিকেতা বললেন 'দেবতাদেরও যখন এই বিষয়ে সংশয় ছিল এবং হে যমরাজ! আপনিও যখন বলছেন আত্মতত্ত্ব সুবিজ্ঞেয় নয়, তখন আপনার মত আত্মতত্ত্বের বক্তা আর কাউকে পাওয়া তো সম্ভব নয় আর এই বরের তুল্য অন্য কোন বরও তো থাকতে পারে না')।

ও তাই! দেবতারাও এই বিষয়ে সন্দিগ্ধ ছিলেন! আপনার মত পুরুষও বলছেন এই তত্ত্ব সুবিজ্ঞেয় নয়! সহজে এই তত্ত্ব ধারণা করা যাবে না। কারণ আগের মন্ত্রেই যমরাজ নচিকেতাকে বলছেন *ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্মঃ*, আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন। আপনি আচার্য হয়ে নিজেই বলছেন অত্যন্ত কঠিন, এটাই আমাকে আত্মতত্ত্ব জানার জন্য আরও উদগ্রীব করে তুলেছে। *বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো*, আপনার মত বক্তাও আমি কোথাও পাবো না। ঠিক আছে আমি না হয় একটা প্রশ্ন করে ফেলেছি, কিন্তু আপনার কথা শোনার পর আমার উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে গেছে। কিছু দিন আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছ ভারত করার প্রচার শুরু করছেন। অনেকেরই মনে হল সব কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হোক। গুজরাতের একটা স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকরা মিলে ঠিক করল আমাদের স্কুলকে পরিষ্কার করতে হবে। স্কুলে একটা পুরনো লকারের মত কিছু ছিল। সবাই মিলে সেই লকার পরিষ্কার করতে গেছে। পরিষ্কার করতে গিয়ে যেই লকার খুলেছে ওখান থেকে

কয়েক কোটি টাকার সোনা ঝর ঝর করে পড়তে শুরু করেছে। কয়েক কোটি সোনা বেরিয়ে আসতেই ওদের সবারই মাথায় হাত পড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ওরা পুলিশ, জেলা শাসক সবাইকে ফোন করে দিয়েছে। খবর পেয় সবাই দৌড়ে এসে দেখে বলছেন কোন ক্রিমিনাল গ্যাং হয়ত এগুলো এখানে লুকিয়ে রেখেছে। ছেলেরা ঘরে ঝাঁটা দিচ্ছিল মাঝখান থেকে বেরিয়ে এল সোনার খাজানা। যদি এর পরিমাণ কম হত তাহলে নিজেরাই হয়ত স্কুলের জন্য রেখে দিত, কিন্তু দেখছে বিরাট খাজানা। নচিকেতারও ঠিক তাই হয়েছে, কৌতুহল বশতঃ একটা প্রশ্ন করে ফেলেছে, কিন্তু এটা যে এত গভীর জিনিষ কল্পনাই করতে পারেননি।

বক্ত্যা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো, আমি যে আশ্রমে থাকি, সেখানে আমার বাবা আছেন, তিনি পণ্ডিত হতে পারেন, ঋষি হতে পারেন কিন্তু ওনার কাছে এই জ্ঞানটা নেই, তা নাহলে ছোটবেলাতেই আমি কিছু শুনে থাকতাম। তাই আপনার মত বক্তা আমি কোথায় পাবো! যমরাজের আরেকটি নাম ধর্মরাজ। তিনি যে সবাইকে মৃত্যুপাশে বাঁধছেন, কাউকে কম সময়ে বাঁধেন, কাউকে একশ বছর হলে বাঁধেন, এই কাজ তিনি সব সময় ধর্মানুসারে করেন। এই নিয়ে পরের দিকে অনেক কাহিনীও হয়েছে, যেখানে বলছে মৃত্যুর সময় হয়ে গেলে যমলোক থেকে যমদূত এসে তাকে যমলোকে নিয়ে যায়, সেখানে চিত্রগুপ্ত তার বিচার করেন ইত্যাদি। এর মধ্যে অবশ্য কিছু কিছু জিনিষ অন্যান্য ধর্ম থেকেও অনুপ্রবেশ করেছে। কিন্তু আমাদের যে বিভিন্ন লোকের ধারণা চলে আসছে, প্রত্যেকটি লোকের আবার একজন করে অধিষ্ঠাতা থাকেন, যেমন এই পৃথ্বীলোকের আধিকারিক পুরুষ হলেন মহারাজা। এই লোকে মানুষ বেশি দিন বাঁচে না, একশ বছর পর্যন্ত আয়ু। এদের উপরে পিতৃলোক বা পিতৃলোকের সমান্তরাল লোক যমলোক। যারা সাধারণ কর্ম করেছে তারা যমলোকে যায়। অন্য দিকে পিতৃলোক, স্বর্গলোক, ব্রহ্মালোক বিভিন্ন রকমের লোক রয়েছে, পরের দিকে আবার ভূঃ ভুবঃ স্বঃ, তপঃ জনঃ মহৎ আর সত্য এই সাতটি লোকের কথা বলা হচ্ছে আবার নীচের দিকে তল, অতল, বিতল ইত্যাদি আরও সাতটা লোকের কথা আছে, প্রত্যেকটি লোক দেখভালের জন্য একজনকে অধিষ্ঠাতা করে দেওয়া হয়েছে। পিতৃলোকের অধিষ্ঠাতা হলেন অর্যমা। যমলোকের অধিষ্ঠাতা পুরুষ হলেন যম। যম দেবতাদের খুব কাছের অথচ তিনি একজন মানুষ, তাই যমের মধ্যে দেবভাব আর মনুষ্য ভাব দুটো ভাবই আছে। তিনিই সৃষ্টিতে প্রথম মৃত্যুকে প্রাপ্ত করেছিলেন, তিনি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাই ওনাকে যমলোকের প্রশাসনিক দায়ীত্ব দেওয়া হয়েছে। সৃষ্টিতে একটা কল্প যত দিন চলবে তত দিনই যমরাজ যমলোকের দায়ীত্বে থাকবেন। যমরাজকে নিয়ে বেশি কিছু লেখালেখি হয়নি, তবে ওনাকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। রাবণ ব্রহ্মার বরে ক্ষমতা লাভ করে সব লোকের উপর আক্রমণ করতে গিয়ে যমলোকের উপর আক্রমণ করেছে। যমরাজ খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন, রাবণ যা করছে এতে ধর্মের বিঘ্ন হয়ে যাবে। তিনি রাবণের উপর কালদণ্ড প্রয়োগ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছেন। কালদণ্ড যার উপর তোলা হবে সে আর বাঁচবে না। ব্রহ্মা এসে তখন যমরাজকে আটকালেন, রাবণের উপর আমার বর আছে। ব্রহ্মার সম্মানে যমরাজও আর কালদণ্ড নিক্ষেপ না করে ফিরে গেলেন। নচিকেতা এই শরীরে কোথায় কোথায় যেতে পারবে? পিতৃলোকে যেতে পারবে না, কারণ এখনও যজ্ঞ করেননি, স্বর্গলোকেও যেতে পারবেন না কারণ এখনও কোন পূণ্যকর্ম করেননি। আর বাবা যেহেতু যমলোকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেইহেতু এখন যমলোকে পৌঁছে গেছেন। আধ্যাত্মিক উত্থানের যে বিবর্তনের স্তর, সেই বিবর্তনের স্তরে নচিকেতা এখন সব থেকে নীচে। সেইজন্য বলেছিলেন, *বহুনামেমি প্রথমো বহুনামেমি মধ্যমো*, তাই যদি হয় তাহলে আমি যমরাজের কোন কাজে লাগব? কিন্তু যে করেই হোক আমি আপনার এখানে পৌঁছে গেছি, আর আমার পক্ষে তো স্বর্গলোক, পিতৃলোকে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই, তাই আপনার মত বক্তা আমি কোথায় পাবো! আমি কার কাছে এই আত্মবিদ্যা জানব? পৃথিবীতে অবশ্যই কেউ থাকতে পারেন, কিন্তু আমি কোথায় খুঁজতে যাব! ভারতে এখনও অনেক ঋষি, মুনিরা আছেন, ভালো ভালো সাধুরাও আছেন। পৃথিবীতেও বড় বড় ঋষিরা থাকতে পারেন কিন্তু আমি তো তাঁদের ব্যাপারে কিছুই জানি না, আমি আপনাকেই জানি, *বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো*, আপনার মত বক্তা আমি কোথায় পাবো!

আচার্য এখানে নিজের তরফ থেকে আবার বলছেন *ন লভ্যঃ অন্বিষ্যমাণোহপি*, আমি যদি খুঁজেও বেড়াই আমি কোথাও পাবো না। কারণ ভারতবর্ষে তখনকার ব্রাহ্মণরা যজ্ঞাদি নিয়েই থাকতেন। আপনিই বলুন আমি কোথায় শিক্ষক খুঁজে বেড়াব! আমি আপনাকে আর ছাড়ছি না। *অয়ং তু বরো নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তিহেতুঃ*, নচিকেতার মনে আগ্রহ জেগে গেছে, নচিকেতা বুঝে গেছে এই আত্মতত্ত্বই মুক্তিপ্রাপ্তির একমাত্র হেতু। তাই

বলছেন, আপনার কথা শুনে আর আমার নিজস্ব যা কিছু ধারণা ছিল তাতে আমি বদ্ধমূল যে এর থেকে শ্রেষ্ঠ বর আর হতে পারে না। এতক্ষণে নচিকেতা বুঝতে পেরেছে যে শ্রেষ্ঠতম লোকে পৌঁছানর জন্য যে যজ্ঞ করতে হবে, যে যজ্ঞের পদ্ধতি সবে মাত্র শিক্ষা পেল, সেই লোক ব্রহ্মলোক হলেও, সেখানে অনেক দিন থাকলেও তাকে সেখান থেকে নেমে আসতে হবে। তাহলে নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তি, পরম কল্যাণ যে প্রাপ্তিতে হবে, যে প্রাপ্তি হলে আর আসা-যাওয়া করতে হবে না, সেই নিঃশ্রেয়স ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিতে হবে না। সুতরাং তৃতীয় বরে আমি যা জানতে চাইছি এর থেকে নিঃশ্রেয়স আর কিছু হতে পারে না। বিদ্যার দিক থেকে এই আত্মবিদ্যা শ্রেষ্ঠতম আবার আচার্যের দিক থেকেও আপনিই শ্রেষ্ঠতম সেই জন্য আমার এই বরই চাই।

বিদ্যার দিক থেকে শ্রেষ্ঠতম, আচার্যের দিক থেকেও যমরাজ শ্রেষ্ঠতম কিন্তু শিষ্যের দিক থেকে নচিকেতা শ্রেষ্ঠতম কিনা এবার যমরাজ সেটা পরীক্ষা করবেন। এই বিদ্যা একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে যখন যায় তখন তিনটে জিনিষ চলে আসে, বিদ্যা, আচার্য ও শিষ্য। বিদ্যার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ, যিনি আচার্য তিনিও শ্রেষ্ঠতম। *আশ্চর্যো বক্তা কুশলোহস্য লব্ধাঃ*, আশ্চর্য বক্তা হয়ে গেছেন, শিষ্য কতটা কুশল যমরাজ নাড়িয়ে দেখবেন। গীতাতেও ভগবান বলছেন এই বিদ্যা খুব কঠিন, বেশির ভাগ লোক এই বিদ্যার ব্যাপারে জানতেও পারে না, শুনতেও পায় না, আবার কেউ শোনার সুযোগ পেলেও ধারণা করতে পারে না।

আশ্চর্য বিদ্যা কেন বলা হচ্ছে? আগেও এই জিনিষটাকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছিল যেখানেই অজ্ঞানের সাম্রাজ্য সেখানেই ক্রিয়া-কারক-ফল এই নয়টি জিনিষ এসে পড়ে আর তার ফলে যে কোন কর্মের ফলই আজ হোক বা কাল হোক ক্ষয় হয়ে নাশ হয়ে যাবে। সেইজন্য আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে, যে কোন উপলব্ধি দুদিন পর ক্ষয় হয়ে বিনাশের দিকে চলে যাবে। কিন্তু সবাই আত্মজ্ঞানের পথে যেতে পারে না। প্রথম জগৎ থেকে কোন কিছুর প্রত্যাশা থাকবে না, দ্বিতীয় পরলোক প্রাপ্তির শক্তিকে অর্জন করা চাই। দুটোই নচিকেতা করে নিয়েছেন। প্রথম বরে তিনি জগৎকে পুরোপুরি ঠিক করে নিয়েছেন, বাবার সম্পত্তির উপর অধিকার তাঁর আগে থেকেই আছে, এবার বাবা যেন খুশী থাকেন সেই ব্যবস্থাও করে নিয়েছেন তার সাথে পরলোক প্রাপ্তিতে যেটা উচ্চতম লোক, যে লোকের প্রাপ্তি নাচিকেত অগ্নি দিয়ে হবে তার কৌশলটাও তিনি আয়ত্ত করে নিয়েছেন। তাই স্বর্গ তাঁর মুঠোয়। যারা বলে, জগতের কোন কিছুই আমার আর লাগবে না, স্বর্গসুখও আমার লাগবে না, আমি এখন ধর্মে পুরোপুরি মন দিয়েছি। এবার তাদের জিজ্ঞেস করুন, তোমার কি মনে হয় চাইলেই তুমি কোটিপতি হয়ে যেতে পারবে? আর সিনেমার হিরোইনদের হাতের মুঠোয় এনে নাচাতে পারবে? এই ক্ষমতা যদি না থাকে তাহলে তোমার দ্বারা আত্মবিদ্যা হবে না। বেশির ভাগই হল ঠাকুরের সেই গরুর উপমা, যে গরুর ল্যাজে হাত দিলে শুয়ে পড়ে। যে এসে বলতে পারবে, এই জগতে এমন কোন কিছু নেই যে আমি অর্জন করতে পারবো না, আর যে উচ্চতম স্বর্গ, যে স্বর্গকে নাচিকেত অগ্নি দিয়ে পাওয়া যায় সেই স্বর্গ আমার মুঠোয়। এখানে চিন্তা ভাবনার কিছু নেই, কল্পনাও করতে হবে না, পরিষ্কার আমরা চোখের সামনে দেখছি নচিকেতার বাবার এত সম্পত্তি আছে যে তিনি *সর্ববেদসং দদৌ*, সব দান করে দিচ্ছেন, এত এত সম্পত্তি দান করেছেন, তার মানে নচিকেতার বাবার অগাধ সম্পত্তি। বাবার যেটুকু রাগ ছিল সেটাও যমরাজের আশীর্বাদে মিটে গেল। পরে দেখাবে নচিকেতা বুদ্ধি করে আরও কিছু জিনিষ যমরাজের কাছ থেকে আদায় করে নিচ্ছেন। তার উপর তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন আর উচ্চতম যে স্বর্গলোক সেই ব্রহ্মলোককেও মুঠোর মধ্যে নিয়ে এসে তিনি সেটাকে পরে ধুলায় নামিয়ে দিচ্ছেন। যমরাজ বলছেন, যে জিনিষ মানুষ মৃত্যুর পর পায় তার সব কিছু তুমি বেঁচে থাকতেই তোমাকে দিতে চাইছি, তাও তুমি ফিরিয়ে দিচ্ছ। এর পরেই মানুষ উচ্চতম বিদ্যাকে প্রাপ্ত করার জন্য প্রস্তুত হয়। আত্মবিদ্যা তাই কখনই সবার জন্য হতে পারে না। স্বামীজী তাই বলছেন ধর্ম পথে যারাই আসে তাদের আশি শতাংশ ধুর্ত, ঠগবাজ হয়ে যায়, পনের শতাংশের মাথা খারাপ হয়ে যায় বাকি পাঁচ শতাংশ এগোতে পারে।

কিন্তু যতই হোক আমাদের সব কিছু শুনে যেতে হবে। ঠাকুরও বলছেন শুনে রাখা ভালো। শোনাটা বন্ধ করা যাবে না। জীবনে হাজার বার অকৃতকার্য হোক, পতন হয়ে যাক, সেখান থেকে আবার উঠে দাঁড়াতে হবে, আমি ছাড়ছি না, মনের মধ্যে এই দৃঢ়তা নিয়ে আসতে হবে। তার সাথে এটাও মনে রাখা দরকার যত দিন ঐ শক্তি না আসে তত দিন কিন্তু কিছু হবে না। এই জগতে এমন কোন কিছু নেই যেটাকে আমি অর্জন করে

নিতে পারব না। কিন্তু স্বর্গের ব্যাপারে গিয়ে সমস্যা হয়ে যায়, কারণ স্বর্গ সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নেই। ছেলে বাচ্চা বয়সে বলে বড় হয়ে আমি এক মণ চকলেট খাবো। কারণ তার বড় হওয়ার ব্যাপারে কোন ধারণা নেই আর এক মণ চকলেট কতটা সেই ব্যাপারেও কোন ধারণা নেই। স্বর্গের কথাও আমাদের কথার কথা, কোন ধারণা নেই। আগে এই জগতে ক্ষমতা অর্জন করে দেখাতে হবে। আমাদের হজম করার শক্তিই নেই, একটু বেশি খেলে শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। অগস্ত্য মুনি পুরো সমুদ্রকেই পান করে নিচ্ছেন, একটা রাক্ষস ছাগল হয়েছে আরেকটা রাক্ষস তাকে কেটে অগস্ত্য মুনিকে খাইয়ে দিতেই সেকেণ্ডের মধ্যে হজম করে ঢেকুর তুলে দিয়েছেন। এই হল শক্তির পরিচয়। আমি যেটা ইচ্ছে করব সেটা এই জগতে করে দেখাবার ক্ষমতা আমার আছে, আর আমি যার দিকে দৃষ্টি দেব সে সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রবিদ্ধ সাপের মত কেঁচো হয়ে আমার পায়ে লুটোবে। তারপর আমি বলতে পারব, আমার এসব কিছুই লাগবে না। ঐ শক্তি না হলে এই আত্মবিদ্যা কারুর দ্বারাই হবে না। ভগবান শিবের মত হলাহল পান করে ঐ হলাহলকে ধরে রাখার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। ভগবান গীতাতেও বলছেন *নানবাপ্তমবাপ্তব্যং*, এই জগতে কিছু নেই যেটা আমি পেতে পারি না, অথচ আমি কোন কিছুই চাই না। প্রথমে এই ক্ষমতাকে অর্জন করতে হবে, আমি যা চাইব আমি পেয়ে যাব, দ্বিতীয় এই ক্ষমতা, আমার কোন কিছুই লাগবে না, আমি পূর্ণকাম।

প্রথম দুটি বরে এই শক্তিকে দেখানো হয়েছে। তৃতীয় বরে এসে যমরাজ দেখছেন, নচিকেতার যে প্রশ্ন, এই প্রশ্নের ব্যাপারে ওর কোন ধারণাই নেই, বাচ্চা ছেলে। নচিকেতাকে আত্মজ্ঞানের ব্যাপারে এইভাবে একটু ধারণা করানো যেতে পারে, তুমি এই আত্মজ্ঞানের বদলে কি কি জিনিষ পেতে পার।

শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব, বহূন্ পশুন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্।
ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ্ব, স্বয়ং চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি।।১/১/২৩।।

(যম বললেন 'তুমি শতায়ু পুত্র ও পৌত্র প্রার্থনা কর এবং বহু গবাদি পশু, হস্তী, অশ্ব, স্বর্ণ ও এই পৃথিবীতে বিশাল রাজ্য প্রার্থনা কর, অধিকন্তু তুমি নিজে যত বৎসর জীবনধারণ করতে চাও ততকাল জীবিত থাক।)

তোমার একশ বছর আয়ু হবে, তোমার পুত্র-পৌত্র হবে আর হাতি, ঘোড়া, সোনা যত চাও সব হবে, তুমি বিশাল সাম্রাজ্যের সম্রাট হয়ে রাজত্ব করতে চাও তাও করতে পারবে। কত দিন এগুলো তোমার থাকবে? মনে করো না যে অল্প কিছু দিনের জন্য, *স্বয়ং চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি*, তোমার সন্তানরা একশ বছর বাঁচবে, তোমার নাতিপোতারাও একশ বছর বাঁচবে আর তুমি নিজে যত দিন খুশী দীর্ঘায়ু হয়ে বেঁচে থাকতে পার। এত কিছু নচিকেতাকে যমরাজ দিতে চাইছেন।

ফরাসী লেখক বালজাকের The Donkey' Skin একটা বিখ্যাত উপন্যাস। সংক্ষেপে কাহিনী হল একটি যুবক আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে, সে ঠিক করে নিল সন্ধ্যে সাতটায় নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করবে। তার আগে সে একটা কিউরিও দোকানে ঢুকেছে। দোকানদার দেখেই বুঝতে পেরেছে ছেলেটি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে। দোকানদার বলছে 'দেখো বাপু! জীবন অমূল্য এভাবে মরার কথা চিন্তাও করবে না'। ছেলেটি একটা দুটো তার জীবনের দুঃখের কথা বলল। দোকানদার তখন বলছে 'ঠিক আছে, অনেক দিন আগে আমার কাছে ভারত থেকে একটা গাধার চামড়া এসেছিল এটা তুমি নিয়ে যাও, এই চামড়া যাদুগুণ সম্পন্ন। তুমি যা বলবে সেই ইচ্ছাই এই চামড়া পূরণ করে দেবে, সাথে সাথে এর সাইজটাও কমে যাবে। যেদিন এর সাইজ ছোট হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে সেদিনই তুমি মারা যাবে। তবে ততদিনে তুমি জীবনের মূল্যটা বুঝে নিতে পারবে'। ছেলেটি শুনে খুব হাসছে, যত সব আজগুবি ব্যাপার। দোকানদার বলছে, তাহলে আমি ডিল করে দিচ্ছে তুমি এটা ফ্রিতেই নিয়ে যাও। তখন সে চামড়াকে ছুঁয়ে বলছে তুমি আমার অধীনে এসে যাও। ছেলেটি বলছে 'ভদ্রলোকের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে মরার সময় আমি যেন প্রচুর সম্পত্তির মালিক থাকি। আমার কোলে এক সুন্দরী যুবতী শায়িত থাকে'। যেমনি বলা সঙ্গে সঙ্গে গাধার চামড়া সোজা অর্দ্ধেক হয়ে গেছে। যুবকটি কেঁপে উঠেছে। দোকানদার বলছে 'তুমি কিন্তু এর সাথে যুক্ত হয়ে গেছ, তুমি বুঝতে পারছ না তোমার আশা-আকাঙ্খার পুর্তি করতে গিয়ে তোমার কী ভয়ঙ্কর পরিণতি ডেকে নিয়ে আসছ। এবার তুমি আসতে পার'।

সেখান থেকে বেরিয়ে সে একটা রেস্তোরাঁয় গেছে। বন্ধুরা সব ছিল, তাদের গল্পটা বলছে, এই রকম ম্যাজিকাল কিছু ব্যাপার কিন্তু ব্যাপারটা আমার সামনেই ঘটেছে। যদি সত্যিই এর ক্ষমতা থাকে তাহলে পাঁচ

মিনিটের মধ্যেই আমি কোটিপতি হয়ে যাব। বলতেই চামড়ার সাইজটা এক চতুর্থাংশ কমে গেল। রেস্তোরাঁতে একজন লোক খাচ্ছিল হঠাৎ সে উঠে এসে ছেলেটিকে বলল 'তোমার কি নাম বললে'? 'আমার অমুক নাম'। 'অমুক নামে তোমার কোন কাকা ছিল'? 'হ্যাঁ ছিল, কিন্তু আমরা অনেক দিন তার কোন খবর জানি না'। লোকটি তখন বলছে 'ভাই আমি তোমাকে অনেক দিন খুঁজছি, তোমার কাকা ভারতে অমুক যুদ্ধে মারা গেছেন। মারা যাওয়ার সময় উনি বলে গেছেন আমার শেষ যে বংশধর থাকবে তাকে আমার সম্পত্তির এত কোটি টাকা দিয়ে দিতে হবে। আমি চারিদিকে তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি, তোমার নামটা আমার কানে এল, এই নাও তোমার টাকা'। পাঁচ মিনিটের মধ্যে এক কোটি টাকার মালিক হয়ে গেল। কিন্তু চামড়ার সাইজটা দেখছে এক চতুর্থাংশ হয়ে গেছে। এবার ওর ঘাম ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে। মুখ থেকে যদি কোন ইচ্ছা ফসকে বেরিয়ে আসে সঙ্গে সঙ্গে সেটার পুর্তি হয়ে যাচ্ছে, তার সাথে মৃত্যুর আতঙ্ক তাকে গ্রাস করে নিতে শুরু করেছে। বালজাক বিরাট বড় লেখক ছিলেন, তিনি মানুষের জীবনের আশা-আকাঙ্খার সাথে মৃত্যু ভয়কে মিশিয়ে খুব সুন্দর একটা ছবি এঁকেছেন। ছেলেটি এবার একজনকে ডেকে এনে বলছে, শিশুকে যেভাবে সামলে রাখা হয় আপনি আমাকে সেই ভাবে সামলে রাখুন, আমার মন থেকে কোন ইচ্ছাই যেন না বেরিয়ে আসে। সেই ভদ্রলোক এখন ব্যবস্থা নিচ্ছেন যাতে ওর মুখ দিয়ে মনের ভেতরে কোন ইচ্ছা না বেরিয়ে আসে। ছেলেটি এখন কোটি টাকার মালিক, প্রচুর সম্পত্তি। বাড়ির সামনে তিন খানা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে, ছেলেটি কোন ঘোড়ার গাড়িত উঠবে সেই ইচ্ছাও যেন না হয়। শহরে যত থিয়েটার হল আছে সব হলে তার সামনের সাড়িতে রোজ ছেলেটির জন্য সিট বুক করা থাকে। যদি বলে দেয় আজ আমি অমুক থিয়েটার হলে নাটক দেখব, সঙ্গে সঙ্গে টিকিটের ব্যবস্থা হয়ে যাবে, কিন্তু চামড়ার সাইজ একটু কমে যাবে। ইচ্ছা যত বড় হবে সেই অনুপাতে ছোট হয়ে যাবে। এভাবে কি মানুষ জীবন চালাতে পারে! সব সময় মৃত্যুর আতঙ্কে দিন কাটাতে হচ্ছে। কিন্তু কিছু না কিছু এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে যার ফলে তার মুখ থেকে কোন না কোন ইচ্ছা বেরিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটি এরপর ছ মাসও বাঁচল না। টিবি রোগে মারা যায়। টিবি স্যানোটেরিয়ামে আছে, সেখানে একটা লোক এসে তাকে চ্যালেঞ্জ করছে ডুয়েল লড়াই করার জন্য। ছেলেটি অনেক করে লোকটিকে বলছে আপনি আমাকে চ্যালেঞ্জ করবেন না, তখন আমার ইচ্ছা হবে আপনাকে গুলি মারি। আমি জানি আমি যদি পেছনের দিকেও গুলি চালাই তাহলেও ঐ গুলি এসে আপনার বুকে ঢুকে যাবে। আর আমি যদি চাই আপনি গুলি চালালেও আপনি আমাকে কিছুই করতে পারবেন না। কিন্তু লোকটি চ্যালেঞ্জ থেকে সরে আসবে না। এর আগে ঐ গাধার চামড়াটা একটা পরিত্যক্ত কুয়োতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। মালি বালতি দিয়ে জল তুলতে গেছে, বালতিতে ফেঁসে আবার চামড়াটা উপরে এসে গেছে। মালিটি ছেলেটিকে বলছে, স্যার আপনি তো পুরনো জিনিষ সংগ্রহ করে রাখেন, এই জিনিষটা আপনার কাছে দেখেছিলাম তাই আপনার জন্য নিয়ে এসেছি। তারপর চামড়াটাকে পোড়ানোর চেষ্টা কর হল, কিন্তু কিছুতেই ঐ টুকরোটাকে শেষ করে ফেলতে পারছে না। মৃত্যুর আতঙ্ক ছেলেটিকে আস্তে আস্তে ঘিরে ফেলছে। একটি মেয়ের সাথে তার পরিচয় হয়ে ভালোবাসা হয়েছিল। মেয়েটির কোলে মাথা রেখে কাঁদছে, আর সেই যক্ষ্মা রোগ এসে তাকে টেনে নিয়ে চলে গেল।

ইচ্ছা একটা মানুষকে যে কোথায় টেনে নিয়ে যেতে পারে কল্পনাই করা যায় না। এখানে যমরাজ বলছেন, তোমার সবই হয়ে যাবে, ধন-সম্পদ হবে, পুত্র হবে, পৌত্র হবে। কিন্তু সে যদি নিজেই না বেঁচে থাকে তাহলে এগুলো দিয়ে তার কি হবে! এই ছেলেটির যেমন, তার সব কিছুই হল কিন্তু নিজের জীবনটাই চলে গেল। কিন্তু যমরাজ নচিকেতাকে বলছেন, মৃত্যু-ভয় তোমাকে পেতে হবে না। আচার্য বলছেন *সমগ্রন্দ্রিয়কলাপম্ শরদো*, শরদো মানে যত দিন তোমার বাঁচতে ইচ্ছে করবে তত দিন জীবিত থাকবে। পূর্ণ যৌবন তোমার সব সময় থাকবে, সব ইন্দ্রিয় কার্যক্ষম থাকবে। এত কিছু দেওয়ার পর আবার যমরাজ বলছেন –

এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং, বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাং চ।
মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি, কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি।।১/১/২৪।।

(যদি এর তুল্য অন্য কোনও বর পেতে চাও সেটাও প্রার্থনা কর। অধিকন্তু চিরজীবন এবং সোনা, রত্ন সব প্রার্থনা কর, তুমি বিশাল ভূখণ্ডের অধিপতি হও, আমি তোমাকে দিব্য ও লৌকিক সব কাম্যবস্তু ভোগের ক্ষমতা দিয়ে দিচ্ছি।)

প্রথমে তোমাকে আমি একটা আইডিয়া দিলাম, কিন্তু তোমার যদি অন্য কিছু মনে হয়, *এতত্তুল্যং*, এর সমান অন্য কিছু যদি তোমার মাথায় আসে সেটাও তুমি জানিয়ে দিতে পার, তোমার জন্য তাই করে দেওয়া

হবে। *বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাং চ*, যদি প্রচুর ধনরত্ন তোমার পেতে ইচ্ছে করে, আর তাই না, আজকে দিয়ে দিলাম কিছু দিন পরে শেষ হয়ে যাবে, তা কখনই হবে না, *চিরজীবিকাং চ*, চিরদিনের জন্য সব সময় এর যোগান হতে থাকবে, ধনরত্ন তোমার আসতেই থাকবে। *মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি*, তুমি বিশাল ভূখণ্ডের অধিপতি হও। মানুষ তো কামিনী আর কাঞ্চনই চায়, এর বাইরে তো আর তার কিছু চাওয়ার নেই। সেইজন্য বলছেন, যত বড় ভূখণ্ডই হোক না কেন তুমি চাইলেই পেয়ে যাবে। *কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি*, মানুষের মনে যত রকমের ইচ্ছা হতে পারে বা দেবতাদের যে ভোগ হতে পারে, তুমি বল আমি তোমাকেই সবটাই দিয়ে দেব। কিভাবে দেবেন? আচার্য এখানে যোগ করছেন – *সত্যসঙ্কল্পো হ্যহং দেবঃ*।

যোগশাস্ত্রে বলছে *সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্*, যোগী যদি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হন তখন তাঁর ক্রিয়াফল আশ্রয় হয়ে যায়। ক্রিয়াফল আশ্রয় হল, কর্ম না করেই সেই কর্মের ফল পেয়ে যান। সত্যে প্রতিষ্ঠিত কোন যোগী যদি বলে দেন, এটা তোমার হয়ে যাবে, যদি এখন নাও হওয়ার থাকে তাও হবে। যমরাজ কিন্তু সত্যে প্রতিষ্ঠিত নন, তিনি সত্যসঙ্কল্প। ঠাকুরও সত্যে প্রতিষ্ঠিত নন, তিনি সত্যসঙ্কল্প, গান্ধীজী সত্যে প্রতিষ্ঠিত, তিনি চেষ্টা করছেন আমি যেন সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি। সত্যসঙ্কল্প মানে, মনে যেটা উঠে গেছে সেটা আর মুখে বলার দরকারই নেই, সেটাই হবে। সেইজন্য সত্য বচন আর সত্য সঙ্কল্পে বিরাট তফাৎ। সত্য বচন মানে আপনি যেটা বলে দিয়েছেন সেটাই করবেন, আর সত্যসঙ্কল্পে মাথায় যেটা উঠেছে সেটাই হবে। শুধু নিজের উপরই নয়, যাকে বলে দেবেন তারই হবে। নরেনের অভাবের কথা শুনে নরেনকে মায়ের কাছে প্রার্থনা করতে পাঠালেন। নরেন বারবার মায়ের কাছে গিয়ে শুধু বিবেক বৈরাগ্য চাইছেন, ঠাকুর তখন নরেনকে বলছেন, যাঃ, তোর মোটা রুটি আর মোটা কাপড়ের অভাব কখন হবে না। এই হল ঠাকুরের সত্য সঙ্কল্প। যমরাজ হলেন সত্য সঙ্কল্প, তিনি এমন সাধনা করেছেন যে তাঁর চিন্তায় যেটা আসবে সেটাই হয়ে যাবে।

যমরাজ এটাই বলছেন, আমি সত্যসঙ্কল্প, তুমি শুধু বলে ফেল, তুমি বললেই আমার মনে সঙ্কল্প উঠবে। ব্রহ্মা, সঙ্কল্প মাত্র সব সৃষ্টি করে দেন। চণ্ডীতে আছে মা *হুঙ্কারেণ*, শুধু হুঙ্কার করে দিচ্ছেন তাতেই অসুর ভস্ম হয়ে যাচ্ছে। হুঙ্কারে কি করে ভস্ম করছেন! মা সঙ্কল্প করলেন মাত্র, ভস্ম হয়ে যাক। এর আগেই আমরা বলছিলাম, তোমার মধ্যে কি সেই শক্তি আছে ইচ্ছে করলে জগতের যা কিছু অর্জন করে নিতে পারবে! কারণ যখন সাধনা করতে শুরু করে তখন ধীরে ধীরে এই জিনিষগুলো আসতে শুরু হয়। ক্রিয়া করে যে ফল হবে সেই ফল তাঁকে আশ্রয় করে নেয়, যার জন্য কর্মের বিধান সেখানে আর খাটবে না। এই যে এখানে যমরাজ বলছেন *স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি*, মানুষের একশ বছর আয়ু নির্ধারিত। তাহলে কি করে বলছেন যত দিন ইচ্ছে হয় তুমি বেঁচে থাকতে পারবে? নচিকেতা যেদিন জন্ম নিয়েছে সেদিনই তার কর্মে নির্ধারিত হয়ে আছে তুমি এত দিন বাঁচবে। তাহলে কিভাবে তিনি যত দিন ইচ্ছে বেঁচে থাকতে পারবেন? এইজন্যই বাঁচবে, কারণ কর্মের বিধান কখনই অকাট্য হয় না, ঋষি মুনিরা ঐ বিধানকে পাল্টে দেন, দেবতারা পাল্টে দেন, ভগবান কর্মের বিধান পাল্টে দেন। সেইজন্য প্রার্থনাদি করলে কর্মের বিধান একটু পাল্টে যায়। শ্রীমাও বলছেন ঠাকুরের শরণাগত হলে কর্মপাশ কেটে যায়। এখানে যমরাজ সেটাই করছেন, নচিকেতার কর্মের বিধানকে পাল্টে দিচ্ছেন। যেটা তোমার হওয়ার কথা নয় সেটাই হয়ে যাবে। একটার পর একটা যমরাজ নচিকেতাকে দিতে চাইছেন। দিতে চাইছেন মানে, তুমি যদি না চাও তাহলে হবে না। আমাদের একটা প্রচলিত ধারণা যে, কর্মের বন্ধন সব সময় ঠিক হয়ে আছে, কিন্তু তা নয়, কর্মের বন্ধন কখনই স্থির থাকে না। কর্ম আমাদের একটা দিকে নিয়ে যায়। যমরাজ বলছেন, আমি সত্যসঙ্কল্প, তুমি শুধু বলে দাও তুমি কি চাও, আমি সঙ্কল্প করলেই তোমার সেটা হয়ে যাবে। যমরাজ এখনও শেষ করে দিচ্ছেন না, আরও অনেক কিছু বলছেন –

যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্যলোকে
সর্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্যা
ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।
আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব
নচিকেতো মরণং মাহনুপ্রাক্ষীঃ।।১/১/২৫।।

(মর্ত্যলোকে যে যে কাম্যবস্তু দুর্লভ সেই সেই কাম্যবস্তুও তুমি ইচ্ছানুসারে প্রার্থনা কর। এই যে সুন্দরী অপ্সরাগণ রথে আরোহণ করে এবং বাদ্যযন্ত্র সহ তোমার সামনে অবস্থিত আছে, এই রকম রমণী মনুষ্যের লভ্য নয়। আমার দ্বারা প্রদত্ত এদের দ্বারা তুমি নিজের সেবা করাও, কিন্তু হে নচিকেতা! মরণবিষয়ে এরূপ প্রশ্ন করো না।)

যে যে সুখ মর্ত্যলোকে পাওয়া যায় না সেই সেই সুখ তুমি তোমার ইচ্ছামত চেয়ে নাও। যত সুন্দরী অপ্সরাদের দেখছ এদের শুধু স্বর্গলোকেই দেখা যায়, তুমি যদি চাও আমি এদের তোমার সাথে মর্ত্যলোকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আচার্য *রামাঃ* শব্দের অর্থ করে বলছেন, *রময়ন্তি পুরুষানিতি রামাঃ*, যারা পুরুষের মনকে রঞ্জন করে, আনন্দ দেয় তাদের রামা বলে। সেখানে আবার বৃদ্ধা বিগতাযৌবনা কোন নারীর কথা বলছেন না, যারা পুরুষের মনকে আনন্দ দিতে পারে এই ধরণের মেয়ে। তার সাথে *সরথাঃ*, সারথি সমেত দিব্য রথ যত এখানে আছে সব নিয়ে যাও। *সতূর্যা*, দিব্য বাদ্যযন্ত্র সমূহ যত আছে সব তুমি নিয়ে নাও। *ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ*, এইসব জিনিষ মনুষ্যলোকে পাওয়া তো দূরের কথা মানুষ চোখেও দেখতে পায় না।

অভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব, তোমাকে যত অপ্সরা দেওয়া হচ্ছে, এদের কোন খাতির যত্ন করতে হবে না, সবাইকে তোমার সেবিকা করে রাখ। *পরিচারয়স্ব*, আচার্য ব্যাখ্যা করছেন *পাদপ্রক্ষালনাদিশুশ্রূষাং*, সারা জীবন এরা তোমার পাদপ্রক্ষালন করতেই থাকবে। মর্ত্যে মেয়ের বাবা বিয়ের সময় পাত্রপক্ষকে বলে, আমার মেয়েকে আপনাদের হাতে তুলে দিলাম, অনেক আদর-যত্নে ওকে রেখেছিলাম, দেখবেন ওর যেন কোন কষ্ট না হয়। যমরাজ এসব কিছু বলছেন না, তুমি শুধু এদের নিয়ে যাও, অপ্সরাদের দেখাশোনাও তোমাকে করতে হবে না, এরা শুধু তোমার পাদপ্রক্ষালন করতেই থাকবে। *নচিকেতঃ মরণং মরণসম্বন্ধং প্রশ্নম্*, কিন্তু নচিকেতা! মৃত্যুর পর আত্মা থাকে কি থাকে না এই প্রশ্ন তুমি করতে যেও না। এই প্রশ্নকে আচার্য বলছেন *কাকদন্তপরীক্ষারূপং*। সাধারণ মানুষের পক্ষে আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা কাকদন্ত পরীক্ষার ন্যায়। কাকের কখন দাঁত হয় না, কিন্তু কাকের দাঁত আছে কি নেই এর উপরই সারা জীবন গবেষণা করে যাচ্ছে। যারা অতি সাধারণ লোক, যাদের মধ্যে সামান্যতম জ্ঞানের উন্মেষ হয়নি এদের কাছে আত্মজিজ্ঞাসা কাকদন্তপরীক্ষারূপ। যমরাজ এটাই বলছেন, হে নচিকেতা! এই আত্মতত্ত্ব তোমার কোন কাজে লাগবে না, যে জিনিষ তোমার কোন কাজে লাগবে না সেটা নিয়ে তোমার এই অমূল্য বর কেন নষ্ট করছ, তুমি একটা সুযোগ পেয়েছ, সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নাও, কাকের দাঁত আছে কিনা জানার জন্য বৃথা ছুটোছুটি করতে যেও না।

এবং প্রলোভ্যমানোহপি নচিকেতা মহাহ্রদবদক্ষোভ্য, আচার্য নচিকেতার হৃদয়কে মহাহ্রদের সাথে তুলনা করছেন, ঠাকুর যেমন বলছেন সায়ের দীঘিতে যদি হাতে নামে তাতে দীঘিতে কোন ক্ষোভণ হয় না বা গীতায় বলছেন *সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ*, সমুদ্রের মত বিশাল হৃদয়। সমস্ত রকম প্রলোভন সত্ত্বেও নচিকেতার হৃদয় এতটুকু প্রলুব্ধ হল না, হৃদয়সমুদ্রে সামান্যতম ক্ষোভণ উৎপন্ন হয়নি, যমরাজের সমস্ত প্রলোভনকে সে প্রত্যাখ্যান করে দিল। প্রশ্ন আসে নচিকেতা কেন সব কিছু প্রত্যাখ্যান করে দিল? নচিকেতার প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে উপনিষদ কি বলতে চাইছে? এই প্রত্যাখ্যান একমাত্র দুজনই করতে পারে। প্রথম, যে ব্যক্তি জগতের সমস্ত রকম ভোগ করে জগৎ থেকে একেবারে বিরক্ত হয়ে গিয়ে বলছে আমার আর কিছু লাগবে না, যেমন যযাতির হয়েছিল। আর দ্বিতীয় যার কোন বোধই নেই, নচিকেতা দ্বিতীয় শ্রেণীর, ওর এখনও কোন বোধই হয়নি। ঠাকুর কাকে ঠোকরান আমের কথা বলছেন, ঠাকুরের ভোগে দেওয়া যায় না। আমরা সবাই কাকে ঠোকরানো আম, কোন কাজেই লাগি না। আত্মজ্ঞানে মাত্র এই দুজনই যেতে পারে, এক যার কোন বোধ নেই, নচিকেতার কোন বোধই নেই। প্রথমেই বলছেন যার প্রজনন শক্তি আসেনি, তার উপর *কুমার সন্তং*, বারো বছরের নীচে কুমার, সে কী বুঝবে রামা কাকে বলে, সতূর্যা কাকে বলে, সরথাঃ কাকে বলে! ঠাকুরও বলছেন পাঁচ বছরের বাচ্চাকে রমণ সুখ বোঝান যায় না। সব জায়গায় সাধু ব্রহ্মচারীদের তাই ঘেরাটোপের মধ্যে খুব সুরক্ষিত ভাবে রাখা হয়, কোন কিছুর প্রভাব যাতে না পড়ে। যার ফলে সন্ন্যাসীদের জগতের অনেক কিছুর ব্যাপারে কোন ধারণাই থাকে না। কিন্তু কোন ভাবে কোন সাধুর মাথায় ভোগ্যবস্তুর চিন্তা যদি একবার ঢুকে যায় এরপর মনে হবে যেন বানরকে বিছে কামড়েছে। সন্ন্যাস জীবনে এটি একটি মারাত্মক সমস্যা। ভোগের ইচ্ছা ঢুকে যাওয়ার পর ঐ ভোগ যদি না মেটাতে পারে তাহলে তাঁর মাথাটি খারাপ হবেই। সেইজন্য আত্মজ্ঞানের পথে মাত্র দুজনই যেতে পারেন। প্রথম, ভোগ্যবস্তুর ব্যাপারে যে একেবারেই অজ্ঞ, সদ্যোজাত কুসুমের মত, রাতের শিশির সিক্ত গোলাপ ভোরের আলোতে কয়েকটি পাপড়ি খুলেছে, ঐ পবিত্র মনই পারে। আর দ্বিতীয়,

জগতকে পুরোপুরি দেখা হয়ে গেছে, দেখার পর জগতের প্রতি সম্পূর্ণ বিরক্তি এসে গেছে। বাকি সবাই এই দুজনের মাঝখানে, না তারা টাটকা সতেজ, না তাদের সন্তুষ্টি হয়ে গেছে।

মানুষ সারাক্ষণ বিষয়ের মধ্যে ডুবে আছে, বিষয়ের মধ্যে না থাকলে বিষয় চিন্তার মধ্যে হারিয়ে আছে, বাসে ট্রামে রাস্থায় পঞ্চাশ রকম লোক, তার মধ্যে ছেলে মেয়ে, এত লোকের সাথে পরিচিতি, আজ বিয়ে, কাল অন্নপ্রাশন, পরশু জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী, সবাই এর মধ্যেই ডুবে আছে। আমি মনে করছি সংসার থেকে সরে এসেছি, কিন্তু সংসারের বীজ ভেতরে গিজগিজ করছে, ঐ বীজ নাশ না হওয়া পর্যন্ত আত্মজ্ঞানের পথে কেউ যেতে পারবে না। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়, হে ঠাকুর! আমার ভেতরের এই সংসারের বীজ যেন নাশ হয়ে যায়। হয় তাকে একেবারে বিশুদ্ধ থাকতে হবে, শৈশব থেকেই এই পথের দিকে ঝোঁক। ছোটবেলা থেকেই বেশি লোকের সাথে বিশেষ করে আজেবাজে লোকের সঙ্গ করার সুযোগ দিতে নেই। ভাগবতে বলছেন কামী পুরুষদের সঙ্গ করতে নেই। তাছাড়া কি ধরণের বই পড়বে, আমোদ-আহ্লাদ করবে সেদিকেও খুব নজর দিতে হয়। উপন্যাসাদির মত জাগতিক বই পড়া, সিনেমা দেখা টিভি দেখা এগুলোর উপরও খুব সতর্ক দৃষ্টি দিতে হয়। একবার এগুলোর আস্বাদ পেয়ে গেলে পরে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। ঠাকুর বলছেন জেলেরা যখন পুকুরে জাল ফেলে তখন কিছু কিছু মাছ এমন সেয়ানা যে তারা জালের ধারে কাছেই আসবে না, কিছু মাছ জাল থেকে ঝপাং করে লাফিয়ে পালিয়ে যায়, কিছু মাছ চেষ্টা করে জাল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আবার কিছু মাছ জালকে মুখে ঠেকিয়ে সোজা ভেতরের দিকে সেঁদিয়ে থাকে আর ভাবে আমি বেশ আছি, এরাই শেষ পর্যন্ত জেলেদের হাতে ধরা পড়ে। সাধক জীবনে প্রথমেই ভোগ্য বস্তু থেকে সরে আসতে হবে, ধারে কাছেই যাবে না। নচিকেতা শিশু, পবিত্র মন, যমরাজের সব কিছু প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে যমরাজকে বলছেন –

শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ, সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব, তবৈব বাহ্যস্তব নৃত্যগীতে।।১/১/২৬।।

(নচিকেতা বললেন 'হে যমরাজ! আপনার দেওয়া এই ভোগ্যসমূহ আগামীকাল থাকবে কিনা অনিশ্চিত, এরা মানুষের ইন্দ্রিয়ের শক্তি ক্ষয় করে, এমনকি হিরণ্যগর্ভাদি সকলেরই জীবন স্বল্প। অতএব এই রথ, নৃত্যাদি আপনারই থাকুক।)

শ্বোভাবা, আচার্য বলছেন *শ্বো ভবিষ্যন্তি ন ভবিষ্যন্তি বেতি সন্দিহ্যমান এব যেষাং ভাবো ভবনম্* – সংস্কৃতে *শ্বো* মানে আগামীকাল, যেমন অশ্বত্থ শব্দের অর্থ অ-শ্ব-ত্থ আগামীকাল যেটা থাকবে না, এই সংসারবৃক্ষ আজ আছে কিন্তু আগামীকাল থাকবে না। *শ্বোভাবা*, আগামীকাল এর ভাব থাকবে কি থাকবে না, অর্থাৎ জিনিষটা আগামীকাল থাকবে কি না সন্দেহ থাকে। এই জায়গাতে আখ্যায়িকায় উত্তর দিচ্ছেন একজন বিবেকী পুরুষ, যিনি পুরো জিনিষটা বোঝেন তিনিই নচিকেতার মুখ দিয়ে বলছেন। *শ্বোভাবা মর্ত্যস্য*, এই মর্ত্য লোকে যা কিছু আছে সবটাই অস্থায়ী, আজ যেটা ভোগ করছি কাল দেখছি জিনিষটা নেই। কত কষ্ট করে, কত আশা নিয়ে একটা জিনিষকে দাঁড় করাচ্ছি কিন্তু কিছু দিন থাকার পর জিনিষটা নষ্ট হয়ে গেলে কত কষ্ট পাই। *যদন্তকৈতৎ*, যিনি সব কিছুকে শেষ করে দেন। অন্তক শব্দের অর্থ যিনি সব কিছুকে শেষ করে দেন, অন্তক তাই যমরাজার একটি নাম। যারই প্রাণনক্রিয়া হয় সে যমরাজার অধীনে। *সর্বেন্দ্রিয়াণাম্ জরয়ন্তি তেজঃ*, একেই তো এগুলো কাল থাকবে কি না ঠিক নেই উপরন্তু আমাদের সব ইন্দ্রিয়ের শক্তিকে জীর্ণ করে দেয়, সব কিছুকে পুড়িয়ে দেয়। কি কি পুড়িয়ে দেয়? আচার্য তাঁর ভাষ্যে নির্দিষ্ট করে বলছেন *অপ্সরঃপ্রভুতয়ো ভোগাঃ*, সুন্দরী রমণীর ভোগ যে শুধু ইন্দ্রিয়ের তেজকেই ক্ষয় করে দেয় তা নয়, তার সাথে ধর্ম, বীর্য, প্রজ্ঞা, তেজ ও যশ আদিকে নাশ করে দেয়। ঠাকুরও বলছেন কামিনী ভোগ মানুষের পরমার্থ হানি করে।

কামিনীতে যে আসক্ত হবে প্রথমে তার ধর্ম চলে যাবে, সে আর ধর্মকার্য করতে পারবে না। সীতাকে অপহরণ করার পর রাবণের ধীরে ধীরে সব কিছুই নাশ হয়ে গেল। গ্রীক পুরাণে হেলেন অফ ট্রয়ে একটি মেয়ের জন্য কত লোক মারা গেল, ক্লিওপেট্রার জন্যও কত লোকের জীবন চলে যেতে হয়েছিল। নারীসঙ্গে প্রথমে বিবেক নাশ হয়ে যায়, যদি বিবাহিতও হয় তাহলেও প্রথমে তার ধর্মের হানি হবে, অর্থের হানি হবে। তার সাথে শক্তি ও সামর্থ ক্ষয় হয়ে যাবে এবং প্রজ্ঞাও চলে যাবে। প্রজ্ঞা হল, প্রকৃষ্ট রূপে জ্ঞান। প্রজ্ঞার আরেকটি অর্থ, অনেক শাস্ত্রকে ধারণ করার ক্ষমতা। প্রজ্ঞা আর মেধা দুটো আলাদা। মেধার সংজ্ঞা হল – *গ্রহণ ধারণ সামর্থম্*। যে কোন জিনিষকে শ্রবণ করার পর বুঝে নিয়ে ধারণ করে রাখার ক্ষমতাকে বলে মেধা। প্রজ্ঞা

হল, *বহু শাস্ত্র ধারণ সামর্থম্*। যখন একটা বিষয়কে ধারণ করে রাখার ক্ষমতা হবে তখন তা মেধাই থাকবে, কিন্তু প্রজ্ঞাতে বহু শাস্ত্রকে ধারণা করে সব রকম বিষয়কে একটার সাথে আরেকটার যোগসূত্রকে টেনে এনে মীমাংসা করে দেবার ক্ষমতা। আচার্য শঙ্কর যেমন, তিনি প্রজ্ঞাবান, বিভিন্ন শাস্ত্রের উপর তাঁর দখল ছিল, একটার সাথে আরেকটাকে মিলিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাচ্ছেন। স্বামীজীর সাথে তৎকালীন পণ্ডিতদের এটাই পার্থক্য, তৎকালীন বা বর্তমান পণ্ডিতদের মেধা আছে, বেদ উপনিষদ মুখস্ত, যেখান থেকে যা জানতে চাইবেন শুনিয়ে দেবেন, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান ছিল না, তার মানে প্রজ্ঞা নেই। স্বামীজীর অনেক বিষয়ের উপর দখল ছিল, আর যে কোন বিষয়কে অন্যান্য বিষয়ের সাথে সমন্বয় করে বক্তব্যকে একটা সামঞ্জস্য করিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল, স্বামীজী একদিকে মেধাবান আবার অন্য দিকে প্রজ্ঞাবান। বলছেন নারীসঙ্গে এই প্রজ্ঞা নাশ হয়ে যায়। এর সাথে তেজ চলে যায়। ঠাকুর বলছেন হারুকে প্রেতনী পেয়েছে। হারু খুব ভালো ছিল কিন্তু কোন নারীর পাল্লায় পড়ে তার সব তেজ চলে গেছে। চেহারার মধ্যে একটা কালো ছায়া এসে যায়। আর সমাজে কত বদনাম হবে, বদনাম হলে সুনাম নষ্ট হয়ে যাবে। আচার্য এখানে কয়েকটা জিনিষকে বললেন। কিন্তু এখানেই শেষ না, আরও অনেক কিছু নাশ হয়, যেমন অর্থ নাশ হয়, সময় নাশ হয়ে যায়। *সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজাঃ*, এটাই বলছেন, একেই তো আজ আছে কাল থাকবে কিনা কোন ঠিক নেই কিন্তু তার সাথে যতটুকু সময়ের জন্য থাকবে ততটুকু সময়ের মধ্যে সব কিছুকে নাশ করে দিয়ে চলে যাবে, সবটাই অনর্থের কারণ। তবে নচিকেতা এত কথা হয়ত বলছেন না, কারণ এসব কথা বলার ক্ষমতা এখনও নচিকেতার হয়নি। তবে আখ্যায়িক রূপে এই ভাবটা নচিকেতার উপর আরোপ করে দেওয়া হয়েছে।

সেইজন্য বলছেন, *অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব*, আপনি একদিকে আমাকে বলছেন তুমি সব অপ্সরাদের নিয়ে যাও, কিন্তু মানুষ কত বছর বাঁচে, খুব জোর একশ বছর বাঁচবে আর তা নাহলে তার থেকে আরেকটু বেশি বাঁচবে, ব্রহ্মা তার থেকে আরেকটু বেশি দিন বাঁচেন, কিন্তু অনন্ত কালের তুলনায় এই সময় তো ক্ষণিক। অনন্তের তুলনায় যে কোন জিনিষই স্বল্পম্। আমাদের জাগতিক জীবনের সাথে তুলনা করলে আরও ভালো বোঝা যায়। জীবন সব সময় আমাদের সামনে যা কিছু নিয়ে আসে তার দুটো রূপ থাকে, একটা তার অন্তর্নিহিত রূপ আরেকটি তার বাহ্যিক রূপ। আমরা সব সময় বাহ্যিক রূপেই প্রভাবিত হয়ে যাই, অন্তর্জগতের দিকে যেতে চাই না, যাঁরা যাবার চেষ্টা করেন তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রে দুটো দিক থাকে, প্রথমটা বিষয়ের জ্ঞান দ্বিতীয় পরীক্ষায় নম্বর পাওয়া। দুটোই আলাদা, বাহ্যিক হল নম্বর পাওয়া আর অন্তর্নিহিত হল বিষয়ের জ্ঞান। স্কুলে শুরু থেকে আমরা সবাই লেখাপড়া করে এসেছি নম্বর পাওয়ার জন্য, সব বাবা-মারা চায় নিজের সন্তান যেন সবার থেকে বেশি নম্বর পায়, বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের দিকে তাদের নজর নেই। অথচ যার বিষয়ের জ্ঞান আছে তার জ্ঞানের বিকাশও হবে তার সাথে পরীক্ষায় নম্বরও ভালো হবে। ঠিক তেমনি যে কোন কাজ করার সময়েও একই জিনিষ হয়। বিষয়ের ব্যাপারে পুরোটা জানা, জেনে নিজের পুরো ব্যক্তিত্বকে শক্তপোক্ত তৈরী করে দেওয়া। অন্য দিকে রয়েছে কাজের ফল। মায়েরা রান্না করছেন, রান্না করার ফল হল সবারই পেট ভরিয়ে দেওয়া। কিন্তু রান্নার যে একটা আভ্যন্তরীন ব্যাপার আছে, তাতে রান্নাকে একটা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে চলে যাওয়া যায়। স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ যখন শ্যামলতালে থাকতেন সেখানে তিনি নিজের জন্য যা যা রান্না হবে তার সবটাই, চাল, ডাল, নুন, তেল, মশলা, আনাজ নিজের হাতে বার করে দিতেন, সবটাকে একটা থালার মধ্যে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতেন, পরে ওনার সেবক সেটা রান্নাঘরে রেখে আসতেন। এমন ভাবে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতেন দেখে মনে হত বাচ্চাদের কোন খেলনা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

সংসারীরা সারাদিন যা কিছু করছে, একটু বিচার করলে দেখা যাবে অস্থায়ীর পেছনেই সব শক্তি, সময়, অর্থ ঢেলে যাচ্ছে। তার পেছনে যে একটা চিরন্তন সত্তা আছে সেটাকেই তারা সব সময় ভুলে থাকে। কঠোপনিষদে পরে বলবেন *নিত্যোনিত্যানাম্ চেতনশ্চেতনানাম্*, অনিত্যের পেছনে যে নিত্য রয়েছে, অচিরন্তনের পেছনে যে চিরন্তন সত্তা রয়েছে তাঁর দিকে কারুর দৃষ্টি নেই। নচিকেতা এটাই বলছেন বাহ্যিক রূপ হল মানুষের জীবনকাল, দেবতাদের জীবনকাল, ব্রহ্মার জীবনকাল কিন্তু এই বাহ্যিক রূপের আড়ালে যে অন্তরতম রূপ আছে সেটাই চিরন্তন, এর কোন দিন বিনাশ হবে না, আমার ওটাই লাগবে।

নচিকেতা খুব মিষ্টি করে বলছেন *তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে*, আপনার রথ আপনার কাছেই থাকুক, অপ্সরাদের নৃত্য গীত, বাদ্য সব আপনার কাছেই থাক। যাঁরা বিবেকী পুরুষ, যাঁরা ধর্ম পথে যেতে চাইছেন

এখানে তাঁদের জন্য এটাই শিক্ষণীয় যে, সব সময় বিচার করতে হয়। কিছু চাওয়ার আগে, পাওয়ার আশায় পাগলের মত ছোটার আগে একটু বিচার করে কি দেখবো না! এর জন্য আমরা কি ত্যাগ করছি! মনে কিছু উঠল দু-পাঁচ টাকা খরচা করে সেটাকে মিটিয়ে দিলাম ঠিক আছে, কিন্তু মেটাতে গিয়ে পুরো জীবনটাই যদি চলে যায় তখন এর মত মুর্খামি আর কিছু কি হতে পারে! আপনি আমাকে যে সুখের জীবন দিতে চাইছেন এই জীবন তো ক্ষণভঙ্গুর, এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের জন্য আমার চিরন্তন জীবনকে কেন নষ্ট হয়ে যেতে দেব! এভাবে গভীর ভাবে চিন্তন করা, বিচার করা সত্যিই খুব কঠিন, বিশেষ করে এই উচ্চ আত্মতত্ত্বের ব্যাপারে, কিন্তু একটু চিন্তা করতে করতে আমরা জীবনের অনেক ছোটখাটো নিরর্থক জিনিষগুলো থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা অর্জন করে নিতে পারি, আমরা জগতকে যে আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরে রেখেছি, এই ধরে রাখাটা একটু শিথিল হয়। এতক্ষণ অপ্সরা, নৃত্য, বাদ্য নিয়ে বলছিলেন এবার অর্থ নিয়ে বলছেন –

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো, লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেৎ ত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং, বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব।।১/১/২৭।।

(মানুষ কখনই বিত্তের দ্বারা সন্তুষ্ট হতে পারে না। আপনার দর্শন যখন পেয়েছি তখন আমার বিত্তলাভ অবশ্যই হবে, আর আপনি যতদিন প্রভুত্ব করবেন ততদিন আমি জীবিত থাকতে পারবো, কিন্তু এই বরই আমার কাম্য।)

আজ পর্যন্ত জগতে দেখা যায়নি কেউ টাকাতে তৃপ্ত হয়েছে। এটা সত্য, খুব গরীব লোক ছাড়া টাকাতে কেউই তৃপ্ত হয় না। ঠাকুর বলছেন তারে বাড়া তারে বাড়া, আপনার এখন কিছু টাকা-পয়সা হয়ে যাওয়াতে আপনি গ্রামের সবচেয়ে বড়লোক হয়ে গেলেন, এবার ইচ্ছে হবে আমাকে জেলার সবচেয়ে ধনী হতে হবে। জেলারও সব থেকে বড়লোক হয়ে গেলেন, এবার আমাকে ভারতের বড়লোক হতে হবে, এরপর আমাকে বিশ্বের বড়লোক হতে হবে। তারপর ভাববেন *ন ভূতো ন ভবিষ্যতি*, এর আগেও কারুর এত টাকা ছিল না, ভবিষ্যতেও এত টাকার কারুর হবে না। বিত্তের শেষ কোথায়? কোথাও শেষ নেই। ওটাও যদি হয়ে যায় তখন বলবেন কুবেরেরও অত বিত্ত যেন না থাকে। শেষ কোথাও নেই। যত ঢালবে তত পেট বড় হতে থাকে। আগুনে যত ইন্ধন দেবে ততই তার খিদে বাড়বে। টাকা-পয়সাও আগুনের মত, যত টাকা হবে তত তার চাহিদা বাড়বে। গরীবলোক কিছু টাকা পেলে তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে যায়। সেইজন্য বলা হয় ত্যাগ ছাড়া অমৃতত্ব পাওয়া যায় না। কোন মানুষকে যদি নষ্ট করতে হয় তাহলে কটা টাকা দিয়ে দিন। ঠাকুরকে একজন কটা টাকা দিয়েছে, ঠাকুরের মাথা ঘুরতে শুরু করে দিয়েছে। তিনি হিসেব করতে বসে গেলেন, দুধওয়ালার অত দেনা আছে, অমুকের অত দেনা আছে। রাত্রিবেলা রামলালকে ঘুম থেকে তুলে বলছেন, যা টাকা ফেরত দিয়ে আয়।

এরপর নচিকেতা নিজের পাটোয়ারি বুদ্ধি লাগাচ্ছেন, *লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেৎ ত্বা*। আমি আপনাকে দেখে নিয়েছি তাই আমি যা চাইব তাই পেয়ে যাব। ঠাকুর টাকা মাটি মাটি টাকা বলে দুটোই গঙ্গায় ফেলে দিলেন। তারপর ঠাকুরের চিন্তা হল টাকা লক্ষ্মী, লক্ষ্মী যদি রাগ করে খ্যাঁট বন্ধ করে দেন তাহলে চলবে কি করে! তখন তাড়াতাড়ি বলছেন, মা লক্ষ্মী তুমি আমার হৃদয়ে বাস কর। বেশি বৈরাগ্য দেখিয়ে ভয় হল যদি কোন গোলমাল লেগে যায়, নচিকেতাও বলছেন, আপনাকে দেখে নিয়েছি আমার আর কি চাই!

জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং, আমি সহজে মরবও না, কারণ আপনার সাক্ষাৎ আমি পেয়ে গেছি। নচিকেতা বুঝে গেছেন যমরাজের দর্শন হয়ে যাওয়া মানে তার বিত্তও হবে আর বেঁচেও থাকবে। নচিকেতা সহজে ছেড়ে দেননি, সব কিছুই আদায় করে নিয়েছেন, মেধাসম্পন্ন কিনা। *বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব*, তবে এই নিত্য জীবনের তুলনায় এগুলো অল্প আয়ুর আর মানুষের ইচ্ছার কোন দিনই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। সেই তুলনায় আপনি যা কিছু দিচ্ছেন সবটাই অল্প, তাই আপনার এসব নিয়ে আমার কোন লাভ নেই, আমি আত্মতত্ত্বের বরটাই চাই। পরের দুটি মন্ত্রে খুব সুন্দর বলছেন –

অজীর্যতামমৃতানামুপেত্য
জীর্যন্ মর্ত্যঃ ক্বধঃস্থ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদান্
অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত।।১/১/২৮।।

(দ্যুলোকের নীচে পৃথিবীতে কোন্ জরামরণশীল ব্যক্তি জরারহিত দেবতাদের নিকট উপস্থিত হয়ে, তাঁদের কৃপায় উৎকৃষ্ট প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে জেনেও এবং অপ্সরাদের নৃত্যগীত ও ক্রীড়াজনিত সুখ অনিত্য জেনেও দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার জন্য উৎসুক হতে পারে?)

দেবতাদের বৈশিষ্ট্য হল দেবতারা জরাপ্রাপ্ত হন না, মানুষের মত তাঁরা বৃদ্ধ হন না। শ্রীমা দেবতাদের কিভাবে মৃত্যু হয় বলতে গিয়ে বলছেন, বরফ যেমন আস্তে আস্তে গলে যায়। এও হতে পারে সূক্ষ্ম শরীরটা আস্তে আস্তে ভারী হতে থাকে, যত ভারী হতে থাকে তত নীচের লোকে চলে আসে। কিন্তু জরাপ্রাপ্ত হন না। *অমৃতানাম্*, দেবতারা অমর, এই অমরত্ব আপেক্ষিক অর্থে। *উপেত্য*, দেবাতাদের শরীর জীর্ণ হয় না, যমরাজকে দেবতা রূপে বলছেন, তিনিও অজর অমর। এই অজর অমরও আপেক্ষিক অর্থে। *জীর্যন্ মর্ত্যঃ ক্বধঃস্থ প্রজানন্*, বেদে কু শব্দের একটা অর্থ পৃথিবী, বেদে ক মানে আবার প্রজাপতি। হিরণ্যগর্ভসূক্তে বলছে *কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম*, ক প্রজাপতির একটা নাম। তেমনি কু মানে পৃথিবী, কু+অধঃ ক্বধঃ, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গলোকের তুলনায় কু হল অধঃ, সেইজন্য পৃথিবীর একটা নাম ক্বধঃ, পৃথিবীলোকে যারা বাস করে তাদের বলছেন ক্বধঃস্থ, মৃত্যুধর্মী। একদিকে দেবতারা অজর অমর, অন্য দিকে ক্বধঃস্থ, মৃত্যুধর্মা। মানুষ যদি দেবতাদের কাছে পৌঁছে যায় তাহলে *অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদান্*, এই অনিত্য ভোগ্যবস্তু কে চাইবে? *অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত*, অনেক দিন বেঁচে থাকতে কে ইচ্ছে করবে? আচার্য বলছেন, কিছু কিছু উপনিষদে পাঠান্তরে ক্বধঃস্থ হয় *ক্ব তদাস্থঃ*। *ক্ব তদাস্থঃ* এই পাঠান্তর যদি নেওয়া হয় তাহলে তার অর্থ হবে পুত্রবিত্তাদির আসক্তিতে যার মন রঞ্জিত। আচার্য নিজের তরফ থেকে যোগ করে বলছেন, মানুষ মাত্রই জীবনে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর বস্তুকে পেতে চায়। যাঁরা বিবেকী পুরুষ, যাঁরা সব বোঝেন তাঁরা অবিবেকী পুরুষের মত কেন চাইতে যাবেন! বলছেন *অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত*, এখানে বিবেকী শব্দটাকে উহ্য রাখা হয়েছে। অবিবেকী আর বিবেকীর তফাৎ কি? অবিবেকীরা দেবতাদের কাছে গিয়েও সাধারণ জিনিষই চাইবে, কিন্তু বিবেকীরা অনিত্য বস্তু কখনই চাইবে না। ক্বধঃস্থ শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ না হয়ে যদি যাদের মন স্ত্রী-পুত্রের মধ্যেই পড়ে আছে এই অর্থে হয়, তখনও একই জিনিষ হবে, এরাই অবিবেকী, এরাই দেবতাদের কাছে গিয়ে সাধারণ জিনিষই চাইবে। ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলছেন, কল্পতরুর কাছে গিয়ে কেউ কি লাউ কুমড়ো চাইবে! স্বামীজী মা কালীর কাছে গিয়ে চাইছেন জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য। *অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত*, কারা অনেক দিন বাঁচতে চায়? অবিবেকীরাই অনেক দিন বাঁচতে চায়, অবিবেকীরাই পুত্র বিত্ত ভোগ করতে চায়। বিবেকী পুরুষ কখনই এগুলো চাইবে না। তাহলে বিবেকী পুরুষরা কি বিয়ে থা করে না? বিবেকী পুরুষের কি সংসারে থাকে না? অবশ্যই থাকে। কিন্তু ভেতরে এই রকম চাহিদা থাকে না। বিবেকী পুরুষ কোন মহাপুরুষের কাছে বা কোন দেবতার কাছে বর পাওয়ার যদি সুযোগ পায় তারা কখনই এই ধরণের জিনিষ চাইবে না। সেইজন্য কি হয় –

যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো
যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোহয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো
নান্যং তস্মান্নচিকেতো বৃণীতে।।১/১/২৯।।

হে যমরাজ! যে আত্মার সম্বন্ধে লোকের মনে 'আত্মা আছে কিনা' এরূপ পরলোক-বিষয়ক সংশয় উপস্থিত হয়, মহৎ প্রয়োজনের নিমিত্তে আপনি আমাদের তাই বলুন। উপনিষদ নিজে বলছেন – এই যে বর যা অতি দুর্বিজ্ঞেয় এবং গভীরে প্রবিষ্ট, এর ভিন্ন নচিকেতা অন্য কিছুই প্রার্থনা করে ন।)

নচিকেতা নিজেই বলছেন, নচিকেতা কখনই করবে না। নচিকেতা কি করবেন না? *যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো*, আত্মজ্ঞানের ব্যাপারটাকে নিয়ে যখন এতই সংশয়, জিনিষটা পরিষ্কার নয়, *যৎ সাম্পরায়ে*, সাম্পরায়ে মানে পরলোক বিজ্ঞান, এই বিজ্ঞান ছাড়া নচিকেতা আর কোন কিছুই প্রার্থনা করবে না। নচিকেতা এখনও সব লোকের সম্বন্ধে জানে না, নচিকেতার জীবন এখনও ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই কটি লোককে কেন্দ্র করে চলছে। তার সাধারণ ধারণায় এই পৃথিবীলোক যেমন আছে, তেমনি স্বর্গলোক আছে, ব্রহ্মলোক এক্ষুণি পেল। এখন মনে করছে ব্রহ্মলোকের উপরে এমন কোন লোক আছে যেখানে আত্মা গিয়ে বাস করেন, যেখান থেকে আর আসা যাওয়া হয় না। এখানেই বোঝা যাচ্ছে যে আত্মার ব্যাপারে নচিকেতা এখনও কিছু জানে না। আত্মার চরিত্র যদি জানা থাকত তাহলে নচিকেতা এই প্রশ্নই করতেন না। পরলোকের ব্যাপারে একটা সাধারণ ধারণা নিয়ে নচিকেতা বলছেন, *যৎ সাম্পরায়ে*, আত্মা আছে কি নেই এই ব্যাপারে পরলোক বিষয়ক সংশয়

উপস্থিত হয়। আমরাও মনে করি রামকৃষ্ণলোক, ব্রহ্মলোক মানে, এই পৃথিবীলোক যেমন আছে তেমনি কোন লোক হবে। যে জিনিষের অস্তিত্ব আছে মানুষ সেই জিনিষেরই জ্ঞান লাভ করতে পারে। সেই জিনিষের মূল একটা ধারণা যেই হয়ে গেল তখন তুলনা করে করে আরও এগোতে শুরু করে। নচিকেতা পরলোক জানে, এরপর যেটাই হয় সেটাকেই নচিকেতা জানছে আরেকটা লোক বলে। সেইজন্য বলছেন এই যে মহান যে পরলোক তার ব্যাপারে আমাকে বলুন। এই দুর্বিজ্ঞেয় বিষয় ছাড়া নচিকেতার আর কিছু লাগবে না। ভদ্রতার খাতিরে আমরা অনেক সময় মনে এক রকম চাইছি কিন্তু মুখে অন্য রকম বলতে হয়। অথবা নচিকেতা এখানে মুখ ফসকে যমরাজের কাছে প্রশ্ন করে ফেলেছেন তাও নয়। নচিকেতা বলতে চাইছেন, আমার এই প্রশ্নের মধ্যে অন্য কোন ধরণের মনের ভাব রয়েছে তা নয়, আমি মুখে আপনাকে যা প্রশ্ন করেছি আমার মনের ভাবও তাই। এখানেই কঠোপনিষদের প্রথম বল্লীর দ্বিতীয় প্রথম অধ্যায় শেষ হয়ে যাচ্ছে।

এই ধরণের শাস্ত্র নিত্য পাঠের অন্তর্ভুক্ত। যেমন যেমন সাধনা হবে, যেমন যেমন বুদ্ধির বিকাশ হবে, তার সাথে যেমন ধারণা করার শক্তি বৃদ্ধি হবে, মেধা শক্তি যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমন তেমন কঠোপনিষদের মত শাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্বগুলি স্পষ্ট হতে থাকবে। আমরা মনে করছি সব বুঝে ফেলেছি কিন্তু আত্মদর্শন, ঈশ্বর দর্শন না হওয়া পর্যন্ত এই ধরণের শাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্ব জানা অসম্ভব। আমরা যতটুকু জানছি বা ধারণা করছি সবটাই তত্ত্বত জানছি, উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত এই জানার কোন দাম নেই। ঠাকুর বলছেন বই পড়ে এক রকম জানা হয়, প্রত্যক্ষ করার পর অন্য রকম জানা যায়। মনের যেমন যেমন বিকাশ হতে থাকে তেমন তেমন এক একটা জিনিষ পরিষ্কার হতে থাকে। মনের বিকাশ হওয়াকে সচল রাখার জন্য নিত্য পাঠ চালিয়ে যেতে হয়।

প্রথম অধ্যায়ের মূল বক্তব্য দুটি। নচিকেতা বর চাইছেন যাতে সে বাবার কাছে ফেরত যেতে পারে, এটা ততটা গুরুত্ব নয়। এর বাইরে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আসছে, একটা সগুণ ব্রহ্মের জ্ঞান আরেকটা নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান। দ্বিতীয় বরে নচিকেতা যে স্বর্গলোকের কথা জানতে চাইছেন, আসলে উপনিষদ সেখানে সগুণ ব্রহ্মকে নিয়ে বলছেন। সগুণ ব্রহ্মের কথা বলতে গিয়ে যমরাজ নচিকেতাকে বললেন, *বিদ্ধি তমেতং নিহিতং গুহায়ম্*, এই সগুণ ব্রহ্মের বিদ্যা তোমারই হৃদয়গুহায় বিরাজ করছে। যজ্ঞ-যাগ বা বাহ্যিক কর্মের ব্যাপারে যা কিছু বলা হয়, এগুলোর নিজস্ব একটা গুরুত্ব আছে। এই জায়গাতে কঠোপনিষদ জ্ঞান আর কর্মের সমুচ্চয়ের পথ দেখাচ্ছেন, তোমাকে যজ্ঞও করতে হবে আর তার সাথে ধ্যানও করতে হবে। পণ্ডিতরা ভিন্ন ভিন্ন মথ ও পথের কথা বলেন, আমরা জানি না কোন পথ ঠিক, কোন পথ ভুল। কিন্তু এসব ব্যাপারে শাস্ত্র যেমনটি বলছে তেমনটিই আমরা মেনে চলব। তৃতীয় বরে সম্পূর্ণ নির্গুণ ব্রহ্মের কথা বলছেন, নির্গুণ ব্রহ্মে লয় হলে আর আসা যাওয়া নেই। উপনিষদের উদ্দেশ্য হল নির্গুণ উপাসনার দিকে নিয়ে যাওয়া। উপনিষদে সগুণ উপাসনার কিছু কথা থাকতে পারে, যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদ ও অন্যান্য কয়েকটি উপনিষদে ওঁ উপাসনার কথা বলা হয়েছে। ওঁ উপাসনার কথাতেই বলছেন, যিনি ওঁ উপাসনা করেন তিনি এই জগতকে জয় করে নেন। এই কথাকে আধার করে অনেক সাধু সন্ন্যাসীরা ওঁ জপ করে যেতে বলেন। কিন্তু উপনিষদের উদ্দেশ্য জগৎ জয় করা নয়। ঠাকুর বলছেন, একটু আঁশ ধোয়া জল না দিলে ছোকড়াগুলো ছিটকে যাবে। ঠিক তেমনি এগুলোও আঁশ ধোয়া জল, একটু টোপ খাইয়ে দেওয়া হল। যদি কেউ ধর্ম ঠিক কি বুঝতে চায়, আধ্যাত্মিক জ্ঞান যদি পেতে চায়, তাহলে তাদের জন্য এসব আলোচনা চলবে না। তাই প্রথম বরের কোন মাহাত্ম্য নেই, দ্বিতীয় বরেরও কোন গুরুত্ব নেই, তৃতীয় বরই আসল। ছান্দোগ্য বা বৃহদারণ্যক উপনিষদে যে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার কথা আছে, সেগুলো বেদের আরণ্যক অংশ থেকে বেশি প্রভাবিত। বৃহদারণ্যক উপনিষদের মধ্যেই আরণ্যক জড়িয়ে আছে। যদিও উপনিষদে কোথাও কোথাও জাগতিক অভ্যুদয়ের কথা বলা হয়েছে, কোথাও আবার সগুণ উপাসনার কথাও বলছেন, কিন্তু এই দুটো কখনই উপনিষদের মূল বক্তব্য নয়। আর যদিও বা এই দুটোর উপর যেখানে জোর দেওয়া হচ্ছে সেখানে যা যা শর্ত আরোপ করছেন সেগুলো একই থাকছে। যেমন শ্রদ্ধা সবেতেই থাকতে হবে, জাগতিক অভ্যুদয়ের জন্যই কাজ করুক বা সগুণ অথবা নির্গুণ ব্রহ্মের সাধনা করুক, সবেতেই শ্রদ্ধা লাগবে, শ্রদ্ধা মানে এই দৃঢ় বিশ্বাস যে এটাই ঠিক। আর বিনয়ের ভাবও সব জায়গাতেই লাগছে। এরপর সাধনার তীব্রতায় তফাৎ হয়ে যায়। সাধনা যত তীব্র ও ক্ষুরধার হবে সাধনার ফল ততটাই বৃহৎ হবে। কিন্তু তার বাকী সাধারণ জিনিষগুলো সমান ভাবে থাকতে হবে, মূল প্রস্তুতিতে এগুলোর কোনটারই ছাড় নেই। প্রথম অধ্যায়ের এটাই মূল বক্তব্য। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে ধীরে ধীরে নির্গুণ উপাসনার দিকে প্রবেশ করবেন।

প্রথম অধ্যায়
দ্বিতীয়বল্লী

প্রেয় আর শ্রেয়, প্রত্যেক পরিস্থিতিতে জীবন আমাদের সামনে এই দুটি জিনিষকে নিয়ে আসে। প্রেয় আর শ্রেয় এর ফল আলাদা, লক্ষ্য আলাদা, সব কিছুই আলাদা। কিন্তু দুটোই মানুষকে বাঁধে। আমাদের সাধারণ একটা ধারণা যে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম মানুষকে বাঁধে আর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম খুলে দেয়, তা নয়, দুটোই বাঁধে। কিন্তু যাঁরা সাধুপুরুষ, বুদ্ধিমান তাঁরা শ্রেয়কে বেছে নেন আর মন্দ বুদ্ধির, সাধারণ মানুষ সব সময় প্রেয়কে বরণ করে। প্রেয় আর শ্রেয় জিনিষটা ঠিক কি, আমাদের অনেকেরই পরিষ্কার ধারণা নেই। দৈনন্দিন জীবনে শ্রেয় আর প্রেয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলে। শৈশবে লেখাপড়া থেকে শুরু করে বয়স কালে সংসার জীবনে এসে মানুষ যে কোন কাজই করুক না কেন, সব কাজেই জীবন এই দুটো জিনিষের সম্ভবনাকে নিয়ে আসে। কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লী যমরাজ শুরুই করছেন শ্রেয় আর প্রেয়কে নিয়ে। দ্বিতীয় বল্লীর আলোচনা শুরু করার আগে তাই প্রেয় আর শ্রেয়কে নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার। দুটো সম্ভবনাকে নীচের তালিকায় কয়েকটি শব্দ দিয়ে সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই কটি শব্দ দিয়ে যদি প্রেয় আর শ্রেয়কে দেখা হয় তাহলে জিনিষটা বুঝতে সুবিধা হবে।

Empirical	Intrinsic
External	Internal
Personal	Impersonal
Small	Complete
How	Why

আমাদের বুদ্ধির এমনই গঠন যে, জীবন চালাতে গিয়ে যে কাজই আমরা করি না কেন সব কিছুতে প্রথমেই empirical, external, personal, small আর howএর দিকেই আমাদের দৃষ্টি যায়। Empirical আর intrinsic মানে, যে জিনিষই আমাদের জীবনে আসে তার নিজস্ব একটা অন্তর্নিহিত মূল্য আছে, সেই মূল্যের একটা বহিঃপ্রকাশ থাকে, আমরা সব সময় সব জিনিষের অন্তর্নিহিত মূল্যকে অর্থাৎ বস্তুর সারকে গুরুত্ব না দিয়ে তার বহিঃপ্রকাশকে মূল্য দিয়ে থাকি। এটা আমাদের স্বভাবেই অবস্থিত। খুব সহজ দৃষ্টান্ত রসগোল্লা, রসগোল্লা একটা বস্তু। রসগোল্লার সার হল রসগোল্লার মাধুর্য, অর্থাৎ রসগোল্লার মিষ্টত্ব। বাচ্চার কাছে রসগোল্লা একটা লোভনীয় বস্তু, কারণ বাচ্চা জিনিষটাকে empirically দেখে। আবার একজন ডায়াবেটিস রোগী রসগোল্লাকে বিষতুল্য দেখবে। কিন্তু রসগোল্লা বিষও নয়, লোভনীয় বস্তুও নয়। বস্তুর দিক থেকে দেখলে রসগোল্লা রসগোল্লাই, মিষ্টি পদার্থ। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত চাঁদ, আকাশের চাঁদকে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখার পর চাঁদের ব্যাপারে বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। কবি চাঁদ দেখে চাঁদের সৌন্দর্যকে নিয়ে একটা কবিতা রচনা করে দেবে, একজন বিরহী চাঁদের মধ্যে তার প্রেমিকার মুখ দেখবে, বিপ্লবী কবি সেই চাঁদকে দেখে ঝলসানো রুটি। অন্য দিকে মুসলমানরা চাঁদ দেখে তাদের ধর্ম পালনের দিনক্ষণ ঠিক করে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী চাঁদ দেখে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের হিসাব করতে বসে যায় কবে চন্দ্রগ্রহণ হবে, কবে সূর্যগ্রহণ হবে ইত্যাদি। কিন্তু চাঁদের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্কই নেই। এই বিশাল নক্ষত্রপুঞ্জের একটা ছোট্ট সৌরমণ্ডলে পৃথিবী অতি সাধারণ একটা গ্রহ, সেই গ্রহের অতি ক্ষুদ্র একটি উপগ্রহ হল রাতের আকাশের এই চাঁদ। সেই চাঁদকে নিয়ে মানুষ কত রকম চিন্তা ভাবনা করে চলেছে।

যে কোন বস্তু যখনই আমাদের জীবনে আসে আমাদের স্বভাবই এমন যে সব সময় আমরা বস্তুর empirical এর দিকে যাই কখনই intrinsicএর দিকে যাই না। আমাদের শাস্ত্র সব সময় চেষ্টা করছে মানুষকে intrinsicএর দিকে, অর্থাৎ ভেতরের দিকে নিয়ে যেতে, কিন্তু আমরা সব সময় ভেতরের দিকে না গিয়ে বাইরের দিকে যেতে চাইছি। যেমন, শাস্ত্র পরিষ্কার বলে দিচ্ছে বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য সন্তানোৎপত্তি, যাতে বংশের ধারা বজায় থাকে, ক্রিয়াকর্মাদি, পিতৃকর্মাদি সম্পন্ন করা যাবে ইত্যাদি। কিন্তু বিবাহের সময় পাত্রের বাবা-মা দেখে মেয়ে উচ্চবংশের কিনা, মোটা পণ পাওয়া যাবে কিনা, পাত্র দেখে ভাবী স্ত্রী দেখতে সুন্দরী কিনা, স্ত্রীকে নিয়ে গর্ব করা যাবে কিনা। এখানে মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে আসছে। অথচ বিবাহ করার

সময় কেউই ভাবে না কেন এই বিবাহ করা হচ্ছে, যদিও ভাবে তখনও কিন্তু empirical জিনিষটাই বেশি থাকে। প্রেয় মানেই empirical আর শ্রেয় মানেই intrinsic। যে কোন জিনিষ যখন করা হচ্ছে তখন তার empirical aspect আর intrinsic aspect দুটো একসাথেই আসবে। আমরা যতই শাস্ত্রের কথা শুনে যাই না কেন, যতই মনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হোক না কেন কার্যক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাবে empirical থেকে সরে আমাদের মন কিছুতেই intrinsicএর দিকে যেতে চায় না।

এর পরে আসছে external আর internal। আমরা যে কাজই করি না কেন, একটা চাকরি করছি, চাকরি করার জন্য মাসের শেষে কটি টাকা পাচ্ছি। এই কটি টাকার জন্যই আমার গর্ব, এই টাকার জন্য সমাজ ও পরিবারে একটা বিশেষ মর্যাদা পাচ্ছি, স্ত্রী গর্ব করে বলে আমার উনি এত টাকা পান। কিন্তু কাজ মানে কাজ। গাধা যখন পিঠে বোঝা বয়ে নিয়ে যায় তখন সে ভাবে না এর মধ্যে সোনা আছে না বালি আছে। গাধার কাছে আছে একমাত্র ওজন। কাজ মানেও তাই। কাজকে আমাদের কাজ রূপেই দেখতে হবে। কাজের সাথে সাথে কাজের আনুষাঙ্গিক রূপে যে আড়ম্বর আসছে তার দিকে নজর দিতে নেই। আমাদের এতই দুর্ভাগ্য যে কাজকে কাজ রূপে খুব কম দেখি কিন্তু কাজের আড়ম্বর গুলোকে নিয়েই বেশি মাতামাতি করছি। পরিণাম স্বরূপ আমাদের দুঃখ-কষ্টেরও সীমা-পরিসীমা নেই। কাজের একটাই ভূমিকা, অবশ্যই তার একটা দিক হবে দুটো টাকা পাওয়া, যা দিয়ে আমার সংসার চলবে, কিন্তু তার থেকেও বেশি হল প্রত্যেকটি কাজ আমাদের মনকে তৈরী করে দেয়। কাজ মাত্রই আমাদের মনকে এমন প্রশিক্ষণ দেয় যে ধীরে ধীরে মন শক্তিমান হতে থাকে, শক্তিমান হওয়ার সাথে সাথে আমাদের মনও একাগ্র হতে শুরু হয়। মন যদি একাগ্রতাকে আয়ত্ত করে নিতে পারে, তখন সেই একাগ্র মন বিশ্বের সব কিছুকেই করায়ত্ত করার ক্ষমতা পেয়ে যাবে। অথচ দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়, অফিসে, স্কুল কলেজে, মাঠে ঘাটে মন্ত্রী থেকে পিওন সবাই বলছে – এটা কি আমার কাজ? এই কাজের জন্য অন্য কেউ আছে। নিজের কাজ যদি হয় হয়তো করে দেবে নয়ত করতে চাইবে না। ভবিষ্যত আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ভগবানই জানেন! এই ব্যাপারটাকে আমাদের খুব গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে, যে কাজ অযাচিত ভাবে এসে গেছে সেই কাজ যদি খুব নিষ্ঠার সাথে না করে, তাহলে জেনে নিন সে এক মহা বিপদের দিকে, নিজের বিনাশের দিকে এক ধাপ এগিয়ে গেল। সে তো বিনাশের দিকে যাচ্ছেই, সাথে সাথে তার নিজের লোকেদেরও বিনাশের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সবাই জীবনে অনেক ভুল কাজ করে থাকে, ভুল করা মানেই জীবনের সংগ্রাম চলছে, কিন্তু তাতেও তাদের আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের অনেক কষ্ট পেতে হয়। ভুল কাজ থেকে বিরত থাকা খুব কঠিন। বড়রাই যদি ভুল কাজ থেকে বেরিয়ে না আসতে পারে তাহলে বাচ্চাদের কী অবস্থা ভাবুন। বাচ্চাদের সব সময় বলা হয় পড়াশোনা করে যাও, বড় হতে হবে ইত্যাদি, কিন্তু তারাও বড়দের সব কথা পালন করতে চায় না। সেইজন্য তাদের বেঁধে দেওয়া হয়, তোমাকে এটাই করতে হবে। যেমন অনাসক্ত, অনাসক্ত বাচ্চারা বুঝতে পারবে না। কিন্তু আমরা তাদের জোর করে অনাসক্ত করাই। স্কুলের ক্লাশ চল্লিশ মিনিট হয়ে যাওয়ার পর ঘন্টা বেজে গেল। শিক্ষক ভালো পড়াচ্ছেন কি খারাপ পড়াচ্ছেন তাতে কিছু আসে যায় না, ঘণ্টা পড়ে গেছে ক্লাশ শেষ, এটাই অনাসক্ত হয়ে গেল। স্কুল শুরুতে তোমার ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক ঘণ্টা পড়ে গেল ক্লাশে ঢুকে পড়। ঘণ্টা পড়ল এবার খেলতে যাও, ঘণ্টা পড়ল ক্লাশে ঢোক, ঘণ্টা পড়ল বাড়ি যাও, এটাই detachment, এখানে জোর করে তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এভাবেই তার মন ধীরে ধীরে অনাসক্ত হতে শুরু করবে। কিন্তু যারা নিজের মত করে যাচ্ছে আর বলছে জীবনে যত বড় কাজ হয়েছে সেখানে তারা একটানা আট ঘণ্টা দশ ঘণ্টা কাজ করছে, এই চল্লিশ মিনিটে কি কিছু হয়! যখন বড় হবে তখন হবে কিন্তু প্রথমে এভাবেই সবাইকে এগোতে হবে। ইদানিং একটি সন্তান হওয়ার জন্য শেয়ারিং জিনিষটাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ছোট ভাই নেই, ছোট বোন নেই, ভালোবাসাটাই express হতে পারছে না। External আর internalএ অনাসক্তের প্রথম প্রশিক্ষণটা এভাবেই দেওয়া হয়। প্রথম থেকে যে শিক্ষাটা দেওয়া হচ্ছিল তার উদ্দেশ্য এটাই, ধীরে ধীরে তোমার মনকে যেটা internal যেটা essence, যেটাকে intrinsic বলছেন সেটার দিকে নিয়ে যাও। এইভাবে যদি না নিয়ে যায় তাহলে উপরের তালিকার বাম দিকে যে শব্দগুলি আছে সেইদিকে চলে যাবে।

পদার্থ বিজ্ঞান একটা বিষয়, personalized aspect of knowledge, সমষ্টি বিদ্যার খুব ছোট্ট একটা দিক হল পদার্থ বিজ্ঞান। পদার্থ বিজ্ঞানের যে সমষ্টি জ্ঞান তারও ছোট্ট একটা দিক হল ক্লাশ টেনের

পদার্থ বিদ্যার জ্ঞান। এরও নীচে হল পরীক্ষায় নম্বর পাওয়া। ক্লাশ টেনের ফিজিক্স পরীক্ষার নম্বর পাওয়াতে নেমে যাওয়া সব থেকে নিকৃষ্ট, এর থেকে আর নীচে যেতে পারে না। অথচ এটাই আশ্চর্যের যে, সবাই নিজের সন্তানের নম্বর পাওয়ার উপরই বেশি জোর দেয়। এটাই প্রেয়। পরীক্ষায় নম্বর যদি না পাও তাহলে তোমার জীবনে কিছুই হবে না। সবাই জিজ্ঞেস করে, ক্লাশে first হয়েছ কিনা বা first divisionএ পাশ করেছে কিনা, ভুলেও কেউ জিজ্ঞেস করবে না, তুমি এই বিষয় জ্ঞানকে ভালো ভাবে রপ্ত করেছ কিনা। অভিবাবকদের একটাই প্রত্যাশা, ভালো নম্বর পেলে হায়ার ক্লাশে যেতে পারবে, সেখান থেকে কম্পিটিশান পরীক্ষায় যেতে পারবে, পরীক্ষায় পাশ করে কোন রকমে একটা চাকরি জোগার করে নেবে। এরপর বিয়েথা হয়ে গেল আমিও দায় মুক্ত। বড় হয়ে সেই সন্তানও মনে করছে এটাই তার জীবনের বিরাট achievement। মাঝখান থেকে সে ভুলে যাচ্ছে প্রত্যেকটি পদক্ষেপে জীবন তার সামনে একই সঙ্গে দুটো জিনিষকে নিয়ে হাজির করছিল, intrinsic দিচ্ছিল, internal দিচ্ছিল, personal আর complete দিচ্ছিল। আমি জ্ঞান পেতে চাই, আমি এই বিষয়ের সম্বন্ধে জানতে চাই, ভারতে যে total knowledge bank আছে সেখানে আমার অবদান রাখতে চাই, মানুষ যেমন ব্যাঙ্কে টাকা জমা করে, ঠিক তেমনি আমি যে জ্ঞান অর্জন করছি সেটাকে ভারতের knowledge bankএ জমা করে যাব, এই ভাব যদি না আনে তাহলে সে কিন্তু পুরোপুরি extarnalএ অর্থাৎ প্রেয়র মধ্যে পড়ে থাকবে।

সাধারণ লোকেরা উপরের তালিকার ডানদিকের জিনিষগুলির দিকে কখনই দৃষ্টি দেয় না, ওরা impersonal aspect কে দেখে না, personalএর মধ্যে পড়ে থাকে, কখন intrinsicএর দিকে যেতে চাইবে না, সব সময় empericalএর মধ্যেই পড়ে থাকবে। স্বামীজীর সময় ইঙ্গারসোল আমেরিকায় একজন খুব নামকরা বক্তা ছিলেন, ধর্মের বিরুদ্ধে, ভগবানের বিরুদ্ধে প্রচুর বক্তৃতা দিতেন। স্বামীজী যখন আমেরিকায় তখন ইঙ্গারসোলের বয়স হয়ে গিয়েছিল। স্বামীজীর সঙ্গেও তার দেখা হয়েছিল। স্বামীজীকে বলছেন 'দেখো ভাই! এই জগতটাই আমার কাছে সত্য, জগতটা আমার কাছে কমলালেবুর মত। জীবনের উদ্দেশ্য হল এই কমলালেবুর রসের প্রত্যেকটি ফোঁটাকে চুষে নেওয়া'। স্বামীজী শুনে বলছেন 'ঠিকই বলছেন, আমারও জীবনের একই উদ্দেশ্য। তবে আমি ভারতীয় বলে ফলের মধ্যে আমার পছন্দ হল আম, কমলালেবুর জায়গায় আমি আম পছন্দ করব। আমিও আমের প্রতিটি রসকে চুষে নিতে চাই, শেষ ফোঁটা পর্যন্ত। তবে আমার কোন তাড়াহুড়ো নেই, মৃত্যুতেই আমার সব কিছু শেষ হয়ে যাবে না। আমি জানি জগতের সবাই ভগবানেরই এক একটি রূপ, সেই ভগবানের রূপেই আমি সবাইকে দেখি, আর আমি এও জানি, এই জগতে এসেছি, একটু জ্ঞান উপদেশ নিলাম, বিজ্ঞানকে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলাম আর মৃত্যুর পর চলে গেলাম, এটা আমার জীবনের উদ্দেশ্য নয়'। শেষে স্বামীজী বলছেন I want 'why' of everything, I leave the 'how' for children। যে কোন জিনিষের why, এটা কেন এই রকম হয়, এই whyএর জন্য পাগলের মত, উন্মত্তের মত যতক্ষণ না ঝাঁপিয়ে পড়ছে ততক্ষণ জীবনে কোন কিছুই হবে না। একটা বয়সে এসে আমরা এখানে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আসছি। কেন আসছি? আমি জানতে চাইছি শাস্ত্র কি। শাস্ত্রের ব্যাপারে জানার ইচ্ছাটা এসেছে বলেই আমরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আসছি। আমরা এখন whyতে ঢুকে গেছি। কিন্তু স্কুল কলেজে পড়ার সময় howতে ছিলাম। বিষয়ের জ্ঞান আহরণের থেকেও বেশি নজর ছিল পরীক্ষায় নম্বর কিভাবে বেশি পাওয়া যেতে পারে। Why মানে বিষয়ের ভেতরটা। আমি কেন অধ্যয়ন করছি? নম্বর পাওয়ার জন্য, how to get the marks। এখন সর্বক্ষেত্রে শুধু how, টাকা কিভাবে আয় করা যেতে পারে। কিন্তু আমি টাকা কেন আয় করব, টাকা আয় করে কি করব? এই বিচার কেউ করছে না। সবাই পাগলের মত শুধু টাকা আয় করে যাচ্ছে। জীবন আমাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে বলছে তুমি এসো মহৎ হও। আর আমরা প্রত্যেক পদক্ষেপে বলছি আমি নিজেকে শোধরাতে চাই না, আমি নিজেকে জানতে চাই না।

প্রেয় আর শ্রেয় দুটোই টেকনিক্যাল শব্দ যার কোন অর্থ করা যায় না কিন্তু ব্যাখ্যা করা যায়। তবুও ধারণা করার সুবিধার্থে বলা যায় প্রেয় মানে যেটা আমার পছন্দ বা যেটা আমার ভালো লাগে আর শ্রেয় মানে যেটা আমার জন্য ভালো। প্রেয় আর শ্রেয়র মধ্যে এটুকুই তফাৎ। ছেলে আর মেয়ে দুজন দুজনকে ভালোবাসে, মেয়েটির কথা ভাবলেই ছেলেটির মন আনন্দে নেচে ওঠে। এই আনন্দ কোথায় আছে? মেয়েটির মধ্যে যদি আনন্দ থাকত, তাহলে তো সে রসগোল্লার মত হয়ে গেল। রসগোল্লা যার মুখেই দেবে তারই মিষ্টি লাগবে।

এটা ঠিক যে ডায়বেটিস রুগীর পছন্দ হবে না, সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু রসগোল্লার নিজস্ব একটা intrinsic value আছে। একটা মেয়ের কি intrinsic value আছে? না নেই, যে তাকে ভালোবাসে তার জন্যই সে ভালো, সবার জন্য ভালো নয়। আসলে কি? যেটা দিয়ে কোল্ডড্রিঙ্কসের বোতলের ছিপি খোলে, মেয়েটি তাই। ছেলেটির ভেতরে যে ভালোবাসা বোতল বন্দী হয়ে আছে, মেয়েটি সেই বোতলের ছিপিটা খুলে দিতেই বোতল থেকে সব ভালোবাসা হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসছে। আমরা মনে করছি মেয়েটির জন্যই হয়েছে। কিন্তু ভালোবাসা ছেলেটির ভেতরে আগে থেকে আছে বলেই হয়েছে। এখন ছেলেটি যদি মেয়েটিকে ভালোবাসে, এই ভালোবাসা অবশ্যই ভালো জিনিষ, যে অত্যন্ত কর্কশ স্বভাবের ছিল, ভদ্র ব্যবহার জানত না, কিন্তু এই ভালোবাসার জন্য ছেলেটি অনেক নরম হয়ে গেছে, তার জীবনটাই পাল্টে যাচ্ছে। কিন্তু কাউকে ভালোবাসা এটা হল একটা personal aspect, ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই ভালোবাসারই impersonal aspect হল – ভালোবাসা, শুধু ভালোবাসা জিনিষটাই impersonal aspect। শুধু এই ভালোবাসার উপরই যদি নিজেকে কেউ কেন্দ্রিত করে সে মহৎ হয়ে যাবে।

জেলে বন্দী থাকাকালীন গান্ধীজীর উপর তদানিন্তন ইংরেজ সরকারের গভর্নর জেনারেল প্রচুর নির্যাতন করেছিলেন। সেই গভর্নর জেনারেল যখন ভারত থেকে চলে যাচ্ছেন সেই সময় গান্ধীজী তাঁকে একটি চিঠি লেখেন, গান্ধীজীর পত্রাবলীর মধ্যে এটি একটি বিখ্যাত চিঠি। গান্ধীজী চিঠিতে তাঁকে বলছেন, 'আপনি ভারত থেকে চলে যাচ্ছেন শুনলাম। ভারত ছেড়ে আপনি ইংল্যাণ্ডে চলে যাচ্ছেন, একদিন ভারতের লোকেরা হয়ত আপনাকে ভুলে যাবে, কিন্তু কখন যদি আপনার ভারতের কথা মনে পড়ে আপনি জানবেন ভারতে আপনার একজন বন্ধু আছে, সেই বন্ধুটি হলাম আমি। তবে এই চিঠি জেলে বসে যখন আপনাকে লিখছি তখন আমি বুকের ভেতর প্রচণ্ড বেদনা নিয়ে লিখছি, কারণ আপনি মিথ্যাকে আশ্রয় করেছিলেন। আপনার এই মিথ্যার আশ্রয় নেওয়াকে আমি মন থেকে কিছুতেই সরাতে পারছি না। যদিও আপনাকে আমি ভালোবাসি কিন্তু এই জিনিষকে আমি কোন দিন ভুলতে পারব না যে, আপনি একদিন মিথ্যার আচরণ করেছিলেন'।

আমাদের জীবনে গান্ধীজীর মত দৃষ্টান্ত খুবই কম। স্বদেশী আন্দোলন, সত্যাগ্রহের সাথে উনি যখন খাদি নিয়ে আন্দোলন করছিলেন তখন ভারতবাসীকে বিদেশী বস্ত্র বর্জন করতে বলেছিলেন। উনি সেই সময় একবার সেকেণ্ড রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে ইংল্যাণ্ড গেলেন। স্বদেশী আন্দোলন, খাদি আন্দোলনের ফলে ভারতে বস্ত্রের রপ্তানী বন্ধ হয়ে যাওয়াতে ইংল্যাণ্ডের কটন মিলসের অনেক লোকের চাকরি চলে গিয়েছিল। শ্রমিকরা গান্ধীর নাম শুনলেই উত্তেজিত হয়ে উঠত। গান্ধীজী ইংল্যাণ্ডে গিয়ে বললেন আমি ওদের সাথে দেখা করতে যাব। ওখানকার প্রশাসন থেকে নিষেধ করা হচ্ছে, ওদের মধ্যে আপনি যাবেন না, আপনাকে ওরা খুন করে দিতে পারে। গান্ধীজী বলছেন 'তা কেন হবে! আমি তো আমার দেশের সেবা করছি, ওদের সাথে তো আমার কোন বিবাদ নেই, ওদের সবার প্রতি আমার ভালোবাসা আছে, ওদের দুঃখে আমি অংশীদার হতে চাই'। গান্ধীজী শেষ পর্যন্ত গেলেন। ওদেরও প্রথমের দিকে গান্ধীজীর প্রতি প্রচণ্ড রাগ ছিল – এই লোকটির জন্য আজ আমরা অভুক্ত, পরিবারকে খাওয়াতে পারছি না। গান্ধীজী ওদের বোঝালেন 'ভাই! তোমরা বোঝার চেষ্টা কর আমার দেশের কি দুরবস্থা। আমাকে তো আমার লোককেও দেখতে হবে। আমি তোমাদেরও ভালোবাসি আর আমার দেশকেও ভালোবাসি'। শেষে দেখা গেল ল্যাঙ্কাশায়ারে যত কটন মিলস ছিল তার সব শ্রমিকরা গান্ধীজীর অনুরাগী হয়ে গেল। গান্ধীজীও ভালোবাসছেন, কিন্তু এই ভালোবাসাটাই impersonal। আমাদের নেতাদের জিজ্ঞেস করুন, আপনি কী চাইছেন? আপনি সত্তা চাইছেন নাকি দেশকে ভালোবাসতে চাইছেন? সত্তার কখনই intrinsic value নেই। ক্ষমতা দিয়ে কিছু জিনিষ হয়, তার মধ্যে নিজের অহং তুষ্টি অন্যতম। এই অহং তুষ্টি দিয়ে আপনার কি হবে? সত্তা দিয়ে মানুষের কিছু সেবা করা যায়, তাছাড়া আর কিছু না। রাজনীতির মাধ্যমে আপনি যদি দেশ সেবা করতে চান, তখন কে মুখ্যমন্ত্রী হল আর কে মুখ্যমন্ত্রী হল না, তাতে কি আসে যায়! আপনার ভেতরে যদি সত্যিকারের সেবার ভাব থাকে তাহলে ভোটের সময় বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমাকে ভোট দিন, কখনই আপনাকে বলতে হবে না। ১৯২০ সালে চৌরিচরার মত কিছু ঘটনার সময় গান্ধীজী বলে দিলেন দেশ এখনও এই স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত নয়। সেই সময় তিনি নিজেকে সব কিছু থেকে গুটিয়ে আশ্রমে থাকতে শুরু করে দিলেন। দশ বছর তিনি চুপচাপ ওখানেই পড়ে থাকলেন, সবাই ভাবলো রাজনীতিতে গান্ধীজী শেষ। ১৯৩০ সাল আসার পর চারিদিকে এক চরম অবস্থা শুরু হয়ে গেল, কংগ্রেস

নেতারা গান্ধীজীকে টেনে বার করে আনলেন, আপনাকে আমাদের খুব প্রয়োজন। পরের ইতিহাস আমাদের সবারই জানা, আর কারুর দম নেই যে গান্ধীজীর সামনে দাঁড়াতে পারে। আপনিও এই রকম সাধনা করুন, সমাজ এসে বলবে আমাদের আপনাকে দরকার আপনি আসুন। আর নেতারা বলে যাচ্ছেন ভোট দিন ভোট দিন। কেন ভোট দিন বলতে হবে! কারণ আপনার তো সেবা উদ্দেশ্য নয়, আপনার উদ্দেশ্য হল সত্তা। সত্তা মানেই উপরের তালিকার বাঁ দিকের empirical, external, personal, small আর how এই জিনিষগুলিতে নেমে যাওয়া। এগুলোতে নেমে যাওয়া মানে, সব সময় মনের মধ্যে এক চিন্তা কিভাবে আমাকে সত্তা কব্জা করতে হবে, লোককে কিভাবে বোকা বানিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু এরপর সত্তা নিয়ে আপনি কী করবেন? আপনি whyতে যেতে চাইছেন না। আপনি বলছেন সত্তা পেলে আমি সেবা করব। সেবা তো আপনি এমনিও করতে পারেন। ইয়ং সন্ন্যাসীদের বড়রা এই শিক্ষায় দেন, যখন কাজ করবে তখন কাজের মাধ্যমে ভগবানকে পাওয়ার চেষ্টা করে যাবে, আর যখন কাজ থাকবে না তখন সরাসরি ভগবানকে পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। একটা হল মাধ্যম, আরেকটা হল সরাসরি। সত্তায় যখন আছি তখন সত্তার মাধ্যমে মানুষকে সেবা করে যেতে হবে, যখন সত্তায় নেই তখন সরসারি মানুষের সেবায় নিজেকে পুরোপুরি ঢেলে দিতে হবে। সেবা করতে তো কেউ আপনাকে বাধা দেবে না। সবাই তো সেবা চাইছে। সেবা যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে সত্তা থাকুক আর নাই থাকুক তাতে কী এসে যায়!

আয়ান র‍্যাণ্ডের বিখ্যাত উপন্যাস ফাউন্টেনহেডের কাহিনীতে দেখাচ্ছেন একটি ছেলে আর্কিটেক্ট কলেজে ভর্তি হয়েছে শুধু জানার জন্য আর্কিটেক্ট বিষয়টা কি। ঐ ক্লাশেই আরেকজন ছাত্র যে কলেজের টপার, সে জানে এই ছেলেটি আমার থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ। ছেলেটি পরীক্ষা দেয়নি বলে তাকে ফেল করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর দুজনকে পাশাপাশি রেখে উপন্যাসের কাহিনী এগিয়ে গেছে। ছেলেটির কেরিয়ারের দিকে কোন নজরই নেই, তার নজর শুধু নলেজের উপর। এটাই, personal aspect আর impersonal aspect, how আর whyএগুলোকে নিয়ে বিচার করা। ঠাকুর লাট সাহেবের বাড়ি দেখে বলছেন ইটির ঢিপি, সন্দেশ গলার নীচে গেলে আর কিছুই নেই, এটাই intrinsic। কিন্তু আমরা intrinsicকে ছেড়ে empirical এ নেমে যাচ্ছি। তাই বলে কি empericalএর কোন দরকার নেই? অবশ্যই আছে, কারণ আমাদের অস্তিত্ব দাঁড়িয়ে আছে শরীরকে কেন্দ্র করে, শরীর রক্ষার জন্য কিছু জিনিষের দরকার, ঠাকুর বলছেন শহরে থাকতে গেলে যেমন ট্যাক্স দিতে হয়, এগুলো হল সেই ট্যাক্স, শব সাধনায় শবের মুখে মাঝে মাঝে চালভাজা দেওয়া।

জীবনের যে কোন পরিস্থিতিতে, মানুষের সাথে মেলামেশা করছি, কোন কিছু কিনছি, কোন কাজ করছি, যা কিছুই করছি সর্বদা এগুলোকে বিচার করতে হয়। আমি এটা কেন করছি, এই জিনিষটার আমার জীবনে সত্যিই কোন প্রয়োজন আছে কিনা, আমার জীবনের উদ্দেশ্যটা কি, সেই উদ্দেশ্যে এর কতটা স্থান, এইভাবে বিচার করলে আমরা দেখতে পাব কত আবর্জনা আমরা বহন করে চলেছি। এটাকে নিয়েই এখানে যমরাজ তাঁর সংলাপ শুরু করছেন। এতক্ষণ যমরাজ নচিকেতাকে যাচাই করে নিলেন ওর সেই ক্ষমতা আছে কিনা। *নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে*, নচিকেতা এই বর ছাড়া অন্য কোন বর চায় না। তাহলে নচিকেতা কি চাইছেন? *যোহয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো*, যেটা একেবারে দুর্বিজ্ঞেয় আত্মবস্তুর সাথে ভেতরে প্রবেশ করে আছে, এছাড়া নচিকেতা কিছু চায় না। নচিকেতাকে পরীক্ষা করা হয়ে গেছে। এবার বিদ্যা আরম্ভ হবে। বিদ্যারম্ভের আগে যমরাজ বিদ্যার ভূমিকা দিতে গিয়ে শ্রেয় আর প্রেয় এই দুটো জিনিষকে বলে দিচ্ছেন, তার সাথে দেখাচ্ছেন শ্রেয় আর প্রেয় এই দুটোকে নিয়ে মানুষ কিভাবে গোলমাল পাকিয়ে দেয়।

প্রেয় সব সময় মানুষকে বাঁধে আর শ্রেয় সব সময় মানুষকে মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। জীবনে যত দুঃখ, যত চোখের জল, মনে যত হতাশার ভাব, দুশ্চিন্তাজনিত যত অনিদ্রা, এর সবের মূলে উপরের তালিকার বাঁ দিকের জিনিষগুলো। যারই জীবনে এই ধরণের কিছু আছে, বুঝতে হবে সে প্রেয়কেই বেছে নিয়েছে। অথচ তখনও প্রেয়র সাথে শ্রেয়ও তার কাছে এসেছিল, কিন্তু শ্রেয়কে ছেড়ে প্রেয়কেই বরণ করেছে। ডান দিকের জিনিষগুলো আমাদের সব সময় শুধু আনন্দই দেয়। আর বাঁ দিকের জিনিষগুলি আমাদের সুখ দেয়। কতক্ষণ সুখ দেয়? যতক্ষণ জিনিষগুলো কাছে থাকে। বাঁ দিকের জন্য শ্রেষ্ঠ পুরুষেরও চোখে জল আসে, তাঁদেরও প্রেয় দরকার, কিন্তু দ্বিতীয়বার চোখের জল ফেলবেন না। গুডউইন মারা যাওয়ার পর স্বামীজীও চোখের জল

ফেলছেন, স্বামীজীর কাজের জন্য প্রেয়রও দরকার, কিন্তু impersonal aspectএ এর কোন মূল্য নেই। অক্ষয় মারা যাওয়ার পর ঠাকুরও চোখের জল ফেলছেন। ডান দিকের জিনিষগুলিই ঠিক ঠিক ধর্মের দিকে নিয়ে যায়, বাঁ দিকের জিনিষগুলো জাগতিক জ্ঞান দেয়।

প্রেয় আর শ্রেয় এক অপরকে জড়িয়ে আছে, তাই যখন আসে তখন একসাথেই আসে। শ্রেয়কে ছেড়ে প্রেয়কে বরণ করা মানে, বাজারে গিয়ে বেশি দাম দিয়ে একটা নিকৃষ্ট মানের জিনিষকে বাড়িতে নিয়ে আসা। জীবনে আমরা সব সময় তাই করে যাচ্ছি। গয়নার দোকান থেকে বহু মূল্যের একটা ছোট্ট ডায়মণ্ড রিং কিনলাম। তার বাক্সটা বিশাল আর বাইরের চাকচিক্য অনেক বেশি। বাক্সের চাকচিক্যে আকৃষ্ট হয়ে আমরা ডায়মণ্ডের রিং ফেলে ওর বাক্সটা বাড়ি নিয়ে আসছি। আগেকার দিনে দেওয়াল ঘড়ি সস্তা ছিল। এক মহিলা ঘড়ির দোকানে গিয়ে একটা দেওয়াল ঘড়ি কিনেছে। তখনকার দিনে কিছু কিনলে একটা কিছু ফাউ দিত। এখনও সব্জিওয়ালার কাছ থেকে অনেক আনাজ কিনলে ধনেপাতা ফাউ দিয়ে দেয়। বড় ঘড়ি কিনেছে, তাকে ফাউ দিতে হবে। মহিলা দোকানদারকে বলছে এত বড় ঘড়ি কিনলাম একটা ছোট ঘড়ি ফাউ দিন। দোকানদার বলছে – কী বলছেন! দেওয়াল ঘড়ির দাম একশ টাকা আর ছোট রিস্টওয়াচের দাম পাঁচশ টাকা। মহিলা ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে। আমাদের ক্ষেত্রেও তাই হয়, আমরা শ্রেয়কে ফেলে প্রেয়কে পেতে চাইছি। ছোট্ট রিস্টওয়াচকে ফাউ মনে করছি, দামী ডায়মণ্ড রিং ফেলে তার বাক্স নিয়ে লাফাচ্ছি। এটাই শ্রেয় আর প্রেয়র তফাৎ। প্রেয়ও জীবনে দরকার। কিন্তু যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা শ্রেয়কে আধার করেই জীবন চালান। প্রেয়কেও জীবনে দরকার কিন্তু তাই বলে বেশি গুরুত্ব নেই। তবে প্রেয় থেকে শ্রেয়র পথে এই যাত্রা খুব কঠিন। শ্রেয় আর প্রেয় এর যে শুধু একটা আধ্যাত্মিক দিক আছে তা নয়, জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপে এর উপযোগিতা আছে। মানুষ যত প্রেয়কে ছেড়ে শ্রেয়র দিকে চলে আসবে তত তার জীবন তাৎপর্যময় হয়ে উঠবে, তত জীবন সহজ হতে থাকবে। খুব সহজ ভাষায় প্রেয় হল যে জিনিষগুলি আমার ভালো লাগে, আর শ্রেয় মানে যে জিনিষগুলি আমার জন্য ভালো। দ্বিতীয় বল্লীর প্রথম দিকের কয়েকটি মন্ত্রে এই শ্রেয় আর প্রেয়কে নিয়ে বলছেন।

এরপর যমরাজ নচিকেতাকে যা যা বলবেন, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি না হলে এগুলোকে ধারণা করা যাবে না। তবে জীবনের সমস্ত রকম ঘাত-প্রতিঘাতকে সহ্য করে যদি এই চর্চার মধ্যেই সব সময় পড়ে থাকা যায়, তখন ভেতরে ভেতরে কোথাও না কোথাও তার একটা সদাত্মক বিবর্তন শুরু হয়ে যাবে। বিচারধারা যত উন্নত হতে থাকবে ততই অবাক লাগতে থাকবে, এটাই পরে যমরাজ বলবেন *আশ্চর্যো বক্তা*। আশ্চর্য না লাগাটাই আশ্চর্যের কারণ এই বৃহৎকে ধারণা করার পর মনে হয় এই বৃহৎকে ধারণা করা কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু তার আগে এই শ্রেয় আর প্রেয়র বিচিত্র খেলাটা ধারণা করার পর জীবনকে প্রেয় থেকে সরিয়ে এনে শ্রেয়র দিকে নিয়ে যাওয়ার যাত্রাটা শুরু করতে হবে। শ্রেয় আর প্রেয় শুধু শব্দ মাত্র নয়, শ্রেয় আর প্রেয়র একটা আলাদা perspective আছে, সমগ্র জীবনকে একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্ররূপে যতক্ষণ না নেওয়া হবে ততক্ষণ এর কোন কিছুই মনে স্পষ্ট রেখাপাত করবে না।

তবে এখানে একটা জিনিষ আমাদের খুব ভালো করে জেনে রাখা দরকার, শ্রেয় প্রেয়র সাথে সাকার নিরাকার ধ্যানের কোন সম্পর্ক নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় সাকার নিরাকারে কোন তফাৎ করা হয় না। উত্তরাখণ্ড এবং অন্যান্য অনেক জায়গায় অনেক সাধু মহাত্মা, পণ্ডিতরা এই নিয়ে অনেক তর্কাদি করেন। কিন্তু আচার্য শঙ্করের গীতার ভাষ্য যদি ঠিকমত অধ্যয়ন করা হয় আর পরে কথামৃত ও স্বামীজীর রচনাবলী যদি ঠিক ভাবে পড়া থাকে তাহলে দেখা যাবে এনারা কেউই সাকার ও নিরাকারকে দুটো আলাদা কিছু বলছেন না। যিনি সাকারের ধ্যান করছেন তাঁকে সাকার থেকে কখনই নিরাকারে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না, আবার যিনি নিরাকারের ধ্যান করছেন তাঁকেও নিরাকার থেকে মনকে সরিয়ে সাকারে নিয়ে আসারও কোন প্রয়োজন নেই। এই জিনিষটার উপর আমরা এর আগেও কিছুটা আলোকপাত করেছিলাম।

অনেকের একটা ভুল ধারণা যে সগুণ সাকার সাধনা নির্গুণ নিরাকার সাধনা থেকে নিকৃষ্ট। দ্বিতীয় বর নিয়ে যখন আলোচনা চলছে তখন আচার্য শঙ্কর বলছেন, যিনি হিরণ্যগর্ভের সাথে এক হয়ে যান তাঁর পূণ্য শেষ হয়ে গেলে তিনি আবার ফেরত চলে আসেন। হিরণ্যগর্ভ আর বর্তমান কালের সগুণ ঈশ্বর ধারণার মধ্যে একটা সমান ভাব আছে। সমান ভাব থাকলেও একটা বড় পার্থক্যও আছে। যেমন কেউ একশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ

করেছেন তিনি এখন হিরণ্যগর্ভের সঙ্গে এক হবেন অর্থাৎ এই জগতের যিনি সর্বোচ্চ প্রকাশ তাঁর সাথে এক হবেন। কিন্তু ধীরে ধীরে পূণ্য ক্ষয় হয়ে যাওয়ার পর আবার তাঁকে এসে জন্ম নিতে হবে, গীতায় ঠিক এই কথাই বলছেন *ক্ষীণে পূণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*। কিন্তু যিনি সাকার সাধনা করছেন তিনি তাঁর ইষ্টের সঙ্গে এক হয়ে যাবেন, তিনিও তত দিনই ইষ্টের সাথে এক হয়ে থাকবেন যত দিন এই সৃষ্টি থাকবে। সৃষ্টির নাশ হয়ে গেলে তাঁরও মুক্তি হয়ে যাবে। এখানেই সাধনার সিদ্ধি তিন রকম হয়ে গেল – এক যিনি আত্মজ্ঞান পেয়ে গেলেন তাঁর সেখানেই মুক্তি হয়ে গেল, দুই অশ্বমেধ যজ্ঞ করে বা নাচিকেত অগ্নি চয়ন করে ব্রহ্মলোকে প্রাপ্তিকে যদিও মৃত্যুর পারে বলছেন, কিন্তু এই অমৃত আপেক্ষিক। তৃতীয় সগুণ সাকার সাধনার সিদ্ধির কথা আগে বলা হল। সগুণ সাকার মানে ঈশ্বরকে একটা বিশেষ রূপে ভালোবাসা। নিরাকার সাধনা অনেক দূরে তার আগে ঈশ্বরকে একটা বিশেষ রূপে ভালোবাসাটা কি জিনিষ হতে পারে এই ধারণা করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ জীবনে আমরা কাউকে ভালোবাসা দূরে থাক, ভালোবাসাটা যে কি জিনিষ সেটাই জানিনা।

জীবনে এমন কাউকে কি আমরা ভালোবাসতে পেরেছি যে বলতে পারছি, ভাই! তোমাকে আমি ভালোবেসেছি, তোমার জন্য আমি আমার জীবনের সব কিছু দিয়ে দিচ্ছি, তোমার জন্য আমি living death হয়ে যেতে চাই, আমার মান, সম্মান, কুল, শীল, মর্যাদা সব তোমার জন্য ছেড়ে দিচ্ছি। সারা জীবনের জন্য বলতে হবে না, দশ মিনিটের জন্য খুব জোর একদিনের জন্য বলতে হবে, ভাই তোমাকে আমি ভালোবেসেছি, তোমার জন্য জগতের সমস্ত রকম বিষম পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে রাজী আছি। তাই না, তোমার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য তোমাকে ভালোবাসছি না, আমি তোমাকে শুধু ভালোবাসি, প্রতিদানে আমি কিছুই পেতে চাই না। এবার নিজের বুকে হাত রেখে কি বলতে পারব কাউকে এই ভাবে আমরা ভালোবাসতে পেরেছি কিংবা পারব? জাগতিক ভালোবাসার ব্যাপারেই আমাদের কোন ধারণা নেই সেখানে ঈশ্বরের প্রতি বিশেষ ভালোবাসার কী আর ধারণা হবে! জগতে এই রকম কাউকে ভালোবেসেছে আর ভালোবেসে বেদম মার খেয়ে খেয়ে জীবন যার বিধ্বস্ত হয়ে গেছে তবুও সে ঐ ভালোবাসা ছাড়ছে না, এই কঠোর দুর্বিষহ পরিস্থিতির মুখোমুখি যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ তার পক্ষে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা কি জিনিষ কোন দিন ধারণা হবে না, ঈশ্বরের প্রতি এই ভালোবাসার ধারণা না থাকলে সগুণ সাকার সাধনা কি জিনিষ সেটাও ধারণা করতে পারবে ন।

ইংল্যাণ্ডের রাজপরিবারের নিয়ম হল রাজপরিবারের যিনি রাজা হবেন তিনি যদি তাঁর স্ত্রীকে ডিভোর্স দিয়ে দেন তাহলে তিনি আর রাজা হতে পারবেন না। ১৯৩০ সালের একটা ঘটনা। যিনি রাজা হবেন তিনি একটি মেয়েকে ভালোবেসেছিলেন। ইনি নিজের স্ত্রীকে ডিভোর্স দিয়ে মেয়েটিকে বিয়ে করলেন। বিয়ে করা মানে ওনাকে রাজপরিবারের সব কিছু ছেড়ে দিতে হবে। তখনকার দিনে ইংল্যাণ্ড সারা বিশ্ব জুড়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে, বলাই হত ইংরেজের রাজ্যে সূর্যাস্ত হয় না। একটা মেয়ের জন্য তিনি এই সাম্রাজ্য ছেড়ে দিলেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর স্মৃতিকথায় একটা ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীকে একজন সাধু বলছেন 'মহারাজ! লোকটি কী লম্পট দেখুন। একটা মেয়ের জন্য এত বড় সাম্রাজ্য ছেড়ে দিল'! শুনে বিজ্ঞানানন্দজী বলছেন 'যে আজকে একটা মেয়ের জন্য সব কিছু ছেড়ে দিতে পেরেছে সেই লোকটি আগামীকাল ঈশ্বরের জন্য এই মেয়েটিকেও ছেড়ে দেবে। লোকটির ত্যাগ দেখ'! গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান বলছেন *শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ ধ্যানং বিশিষ্যতে*, কর্মফলের ত্যাগ হল সর্বশ্রেষ্ঠ, সেখানে আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে বলছেন কর্মফল ত্যাগ কখনই সংসার ত্যাগের থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না, তবে ত্যাগের সমানতার জন্য এখানে ত্যাগের স্তুতি করা হচ্ছে। কারণ তুমি তো কিছুই ত্যাগ করতে চাইবে না, ঠাকুর বলছেন কাউকে এখানে প্রস্বাব করতে বললে প্রস্বাব করবে না পাছে অপরের ভালো হয়ে যাবে, সেখানে তুমি যদি কর্মফল ত্যাগ কর তুমি তো অনেকখানি এগিয়ে গেলে। এখানে শ্রেয় আর প্রেয়র কথা বলতে গিয়ে বলা হচ্ছে, একজন মানুষের মধ্যে দয়ার ভাবই নেই, করুণার লেশ মাত্র নেই, সেই মানুষের যদি একটি সন্তান হয়ে যায় আর সেই সন্তানকে যদি সে ভালোবাসতে শুরু করে, তাহলে যেখানে কিছুই হচ্ছিল না, এবার একটু কিছু তার হল। এটা একেবারেই নিন্দনীয় নয়। এগুলোকে আমরা যেন ভুল না বুঝি। ঠাকুর সেইজন্য বারবার বলছেন তোমরা শুষ্ক জ্ঞানী হতে যেও না। তোতাপুরী বেদান্তের বড় বড় কথা বলে যাচ্ছেন, আর তাঁর ধুনী থেকে একজন টিকে ধরাবার জন্য একটু আগুন নিতে গেছে তাকে তিনি চিমটে দিয়ে মারতে যাচ্ছেন। কোন মা কি নিজের সন্তানকে কখন এভাবে মারতে যাবে! হয়ত একটু বকে ঝকে দেবে। এখানে তিনি শুষ্ক জ্ঞানে নেমে গেছেন, নিজের টুকু

ছাড়া আর কিছু বোঝেন না। নিজের সর্বনাশের যে শেষ কিনারা হতে পারে সেখানে গিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে গেছেন। ইংরাজীতে একটা নামকরা কথা আছে It is better to have loved and lost than to have never loved someone। শাস্ত্র কখনই এই ধরণের কথা বলবে না, অবশ্যই সবাইকে ভালোবাসতে হবে। কিন্তু এই যে এখানে someone করে দিচ্ছে, এই যে personalized করে দিচ্ছে সেখান থেকে যে ভালোবাসাটা ভেতরে impersonal রয়েছে সেটার উপর জোর দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। ভারত পাকিস্থানের ক্রিকেট ম্যাচ হচ্ছে, ভারতের লোকরা চাইবে ভারত জিতুক, এটা হল personal aspect কিন্তু এর impersonal aspect হল ক্রিকেটকে ভালোবাসা। প্রেয় মানে personal aspectকে ভালোবাসা, শ্রেয় মানে impersonal aspectকে ভালোবাসা।

সেইজন্যই বলা হচ্ছিল, সাধারণ মানুষের ভালোবাসার কোন ধারণাই নেই, অভিজ্ঞতা না থাকলে বুঝতে পারবে না। একবার যাকে ভালোবেসেছি এরপর আমি তাকে সব কিছু দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। সব কিছু মানে কি শুধু জীবন? তা নয়, আমার মান, সম্মান, মর্যাদা, কুল, শীল, সম্পদ, ভালো, মন্দ সব কিছু। তার বিনিময়ে আমি কিছু চাই না। এই ভাব যদি কারুর হয়ে থাকে, দশ মিনিটের জন্যই যদি হয়ে থাকে বা যদি জীবনে আমরা কাউকে এই রকম দেখে থাকি বা কোন সিনেমা নাটকে এই রকম ভালোবাসা যদি দেখে থাকি আর যে দেখাটা তার হৃদয়কে সত্যিকারের নাড়া দিয়ে গেছে তখন সে বুঝতে পারবে সগুণ সাকার সাধনা কি জিনিষ। সগুণ সাকারে যিনি ঠাকুরকে ভালোবেসেছেন, যিনি কৃষ্ণকে ভালোবেসেছেন তাঁর কাছে সালোক্যও যা সারূপ্যও তাই। সালোক্য, সারূপ্য আমাদের কাছে এখন শব্দ মাত্র, আমরা ভাবছি সালোক্য সারূপ্য মানে বেলুড় মঠ আছে বেলুড় মঠে গিয়ে বাস করা। এর মত মুর্খ ধারণা আর কিছু হয় না। ঐ ভালোবাসা! যেখানে তিনি বলছেন – হে ঠাকুর! তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই, আমি তো নিজেকে তোমায় দিয়ে দিয়েছি। এরপর তাঁর কাছে মুক্তি, ভক্তি এগুলোর কোন মূল্যই থাকে না। ঠাকুরের প্রতি এই রকম ভালোবাসা হওয়ার আগে আমরা যা কিছু বলছি, মুক্তি, ভক্তি, সালোক্য, সারূপ্য সব শব্দ মাত্র। এক্ষুণি যমরাজ বলবেন *তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ*, মুক্তির ইচ্ছা এটাও বন্ধন, এখনও অজ্ঞানের মধ্যে পড়ে আছে। তাই না, সগুণ সাকার সাধনা এটাও অজ্ঞান আবার নিরাকার সাধনা এটাও অজ্ঞান। আমাদের কাছে এগুলো শব্দ মাত্র।

মহাপুরুষ মহারাজের জনৈক শিষ্য তাঁর স্মৃতিকথায় লিখছেন, মহাপুরুষ মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়ার পর গুরু যেমন যেমন বলে দিয়েছেন সেই অনুসারে তিনি সাধন-ভজন করে যাচ্ছেন। মাঝখান থেকে হঠাৎ ওনার এক গোঁড়া বৈষ্ণব আত্মীয় তাঁকে বোঝাতে শুরু করল 'স্কুল কলেজে যেমন অনেক রকম ডিগ্রী হয়, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক হয় তারপর গ্রাজুয়েট, পোস্ট গ্রাজুয়েট ইত্যাদি, আধ্যাত্মিক জগতেও বিএ এমএ হয়। এই যে তুমি ঠাকুরের মন্ত্র জপ করছ, ঠাকুরের সাধনা করছ আসলে এগুলো নিম্ন শ্রেনীর সাধনা, কৃষ্ণ সাধনাই শেষ কথা। তোমার প্রস্তুতি হয়ে গেছে, এবার তুমি ঠিক জায়গায় গিয়ে কৃষ্ণ মন্ত্র নিয়ে সাধনা শুরু করু'। উনি স্মৃতিকথায় লিখছেন 'আমি জানি না কোনটা নিকৃষ্ট সাধনা আর কোনটা উৎকৃষ্ট সাধনা। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা করাটা হয়ত নিকৃষ্ট আর কৃষ্ণের সাধনা করাটা উৎকৃষ্ট, কিন্তু আমি ঠাকুরকে ভালোবেসেছি এরপর ঠাকুর নিকৃষ্ট হন তাও এখানেই মরতে চাই, ঠাকুর উৎকৃষ্ট হন তাও এখানেই মরব'। ঠাকুরের ভক্ত এটাই বলতে চাইছেন, আমার আর কিছু লাগবে না, আমি আমার সব কিছু ঠাকুরকেই দিয়ে দিয়েছি। আমি ঠাকুরের মুরগী, ঠাকুর এবার আমাকে সামনে দিয়েই কাটুন আর পেছন দিয়েই কাটুন, আমার কাছে সবটাই এক।

সগুণ সাকার সাধনা মানে এটাই। যাদের হৃদয়ে গভীর ভালোবাসা বা প্রেম নেই তাদের জন্য ভক্তি সাধন নয়। সগুণ সাকার ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হওয়ার আগে হৃদয়ে প্রেমের আগুন জ্বলতে হবে বা কোন মানুষের জন্য একটা সময় ভেতরে প্রচণ্ড ছটফটানি হওয়া চাই। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের প্রেমের এই ছটফটানির বর্ণনা আছে। গোপীরা সবাই অশিক্ষিত, গ্রাম্য মেয়ে, শ্রীকৃষ্ণকে কৃষ্ণ রূপেও ভালোবাসেনি, কাম বাসনা দিয়ে, দেহের দৃষ্টিতেই ভালোবেসেছিল। গোপীরা আগের জন্মে বেদের ঋচা ছিলেন, ঋষি ছিলেন এগুলো পরের দিকে বলা হচ্ছে, কিন্তু মূল ভাগবতে এসব কথা একবারও বলছেন না, বলছেন গোপীরা জার ভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবেসেছিল, পতি রূপেই তাঁকে পেতে চেয়েছিল। শুকদেব বলছেন ভগবানকে জার রূপেও যদি কেউ ভালোবাসে তাতেও তার মঙ্গলই হয়। কোন মানুষের প্রতি যদি কারুর গভীর ভালোবাসা হয়

তখন এই ভালোবাসাই তাকে personal থেকে impersonalএ নিয়ে যায়। মেয়েরা কত চঞ্চল, কিন্তু যেমনি বিবাহের পর কোলে সন্তান এসে যায়, তখন সন্তানকে সে এমন ভালোবাসে যে তার ব্যক্তিত্বটাই নরম হয়ে যায়, ভারতবর্ষে মাতৃত্বকে তাই এত সম্মান দেওয়া হয়। সন্তানের প্রতি personal ভালোবাসা থেকে তার impersonal ভালোবাসা তৈরী হয়ে যায়। যদিও impersonal পুরোপুরি হয় না, মাঝামাঝি একটা জায়গায় থাকে। বেশির ভাগ মানুষের মধ্যে প্রেমের কোন ধারাই নেই, না আছে দৃশ্য ধারা, না আছে অদৃশ্য ফল্গু নদীর অন্তঃসলিলার ধারা। আর আমাদের না আছে সেই বিবেক, না আছে সেই পবিত্রতা, জ্ঞান সাধনও তাই আমাদের জন্য সুদূর পরাহত। অন্য দিকে ভুক্ত খাদ্য হজম করতে পারি না, যোগ সাধনা করবে কার সাধ্য! সেইজন্য আমাদের জন্য কর্ম, কর্ম ছাড়া কিছু নেই। কর্ম মানে, যা কর্মই করি না কেন সব কর্মের মাধ্যমে ঠাকুরের সেবা করা। ঠাকুর বারবার বলছেন খাটো, খাটতে থাক, স্বামীজী তাই সেবাকার্যের প্রবর্তন করলেন।

আর ঈশ্বরের ধারণা কতটুকু? বেলুড় মঠের মন্দিরে ঠাকুর আছেন, ঠাকুর ঈশ্বরের অবতার। ওখানেই ঈশ্বরের ধারণা শেষ। বেলুড় মঠে ঠাকুর আছেন, বেলুড় মঠের বাইরে কি ঠাকুর নেই? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত রূপ আছে সব রূপ তো ঠাকুরেরই রূপ। আগামীকাল যার সিদ্ধি হয়ে যাবে সে তো এটাই দেখবে। হিন্দু ধর্মে সাধনা আর সিদ্ধির মধ্যে কোন তফাৎ নেই, সাধনা যা সিদ্ধিও তাই। আমি যদি ঠাকুরকে দেখি বেলুড় মঠের মন্দিরের গর্ভগৃহে তিনি মুর্তি হয়ে বসে আছেন। সাধনার শেষে আমার সিদ্ধিও ঠিক তাই হবে, এর বাইরে কোন সিদ্ধিই হবে না, জন্মজন্মান্তর এটাই দেখতে থাকব ঠাকুর বেলুড় মঠের মন্দিরে বসে আছেন। এর বাইরে শাস্ত্রে যত রকম সিদ্ধির বর্ণনা আছে তার কোনটাই আমার কোন দিন হবে না। তাহলে ঠাকুরকে কিভাবে দেখতে হবে? ঈশ্বরের ঠিক ঠিক বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রুতি বলছেন *ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমান্ অসি ত্বং উত বা কুমারী। ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।।* হে ভগবান! তুমিই নারী তুমিই পুরুষ। আমরা কি ঠাকুরকে কখনো এভাবে দেখি বা দেখার চেষ্টা কোন দিন করেছি, রাস্থার ধারে যে ভিখারী কাঙালীরা পড়ে আছে, এরাও সবাই এক একটা ঠাকুরেরই রূপ? আমাদের কারুর ভেতরে কি করুণার উদ্রেক হচ্ছে এই ভেবে যে, হে ঠাকুর! তুমি এই রূপেও বিচরণ করছ? যদি দেখি, তাহলে শাস্ত্রে বর্ণিত ঠাকুরের যে রূপ সেই রূপকে সিদ্ধিতে দেখতে পাব। যে ভাব নিয়ে আমরা চলেছি ঐ ভাবকেই আমরা পাব, ঐ ভাবটাই পাকা হয়ে গিয়ে বসে যাবে, ওর বাইরে আর কিছু পাবে না। আমাদের একটা বিচিত্র ধারণা হয়ে আছে, তুমি পড়াশোনা কর নম্বর পাবে, নম্বরের ফল চাকরি পাবে, চাকরির ফল মাসের শেষে কটি টাকা পাবে, টাকার ফল একটা ঘর সংসার হবে। আধ্যাত্মিক জীবনে এভাবে কিছু হয় না। আধ্যাত্মিক জীবনে ক্রিয়া, কারক আর ফলের কোন আলাদা অস্তিত্ব নেই। এই কাজ আর এই তার ফল এই নিয়ম আধ্যাত্মিকতায় কোন দিনই প্রযোজ্য হবে না। ভক্তি করলে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে? কখনই পাওয়া যাবে না। যার যা ভাব তার তা লাভ।

ঈশ্বরকে আমরা যেভাবেই দেখে থাকি না কেন, আমাদের বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরকে যেভাবে বুঝছি সেই ভাবে কি আমরা জীবনকে দেখছি, সেই ভাবে কি আমাদের জীবনটা চলছে? যদি বলেন হ্যাঁ তাই। তাহলে এখন যেটা আপনি অনেক চিন্তা-ভাবনা করে, অনেক রকম কষ্ট করে সাধনা করছেন, তখন এটাই আপনার স্বাভাবিক হয়ে যাবে। রাস্থা ঘাটে কাঙালী ভিখারীরা গায়ের উপর এসে দুটো পয়সা চাইতে এলে এখন আমরা কত বিরক্ত হই, পরেও বিরক্ত হব। কিন্তু তখন একবারের জন্য হলেও মনের মধ্যে এই চিন্তা আসবে, কঠোপনিষদের আলোচনায় শুনেছিলাম এরাও ঠাকুরেরই রূপ। ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে আমি একশ টাকা প্রণামী দিই, এখানেও না হয় দুটো টাকা দিলাম। যদি ঠাকুরকেও না দিই তাহলে এদেরকেও দেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু ঠাকুরকে প্রণাম করে একশ টাকা যদি দিতে পারি তাহলে এখানেও সহজে পাঁচটা টাকা দেওয়া যায়, কারণ এই রূপটাও তো ঠাকুরেরই রূপ। কিন্তু আমাদের সমস্যা হল আমরা কখনই impersonal aspect গুলিকে সহজ ভাবে নিতে পারি না। আমরা সব সময় personal aspectকে নিচ্ছি।

জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা কখন ঢাক পেটাই না। আমাদের স্বাভাবিক কাজগুলোকে নিয়ে আমরা কখন অপরকে বলে বেড়াই না। আজকে ভাত, ডাল, তরকারি খেয়েছি, কাল রাত্রে আমি ঘুমোতে গিয়েছিলাম, এগুলো আমরা কাউকে বলতে যাই না? কিন্তু যেদিন বিরিয়ানি খেলাম, তখন বলি আজ কি দারুণ খেলাম। তার মানে বিরিয়ানি খাওয়াটা স্বাভাবিক জিনিষ নয়। স্বাভাবিক কাজ নিয়ে কেউ আলোচনা করে না। সেবা করা

যদি আপনার স্বাভাবিক হয় তখন আপনি কাউকে দেখিয়ে সেবা করতে যাবেন না, তখন আপনি নিজের মত সেবা করে বেরিয়ে যাবেন। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি যদি স্বাভাবিক হয় আপনার মন্দিরে আসার কোন দরকারই পড়ে না। এত বছর সাধনার করার পরেও আপনি এখনও ঠাকুরের মুর্তি না দেখে থাকতে পারছেন না, মন্দিরে না এলে আপনার চলছে না! ঠিক আছে, এও না হয় মেনে নিলাম যে আপনি বলছেন আমি ঠাকুরকে হৃদয়েও যেমন দেখতে চাই বাইরেও তার ছবি বা মুর্তিকেও দেখতে চাই। তাহলে বাইরের কাঙালী ভিখারীদের মধ্যেও কেন আপনি ঠাকুরের রূপ দেখছেন না? একটা টাকার জন্য রিক্সাওয়ালার সাথে, সব্জীওয়ালার সাথে কেন ঝগড়া করছেন? তারাও তো ঠাকুরের রূপ। আপনি হয়ত তাকে দুটো টাকা দিয়ে সাহায্য করতে না পারেন, কিন্তু তার সাথে মিষ্টি ব্যবহার করতে তো আপনার পয়সা খরচ হচ্ছে না। আমাদের মূল্যবোধে বলা হয় ভালো ব্যবহার করতে, ঐ মূল্যবোধের জন্য ভালো ব্যবহার করতে বলা হচ্ছে না, কারণ আপনি জানেন এটাও ঠাকুরেরই একটা বিশেষ রূপ। এই যে স্বামীজী বলছেন, আমি সেই যিশু আর আমিই সেই জুডাস যে জুডাসের জন্য যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ হতে হয়েছিল। কোন খ্রিশ্চানের এই কথা বলার সাহস হবে? তাকে খ্রীষ্টান ধর্ম থেকে বহিষ্কার করে দেবে। একমাত্র আমরাই এই কথা বলতে পারি, আমি যিশু আমিই জুডাস। আমরাই এই কথা বলতে পারি, তিনিই সাপ হয়ে দংশন করেন আবার তিনি রোজা হয়ে সাপের বিষ নামিয়ে দেন। কারণ আমাদের ধমনীতে আমাদের পূর্বজরা সেই আধ্যাত্মিক শক্তির বীজকে বপন করে দিয়ে গেছেন। কিন্তু আমরা সেটা ভুলে গিয়ে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হিংসার মধ্যে জড়িয়ে পরস্পর মারামারি, কাটাকাটি করে যাচ্ছি। স্বামীজী বারবার চিঠিতে গুরুভাইদের বলছেন এই হিংসুটে ভাব সমাজকে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যায়। সত্যিই তাই, আজ দেশের কি করুণ অবস্থা, পুরো মাথা থাকে পা পর্যন্ত সর্বত্র শুধু হিংসার ভাব। কেন হিংসার ভাব? সবাই ঐ personal aspectএ গিয়ে পড়ে আছে। যেখানেই হিংসা, যেখানেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, যেখানেই অবসাদ দুঃখ বুঝবেন সেখানে সবাই personal aspectএ পড়ে আছে। আপনি নিজের দিকে তাকান, অন্যদের কথা ছেড়ে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখুন আপনি কি মহৎ হতে চাইছেন? আপনার কাছে জগতের কেউ মূল্যবান নয়, আপনার কাছে আপনিই একমাত্র মূল্যবান। কাল আপনার শরীরে ব্যাধির আক্রমণ হলে আপনাকেই ব্যাধির যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে, অন্য কেউ এসে আপনার শরীরের কষ্ট ভোগ করবে না। বাড়ির লোক আপনাকে এক গ্লাশ জল দিতে পারবে, ডাক্তার ওষুধ দিতে পারবে কিন্তু ব্যাধির যন্ত্রণা আপনাকেই সহ্য করতে হবে। বাড়ির লোক রান্না করে আপনার সামনে খাবার সাজিয়ে দিতে পারে, কিন্তু আপনাকে নিজের মুখ দিয়েই খেতে হবে, খেয়ে সেই খাবার আপনাকেই হজম করতে হবে। উল্টোপাল্টা খেয়ে বদহজম হলে আপনাকেই ভুগতে হবে। এই জীবনে যা কিছু হবে সব নিজের জন্যই হবে। আপনি যদি ঠিক ঠিক নিজের জন্য করতে চান তাহলে আপনাকে উপরের তালিকার ডান দিকের জিনিষগুলিকে আপনার জীবনে নিয়ে আসতে হবে। বাঁ দিকের জিনিষগুলি আপনি করছেন নিজের জন্য, কিন্তু এগুলোই অসীম থেকে নামিয়ে আপনাকে সীমিতের মধ্যে বেঁধে ফেলছে। যেখানে একটা বড় লাভ হওয়ার সুযোগ এসেছিল সেখানে একটা ছোট্ট জিনিষকে নিয়ে আপনি সুযোগটা নষ্ট করে ফেলছেন। হাতি নিতে গিয়ে তার লেজটুকু কেটে নিয়ে আসছেন। ডান দিকের জিনিষগুলিকে অনুশীলন করলে মানুষ অনু থেকে মহৎএ চলে যাবে, স্বরাট থেকে বিরাটে চলে যাবে, সাধারণ থেকে অসাধারণে চলে যাবে।

ভগবান সব সময় প্রতিটি পদক্ষেপে বিরাট সুযোগ দিয়ে যাচ্ছেন আর বলে যাচ্ছেন তোমার জন্য এই মাণিক্য, এই ধনরত্ন, সব তোমার। কিন্তু সেই মাণিক্য ফেলে সবাই ভেলভেটের দু-পয়সার বাক্সকে নিয়ে আনন্দে লাফাচ্ছে। কারণ আমরা কেউই মুক্তা কি জিনিষ জানি না, হীরা মাণিক্য কি রকম দেখতে তাও জানি না, তাই রত্ন বাছতে বললে সবাই চকচকে বাক্সটাকে নিয়ে চলে যাই। আমাদের let us begin বলার কোন প্রয়োজনই নেই, কারণ প্রতিটি মুহূর্তে ভগবান ক্রমাগত একেবারে টাটকা জিনিষ পাঠিয়ে যাচ্ছেন। গঙ্গা নদীতে যেমন প্রতি ক্ষণে নতুন জল আসছে তেমনি জীবন প্রতিটি ক্ষণে আমাদের মহৎ বানিয়ে দেওয়ার, মহাপুরুষ করার সুযোগ দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা ঘেয়ো কুকুরের মত সেই সুযোগকে তাড়িয়ে দিচ্ছি। জীবন আমাদের প্রতি মুহূর্তে অমৃত ধারা ঢেলে যাচ্ছে কিন্তু আমরা নর্দমার জল দিয়ে পাত্রকে পূর্ণ করে যাচ্ছি। এখানে শুরু করার কিছু নেই, শুধু দেখতে হবে কোনটা আমরা চাইছি। প্রেয়কে চাইছি না শ্রেয়কে চাইছি? সবাই প্রেয়কেই

বেছে নিচ্ছি, এই পছন্দই আমাদের সমস্ত দুঃখ কষ্টের হেতু। উপনিষদ এই কথাই বলবে, *প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে*, শ্রেয়কে সবাই বরণ করে না, প্রেয়কেই সবাই বরণ করে এটাই আমাদের দুর্ভাগ্য।

নচিকেতার যোগ্যতা আছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য যমরাজ প্রথমে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করে বলে দিলেন নচিকেতাকে কি কি ভোগ্যবস্তু দেওয়া হবে। কিন্তু নচিকেতা অটল সুমেরুবৎ, তার কোন কিছুই লাগবে না। তবে এটা একটা আখ্যায়িকা। নচিকেতার যোগ্যতার যাচাই হয়ে গেছে, যমরাজের পরীক্ষায় নচিকেতা উত্তীর্ণ। এবার যমরাজ মূল বিদ্যাতে প্রবেশ করার আগে বিদ্যার একটা যথোপযুক্ত ভূমিকা দিচ্ছেন। নচিকেতা জানতে চাইলেন মৃত্যুর পর কিছু আছে কিনা, যমরাজ যদি এক কথায় বলে দিতেন হ্যাঁ আছে, প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ে গেল, সব কিছু তো ওখানেই ইতি হয়ে গেল, এরপর তো আর কিছু জানার নেই। তাহলে কঠোপনিষদ আর উপনিষদ হবে না, শাস্ত্রের মর্যাদাও পাবে না। যদি বলে দেন হ্যাঁ আছে, তারপরেই প্রশ্ন হবে – এর কি প্রমাণ আছে? আপনার কথা কেন মানব? পর পর প্রশ্ন চলতেই থাকবে। বিদ্যা কখনই এভাবে এগোতে পারে না। বিদ্যার উপর প্রশ্ন করার আগে পাত্রতা দরকার, পাত্রতা অর্জন করার জন্য একটা দীর্ঘমেয়াদী অনুশীলনের মাধ্যমে প্রস্তুতি দরকার। সেইজন্য আগে বিদ্যার ভূমিকাকে উপস্থাপিত করতে হবে। যদিও যমরাজ কোথাও সরাসরি বলছেন না যে মৃত্যুর পর কিছু আছে কি নেই, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছেন, বলতে বলতে আসল জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন। কারণ শিষ্যের যেমন যেমন প্রজ্ঞা উৎপন্ন হবে, যেমন যেমন মেধা হবে সে তেমন তেমন বিষয় বস্তুকে ধারণা করতে সক্ষম হবে। আত্মবিদ্যাতে যখন সরাসরি নেমে যাবেন তখন আত্মবিদ্যারও একটা ভূমিকা আছে। যে কোন বইতে যেমন Introduction থাকে, Foreward বা Preface থাকে বাংলায় যাকে প্রাক্ কথন বা প্রস্তাবনা বলা হয়, এর প্রথম কয়েকটি মন্ত্র ঠিক তাই। যদিও এই কটি মন্ত্র প্রস্তাবনা কিন্তু এটাই খুব কঠিন। যাই হোক যমরাজ প্রথম মন্ত্রে বলছেন –

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে।।১/২/১।।

(যমরাজ বললেন 'নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মোক্ষ সাধনবিদ্যা স্বর্গাদি ও পশুপুত্রাদি অর্জনজনিত অবিদ্যা থেকে পৃথক। বিভিন্ন প্রয়োজন বিশিষ্ট এই উভয় বিদ্যা পুরুষকে বদ্ধ করে। শ্রেয় ও প্রেয় এই দুটির মধ্যে যিনি শ্রেয়কে অবলম্বন করেন তাঁর মঙ্গল হয় আর যিনি প্রেয়কে বরণ করেন তিনি পুরুষার্থ থেকে বিচ্যুত হন'।)

শাস্ত্রের কিছু শাস্ত্রীয় পরিভাষা আছে, যেগুলোকে আমরা সাধারণত technical term বলি, শাস্ত্রের এই সব শব্দের কখন অনুবাদ করা যায় না। যেমন মায়া, মায়া একটা technical term, মায়া শব্দকে অনুবাদ করা যায় না, কিন্তু ব্যাখ্যা করা যায়। ঠিক তেমনি শ্রেয় আর প্রেয় এই দুটি শব্দও technical term, যার কখন অনুবাদ করা যায় না, কিন্তু অনেক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। শ্রেয় ও প্রেয়কে গীতা প্রেস অনুবাদ করছেন বিদ্যা ও অবিদ্যা। কিন্তু এত সহজে এক কথায় শ্রেয় আর প্রেয়কে অনুবাদ করা যায় না, সেইজন্য আমরা শ্রেয়কে শ্রেয় আর প্রেয়কে প্রেয় নামেই বলব।

আচার্য শঙ্কর শ্রেয়কে বলছেন *অন্যৎ পৃথগেব শ্রেয়ো নিঃশ্রেয়সম্*। আমরা শ্রেয় আর প্রেয়কে নিয়ে এত দীর্ঘ আলোচনা করলাম, কিন্তু আচার্য অন্য ভাবে নিয়ে গেছেন। অন্য ভাবে নিয়ে গেলেও মূল ভাব একই থাকছে। যেমন এর আগে আমরা বললাম ভারতের ক্রিকেট টিমকে ভালোবাসা, তাদের উৎসাহিত করা, ভারতের জয়ে খুশী হওয়া এতে কোন দোষ নেই, কিন্তু ক্রিকেট খেলাকে যদি ভালোবাসা হয় তখন সেটা তাকে আরও মহৎ করে দেবে। শ্রেয় আর প্রেয় যেমন ক্রিকেটের ক্ষেত্রে এভাবে চলে, টাকার ক্ষেত্রেও এভাবেই যাবে। নিজের এবং পরিবারের জন্য টাকা উপার্জন করছে খুব ভালো কথা, কিন্তু দেশের জন্য সমাজের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করা এর থেকে অনেক ভালো। Impersonal aspect হল দেশের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করা আর personal aspect হল নিজের জন্য অর্থোপার্জন করা। এখানে উপনিষদ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা করা হচ্ছে। ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা করতে গিয়ে ধর্মের যে সাধারণ ভাব আর ধর্মের যে বিশেষ ভাব, এই দুটোকে তুলনাত্মক রূপে ব্যাখ্যা করছেন। আচার্য শ্রেয়কে এখানে তাই বলছেন নিঃশ্রেয়স, নিঃশ্রেয়স মানে মুক্তির পথ, তাই শ্রেয় মানে মুক্তির পথ। গীতার দৃষ্টিকোণ দিয়ে শ্রেয়কে আমরা নিবৃত্তি রূপে দেখতে পারি আর প্রেয়কে

প্রবৃত্তি রূপে দেখতে পারি। কিন্তু সেই একই কথা এখানেও বলতে হচ্ছে, শ্রেয় আর প্রেয় দুটো শাস্ত্রীয় শব্দ, এর অর্থ করা যায় না কিন্তু যেদিন বুঝে যাব সেদিন এর অর্থ আপনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। নিজে থেকে না বুঝে নিলে অন্য কেউ বোঝালে ধারণা হবে না, কারণ সরাসরি একটা দুটো শব্দ দিয়ে এর অর্থ করা যায় না। বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে এর ব্যাখ্যাও বিভিন্ন ভাবে করতে হবে। যখন পরীক্ষার নম্বরের জন্য লেখাপড়া করছে তখন সেটা হয়ে যায় প্রেয় আর জ্ঞান উপলব্ধির জন্য যখন অধ্যয়ন করছে তখন সেটাই হয়ে যায় শ্রেয়। প্রত্যেকটি জিনিষেরই personal আর impersonal aspect আছে। ধর্মের personal aspect প্রবৃত্তিমার্গ আর impersonal aspect নিবৃত্তিমার্গ, তাই বলছেন নিঃশ্রেয়স আর *প্রিয়তরমপি তে প্রিয়ঃ*, যেটা আমার প্রিয়তর সেটাই প্রেয়। জীবনে এদের প্রয়োজনও আলাদা, এদের লক্ষ্য আলাদা, কার্য আলাদা, এদের প্রাপ্তি আলাদা। অথচ এরা দুজনই নিজ নিজ অধিকারীকে বেঁধে ফেলে।

শ্রেয় আর প্রেয় এই দুটোই বিপরীত, শ্রেয়ো যদি পূর্ব দিকে যায় প্রেয় পশ্চিম দিকে যাবে, কিন্তু *তে উভে*, এই দুটোই, *নানার্থে*, নানান ভাবে *পুরুষং সিনীতঃ*, পুরুষকে বেঁধে নেয়। পুরুষকে বাঁধা মানে, মানুষের মধ্যে বন্ধন এসে গেল। বন্ধন মানে কর্তব্যবোধ। বাবা-মা ছেলের বাঁদরামো আর দৌরাত্ম্যে অস্থির, ছেলের কাকা-জ্যাঠা বলছে, ওকে একটা বিয়ে দিয়ে দাও তাহলেই জব্দ হয়ে যাবে। বিয়ে দিয়ে দেওয়া হল, এবার সে বন্ধনে পড়ে গেল। বন্ধনে পড়ে গেল মানে তার মধ্যে কর্তব্যবোধ এসে গেছে, আর বাঁদরামো করার ফুসরৎ পাবে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দিনরাত খটাখটি লেগে আছে। সবাই বলছে একটা বাচ্চা হয়ে গেলে ঠিক হয়ে যাবে। কারণ সন্তান এসে গেলে তাদের কর্তব্যবোধ এসে যাবে। প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি দুটোই বাঁধে, সেটাই এখানে বলছেন শ্রেয় আর প্রেয় দুটোই কর্তব্যবোধ্য দিয়ে পুরুষকে বেঁধে ফেলে। যারা শ্রেয়র পথ নেয় তাদের কর্তব্যবোধ এক রকম হয় আর প্রেয়র পথ যারা নিচ্ছে তাদের কর্তব্যবোধ আরেক রকম হবে।

কর্তব্যবোধ এসে যাওয়ার পর দুজনেই নিজের নিজের ভাবে প্রবৃত্ত হয়, শ্রেয়র পথ যারা নিয়েছে তারা নিজের মত প্রবৃত্ত হয় আর যারা প্রেয়র পথ নেয় তারা নিজের মত প্রবৃত্ত হয়। প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি দুটোর মধ্যেই বৃত্তি শব্দ আছে, বৃত্তি মানে পথ। প্রবৃত্তি মানে একটা জিনিষের অর্থাৎ একটা বৃত্তি বা পথের সাথে যোগ হয়ে যাওয়া, নিবৃত্তি মানে সেই বৃত্তি বা পথ থেকে থেকে সরে আসা। আরেকটু সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে প্রত্যেক প্রবৃত্তির মধ্যে নিবৃত্তি লেগে থাকে আর প্রত্যেক নিবৃত্তির মধ্যে প্রবৃত্তি লেগে আছে। যেমন আমরা কঠোপনিষদের আলোচনা শুনতে এখানে এক হয়েছি, তার মানে আমরা সবাই একটা জিনিষকে ছেড়ে এসেছি, ঘর-বাড়ি ছেড়ে এখানে এসেছি। নিবৃত্তিতেও একটা প্রবৃত্তি থাকে, প্রবৃত্তি মানে একটা শক্তি, যে শক্তি তাকে নিবৃত্তি থেকে টেনে বার করে নিয়ে আসে। এটা ঠিকই যে প্রবৃত্তিতে যে পরিমাণ শক্তি দরকার তার থেকে অনেক গুণ শক্তি দরকার নিবৃত্তিতে। একটা কিছুতে নিজেকে জড়িয়ে ফেলাটা কঠিন কিছু নয় কিন্তু ওখান থেকে বেরিয়ে আসাই খুব কঠিন। অল্প বয়সে আমরা ওয়ান-ডে ক্রিকেট ম্যাচ থাকলে টেলিভিশনের সামনে খেলা দেখতে বসে যেতাম, এখন বয়স হয়ে গেছে কিন্তু এত বছর পরেও ক্রিকেট ম্যাচ হলেই ইচ্ছে হয় খেলা দেখি। কিন্তু উপনিষদের ক্লাশে যেতে হবে, ক্রিকেট ম্যাচ থেকে নিবৃত্তি নিয়ে যে বেরিয়ে আসতে হচ্ছে, ঐ নিবৃত্তির পেছনে যে শক্তিটা নিয়ে আসতে হচ্ছে সেই শক্তিটাও কিন্তু প্রবৃত্তি। আচার্য তাই বলছেন প্রেয় যেমন বাঁধে শ্রেয়ও আমাদের বাঁধে, একটা প্রবৃত্তিমার্গের আরেকটা নিবৃত্তিমার্গের বন্ধন। বেদান্তে যুক্তির মূল কেন্দ্র এটাই। বেদান্তের বন্ধনের এই যুক্তিকে যতক্ষণ না বোঝা যাবে ততক্ষণ বেদান্তের মুক্তিকেও বোঝা যাবে না। নিবৃত্তিও যে প্রবৃত্তি এটাকে ধারণা করা খুব কঠিন। অনেক দিন গুরুসঙ্গ, অনেক বিচার করা না হলে নিবৃত্তিতেও যে প্রবৃত্তি লেগে থাকে এই ধারণা স্পষ্ট হবে না। আচার্য বলছেন উপনিষদেই বলছে *তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ*, দুটোই মানুষকে বাঁধে। বাঁধা মানেই তার মধ্যে কর্তব্যবোধ সৃষ্টি হবে, কর্তব্যবোধ সৃষ্টি হওয়া মানেই প্রবৃত্তি। কোথায় প্রবৃত্তি লাগছে? নিবৃত্তিতে, নিবৃত্তির জন্য প্রবৃত্তি লাগে। আর প্রত্যেক প্রবৃত্তির পেছনে নিবৃত্তি থাকবে। কারণ যতক্ষণ একটা জিনিষ থেকে নিবৃত্ত না হচ্ছে ততক্ষণ অন্য দিকে সে প্রবৃত্ত হবে না। সেইজন্য প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সব সময় একসাথে চলে।

শ্রীমা জীবনের উপমা দিতে গিয়ে বলছেন ঘুড়ির লাটাই থেকে যেমন একদিকে সুতো ছেড়ে যাচ্ছে অন্য দিকে সুতো গুটিয়ে যাচ্ছে। লাটাই থেকে যখন সুতো বেরোবে তখন প্রথম যে রঙের সুতো ঢুকেছিল সেই

সুতোই বেরোবে, এখন যে সুতো ঢুকছে সেই সুতো বেরোতে অনেক দিন, অনেক জন্মও লেগে যেতে পারে। আমি মনে করছি – কি হল! আমি সবুজ সুতো ছাড়লাম কিন্তু ওখান থেকে লাল সুতো কি করে বেরোচ্ছে। কিন্তু আমি বুঝছি না যে, সবুজ সুতো সবে ঢুকছে ওর বেরোনর সময় আসতে অনেক দিন লাগবে। আমি এখানে শাস্ত্রের কথা শুনছি, বাড়ির লোক, পাড়াপ্রতিবেশীরা বলছে – এত ধর্মের ক্লাশ করে যাচ্ছ তাও তোমার কিছু হচ্ছে না! এখন কিছুই হবে না, এই শাস্ত্র পাঠের ফল পেতে হলে এখনও হয়ত আমাকে পাঁচ জন্ম অপেক্ষা করে থাকতে হবে। জীবনের লাটাইয়ে এখন কত রকমের সুতো জড়ানো আছে আমরা কী করে জানব! এখন যে সুতো বেরোচ্ছে এই সুতো কোন জন্মের সুতো বেরোচ্ছে আমরা কী করে জানব! এই কথা শ্রীমা বলছেন। অনেকের আবার পাঁচ জন্ম অপেক্ষা করতে হয় না, প্রচুর জপ-ধ্যান তপস্যা করে করে মন যদি খুব শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যায় তাহলে আজ সকালে যেটা গোটান হবে বিকেলের মধ্যেই সেটা বেরিয়ে আসবে। আমাদের মধ্যে এখনও সেই পবিত্রতা আসেনি। কিন্তু লাটাইয়ে যত সুতো গোটান হচ্ছে সব সুতোই একদিন না একদিন বেরোবে, একদিক দিয়ে সুতো গোটাচ্ছে আরেক দিয়ে সুতো বেরিয়ে আসছে। এই ছাড়া আর গোটান দুটো এক সঙ্গেই চলছে, উপনিষদও তাই বলছেন *তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ*। সেইজন্য যেখানে শ্রেয় আছে সেখানেও কর্তব্যবোধ থাকবে, সেখানেও কার্য থাকবে। সাধু বাবাজীরা বলেন কাজ মানে জড়িয়ে যাওয়া। কিন্তু তাঁরা বুঝছেন না যে, বসে থাকাটাও একটা কাজ, ঘুমনোও একটা কাজ, ধ্যান করছে সেখানেও কর্মের সৃষ্টি হচ্ছে। তাই না, ত্যাগটাও একটা কাজ। এটা নিয়েই যমরাজ এখানে আলোচনা করছেন। এগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম জিনিষ, যমরাজ এরপরে বলবেন যুক্তিতর্ক দিয়ে এই সূক্ষ্ম জিনিষগুলি বোঝা যায় না। এই জিনিষগুলো বোঝার জন্য শুদ্ধ বুদ্ধির দরকার, শুদ্ধি বুদ্ধি না হলে ধারণা করতে পারবে না ত্যাগটাও কি করে কাজ হয়, ত্যাগটাও আসলে একটা সংগ্রহণ। আর যে কোন সংগ্রহণেও একটা ত্যাগ থাকে। কথামৃতে ঠাকুর কত বার বলছেন বিদ্যা অবিদ্যা দুটোকে ফেলে দিতে। কারণ অবিদ্যা যেমন বাঁধে বিদ্যাও তেমনি বিভিন্ন গুণ দিয়ে বাঁধে। বাঁধা মানেই কর্তব্যবোধ, কর্তব্যবোধ এসে যাওয়া মানেই কর্ম শুরু হয়ে গেল। তোতাপুরীর মত সন্ন্যাস নিয়ে আর কৌপিন ধারণ করে ঘুরে বেড়ালেই কি আমার মুক্তি হয়ে যাবে? কিছুই মুক্তি হবে না। হ্যাঁ এটা ঠিক যে, আমার একগুচ্ছ ঝামেলা, একগুচ্ছ কর্তব্য ছিল সেগুলো চলে গেছে কিন্তু সেগুলো চলে গিয়ে তার জায়গায় অন্য একগুচ্ছ ঝামেলা চলে এসেছে, অন্য ধরণের কর্তব্য চলে এসেছে। যে মুহূর্তে সন্ন্যাসী হতে যাচ্ছে সেই মুহূর্তে সে এক ধরণের সমস্যাকে ছেড়ে অন্য ধরণের সমস্যা নিচ্ছে, এক ধরণের লোকজন ছেড়ে অন্য ধরণের লোকেদের সঙ্গে ওঠাবসা করছে।

শ্রেয় আর প্রেয় এই দুটোই এক একটা পুরুষার্থের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। প্রেয় তিনটে পুরুষার্থ দেয় – ধর্ম, অর্থ আর কাম। অন্য দিকে শ্রেয় দেয় মোক্ষ, মোক্ষও পুরুষার্থ। পুরুষার্থ মানেই জীবনের একটা উদ্দেশ্য। আমি বলছি আমার জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন, আপনি বলছেন আমার জীবনের লক্ষ্য মুক্তি। তার মানে, যে মুহূর্তে আপনি বলে দিলেন আমার জীবনের উদ্দেশ্য মুক্তি, সেই মুহূর্তেই আপনার কর্তব্যবোধ এসে গেল। কর্তব্যবোধ এসে যাওয়া মানেই ক্রিয়া, কারক, ফল সব এসে যাবে, আপনার বন্ধন তৈরী হয়ে গেল। মুক্ত মানে সেখানে কোন ক্রিয়া কারক ফল থাকবে না, মুক্ত মানে কোন ধরণের কর্তব্যবোধ থাকবে না। মুক্ত মানে মুক্ত, আর কোন কিছু সেখানে থাকবে না, কোন কর্তব্যবোধ থাকবে না, কোন ক্রিয়া কারক ফল থাকবে না।

ঠাকুর বলছেন, হিঞ্চের শাক শাকের মধ্যে নয়, মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়, ঠিক তেমনি ঈশ্বর দর্শনের ইচ্ছা কামনা-বাসনার মধ্যে পড়ে না। আচার্য কিন্তু এখানে বলছেন ঈশ্বর দর্শনের ইচ্ছাও একটা পুরুষার্থের মধ্যে পড়ে। ঠাকুর কি তাহলে আচার্য শঙ্করের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বলছেন? কখনই তা নয়। কারণ ঠাকুর অধিকারী ভেদে এই কথা বলছেন, যাদের বলছেন তারা এই জিনিষটাকে ধারণা করতে পারবে না বলে অন্য ভাবে বলছেন। ঠাকুর তাদের বোঝাতে চাইছেন, বাকি তিনটে পুরুষার্থ ধর্ম, অর্থ আর কামকে ছেড়ে দিয়ে তোমরা মোক্ষের দিকে যাও, অর্থাৎ ঈশ্বর দর্শনকেই জীবনের উদ্দেশ্য কর। কিন্তু আরও গভীরে যখন যাবে তখন দেখবে ঈশ্বর দর্শনের ইচ্ছাটাও একটা পুরুষার্থ হয়ে যায়। পুরুষার্থ মানে, যেখানে পৌরুষ লাগে, ক্রিয়াকলাপ লাগে, সেইজন্য কোন পুরুষার্থই শেষ কথা নয়, এটাও মায়ার রাজ্যের বস্তু।

যদিও শ্রেয় আর প্রেয় দুটোরই আলাদা আলাদা পুরুষার্থ কিন্তু এদের একটার বিদ্যারূপ আরেকটির অবিদ্যারূপ, শ্রেয় বিদ্যারূপিণী প্রেয় অবিদ্যারূপিণী। তাই শ্রেয়ও বন্ধন প্রেয়ও বন্ধন, কিন্তু শ্রেয় পুরুষকে মুক্তির দিকে নিয়ে যায় আর প্রেয় নিয়ে যায় সংসারের দিকে। সেইজন্য একই লোকের পক্ষে শ্রেয় আর প্রেয় দুটোকে একসাথে পালন করা কখনই সম্ভব নয়। শ্রেয়কে পালন করার জন্য অবিদ্যাজনিত সব কিছুকে ত্যাগ করতে হয়। এই জগতে আমরা যা কিছু করছি সবটাই অবিদ্যা। তবে এখানে উপনিষদের আলোচনা চলছে, চরিত্রগঠন, ব্যক্তিত্ব নির্মাণ নিয়ে কিছু বলা হচ্ছে না, ধর্মকে বিশেষ পুরুষার্থ রূপে বলা হচ্ছে। ধর্ম পালনের ফল আমাদের কাছে অর্থ আর কাম রূপে আসে। আমরা জানি যজ্ঞাদি করলে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে, তীর্থাদি করলে আমাদের সংসারের মঙ্গল হবে। এটাই ধর্মকে অর্থ আর কামে পরিণত করার প্রয়াস। কিন্তু ধর্মের ঠিক ঠিক লক্ষ্য হল মানুষের মনকে মোক্ষের দিকে নিয়ে যাওয়া। সেইজন্য সাধুপুরুষরা সব সময় মোক্ষ পথের দিকে যান, অর্থাৎ তাঁরা প্রেয়কে বরণ করেন। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষ সব সময় প্রেয়কে বরণ করে। আত্মজ্ঞানের ইচ্ছাটাও বন্ধন, যে কোন কিছুর ইচ্ছা মানেই অজ্ঞানের এলাকা। কিন্তু আত্মজ্ঞানের ইচ্ছা ধীরে ধীরে মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। যিনি আত্মজ্ঞানী, আত্মজ্ঞান যাঁর হয়ে গেছে একমাত্র তিনিই অজ্ঞানের এলাকা থেকে বেরিয়ে গেছেন। গীতায় ভগবান বলছেন *নৈব তস্য কৃতেনার্থ নাকৃতেনেহ কশ্চন*, আত্মজ্ঞানীর কৃত অকৃত বলে কিছু অবশিষ্ট থাকে না। এই কাজ করলে আমার ভালো হবে, না করলে পাপ হবে, এই ধরণের কোন বোধ তাঁদের থাকে না, গঙ্গাজল আর নর্দমার জলে কোন তফাৎ থাকে না, ভালো মন্দ সবটাই সমান হয়ে যায়। কেউ কেউ জগতের হিতের জন্য শরীরটা রেখে দেন, অনেকে আবার তাও রাখেন না। এগুলো যে কোন যুক্তি বিচার করে করছেন তা নয়, আত্মজ্ঞানীর ভেতর থেকেই এই ভাব এসে যায়।

শ্রেয় আর প্রেয় দুটোই অজ্ঞানের এলাকার বস্তু। ঠাকুর মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করছেন, তোমার স্ত্রী বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি? স্ত্রী থাকা মানেই সেখানে গৃহস্থ ধর্ম লেগে আছে, একটা ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরী হয়ে আছে, এটাই অজ্ঞানের সংসার। তাহলে ঠাকুর কেন বিদ্যাশক্তি আর অবিদ্যাশক্তির কথা আনছেন? ঠাকুর বলতে চাইছেন, বিদ্যাশক্তি মানে যে শক্তি আমাকে ধীরে ধীরে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে। আর অবিদ্যাশক্তি সংসারে আরও শক্ত করে বেঁধে রাখতে চাইছে, আরও যেন টাকা-পয়সা হয়, আরও ভালো বাড়ি হয়, গাড়ি হয় – এই ভাবগুলি যেখানে বেশি বেশি আসতে থাকবে। একমাত্র আত্মজ্ঞানীই এর সব কিছুর বাইরে, আত্মজ্ঞানী ছাড়া বাকি সবাই এর মধ্যে আটকে আছে।

সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা যা কিছু বুঝি সবটাই অজ্ঞান, অবিদ্যা ও প্রেয়। এর আগে আমরা শ্রেয় আর প্রেয়কে নিয়ে যে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, সেই আলোচনার সারবস্তুকে পুরো ধর্মতত্ত্বের দৃষ্টিতে যদি দেখা হয়, তখন দেখা যাবে ধর্মতত্ত্বের আবার দুটো দিক বেরিয়ে আসছে, personal aspect আর impersonal aspect। Personal aspectএ আসছে ধর্ম নিজে, যার ফল সব সময় অর্থ আর কামের দিকে চলে যায়। ধর্মের impersonal aspect হল মোক্ষ কামনা। সাধারণ মানুষের ধর্ম পালনের মধ্যে এই কামনাগুলো সব সময় জড়িয়ে থাকে – আমার স্ত্রী, সন্তানরা যেন ভালো থাকে, আর কিছু না হোক আমার শরীরটা যেন ঠিক থাকে। সাধারণ ভক্তদের যখন পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হয় তখন জিজ্ঞেস করে, কেমন আছ, শরীর ভালো আছে তো, তার থেকে একটু বেশি হলে জিজ্ঞেস করবে, ঠাকুরের তিথি পূজায় মঠে এসেছিলে কিনা, ইত্যাদি। কিন্তু হরিদ্বারের দিকে সাধুদের পরস্পর দেখা হলে কখনই এসব জিজ্ঞেস করবেন না, তাঁরা সব সময় জিজ্ঞেস করবেন – মহাত্মা! দর্শন সাফ্ হ্যায় না! অর্থাৎ জিজ্ঞেস করছেন, মন আপনার পরিষ্কার আছে তো, জপ-ধ্যান-তপস্যা ঠিক ঠিক চলছে তো। 'দর্শন' ওনাদের খুব প্রচলিত শব্দ। দর্শন মানে life philosophy, অর্থাৎ আপনি life philosophyতে ঠিকমত established আছেন তো? সাধুরা কখনই অপর সাধুর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে জানতেই চাইবেন না। কোন ভক্তকে যদি জিজ্ঞেস করেন, কি দাদা! জপ-ধ্যান ঠিকমত চলছে তো, তখন সে ভেতরে অহঙ্কারকে ঢেকে বাইরে খুব বিনয়ের ভাব নিয়ে বলবে, কই কিছুই তো হচ্ছে না। সন্ন্যাসীদের এই প্রশ্ন করাই যাবে না। আমরা চাইছি কিভাবে ধর্মকে অর্থ আর কামে ফলপ্রসু করা যায় – আমার শরীরটা যেন ঠিক থাকে, আমাকে সবাই একজন বড় ভক্ত বলে জানুক, আমার নিজের লোকেরা যেন সবাই ঠিক থাকে। কিন্তু ধর্ম যখন impersonal aspectকে নিয়ে চলে তখন জীবন-দর্শন কখনই আর অর্থ আর কামের দিকে যাবে না। এই কথাই যমরাজ বলছেন *তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি*, যাঁরা সাধুপুরুষ,

যাঁরা বিজ্ঞ, বুদ্ধি যাঁদের একেবারে পরিষ্কার, তাঁরা সর্বক্ষণ শ্রেয় জিনিষের দিকে দৃষ্টি রাখেন। আচার্য এখানে সাধুর ব্যাখ্যা করছেন – *আদদানস্য উপাদানং কুর্বতঃ সাধু শোভনং শিবং ভবতি*, যাঁরা সাধুপুরুষ, যাঁদের বুদ্ধি শুভ হয়ে গেছে, শিব মানে শুভ, তাঁরা *শ্রেয়ঃ এব কেবলম্ আদদানস্য*, তাঁরা একমাত্র শ্রেয়কেই বরণ করেন। শ্রেয়কে বরণ কেন করছেন? উপনিষদ খুব সহজে বলে দিচ্ছেন, শ্রেয় মুক্তির পথে নিয়ে যায়। মুক্তির পথে যেতে হলে শরীরকে সুস্থ রাখতে হবে। রাতে ভালো ঘুম না হলে সকালে ঘুম ভাঙবে না। ঘুম না ভাঙলে কি করে জপ-ধ্যান করবে? খাওয়া যদি ঠিকমত হজম না হয় শরীর দুর্বল হয়ে যাবে, দুর্বল শরীর নিয়ে কি করে জপ-ধ্যান করবে! মনের আবেগ যদি ঠিকমত না থাকে বিবেক বৈরাগ্য কি করে আনবে! তাই শরীর ও মনের সমান গুরুত্ব রয়েছে, শরীরের বিশ্রামেরও প্রয়োজন আছে তার সাথে বাকসংযমেরও গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু মূলকে কোন অবস্থাতেই ছাড়া যাবে না। মূল হল আত্মজ্ঞানের দিকে এগিয়ে যাওয়া। সিনেমাতে যেমন অনেক সময় দেখা যায় একটা বন্দুক পড়ে আছে, নায়ক মরতে মরতে গিয়ে বন্দুকটাকে কোন রকমে ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছে, আত্মজ্ঞানের জন্য ঠিক এই রকম যখন লড়াই শুরু হয় তখন বোঝা যায় এবার সে কিছুটা ওদিকে এগোতে শুরু করেছে, এবার সে উপরে উঠে যাবে, কোন কিছুই তাকে আর বন্ধনে ফেলতে পারবে না।

ভবতি হীয়তেহর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে, কিন্তু যারা *অদূরদর্শী বিমূঢ়ো হীয়তে*, যারা অদূরদর্শি, যারা মোহগ্রস্ত তারা প্রেয়কে বেছে নেয়, যার লক্ষ্য অর্থ আর কাম। অর্থ আর কাম এই দুটো শাস্ত্রীয় পরিভাষা, আসলে বলতে চাইছেন মানুষ শুধু কামিনী আর কাঞ্চনের দিকে দৌড়াচ্ছে। আগেকার দিনে এদের মধ্যে যারা একটু ভালো ছিলেন তারা অর্থ আর কামের দিকে ছুটতেন, এদের মধ্যেও যারা একটু ভালো তারা ধর্মকে ধরে রাখতেন, তাও আবার অর্থ আর কামের জন্য। কিন্তু যাঁরা ঠিক ঠিক সাধু তাঁরা অর্থ ও কামকে কাজে লাগান ধর্ম সাধনের জন্য। ভাগবতে খুব সুন্দর বলছেন, পুরুষার্থ রূপে কামের একমাত্র উদ্দেশ্য হল দেহ ধারণ। দেহের একমাত্র লক্ষ্য আত্মজ্ঞান আর তত্ত্ব জিজ্ঞাসা। পুরুষার্থ রূপে অর্থের একমাত্র উদ্দেশ্য ধর্ম। অর্থ থাকলে কি হয়? ঠাকুর বলছেন, খাওয়া-পড়া হয়, থাকার জায়গা হয় আর সাধুসেবা হয়। যে অর্থ দিয়ে সাধুসেবা করা হয় না, যে অর্থ দিয়ে পাঁচটা গরীবের মঙ্গল হয় না, সেই অর্থ কিসের অর্থ! এই অর্থ বোঝা ছাড়া কিছু না। অর্থের একমাত্র কাজ ধর্ম সাধন। আর ধর্মের উদ্দেশ্য তত্ত্ব জিজ্ঞাসা। আমরা যেদিক দিয়েই যাই না কেন, সব দিক দিয়েই ঠাকুরের এই কথাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায় – মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন। অর্থই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে অর্থ উপার্জন করতে থাকুক। কিন্তু অর্থ নিয়ে কী করবে? কিছুটা কামের পুর্তির জন্য লাগবে আর কিছুটা ধর্ম সাধনের জন্য লাগবে। কাম কিসের জন্য? দেহ ধারণের জন্য। দেহ ধারণ কিসের জন্য? তত্ত্ব জিজ্ঞাসা। আর ধর্মের দিকে যদি লাগান তখন সেখানেও ধর্মের উদ্দেশ্য হল তত্ত্ব জিজ্ঞাসা। যেদিক দিয়েই যাওয়া হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তিনটে পুরুষার্থই তত্ত্ব জিজ্ঞাসাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তত্ত্ব জিজ্ঞাসা মানেই শ্রেয়র পথ। অথচ সাধারণ মানুষ কি করছে? সাধারণ মানুষরা মোক্ষের পথে কখনই যাবে না, খুব বেশি হলে অর্থ আর কামের দিকে যাবে। অর্থ আর কাম মানে, সৎ ভাবে শাস্ত্রের নির্দেশ মত অর্থ উপার্জন করাটাই অর্থ সাধন আর নিজের স্ত্রীর সাথে থেকে দুটো সন্তান উৎপাদন করে সংসার করাটাই কাম সাধন। আর ধর্ম হল যজ্ঞাদি করা, তীর্থে যাওয়া, দান করা ইত্যাদি। ওনাদের জীবন ধর্ম, অর্থ আর কাম এই তিনটের মধ্যেই ঘুরপাক করত। টাকা আয় করে ধর্ম করে, ধর্ম দিয়ে অর্থ আর কাম চাইছে। এদের থেকে যারা আরেকটু বিবেকী তারা বলবে মৃত্যুর পর আমি যেন স্বর্গে যেতে পারি।

অথচ ধর্ম, অর্থ আর কাম এই তিনটেরই মূল উদ্দেশ্য তত্ত্ব জিজ্ঞাসা। কিন্তু সেদিকে কেউই যেতে চাইবে না। সেইজন্য বলছেন *হীয়তে*, অর্থাৎ সাধারণ মানুষ সব সময় প্রেয়কেই বরণ করে। জীবনকে সহজ করে নেওয়া অত্যন্ত সোজা, এমন কিছু কঠিন নয়। জীবনকে সহজ করার জন্য যে প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া হবে সেটাও এমন কিছু কঠিন নয়। জীবনে মুক্তির নিঃশ্বাস নেওয়া, জীবনে আনন্দ ধারাকে প্রবাহিত করা এমন কিছু কঠিন নয়। কিন্তু আমাদের এমনই দুরবস্থা যে আমরা সব কিছু জেনে বুঝেও দুঃখ-কষ্টের মধ্যেই থাকতে চাই। ফলে পরম পুরুষার্থ থেকে চ্যুত হয়ে ধর্ম, অর্থ আর কামের মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকে। যমরাজ প্রথমে বললেন শ্রেয় আর প্রেয় দুটোই বিপরীত, কিন্তু শেষে বলছেন *তয়োঃ শ্রেয় আদদনস্য সাধু*, যিনি শ্রেয়কে বরণ করেন তাঁর মঙ্গল হয়, আর প্রেয়কে বরণ করার ফল পরমার্থ থেকে বিচ্যুত হওয়া। তখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, কেন সাধুরা শ্রেয়কে বেছে নিচ্ছেন, সাধারণ মানুষ কেন প্রেয়কে বেছে নিচ্ছে, মন কেন পাপ কর্মের দিকে

যায়, মন কেন ভোগের দিকে যায়? দুটো ক্ষেত্রেই আমরা স্বাধীন, দুটো জিনিষের একটাকে গ্রহণ করা আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে, আমি ভালোর দিকেও যেতে পারি, মন্দের দিকেও যেতে পারি। এখানে খারাপ না বলে বলছেন মন্দ, খারাপ হল কামিনী-কাঞ্চন, কামিনী-কাঞ্চনকে এখানে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছেন না, এদেরকে ওনারা বর্ণাশ্রমের বাইরে রাখেন। বর্ণাশ্রমে তারাই আছে যারা সচেতন ভাবে ধর্ম, অর্থ আর কাম সাধন করছে। শাস্ত্র তাদের নিয়েই আলোচনা করছে যারা সৎলোক আর সৎ ভাবে টাকা উপার্জন করছে এবং সৎ ভাবে কামভোগ করছে। কিন্তু এদেরই কেউ প্রেয়কে কেন বরণ করছে, কেউ শ্রেয়কে কেন বরণ করছে?

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত –
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে।।১/২/২।।

(শ্রেয় এবং প্রেয় উভয়ই মানুষের নিকট উপস্থিত হয়। বিবেকী উভয়কেই ভালোভাবে বিচার করে পরস্পরের পার্থক্য নিরূপণ করেন, ধীর প্রাজ্ঞ পুরুষ প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়কেই নিশ্চিত রূপে বরণ করেন। অবিবেকী ব্যক্তি অপ্রাপ্তবস্তুর প্রাপ্তিরূপ যোগ এবং প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণ রূপ ক্ষেমের জন্য প্রেয়কে আশ্রয় করে।)

শ্রেয় আর প্রেয় এই দুটো একেবারে মিশে থাকে, কাদায় যেমন মাটি আর জল মিশে থাকে, দুটোকে যেমন আলাদা করা যায় না, ঠিক তেমনি আমাদের জীবনে শ্রেয় আর প্রেয় দুটো একই সঙ্গে মিলেমিশে আসে। চিনিতে আর লবণে মিশে গেলে পিঁপড়ে লবণ ছেড়ে চিনিকে বেছে নিয়ে চলে যাবে। এই জিনিষটাকেই এখানে বলছেন *শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ*, এই জগতে শ্রেয় আর প্রেয় মিলেমিশে রয়েছে। *তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ*, দুটোরই লক্ষ্য আলাদা, দুটোর সব কিছুই আলাদা। বিবেকী পুরুষ এই দুটোকে ধীর স্থির ভাবে আলাদা করে শ্রেয়কে বরণ করেন, এটাই বলছেন *শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে*। *প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে*, যারা মন্দ বুদ্ধির পুরুষ তারা প্রেয়কে বেছে নেন। প্রেয়কে বিশ্লেষণ করছেন যোগ আর ক্ষেম দিয়ে।

মন্ত্রে প্রথমে স্বাধীন ইচ্ছাকে নিয়ে বলছেন। আমরা যে বলি সব কিছু কর্ম দ্বারা প্রেরিত হয়ে আসছে, কিন্তু তা নয়। এর আগে আমরা কত উপমা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছি, যেমন আমি ভারতের ক্রিকেট টিমকে ভালোবাসছি সেটা ভালোই কিন্তু যদি ক্রিকেটকে ভালোবাসি তাহলে সেটা আরও ভালো। নম্বর পাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে যদি পড়াশোনা করি ভালো কিন্তু জ্ঞানার্জনের জন্য যদি পড়াশোনা করা হয় সেটা আরও ভালো, টাকা উপার্জন করছি খুব ভালো কিন্তু সমাজ ও দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য যদি চেষ্টা করি সেটা আরও মহৎ, তাতে আমারও ভালো হবে আরও পাঁচজনের ভালো হবে। এগুলোই personal আর impersonal aspect। মন্দ বুদ্ধি আর ধীর পুরুষকে আচার্য এভাবে বিশ্লেষণ করছেন – *ব্যামিশ্রীভূতে ইব মনুষ্যম্ পুরুষম্ আ+ইতঃ এতঃ প্রাপ্নুতঃ শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ। অতো হংসে ইবাম্ভসঃ পয়ঃ*, দুধ আর জল মিশে থাকলে হাঁস যেমন শুধু দুধটুকু নিয়ে জলকে ছেড়ে দেয়, ঠিক তেমনি জীবনে যখন শ্রেয় আর প্রেয় দুধ আর জলের মত মিলেমিশে আসে, সাধারণ মানুষ দুটোকে আলাদা করে নিতে পারে না, কিন্তু ধীর পুরুষরা পারেন। ধীর পুরুষ মানে যাঁর ধৃতি অর্থাৎ ধরে রাখার ক্ষমতা আছে। একটা স্তর পর্যন্ত বুদ্ধি সবারই থাকে। যেটা সবার থাকে না তা হল, লেগে থাকার ক্ষমতা। আমরা সবাই জানি নিয়মিত আহার করতে হয়, নিয়মিত শরীর চর্চা করতে হয়, নিয়মিত জপ-ধ্যান করতে হয়। আমরা একেবারেই কিছু করছি না তা নয়, মাঝে মাঝে হাত-পা নাড়িয়ে নিচ্ছি, মাঝে মাঝে একটু জপ-ধ্যানও করে নিচ্ছি, কিন্তু নিয়মিত ভাবে করছি না। আহারের ক্ষেত্রে রোজই ঠিক ঠিক খেয়ে নিচ্ছি, সাত দিন পরে কোথাও একটু ভালোমন্দ খাওয়ার সুযোগ এসে গেল, খুব করে সেদিন খেয়ে নিলাম আর তিন দিন বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে থাকলাম। কিন্তু যাঁরা ধীর পুরুষ তাঁরা কখনই এভাবে চলেন না, ধীর মানে ধরে রাখার ক্ষমতা। ধৃতি থেকে ধারণা বা ধারণ করার ব্যাপারটা এসেছে। ধৃতি মানে একটা বিচার করে নিল, বিচার করার পর বিবেককে যখন সজাগ করে দিল তারপরে ঐ জিনিষটাকে ধরে রাখবে, যত বিঘ্নই আসুক আর ওটাকে ছাড়বে না। ধীর পুরুষ কি করেন? *সম্পরীত্য সম্যক্ পরিগম্য*, অর্থাৎ একটা জিনিষের একেবারে ভেতরে ঢুকে, ভালো ভাবে বিচার করে, তার মধ্যে কোনটা চিনি কোনটা বালি আলাদা করে ঠিক জিনিষকে ধরে নেবে, ধরে নেওয়ার পর এবার সেটাকেই আঁকড়ে পড়ে থাকবে, আর ওকে ছাড়বে না। সেইজন্যই বলে মুক্তির পথ খুব কঠিন। কারণ সারাটা দিন, প্রত্যেকটি পদক্ষেপে শ্রেয় আর প্রেয় এই দুটো মিলেমিশে আসতে থাকে, তার মধ্য

থেকে বেছে বেছে শ্রেয়কে ধরে রাখতে হচ্ছে। এটাকেই আচার্য বলছেন – *পৃথক্ করোতি ধীরঃ ধীমান্*। আচার্য এখানে ধীরের সংজ্ঞা দিচ্ছেন *ধীমান্*, যাঁর বুদ্ধি আছে। অন্য দিকে *ধীরঃ* শব্দের সাধারণ অর্থ হয় যিনি দীর্ঘদিন একটা জিনিষকে ধরে রাখেন বা ধরে রাখার ক্ষমতা যাঁর মধ্যে আছে। বুদ্ধি সবারই আছে কিন্তু ধরে রাখার ক্ষমতা সবার মধ্যে থাকে না। বুদ্ধিমান আর ধীরের মধ্যে বিরাট তফাৎ। পাড়ার মস্তানদেরও বুদ্ধি আছে, বুদ্ধিকে কোথায় লাগাতে হবে সেটাও জানা আছে কিন্তু ধরে রাখার ক্ষমতা তাদের থাকে না, সেইজন্য এদের ধীর পুরুষ বলা যাবে না।

ধীর পুরুষের বিপরীত, যারা মন্দ বুদ্ধির তারা প্রেয় জিনিষকেই বেছে নেয়। প্রেয়কে ব্যাখ্যা করছেন যোগ আর ক্ষেম রূপে। শাস্ত্রে যোগ মানে একটা জিনিষকে প্রাপ্ত করা, ক্ষেম মানে সেই প্রাপ্ত জিনিষের রক্ষণ করা। আমি প্রচুর টাকা রোজগার করছি কিন্তু টাকাকে ধরে রাখতে পারছি না, নানা ভাবে টাকা হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। শুধু প্রাপ্ত করলেই হবে না, ওটাকে রক্ষণ করার ক্ষমতা থাকা চাই। প্রাপ্ত করা এবং প্রাপ্তবস্তুকে ধরে রাখা, এই দুটোকে একত্রে বলেন যোগক্ষেম। প্রাপ্ত বস্ত কি রকম? আচার্য বলছেন, *পশুপুত্রাদিলক্ষণং*, আগেকার দিনে পশুধন মানে গরু, ঘোড়া, হাতি, এগুলো থাকা মানে তার অনেক ঐশ্বর্য আছে। সাধারণ মানুষ যা কিছু করে সব শক্তি তার যোগক্ষেমেই চলে যায়। যোগক্ষেমে শক্তি চলে যাওয়া মানে, যা কিছু উপার্জন করল সব স্ত্রীর পুত্রের জন্য রেখে দিল, খেটেখুটে যা কিছু রোজগার করল সব রোজগারের ধন পশু, জমি সংগ্রহ করতেই বেরিয়ে গেল। যে কোন জাগতিক জিনিষের সংগ্রহন করা আর তার সংরক্ষণ এটাই যোগক্ষেম। যোগ বলতে চিত্তবৃত্তি নিরোধ, কিন্তু এখানে যোগ তা নয়।

তাহলে শ্রেয় মানে মুক্তি সাধনের পথ আর প্রেয় হল সংসারের জন্য যা ভালো। প্রেয় আর শ্রেয়র আরেকটি নাম অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়স। প্রেয় সব সময় অভ্যুদয় নিয়ে আসে, অভ্যুদয় মানে সাংসারিক বা জাগতিক কল্যাণ, নিঃশ্রেয়স মানে মুক্তি। নিঃশ্রেয়সের পথ অত্যন্ত কঠিন, একমাত্র যাঁরা বিবেকী ও ধীর পুরুষ তাঁরাই নিঃশ্রেয়সের পথকে অবলম্বন করতে পারেন। যারা মন্দবুদ্ধির, অবিবেকী তারা প্রেয়র পথকে বেছে নেয়, যে পথ তাদের যোগক্ষেম বা অভ্যুদয়ের দিকে নিয়ে যায়। এগুলোকে কেন প্রেয় বলা হবে আর এগুলিকে কেন শ্রেয় বলা হবে এই নিয়ে এখান থেকে পর পর আলোচনা চলতে থাকবে। কিন্তু মূল জিনিষটাকে এর আগে আলোচনা করে দেখান হয়ে গেছে যে শ্রেষ্ঠ আর অশ্রেষ্ঠর মধ্যে কোথায় পার্থক্য। যাঁরা শ্রেয়কে বরণ করেন তাঁরা প্রেয়টাও পান। আমাদের একটা ভুল ধারণা যে যাঁরা শ্রেয়র পথে চলে যান তাঁরা জগতের সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে যান। কিন্তু জিনিষটা পুরো উল্টো, সব অর্থেই তাঁদের সুখ অনেক গুণ বেড়ে যায়। ঠাকুর বলছেন, আমি মায়ের নাম করি বলে সব জিনিষ হাজির হয়ে যায়। যাঁরা ঈশ্বরের পথে চলে যান, শ্রেয়কে যাঁরা বরণ করে নেন তাঁরা প্রেয়টাও পান। যেমন, যাঁরা দেশের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করছেন তাঁদেরও প্রচুর আর্থিক স্বচ্ছলতা হয়। যারা শুধু নিজের জন্য আয় করছে তারা শুধু খেটেই মরে, কান্না ছাড়া তাদের জীবনে আর কিছু থাকে না। যারা একটা বিষয়কে জানার জন্য খেটে যাচ্ছে তারা পরীক্ষায় নম্বরও পায় তার সাথে বিষয়ের জ্ঞানটাও পেয়ে যায়। যারা শুধু নম্বরের জন্য খেটে যাচ্ছে তাদের জ্ঞানপ্রাপ্তিতে ঘাটতি থেকে যায়। শ্রেয়কে যাঁরা বরণ করেন তাঁরা যদি চান তাহলে প্রেয়কেও তার পেয়ে যান। কিন্তু মুশকিল হল তাঁদের কিছু পাওয়ার ইচ্ছাটাই চলে যায়, এটাই আশ্চর্যের। কিন্তু প্রেয়কে যারা বরণ করে তাদের মন সব সময় সেই জিনিষের প্রতিই যাবে যে জিনিষগুলির প্রতি সে নিজেকে জুড়ে রেখেছে, তার মানে নিজের শরীরকে কিভাবে ভালো রাখতে হবে, ধন-সম্পদ কিভাবে বৃদ্ধি হবে, সন্তানাদিকে কি করে সুখী করা যায় ইত্যাদি জিনিষগুলির দিকে মন চলে যায়। যমরাজ এভাবে শ্রেয় আর প্রেয়কে নিয়ে একটা ভূমিকা দিলেন, এরপরেও শ্রেয় আর প্রেয়কে নিয়ে বলবেন। শ্রেয় আর প্রেয় কিন্তু উপনিষদের মূল বিষয়বস্তু নয়, এর মূল বিষয় হল আত্মতত্ত্ব, যমরাজ পরে ধীরে ধীরে আত্মতত্ত্বে ঢুকবেন। পরের মন্ত্রে যমরাজ বলছেন –

স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামা-
নভিধ্যায়ন্নচিকেতোহত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো
যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ।।১/২/৩।।

(হে নচিকেতা! তোমাকে বারংবার প্রলোভিত করা সত্ত্বেও প্রিয়বস্তু এবং প্রীতিপ্রদ কাম্য পদার্থকে বিশেষ ভাবে বিচার করে পরিত্যাগ করেছ। যে ধনবহুল সংসারমার্গে মানুষ আসক্ত হয়ে আছে তাকে তুমি গ্রহণ করনি।)

যমরাজ নচিকেতাকে বলছেন, তুমি ধন্য তোমার মধ্যে কোন প্রলোভন নেই। প্রিয় জিনিষকে আচার্য ব্যাখ্যা করছেন *পুত্রাদীন্ প্রিয়রূপাংশ্চ*, প্রিয় মানে যে জিনিষগুলিকে মানুষ চোখের সামনে দেখছে আর প্রিয়রূপী মানে যে জিনিষের অনুভব হয়েছে এবং তার একটা স্মৃতি রয়েছে। মানুষের দুঃখ-কষ্টের অভিজ্ঞতা শুধু বর্তমানকে নিয়েই হয় না, কিছুটা বর্তমান আর কিছুটা অতীতকে নিয়েও হয়। আগে আগে যে সুখভোগ করা হয়ে গেছে সেটা স্মৃতি রূপে আসে বা অনেক সময় নিদ্রায় স্বপ্ন রূপেও আসে। ভবিষ্যতে যে সুখ বা দুঃখ ভোগ করতে হতে পারে সেটা কল্পনা রূপে আসে। স্মৃতি আর কল্পনার মাঝখানে বাচ খেলে বর্তমান। প্রিয় জিনিষটা বর্তমান, তবে এমনও হতে পারে সেটা আগে ছিল কিন্তু এখন নেই বর্তমানে চাইছে। তবে বোঝা যায় যে, যে জিনিষের ব্যাপারে তার ধারণা আছে সেটাকে প্রিয় বলছেন আর যে জিনিষের কোন ধারণা নেই, কিন্তু সেই জিনিষের প্রতি ধাবিত হচ্ছে সেটাকে প্রিয়রূপ বলছেন। সেইজন্য প্রিয় জিনিষকে বলছেন পুত্রাদিন্ আর অপ্সরাদিকে বলছেন প্রিয়রূপ। প্রিয়রূপ মরীচিকা নয়, কোথাও শুনেছে যে এই রকম কিছু জিনিষ আছে, সেখান থেকে তার মনে একটা ধারণা হয়ে গেছে। নল-দময়ন্তীর কাহিনীতে প্রিয়রূপের কিছুটা বর্ণনা পাওয়া যায়। হাঁস নলকে দময়ন্তীর রূপের বর্ণনা করল। দময়ন্তীর রূপের বর্ণনা শুনে শুনে নলের মনে দময়ন্তীর রূপের একটা ধারণা হয়ে গেল, দময়ন্তী তখন হয়ে গেল প্রিয়রূপ। বিবাহ করার পর দময়ন্তী প্রিয়রূপ থেকে প্রিয় হয়ে গেল।

স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামান্, যত রকমের কাম হতে পারে তার কোনটা হয় প্রিয়রূপ হবে আর তা নাহলে প্রিয় হবে। নচিকেতাকে যমরাজ বলছেন, তুমি প্রিয় আর প্রিয়রূপ দুটোই ছেড়ে দিয়েছ। অনেক সময় আমরা বলতে শুনি, জিনিষের ভোগ মিটে গেলে জিনিষকে ফেলে দেয়। কিন্তু যে জিনিষের ভোগ হয়নি সেই জিনিষের কি হবে? এগুলো প্রিয়রূপ হয়ে ভেতরে থেকে যাবে। প্রিয় যতখানি বিপদের প্রিয়রূপও ততটাই বিপজ্জনক। অনেক সময় প্রিয়রূপ আরও বেশি বিপজ্জনক হতে পারে। কারণ মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের একটা মতে বলা হয়, যার কথা প্রথম বলেছিলেন উইলিয়ম জেমস্, কল্পনার মধ্যে যে জিনিষগুলি সৃষ্টি হয় সেই জিনিষের তীব্রতা অনেক গভীর হয়, সুখেরও যেমন তীব্র প্রভাব হয় তেমনি দুঃখ, ভয়েরও তীব্রতার মাত্রা অনেক বেশি হয়। আমাকে হরিদ্বার যেতে হবে, আগে কখনও আমি হরিদ্বার যায়নি, কিন্তু এর ওর মুখে হরিদ্বারের অনেক কথা শুনেছি, একটা অজানা আনন্দের আভাসে আমার মনটা উদ্বেলিত হয়ে উঠছে, এটাই প্রিয়রূপ। কল্পনার রাজ্যে অনেকটা জায়গা জুড়ে হরিদ্বার এখন বিরাজ করে আছে। কিন্তু হরিদ্বারে যাওয়ার পর অতটা আনন্দ নাও হতে পারে। আবার অনেক সময় আমরা বলি, যতটা শুনেছি তার থেকে অনেক বেশি। তবে সাধারণত কল্পনার রাজ্যে আনন্দ বা দুঃখের অনুভবের তীব্রতা সব সময় বেশিই হয়, বাস্তবে সুখ বা দুঃখ সব সময়ই কম হবে। ইঞ্জেকশান দেওয়ার আগে যতটা ভয় করবে দেওয়ার সময় ততটা আর ভয় করে না। এর একটা কারণ, মন সব থেকে শক্তিশালী, মন যখন সরাসরি কোন জিনিষকে ভোগ করে তখন তার সুখের মাত্রা বা ভয়ের মাত্রা অনেক বেশি হবে কিন্তু শরীরের মাধ্যমে ভোগ করার সময় তার মাত্রা অনেক কমে যায়। এখানে যমরাজ তাই বলছেন, তুমি শুধু প্রিয়কেই ছেড়ে দাওনি প্রিয়রূপকেও ছেড়ে দিয়েছ।

এর অন্যটাও হতে পারে, যে জিনিষের ব্যাপারে আমরা অবগত সেটাকে ছেড়ে যে জিনিষের ব্যাপারে অবগত নই সেটার প্রতি আকৃষ্ট হই না। স্বামীজীর বাড়ি অধিগ্রহণের আগে ওখানকার ভাড়াটেরা কত কষ্টে ছোট্ট একটা ঘরে গোটা পরিবারকে নিয়ে দিন কাটাত অথচ তাদেরকে তিন কামরার ফ্ল্যাট দেওয়া হচ্ছে তার সাথে আট দশ লাখ টাকা দেওয়া হচ্ছে তবুও তারা ঐ ছোট্ট ঘরটা ছেড়ে যেতে রাজী নয়। যখন বাধ্য হয়ে ছাড়তে হল তখন আবার মহারাজদের গালাগাল দিতে দিতে গেল। যে জায়গাতে সে আছে ঐ জায়গাতে তার মন এমন বসে গেছে সেটাই এখন প্রিয় হয়ে গেছে, এর থেকে অনেক গুণ ভালো জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিন্তু সে যেতে চাইছে না। ওখানে যাওয়ার পর সবাই ভাবছে – বাপরে! ওখানে আমরা কী করে ছিলাম! এখন যদি বলা হয় স্বামীজীর বাড়িতে আগের মত ভাঙা ছোট্ট ঘরে থাকতে ওরা আর কেউ থাকতে চাইবে না, এটাই প্রিয় আর প্রিয়রূপ। নচিকেতা এই দুটোকেই ছেড়ে দিয়েছেন।

অভিধ্যায়ন্ অত্যস্রাক্ষী, চিন্তন করে, গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করে নচিকেতা বুঝে গেছে এগুলোর কোন দাম নেই, এগুলো সবই অনিত্য, কোনটাই স্থায়ী নয়। যা কিছু personal aspect, যা কিছু empirical

aspect সবই অনিত্য, আজ আছে কাল থাকবে না। কোন জিনিষকে যদি জীবন থেকে বাদ দিতে হয় তাহলে সব সময় সেই জিনিষের দোষ দেখতে হয়। গীতায় ভগবান বলছেন *দুঃখদোষানুদর্শনম্*, সেই জিনিষের দোষ দর্শন করতে হয়। ঠাকুর বলছেন, বিচার করে দেখো নারী শরীরে কী আছে। তারপর নিজেই বলছেন, অস্তি, চর্ম, রক্ত, মজ্জা, মল-মুত্রাদি ছাড়া নারী শরীরে কিছু নেই। বিচার করারও দরকার নেই, নারীর শরীরকে দুগুণ করে দেখলে তো তাকে একটা রাক্ষসী মনে হবে। যে জিনিষে মানুষ দোষ দর্শন করে মানুষ সেই জিনিষ থেকে সরে আসে। সেইজন্য বলা হয়, যদি কারুর সাথে নতুন করে পরিচিতি করতে হয় তখন তার দু-চারটে দোষ জেনে রাখতে হয়। এতে সুবিধা হল, যদি কোন পরিস্থিতিতে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় বা সে যদি নিজে থেকে ছেড়ে চলে যায় তখন ঐ দোষটুকু চিন্তা করে তাকে সহজে মন থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু যেখানে সত্যিকারের ভালোবাসা দিয়ে গভীর ভাবে জুড়ে রেখেছে সেখানে সে যদি চলে যায় সেই মুহুর্তে তার দোষের কথা মনে আসবে না। তার মধ্যে দশ-বারোটা দোষ থাকতে পারে কিন্তু তবুও সে তাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। মানুষ তাই মহৎ হতে পারে না। *অভিধ্যায়ন্*, চিন্তন করে, বিচার করে করে এগুলোকে ছাড়তে হবে। নচিকেতাকে মাধ্যম করে আমাদের এই উচ্চতত্ত্ব দেওয়া হচ্ছে। যদি কেউ শ্রেয়র পথ বেছে নিতে চায় তাকে কেমন হতে হবে সেটাই এখানে দেখাচ্ছেন।

আচার্য তাঁর ভাষ্যে দুটো বৃহৎ দোষকে নিয়ে বলছেন, *অনিত্যত্বাসারত্বাদিদোষান্*, যত দোষ দেখা যেতে পারে ততই ভালো, কিন্তু সবচেয়ে সহজ দোষ হল অনিত্য আর অসারত্ব। এই ভুল কাজটা করা যাবে কি যাবে না, যখনই কোন কাজের ব্যাপারে আমাদের মন খুঁতখুঁত করতে থাকে, তখন সেই কাজের যে ফল সেই ফলের অনিত্যতা আর অসারত্বতাকে নিয়ে বিচার করতে হবে। পাশের বাড়িতে একটা দামী গয়না আছে, এবার যদি কেউ আপনাকে ওটা চুরি করে নিয়ে আসতে বলে, তখন আপনাকে এইভাবে বিচার করতে হবে – গয়নাটা দশ হাজার টাকায় বিক্রি হবে, আমাকে পাঁচ হাজার দেওয়া হবে আর যে খবর দিয়েছে সে পাঁচ হাজার পাবে। তখন আপনি তাকে কী বলবেন? এটাই বলতে হবে, এই পাঁচ হাজার টাকায় আমার কদিন যাবে? এই কটি টাকার জন্য আমি নিজেকে কেন আপনার কাছে বিক্রি করব? এই বিচারই হয়ে গেল *অনিত্যত্বাসারত্বদিদোষান্*। কিন্তু এই টাকাটাই যদি দু লাখ হয়ে যায়? তখনও করতে যাব না। কিন্তু দু কোটি যদি হয়ে যায়? তখন জিনিষটা অন্য রকম দাঁড়িয়ে যাবে, এবার আপনি একটু ভাববেন। সমস্যা হল, যে জিনিষটাই বর্তমানে আমাদের কাছে আছে সেই জিনিষটাই দু কোটি নয়, দুশো কোটি, দু হাজার কোটি, দু লক্ষ কোটি এই পরিমাণ মূল্যের জিনিষ বলে মনে হয়। যাঁরা আত্মজ্ঞানী, আচার্যের ভাষায় *বিশ্বত্যাক্তা স্বপ্নবিচারঃ*, যাঁরা ঐ অবস্থায় পৌঁছে গেছেন তাঁরা ছাড়া সবাই শুধু সুযোগ পায় না বলে সৎ হয়ে আছে। হয় তার ক্ষমতা নেই আর তা নাহলে সে সুযোগ পাচ্ছে না বলে নিজেকে সৎ বলছে। প্রত্যেকটি মানুষের কাছে প্রত্যেকটি জিনিষের একটা আলাদা মূল্য রয়েছে, ঐ মূল্যটা তাকে দিয়ে দিন আপনি তাকে পেয়ে যাবেন। এর থেকে বেরোবে কী করে? *অনিত্যত্বাসারত্বদিদোষান্*, বার বার বস্তুর অনিত্য আর অসারত্বকে বিচার করে করে সরাতে হবে। এর আগে যমরাজ বলেছিলেন বুদ্ধিমান, ধীর পুরুষ, বিবেকী পুরুষ না হলে শ্রেয়র পথে আসতে পারবে না। এখন বলছেন প্রেয় বস্তুর অনিত্যত্ব আর অসারত্ব এই দুটো বিচার করে করে প্রেয় বস্তুকে না সরালে শ্রেয়র পথে আসতে পারবে না। যমরাজ দেখছেন নচিকেতা এমনই বুদ্ধিমান যে যেখানে সাধারণ মানুষ *যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ*, যে প্রিয় ও সুখোৎপাদক বস্তুর মধ্যে ডুবে গিয়ে সবাই হাবুডুবু খেয়ে যাচ্ছে, সেগুলোকে বিচার করে সে সব ত্যাগ করে দিয়েছে। ঠাকুর বলছেন সংসার হল বিশালক্ষীর দ, হাতিও যদি তাতে নামে সেও আর বেরিয়ে আসতে পারবে না। সাধারণ মানুষের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। অনেক লেকচার শুনতে পারি, অনেক শাস্ত্র কথা শুনে থাকতে পারি, শাস্ত্র অধ্যয়ন করে থাকতে পারি কিন্তু নচিকেতার মত এভাবে বিচার করা আমাদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। এগুলিকে ধারণা করার জন্যও যে ধরণের ত্যাগ দরকার, ঐ ত্যাগ সংসারীদের পক্ষে সম্ভব নয়। সন্ন্যাসী মনে করছে, আমার মনে জগতের কোন কিছুরই পাওয়ার আকাঙ্খা নেই, কিন্তু সব বাসনাই সূক্ষ্ম ভাবে মনের মধ্যে বসে আছে। সূক্ষ্ম বাসনাগুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত হচ্ছে না বলে পুরো জিনিষটা অন্য একটা চ্যানেলে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়, এই চ্যানেলের নাম হল নাম-যশ-সম্মান। বয়স হয়ে গেছে, ইন্দ্রিয় আর শারীরিক ক্ষমতা চলে গেছে, শক্তিও নিঃশেষিত হয়ে গেছে, মনে করছে আমি কামিনী-কাঞ্চন থেকে বেরিয়ে এসেছি। কিন্তু কী করে বেরোবে! বীজটা তো থেকে গেছে।

আপনার দশ কোটি টাকা আছে, ঐ টাকা আপনি একটা চেকে convert করে ব্যাঙ্কে রেখে দিলেন। এবার আপনি ঐ একটি চেককে যত খুশী চেকে convert করতে পারেন। আমাদের সব ইমোশানের ক্ষেত্রে ঠিক তাই হয়। কামিনী-কাঞ্চনের ব্যাপারটা বয়সের সাথে সাথে চলে যায়। তাতে কি সে উপরে উঠে যাবে? কামিনী-কাঞ্চন জনিত সব ইমোশান এখন convert হয়ে একটা single চেকে চলে গেছে desired for recognitionএ, অর্থাৎ সম্মানে। বৃদ্ধ বয়সে সব কিছুই ছেড়ে দেয় কিন্তু নিজের সম্মানটুকু কখনই ছাড়তে চাইবে না। শ্রীমা বলছেন, সাধুর সব কিছু চলে যায় কিন্তু তাঁর সাধুত্বের অহঙ্কার যায় না। কারণ কামিনী-কাঞ্চনই 'আমার মত সাধু নেই' সাধুত্বের এই অহঙ্কারে নেমে যায়। মৃত্যুর পর আবার যখন জন্ম নেবে তখন এই চেকটাই কামিনী-কাঞ্চনের ক্যাশে convert হয়ে কত চেক জেনারেট করতে থাকবে কে জানে! এখন শুধু এ্যাকশান আর এ্যাকশান চলতে থাকবে। যে মুহুর্তে বৃদ্ধ হয়ে যাবে তখন আর এ্যাকশান করতে পারবে না, আগে যে তৃপ্তির খোরাক আসছিল সেই খোরাককে এখন সম্মানের মাধ্যমে নিয়ে আসতে চাইবে। এই কথাই যমরাজ বলছেন, *মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ*, সবাই কামিনী-কাঞ্চন, নাম যশে একেবারে ডুবে আছে।

এদের কি হয়? *নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো*, এর আগে দ্বিতীয় বরে *সৃঙ্কা* শব্দটা এসেছিল, সেখানে এর অর্থ করা হয়েছিল বহু মূল্যের দিব্য স্বর্গীয় মালা, যে মালা কোন দিন মলিন হয় না। আচার্য সেখানে সৃঙ্কার আরেকটা অর্থ বলেছিলেন সৃঙ্কা মানে কর্মের গতি অর্থাৎ শুভ কর্ম করার জন্য, নাচিকেত অগ্নি চয়ন করার জন্য তিনি যে উচ্চ গতি পান, সেই গতিকে বলছেন সৃঙ্কা। এখানেও সেটাই বলছেন, *নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো*, গতি মানে পথ, যে পথ নিলে *বিত্তময়ীমবাপ্তো*, প্রচুর বিত্ত হয়। টাকার পথ বেছে নেওয়াকে আচার্য বলছেন *কুৎসিতাং*, নিন্দিত পথ। ভারতে সেইজন্য কোন দিনই টাকা-পয়সাকে সম্মান দেওয়া হত না। বৈশ্যদের প্রচুর টাকা ছিল কিন্তু সামাজিক স্তরে তারা তিন নম্বরে ছিল। কিন্তু এখন পাশ্চাত্যের প্রভাবে হঠাৎ করে টাকা-পয়সা দেখানোর ভাবটা এসে গেছে, আচার্য এই ভাবকে বলছেন *কুৎসিতাং*। যাঁরা খুব উচ্চমানের বিজ্ঞানী, শিল্পী, সাহিত্যিক তাঁরা টাকা-পয়সা নামযশের দিকে কখনই তাকাতেন না। এগুলো কুৎসিত গতি। কারা এই পথে যায়? যারা মূঢ়মতি, যাদের সাধারণ বুদ্ধি। মন্দ বুদ্ধির মানুষই *মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ*, এই প্রেয়র মধ্যেই হাবুডুবু খেতে থাকে। চারিদিকে যাদের আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি, বিচার করলে দেখা যাবে, সবাই মূঢ়। আচার্য খুব সুন্দর এখানে বলছেন, এই যে আগে বলা হল শ্রেয় আর প্রেয় এই দুটোর মধ্যে যাঁরা শ্রেয়কে অবলম্বন করেন তাঁরা উপরের দিকে উঠে যান আর সাধারণ মানুষ প্রেয়কে অবলম্বন করে পরম পুরুষার্থ থেকে পতিত হয়ে যায়। *তৎ কস্মাৎ?* কেন এই রকম হয়? পরের মন্ত্রে এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন –

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী
অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে
ন ত্বা কামা বহবোহলোলুপন্ত।।১/২/৪।।

(যা অবিদ্যা এবং যা বিদ্যা রূপে খ্যাত, এরা উভয়ে অত্যন্ত বিভিন্ন এবং বিরুদ্ধ-পথগামী। নচিকেতা! তোমাকে আমি বিদ্যাভিলাষী মনে করি, কেননা বহু কাম্যবস্তু তোমাকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি।)

দুটি পথ, বিদ্যা আর অবিদ্যার পথ, এর একটি হল বিবেক রূপ আরেকটি অবিবেক রূপ। বিবেক রূপ কেন? ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলছেন ঈশ্বরই সত্য বাকি সব অনিত্য, মোক্ষমার্গই সত্য বাকি সব অনিত্য। যাদের মধ্যে এই ভাব আছে তারাই বিবেকী, যাদের মধ্যে এই ভাব নেই তারা অবিবেকী। আমরা সবাই সত্যিই জীবনে কি চাইছি? শরীর স্বাস্থ্য যেন ভালো থাকে, পরিবার পরিজনদের সবার যেন মঙ্গল হয় তার সাথে চাইছি দুটি টাকা-পয়সা আর সম্মান। এই যদি সত্যিকারের চাওয়া হয় তাহলে যতই আমরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করি, যতই মুখে বড় বড় ভাষণ দিই না কেন, সবাই অবিবেকী। এর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবে না, নিজেকেই এগুলো বিচার করে ঠিক করে নিতে হয়। আলো আর অন্ধকার যেমন এক সঙ্গে থাকতে পারে না, ঠিক তেমনি বিদ্যা আর অবিদ্যা কখনই এক সঙ্গে থাকতে পারে না, কারণ এই দুটোই বিবেক আর অবিবেক রূপ। *দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী*, *বিষূচী* মানে যাদের আলাদা আলাদা গতি, গতি মানে পথ। দুটোরই পথ আলাদা, দুটোরই লক্ষ্য আলাদা, দুটোই আলাদা জায়গায় নিয়ে যায়। আচার্য এখানে

অন্য একটা শব্দ বলছেন, *অন্যোন্যব্যাবৃত্তরূপে, ব্যাবৃত্ত* অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভাবে আলাদা। যে কাজই করি না কেন, সব কাজেই দুটো একসাথে মিলেমেশে থাকে। অবিদ্যার পথ বেছে নিলে সংসারের দিকে নিয়ে যাবে, বিদ্যার পথ বেছে নিলে মোক্ষের দিকে নিয়ে যাবে। যমরাজ বলছেন *বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে,* হে নচিকেতা আমি তোমাকে বিদ্যা অভিলাষি মনে করি। কারণ *ন ত্বা কামা বহবোহলোলুপন্ত,* অবিবেকীরা যে জিনিষকে কামনা করে সংসারের চরমতম ভোগের মধ্যে একেবারে মজে থাকতে চাইছে, সেই জিনিষগুলো তোমাকে কোন ভাবেই প্রলুব্ধ করতে পারল না। এই রমণীয় ভোগ্য সমূহকে নিয়ে তোমার হৃদয়ে যে একটু ক্ষোভণ হবে সেই ক্ষোভণটুকুও তোমার হৃদয়ে হয়নি, মোহ আসা তো অনেক দূরের ব্যাপার। ঠাকুর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন, বাচ্চা যদি একবার বলে দেয় মার কাছে যাব, এরপর আপনি যতই খেলনা দিন, লজেন্স দিন কোন কিছু দিয়েই তাকে আর থামানো যাবে না। ওর হৃদয়ে মা ছাড়া আর কিছু ঢুকবে না। যমরাজ বলছেন, হে নচিকেতা সেইজন্য আমি মনে করি তুমি হলে ঠিক ঠিক বিদ্যা অভিলাষি, তুমি হলে শ্রেয় পথের পথিক।

গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে দৈবাসুরসম্পদের কথা বলছেন, সেখানেও ভগবান ঠিক এই ভাবে অর্জুনকে বলছেন *মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাণ্ডব,* হে অর্জুন! তুমি দৈবী আর আসুরিক সম্পদের বর্ণনা শুনে চিন্তা করো না, আমি জানি তুমি দৈবী সম্পদের যোগ্য হয়েই জন্ম গ্রহণ করেছ। এখানে নচিকেতাকে যমরাজ পরীক্ষা করছেন আর গীতায় ভগবান অর্জুনকে পরীক্ষা করছেন, তাঁরা জানেন এরাই এই শিক্ষা পাওয়ার যোগ্য আধার, যাকে তাকে এনারা শিক্ষা দিচ্ছেন না, উপযুক্ত আধার হতে হবে। ঠাকুরও স্বামীজীকে শিক্ষা দিতে গিয়ে নানান ভাবে স্বামীজীকে বাজিয়ে নিচ্ছেন। স্বামীজীর বাবা বেঁচে আছেন, পরিবারে স্বচ্ছল অবস্থা, তখনও স্বামীজীর মন বিবেক বৈরাগ্যের দিকে। বাবা চলে গেলেন, পরিবারে প্রচণ্ড অভাব, মা, ভাই-বোনেরা খেতে পাচ্ছে না, তখনও তিনি বিবেক বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত। এই যে *সুখেদুঃখে সমে কৃত্বা,* যে অবস্থা জ্ঞানের পরে হয় সেই অবস্থাতে স্বামীজী আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত। স্বামীজীও তাই *বিদ্যাভীপ্সি*। ব্রহ্মবিদ্যার যদি তুমি আকাঙ্খী হও তাহলে তোমার জন্য যে সুখভোগ রাখা আছে সেগুলোর বাইরেও তোমাকে যেতে হবে আর দুঃখে পড়ে যদি তোমার মনে দায়ীত্ববোধ কর্তব্যবোধ জেগে ওঠে, তাহলে ব্রহ্মবিদ্যা তোমার জন্য নয়। বাড়ির লোকদের সুখভোগের ব্যবস্থা করতে হবে এটাও এক ধরণের সুখভোগ। স্বামীজী সেদিকে তাকালেন না, এনারাই ঠিক ঠিক বিদ্যা পথের পথিক। তবে ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হয়ে গেল তখন একটু কিছু করে দেওয়ার ইচ্ছে জাগতে পারে। স্বামীজী চিঠিতে লিখছেন কিছু টাকা যদি হাতে আসে তাহলে মা, ভাই-বোনদের একটু ভালো করে রাখবেন। কারণ স্বামীজী ঐ অবস্থাকে অতিক্রম করে চলে এসেছেন। আর সারা জগতের ভালো করে বেড়াচ্ছেন, দেশের মঙ্গলের জন্য সঙ্ঘ স্থাপনা করছেন, বিদেশ থেকে টাকা এনে বেলুড় মঠ তৈরী করছেন অন্য দিকে তাঁর মা না খেয়ে মরবেন, এই জিনিষ কখন কি হতে পারে! কিন্তু যখন সাধনা করছেন তখন আর অন্য কোন দিকে তাকাচ্ছেন না। যমরাজ তাই বলছেন, আমি তোমার উপর খুশী হয়েছি, এই বিদ্যা গ্রহণ করার যোগ্যতা তোমার মধ্যে আছে। পরের মন্ত্রে বলছেন –

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতন্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।।১/২/৫।।

(যারা অবিদ্যা-পরিবেষ্টিত হয়ে নিজেদের প্রজ্ঞাবান ও শাস্ত্রবিশারদ মনে করে অভিমান করে, এই সব কুটিল স্বভাব অবিবেকী ব্যক্তিরা বিভিন্ন লোকে পরিভ্রমণ করতে থাকে, যেমন অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্ধ ব্যক্তিরা ঘুরতে থাকে।)

উপনিষদে বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুটি শব্দ অনেকবার আসবে। অবিদ্যা আর বিদ্যা শব্দও দুটিও খুব technical শব্দ, এর অর্থও তাই খুব জটিল। সেইজন্য কোন পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যা ও অবিদ্যার কথা বলা হচ্ছে সেটাকে আগে দেখে নিয়ে সেই অনুসারে বিদ্যা আর অবিদ্যার অর্থ বুঝতে হবে। বিদ্যাকে আগে বুঝে নিলে অবিদ্যাকেও বোঝা যাবে, কারণ বিদ্যাকে যে যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হবে তার বিপরীতটাই তখন অবিদ্যা হয়ে যাবে। বিদ্যা ও অবিদ্যার প্রথম উল্লেখ আমরা পাই ঈশাবাস্যোপনিষদে, যেখানে বিদ্যা ও অবিদ্যাকে এক ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ঈশোপনিষদে বিদ্যার স্তুতি করে বলছেন *বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ*।

বিভিন্ন শাস্ত্রে বিদ্যাকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নীচের তালিকাতে বিদ্যার কয়েকটি শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, যেটাকে বিদ্যা বলা হচ্ছে তার বিপরীতটাই অবিদ্যা।

	বিদ্যা	**অবিদ্যা**
১)	দেবতা বিষয়ক জ্ঞান	যজ্ঞাদি কর্ম
২)	আত্মজ্ঞান	ধর্ম, অর্থ আর কাম
৩)	জ্ঞান	অজ্ঞান (বাকি সব কিছু)

বিদ্যার ব্যাপারে প্রথম যে ধারণা পাই যেখানে বিদ্যা বলতে বোঝায় দেবতা বিষয়ক জ্ঞান, যে বিদ্যা দ্বারা দেবতাদিকে জানা যায়। এর অবিদ্যা হবে যজ্ঞাদি কর্ম, যজ্ঞ করে যাচ্ছে, যজ্ঞের মন্ত্র বলে যাচ্ছে কিন্তু কিছু না বুঝেই মন্ত্র বলে যাচ্ছে আর যজ্ঞ করে যাচ্ছে। যেসব পুরোহিতরা বিবাহ, অন্নপ্রাশনাদি করান তাঁদের যদি মন্ত্রের অর্থ জিজ্ঞেস করা হয় বেশির ভাগ পুরোহিতরা বলতে পারবেন না, এটাকে বলছেন অবিদ্যা। দেবতা বিষয়ক জ্ঞান মানে যজ্ঞে যে মন্ত্র বলা হচ্ছে সেই মন্ত্রের অর্থ তাঁর কাছে পরিষ্কার, এবার সেই মন্ত্রের উপর তিনি যখন ধ্যান করছেন তখন তাকে বলছেন বিদ্যা। ঈশোপনিষদে বিদ্যা আর অবিদ্যাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদেও বিদ্যা আর অবিদ্যার অর্থ এভাবে করা হয়েছে। এই বিদ্যা আর অবিদ্যা টেকনিক্যাল শব্দ, আজকের দিনে বিদ্যার যে অর্থ তার সাথে এক করা যাবে না। ঈশোপনিষদে বলছেন, শুধু অবিদ্যায় যে রত সে ডুবে যায়, আর যে শুধু বিদ্যায় রত সে আরও বেশি ডুবে যায়। এখানে কি বলতে চাইছেন, এর কি অর্থ কিছুই বোঝা যায় না। আচার্য শঙ্করের ভাষ্য যদি না থাকত এর অর্থ কোন দিন আমাদের কাছে পরিষ্কার হত না। ঈশোপনিষদে পরিষ্কার বলছেন, যে অবিদ্যার উপাসনা করে যাচ্ছে সে অন্ধকারে ডুবে আছে, যে বিদ্যার উপাসনা করে যাচ্ছে সে আরও অন্ধকারে ডুবে আছে। এর অর্থ হল, যে মানুষ কোন দিন কোন কাজকর্ম করেনি কিন্তু নিজেকে শুধু দেবতা বিষয়ক জ্ঞানে নিয়ে গেছে এর দ্বারা কিছুই হবে না। উদ্বোধনে শ্রীমাকে তাঁর এক আত্মীয়া বলছেন, আমি মরে যেতে চাই, আমার সব সম্পত্তি তোমার নামে করে দিয়ে যাব। শ্রীমা প্রথমে মজা করে বললেন 'তা তুই কবে মরবি বল'। বলার পর শ্রীমার কি মনে হল, সত্যিই যদি মরে টরে যায়, তাহলে আবার কি না কি ঝামেলা হবে। তখন শ্রীমা খুব গম্ভীর হয়ে বললেন 'এখানে ওসব কিছু করতে যাস না, এখানে আমার সাধু, ব্রহ্মচারীরা আছে, উৎপাত যদি করতে হয় অন্য জায়গায় গিয়ে কর'। তারপরেই শ্রীমা কিছু কথা বলছেন, তার মধ্যে মূল কথা হল – তোর পাপ মন তাই তোর এত অশান্তি। এইসব কথাবার্তা হওয়ার পর সেই আত্মীয়া চলে গেলেন। তখন শ্রীমা বাকি সবাইকে বলছেন 'বুঝলে! খাটতে হয়, না খাটলে কি কিছু হয়! কাজ না করে বসে বসে মাথা গরম হয়ে গেছে। কাজকর্ম যদি না করা হয় আস্তে আস্তে মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে'। তারপর শ্রীমা আবার বলছেন 'ভোর তিনটে থেকে জপ কর দেখি, কি করে মাথা ঠাণ্ডা না হয় দেখি'। খাটা আর জপো, শ্রীমা একসাথে দুটোকে বলছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের দর্শনে কাজ আর জপ-ধ্যান দুটো একসঙ্গে চলে। ঈশোপনিষদে এটাই বলছেন, তুমি শুধু কাজ করে যাচ্ছ, তাও বাড়ির কাজ নয়, যজ্ঞ করে যাচ্ছে, তুমি অন্ধকারে যাবে। অন্ধকারে যাওয়া মানে, একটু স্বর্গটর্গ কোথাও যাবে আবার ওখান থেকে ফেরত আসতে হবে। আর যদি শুধু বিদ্যাতে থাক অর্থাৎ দেবতা বিষয়ক জ্ঞানে থাক, এখানে ধর্মের কথা শুনছে, বাড়িতে সবাইকে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে আর বাকি সময় শুয়ে ঘুমিয়ে কাটাচ্ছে। বুঝে নিন এরা আরও বেশি অন্ধকারে গিয়ে পড়বে। উপনিষদ বলছেন অবিদ্যার সাহায্যে বিদ্যাকে ধরে অর্থাৎ জ্ঞান আর কর্ম একই সাথে চালিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। এটা বিদ্যার প্রথম অর্থ।

বিদ্যার দ্বিতীয় অর্থ আত্মজ্ঞান, বিদ্যার এই অর্থ অনেক পরের দিকে এসেছে। এখানে অবিদ্যার অর্থটাও অন্য রকম, অবিদ্যার অর্থ হল ধর্ম, অর্থ ও কাম। মানুষ যখন ধর্ম, অর্থ আর কামের দিকে যায় তার মানে সে এখনও অবিদ্যার মধ্যে পড়ে আছে, বিদ্যা মানে মোক্ষ। বর্তমানে বিদ্যার তৃতীয় একটা অর্থ হল জ্ঞান, জ্ঞান মানে এখানে আত্মজ্ঞানের কথাই বলা হচ্ছে। আর অবিদ্যা বলতে বাকি সব কিছু। সব কিছু বলতে যা কিছু আছে, ধর্ম, অর্থ, কাম, ধনুর্বেদ, টাকা-পয়সা বানানোর বিদ্যা, রাজনীতি, শিল্পকলা সব কিছু। ঈশ্বর প্রাপ্তি কিভাবে হবে তার যে জ্ঞান সেটাই বিদ্যা, এর বাইরে বাকি সব কিছু অবিদ্যা। এই বিদ্যার খুব বিখ্যাত

সংজ্ঞা হল *সা বিদ্যায়া বিমুক্তয়ে,* যে বিদ্যা মুক্তি প্রদান করে সেটাই বিদ্যা, এর বাইরে বাকি সব অবিদ্যা। কিন্তু এর অর্থও ধীরে ধীরে পাল্টে গেছে।

উপনিষদে যখনই বিদ্যা বা অবিদ্যা শব্দ আসে তখন দেখতে হয় অবিদ্যা বলতে এখানে কোনটাকে বলছেন। অবিদ্যার প্রথম অর্থ, না বুঝে শুধু যজ্ঞ করে যাওয়া, দ্বিতীয় অর্থ ধর্ম, অর্থ আর কাম, তৃতীয় অর্থ অজ্ঞান। চতুর্থ একটা সাধারণ অর্থ হল, পুঁথিগত বিদ্যা আছে কিন্তু ব্যবহারিক কাজে লাগাতে পারছে না। অথচ বর্তমান কালে বিদ্যা মানে পুঁথিগত বিদ্যা, আর অবিদ্যা মানে অজ্ঞান। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে মাস্টারমশাই প্রথম এসেছেন, ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন, তোমার বিয়ে হয়েছে। মাস্টারমশাই বললেন হ্যাঁ হয়েছে। ঠাকুর আবার জিজ্ঞেস করছেন, তোমার পরিবার কেমন? বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি? মাস্টারমশাই শুনে বলছেন, আজ্ঞা ভাল, কিন্তু অজ্ঞান। ঠাকুর খুব বিরক্ত হয়ে বলছেন, আর তুমি জ্ঞানী! কথামৃতে মাস্টারমশাই নিজে লিখছেন, মাস্টার জ্ঞান কাকে বলে অজ্ঞান কাকে বলে তখনও জানতেন না, লেখাপড়া শিখলে আর বই পড়তে পারলেই জ্ঞান হয়। ঠাকুর মাস্টারমশাইর এই ধারণাকে ভেঙে দিচ্ছেন। যে কোন সাংসারিক জ্ঞানই অবিদ্যার মধ্যে। যে জ্ঞানে মানুষ স্বর্গে যেতে পারে সেই জ্ঞানও অবিদ্যা। যদি কেউ পড়াশোনা না করে থাকে? কখন কি হতে পারে যে মানুষ অজ্ঞানের মধ্যে পড়ে আছে, কিছু না হোক সকালে উঠে দাঁত ব্রাশ করতে হয় জানে, যাকে পাগল বলছি সেও জানে খাবার খেতে হয়, পাগলও খাবারটা নিয়ে কানে ঢোকায় না, মুখেই ঢোকায়। প্রত্যেকটি জীবের কিছু তো জ্ঞান থাকতে হবে। এক এক জনের জ্ঞান এক এক রকমের, পাগলের জ্ঞান এক রকমের আর পণ্ডিতদের জ্ঞান অন্য রকমের, যে জ্ঞান দিয়ে তাঁরা স্বর্গ পর্যন্ত যেতে পারেন।

দ্বিতীয় বল্লীর প্রথম অংশে দুটো জিনিষের স্তুতি করা হচ্ছে, এক হল শিষ্যের স্তুতি, যে ছাত্রকে যমরাজ পেয়েছেন তাঁর স্তুতি করছেন। দ্বিতীয় যে ব্রহ্মবিদ্যা বলা হবে সেই বিদ্যার স্তুতি করছেন। এখন শিষ্য অর্থাৎ নচিকেতার স্তুতি চলছে। যমরাজ নচিকেতাকে বলছেন, তুমি যে জগৎ থেকে এসেছ, সেই জগতে যাদের মহৎ বলে মনে করা হয় তারা কি রকম? *অবিদ্যায়মন্তরে বর্তমানাঃ,* এরা সবাই অবিদ্যার মধ্যে পড়ে আছে। অবিদ্যা বলতে উপরের তালিকায় যে কটি অবিদ্যার কথা বলা হয়েছে, যারা না বুঝে শুধু যজ্ঞাদি কর্ম করে যাচ্ছে, তবে এটাকে আনা যায় আবার নাও আনা যায়। কারণ ঈশোপনিষদে একটা বিশেষ অর্থে বলা হচ্ছে, কিন্তু একটু টানলে এখানে চলে আসতে পারে। যে কোন মন্দিরে গেলে পাণ্ডার বলতে থাকে এখানে এত টাকার পূজা দিন আপনার এই এই হয়ে যাবে, ওখানে এত টাকা দিলে আপনার অমুক হবে ইত্যাদি। পাণ্ডারা যে সব সময় আমাদের বোকা বানাবার জন্য বলছেন তা নয়, অনেক সময় অকপট ভাবেই বলেন। আমরাও হয়ত আর্ত হয়ে মন্দিরে গেছি, পূজারী আমার মনের অবস্থা দেখছেন, এই অবস্থায় তিনি আমাকে আর কি বলবেন, আমার হয়ে একটা পূজা করে দিলেন আর এই এই বলে দিলেন যাতে আমার মনটা শান্ত হয়ে যায়! কিন্তু এটাই যখন একেবারে অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে পূজারী আমার জন্য পূজা করছেন, এই আমি পূজো দিয়ে দিলাম এবার আপনার সব সমস্যা চলে যাবে, তখন এটাই অবিদ্যা হয়ে যায়। প্রথমে পূজারী ভালোবেসে, আমার প্রতি একটা করুণাবশাৎ আমাকে পূজা দেওয়ার কথা বললেন, যাতে আমার মনের অস্থিরতাটা প্রশমিত হয়ে যায়। কিন্তু সেখান থেকে এবার অন্ধ বিশ্বাস এসে গেছে, তখন সে অবিদ্যার মধ্যে ঢুকে গেল।

আচার্য বলছেন *অবিদ্যায়ম্ অন্তরে মধ্যে ঘনীভূত ইব তমসি বেষ্ট্যমানাঃ,* অবিদ্যার ঘন অন্ধকারে পোকার মত কিলবিল করছে। ঘন অন্ধকারে কিলবিল করাকে আচার্য পরিভাষিত করছেন মানুষ যখন স্ত্রী, পুত্র, পশু সব কিছুকে নিয়ে কামনা-বাসনার মধ্যে ঘুরঘুর করতে থাকে, *পুত্রপশ্বাদিতৃষ্ণাপাশশতৈঃ।* পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা আর প্রাচ্যের চিন্তাধারার মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য ধরা পড়ে। পাশ্চাত্য চিন্তাধারা বলে যেভাবেই হোক আমার জন্ম হয়ে গেছে, একদিন আমি মারা যাব, মৃত্যুর পর হয় আমি স্বর্গে যাব আর তা নাহলে নরকে যাব বা জীবন এখানেই শেষ। তাই আমাদের যা করার সব এই জীবনেই চটপট সেরে নিতে হবে। কারণ পাশ্চাত্য দর্শনের মতে ভগবান সৃষ্টিটা একবারের জন্যই করেছেন। ভগবান কোন পাগল নন, তিনি যখন সৃষ্টি করেছেন তখন তার একটা উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্যর পুর্তি আমার মাধ্যমে অবশ্যই করতে হবে। সেইজন্য এসে যায় goal setting। তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কি? জীবনটাই আমার উদ্দেশ্য, এছাড়া আর কি উদ্দেশ্য হতে পারে! হিন্দুদের কাছে সেটাও হয় না, হিন্দুদের কাছে আমার জীবনটাই সব কিছু, আমার অস্তিত্বই সব

কিছু, আমি আছি এই বোধটুকুই সব। জীবন শুরুই হয় 'অহম্ অস্মি' থেকে। একটা ব্যাকটেরিয়া বা এক কোষী প্রাণী সেও জানে আমি আছি, যার জন্য কিছু করলে সব প্রাণীই একটা প্রতিক্রিয়া জানায়। ওখান থেকে শুরু হয়ে জীবনের খেলা, শেষ হয় 'অহং ব্রহ্মাস্মি'তে গিয়ে। পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, সৃষ্টিচক্রে যা কিছু আছে শুধু একটি শব্দ যোগ করতেই চলে যায় – 'অহম্ অস্মি' দিয়ে শুরু আর 'অহং ব্রহ্মাস্মি'তে গিয়ে শেষ। কিন্তু 'আমি আছি' এই বোধ সব সময় চলতে থাকে, কখন পাল্টায় না। কোন জন্মে ছাগল ভেড়া হয়েছিল, কোন জন্মে হয়ত সাপ ব্যাঙ হয়েছিল সব অবস্থাতেই এই বোধ ছিল, 'অহম্ অস্মি'। এরপর মনুষ্য জন্মে সে সন্ত্রাসবাদী হয়ে বোমাই মারুক আর সাধারণ মানুষ হয়ে বোমাই খাক, সব সময় 'আমি আছি', আমিত্বের বোধ কিন্তু চলছে। যখন ঋষি হয়ে গেল তখনও ঐ আমিত্বের বোধ চলতে থাকে আর শেষে ঐ অহং ব্রহ্মাস্মিতে গিয়ে, আমি সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম এই বোধ যখন হয়ে গেল তখন অস্তিত্বের খেলা, সংসারের খেলা সব শেষ হয়ে গেল। তার মানে central thought আমিতে চলে।

আমিই সব কিছু, আমাকে বৃহৎ আমির দিকে এগোতে হবে, এই মনোভাব নিয়ে যখন বৃহৎ আমির দিকে এগোনর সচেতন লড়াই শুরু হয় তখন এখান থেকেই বিদ্যার শুরু হয়। বিদ্যা মানে ক্ষুদ্র আমি থেকে বৃহৎ আমিতে উত্তরণ। আর অবৃহৎ বা অনু বা হীন আমি সেখানে কি করে? আমিত্বের উপরও তার পুরোপুরি ভরসা নেই, তাই সে সন্তান, স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব, টাকা-পয়সা, বাড়ি, গাড়ি দশটা জিনিষকে জড়িয়ে নেয়, তারপর বলতে থাকে তোমার আনন্দেই আমার আনন্দ। এরাই অজ্ঞানী, এখনও এদের আমিত্বের বোধই আসেনি। আমিত্বের বোধ আসার পরই conscious struggle শুরু হয়, আমাকে এগোতে হবে, এগিয়ে এগিয়ে আমাকে বৃহৎ আমিতে পৌঁছাতে হবে। অহং ব্রহ্মাস্মি, আমি সচ্চিদানন্দের সাথে এক এই ভাব নিয়ে কেউই চলে না, কিন্তু আমাকে এগোতে হবে এই বোধটা আনতে হবে। শরীর বোধ একটা পশুরও আছে, সেও জানে আমার শরীরকে রক্ষা করতে হবে। যখন বলছি আমার শরীরের রক্ষা করতে হবে, তখন আমার আর পশুর মধ্যে কোন তফাৎ থাকছে না। রাস্তার যে কুকুর তিন চারটে বাচ্চা দেয় সেও তার বাচ্চাগুলিকে জড়িয়ে রাখে, তাদের খাওয়ায়, তাদের রক্ষা করে। মানুষও নিজের স্ত্রী, সন্তানদের একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখে। তাহলে রাস্তার কুকুরের সাথে মানুষের তফাৎ কোথায়? তফাৎ একটাই, অহম্ অস্মি এই বোধের সাথে বৃহৎ আমির দিকে লক্ষ্য রেখে উপরের দিকে উঠে আসার একটা নিরলস চেষ্টা মানুষ ইচ্ছে করলে করতে পারে। কিন্তু মানুষ চেষ্টা করতে চায় না, চেষ্টা না করে নিজেকে ছেড়ে দেয়। ফলস্বরূপ আমাদের উপর যে বিভিন্ন রকম শক্তি কাজ করছে সেই শক্তির ইচ্ছা দ্বারা আমরা চালিত হই। বাচ্চা বয়সে বাবা-মা স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে, ভর্তি হয়ে গেলাম, তারপর হায়ার সেকেণ্ডারী করার পর কলেজে ঢুকিয়ে দিল, ঢুকে গেলাম, একটা ডিগ্রী পেয়ে গেলাম, সেই ডিগ্রী নিয়ে একটা কিছু রোজগার করতে শুরু করলাম। তারপর কি করবে? হয় বাবা-মা একটা মেয়েকে আমার সাথে জুড়ে দিল, তা নাহলে নিজের থেকে কোন মেয়ের দিকে দৃষ্টি পড়ল, তারপর বিয়ে হয়ে গেল। সে জানলও না কেন সে বিয়ে করছে, খুব হলে মেয়েটির রূপ বা তার কোন গুণ তাকে আকৃষ্ট করেছিল বলে কাছে নিয়ে এল, সেটা তাও অনেক ভালো, আমি তার গুণকে ভালোবেসেছি এটা আমার সিদ্ধান্ত। কম্যুনিস্টরা বলে ধর্ম সমাজের আফিং কিন্তু তারা বুঝছে না, কামিনী-কাঞ্চনই সমাজের ঠিক ঠিক আফিং। কামিনী-কাঞ্চন মানুষকে অন্ধকারের মধ্যে চোখে পট্টি বেঁধে ছেড়ে দিয়েছে। আফিং খোড়দের কিছুক্ষণ পর পর যেমন আফিংএর গুলির দরকার হয়, যখন নেশার মৌতাত ধরে তখন সে জানে কোথায় গেলে আফিংএর গুলি পাওয়া যাবে, ঠিক সময়ে সেখানে পৌঁছে যায়। ঠিক তেমনি এই ঘর, বাড়ি, সংসার, স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, ধন, সম্পদ, যৌবন সব আফিংএর গুলি। এই নেশাতে সমস্ত জগৎ বুঁদ হয়ে আছে। কোন কারণে এর একটা গুলি যদি হাতছাড়া হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে সে আরেকটা গুলি খুঁজতে শুরু করে দেয়। আচার্য এটাই বলছেন *অবিদ্যায়ম্ অন্তরে মধ্যে ঘনীভূত ইব তমসি বেষ্টমানাঃ পুত্রপশ্বাদিতৃষ্ণাপাশশতৈঃ*, ঘন অন্ধকারের মধ্যে পোকার মত কিলবিল করছে, শত শত তৃষ্ণার পাশ সবাইকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে।

একটু ভালোবাসা, একটু সুখের ছায়া দেখলেই আমরা নেচে উঠছি। কিসের ভালোবাসা, কিসের সুখ, একবারও কি আমরা ভেবে দেখছি। আমাদের যত রকম আনন্দ, যদি সব আনন্দ object based হয়, তাহলে আমি যদি আপনাকে ভালোবেসে আনন্দ পাই তাহলে আপনাকে দেখে সবারই আনন্দ পাওয়ার কথা। কিন্তু সবাই আপনাকে ভালোবাসে না। একটা মেয়েকে পাগলের মত ভালোবেসে ছেলে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে,

মা বলছে আমার ছেলে ঐ প্রেতনীর পাল্লায় পড়েছে। ছেলে যাকে ভালোবাসছে তাকেই মা ডাইনি, প্রেতনী বলছে। তার মানে objective reality বলে কিছুই নেই, সবটাই subjective। তবে আপনার ভেতরে যে আনন্দ আছে, কোথাও সে যেন টোকা মেরে দিল। ঐ যে লোকটি, সে যেই হোক, সে আপনার সামনে যখন এল, আপনার ভেতরে যে ভালোবাসা ছিল সে এখন সেখানে টোকা মেরে দিয়েছে, এবার ওখান থেকে ভালোবাসা ফোয়ারার মত বেরিয়ে এল। আপনি মনে করছেন ওর জন্যই আমার এই ভালোবাসা। কিন্তু তা নয়, ভালোবাসাটা আপনি, সে টোকা মেরেছে। বলতে পারেন ওর টোকাতেই কেন হল? হ্যাঁ, এই জায়গা থেকে জীবন দর্শনের অনেক কিছু শুরু হয়, এর পেছনে অনেক কারণ থাকে, অনেক ঘটনা থাকতে পারে। আমরা যখন কাউকে ভালোবেসে বা নিজের টাকা-পয়সা, গাড়ি, বাড়ি, স্ত্রী, সন্তান, স্বামীকে ভালোবেসে, তাদের সান্নিধ্যে যে গভীর আনন্দ অনুভব করছি, এই আনন্দটা কোথা থেকে আসছে? বাইরে কোথা থেকেও আসছে না, আমার ভেতর থেকেই আসছে। অথচ আমরা বুঝতে পারিনা, আনন্দটা আমাদের ভেতরে, ভেতরেই আনন্দের অনুসন্ধান না করে আমরা বাইরের বিষয় বস্তুর দিকে ছুটছি। ভেতরে আনন্দের অনুসন্ধান করলে আনন্দ অনেক গুণ বেড়ে যাবে। আমার ঐ মানুষটির প্রতি কৃতজ্ঞতা থাকা দরকার যার জন্য আমার আনন্দের ফোয়ারাটা খুলে গেল, ব্যস ওখানেই সব কিছুর ইতি। দেবী! তোমাকে দেখেই জানলাম আমার ভেতরে আনন্দ আছে, আমি তোমার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ, এরপর আমি নিজেই আমার লক্ষ্যের সন্ধান করে নিতে পারব।

আপনার স্ত্রী, সন্তান, স্বামী, বন্ধু এরা আপনার দেবতা। আপনার ভেতরে যে ভালোবাসা, আপনার যে সেবার ভাব, আপনার ভেতরে যা কিছু ভালো সব এদের জন্য বেরিয়ে আসছে। এদের সৌজন্যে আপনি এক হীন পুরুষ থেকে মহাপুরুষের দিকে চলার সুযোগ পেলেন। আপনি এদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমরা কি করছি! কি করে তাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারি। যে হীন বস্তু আপনাকে মহৎ বানিয়ে দিল তার মধ্যেই আপনি ডুবে গেলেন। খাঁচায় বদ্ধ পাখিকে মুক্ত করে দিলেন, মুক্ত হয়ে পাখি বলছে তোমার মত লোক হয় না, আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারব না। পাখিটা আপনার কাঁধে বসে থাকে, সে আর কোথাও যেতে চাইছে না। একটা খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে আরেকটা খাঁচায় বদ্ধ হয়ে রইল, তাতে লাভটা কি হল! পাখিটার যদি বিবেক বুদ্ধি থাকে তাহলে সে খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে আপনার চারিদিকে একটা পাক মারবে, মনে মনে আপনাকে প্রণাম করে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আকাশে ডানা বিস্তার করে উড়ে চলে যাবে। কিন্তু সবাই অবিদ্যার মধ্যে পড়ে আছে আর পশু, পুত্র এদের মধ্যে পোকার মত কিলবিল করছে। এর মধ্য থেকে বেরোতেই পারছে না। কে বেরোতে পারে না? সব্বাই। ঠাকুর বলছেন শকুন অনেক উপরে থাকে কিন্তু দৃষ্টি তার ভাগাড়ে, পণ্ডিতরা অনেক শাস্ত্র পড়ে কিন্তু তাদের মন কামিনী-কাঞ্চনে।

তবে কি জগতে কামিনী-কাঞ্চনের দরকার নেই? অবশ্যই আছে। কারণ আমাদের মনে যে হাজার রকমের দুর্বলতা আছে সেগুলো তা নাহলে কি করে পূরণ হবে! সবাই তো আর ব্রহ্মজ্ঞানী আর সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য জগতে আসেনি। সেইজন্য যে কোন স্বামীর কাছে তার স্ত্রী হল দেবী। কেন? আমার মধ্যে যে অপূর্ণতা ছিল স্ত্রীর জন্য সেই অপূর্ণতা কেটে গেল। আমার ভেতরে যে একটা শুষ্ক ভাব ছিল, তোমার জন্য হৃদয়ে রসের জোয়ার এসে গেল। জগতের প্রতি আমার যে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল, তোমার জন্য আমি সবাইকে ভালোবাসতে শিখলাম। ঠিক সেইভাবে একজন স্ত্রীর কাছে তার স্বামীও একজন দেবতা। যে একজনকে ভালোবাসতে পারে সে জগতের আরও দশ জনকে ভালোবাসতে পারবে। যে কাউকে ভালোবাসে না, সে জগতের কাউকেই ভালোবাসতে পারবে না। যে বলে আমি সবাইকে ভালোবাসি, আসলে সে কাউকেই ভালোবাসে না। আর যদি একজনের প্রতি ভালোবাসা আবদ্ধ হয়ে যায়, এই ভালোবাসা থেকেই হিংসা, কাম, ক্রোধের মত কত নেগেটিভ জিনিষ যে চলে আসতে পারে কল্পনাও করতে পারবে না। একজন ভালো মানুষ হওয়ার বদলে একটা জঘন্য পশুসুলভ মানুষে পরিণত হয়ে যাবে।

জগতে এর কোন ব্যতিক্রম নেই, পণ্ডিত হোক, জ্ঞানী হোক, যেই হোক পুরো সৃষ্টি *অবিদ্যায়মন্তরে বর্তমানাঃ*। যারাই স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত, মিত্র এর মধ্যে ডুবে আছে তারা সবাই এক ভাবে অবিদ্যার ঘন অন্ধকারে পোকার মত কিলবিল করে যাচ্ছে। সাধু সন্ন্যাসীরাও যে সবাই অবিদ্যার থেকে বেরিয়ে এসেছেন তা নয়। সাধু মহাত্মাদের উদ্দেশ্য মানুষের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করা, ভালোবাসা বিতরণ করা, কিন্তু এগুলো করতে গিয়ে

অনেকে নাম-যশকে উদ্দেশ্য করে নেন। নাম-যশের জন্য কিছু ক্ষমতা থাকা দরকার, কিন্তু পুত্র, বিত্ত, মিত্র, স্ত্রী এগুলোর জন্য ক্ষমতার দরকার পড়ে না, কারণ এগুলো কুকুর বেড়ালও করে নিতে পারে। এখানে মানুষ আর কুকুর বেড়ালে কোন তফাৎ নেই। কিন্তু মুশকিল হল এরা নিজেরাও গর্তে পড়ে থাকে আর অপরকেও গর্তে টেনে নিয়ে যায়। বলছেন *অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ*, অন্ধ যেমন আরেক অন্ধকে পথ দেখাতে গিয়ে দুজনেই গর্তে গিয়ে পড়ে, এদেরও ঠিক একই অবস্থাই হয়। কাদের এই অবস্থা হয়? *স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ*, যারা নিজেদের ধীর পুরুষ মনে করে, নিজেদের বিরাট পণ্ডিত মনে করে।

সাপের লেজ আর মুণ্ডুর মধ্যে ঝগড়া লেগেছে। লেজ মুণ্ডুকে বলছে ‘আমাকেই কেন সব সময় তোমার পেছনে পেছনে চলতে হবে’। মুণ্ডু বলল ‘এত ঝগড়ার কি আছে, তুমিই আমাকে নিয়ে চল’। লেজ এবার টানতে শুরু করেছে। টানতে গিয়ে প্রথমেই একটা গর্তের মধ্যে গিয়ে পড়েছে, লেজ তো সামনে কিছু দেখতে পায় না। মুণ্ডু তখন বহু কষ্টে গর্ত থেকে বার করে নিয়ে এল। লেজ তখন বলছে ‘একবার ভুল হয়ে গেছে দ্বিতীয়বার আর ভুল হবে না’। দ্বিতীয়বার চলতে গিয়ে এবার একটা কাঁটা ঝোপে গিয়ে আটকে গেছে, কাঁটাতে শরীরটা ক্ষত বিক্ষত হয়ে রক্তারক্তি হয়ে গেছে। মুণ্ডু তখন বলছে ‘এতো দেখছি মহা জ্বালা, তোমার হলটা কি’? ‘আচ্ছা ঠিক আছে, ও এমন কিছু না, এ রকম হতেই পারে। কিন্তু আমিই আগে আগে যাব’। তৃতীয়বার একটা জায়গায় আগুন জ্বলছিল তার মধ্যে গিয়ে পড়েছে। এবার সবটাই শেষ। নেতা বা পথপ্রদর্শক যদি অন্ধ হয় অনুগামীদের এই সাপের লেজের অবস্থা হবে। অন্ধ যদি অন্ধকে নিয়ে যায় তখনও এই অবস্থাই হবে।

মূঢ়কে ব্যাখ্যা করে আচার্য বলছেন, *মূঢ়া অবিবেকিনঃ অন্ধেনৈব*, মনের মধ্যে যে নানা রকমের কুটিল ইচ্ছা, কুটিল ইচ্ছা হল আমার টাকা আয় করা নিয়ে কথা এতে সৎ অসৎ আবার কি, পরীক্ষায় আমার নম্বর পাওয়াটাই উদ্দেশ্য, চাকরি পাওয়াটাই উদ্দেশ্য, তা যে করেই হোক। অর্থাৎ লক্ষ্যটাই প্রধান, কোন পথে সেই লক্ষ্যে পৌঁছাবে তার কোন দাম নেই, সৎ পথ অসৎ পথ তা যাই হোক না কেন। হিন্দু ধর্মে লক্ষ্যটা কখনই প্রধান নয়, পথটাই প্রধান। স্বামীজী বলছেন take care of the means and the goal will be taken care of automatically পথ যদি ঠিক থাকে আজ হোক কাল হোক ঠিক লক্ষ্যে নিয়ে যাবে। লক্ষ্য ঠিক করে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যদি যে কোন পথ অবলম্বন করে তাহলে সে মরবেই মরবে। এই নিয়েই পাশ্চাত্য চিন্তাধারা আর প্রাচ্যের চিন্তাধারার বিবাদ চলে। পাশ্চাত্যের কাছে লক্ষ্যটাই প্রধান কিন্তু আমাদের কাছে পথটাই প্রধান। এই জিনিষটা আমাকে পেতে হবে, এরপর আর কোন দিকে তাকাবে না, এবার যে করেই হোক সেটাকে পাওয়ার জন্য যে কোন পথে নেমে পড়বে। এরাই অবিবেকী, মূঢ়মতি। কিন্তু সমস্যা হল *পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ*, নিজেদের বিশাল পণ্ডিত মনে করে। দুটো ইংরাজী বই যদি পড়ে থাকে আর তার সাথে কিছু শাস্ত্র যদি পড়া থাকে তাহলে আর তাকে সামলানো যাবে না। সমাজে সবাই নিজেকে সবজান্তা মনে করে বসে আছে আর সব ব্যাপারে নিজেকে ওস্তাদ মনে করছে। এবার এদের কথা মত যারা চলবে তাদের কি গতি হবে? ওদেরই মত গতি হবে। ওদের কি গতি? *পরিযন্তি মূঢ়া*, সব সময় নানান রকমের কুটিল ইচ্ছা, মনের মধ্যে হাজার রকমের কামনা-বাসনা ঘুরপাক করে যাচ্ছে। যার যেমন চিন্তা-ভাবনা সে তো অপরকে তেমনই শিক্ষা দেবে। সে জানে তিনটে জিনিষ, কি করে একটা মেয়ে জোগাড় করা যায়, কি করে কিছু টাকা আয় করা যায় আর কি করে নিজের অহংকে জাহির করা যায়, যাকে আমরা নাম-যশ বলছি। অপরকেও তারা এই শিক্ষাই দেবে। এরপর যদি দেখে যাকে শেখালো তার দুটো টাকা বেশি হয়ে গেছে, তার নাম-যশ হয়ে যাচ্ছে তখন উল্টে তাকেও গালামন্দ নিন্দাবাদ করতে শুরু করবে আর বলবে, আমার কাছে শিখে এখন নিজেই ওস্তাদ হয়ে গেছে। এই জিনিষটাকেই এখানে বলছেন *অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ*। অন্ধ অন্ধকে নিয়ে গেলে যে পরিণতি হবে, সংসারীদের কথা অনুযায়ী চললে সেই পরিণতিই হবে।

ঠাকুর বলছেন, বাঙালীদের খালি হুজুগ আর লেকচার। মাস্টারমশাই এক জায়গায় ভাষণ শুনতে গেছেন। সেখানে বক্তা মা দুর্গার ব্যাখ্যা করে বলছে, দুর্গাকে ধরলে কার্তিক গণেশও আসবে সাথে লক্ষ্মী সরস্বতীও আসবেন, বলতে চাইছেন দুর্গার আরাধনা করলে শক্তি, সিদ্ধি, ঐশ্বর্য, জ্ঞান সব এসে যাবে। ঠাকুর খুব মন দিয়ে দুর্গার ব্যাখ্যা শুনলেন, শোনার পর বলছেন – তুমি যেখানে সেখানে যেও না, এখানেই আসবে। যারা ঠাকুরের ব্যাপারে কিছু জানে না, বোঝে না, তারা এই কথা শুনে বলবে, নিজের শিষ্যরা যাতে হাতছাড়া

না হয়ে যায় তাই ঠাকুর এভাবে বলছেন। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়, একজন শুদ্ধ আধার, অধিকারি শিষ্য যদি উল্টোপাল্টা কথা শুনে বেড়ায় তার তো সর্বনাশ হয়ে যাবে। এই সর্বনাশ হয়ে যাওয়া থেকে ঠাকুর আগলে রাখছেন। একজন বক্তা বলছে, ঈশ্বর নিরস আমাদের প্রেম ভক্তি দিয়ে তাঁকে সরস করতে হবে। ঠাকুর শুনে বলছেন, দেখো দেখি কী কাণ্ড, যাঁকে বেদে বলছে রসস্বরূপ তাঁকে কিনা বলছে নিরস। আবার এক জায়গায় নিরাকারের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিরাকারের 'নি' না বলে 'নী' লাগিয়ে বলছেন নীরাকার মানে জলের মত। এগুলো কোন হাসাহাসি করার জন্য বলা হচ্ছে না। এখন ছাপানো বই সব এসে গেছে, ঠাকুর, মা, স্বামীজীর কথা আমাদের নাগালে, শাস্ত্রের সব কিছুর ব্যাখ্যা সহজে পেয়ে যাচ্ছি। কিন্তু দুশ বছর আগেও এত কিছু ছিল না, সাধারণ মানুষ পণ্ডিতরা যা বলতেন সেটাই শুনত আর বিশ্বাস করে নিত। তখন লেকচার দেওয়ার প্রথাও ছিল না। তখন প্রথা ছিল, একটা শাস্ত্রকে আধার করে ব্যাখ্যা করে যেতেন, ব্যাখ্যাটাও লেখাই থাকত। যেমন, রামচরিতমানসে দোঁহা আছে, দোঁহার অর্থও দেওয়া আছে, তুমি এবার তোমার পাণ্ডিত্য দিয়ে নিজের মত ব্যাখ্যা করে যাও। যতই তুমি ব্যাখ্যা কর না কেন ঐ দোঁহা বা চৌপাঈয়ের বাইরে যেতে পারবে না। চৈতন্যাচরিতামৃতে যা আছে তার বাইরে কেউ যেতে পারবে না। অল্প একটু ভুলভাল ব্যাখ্যা করে দিতে পারে কিন্তু কোথাও না কোথাও গিয়ে আবার ঠিক লাইনে এসে যাবে। কিন্তু শুধু লেকচারে তিরিশ মিনিট থেকে শুরু করে তিন ঘন্টা পুরোটাই ভুলভাল বলে কাটিয়ে দিতে পারে।

ঠাকুরের উপর ভাষণ দেওয়ার সময় বেশির ভাগ বক্তাই শুরু করেন এই বলে – ১৮৩৬ সালে লর্ড মেকলে ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষা পদ্ধতি শুরু করলেন আর সেই বছরেই শ্রীরামকৃষ্ণের এই ধরাধামে আবির্ভাব। যেন পাশ্চাত্য সভ্যতার করালগ্রাস থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্য ভগবানের আগমন। এর উৎস হল, স্বামী সারদানন্দজী রচিত লীলাপ্রসঙ্গ। লীলাপ্রসঙ্গে বক্তারা এই কথাটা পড়েছেন, কিন্তু কোন বক্তাই একবারও ভাবেন না যে, লর্ড মেকলের প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতিতে লেখাপড়া করে স্বামীজী বড় হলেন, এই শিক্ষা পদ্ধতিতে পড়াশোনা করেই গান্ধীজী ভারতের স্বাধীনতা আনলেন। ইংরজেদের প্রবর্তিত এই শিক্ষা পদ্ধতিতে পড়াশোনা করে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন। আর এই শিক্ষা পদ্ধতিকে এখনও অনুসরণ করে ভারত আজ বিশ্বের সেরা দেশ হতে যাচ্ছে, যেখানে চীন, জাপান পিছিয়ে গেল শুধু তারা ইংরাজী জানে না বলে। আর একটু যে ডিসিপ্লিন ভারতে এসেছে সেটাও মেকলের প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতির জন্য। আর এই পদ্ধতি এতটাই নিখুঁত যে ভারতের স্বাধীনতার সত্তর বছর হয়ে যাওয়ার পরেও এখনও এই পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন নিয়ে আসা যাচ্ছে না। এরপর কি উত্তর দেবে? কোন উত্তর নেই। একবারও কেউ ভেবে দেখছেন না স্বামী সারদানন্দ কেন এই কথা লিখেছিলেন। শরৎ মহারাজ কবে লিখছেন? তখন ভারতের চিন্তাধারা আর পাশ্চাত্যের চিন্তাধারর মধ্যে একটা লড়াই চলছে। তখনও এই পদ্ধতি পরীক্ষিত হওয়ার সুযোগ পায়নি, সবারই একটা দুশ্চিন্তা, এই পদ্ধতিতে ভারতের কী অবস্থা হবে ভেবে। অবতারের কি আর কোন কাজ নেই? কোথায় মেকলে নামে একজন লোক একটা শিক্ষা পদ্ধতি চালু করতে যাচ্ছে সেটাকে আটকানোর জন্য শেষ পর্যন্ত ভগবানকে নামতে হবে? ঐ দুই পয়সার একটা মানুষকে আটকানোর জন্য ভগবানকে মর্ত্যধামে আবির্ভাব হতে হবে? অথচ ঠাকুরের কথা বলতে গেলে প্রথমেই এই কথা দিয়ে বক্তারা বলতে শুরু করেন, পরে অবশ্য কথামৃতের প্রসঙ্গে এসে ঠিক ঠিক চলতে শুরু করেন। আমাদের নিয়মই ছিল, তুমি যা কিছু বলতে চাইছ তোমার সব কথাকে শাস্ত্রের কথার মধ্যে আবদ্ধ রাখ, নিজে ওস্তাদি দেখাতে যেও না। লেকচার দেওয়ার প্রথা আমাদের পরম্পরাতে কখনই অনুমোদিত ছিল না। যাঁরা পণ্ডিত, একটা দুটো শাস্ত্র পড়েছেন, তাঁরা যখন গাইড করতে শুরু করেন তখন তাঁরা যজ্ঞাদি কর্ম, ধর্ম, অর্থ আর কামের মধ্যে ঘোরাঘুরি করবেন আর এনাদের থেকে যারা আরও নিকৃষ্ট তারা অজ্ঞানের বাকি সব কিছুতে নেমে যাবে।

মানুষ দুঃখ কষ্টে পড়ে আছে, তাকে জীবন দর্শনের ব্যাপারে কিছু না বলে বলে দিচ্ছে তুমি কালীঘাটে গিয়ে পূজো দাও তোমার সব দুঃখ-কষ্ট মিটে যাবে। এদের কথাই এখানে বলছেন, এরা নিজেরাও অন্ধকারে অপরকেও টেনে অন্ধকারে নিয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরের জীবন এই মন্ত্রের সব থেকে ভালো দৃষ্টান্ত। ঠাকুর সাধনা করছেন, কত উচ্চমানের সাধনা, অথচ সবাই বলছে ঠাকুর পাগল হয়ে গেছেন। এর একটা কিছু বিহিত করতে হবে। বিয়ে দিয়ে দাও সব ঠিক হয়ে যাবে। আধ্যাত্মিক জগতের ইতিহাসে ঠাকুরের কঠোর সাধনার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, সেই সাধনাকে ঠাকুরের মাথার গণ্ডগোল বলে সন্দেহ করছে আর সেই রোগ সারাবার

জন্য বলছেন ওকে বিয়ে দিয়ে দাও সব ঠিক হয়ে যাবে। ভারতবর্ষের সব সমাধান যেন বিয়েতেই হয়ে যায়। ভাবছে ঠাকুরের মন কুপিত হয়ে গেছে, একটা বিয়ে দিয়ে দিলে মন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। বিয়ে দিয়ে দেওয়া হল। ঠাকুর সাক্ষাৎ নারায়ণ, নারায়ণের জন্য নারায়ণীকে নিয়ে আসতে হবে। ওরা তা ভাবছে না, ভাবছে গদাইয়ের মাথাটা গেছে। মাথার গণ্ডগোল হলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও না বাপু, তা না, বিয়ে দিয়ে দাও। এটাই হল *দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ* এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। পরের মন্ত্রেই আবার বলছেন –

> ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
> প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
> অয়ং লোকো নাস্তি পর ইত মানী
> পুনঃ পূনর্বশমাপদ্যতে মে।।১/২/৬।।

(সংসারে আসক্ত এবং ধনাদিমোহে আচ্ছন্ন অবিবেকীর মনে পরলোকসম্বন্ধীয় সাধন প্রতিভাত হয় না। এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট লোকই আছে, এর বাইরে আর কোন লোক নেই, এরূপ ধারণাশীল ব্যক্তি বারবার জন্মমৃত্যু রূপ আমার অধীনতা প্রাপ্ত হয়।)

উপনিষদে *সাম্পরায়ঃ* শব্দটি অনেকবার এসেছে। আচার্য *সাম্পরায়ঃ* শব্দের ব্যাখ্যা করছেন – *সম্পর ঈয়তে ইতি সম্পরায়ঃ পরলোকঃ, তৎপ্রাপ্তিপ্রয়োজনঃ সাধনবিশেষঃ শাস্ত্রীয়ঃ সাম্পরায়ঃ*। দেহধারীর মৃত্যুর পর যেটার দিকে তার গমন হয়, *সম্পর ঈয়তে*, *ঈয়তে* মানে যাওয়া, যেটার দিকে যাওয়া হয় সেটাকে *সম্পরায়ঃ* বা পরলোক বলা হয়। মন্ত্রে সম্পর শব্দে আকার দিয়ে বলছেন *সাম্পরায়ঃ*, ব্যাকরণগত ভাবে ব্যাখ্যা করলে অর্থ হয়, দেহ পতনের পর যেটার দিকে গতি হয়, সেটাকে বলছেন সম্পরায় বা পরলোক। সম্পরায়কে সাধন করার বিদ্যাকে শাস্ত্রে বলছেন *সাম্পরায়ঃ*, সহজ অর্থ পরলোকপ্রাপ্তির বিদ্যা। কিন্তু পরলোক অর্থও পুরোপুরি ঠিক অর্থ হয় না, কারণ বলছেন দেহের পতনের পর যেদিকে তার গতি হয়, মৃত্যুর পর অনেক রকম গতি হতে পারে।

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং, প্রতিভাতি মানে প্রতিভাসিত, স্পষ্ট হওয়া, সাধারণ মানুষ, যারা বালবুদ্ধি সম্পন্ন তাদের কাছে পরলোক বিদ্যা স্পষ্ট নয়। কিন্তু পরলোক বা সম্পরায়কে আচার্য ব্যাখ্যা করছেন যেটার দিকে তার গতি হয়। আর পরে অন্যান্য মন্ত্রে যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে আর শাস্ত্রে যেমন যেমন ব্যাখ্যা চলে সবটাকে মিলিয়ে সাম্পরায়ের অর্থ দাঁড়ায় শুভ গতি। শুভ গতি দুই রকম – এক মুক্তি আর দুই ব্রহ্মলোক। তাহলে সাম্পরায়ের অর্থ হবে মোক্ষবিদ্যা, ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি বিদ্যা, স্বর্গপ্রাপ্তি বিদ্যা হবে না। কিন্তু অন্যান্য পণ্ডিতদের যদি বিক্ষিপ্ত ভাবে এই একটি মন্ত্রকে অর্থ করতে বলা হয় তাঁরা এর অর্থ করবেন স্বর্গপ্রাপ্তির বিদ্যা। ঋষিরা বেদ বা উপনিষদের মন্ত্রের অর্থ নিরূপণ করার জন্য কতকগুলি বিধান করে দিয়েছেন, সেই নিয়মানুযায়ী যদি এর অর্থ নিরূপণ করা হয় তাহলে সাম্পরায় শব্দের অর্থ হবে মোক্ষবিদ্যা বা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি বিদ্যা, কখনই স্বর্গলোক প্রাপ্তি বিদ্যা হবে না। সাম্পরায় খুব প্রচলিত শব্দ, যার অর্থ হল দেহপাতের পর যেদিকে গতি হয়। কিন্তু গতি তো অনেক দিকেই হতে পারে, পুনর্জন্মটাও গতি, স্বর্গে যাওয়াও গতি, ব্রহ্মলোকে যাওয়াও গতি, মুক্তিও একটা গতি, সবটাই গতি। তাহলে ঠিক কোন গতির অর্থ হবে? আচার্য খুব স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন এর অর্থ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি। যদি আরেকটু টেনে দেওয়া যায় তাহলে মুক্তিও এর মধ্যে চলে আসবে। তবে এখানে শব্দটা হল গতি, দেহপাতের পরে যে গতি হয় সেই গতি। সেদিক দিয়ে মুক্তিতে দেহপাতের পর কোন গতি হয় না, শাস্ত্রেও বার বার বলছে সে কোথাও যায় না। সেইজন্য যদি ঠিক ঠিক অর্থ করতে হয় তাহলে সাম্পরায়ের অর্থ শুধু ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিই হবে। কিন্তু যেহেতু উপনিষদ মোক্ষপ্রাপ্তির বিদ্যা, সেইজন্য এখানে মুক্তির অর্থেও নিয়ে আসা যায়। সংস্কৃতে শব্দ অন্বেষণ করে তার যে ধাতু বেরিয়ে আসে সেই ধাতু অনুসারে শব্দের অর্থ করা হয়। সেইভাবে সাম্পরায় শব্দের অর্থ বার করলে এর ঠিক ঠিক অর্থ হবে দেহপাতের পরে যেদিকে গতি হয়। এখন মুক্তিতে কোন গতি হয় না, সেইজন্য মুক্তির অর্থ করলে খাপছাড়া লাগবে, তবে আমাদের মত লোকেদের জন্য জাগতিক অর্থে মুক্তিকেও নিয়ে আসা যেতে পারে, ব্রহ্মলোক অবশ্যই হবে। কারণ মন্ত্রের পরের লাইনের সাথে সামঞ্জস্য করতে হলে এর অর্থ ব্রহ্মলোকই হতে হবে।

আমাদের বোঝার সুবিধার জন্য বলতে পারি সাম্পরায় শব্দের অর্থ মোক্ষবিদ্যা বা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি বিদ্যা, যে বিদ্যা বালবুদ্ধিদের মধ্যে কখন প্রতিভাসিত হয় না। বালবুদ্ধি মানে অবিবেকী, অবিবেকী মানে যারা এষণাত্রয়ের মধ্যে ডুবে আছে। শাস্ত্রে তিনটে এষণার কথা বলা হয়, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা আর লোকৈষণা; পুত্র,

বিত্ত আর লোক, লোক মানে স্বর্গাদি লোক। এই তিনটে জিনিষের মধ্যেই মানুষে সমস্ত রকমের কামনা-বাসনা ঘুরপাক করে। পুত্র মানে কাম, বিত্ত মানে অর্থ, আর স্বর্গ মানে ধর্ম। ধর্ম, অর্থ আর কাম এই তিনটে জিনিষ দেয় – পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা আর লোকৈষণা। যারা এই তিনটে এষণার মধ্যে থাকে বা আরও সাধারণ ভাবে বললে যারা কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত বা আরও সাধারণতর, যারা জীবনকে যেন তেন প্রকারে চালিয়ে যাচ্ছে এরা সবাই বালবুদ্ধি। এর আগে অবিদ্যার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছিল যারা ধর্ম, অর্থ আর কামের মধ্যে ঘুরছে বা যারা মোক্ষাবিদ্যা বাদে যা কিছু করছে তারা সবাই অবিদ্যার এলাকাতেই পড়ে আছে। যারাই অবিদ্যার সাধনে রত তারা সবাই বালবুদ্ধি। বলছেন যারা এই ধরণের বালবুদ্ধি তাদের কাছে এই বিদ্যা কখনই স্পষ্ট হয় না, *ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং*।

যারা ঠাকুরের ভক্ত, অনেকেই বিভিন্ন ভাবে ঠাকুরের কাজকর্মে যুক্ত, পাঠচক্র, ভক্ত সম্মেলনে অংশ নিচ্ছে, ঠাকুরের কথামৃত পড়ছে, ব্যাখ্যা, আলোচনা শুনছে বা করছে, সেখান থেকে একটা ধারণা হয়ে গেছে যে মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন। এবার জীবনকে যদি ভালো করে বিশ্লেষণ করতে যাই তাহলে প্রথমে দেখতে হবে ছোটবেলায় আমরা যে জীবন কাটিয়ে এসেছি বা পরে যখন সব কিছু বুঝে ওঠার ক্ষমতা হয়েছে, তখন আমরা জীবনে কি চাইছিলাম? কেউ ইঞ্জিনিয়ার হতে চেয়েছি, কেউ ডাক্তার হতে চেয়েছি, কেউ একটা চাকরি পেতে চেয়েছি। কেন এগুলো হতে চেয়েছি? অর্থ রোজগার করার জন্য। প্রথম বয়সে অনেকেই বলে আমি বড় হয়ে ডাক্তার হলে মানুষের সেবা করব, কিন্তু পরে টাকা রোজগার করতেই নেমে পড়ে। প্রথম হল অর্থ কি করে আয় করা যায়। দ্বিতীয় আমাকে একটা বিয়ে করতে হবে। বাচ্চা বয়সে বড়দের কাছে স্বর্গের কথা শুনেছি, ঠাকুর দেবতার কথা শুনে এসেছি, কখন সখন মনে একটু জানার অনুসন্ধিৎসা এলে আকাশের দিকে তাকিয়ে এক অজানা রাজ্যের কথা ভেবে অবাক হয়ে যেতাম, ওখানেই হয়ত স্বর্গ আছে, ঈশ্বর বা ভগবান বলে যা শুনছি তিনিও হয়ত ওখানে কোথাও থাকেন। আজ আমরা ঠাকুরের কথামৃত শুনছি, পড়ছি, চিন্তা-ভাবনা না করে কিছু কথা ভেতরে সযত্নে সাজিয়ে রাখছি, তারপর এদিক সেদিক লেকচার, আলোচনা শুনছি, এত কিছুর পরেও যদি আমাদের ভেতরটা একটু অকপট ভাবে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো যে আমাদের মন এখনও এই তিনটে জিনিষের মধ্যেই ঘুর ঘুর করছে। ঠাকুরের কাছে যখন যাচ্ছি তখনও এই তিনটের জন্যই যাই। আর যখন বয়স হয়ে যাচ্ছে তখন ভাবছি হে ঠাকুর! মৃত্যুর পর যেন তোমার কাছে যেতে পারি। তোমার কাছে যাওয়া মানে স্বর্গলোকের অর্থে, কখনই মুক্তির অর্থে নয়। ধর্ম জীবন, অধ্যাত্ম জীবন এত সহজ নয়। ঠাকুরের ভক্ত হয়েও আমাদের যদি এই দুরবস্থা হতে পারে তাহলে বাকি যারা অর্থ, কামের পেছনে দৌড়াচ্ছে তাদের কী অবস্থা ভাবুন! এদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় জীবন মানে কি, কোথাও এরা মনে করে বসে আছে যে মরে গেলে সব শেষ। এর থেকে একটু যদি বেশি হয় তাহলে বলবে, আমি ভালো কর্ম করেছি মৃত্যুর পর আমি স্বর্গেই যাব। অথবা এটুকু বোধ আছে যে একটু দান-টান করলে স্বর্গে যেতে পারব। তার মানে দাঁড়ায়, বাচ্চা বয়সে জীবনকে নিয়ে আমাদের বুদ্ধি যেমনটি ছিল, একটা পরিণত বয়সেও সেই একই বুদ্ধি চলছে। যাঁরা অনেক দিন ধরে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে যাচ্ছেন এই কথাগুলো তাঁদের জন্য প্রযোজ্য হবে না, কারণ শাস্ত্রের কথা শুনতে শুনতে ভেতরে অনেক পরিবর্তন হতে থাকে। সমাজের সাধারণ লোকেদের কথা এখানে বলা হচ্ছে। সমাজের বেশির ভাগ লোক শাস্ত্রের কথা, ধর্মের কথা শুনতেই চাইবে না। এদের জীবন-দর্শন হল আমার পরিবারে যেন সুখশান্তি থাকে, বাড়ির সবাই যেন সুস্থ থাকে। আর কখন সখন কোন গরীবকে একটা ছেঁড়া নোট দিয়ে দিল, এই আশায় যে আমি দিয়েছি তো, ছেঁড়াই হোক আর যাই হোক একটা শুভ কর্ম তো আমার হল, স্বর্গে যাওয়ার একটা সুযোগ তো এসেছে। ভেতরে কোথাও এদের এই ভীতিটাও আছে। এবার ভাবুন, আমরা যারা শৈশবে ছিলাম, কলেজে ছিলাম, আমাদের আশেপাশে যারা এখন আছে এই ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি বিদ্যা কি কখন এদের কাছে স্পষ্ট হবে, হতে পারে?

ঠাকুর যদি আমাদের দেখা দিয়ে বলেন – তুই কি চাস বল। আমরা কিন্তু সত্যিই কিছু চাইতে পারব না। যদিও কিছু চাই সেটাও খুব বোকা বোকা চাওয়া হয়ে যাবে। যেহেতু আমরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি সেইজন্য জাগতিক কোন কিছুই চাইব না, আমাদের চাওয়াটাও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকেই হবে। যদি বলি আমি জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে চাই। এর মত বোকা চাওয়া আর কিছু হবে না। কারণ জন্ম-মৃত্যু, চক্র এসবের আমাদের কোন ধারণাই নেই। আমরা কি আমাদের মৃত্যুকে দেখেছি, আগে আগে আমার যত জন্ম

হয়েছে সেই ব্যাপারে কোন ধারণা আছে? আমার মৃত্যু আমি দেখেনি, কোন জন্ম দেখিনি, জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে কী মুক্তি চাইব! মানুষ যেটা তার বাস্তব সমস্যা, প্রতিনিয়ত যে সমস্যার সামনে তাকে দাঁড়াতে হচ্ছে, তার থেকে সে বেরিয়ে আসতে চায়। জন্ম-মৃত্যু, পুনর্জন্মের যে কিছুই জানে না, সে যদি জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, এর মত বোকা বোকা কথা হতে পারে? নিজের জন্ম-মৃত্যুর কোন কিছুই যে দেখেনি তার কাছে কোন দিনই ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মালোকপ্রাপ্তির বিদ্যা স্পষ্ট হবে না। ঠাকুরও এদের অজ্ঞান দূর করতে পারবেন না। সেটাই এখানে বলছেন, *ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং*, এরা সবাই বালবুদ্ধি সম্পন্ন, পরলোক বিদ্যা কোন দিন এদের কাছে স্পষ্ট হবে না।

জীবনে এমন কোন বস্তু কি আছে যেটাকে পাওয়ার জন্য আমি সর্বস্ব ত্যাগ করতে রাজী? কিছুই নেই। যিনি লেখক হতে চাইছেন, তাঁকে যদি ঠাকুর এসে বলেন তোমার একটা বই অবশ্যই ছাপা হয়ে বেরোবে কিন্তু তার বিনিময়ে তোমার একটা পা পঙ্গু হয়ে যাবে, তুমি রাজী আছ? না, আমি রাজী নই। কিন্তু যিনি উচ্চ চিন্তন নিয়ে থাকেন, যিনি শুধু লেখা নিয়েই থাকতে চান, উচ্চ চিন্তা-ভাবনাকে লেখার মাধ্যমে তুলে ধরতে প্রচণ্ড আগ্রহী, তাঁকে যদি ঠাকুর এসে বলেন তোমার একটা বই ছাপা হয়ে বেরোবে, কিন্তু কেউ সেই বই পড়বে না, আর তার জন্য তোমার একটা পা পঙ্গু হয়ে যাবে, তুমি রাজী আছ? হ্যাঁ আমি প্রস্তুত। সত্যিকারের লেখক তাই চাইবেন। আমাদের জীবনে এমন কিছু কি আছে যার জন্য আমরা বলতে পারব যে এর জন্য আমি সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। একটু পরেই যমরাজ ঠিক এই কথাই বলবেন, *যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি*, যেটাকে জানার জন্য মানুষ ব্রহ্মচারী হয়ে যায়, বলে আমি বিয়ে করব না, আমার ইন্দ্রিয় সুখ লাগবে না। কী ত্যাগ! আমাদের কারুর এমন কিছু কি আছে যার জন্য আমি সব কিছু ত্যাগ করে দিতে রাজী হব? কোন কিছুই নেই। এটাই বালবুদ্ধি, সেইজন্য ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মলোক বিদ্যা কোনটাই স্পষ্ট হয় না। বালবুদ্ধি মানেই, যারা স্ত্রী-পুত্রাদির মধ্যে গতানুগতিক ভাবে কোন রকমে জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাইছে। ঠাকুর বলছেন ঢিমে তেতালা হলে হবে না। এটাকেই শাস্ত্রে বলছেন *ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং*। বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিদ্যা হল ব্রহ্মবিদ্যা, যে কোন জিনিষের জন্য যে ত্যাগের দরকার সেই ত্যাগের মধ্যে সব থেকে বেশি ত্যাগ demand করে ব্রহ্মবিদ্যা। আমাদের সামনে চারটে আদর্শ খুব স্পষ্ট ভাবে হাজির হয়, বিদ্যা, সম্পদ, সেবা ও ত্যাগ। এই চারটে আদর্শের দুটো আদর্শকে চরমতম demand করছে ব্রহ্মবিদ্যা। সেই বিদ্যাকে কি সাধারণ মানুষের পক্ষে কখন ধারণা করা সম্ভব! সেটাই এখানে বলছেন *ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং*, যে বিদ্যা দিয়ে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় সেই বিদ্যা সাধারণ লোকেদের কাছে কখনই স্পষ্ট হয় না। এখানে কিন্তু আচার্যদের কথা বলা হচ্ছে, শিষ্যদের কথা বাদ দিন আচার্যদেরই এই অবস্থা, আচার্যদের কাছেও ব্রহ্মলোক বিদ্যা স্পষ্ট নয়।

প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্, বলছেন প্রমাদগ্রস্ত হয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। কিসের মধ্যে প্রমাদে হারিয়ে গেছে? আচার্য শঙ্কর বলছেন *পুত্রপশ্বাদিপ্রয়োজনেষু আসক্তমনসং তথা বিত্তমোহেন*, টাকা, পয়সা, স্ত্রী, পুত্র, ঘরবাড়ি এদের মধ্যে যার মন আসক্ত তারা প্রমাদগ্রস্ত, প্রমত্ত হয়ে আছে। ফলে কি হয়? *অয়ং লোকো নাস্তি পর ইত মানী*, এদের একটা দৃঢ় ধারণা, এই জীবনের পরে আর কিছু নেই। এই বিশ্বাস যে শুধু প্রমাদগ্রস্ত মূঢ়দেরই মধ্যে আছে তা নয়, আমার আপনার সবারই ভেতর কোথাও এই ধারণা হয়ে আছে। মুখে যতই ঠাকুর ঠাকুর করি না কেন, যতই পুনর্জন্ম স্বর্গাদির কথা বলি না কেন কোথাও আমাদের মনে হয় যে মৃত্যু হলেই সব শেষ। পুনর্জন্মে যার ঠিক ঠিক বিশ্বাস তার জীবন রাতারাতি অন্য রকম হয়ে যাবে। শাস্ত্র বলছে, গুরুজনরা বলছেন তাঁদের মুখের কথাকে সম্মান দিই, কিন্তু সত্যিকারের ঐ বিশ্বাসটা নেই। এখানে আরও নীচু স্তরের যারা তাদের কথা যমরাজ বলছেন। এদের স্থির বিশ্বাস হয়ে আছে মরে গেলে সব শেষ। আমাদের কখন মনে হয় আছে আবার কখন মনে হয় চোখ বুজলেই সব শেষ। দুঃখ যখন আসে তখন মুখে অনেক সময় বলি আগের জন্মে হয়ত কোন খারাপ কাজ করা ছিল। কিন্তু যারা একেবারে কট্টর, নিজেকে ওস্তাদ মনে করে, এরা মুখেও কখন বলতে যাবে না, এদের স্থির বিশ্বাস, জীবন চলে গেলে সব শেষ।

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং, এটাই মন্ত্রের মূল কথা। যারা বালবুদ্ধি তারা কখনই ঐ বিদ্যাকে জানার চেষ্টা করে না, যে বিদ্যা দিয়ে পরলোক প্রাপ্তির বিষয় জ্ঞান হয়। যারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করছে, দিনরাত আলোচনা করছে, তাদেরও ঐ বিদ্যার প্রতি যে তীব্র আগ্রহ হবে, মন অন্য দিকে যাবে না, এই আগ্রহটা হয় না। কারণ

এরাও বালবুদ্ধি সম্পন্ন। পছন্দের মত খাওয়া-পড়া, পছন্দের মত খেলনা হলেই আমাদের জীবন চলে যায়। সারাটা জীবন আমরা খাওয়া আর খেলনা নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিই। শুধু যেমন যেমন বয়স পাল্টায় তেমন তেমন খেলনাটাও পাল্টাতে থাকে। আচার্য বলছেন *বালস্তাবৎক্রীড়াসক্ত-স্তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ। বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ, পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ।।* বাচ্চা বয়সের খেলনা আর তরুণ অবস্থায় তরুণীতে আসক্তি একই জিনিষ। সন্তানাদি মায়ের কাছে খেলনা, দাদু দিদার কাছে নাতি খেলনা। মনকে একটা কিছুতে কোন রকমে বুঁদ করে রাখা। মুর্তিপূজাও এক ধরণের ধর্মীয় খেলনা। সাধারণ মানুষ যে জিনিষগুলিকে নিয়ে মত্ত, সেগুলোর সাথে এই ধর্মীয় খেলনার খুব একটা তফাৎ নেই। এদের কাছে পরলোক বিদ্যা কখনই স্পষ্ট হয় না। বুদ্ধির পরিপক্কতা মানে এই ধরণের সব রকম খেলনা থেকে বেরিয়ে আসা। তারপরেই বলছেন প্রমাদ, প্রমাদ মানে মন যেখানে একেবারে ডুবে আছে। কিসে ডুবে আছে? পুত্র, পশু, বিত্তের মধ্যে একেবারে বুঁদ হয়ে আছে। যারা এই ধরণের কোন কিছুতেই মজে নেই অথচ বালবুদ্ধি এরা আলস্যের গর্তে গিয়ে পড়ে, এরা আরও বাজে। যারা পুত্র, বিত্ত, পশুর পেছনে দৌড়াচ্ছে তারা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকে, অন্তত সক্রিয়। আর যারা এগুলোর পেছনেও দৌড়াচ্ছে না, অন্য দিকে বালবুদ্ধি সম্পন্ন, এরা আরও ঘোর অন্ধকারে গিয়ে পড়ে, মানসিক ভাবে একেবারে স্থবির হয়ে যায়। কিন্তু তাঁরা যদি ত্যাগী হন তাঁদের কথা আলাদা। যাঁরা খুব উচ্চমানের সন্ন্যাসী তাঁরা এসবের ধারে কাছে যান না। কারণ তাঁরা উপরের দিকে যেতে চাইছেন। কিন্তু উপরে যাওয়ার চেষ্টাটা যদি না থাকে তাহলে গোত্তা খেয়ে পড়ে যাবে। সন্ন্যাসী হয়ে তিনি যদি প্রচুর জপ-ধ্যান, স্বাধ্যায় না করেন তাহলে তিনি আর উপরের দিকে যেতে পারবেন না, তাঁরও পতন অবশ্যম্ভাবি। যাঁরা শাস্ত্রের কথা বছরের পর বছর শুনে যাচ্ছেন তাঁরাও বালবুদ্ধি থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন না। সন্ন্যাসী আর এদেরই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে বাকিদের কী ভয়ঙ্কর অবস্থা ভাবতে পারা যায় না। পানিহাটির উৎসবে ঠাকুরের যাবার কথা, ঠাকুর বলছেন রামলালের খুড়িকে বললাম ওখানে যাব কিনা, সে বললে গিয়ে কাজ নেই, তাই আমার আর যাওয়া হল না। ঠাকুর তখন ঠিক এই কথাই বলছেন, আমি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী সন্ন্যাসী, আমার মাগ বললে গিয়ে কাজ নেই, তাই আমার আর যাওয়া হল না, আমারই এই অবস্থা তাহলে সংসারে যারা আছের তাদের কী অবস্থা! উপনিষদ এই কথাই বলছেন, *ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং,* পরলোক প্রাপ্তি বিদ্যা বালবুদ্ধিদের কাছে কখনই স্পষ্ট হয় না। বেশির ভাগ লোকের শোনারই সৌভাগ্য হয় না, সৌভাগ্য হলেও ধারণা করতে পারে না, ধারণা করলেও উপলব্ধি করতে পারে না।

ফলে এদের কি হয়? *পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে,* যমরাজ বলছেন এরা ঘুরপাক খেতেই থাকে আর বারবার আমার কাছেই আসতে থাকে। যমলোক, পিতৃলোক, স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোক ইত্যাদি লোকের মধ্যে যমলোক সবার নীচে, যমলোকেরও নীচে আছে, তাকে বলে মৃত্যুধর্মা। এরা এখানেই জন্মাচ্ছে আর মরছে, আবার জন্মাচ্ছে আবার মরছে, যমলোক পর্যন্তও যেতে পারে না। পোকামাকড়, ধান, গম এরা জন্মাচ্ছে মরছে আবার জন্মাচ্ছে আবার মরছে। মানুষ এতটা খারাপ নয় বলে এরা যমলোক পর্যন্ত যেতে পারে। যমলোকে গিয়ে কিছু দিন থাকল শুভ কিছু করা থাকলে আবার এসে কোথাও জন্ম নেবে। জন্ম নিয়ে আবার মরবে, মরে আবার যমলোকে যাবে। সেইজন্য যমরাজ বলছেন বারবার এরা আমার পাল্লায় এসে পড়ে। এরা নিজেদের খুব সেয়ানা মনে করে, কিন্তু টাকা, পয়সা, নারী এর মধ্যেই ঘুর ঘুর করতে থাকে, একটুও এগোতে পারে না। আবার এই বিশ্বাস যে মৃত্যুর পরে কিছু নেই, চোখ বুজলেই সব শেষ। ফলে এদেরকে মরতে হয়, মরে আমার কাছে আসতে হয়, আমার অধীনতা থেকে এরা কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারে না। খ্রীষ্টানরা মনে করে মৃত্যুর পর কিছু নেই, স্বর্গ নরকের কথা বলছে ঠিকই কিন্তু পুনর্জন্মকে তারা মানে না, ইসলাম, জুদাইজিম্, বস্তুবাদী এরাও মানে না। বক্তব্য হল, যে পুনর্জন্ম মানে না তাকে বারবার ঘুরঘুর করতে হবে, যে মানে না সে শুভ কাজ করবে না। কিন্তু যার পুনর্জন্মে বিশ্বাস আছে সে জানে আমি যা শুভ অশুভ কাজ করছি এর সব কিছুর হিসেব-নিকেষ একদিন হবে। তখন তার জীবনটাই পাল্টে যাবে। তবে কচিৎ কখন সখন কেউ কেউ এসে যান যাঁরা অন্য রকম হন। তাঁরা কি রকম হন?

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা-
শ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।।১/২/৭।।

(যেহেতু আত্মতত্ত্বের কথা বহুলোক শোনারই সুযোগ পায় না, শুনলেও অনেকে ধারণা করতে পারে না, সেইহেতু আত্মতত্ত্বের উপদেষ্টা অতি বিরল এবং অনুভবকারীও সুনিপুণ। আত্মতত্ত্বের বোদ্ধা অতি সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন এবং নিপুণ আচার্য দ্বারা উপদিষ্ট আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিও অতি বিরল।)

এতক্ষণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের কথা বলছিলেন। কিন্তু কদাচিৎ এদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কেউ এসে যান যিনি আত্মজ্ঞানের দিকে যেতে চান। গীতাতেও ঠিক এই কথা ভগবান বলছেন *মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।।* এই মন্ত্রে যমরাজ বলছেন *শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ*, হে নচিকেতা! এই যে তুমি আত্মতত্ত্ব নিয়ে প্রশ্ন করেছে, বেশির ভাগ মানুষ জীবনে এই আত্মতত্ত্বের কথা শোনার সুযোগই পায় না। সুদূর আফ্রিকার জঙ্গলে কোন আদিবাসীদের গ্রামে গিয়ে যদি কোন আদিবাসীকে আত্মতত্ত্বের কথা বোঝাতে যায় সে বেচারী কী বুঝবে! আফ্রিকার কথা না হয়ে ছেড়ে দিলাম, আমেরিকা, ইউরোপের কোটি কোটি মানুষ কোথায় এই আত্মতত্ত্বের কথা শোনার সুযোগ পাবে, যদিও বা কোথাও কোন সুযোগ পায় কিছুই বুঝতে পারবে না। বাইরের দেশের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম। বেলুড় মঠে প্রতিদিন কত দূর দূর থেকে কত লোক ঠাকুরকে দর্শন করতে আসছে। এদের যদি বলা হয়, ওখানে কঠোপনিষদের উপর আলোচনা চলছে, চলুন শুনবেন। কেউ শুনতে আসবে না। বেলুড় মঠে মেলা হবে, বাজি পোড়ান হবে এতেই তাদের আনন্দ। অথচ ইউনিভার্সিটিতে এত উচ্চ তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, কেউ যেতে চাইবে না – *শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ*, এই আত্মতত্ত্ব শোনার সুযোগই হয় না, সুযোগ থাকলেও শোনার মন হয় না।

আর বলছেন, *শৃণ্বন্তোহপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ*, শোনার সুযোগও যদি কোন ভাবে পেয়ে যায় তাও কিছুই বুঝতে পারবে না। কারণ চিত্ত যদি অশুদ্ধ হয়, মনে যদি কামনা-বাসনা থাকে, এখানে কামনা-বাসনা মানে সাধারণ কামনা-বাসনার কথা আসছে না, এই কামনা বাসনা হল ধর্ম, অর্থ আর কাম, সাধারণ মানুষ যেভাবে কামনা-বাসনার মধ্যে পড়ে আছে এদেরকে উপনিষদ ধর্তব্যের মধ্যেই আনবে না, পোকামাকড়ের সঙ্গে এদের কোন তফাৎ নেই। যাঁরা পণ্ডিত, যাঁরা শুধু ধর্ম, অর্থ আর কাম নিয়ে আছেন, যাঁরা সারাদিন দিয়তাম্ ভুজ্যতাম্ বলে সেবা করে যাচ্ছে, এখানে তাঁদের কথা বলা হচ্ছে, বলতে চাইছেন এদের দ্বারাও আত্মতত্ত্ব ধারণা করা সম্ভব নয়। সত্ত্বগুণে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত এদের দ্বারাও আত্মতত্ত্বের ধারণা হবে না। কারণ তাঁদের মন এখনও মলিন, অশুদ্ধ। কেন অশুদ্ধ? কারণ এদের মনে এখনও ধর্ম ও অধর্মের ভাব আছে। আমাকে উচ্চতম স্বর্গে যেতে হবে, আমাকে ভালো হতে হবে, আমাকে ভালো মানুষ হতে হবে, সৎ হতে হবে, আমি যেন চুরি না করি, কাউকে যেন আমি না ঠকাই, আত্মতত্ত্বের ধারণার জন্য এগুলোও অশুদ্ধ চিত্ত। এখানে খুব উচ্চ অবস্থার লোকেদের কথা বলা হচ্ছে, সাধারণ স্তরের লোকেদের কথা এখানে বলছেন না। সাধারণ স্তর হল যেখান থেকে পারো লুটেপুটে খাও, এদের থেকে একটু উপরের স্তরে যারা তারা বলে তুমিও লুট কর আমিও লুটে খাই। এরও উপরে যারা তারা বলবে, না ভাই তুমি যা করার কর আমি এসব করতে যাচ্ছি না। এরপরে সব কিছুতে সে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে। আর শেষ ধাপে তিনি সব কিছুর পারে চলে গেছেন, ঈশ্বর ছাড়া তাঁর আর কোন বোধই নেই, আত্মা ছাড়া আর কিছুই তিনি দেখছেন না। সেইজন্য বলছেন *শৃণ্বন্তোহপি*, শুনেই যাচ্ছে কিন্তু কিছুই হচ্ছে না, কারণ অশুদ্ধ চিত্ত। অশুদ্ধ চিত্ত থাকলে কোন দিন সে আত্মতত্ত্ব ধারণা করতে পারবে না।

আমরা যদি এভাবে বাছাই করতে থাকি – হাজার হাজার লোকের মধ্যে কেউ কেউ এদিকে আসে, তাদের মধ্যে যাঁরা শুনছেন তাঁরা কেউ ধারণাই করতে পারেন না, যদিও বা দু-একজন ধারণা করে নিলেন কিন্তু তাঁরা আবার উপলব্ধি করতে পারেন না। এরমধ্যে কচিৎ কেউ যদি উপলব্ধি করে নেন তিনি আবার কাউকে বলতে চান না। তাই বলছেন *আশ্চর্যো বক্তা*, যদি আত্মতত্ত্বের কেউ ঠিক ঠিক বক্তা হন তিনি কিন্তু আশ্চর্য। আত্মতত্ত্বের কথা কেউ বলছেন, এতো অদ্ভূত ব্যাপার হয়ে যাবে, কারণ এ রকম হয় না, জগতে এই জিনিষ অতি দুর্লভ। ঠাকুর আত্মতত্ত্ব নিয়ে বলছেন, স্বামীজীও বলছেন আত্মতত্ত্ব নিয়ে, এনারা তাই আশ্চর্য পুরুষ। এই ধরণের মানুষ জগতে দুর্লভ।

কুশলোহস্য লব্ধাশ্চর্যো, আত্মতত্ত্বের কথা শুনে আত্মার ব্যাপারে যিনি ধারণা করতে পারেন তিনিও আশ্চর্য। যিনি বলছেন তিনি কদাচিৎ এক অদ্ভূত পুরুষ, যিনি শুনছেন আর শোনার পর ধারণা করছেন তিনিও এক অদ্ভুত আশ্চর্য পুরুষ। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারায় ঠাকুরের ষোলজন সন্তান, শ্রীশ্রীমাও ছিলেন, আরও অনেকে

এসেছিলেন কিন্তু ঠাকুর, মা আর স্বামীজীর এক বিশেষ মাহাত্ম্য। তার কারণ ঠাকুর হলেন এক আশ্চর্য বক্তা আর স্বামীজী হলেন এক আশ্চর্য শ্রোতা, গুরুও আশ্চর্য শিষ্যও আশ্চর্য। স্বামীজীর জীবনকে খুব ভালো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ঠাকুর যখন কোন কথা বলছেন, স্বামীজী সেই কথা একবার শুনেই ধরে নিচ্ছেন। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে আমরা এই জিনিষটা পাই না, ঠাকুর তাঁর তূণির থেকে একটা কর তূণ ছাড়ছেন স্বামীজী সেটাকে সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিচ্ছেন। আর স্বামীজী যদি কোন কারণে নিতে চাইতেন না, তখন ঠাকুর স্বামীজীকে ছুঁয়ে দিতেন বা এমন কিছু একটা করে দিতেন যার ফলে স্বামীজীর কিছুই করার থাকত না, তাঁর মনের পুরো পরিবর্তন হয়ে যেত। একদিন বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঠাকুর বলছেন জীবে দয়া, বলেই ঠাকুর থু থু করে বলছেন, তুই কে জীবে দয়া করার, জীব শিব, দয়া নয় শিবের সেবা। শুনেই স্বামীজী বলছেন – আজ আমি এক নতুন কথা শুনলাম, যদি কোন দিন সুযোগ পাই তাহলে আমি এই মহাবাক্যকে জীবনে পরিণত করে দেখাব। সেখানে আরও অনেকে ঠাকুরের কথা শুনছিলেন। বৈষ্ণবদের গ্রন্থে জীবে দয়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু ঠাকুর শুনেই সঙ্গে সঙ্গে এই কথাকে পাল্টে দিচ্ছেন। তাহলে বৈষ্ণব শাস্ত্রে জীবে দয়া কেন বলছে? আমাদের জানা নেই জীবে দয়া চৈতন্য মহাপ্রভু ব্যবহার করেছিলেন নাকি পরে যাঁরা গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁরা নিয়ে এসেছেন। দ্বিতীয়তঃ মহাপ্রভুর সময় দয়ার অর্থ কি বোঝাত আর চারশ বছর পর ঠাকুরের সময় কি বোঝাত আমাদের জানা নেই। কিন্তু ঠাকুরের সময় যখন জীবে দয়া আসছে তখন এই কথা চলে না। কারণ এখন দয়া বলতে আমাদের কাছে এর একটা বিশেষ অর্থ। ঠাকুর জীবে দয়া শুনে তাই বলছেন, দয়া কী রে! শিব জ্ঞানে জীব সেবা। সবাই ঠাকুরের কথা মুগ্ধ হয়ে শুনছেন, কিন্তু স্বামীজী বলছেন আজ এক নতুন কথা শুনলাম, যদি কোন দিন সুযোগ পাই আমি এই কথাকে কার্যে পরিণত করে দেখাব। এই হল ঠিক ঠিক *আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা*। শাস্ত্র সেই এক, সেই বৈষ্ণব শাস্ত্র, সেখান থেকে ঠাকুর যুগের জন্য এক নতুন তত্ত্ব দিয়ে দিলেন।

আরেকটি ঘটনা, এখানে স্বামীজী ঠাকুরের কথা মানছেন না। নরেন আর হাজরা দুজনে বসে ঠাকুরকে ঠাট্টা করছেন – বলে কিনা ঘটিও ব্রহ্ম, লোটাও ব্রহ্ম, সবই নাকি ব্রহ্ম! নরেন ঠাকুরের কথা মানবেন না। মানতে চাইছেন না মানে, নরেন যে বুঝতে পারছেন তা নয়, সবই বুঝতে পারছেন, কিন্তু নরেনের তখন নিজের যে ভাব সেই ভাবকে সরিয়ে এই ভাবকে বসতে দেবেন না। কারণ ঠাকুরকে নরেন তখন পৌত্তলিক বলে মনে করতেন। আবার যখন ঘটি ঈশ্বর, বাটি ঈশ্বর বলছেন তখন সেই ভাবকেও নরেন নিতে পারছেন না। ঠাকুর নরেনকে একটু ছুঁয়ে দিয়েছেন। পরের ইতিহাস আমাদের সবারই জানা, তিন দিন ধরে নরেন সব কিছু চৈতন্যময় দেখছেন। যে থালাবাটিতে খাচ্ছেন সেটাও চৈতন্য, খাদ্যও চৈতন্য। হেদুয়ায় গিয়ে রেলিংকেও দেখছেন চৈতন্য, মাথা ঠুকে পরখ করে নিতে চাইছেন রেলিং কি সত্যিই চৈতন্য না লোহা! মাথা ফুলে গেল। *আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা*, এই অনুভূতি শুধু স্বামীজীর নয়, তাঁর যাঁরা গুরুভাইরা ছিলেন সবারই এই অনুভূতি হয়েছে। কিন্তু স্বামীজীর ক্ষেত্রে ঘন ঘন হচ্ছে, প্রত্যেক ধাপে হচ্ছে।

আচার্য শঙ্করের শিষ্য পদ্মপাদের জীবনেও ঠিক এই *কুশলোঽস্য লব্ধা* দেখা গিয়েছিল। আচার্য শাস্ত্র পাঠ করবেন, দেখছেন তাঁর এই শিষ্য, যে কিনা মুর্খ, নেই। আচার্য পাঠ শুরু করছেন না। শিষ্যরা বলছেন, ও তো মুর্খ। আচার্য শিষ্যদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁর নাম ধরে ডাক দিয়েছেন, পদ্মপাদের তখন নাম ছিল সানন্দনা। সানন্দনা তখন নদীর ওপারে ছিল, গুরুর ডাক কানে যেতেই তিনি নদীর উপর দিয়ে ছুটে আসছেন। নদীতে যাতে ডুবে না যায় নদীর দেবী সানন্দনার প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলার আগেই পদ্মফুল ফুটিয়ে দিচ্ছেন। সেই থেকে তাঁর নাম হয়ে গেল পদ্মপাদ। সত্যিই হয়েছিল কিনা আমাদের জানা নেই, কিন্তু যে জিনিষটাকে বলতে চাইছেন সেটা আমরা বুঝতে পারছি। শঙ্করাচার্য আর তাঁর শিষ্যদের কাহিনী অতিরঞ্জিত হতে পারে, যমরাজ আর নচিকেতার কাহিনীও কল্পিত হতে পারে কিন্তু ঠাকুর স্বামীজীর কাহিনী তো কল্পিত নয়। আর ঠাকুর স্বামীজীকে কেন্দ্র করে একটা দুটো নয় শত শত ঘটনা আছে। আচার্য শঙ্করও বলছেন, উত্তম শিষ্যকে গুরু একবার কিছু বললেই শিষ্য বুঝে নেয় গুরু কি বলতে চাইছেন, এটাই *আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা*। আত্মতত্ত্বকে যিনি ধারণ করে নেন তিনি কুশল আর যিনি আত্মতত্ত্বের বক্তা তিনিও আশ্চর্য পুরুষ।

অনেকের উপলব্ধি হয়ে গেছে কিন্তু তিনি কাউকে উপদেশ দিতে যান না, যেমন ত্রৈলঙ্গস্বামী। বেশির ভাগ উপলব্ধিবানরাই এই রকম হন। অনেক কারণে তাঁরা উপদেশ দেন না। প্রথম কারণ, উনি দেখছেন আমি যে তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত এই উচ্চ তত্ত্ব মানুষ নিতে পারবে না, প্রস্তুতি না থাকার জন্য শ্রোতার সব কিছু গোলমাল হয়ে যাবে। দ্বিতীয় কারণ, রাজা মহারাজ যেমন তাঁর শিষ্যদের বলছেন 'আমি তোমাদের সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখছি, তোমাদের আমি কি উপদেশ দেব'! ব্রহ্মজ্ঞানী দেখছেন যাকে উপদেশ দেবেন তার মন এতই কলুষিত আর সংসারে এমন জড়িয়ে আছে যে এই উচ্চ তত্ত্ব ধারণা করতে পারবে না আর তা না হলে সবাইকে সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখছেন। ভক্তি পথে সাধনা করে যাঁদের উপলব্ধি হয়েছে তাঁরা সবার মধ্যে নারায়ণ দেখেন আর জ্ঞান পথে সাধনা করে দেখছেন আত্মাই শুধু আছেন, আত্মা ছাড়া বাকি সব মায়া। মায়া বা মিথ্যা রূপে যখন সব দেখছেন তখন এদের উপদেশ দেওয়া বেকার আবার নারায়ণ ভাবে যখন দেখছেন তখন নারায়ণকে তিনি কি শিক্ষা দেবেন! তাই সেখানেও উপদেশ দেওয়া যাবে না। সেইজন্য বলছেন *আশ্চোর্যবক্তা*, আত্মতত্ত্বকে বোঝাতে পারেন এ এক আশ্চর্য অদ্ভূত পুরুষ। আত্মতত্ত্বকে নিয়ে যাঁরাই একটু গভীর ভাবে চিন্তন করেন, সামান্যতমও যদি আত্মতত্ত্বের ব্যাপারটা একটু যাঁদের ধারণার মধ্যে আসে তাঁদের কাছে ঠাকুর একজন অবাক মানুষ, ঠাকুরের মত, স্বামীজীর মত মানুষ হতে পারেন ভাবাই যায় না। এনাদের কথা চিন্তা করলে মানুষ থ হয়ে যায়।

আশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ, আত্মতত্ত্বকে ধারণা করে উপলব্ধ করে নেবে, এ জিনিষ দুর্লভ থেকে দুর্লভতর। প্রথম ধাপে, তাদের আত্মার ব্যাপারে শোনার সুযোগ হয় না, দ্বিতীয় ধাপে শুনে নেওয়ার পর এরা কিছু বুঝতে পারে না, তৃতীয় ধাপে তারা একটু ধারণা করতে পারে, চতুর্থ ধাপে জ্ঞান প্রাপ্তি হয়ে যায়। এই জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়ে যাওয়া, *অনুশিষ্টঃ*, এরা দুর্লভ থেকে দুর্লভতর, দুশ পাঁচশ বছরে কখন ক্কচিৎ কয়েকজনের হয়।

সাত নম্বর মন্ত্রে বিদ্যা, আচার্য আর শিষ্য এই তিনজনেরই স্তুতি করা হচ্ছে। একটা জিনিষের গুরুত্বের কথা বলতে হলে কি কি কারণে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ভালো করে দেখাতে হবে। এখানে তিনজনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, প্রথমে বিদ্যাকে, এই বিদ্যা এমনই সূক্ষ্ম যে সাধারণ মানুষ ধারণা করতে পারে না। যিনি এই বিদ্যা জানেন তিনি এক অদ্ভুত পুরুষ, এই ধরণের পুরুষ জগতে বিরল, ক্কচিৎ কখন দেখা পাওয়া যায়। এই বিদ্যার শিষ্য চার শ্রেণীর, প্রথম এই বিদ্যার কথা শোনার সুযোগ পায় না, দ্বিতীয় শুনলেও কিছু বুঝতে পারে না, তৃতীয় ধারণা করতে পারে কিন্তু উপলব্ধি করতে পারে না। চতুর্থ আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি করে নেয়, এরাই কুশল, কুশল মানে পটু, দক্ষ, আত্মতত্ত্বকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা যাঁর আছে তাঁকে বলছেন কুশল। ঠাকুর মাঝে মাঝে মাস্টারমশাইকে বলছেন, তোমার এগুলো বিশ্বাস হয়? বিশ্বাস হয় মানে বলতে চাইছেন, তুমি ধারণা করতে পারছ কি? কারণ তিনি জানেন এগুলো ধারণাই করতে পারবে না। আবার কোথাও বলছেন, কাকেই বা বলি কেউ বা শুনবে। শুধু ধারণা করা নয়, আত্মতত্ত্বের উপলব্ধির পরের ধাপ আরও কঠিন। পরের মন্ত্রে আরও বিস্তারিত করে বলছেন –

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এব সুবিজ্ঞেয়ো, বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণিয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ।।১/২/৮।।

(দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিলে আত্মার ব্যাপারে জ্ঞাত হওয়া যায় না, কারণ আত্মা বাদিগণ দ্বারা বিবিধরূপে বিবেচিত হয়। কিন্তু অভেদদর্শী জীবন্মুক্ত আচার্য উপদেশ দিলে আত্মার সম্বন্ধে সকল রূপ সংশয়ের অবসান হয়। তর্কের দ্বারা আত্মাকে সূক্ষ্ম রূপে প্রমাণ করলে আত্মা তদাপেক্ষা আরও অণুতম রূপে প্রমাণিত হতে পারেন, বস্তুত আত্মা তর্কাতীত।)

আত্মতত্ত্বকে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ভাবে দেখে, এমনকি পণ্ডিতরাও বিভিন্ন ভাবে দেখেন। আত্মা বলতে 'আমি', কিন্তু 'আমি' বলতে আমরা সবাই কি বুঝি? মহা কৃপণ লোক মনে করে টাকা-পয়সা ধন-সম্পদ আমি। মা তার সন্তানকে মনে করে আমি। কামী পুরুষ তার স্ত্রীকে মনে করে আমি। আবার অনেকে বলে শরীরটাই আমি, যে নিজের শরীরকে আমি বলছে সে এদের থেকে অনেকটা উপরে চলে এসেছে, বাইরের জিনিষগুলিকে তাও একটু ছাড়তে পেরেছে। শরীর থেকে আরেকটু ভেতরে গেলে বলে আমার প্রাণটাই আমি, তার থেকে আরেকটু ভেতরে গিয়ে বলছে মনটাই আমি, চেতনা আরও উপরে এলে বলে আমার যিনি অন্তর্যামী সেটাই আমি। আর শেষে বলে সর্বব্যাপী, একমাত্র সত্তা আর সত্তা মাত্রম্ এটাই আত্মা। আমি বোধ সবারই থাকে, আত্মাকে জানে না এমন কেউ নেই, একটা কুকুর বেড়ালও আত্মাকে জানে, শুধু আত্মার পরিভাষাটা

পাল্টে যায়। এটাই এখানে বলছেন *সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ*, আত্মাকে নিয়ে অনেক রকম ভাবনা চিন্তা আছে, আত্মার অনেক পরিভাষা আছে। সেইজন্য কী হয়? *ন নরেণাবরেণ, অবর* মানে সাধারণ বুদ্ধি, সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ তাই একে ব্যাখ্যা করতে পারে না। ঠাকুর দেখছেন, যে ছাগকে বলি দেওয়া হবে সেই ছাগ সচ্চিদাননদ, যে বলি দিচ্ছে সেও সেই সচ্চিদানন্দ, যার উপর রেখে বলি দেওয়া হবে সেটাও সচ্চিদানন্দ আর যেটা দিয়ে বলি দেওয়া হবে সেই খড়্গটাও সচ্চিদানন্দ, এটাই অদ্বৈতের শেষ কথা, যিনি এই রকম দেখেন তিনিই অভেদদর্শী। এই একই ভাব আমাদের রোজ অনুশীলন করান হয় যখন *ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ* বলে খাওয়া শুরু করি। ঠাকুর আবার দেখছেন কোশাকুশি চিন্ময়, ফুল-বেলপাতাও চিন্ময় আর যে মুর্তিকে পূজো করছেন সেই মুর্তিও চিন্ময়, তারপর তিনি চারিদিকে ফুল ছুড়ছেন। এটাই অভেদদর্শী। অভেদদর্শী যখন এই আত্মতত্ত্বের উপদেশ দেন তখন অস্তিনাস্তি ভাব, যেটা নচিকেতা প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছিলেন, আত্মার ব্যাপারে কেউ বলে আছে কেউ বলে নেই, এই অস্তিনাস্তির সংশয়ের ভাবটা নাশ হয়ে যায়। সাধারণ কোন লোক বললে এই সংশয়, এই অজ্ঞান কোন ভাবেই যায় না। কেন যায় না?

অণিয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ, আত্মতত্ত্ব এমনই সূক্ষ্ম, শুধু সূক্ষ্মই নই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আর একে জানার যে বিধি বা প্রমাণ আছে সেই প্রমাণও এত অণু যে এক কথায় বলে দেওয়া যায় আত্মতত্ত্ব দুর্বিজ্ঞেয়। এতই সূক্ষ্ম যে দেখাও যায় না, ধারণাই করা যাবে না যে জিনিষটা আছে। কিন্তু ভৌতিকবাদীরা, তখনকার দিনে চার্বাকরা বলে আত্মা বলে কিছু নেই। মুখে যাই বলুক এদেরও আত্মার বোধ আছে। দর্শন দুই প্রকার, একটা যারা মনে করে মৃত্যুর পর সব শেষ। দ্বিতীয় দর্শন বলে মৃত্যুর পরে সব কিছু শেষ হয়ে যায় না, কিছু একটা চলতে থাকে। যারা মনে করছে মৃত্যুতেই সব শেষ এদেরকে বলা হয় ভৌতিকবাদী আর যারা মনে করে মৃত্যুর পরেও কিছু একটা চলতে থাকে তাদের বলা হয় অধ্যাত্মবাদী, তারা খ্রীষ্টানও হতে পারে, মুসলমানও হতে পারে আবার হিন্দুও হতে পারে। প্রথম সংজ্ঞা হয়ে গেল নাস্তি। অন্য দিকে বৌদ্ধ দর্শন খুব মজার, যদিও তারা অধ্যাত্ম দর্শনের কথা বলে কিন্তু তারা বলে জ্ঞানের পর কিছু থাকে না, এদের দর্শনকে তাই বলা হয় শূন্যবাদ। প্রথম দর্শন মৃত্যুর পর সব কিছুকে উড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু দ্বিতীয় দর্শনে যেখানে আত্মার ব্যাপারে বলে সেখানে আত্মার অনেক রকম ধারণা এসে যায়। খ্রীষ্টানরা সূক্ষ্ম শরীরকে আত্মা মনে করেন, মৃত্যুর পর এই সূক্ষ্ম শরীর স্বর্গে বা নরকে যায়। মুসলমান, জিউসদেরও এই ধারণা। বৌদ্ধদের আত্মার ধারণা আবার অন্য রকম। জৈনদের আত্মার ধারণা আমাদের বেদান্তে যে সূক্ষ্ম শরীরের কথা বলা হয় অনেকটা সেই রকম। হিন্দু ধর্মেও আত্মার ব্যাপারে অনেক ধরণের ভাবনা চিন্তা পাওয়া যাবে। নৈয়ায়িকরা আত্মাকে অনেকটা বুদ্ধির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে, সেইজন্য আত্মার মধ্যে অনেক শুদ্ধি অশুদ্ধির ব্যাপার এসে যায়। ঘোর বেদান্তে আবার রামানুজের ভাব এক রকমের, মাধ্বাচর্যের ভাব অন্য রকমের আবার আচার্য শঙ্করের ভাব পুরো অন্য ধরণের। আচার্য তাঁর ভাষ্যে বলছেন *ন হি সুষ্ঠু সম্যক্ বিজ্ঞেয়ো বিজ্ঞাতুং শক্যঃ যস্মাৎ - বহুধা অস্তি নাস্তি, কর্তা অকর্তা, শুদ্ধোহশুদ্ধ ইত্যাদ্যনেকধা চিন্ত্যমানো বাদিভিঃ*, আত্মাকে নিয়ে অনেক রকমের চিন্তা-ভাবনা পাওয়া যায়। কেউ বলে আত্মা কর্তা, কেউ বলে আত্মা অকর্তা, কেউ বলে শুদ্ধ কেউ বলে অশুদ্ধ, কেউ বলে আছে কেউ বলে নেই। নেহাৎ আমরা দর্শন পড়িনি, দর্শনের মধ্যে ঢুকলে সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে যেতে হয়, আর যখন যাঁর দর্শনই পড়বে তখন মনে হবে ইনিই ঠিক বলছেন এর বাইরে আর কিছু হয় না।

তাহলে আত্মাকে ঠিক ঠিক জানা যাবে কিভাবে? যমরাজ তখন বলছেন *অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি*। *অনন্যপ্রোক্তে*কে আচার্য ব্যাখ্যা করে বলছেন, অনন্য অর্থাৎ *ন অন্য*, নিজের যে প্রতিপাদ্য বস্তু, যে বস্তুকে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে অর্থাৎ ব্রহ্ম বা আত্মা সেই ব্রহ্ম বা আত্মার *অপৃথগ্দর্শিনা আচার্যেণ*, অর্থাৎ যে আচার্য ব্রহ্ম স্বরূপকে নিয়ে বলছেন সেই ব্রহ্ম স্বরূপের উপলব্ধি তাঁর হয়েছে আর তিনি হলেন *অপৃথগ্দর্শি*, সেই আচার্যকেই বলছেন *অনন্যপ্রোক্তা*। অনন্যপ্রোক্তার সহজ অর্থ হল ব্রহ্মজ্ঞানী আচার্য। সাধারণ মানুষ বা পণ্ডিত বা শাস্ত্রজ্ঞ আত্মতত্ত্বের কথা বললে বোঝা যাবে না, একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানী যদি আত্মতত্ত্বের কথা বলেন তবেই আত্মতত্ত্ব বোঝা যাবে। *অনন্যপ্রোক্তা* আর ব্রহ্মজ্ঞানী এক, যিনি অপৃথগ্দর্শি। এখানে এসে আবার আমাদের একটু অন্য দিকে যেতে হচ্ছে।

অনন্যপ্রোক্তাকে নিয়ে বিভিন্ন দর্শন, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বাগবিতণ্ডা শুরু হয়ে যায়। যিনি ঘোর ভক্ত তিনি বলবেন যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে। রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা বলবেন যিনি নিজেকে ঈশ্বরের অভিন্ন

অঙ্গ মনে করছেন তিনিই অনন্যপ্রোক্তা। মাধ্বাচার্যের মত ঘোর দ্বৈতবাদীরা অন্য ভাবে এর অর্থ করবেন। আমাদের এসব বিতর্কে গিয়ে কাজ নেই। তবে এটাই ঠিকই যে অনন্যপ্রোক্তাকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু আচার্য শঙ্কর অনন্যপ্রোক্তাকে পরিভাষিত করতে গিয়ে তিনি উপনিষদের সম্পূর্ণ ছবিকে নিয়ে আসছেন, এনে দেখাচ্ছেন অনন্যপ্রোক্তার সঠিক অর্থ যিনি শ্রেষ্ঠ প্রোক্তা, তাঁর সাথে আর কারুর তুলনা করা যায় না। তাঁরা কারা? অপৃথগ্‌দর্শি, যিনি কখন পৃথক দেখেন না।

ঠাকুরের কাছে অনেক ভক্তই আসতেন, তাঁদের মধ্যে নরেন রাখালাদি যুবক ভক্তরাও ছিল। একবার এক ভক্ত এসেছেন, ঠাকুর তাঁকেও খুব স্নেহ করেন। সেই মুহুর্তে নরেনও উপস্থিত। সেই ভক্ত বলছেন 'ব্যস্! নরেন এসেছে, এবার উনি নরেন খারে, নরেন নেরে, নরেন নরেন করেই যাবেন, আমরা যেন বানের জলে ভেসে এসেছি'। ঠাকুর শুনে হাসছেন। কথামৃতের এই দৃশ্যের বর্ণনা খুবই নিখুঁত, এখানেই বোঝা যায় যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তিনি কিভাবে লোক ব্যবহার করেন। এই যে ঠাকুর সবাই থাকতেও নরেন নরেন করে যাচ্ছেন ঠাকুরের কি ভেদ দৃষ্টি ছিল? অন্য একজন ব্রাহ্মভক্ত এই কথাই ঠাকুরকে আরেক দিন বলছিলেন, ঈশ্বরের মধ্যে বৈষম্য দোষ আছে, তিনি কাউকে ভালো কাউকে মন্দতে রেখেছেন। এটাই কাঁচা মনের লক্ষণ। ঈশ্বরীয় তত্ত্ব যদি ঠিক ঠিক না জানা থাকে তখন এই ধরণের কাঁচা কথা বেরিয়ে আসে। ঠাকুরের কখনই ভেদ দৃষ্টি ছিল না। একটা ঘটনা আমাদের খুব ভালো জানা আছে, একবার কয়েকজন ভক্ত আপত্তি করে ঠাকুরকে বলছেন, কায়েতের ছেলে নরেন, রাখালকে কেন আপনি এত ভালোবাসেন। ঠাকুর তখন বলছেন, ঠিক আছে ওদের উপর থেকে আমার মন তুলে নিচ্ছি। নরেন, রাখালের উপর থেকে মনে তুলে নিতেই ঠাকুর সমাধিতে চলে গেলেন, চুল, লোম সব সজারুর কাঁটার মত দাঁড়িয়ে গেছে। সমাধিবান পুরুষ যখন সমাধিতে থাকেন না তখন তাঁকেও মন একটা জায়গাতে রাখতে হয়। সাধনার পর ঠাকুরের এমন অবস্থা যাচ্ছিল যে তিনি দক্ষিণেশ্বরে কুঠি বাড়ির ছাদের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছেন, ওরে আমার ভক্তরা কে কোথায় আছিস আয়, বিষয়ীদের সাথে কথা বলে বলে আমার মুখ পুড়ে যাচ্ছে। এক জায়গায় ঠাকুর বলছেন, হাজরা উল্টোপাল্টা কথা বলে আমি রেগে গিয়ে ওকে গালমন্দ করি। আবার রাত্রিবেলা মশারির ভেতর শুতে গিয়ে মনে হতে থাকে তার ভেতরেও সেই নারায়ণ। তারপর হাজরার কাছে গিয়ে হাতজোড় করে প্রণাম করে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে আমি যাই। এই হল ঠিক ঠিক অপৃথগ্‌দর্শির লক্ষণ। আচার্য শঙ্করও বলছেন ব্যবহারকালে অভেদ দর্শন থাকে না, কিন্তু ভাবে থাকে। ক্রিয়া যখন হয় তখনও অভেদ দর্শন হয় না, কিন্তু ভাবে সব সময় হবে। ঠাকুর কাউকে ছোটও করছেন না আবার কাউকে বড়ও করছেন না। কিন্তু এক একটা জিনিষ দিয়ে এক এক ধরণের কাজ হয়। ঠাকুরই আবার বলছেন, তিনি জানেন কোন পাত্রের কোন ঢাকনা। এখন পাত্র হল জগতকে শিক্ষা দেওয়া, তার ঢাকনা নরেন। সবাইকে ভালোবেসে সঙ্ঘ চালাতে হবে, এটাও একটা পাত্র, রাজা মহারাজ এই পাত্রের ঢাকনা। অবতার জানেন ঈশ্বরের এই বৃহৎ কার্যে কে কোন ধরণের কাজের জন্য উপযুক্ত, সেইজন ঠাকুর তাঁর এক একজন পার্ষদকে এক এক ভাবে শিক্ষা দিচ্ছেন। ঠাকুর পৃথগ্‌দর্শি ছিলেন না, সবাইকেই তিনি সমান ভালোবাসতেন। তাঁর পার্ষদেরকেই যে ভালোবাসছেন তা নয়, স্বামীজীর কি সুন্দর বর্ণনা *আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ*, ঠাকুরের প্রেম চণ্ডাল থেকে শুরু করে সবার প্রতি সমান ভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। শ্রীমা বলছেন, জপ করতে করতে এক সময় দেখবে ঠাকুর তোমার সাথে কথা বলবেন, তোমার সব বাসনা পূর্ণ করবেন, তখন তুমি দেখবে তোমার ভেতরে যিনি আছেন ঐ দুলে বাগদির মধ্যেও তিনি বিরাজ করছেন। গীতাতেও ভগবান ঠিক এই কথা বলছেন *শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ*। তখনই তোমার মধ্যে দীনতার ভাব আসবে। ঠাকুরও সব কিছুতে সচ্চিদানন্দকেই দেখছেন, বলির ছাগ সেও সচ্চিদানন্দ, খড়্গাও সচ্চিদানন্দ, যে বলি দিচ্ছে সেও সচ্চিদানন্দ আর যাতে বলি দেওয়া হবে সেটাকেও সচ্চিদানন্দ দেখছেন। এনারাই ঠিক ঠিক অভেদদর্শি, অপৃথগ্‌দর্শি।

এই ধরণের আচার্য যখন উপদেশ দেন তখন তিনিই হন অনন্যপ্রোক্তা, শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক। যদি অনন্যপ্রোক্তা কিছু বলেন তাহলে কি হয়? *গতিরত্র নাস্তি*, গতিকে আচার্য আবার অনেক ভাবে ব্যাখ্যা করছেন। প্রথমে বলছেন, অস্তি নাস্তি, শুদ্ধ অশুদ্ধ এই ধরণের সঙ্কল্প-বিকাল্পাত্মক চিন্তাভাবনা মনের মধ্যে যে চলতে থাকে এই গতিটা বন্ধ হয়ে যাবে। মূল হল মনের চাঞ্চল্য। কি নিয়ে চাঞ্চল্য? আত্মা আছে কি নেই, আত্মা শুদ্ধ না অশুদ্ধ এই নিয়ে চাঞ্চল্য, গতি মানে চাঞ্চল্য। মনের এই চাঞ্চল্যটা থেমে যাবে। *অনন্যপ্রোক্তা*, শ্রেষ্ঠ পুরুষ

যখন শিক্ষা দেন তখন *গতিরত্র নাস্তি*, এই গতিটা আর থাকে না। গতির প্রথম অর্থ হল, আত্মার অস্তিত্ব আছে কি নেই, আত্মা শুদ্ধ না অশুদ্ধ এই ধরণের চাঞ্চল্য আর থাকে না, মন সঙ্কল্প-বিকল্প রহিত হয়ে যায়, সংশয়, অবিশ্বাস রহিত হয়ে যায়। নরেন সবার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, মশাই আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন? ঈশ্বর কি আছেন? কোথাও নরেনের সংশয় দূর হচ্ছে না। ঠাকুরের কাছে এসে জিজ্ঞেস করতেই, ঠাকুর বলছেন, হ্যাঁ দেখেছি বইকি! তোকে যেমন দেখছি তার থেকেও স্পষ্ট দেখতে পাই, আর তুই যদি দেখতে চাস তোকেও দেখিয়ে দিতে পারি। এরপর একদিন ঠাকুর নরেনকে ছুঁয়ে দিলেন, ছুঁয়ে দিতেই নরেন দেখছেন জগৎ সংসার সব বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এই হল *গতিরত্র নাস্তি*, নরেনের যত রকম সন্দেহ ছিল একদিনে সব মিটে গেল। এই যে ঠাকুর নরেনকে প্রথম দিন বললেন আরও স্পষ্ট দেখতে পাই, এরই বর্ণনা কঠোপনিষদে পরে আসবে, আমরা এখন যা কিছু দেখছি এই দেখাটাই আত্মজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর সব কিছু আলোময় হয়ে আরও স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। জগতকে তখন ছায়ার মত দেখায়। এরপরেও যে নরেনের সন্দেহ আসেনি তা নয়, কিন্তু তখনকার মত ঐ সন্দেহটা একেবারে চলে গিয়েছিল।

মজার ব্যাপার হল বাইবেলেও ঠিক এই বর্ণনা আছে। তৎকালীন সময় জুহুদি সমাজে অনেক সাধু মহাত্মার ছিলেন যাঁরা জুহুদিদের শাস্ত্রের কথা বলে বেড়াতেন। কিন্তু যিশু যখন বলতে শুরু করলেন, বাইবেলে তার বর্ণনা আছে – He talked as a man with authority। গ্রামের সাধারণ মানুষ ঈশ্বর, আত্মা কিছু বোঝে না, কিন্তু যিশুর কথা যখন তারা শুনছে, তাদের মনে হচ্ছে ইনিই ঠিক ঠিক জানেন, *অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি*। ফলে যিশু যাকেই বলছেন – আমার সাথে চলে এসো, সে সব কিছু ছেড়ে যিশুর সাথে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। তার মনে কোন সন্দেহ নেই, কোন চিন্তা নেই যে আমি কার পেছনে যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি! তবে সবাই কি বেরিয়ে চলে যাবে? সবাই যাবে না, যার মধ্যে ঈশ্বরীয় ভাব এসে গেছে তাদেরই *গতিরত্র নাস্তি* হবে। বেশির ভাগ মানুষ চাইছে কাম-কাঞ্চন ভোগ করতে, এদেরকে নিয়ে এখানে কোন কথা বলা হচ্ছে না। কাদের *গতিরত্র নাস্তি* হবে? যাদের মনে ঈশ্বরীয় ভাব আছে, আর তার সাথে আত্মা আছে কি নেই, তিনি শুদ্ধ না অশুদ্ধ এই সংশয়গুলি আছে, এই গতিটা তার শেষ হয় যখন *অনন্যপ্রোক্তে* হবে।

গতির দ্বিতীয় অর্থেও অনন্যপ্রোক্তের কথা চলছে। নিজের স্বরূপভূত আত্মার ব্যাপারে আচার্য যখন উপদেশ দেন তখন অন্য যে কোন জ্ঞেয় বস্তুর নিতান্ত অভাব হয়ে যায়। অনন্যপ্রোক্ত, নিজের যে আত্মা, যেটা শ্রেষ্ঠতম জিনিষ, গুরুর দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে এই শ্রেষ্ঠ জিনিষকে যখন জানা হয়ে যায়, তখন জগতের অন্য কোন কিছু জানার আগ্রহ থাকে না, জগতের কোন জ্ঞেয় বস্তুর প্রতি তার আর কোন ইচ্ছা আকাঙ্খা থাকে না। কিন্তু স্বামীজী তো বই পড়তেন। ঠাকুর বলছেন নিজেকে মারতে হলে একটা নুড়ুন হলেই হয় কিন্তু অপরকে মারার জন্য ঢাল-তলোয়ার লাগে। স্বামীজী কখনই আমি অপূর্ণ এই বোধে বই পড়তেন না। কিন্তু জগতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁকে পাঁচটা জিনিষ জানতে হত। ঠাকুরের জীবনেও কয়েকটি ঘটনা আছে, ঠাকুরকে দেখানোর জন্য একটা মাইক্রোস্কোপ নিয়ে আসা হয়েছে। মাইক্রোস্কোপে চোখ দেওয়ার আগেই ঠাকুরের সমাধি হয়ে যাচ্ছে, তিনি আর মন দিতে পারছেন না। অন্য একদিন মাস্টারমশাই মাটিতে আঁক কষে চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণ কি করে হয় ঠাকুরকে বোঝাচ্ছেন কিন্তু ঠাকুরের মন অন্য দিকে চলে যাচ্ছে। কারণ আত্মজ্ঞান যাঁর হয়ে যায় জগতের বাকি সব কিছুই তার *গতিরত্র নাস্তি* হয়ে যায়, তার আর অন্য কোন গতি থাকে না, অন্য কোন জ্ঞেয় বস্তুর প্রতি আর আগ্রহ থাকে না। যোগশাস্ত্রেও বলা হয় যে, সাধনার একটা অবস্থার পর যোগী বুঝতে পারেন, আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি ছাড়া এই জগতে আমার আর কিছু জানার নেই। জ্ঞেয় বস্তুর অভাব কেন হয়? কারণ তখন তিনি *অপৃথগ্‌দর্শি* হয়ে যান, নানাত্বের নাশ হয়ে যায় বলেই জ্ঞেয় বস্তু বলে কিছু থাকে না। আমরা একটা জিনিষকে জানতে চাইছি মানে সেখানে অভাব বোধ আসছে, আমি আপনি আলাদা সেইজন্য আপনাকে আমার যেমন জানার অভাব আছে তেমনি আপনারও আমাকে জানার অভাব আছে, তখন পরস্পরের ব্যাপারে জানতে হয়। সোনার দোকানে গিয়ে নানা রকমের সোনার গয়না দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে, একবার যখন সে বুঝে গেল সবটাই সোনা, তখন সে আলাদা আলাদা করে সোনার গয়নাকে জানতে চাইবে না। দোকানদার যদি বলে, দাদা এই গয়নাটা একবার দেখুন, সে বলবে, দেখার কিছু নেই এও তো সেই সোনারই গয়না। যিনি আত্মতত্ত্বকে জেনে গেলেন, ঈশ্বরকে যিনি জেনে গেলেন তাঁর এই নানাত্বের নাশ হয়ে যায়। নানাত্বের নাশ হয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর কাছে আর কোন জ্ঞেয় বস্তু থাকে না। যেদিন আমি দেখব এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমি নিজেই,

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমারই প্রকাশ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় যা কিছু সব আমারই রূপ, সেদিন থেকে আমার আর কী জানার থাকবে, কিছুই জানার থাকবে না। কারণ আমি আসলকে, সার বস্তুকে জেনে গেছি। তিনি জেনে গেছেন সচ্চিদানন্দই বস্তু বাকি সব মায়ার খেলা। আত্মজ্ঞানীদের কাছে জ্ঞেয় বস্তুর অভাব হয়ে যায়। জ্ঞেয় বস্তু মানে – আমি আলাদা বস্তু আলাদা। শাস্ত্রে যেখানে বলা হয় মাটিই সত্য কিন্তু তার খেলনাগুলিই মিথ্যা, সেখানেও এই কথাই বলতে চাইছেন। আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে অন্য বস্তুর অভাব কেন? কারণ মানুষ নিজের বাইরে যেটা আছে সেটাকেই পেতে চায়, সেটাকেই জানতে চায়। যেটা আমারই জিনিষ সেটাকে আলাদা করে আমার আর পাওয়ার কী আছে! আমার হাতঘড়ি সব সময় আমি দেখছি, আমি জানি এটা এইচএমটির ঘড়ি, এরপর এই ঘড়ির ব্যাপারে আমার কিছুই জানার থাকে না, আর এই ঘড়িকে নতুন করে পাওয়ারও ইচ্ছা হবে না। অপরের হাতে একটা দামী ঘড়ি দেখলে জানতে ইচ্ছে করবে, দেখিতো আপনার এই ঘড়িটা কোন কোম্পানীর। যেটা আমার সেটা আমার কাছে স্বাভাবিক। যদি জেনে যাই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমিই হয়েছি, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপারে আমার জানার কী আছে! এটাই গতির দ্বিতীয় অর্থ।

গতির তৃতীয় অর্থে বলছেন *স্বাত্মভূত আত্মতত্ত্ব*, আত্মতত্ত্বের উপদেশ শ্রবণ করে নেওয়ার পর তার আর সংসারে কোন গতি থাকে না, অর্থাৎ তার আর জন্ম-মৃত্যু হয় না, এখানেই সদ্যমুক্ত হয়ে যায়। খুব সংক্ষেপে গতির প্রথম অর্থ হল ব্রহ্মবেত্তা আচার্যের কাছে আত্মতত্ত্বের উপদেশ শোনার পর তাঁর আর কোন সংশয় থাকে না। দ্বিতীয়, অন্য কিছু জানার স্পৃহা থাকে না, কারণ জ্ঞেয় বস্তুর অভাব হয়ে যায়। আর তৃতীয়, জন্ম-মৃত্যুর গতি শেষ হয়ে যায়। চতুর্থ আরেকটা অর্থ করা হয়, আত্মতত্ত্বের কখন অগতি হয় না, অর্থাৎ বলতে চাইছেন একবার জ্ঞান হয়ে গেলে অজ্ঞান আর কখন ফিরে আসবে না। স্বামীজী তখন রাজস্থানে ছিলেন, রোজ ঘর থেকে তিনি দেখতেন দূরে একটা জলাশয় আছে। একদিন তৃষ্ণার্ত হওয়াতে তিনি সেই জলাশয়ের দিকে হাঁটতে শুরু করেছেন। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল যত হাঁটছি জলাশয় ততই পিছিয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি বুঝলেন এটাই তাহলে মরীচিকা, তারপর তিনি ঘরে ফিরে এলেন। পরের দিন আবার সেই মরীচিকা দেখছেন কিন্তু আর তিনি মুগ্ধ হলেন না। একবার জ্ঞান হয়ে গেলে সেই জ্ঞান আর হারায় না, এটাই এখানে বলছেন *গতিরত্র নাস্তি*। কখন এমন হবে না যে, ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব জানার পর আত্মতত্ত্ব থেকে মন সরে আবার সংসারকে গ্রহণ করবে, আত্মজ্ঞানীর তখন অগতি হয়ে যায়। *অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি*, আচার্য এর এই চারটে অর্থ করছেন।

আচার্য বলছেন *এবং সুবিজ্ঞেয়ো আত্মা*, আত্মজ্ঞানী আচার্য যখন শিক্ষা দেন তখন তাঁর অভিন্ন ভাব হয়ে যায়। অভিন্ন ভাব শব্দ কঠোপনিষদের প্রাণ। যদিও বেদান্তের প্রাণ অভেদদর্শন বা অপৃথকত্ব, কিন্তু কঠোপনিষদে এই কথাই ঘুরে ঘুরে আসতে থাকে। ঠিক ঠিক আচার্য যখন আত্মতত্ত্বের কথা বলেন তখন এটাই সুবিজ্ঞেয় হয়ে যায়, বলতে চাইছেন সহজেই আত্মতত্ত্বকে ধারণা করা যায়। ঠিক ঠিক আচার্য যদি না হন তখন আত্মতত্ত্ব সব সময় দুর্বিজ্ঞেয় অর্থাৎ দুর্বোধ্য হয়ে যায়। কেন দুর্বোধ্য হয়ে যায় সেটাই এবার বলছেন। *অণিয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ*, দুটো জিনিষকে নিয়ে আসা হয়েছে, তর্ক আর প্রমাণ। কোন জিনিষকে জানতে হলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাই, কিন্তু আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাহলে আত্মাকে জানার দ্বিতীয় পথ যুক্তি দিয়ে জানা। কিন্তু শ্রুতি এখানে বলে দিচ্ছে যুক্তি দিয়েও আত্মাকে জানা যাবে না। কারণ *আত্মা অণুপ্রমাণাৎ*, অর্থাৎ আত্মা খুব সূক্ষ্মতম বিচারের বিষয়। সূক্ষ্মতম বিচারে সমস্যা হল, জগতে যে কোন জিনিষের জ্ঞান লাভে আমরা সূক্ষ্ম দিয়ে স্থূলকে বুঝি, ছোট দিয়ে বড়কে বুঝি, জ্ঞানের এটাই পথ। মৌলিক দিয়ে যৌগিক জিনিষকে জানা যায়। ছোটদের প্রথমে একের ধারণা দেওয়া হয়, একের ধারণা হওয়ার পর সেখান থেকে তাকে দুইয়ের ধারণা শেখান হয়। শিশুরা নিজেদের শরীর ছাড়া কিছু বোঝে না, নার্সারি স্কুলে তাই বাচ্চাদের শেখানো হয়, তোমার মাথা এক, চোখ দুই। বেশ কিছু দিন অভ্যাস করার পর যেই আঙুল পাঁচ বলা হবে সে কিছুই বুঝতে পারে না। অনেক দিন অভ্যাস করে করে এক আর দুইয়ের ধারণা দেওয়ার পর তাকে শূন্যের ধারণা করাতে হয়। কিন্তু শূন্যকে বাচ্চারা কিছুতেই ধারণা করতে পারে না। তাকে যদি এক আর শূন্য আর কোন রকমে যদি দুইয়ের ধারণা করিয়ে দেওয়া হয় তারপর ধীরে ধীরে তিন, চার, পাঁচ, ছয় ধারণা করিয়ে দেওয়া সহজ হয়, সাথে সাথে মুখস্তও করিয়ে দিতে হবে। তার মানে মৌলিক হল এক, এক মৌলিক থেকে যৌগিক দুই, তিন, চার এগুলোকে শিখিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু আবার এক থেকে শূন্যে যেতে তার প্রাণ বেরিয়ে যায়। এটাই এর একমাত্র কারণ, মৌলিক থেকে যৌগিককে ধারণা করিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু যৌগিক থেকে মৌলিকে কোন দিন

আসতে পারবে না। জটিল থেকে সহজে যাওয়া যায় না, কিন্তু সহজ থেকে জটিলে যাওয়া যায়। ঈশ্বরের একটা নাম সহজ। আত্মা বা ব্রহ্ম শুধু মৌলিকই নন, মৌলিকতম, সব কিছুর মূলে। সেইজন্য ঈশ্বর বা আত্মা বা ব্রহ্মকে কোন দিন কোন কিছু দিয়ে পরিভাষিত করা যাবে না। জগতের কোন কিছু দিয়েই মৌলিককে বোঝান যায় না। গুণকেও ব্যাখ্যা করা যায় না, যেমন সুন্দর বা সৌন্দর্য্যকে ব্যাখ্যা করা যায় না। মৌলিকের সাহায্য নিয়েই আমরা জীবন চালাই। আমরা বলি, আহা ওকে দেখতে কি সুন্দর, কিন্তু সুন্দর বলতে কি বোঝায়, আপনার কত গুণ, গুণ বলতে কি বলতে চাইছে, এগুলোকে ব্যাখ্যা করা যায় না। ঠিক তেমনি আত্মা কি, কখনই ব্যাখ্যা করা যায় না। আত্মা আবার গুণ, সুন্দর এগুলোরও মৌলিক, অর্থাৎ মূলতম। সেইজন্য বলছেন *হ্যতর্কমণুপ্রমাণাৎ*, তর্ক দিয়ে, বিচার করে কোন দিন ঈশ্বরকে জানা যাবে না। আরও সমস্যা হল *অনুপ্রমাণাৎ*, আত্মা বা ব্রহ্ম সূক্ষ্মতম, প্রমাণের মধ্যে, জানার জন্য তিনি হলেন সূক্ষ্মতম। আজ আমরা যে কোন জিনিষকে যুক্তি দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিতে পারি, কিন্তু আগামীকাল আরও বড় বুদ্ধিমান পণ্ডিত এসে অন্য যুক্তি দিয়ে তাকে খণ্ডন করে দেবেন। পরশু তার থেকে আরও একজন বড় পণ্ডিত এসে সেটাও খণ্ডন করে দেবেন। আদিমকাল থেকে এই খণ্ডন করা চলে আসছে। যুক্তি তর্ক দিয়ে তাই কখনই আত্মা বা ঈশ্বরকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারব না। কেন পারা যাবে না? কারণ যার যুক্তি যত ধারাল সে তত অন্যদের যুক্তিকে কুচি কুচি করে কেটে তার যুক্তিকে দাঁড় করিয়ে দেবে। সেইজন্য বলছেন অনন্যপ্রোক্তা ছাড়া আত্মার ব্যাপারে ধারণা করা যাবে না। আত্মদর্শি আচার্য ছাড়া কেউ যদি কাউকে আত্মার ব্যাপারে শিক্ষা দিতে যায় সে কোন দিন আত্মার ব্যাপারে কিছুই বোঝাতে পারবে না। পরের মন্ত্রে এই জিনিষটাকে নিয়েই আবার বলছেন –

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া
প্রোক্তাহন্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি
তাদৃঙ্নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা।।১/২/৯।।

(হে প্রিয়তম! তোমার যে এই সদ্বুদ্ধি হয়েছে, এই জিনিষ তর্কের দ্বারা কখনই লভ্য নয়। তার্কিক থেকে ভিন্ন কোন জ্ঞানী আচার্য কর্তৃক উপদেশ প্রাপ্ত হলেই ঐ মতি সাক্ষাৎকারের কারণ হয়। হে নচিকেতা! সত্যিই তুমি পরমাত্মাকে জানার জন্য দৃঢ়সংকল্প, তোমার মত জিজ্ঞাসুরাই যেন আমাদের কাছে আসে।)

এই ধরণের উক্তির দ্বারা সচরাচর গ্রন্থস্তুতি বা বিদ্যার স্তুতি করা হয়। এখানে কিন্তু বিদ্যার স্তুতির সাথে শিষ্যেরও প্রশংসা করা হচ্ছে। অধ্যাত্ম রামায়ণে পার্বতী যখন মহাদেবকে শ্রীরামের ব্যক্তিত্বকে নিয়ে প্রশ্ন করছেন তখন মহাদেবও পার্বতীর খুব প্রশংসা করছেন। অন্যান্য শাস্ত্রেও যেখানে কথোপকথনের মধ্যে যখন কেউ কাউকে প্রশ্ন করছেন তখন সেখানেও প্রশ্নকর্তার প্রশংসা করা হয়। এখানে যমরাজ নচিকেতার প্রশংসা করে বলছেন তোমার মনে যে প্রশ্নের উদয় হয়েছে এটি অতি উত্তম প্রশ্ন। মনের মধ্যে কোন উচ্চমানের প্রশ্ন উদয় হলে বুঝতে হবে প্রশ্নকর্তার মধ্যে পাত্রতা এসেছে। সাধারণত মানুষ দুই ধরণের প্রশ্ন করে, একটা হল যে ব্যাপারে সে অজ্ঞ সেই ব্যাপারে প্রশ্ন করে আর দ্বিতীয় কাউকে পরীক্ষা করার জন্য প্রশ্ন করা হয়। পরীক্ষা করার জন্য প্রশ্ন করাটা এক শিক্ষকরা করেন আর দ্বিতীয় যারা ঔদ্ধত, যাদের মধ্যে সংস্কৃতির অভাব তারা অনেক সময় নিজেকে জাহির করতে বা কাউকে বিব্রত করতে এই ধরণের আচরণ করে। গুরু শিষ্যকে অনেক কথা বলে যাচ্ছেন, শুনতে শুনতে হঠাৎ শিষ্যের মনে কোন প্রশ্ন জাগল। এই যে প্রশ্ন জাগল, এর অর্থ হল শিষ্যের যে জ্ঞানের পাত্র সেটা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, এরপর একটা কিছু বিচার গুরুর কথার মাধ্যমে তার ভেতরে এল যেটা ঐ পাত্রে খাপ খাওয়াতে পারছে না, সেইজন্য আরেকটা পাত্র তার দরকার বা অন্য দিক দিয়ে বলা যেতে পারে ওর পাত্র তৈরী হয়ে গেছে কিন্তু সেখানে কোথাও একটু ফাঁক থেকে যাচ্ছে। দুদিক দিয়েই প্রশ্ন উঠতে পারে। কোন একটা তথ্য এসে গেছে, সেই তথ্যটা ঠিক খাপে খাপে বসছে না, তার জন্য একটা জায়গা তৈরী করতে হবে বা শিষ্য এমন কিছু একটা শুনেছে যেটাকে নেওয়ার জন্য একটা জায়গা তৈরী হয়ে গেছে সেই জায়গাটাকে এবার ভরাট করা দরকার অর্থাৎ কিছু তথ্য দরকার।

অধ্যাত্ম এমনই একটা বিষয় যার ব্যাপারে আমরা কিছু শুনেছি, এই শোনাটুকু ছাড়া আমরা আর কিছুই জানি না, যার ফলে যখনই কেউ প্রশ্ন করে তখন সেই প্রশ্নগুলি নেহাতই ছেলেমানুষি প্রশ্ন হয়ে যায়। ঠাকুরকে একজন এসে বলছে, মশাই! আমাকে সমাধিটুক শিখিয়ে দিন। ভদ্রলোক কোথাও সমাধি শব্দ শুনেছে, সেখান

থেকে তার মনে প্রশ্ন উঠেছে সমাধি জিনিষটা কি। এগুলোই ছেলেমানুষি প্রশ্ন। নচিকেতা ছেলেমানুষের মত কোন প্রশ্ন করছেন না। অধ্যাত্ম বিষয়ক কিছু জিনিষ আগে থেকেই তাঁর ধারণার মধ্যে আছে, কিছুটা যমরাজের কাছে শুনছেন, কিছুটা আবার পূর্বজন্মের সংস্কার আছে, সব মিলেমিশে নচিকেতার মনে একটা চাঞ্চল্য উৎপন্ন হয়েছে। স্ফটিক তৈরী করার সময় স্ফটিকের মিশ্রণকে তাপ দিয়ে দিয়ে খুব ঘন করে দেওয়া হয়, ঘন করার পর এক ফোঁটা স্ফটিকের রাসায়নিক উপকরণ দিয়ে দিলেই সেটা যেমন স্ফটিক হয়ে গেল, ঠিক তেমনি নচিকেতার ভেতরটা আগে থাকতেই তৈরী হয়ে গেছে, এবার প্রশ্নটা এল। বেশির ভাগ মানুষই যখন প্রশ্ন করে তখন কোন পাত্রতা ছাড়াই তারা প্রশ্ন করে থাকে। পাত্রতা মানে, যে বিষয়কে নিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে সেই বিষয়ের নীচে যা কিছু সবটাই যেন তার জানা থাকে। তার নীচে যা আছে তার কিছুই আমাদের জানা নেই কিন্তু দুমদাম্ প্রশ্ন করে বসি। প্রশ্ন করার আগে তার অনেক প্রস্তুতি চাই। যমরাজ যে নচিকেতাকে এত প্রশংসা করছেন তার কারণ নচিকেতার পাত্রতা তৈরী হয়ে গেছে।

পাত্রতা মানেই অধিকার আর অনধিকারের ব্যাপার সম্পর্কিত। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে এই অধিকার যদি না থাকে সেটাই তখন অনধিকার চর্চা হয়ে যায়। অধিকার না থাকা মানেই পাত্রতা নেই, তখন আর প্রশ্ন করা যায় না। প্রশ্ন করার পাত্রতা আমার মধ্যে এসেছে কিনা কিভাবে বিচার করে বুঝতে পারব? খুব সহজেই বোঝা যায়, প্রশ্নটা প্রশ্নকর্তার মাথার মধ্যে অনবরত নাড়া দিচ্ছে কিনা। যদি দেখা যায় একটা প্রশ্ন অনেক দিন ধরে মাথার মধ্যে ঘুরপাক করছে তাহলে বুঝতে হবে পাত্রতা এসেছে, তা না হলে বুঝতে হবে প্রশ্ন করার পাত্রতা হয়নি। নচিকেতা এখানে যে প্রশ্ন করছেন প্রথমে বলছেন *যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে*, কেউ বলে আছে কেউ বলে নেই, এই প্রশ্ন দীর্ঘ দিন ধরে তাঁর মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। কোন বিষয়ের সামান্য একটু বা বিষয়ের অর্দ্ধেকটা আপনার ভেতরে এসেছে, আসার পর সেই বিষয় জায়গা খুঁজছে, কিন্তু কোন জায়গা নেই। বেশির ভাগ সময় যে প্রশ্ন করা হয় সেখানে প্রশ্নের মাধ্যমে প্রশ্নকর্তার নিজেরই কিছু বলার থাকে। নচিকেতার মনে শুধু যে প্রশ্ন আসছে তা নয়, এর পেছনে যে প্রস্তুতি দরকার সেই প্রস্তুতিটা তাঁর আছে। যমরাজ বলছেন, জগতের সমস্ত সুখ, ঐশ্বর্য দেওয়া হল কিন্তু তুমি গ্রহণ করতে চাইলে না। শিষ্যের ঠিক ঠিক পাত্রতা হয়ে গেছে, আচার্যও বুঝে গেছেন এর মধ্যে পাত্রতা এসেছে, তখন আচার্য তাঁর সুখ্যাতি করছেন। যমরাজও এখানে নচিকেতার প্রশংসা করে বলছেন –

এষা, এই জিনিষটাকে *ন তর্কেণ মতিরাপনেয়া*, অর্থাৎ আত্মতত্ত্বকে যদি মতির মধ্যে আনতে হয় তাহলে তর্কের দ্বারা কোন দিন আনা যাবে না। আচার্য মতি শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, *যেয়মাগমপ্রতিপাদ্যা আত্ম-মতিঃ*, শাস্ত্রে যে জিনিষটা বলা হয়েছে আর আচার্য যেটা নিজের মুখে ব্যাখ্যা করেন সেটা যখন নিজের বুদ্ধিতে আত্মবিষয়ক গতি হয় সেটাকে বলছেন মতি। একটা উচ্চতত্ত্ব বা উচ্চচিন্তন, যার ব্যাপারে কোন ঋষি এর আগে বলে গেছেন, সেই উচ্চ চিন্তনের কথা যখন কোন গুরুজন বলছেন তখন সেটা যেন আমার ভেতরে প্রবেশ করে, এটাকে বলছেন মতি। আমরা প্রায়ই অপরকে বলে থাকি, তোমার এই দুর্মতি কি করে হল! দুর্মতি মতির বিপরীত। তাহলে মতি হল, একটা উচ্চচিন্তন, এখানে আত্মবিষয়ক বুদ্ধি, এই আত্মবিষয়ক বুদ্ধি একমাত্র *প্রোক্তাহন্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ*, যিনি শাস্ত্রজ্ঞ আচার্য একমাত্র তাঁর কথায় বুদ্ধিতে ঠিক ঠিক ভাব উৎপন্ন হয়। আচার্য আত্মার ব্যাপারে শিষ্যকে অনেক কিছুই বলছেন, তিনি সেটাই বলবেন যেটা শাস্ত্রে আছে, নিজের মন থেকে কিছু বলছেন না। হিন্দু সম্প্রদায়ে কোন জিনিষের সত্যের পরীক্ষা হয় শ্রুতি, যুক্তি আর অনুভূতি দিয়ে। যদি শাস্ত্রে এসে থাকে, বেদে যদি থাকে তবেই সেটাকে সত্য বলে মানতে হবে, যুক্তি মানে জিনিষটাকে যুক্তিযুক্ত হতে হবে আর শেষে এই সত্যকে কেউ উপলব্ধি করেছেন। আচার্য বলতে এখানে তাঁকেই বোঝাচ্ছে শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি এই তিনটিতে যিনি সম্পন্ন, অর্থাৎ তিনি শাস্ত্রের মর্ম জানেন, যুক্তি দিয়ে বলছেন আর তাঁর নিজের এই অনুভূতি হয়েছে। এই রকম আচার্যের মুখ দিয়ে যখন আত্মবিষয়ক কথা নিঃসৃত হয়, আর সেই কথাগুলি শ্রোতার মনের মধ্যে প্রবেশ করে ওখানে একটা জায়গা তৈরী করে নেয়, সেটাকে বলছেন মতি। চারিদিকে ঠাকুরের এত উৎসব হচ্ছে, সভা হচ্ছে, সম্মেলন হচ্ছে হাজার হাজার লোক এত এত ভাষণ শুনছে কিন্তু একটা কথাও কি শ্রোতার ভেতরে ঢুকে জায়গা করে নিচ্ছে? যাঁরা বলছেন তাঁরাও কেউ *অনন্যপ্রোক্তা* নন। সেইজন্য কারুরই ভেতরে কিছুই জায়গা করে নিতে পারছে না। জায়গা করে নেওয়া মানে, সংস্কারগত ভাবে মস্তিষ্কের যে গঠন আগে থেকে হয়ে আছে, সেই গঠণটাকেই পাল্টাতে শুরু করে

দেওয়া। তাহলে ভাবুন, মস্তিষ্কের গঠণকে যে চিন্তা-ভাবনা পাল্টাতে শুরু করে দেবে সেই চিন্তা-ভাবনাকে কত শক্তিশালী হতে হবে। ঐ চিন্তা-ভাবনা যদি শাস্ত্র থেকে এসে থাকে, ঐ ধরণের আচার্য বা গুরুর মুখ দিয়ে এসে থাকে তখন সেটাই একটা বুলেটের মত শক্তিশালী হয়ে যাবে। বুলেটকে এমনি হাতে করে ছুঁড়ে মারলে কিছু হবে না, কিন্তু বন্দুকের ভেতর থেকে যখন বেরিয়ে আসে তখন সেটাই মারাত্মক শক্তিশালী হয়ে বেরিয়ে আসে। শাস্ত্রের কথা আমরা যতই পড়ে যাই না কেন, আর যতই এখান ওখান থেকে লেকচারে শুনে যাই না কেন, কিছুই হবে না। আত্মজ্ঞানী আচার্যের মুখ থেকে যখন শাস্ত্রের কথা শ্রবণ করা হবে তখনই সেই শাস্ত্রবাক্য বুলেট হয়ে আমাদের ভেতরে ঢুকে মস্তিষ্কের গঠনটা পাল্টে দিয়ে জায়গা করে নেবে, তবেই মতি সৃষ্টি করবে। মতি মানে ঐ মানসিকতাটা তৈরী করে দেওয়া। সেটাই এখানে বলছেন *নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া*, আত্মার ব্যাপার, ঈশ্বরের ব্যাপার, ঈশ্বরীয় কথা, উচ্চ চিন্তন এগুলো তর্ক দ্বারা কখনই জানা যায় না।

তর্ক দ্বারা কেন জানা যায় না? তর্ক মানেই বুদ্ধির খেলা, বুদ্ধি চলে মন দিয়ে, আর মনের স্বভাব হল সঙ্কল্প বিকল্প। সঙ্কল্প বিকল্প মানে, এক্ষণে বলবে হয়ত আত্মা আছে, পরেক্ষণেই বলবে কে জানে বাপু আত্মা হয়ত নেই। শুধু আত্মার ব্যাপারেই নয়, অনেক কিছুর ব্যাপারেই আমরা সন্দিগ্ধমনা, চঞ্চল মন এভাবেই আচরণ করে। এই বলছে ওর মত বন্ধু হয় না, তারপরেই বলছে ওর মুখও আমি দেখতে চাই না। যাকে ভালোবাসছে তাকে বলবে তুমিই আমার জীবনের সব কিছু, পরক্ষণেই বলছে আমার জীবনের সর্বনাশের মূলে তুমি। এই সঙ্কল্প বিকল্প মন দিয়েই আত্মার কথা, ঈশ্বরীয় তত্ত্বকে তর্কের দ্বারা জানতে চাইছে। তার কোন অনুভূতিই হয়নি, অর্থাৎ ঐ জিনিষে তার মতি হয়নি। যার সাথে তার জীবনের সম্পর্ক, যার প্রতি তার ভালোবাসা, তার এমন কোন একটা আচরণ, তার ব্যক্তিত্বের এমন কোন গুণ যেটা ভেতরে গিয়ে তাকে স্পর্শ করেছে। বেশির ভাগ ভালোবাসা প্রেম চলে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, ব্যক্তিত্বকে নিয়ে চলে না। তার টাকা-পয়সাকে ভালোবাসে, তার সামাজিক পদমর্যাদাকে ভালোবাসে, তার সুন্দর চেহারাকে ভালোবাসে, তার বাহ্যিক জিনিষগুলিকেই ভালোবাসে। ফলে তার থেকে শ্রেষ্ঠ কেউ যদি এসে যায় তখন ঐ ভালোবাসা উড়ে যাবে। আরও জঘন্য ব্যাপার হল, বাহ্যিক জিনিষের জন্যও ভালোবাসছে না, নিজের ভেতরেই কোথাও একটা অভাব বোধ আছে, ঐ অভাব বোধটাকে মেটাবার জন্য যাকে পায় তাকেই আঁকড়ে ধরে। সাধারণ জীবনেই অতি তুচ্ছ তুচ্ছ ব্যাপারে যে মন এত বড় ছলনা করে যাচ্ছে, সেই মন ঈশ্বর বা আত্মার ব্যাপারে কি করে জানবে! ঠাকুর বলছেন, সংসারীদের কোন আঁট নেই, এই বলে মাছ খাবো না, পরের দিনেই মাছ খায়। আমরা এই ঠিক করছি যে আমি এই রকম করব কিন্তু তার পরক্ষণেই তার উল্টোটা করছি। কারণ ঐ জিনিষে আমাদের মতি নেই। কোন অধিকারী পুরুষের থেকে যখন একটা ভাব আমার কাছে আসছে, ঐ ভাব যখন ভেতরে ঢুকছে তখন সেই ভাবটা আমার মনের মানসিকতাকেই পাল্টে দিয়ে একটা জায়গা করে নিচ্ছে, তখনই ঐ জিনিষে আমার মতি এসে যাবে। ঠাকুরের খুব সুন্দর উপমা আছে, হালদার পুকুরের পারে সবাই এসে বাহ্যে করে যেত, লোকেরা গালমন্দ করে কিন্তু কেউই গ্রাহ্য করে না। একদিন কোম্পানীর লোক এসে নোটিশ টাঙিয়ে দিয়ে গেল 'এখানে কেহ বাহ্য করিবে না, করিলে জরিমানা হইবে', তারপর দিন থেকেই সব বন্ধ হয়ে গেল। এরপর দুষ্টুমি করেও সেখানে আর কেউ বাহ্য করতে যাচ্ছে না, এটাকেই বলে চাপরাশ।

আত্মবিদ্যাকে জানার জন্যও নয়, আত্মার ব্যাপারে শাস্ত্র ও আচার্যরা যা কিছু বলছেন সব ঠিক বলছেন, শুধু এই বিশ্বাসটুকু আনার জন্য চাপরাশ দরকার। দুটো জিনিষের সংযোগ হলেই চাপরাশ হয়, প্রথম শাস্ত্রের কথা আর দ্বিতীয় সেই শাস্ত্রের কথা আচার্যের মুখ দিয়ে আসা, এই দুটোর সংযোগ হতে হবে। আচার্যের যদি শাস্ত্রের কথা জানা না থাকে তাহলে সেই আচার্যের কথার কোন দাম হবে না আর আচার্য ব্যতিরেকে অন্য কোন ভাবে যদি শাস্ত্রের কথা আসে তখন সেই কথারও কোন দাম হবে না। কোথাও শুনে নিয়ে কেউ যদি গায়ত্রীমন্ত্রের জপ করতে থাকে সেই জপের কোন ফল হবে না। গায়ত্রীমন্ত্রকে আচার্যের মুখ দিয়েই আসতে হবে। সমস্যা হল, তর্ক যুক্তি সব সময় মনের সংশয় দিয়ে চলে, এই মুহুর্তে মন একটা ঠিক করছে, পর মুহুর্তেই সেটা থেকে সরে আসছে। কথামৃতের পাতাগুলিকে খুলে নেওয়ার পর সব পাতাকে যদি উল্টোপাল্টা করে মিশিয়ে দেওয়া হয় তারপর যদি আবার সাজিয়ে দেওয়া হয়, আমরা কোন দিন ধরতে পারবো না কোন পাতা আগে ছিল আর কোন পাতা পরে ছিল। ক্ষীরসমুদ্রের যেখান থেকেই পাত্রে জল তোলা হোক না কেন, পাত্রে ক্ষীরই উঠে আসবে। একজন চিন্তক বা দার্শনিক বা কোন বুদ্ধিজীবির সমস্ত কথাকে যদি কথামৃতের মত

এভাবে করা হয়, তাহলে যার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে সে ধরে নেবে এই কথাটা সে আগে বলেছে আর এই কথাটা পরে বলেছে। কারণ প্রত্যেকের চিন্তার মধ্যেও বিবর্তনের নিয়ম প্রযোজ্য। চিন্তার বিবর্তন মানেই সে তার নিজের এই চিন্তার ব্যাপারেও নিশ্চিত নয়। পাঁচ দিন পরেই বলবে, এই ব্যাপারে আমার মাথায় আরেকটা জিনিষ এসেছে অথবা বলবে এই ব্যাপারে আমার আরেকটা যুক্তি আছে। কথা শুনেই বোঝা যাচ্ছে ইনি আগে অন্য রকম কিছু বলছিলেন, এবার যখন অন্য রকম বলছেন তার মানে তাঁর চিন্তা-ভাবনাতে পরিবর্তন এসেছে। ঠাকুরের মধ্যে এই জিনিষ কখনই পাওয়া যাবে না। ঠাকুরের সেই কয়েকটি কথা, ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, সচ্চিদানন্দই আছেন, দক্ষিণেশ্বরে মাস্টারমশাইয়ের প্রথম আগমনের দিন যে কথাগুলো বলছেন আর ঠাকুর যখন মহাসমাধিতে চলে যাচ্ছেন তার আগের মুহুর্তেও সেই একই কথা। আচার্যের মুখে শাস্ত্রের কথা আর পণ্ডিতের মুখে শাস্ত্রের কথা বা তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার কথাতে এটাই তফাৎ। চিন্তার মধ্যে যদি বিবর্তন হয় তাহলে তার কথা বিশ্বাস করা যাবে না। আমি আজ যে কথা বলছি আগামীকাল সেই কথা নাও বলতে পারি, কারণ আমার চিন্তা-ভাবনাতেও বিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়ে গেছে তাঁর মধ্যে সমস্ত বিবর্তন হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, তাই প্রথম দিন থেকে তিনি যে কথা বলে আসবেন শেষ দিনেও একই কথা বলে যাবেন। যিশু, বুদ্ধ সবাই একই কথা বলে গেছেন। তাঁরা তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত, তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কথার মধ্যে কখন পরিবর্তন হয় না। 'তর্ক' শব্দ দিয়ে এখানে বলতে চাইছেন যাদের অনুভূতি হয়নি এবং বুদ্ধির দ্বারা বিচার করে যাচ্ছে। বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে যে কথাই বলা হবে সেটাই সংশয়াত্মক হবে। সংশয়াত্মক এখানে খারাপ অর্থে বলা হচ্ছে না, ওর আইডিয়াগুলো এখনও evolve করছে। আইডিয়া evolve করা মানেই আজ এক রকম বলছে কাল অন্য রকম বলবে। তাই বলছেন তর্কের দ্বারা আত্মতত্ত্বকে কোন দিন পাওয়া যাবে না।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেছেন আর জগতকেও প্রচুর চিন্তা-ভাবনার রসদ দিয়ে গেছেন। তিনি নিজে একজন গণিতজ্ঞ ছিলেন। উনি একবার ঠিক করলেন একটা দর্শনের বই লিখবেন যাতে তিনি এমন একটা পদ্ধতি দাঁড় করাবেন, যে পদ্ধতি পুরোপুরি যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকবে, তাতে যুক্তি ছাড়া কিছু থাকবে না আর যেটাকে কেউ কোন দিন আর কোন প্রশ্ন করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত উনি লিখলেন। উনি যখন লিখছিলেন ঠিক সেই সময় আমেরিকাতে একজন গণিতজ্ঞ স্বাধীন ভাবে কাজ করছিলেন। সেই সময় তিনি প্রমাণিত করে দিলেন, বার্ট্রাণ্ড রাসেলের এই মেথড কখনই বাস্তবে সম্ভব হতে পারে না। ওনার একটা খুব জটিল গাণিতিক থিয়োরী আছে যার নামই হল Gödel's incompleteness theorems। উনি তাতে দেখাচ্ছেন আপনি যদি কোন প্রণালীর মধ্যে নিজেকে বেঁধে নেন আর সেই প্রণালীর মধ্যে থেকে আপনি যদি কোন কিছুকে প্রমাণিত করে দিতে পারেন তাহলে সেটা সব সময় incomplete হবে। কারণ কোন জিনিষকে প্রমাণিত করার জন্য আপনাকে ঐ জিনিষের বাইরে থেকে আসতে হবে। কিন্তু বাইরে থেকে আসা মানেই হবে জিনিষটার নিয়মকে ভেঙে দেওয়া। বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর নতুন থিয়োরিতে এক দুই করে কয়েকটি খুব সাধারণ পরিভাষা নিয়ে এলেন, তার মানে তিনি একটা প্রণালী তৈরী করে দিলেন। Gödel গাণিতিক নিয়মে প্রমাণিত করে দিলেন, যদি এই রকম হয় তাহলে ঐ নিয়মের মধ্যে থেকে তাকে কখনই প্রমাণিত করা যাবে না, তার মানে জিনিষটা কখনই complete হবে না। Complete কিনা বোঝার জন্য আপনাকে ঐ সিস্টেমের বাইরে আসতে হবে। যেমনি বাইরে এসে গেলেন তাহলে প্রথমে তিনি যে সিদ্ধান্ত গুলি দিয়েছিলেন সেই সিদ্ধান্তের আর কোন দাম থাকল না। সেই থেকে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের এত নামকরা Mathematical Philosophy চিরদিনের মত ওখানেই শেষ হয়ে গেল। তিনি যে ভেবেছিলেন বিশ্বে আর কোন দিন কোন দর্শনকে প্রশ্ন করার সমস্যা থাকবে না, সব দর্শনকেই যাচাই করে নেওয়া যাবে, এই ভেবে তিনি যেটা দাঁড় করিয়েছিলেন সেটাই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। এটাই বুদ্ধির খেলা। যখনই আমি বুদ্ধি দিয়ে একটা কাজ করলাম, তারপর অন্য একটা বুদ্ধি এসে যাবে বা আমার থেকে একটা শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি এসে আমাকে তুলে ফেলে দেবে।

সেইজন্য যমরাজ বলছেন *নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া*, *আপনেয়া* মানে আপন করে নেওয়া, যুক্তিতর্ক দিয়ে কখনই আত্মবিষয়ক মতি হবে না। *প্রোক্তাহন্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ*, কেবল তর্কবিদ নন, *অন্য* অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞ এবং শাস্ত্রনিষ্ঠ ব্যক্তি যখন বলবেন তখনই প্রকৃষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হবে। যারা যুক্তিতর্ক করছে তারা শাস্ত্র জানে না, তত্ত্বটা জানে না, এদের কথাতে কোন দিন মতি হবে না। এখানে শুধু নাস্তিকদের নিয়ে বলা হচ্ছে না, যারা আস্তিক, যাদের শ্রদ্ধা বিশ্বাস আছে তাদেরকেও বলা হচ্ছে। কারণ তারাও যখন বুদ্ধি দিয়ে আত্মতত্ত্বকে

সামনে নিয়ে আসছে তখন তাদের কথাকেও নেওয়া যাবে না। ঠাকুরের সময় ব্রাহ্ম সমাজের একজন বলছেন ঈশ্বর নিরাকার, তিনি নিরাকার বানানটাও জানেন না, 'নি' না বলে বলছেন 'নী'রাকার, তার মানে ঈশ্বর হলেন নীরের আকার, নীর মানে জল, তিনি জলের আকার, জলের কোন আকার নেই তাই তিনি 'নী'রাকার। বক্তা বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরের স্বরূপকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। বুদ্ধি দিয়ে যে জিনিষকেই নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয় সব সময় সেই জিনিষকে সন্দেহ করতে হয়। যদি ঈশ্বরের ব্যাপারেও হয় তখনও সন্দেহ করতে হবে। ইদানিং ঠাকুরের মাতৃশক্তির উপর ভাষণ দিতে গিয়ে অনেক বক্তা বলেন, মাতৃশক্তির বিকাশের জন্যই ঠাকুরের আগমন। এই কথার পেছনে তিনি কি কি যুক্তি নিয়ে আসছেন? ঠাকুরের ইষ্ট হলেন এক নারী, তিনি গুরু করলেন এক নারীকে, তাঁর জীবনের শেষ পূজাও করলেন এক নারীকে। এই যুক্তিগুলোকে নিয়ে আসার সময় বক্তা ভেবে দেখলেন না যে এর উল্টোটাও ঠাকুরের জীবনে অনেক আছে আর অন্য রকমও অনেক কিছু আছে। ঠাকুর যেমন মা কালীর সাধনা করেছেন তেমনি তিনি শিবের সাধনাও করেছেন, ভৈরবী যেমন তাঁর গুরু ছিলেন তোতাপুরীও তাঁর গুরু ছিলেন। আর শ্রীমাকে যে ঠাকুর ফলহারিণী কালীপূজায় পূজা করলেন সেখানে অন্য একটা ব্যাপার জড়িয়ে আছে। এই যে নিজের বুদ্ধি দিয়ে ঠাকুরের জীবনকে অপরের সামনে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে এখানে আমাদের সন্দেহ করতে হয়। যেখানে শ্রীমা বলছেন তোমাদের ঠাকুর ছিলেন অদ্বৈত তাই তোমরাও অদ্বৈত, যেখানে ঠাকুরও সর্বক্ষণ বলে গেলেন সচ্চিদানন্দ বই আমি আর কিছু জানি না, সেখানে নারীশক্তি, পুরুষশক্তি, ছেলে গুরু নারী গুরু এই ধরণের কথা কোথায় দাঁড়াবে! এগুলোকেই বলে popularistic talk, শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতে হবে। কম্যুনিস্টরা আরও জোর গলায় বলে ঠাকুরই প্রথম মালিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিপ্লবের সূচনা করে গেছেন। বন্দুকের নলই হবে শক্তির উৎস প্রথম শুরু হল শ্রীরামকৃষ্ণকের হাত ধরে যেদিন তিনি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে তাঁর মাল্‌কিন রানী রাসমণীর গালে চড় মেরেছিলেন। এটাই বলছেন *নৈষা তর্কেণ*, এই তর্ক বাংলা তর্ক নয়, এই তর্ক মানে বুদ্ধি দিয়ে যে কাজ হয়। এসব লেকচার শুনে কখন কারুর আত্মবুদ্ধির বিকাশ হবে না, তবে হ্যাঁ ঠাকুরের কথা শুনে কারুর কারুর ঠাকুরের দিকে মন যেতে পারে, সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু আত্মার ব্যাপারে এদের কোন মতি হবে না। *প্রোক্তাহন্যেনৈব*, আত্মজ্ঞানে যিনি প্রতিষ্ঠিত উনি যখন আত্মতত্ত্বের ব্যাপারে বলেন তখনই আত্মার ব্যাপারে মতি হয়।

নয় নম্বর মন্ত্রের আলোচনার মূল কেন্দ্র 'মতি', এখানে আচার্য, যুক্তি, তর্ক এই শব্দগুলির কোন গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব হল মতি। আমরা প্রায়ই বলি, তোমার এই শুভ মতিগতি কি করে হল? আত্মজ্ঞান লাভে প্রথমে দরকার মতি। এই মতিটা কারুরই আসে না। মতি আসা মানে, মন সব কিছু ছেড়ে শুধু একটা বিষয়কে নিয়েই সারাক্ষণ চিন্তন করে যাচ্ছে, ঐ একটা বিষয়কে নিয়েই আবিষ্ট, খাওয়া-দাওয়া, ঘুম, ঘোরাফেরা সব কাজের মধ্যে ঐ একটা বিষয় সব সময় ঘুরপাক করতে থাকবে, ঐ একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে বাকি সব কাজকর্ম চলতে থাকে। সাধারণ অবস্থায় আমাদের নিজের শরীরকে কেন্দ্র করেই মন ঘুরপাক করতে থাকে। সাধারণ মানুষ নিজের শরীর ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। যে নিজের শরীরকে নিয়ে ভাবে সে অপরের শরীরকে নিয়েও ভাববে। মতি মানেই যেটা আমার আপনার সবার জীবনের মূল সুর। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে যে কোন রাগের একটা মূল সুরকে সব সময় ধরে থাকে, ঐ মূল সুরের উপর বিভিন্ন রকম সূক্ষ্ম কাজের খেলা চলতে থাকে।

ঠাকুর বলছেন লোকেরা টাকার জন্য, মাগের জন্য, সন্তানের জন্য ঘটি ঘটি কাঁদে কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কজন কাঁদে! তার মানে ঈশ্বরের দিকে কারুরই মতি নেই। মতি কোথায়? কামিনী-কাঞ্চনে। কিন্তু একে ঠিক মতি বলা যায় না। কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি প্রবণতাটা মানুষের স্বাভাবিক, এখানে মতির কিছু নেই। তোমার দ্বারা মতি হবে না, কারণ তোমার মন শরীরে পড়ে আছে, যুক্তিবাদী যারা বা যুক্তিতর্ক নিয়ে যারা চলে তাদের দ্বারা হবে না, কারণ তারা শাস্ত্রের ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। একমাত্র যিনি শাস্ত্রজ্ঞ আচার্য, যিনি অনুভূতি সম্পন্ন তাঁদের ছাড়া এই মতি হবে না। আচার্য আবার বলছেন, *যাং ত্বং মতিং মদ্‌বরপ্রদানেন আপঃ প্রাপ্তবানসি সত্যা অবিতথবিষয়া ধৃতিরযস্য তব, স ত্বং সত্যধৃতিঃ। বতাসীতানুকম্পয়ন্নাহ মৃত্যুর্নচিকেতসম্‌*, '*বত*' এখানে অব্যয়, আচার্য জোর দেওয়ার জন্য *বত* বলছেন। তোমার যে ধৃতি, ধরে রাখার ক্ষমতা, কিসে ধরে রাখা? সত্যকে বিষয় করার ব্যাপারে। অর্থাৎ বস্তুটি যথার্থ যেমনটি ঠিক তেমনটি প্রকাশিত করার ভাব। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান ধৃতি নিয়ে বিস্তারিত বলতে গিয়ে সাত্ত্বিক ধৃতি, রাজসিক ধৃতি আর তামসিক ধৃতির কথা বলছেন। এখানে আচার্য সাত্ত্বিক ধৃতি না বলে বলছেন *সত্যধৃতিঃ*, কোন বিষয়ের যথার্থতাকে আমাদের সামনে যে আলো

দিয়ে প্রকাশ করে তাকে বলছেন *সত্যধৃতিঃ*। কোন বিষয়ের সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করার জন্য যে নিরন্তর আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে, এটাই সত্যধৃতি। বেশির ভাগ মানুষের বানরের স্বভাব, এই মুহুর্তে একটা জিনিষকে ধরার চেষ্টা করছে, পর মুহুর্তেই সেটা ছেড়ে দিয়ে আরেকটাকে ধরার চেষ্টা করতে থাকে, ধৃতির অভাব। কোন বিষয়ের সত্যকে জানার জন্য যে ধৃতি, জানার জন্য বুদ্ধির সাহায্যে যে লেগে থাকার ক্ষমতা, এই ক্ষমতার লোক দুর্লভ। যমরাজ তাই বলছেন *ত্বাদৃঙ্নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা*, হে নচিকেতা! আমি আচার্য হতে পারি কিন্তু আমি চাইব আমার কাছে যারা প্রশ্নকর্তা আসবে তার যেন তোমার মত হয়। কারণ, তোমাকে নানা রকমের প্রলোভন দেওয়া সত্ত্বেও তুমি প্রলুব্ধ হলে না, জগতের সমস্ত ধন-সম্পদকে তুমি প্রত্যাখ্যান করে দিলে, তার মানে এই প্রশ্ন তোমার মনে অনেক দিন ধরেই আলোড়িত হচ্ছিল। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল তুমি *সত্যধৃতিঃ*।

সত্যধৃতি হওয়া খুব কঠিন। আর যাই হোক সত্যধৃতি আমাদের কারুরই নেই। আমার সোনার হরিণ চাইই চাই, এরপর আমাকে কুচি কুচি করে কাটলেও আমি ওখান থেকে সরে আসব না, আমার ওটাই চাই, এই গোঁ মানুষের মধ্যেও থাকে, সন্তানের জন্য, টাকার জন্য মানুষ যে কোন কিছুর সাথে আপোষ করে নিতে রাজী, কিন্তু সত্যের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে উজার করে দেবে এ দেখাই যায় না। এখানে সত্য মানে truth নয়, আচার্য এখানে শব্দটা ব্যবহার করছেন *সত্যা অবিতথবিষয়া ধৃতিঃ*, বিষয়টি যেমনটি আছে ঠিক তেমনটি চাই, তার যথার্থতাকে আমি চাই। যেমন আমি আপনাকে দেখছি, হয় পুরুষ রূপে নয়ত নারী রূপে দেখছি আর তার সাথে আরও অনেক উপাধি লাগিয়ে দেখছি, কিন্তু আপনি যথার্থ যা সেই যথার্থ রূপকে দেখছি না। যথার্থ রূপ কি? শুদ্ধ আত্মা, যে শুদ্ধ আত্মার কথা ঠাকুরও বলছেন, স্বামীজীও বলছেন, আচার্যও বলছেন আর উপনিষদও বলছেন, অথচ আমরা নারী, পুরুষ, বাঙালী, মারাঠী, ভারতীয়, বিদেশী, বেঁটে, লম্বা, কালো, ফর্সা ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে দেখছি। পদার্থের যে *অবিতথ*, অর্থাৎ সেখানে কোন চাঞ্চল্য নেই, যেমনটি আছে ঠিক তেমনটি জানা, এই যে ধৃতি এটাকেই সত্যধৃতি বলছেন। এই সত্যধৃতি সাধারণ লোকের হয় না। যাদের এই সত্যধৃতি নেই তারা কখনই আত্মবিষয়ক প্রশ্ন করতে পারে না। আত্মবিষয়ক প্রশ্ন করা আর আত্মজ্ঞানের দিকে এগিয়ে যাওয়া দুটো একই জিনিষ। আত্মজ্ঞানের দিকে এগিয়ে যাওয়া মানে আমি সব কিছু ছাড়তে রাজী। এই যে আলোচনা চলছে, শুধু সময় কাটাবার জন্য আত্মতত্ত্বের আলোচনা করা হয় তা নয়, খুবই গভীর বিষয়। আত্মতত্ত্বকে নিয়ে আলোচনা করাও যা জ্ঞানও তাই, জ্ঞানও যা উপলব্ধিও তাই, আলোচনা, জ্ঞান আর উপলব্ধি এই তিনটের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। জিনিষটি যেমন আমার তেমনটি চাই, এই দৃঢ়তা না থাকলে আত্মবিষয়ক, ঈশ্বরবিষয়ক, জ্ঞানবিষয়ক প্রশ্ন করা যায় না। সেইজন্য যমরাজ নচিকেতার প্রশংসা করছেন *তাদৃঙ্নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা*, তোমার মত শিষ্য আমি আরও যেন পাই। সাধনার শেষে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে কুঠিবাড়ির ছাদ থেকে চিৎকার করে ভক্তদের ডাকছেন – ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়, সংসারী লোকেদের সাথে কথা বলে আমার মুখ পুড়ে যাচ্ছে। জগন্মাতা ঠাকুরকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন তোর ত্যাগী সন্তানরা আসবে। ভক্তদের জন্য অবতারের ব্যাকুলতা, হৃদয়ের এই গভীর ব্যাকুলতার মধ্যে যে জিনিষগুলি জড়িয়ে আছে এগুলোকে বোঝা, ধারণা করা খুব কঠিন। সাধনা করে করে আমরা আমাদের অন্তর্জগতে যতটুকু অগ্রসর হতে পেরেছি, ততটুকুর বাইরে আমরা কিছুই বুঝতে পারব না। তার বাইরে সব কিছুই আমাদের কাছে শব্দ মাত্র। তবে শোনার সুযোগ থাকলে শুনে যেতে হয়, শোনাটাও একটা সাধনার অঙ্গ। নচিকেতাকে যমরাজ বলছেন, সাধারণ মানুষ তাদের মন বুদ্ধিকে সাধারণ জিনিষে লাগিয়ে রাখে কিন্তু হে নচিকেতা! তোমার মন বুদ্ধিকে বিষয়ের যেটা সত্য সেই সত্যকে জানার দিকে লাগিয়েছ। এই যে ধৃতি, ধৃতি বুদ্ধিরই একটা গুণ, যে গুণ দিয়ে যে কোন পদার্থের যথার্থতাকে জানা যায়, এই ধৃতি সাধারণ মানুষের হয় না, সেইজন্য আমি যেন তোমার মত আরও শিষ্য পাই। এখানে বিদ্যারও প্রশংসা হচ্ছে আর বিদ্যার্থীরও প্রশংসা করা হচ্ছে।

উপনিষদ হল বেদান্ত অর্থাৎ বেদের শেষ কথা। বেদের মূল বক্তব্য যজ্ঞ, মূল কথা কর্ম, এই মূল থেকে উপনিষদ তাকে সরিয়ে নিয়ে আসছে। জীবনের মূল কথা হল ভোগ আর জীবনের শেষ কথা হল ত্যাগ। ভোগ থেকে তাকে যখন টেনে ত্যাগের দিকে নিয়ে আসা হবে তখন তাকে বার বার ভোগের কথা বলতে হবে। কারণ মন সাধারণ অবস্থায় ভোগের মধ্যে থাকে তাই যে কোন উচ্চতত্ত্বকে ভোগের কথা দিয়ে বোঝালে সহজে বুঝতে পারে, আর এভাবে বোঝানটাই সঠিক পথ। বেদে যে কর্ম দিয়, যজ্ঞ দিয়ে ফলপ্রাপ্তির কথা বলছে এই কথাগুলো সহজেই বোঝা যায়, সেইজন্য যমরাজ পরের মন্ত্রে বলছেন –

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং
ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিহোগ্নি –
রনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্।।১/২/১০

(আমি জানি কর্মফলস্বরূপ সম্পদ অনিত্য, কারণ অনিত্য দ্রব্যের দ্বারা সেই ধ্রুব বস্তুকে কখনই প্রাপ্ত করা যায় না। আমি জেনে বুঝেও অনিত্য দ্রব্যের সাহায্যে নাচিকেত নামক অগ্নি চয়ন করেছি এবং তার ফলস্বরূপ যাম্যপদ রূপ আপেক্ষিক নিত্যত্ব প্রাপ্ত হয়েছি।)

শেবধির অর্থ কর্মফল, যমরাজ বলছেন কর্মফলের যত রকম বিধি আছে, কর্মফলের বিধির সমস্ত খাজানাকে আমি জানি। যত কর্মফল আছে সবটাই অনিত্য। আর বলছেন *ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং* তৎ। ধ্রুব মানে নিত্য, অনিত্য দিয়ে কখনই নিত্যকে পাওয়া যায় না। *ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ*, এই বাক্যকে স্বামীজী বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে নিজের ভাষণে উল্লেখ করেছেন। পুরো বেদান্ত দর্শন এই মন্ত্রের দ্বিতীয় লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। এই লাইনের বক্তব্য যদি সত্য না হয় তা হলে বেদান্ত দর্শনের ভিত্তিই ধুলিসাৎ হয়ে যাবে। আমেরিকাতে স্বামীজী এই যুক্তিকে অনেকবার ব্যবহার করেছেন। বেদান্তে যত দর্শন আছে, আচার্য শঙ্করের বেদান্ত, ঠাকুরের বেদান্ত, স্বামীজীর বেদান্ত সব এই একটি লাইনের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই লাইনের বক্তব্যকে যদি কেউ ভুল বলে প্রমাণিত করে দেয় তাহলে বেদান্তের সমস্ত দর্শন ভেঙে পড়বে। আমাদের পরম্পরাতে বৈষ্ণব শাস্ত্র থেকে শুরু করে যত ভক্তিশাস্ত্র আছে, ভারতের বাইরে যত ধর্ম আছে, জুদাইজিম, খ্রীশ্চান, ইসলাম ধর্ম আর বিষ্ণুলোক, শিবলোক, রামকৃষ্ণলোক বিভিন্ন লোক সম্বন্ধে যত রকম ধারণা আছে এর সব কটিকে এই একটি লাইন খড়কুটোর মত উড়িয়ে দেয়।

জগতের সব কিছুই অধ্রুব, কোন কিছুই স্থির নয়। অস্থির, অনিত্য বস্তুকে দিয়ে কোন দিন নিত্য বস্তুকে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় লাইনের বক্তব্য আমাদের সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছে – নিত্য পূজা-পাঠ, নানাবিধ উপাচারাদি, প্রার্থনা দিয়ে কোন দিন কেউ ঈশ্বর লাভ করতে পারবে না, যদি মনে কর এই এক জীবনে অনেক কিছুই করলাম যার ফলস্বরূপ অনন্ত স্বর্গ প্রাপ্তি হবে, তা কোন দিনই হবে না, যত যাই করে যাও না কেন, ঠাকুরকে অনন্তকাল ভক্তি করে যাও, কোরান, বাইবেলকে অনুসরণ করে যে জীবনই অতিবাহিত করা হোক না কেন অনন্ত স্বর্গ কখনই প্রাপ্ত করতে পারবে না। নিউটনের দ্বিতীয় নিয়মে বলে যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করা হবে ততটুকুই সে যাবে, এই একই নিয়ম ধর্ম জগতেও প্রযোজ্য। স্বামীজীও বার বার বলছেন, একটা জিনিষকে চালিত করার জন্য যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করবে, ততটুকুই জিনিষটা যাবে তার বেশি কখনই যেতে পারবে না। আমি যেমনটি যজ্ঞ করব তেমনটি ফল পাব, কিন্তু নিত্যস্বরূপ কোন দিন হতে পারব না। ঠাকুরের কাছে আমরা যতই মাথা ঠুকি না কেন, আর যত যাই করে যাই না কেন কোন দিন আমাদের মুক্তি হবে না, সাযুজ্য, সামিপ্য কোনটাই হবে না, শ্বাশত, নিত্য কোন দিন হবে না, কারণ তাহলে এই মন্ত্রের দ্বিতীয় লাইনের বক্তব্যের বিরোধী হয়ে যাবে। বেদান্ত কি করে এই কথা বলছে? বেদান্ত এই কথাই বলছে, যেটা তোমার স্বাভাবিক, তোমার স্বাভাবিক হল জ্ঞান, তুমি তোমার স্বরূপে যদি অবস্থিত হয়ে যাও তবেই তুমি ধ্রুব পাবে।

তাহলে অধ্রুব কি? অজ্ঞানই অধ্রুব। অজ্ঞানকে নাশ করাটাও অজ্ঞানের মধ্যেই পড়ে। তোমার চিরন্তন হল তোমার স্বভাব, তোমার স্বভাব আত্মার স্বভাব, এটাই চিরন্তন। আর এই অজ্ঞান তোমার বাইরে থেকে এসেছে, সেইজন্য এটা অধ্রুব, অজ্ঞান তাই কখন চিরস্থায়ী রূপে থাকতে পারে না। এই কারণেই দর্শন সব সময় দুভাবে চলে। একটা দর্শন ধরেই নিচ্ছে আমরা সবাই অপূর্ণ, আমরা মানুষ, মানুষের মধ্যে পঞ্চাশ রকম দুর্বলতা আছে তাই ঈশরের কৃপা পাওয়ার জন্য আমাদের চেষ্টা করে যেতে হবে। কিন্তু চেষ্টা করে যত উপরেই যাই না কেন, কোন দিন চিরস্থায়ী হতে পারবে না। দ্বিতীয় দর্শন যেখানে বেদান্তের কথা বলছে, সেখানে আপনি স্বভাবতই পূর্ণ, পূর্ণ কখনই অপূর্ণ হতে পারে না। অপূর্ণ যে হবে না তা নয়, কিন্তু কাল্পনিক অপূর্ণতা আসবে বাস্তবিক অপূর্ণ কখনই হবে না। কাল্পনিক জিনিষকে যখন খুশী উড়িয়ে দেওয়া যায়।

এটাই হিন্দুদের মৌলিক দর্শন – *ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং* তৎ। এই জায়গাতে এসে অনেকে অনেক রকম দর্শনের মত দিতে শুরু করে, যেমন বলবে, অধ্রুব দিয়ে ধ্রুবকে পাওয়া যাবে না ঠিকই কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি অধ্রুবের মধ্যে পড়ে না। আমরা এবার *নৈষা তর্কেণ*তে নেমে পড়লাম, যুক্তির খেলাতে

নেমে গেলাম আর এটা চলবে না। কিন্তু এটাই বেদান্তের একটি মৌলিক সিদ্ধান্ত, অনিত্য বস্তু দিয়ে, অনিত্য চেষ্টা দিয়ে, অনিত্য কাজকর্ম করে কোন দিন মুক্তির ফল পাওয়া যাবে না। যতই আপনি ব্যাঙ্কে টাকা রেখে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বাড়িয়ে যান কিন্তু সেই ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স কোন দিন চিরস্থায়ী হতে পারে না। আমরা যা কিছুই করি না কেন কোন কিছুকেই এই জগতে চিরস্থায়ী করে রাখতে পারব না। কোনটা চিরস্থায়ী হবে? আগে থেকে যেটা চিরস্থায়ী হয়ে আছে সেটা ছাড়া কোন কিছুই চিরন্তন হবে না। বেদান্ত তাই সদর্পে বলছে তুমি পূর্ণব্রহ্ম, এটাই চিরন্তন, এটাই চির সত্য। তুমি নিজেকে যা ভাবছ এটা অধ্রুব, অস্থায়ী তাই একে নাশ করা যাবে। উপনিষদ এত যুক্তি দিয়ে চলে যে একবার উপনিষদ মন দিয়ে অধ্যয়ন শুরু করলে আর কখনই অন্য কোন দর্শনের দিকে মন যেতেই চাইবে না। উপনিষদের দর্শনের কাছে অন্য কোন দর্শন তাই দাঁড়াতে পারে না। আচার্য শঙ্করের দর্শন সেখানেও তিনি খুব যুক্তি দিয়ে দেখাচ্ছেন কর্ম দিয়ে কখনই মুক্তি হয় না, একমাত্র জ্ঞান দিয়েই মুক্তি হয়। মুক্ত সব সময় হয়ে আছে বলেই মুক্তি হয়, মুক্তিটা স্বাভাবিক আর নিত্য বলেই মুক্তি হওয়াটা সম্ভব, তা নাহলে কখনই সম্ভব হত না।

তারপরেই বলছেন *ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নিঃ অনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্*। প্রথমে যমরাজ বললেন, আমি এই জিনিষটা ভালো করেই জানি অনিত্যকে দিয়ে নিত্যকে প্রাপ্ত করা যায় না, পরে বলছেন তথাপি আমি নাচিকেত নামক অগ্নিচয়নাদির মত উপাসনা করেছি। দ্বিতীয় বরে নচিকেতাকে যমরাজ যে স্বর্গের কথা বলেছিলেন সেই স্বর্গের কথাই উল্লেখ করে বলছেন, আমি জানি কর্ম দিয়ে, যজ্ঞ দিয়ে নিত্যবস্তুর প্রাপ্তি হয় না। জেনেও আমি নাচিকেত অগ্নিচয়ন করেছি, এই অনিত্য পদার্থ দিয়েই আমি নিত্য পদ পেয়েছি। শাব্দিক ভাবে এর অর্থ করলে মন্ত্রের অর্থ কখন পরিষ্কার হবে না, প্রথম অংশে বলছেন অনিত্য জিনিষকে দিয়ে নিত্য জিনিষকে পাওয়া যায় না, তারপরেই বলছেন নাচিকেত অগ্নি চয়নের দ্বারা অর্থাৎ অনিত্য বস্তু দিয়ে নিত্য বস্তু পেয়েছি। সেইজন্য আচার্য এখানে বলছেন এই নিত্য বলতে যমরাজ আপেক্ষিক নিত্যের কথা বলছেন। দ্বিতীয় বরের সময় আপেক্ষিক নিত্যের ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেখানে বলা হয়েছিল, হিরণ্যগর্ভের সাথে যিনি এক হয়ে গেছেন তিনি ব্রহ্মপদ পেয়ে যান, ব্রহ্মপদ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহাসমুদ্রে সর্বোচ্চ পদ, এর মত শ্রেষ্ঠ পদ এই জগতে আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু এই ব্রহ্মপদও আপেক্ষিক অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত ভাবে নিত্য, বাকি সব কিছুই যেন সেই ব্রহ্মপদের তুলনায় নিকৃষ্ট। কিন্তু আসল অর্থে যে নিত্য, সেই অর্থে এই ব্রহ্মপদও কিন্তু নিত্য নয়। যমরাজ এই জায়গাতে বলছেন আমি এই জিনিষটা জানি, কর্ম দিয়ে নিত্যকে পাওয়া যায় না, অনিত্য দিয়ে নিত্যকে পাওয়া যায় না।

এই জায়গাতে মন্ত্রের অর্থ একটু জটিল হয়ে যায়। আগের মন্ত্রে বলা হল, জ্ঞানী না হলে উপদেশ হয় না, তার মানে যমরাজের আত্মজ্ঞান ছিল। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে, যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে তিনি কেন যজ্ঞ করতে যাবেন? অন্য দিক দিয়ে দেখলে, যমরাজের যদি শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞানই ছিল, ব্যবহারিক জ্ঞান ছিল না, তাহলেও জ্ঞান যেন কম পড়ে যায়। এখানে আচার্য শঙ্করও কোন আলোচনা করেননি। একটা বলা যেতে পারে, যমরাজ তত্ত্বতঃ এবং যুক্তি দিয়ে সবটাই জানতেন কিন্তু তাও ওনার ইচ্ছে হল এই যজ্ঞটা করেই দেখি। ঠাকুর যেমন কয়েকজনের ব্যাপারে বলছেন, ওর এখন হবে না, একটু ভোগ বাকি আছে। এই অর্থে যমরাজেরও কোথাও ভোগের ইচ্ছা একটু বাকি ছিল, কিন্তু অন্য দিকে উনি সবটাই জানেন। যেমন যিনি ঠাকুরের সঙ্গ করেছেন তিনি ঠাকুরের সবটাই জানেন অন্য দিকে তার কোথাও ভোগের ইচ্ছা একটু বাকি থেকে গেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় তত্ত্বগত ভাবে হয়ত জানেন কিন্তু মনে অল্প একটু বাসনা থেকে গেছে, সেইজন্য পূর্ণজ্ঞান হচ্ছে না। কিন্তু উপনিষদের বক্তব্যকে যদি সামগ্রিক রূপে নেওয়া হয়, তখন আর এই যুক্তি দাঁড়াবে না, কারণ পরের দিকে বলবেন যমরাজ জ্ঞানী।

দ্বিতীয় আরেকটা হতে পারে যমরাজ প্রথমে নাচিকেতো অগ্নি চয়ন করে হিরণ্যগর্ভের সাথে এক হলেন, পরে যমরাজের পদ পেলেন, সব হয়ে যাওয়ার পর তিনি হয়ত আত্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। এও হতে পারে যমরাজ আত্মজ্ঞানের উপলব্ধি হয়ে গেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কাজ করে যাচ্ছেন, যেমন জনক রাজা ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েও রাজকার্য সম্পাদন করে গেছেন। গীতাতেই ভগবান বলছেন *কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ*, রাজা জনক পূর্ণজ্ঞানী হয়ে রাজাকার্য করে গেছেন। রাজা জনকের ব্যাপারেও এই দুটো মত। যেমন একটা জায়গায়

আচার্য শঙ্কর বলছেন কাজ করে করে চিত্তশুদ্ধি হয়েই রাজা জনক জ্ঞান পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় মতে বলে, জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও রাজা জনক লোকসংগ্রহনার্থে কাজ করেছেন। সাধারণ লোকের যাতে বুদ্ধিভেদ না হয়ে যায় সেইজন্য রাজা জনক জ্ঞানী হয়েও কাজ করেছেন। রাজা জনকের এই ব্যবহারকেই যমরাজ পর্যন্ত টেনে আনলে মনে হবে হ্যাঁ তাই তো রাজা জনক যে ব্যবহার পৃথিবীলোকে করেছিলেন, যমরাজ সেই ব্যবহারই স্বর্গলোকে করছেন। যমরাজ কাজ করতে করতে সিদ্ধি পেয়েছেন বা তাঁর সিদ্ধি আগেই হয়ে গেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি লোকসংগ্রহের নিমিত্তে যজ্ঞাদি করেছেন। রাজার পদে থাকতে হলে পাঁচটা জিনিষ করতে হয় রাজা জনক জ্ঞানী হয়েও পরার্থে সেটা করে দেখিয়ে গেছেন। যমরাজ যে বলছেন আমি জানি অনিত্যের দ্বারা নিত্য বস্তু কখনই পাওয়া যায় না, কিন্তু তথাপি আমি এই এই করেছি, যমরাজের এই কথাতে যে সংশয় হয় সেই সংশয় এই কটি উপায়ে দূর করা যেতে পারে। কিন্তু শাব্দিক অর্থ করলে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়ায় না। প্রথমে বললেন অধ্রুবকে দিয়ে ধ্রুবকে পাওয়া যায় না, পরেই বলছেন আমি কিন্তু অনিত্যকে দিয়ে নিত্যকে পেয়েছি, এভাবে অর্থ করলে একই মন্ত্রের দুটো লাইনে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য হয়ে যাবে। বেদ কোথাও কোন ভাবে দুটো বিরোধী কথা বলবে না। সেইজন্য দ্বিতীয় যে নিত্যের কথা বলা হয়েছে এই নিত্য আপেক্ষিক নিত্য। আর এটাকে আমি পেয়েছি, এর অর্থ একটা হতে পারে কাজ করতে করতে চিত্তশুদ্ধি হয়ে যাওয়ায় তাঁর জ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, এর আরেকটি অর্থ হতে পারে তিনি জ্ঞানী কিন্তু লোককল্যাণের জন্য এই যজ্ঞটা করলেন, সেইজন্য তিনিই প্রথম মানব যিনি এত উচ্চ অবস্থায় গিয়েছিলেন। পরের মন্ত্রেই আবার যমরাজ কর্মের নিন্দা করে বলছেন –

কামাস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং
ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারম্।
স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং দৃষ্ট্বা
ধৃত্যা ধীরো নাচিকেতোহত্যশ্রাক্ষীঃ।।১/২/১১।।

(হে নচিকেতা! পক্ষান্তরে তুমি সর্বোচ্চ কামনার প্রাপ্তিস্থল, সমস্ত জগতের আশ্রয়, যজ্ঞ ও উপাসনার সর্বোত্তম ফল, স্তবনীয়, অণিমাদি ঐশ্বর্যবিশিষ্ট যে হিরণ্যগর্ভপদ ধৈর্যপূর্বক বিশ্লেষণ করে বুদ্ধিমত্তা সহকারে বর্জন করেছ।)

এই মন্ত্রে যমরাজ প্রথমে কর্ম ও যজ্ঞের কি মাহাত্ম্য দেখাচ্ছেন, পরে এই মাহাত্ম্যকেও নচিকেতা যেভাবে বিচার ও ধৈর্যপূর্বক বিশ্লেষণ করে বর্জন করছেন, তার প্রশংসা করছেন। যেটাই তার মাহাত্ম্য সেটাই আবার তার দুর্বলতা। ঠাকুর বলছেন চারাগাছ অবস্থায় বেড়া দিতে হয়, বেড়াটা ভালোর জন্য, তাকে রক্ষা করছে, কিন্তু এই বেড়াই পরে তাকে আর বড় হতে দেয় না। ঠিক তেমনি যে কোন কর্মেরই একটা মহত্ত্ব আছে, কিন্তু ঐ মহত্ত্বই তাকে দুর্বল করে দেয়। যমরাজ বলছেন আমি যে হিরণ্যগর্ভ পদ পেয়েছি, এই পদে এসে সব কামনা শেষ হয়ে যায়। হিরণ্যগর্ভ পদ পাওয়া মানে হয় প্রকৃতিলীন হয়ে যাওয়া, প্রকৃতিলীন হওয়া মানে প্রকৃতির সাথে এক হয়ে যাওয়া। সৃষ্টি যখন হয় তখন প্রথম প্রকৃতির জন্ম হয়, প্রকৃতি থেকে মহতের সৃষ্টি। যোগী ধ্যান করে বা যজ্ঞাদি কর্ম করে যখন হিরণ্যগর্ভ পদ পেয়ে যান তখন তিনি সমষ্টি মনকে অতিক্রম করে যান। কামনা-বাসনা মনের এলাকা। যিনি মনেরও মালিক হয়ে গেলেন তাঁর সব রকম কামনা-বাসনা অনেক নীচে পড়ে থেকে যায়। যার মনে কোন কামনা-বাসনা উঠতে পারে তিনি তার থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ। যেমন কোন রাজ্যে সব জিনিষের একটা নির্ধারিত দাম থাকে, সেই রাজ্যের রাজার কাছে সবার থেকে বেশি অর্থ থাকে, তাই সেই রাজ্যে যাবতীয় যা কিছু আছে রাজা এমনিই সব কিনে নিতে পারে। পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সব কিছু কুবের এমনিতেই কিনে নিতে পারে কারণ তাঁর কাছে যা সম্পদ আছে সেটা এর থেকে ঢের গুণ বেশি। হিরণ্যগর্ভের সাথে যিনি এক হয়ে গেলেন তিনি এখন সমষ্টি মনের রাজা। যিনি মনের রাজা তাঁর কাছে কামনা-বাসনার কোন ব্যাপারই থাকে না। কারণ কামনা-বাসনা মনের একটা অত্যন্ত ছোট্ট অঙ্গ। কেউ যদি ভাবে আমি আগামী সৃষ্টির মালিক হব, সেটাও হিরণ্যগর্ভের অনেক নীচে। অথবা কেউ যদি ভাবে আমি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজা হব, সেটাও প্রকৃতির পদ থেকে অনেক নীচে। সেইজন্য বলছেন *কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং*, যত রকমের কামনা-বাসনার কথা চিন্তা করা যেতে পারে সব কামনা-বাসনা হিরণ্যগর্ভপদে গিয়ে শেষ হয়ে যায়। একটা হোটেলে অনেকগুলো তালা থাকতে পারে কিন্তু তার একটা মাস্টার চাবি থাকতে পারে, যে চাবি দিয়ে সব তালাই খোলা যাবে, শুধু যে হোটেলের সব তালাই খুলে দেবে তা নয়, আরও অনেক তালা খুলে দেওয়া যায়। হিরণ্যগর্ভ হল মাস্টার চাবি, সব কিছুর রাজা। আর *জগতঃ প্রতিষ্ঠাং*, যত রকমের যজ্ঞ

হতে পারে, যত রকমের কর্ম হতে পারে তার সব কামনা-বাসনা দিয়ে দিতে পারে। আত্মজ্ঞান কিন্তু কামনার মধ্যে নয়, সেইজন্য কর্মের সঙ্গে আত্মজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। আর কি হয়? আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবীক সহ যাবতীয় যা কিছু হতে পারে কর্মেই সব কিছুর প্রতিষ্ঠা। এখানে এর ব্যাখ্যা নেই, কিন্তু কর্ম সিদ্ধান্ত বিভিন্ন শাস্ত্রে যেমন এসেছে তেমনি গীতাতেও এসেছে। গীতাতে ভগবান বলছেন, *কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্*, কর্মতেই সব কিভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেই ব্যাপারেই এখানে বলছেন। বেদ মানেই যজ্ঞ, যজ্ঞের ফল দেবতারা পাচ্ছেন, বদলে দেবতারা কৃপা করেন, দেবতাদের কৃপাতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টিতে বৃক্ষরা প্রাণ প্রায়, শস্যাদির জন্ম হয়। গাছাপালা ও শস্যাদি খেয়ে প্রাণী জগৎ জীবন ধারণ করে, প্রাণীদের মধ্যে মানুষ থেকে আবার যজ্ঞ হয়, এই যে চক্র চলছে এর পুরোটাই কর্মে প্রতিষ্ঠিত, *তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্*, যজ্ঞের উপরেই সব কিছু দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব, অধ্যাত্ম, অধিভূত আর অধিদৈব এবং স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ যাবতীয় যা কিছু আছে সব কিছু যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত, আচার্য বলছেন *জগতঃ সাধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবাদঃ প্রতিষ্ঠাম্*। জপ-ধ্যানও যজ্ঞ, কথাবার্তা বলাও যজ্ঞ, মানুষ যা কিছু করছে সবটাই যজ্ঞ। কিন্তু এখানে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া যজ্ঞের কথা বলছেন। পরের দিকে গীতাদি ও অন্যান্য শাস্ত্রে সব কিছুকেই যজ্ঞ রূপে দেখানো হয়েছে। পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সব কিছু যজ্ঞের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারম্, ক্রতো মানে যজ্ঞের অগ্নি, এই যজ্ঞের ফল অনন্ত। অনন্ত ফল মানে হিরণ্যগর্ভ পদ। যজ্ঞ দিয়ে যে কোন জিনিষ পাওয়া যায় আর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে শ্রেষ্ঠ পদ হিরণ্যগর্ভ পদ, সেটাও যজ্ঞ দিয়ে পাওয়া যায়, সেটাই এখানে বলছেন *ক্রতোরনন্ত্যম্*। *অভয়স্য পারম্* বলতে বোঝায় অভয়ের পার। এর দুটো অর্থ হতে পারে। হিরণ্যগর্ভের সঙ্গে যে এক হয়ে গেলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তার আর কিছু পাওয়ার থাকে না। তার পারে কি হয় বলতে গিয়ে আচার্য বলছেন *অভয়স্য চ পারং পরাং নিষ্ঠাম্*, যজ্ঞ করতে করতে যজ্ঞের শেষ উচ্চতম অবস্থায় যখন পৌঁছে গেল তখন তার মধ্যে বৈরাগ্য এসে গেল আর বলছে আমার আর এর কিছুই লাগবে না, তখন এই অবস্থাকে বলছেন অভয়পদ, অভয়পদকে বলছেন পরা নিষ্ঠা। কর্ম আর বৈরাগ্যের দ্বারা হিরণ্যগর্ভ পদেরও পারে সে চলে যেতে পারে, হিরণ্যগর্ভ পদেরও পারে মানে ওটাই অভয়পদ। এর একটা অর্থ হতে পারে যখন বুঝে গেল কর্মের দ্বারা আমি এই পদ লাভ করতে পারব না তখন সে হিরণ্যগর্ভ পদের আশা ছেড়ে দেয়। দ্বিতীয় আরেকটি অর্থ হতে পারে, হিরণ্যগর্ভ পদটাই শেষ, সেই পদকে পাওয়ার যে ইচ্ছে সেই ইচ্ছেরও পারে চলে যায়। কঠোপনিষদ অনেক প্রাচীন বলে কর্মের একটা মাহাত্ম্য থেকে যায়, যদিও উপনিষদ কর্মের বাইরেই যেতে বলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে কর্মের একটু মাহাত্ম্য দেখান হয়েছে। এই মন্ত্র এবং আগের মন্ত্রেও হিরণ্যগর্ভ পদকে খুব উচ্চপদ বলছেন, তার সাথে আবার আত্মজ্ঞানকেও উচ্চস্থান দেওয়া হচ্ছে। কোথাও কোথাও মনে হবে হিরণ্যগর্ভ পদকে যেন শ্রেষ্ঠ বলতে চাইছেন, যজ্ঞের দিক থেকে যে শ্রেষ্ঠ সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। *অভয়স্য পারম্*, এই অভয়কে বলছেন হিরণ্যগর্ভ পদ, হিরণ্যগর্ভ পদেরও পারে, তার পার মানে পরা নিষ্ঠা, পরা নিষ্ঠা মানেই আত্মজ্ঞান। তাই *অভয়স্য পারম্* বলতে এখানে আত্মজ্ঞানের কথাই বলছেন। যদিও অন্য ভাবে বলা যায় অভয়ের পরাকাষ্ঠা, অভয়ের পরাকাষ্ঠা আবার হয়ে যায় হিরণ্যগর্ভ পদ। কিন্তু তার আগে অনন্তম্ বলে দেওয়ার জন্য এই অর্থ দাঁড়াবে না। আচার্য বলছেন কর্ম দিয়ে আত্মজ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা, পরা নিষ্ঠা আসে।

স্তোমমহদুরুগায়ং, এই কর্ম দিয়ে মানুষ জগতে স্তুত্য বস্তু প্রাপ্ত করে আর তার সাথে *মহদ্* অর্থাৎ অণিমাদি ঐশ্বর্য লাভ করে। জগতে যে জিনিষগুলিকে মানুষ বেশি সম্মান করে সেই জিনিষকে বলছেন মহৎ। *স্তোমমহদ্*, স্তুত্য বস্তু আর বিরাট, জগতে যে জিনিষগুলি শ্রেষ্ঠ আবার স্তুতিরও যোগ্য, সমাস করে *স্তোমমহৎ*। স্তোম শব্দের মূল অর্থ হয় শ্রেষ্ঠ, মানুষ যেটা পেতে চায়, শুধু পেতেই চায় না, সেই চাওয়ার মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ, সেইজন্য বলছেন স্তোম। কর্ম দিয়ে যে জিনিষগুলি পাওয়া যায়, যেমন অণিমাদি শক্তি, এটাই *স্তোমমহদ্*। *উরুগায়ং*, উরুগায়ম্ মানে বিরাট আর বিস্তার, কর্মের গতি বিরাট, হিরণ্যগর্ভপদ পর্যন্ত নিয়ে যায়। *প্রতিষ্ঠাং দৃষ্ট্বা*, কর্মের সর্বোত্তম স্থিতিকে দেখার পরেও তুমি তাকে ছেড়ে দিলে। মন্ত্রে কর্মের মাধ্যমে নচিকেতার প্রশংসা করছেন, হে নচিকেতা! তুমি সব কিছু ছেড়ে দিয়েছ। কি কি ছেড়ে দিয়েছ? কর্মের মাধ্যমে যে ফলগুলো হয়। কি কি ফল হয়? *কামস্যাপ্তিং*, হিরণ্যগর্ভ পদ, *জগতঃ প্রতিষ্ঠাম্*, জগতে যা কিছু আছে তার যে আধার সেটাকেই তুমি ছেড়ে দিয়েছ, জগতের আধারকে ছেড়ে দেওয়া মানে, জগতের মূল যেটা দিয়ে সমগ্র জগতকে নিয়ন্ত্রিত

করা হচ্ছে, সেটাকেই তুমি ছেড়ে দিয়েছ। *ক্রতোরনন্তম্*, যজ্ঞের যে অগ্নি দিয়ে *অনন্তম্* অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ পদ, *অভয়স্য পারম্*, এই ধরণের যে শ্রেষ্ঠ গতি হতে পারে বা এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ পদ যেটা হতে পারে সবটাই তুমি ছেড়ে দিয়েছ। *স্তোমমহৎ*, যা কিছু জিনিষ স্তুতির যোগ্য রূপে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অণিমাদি ঐশ্বর্যও তুমি ছেড়ে দিলে। *উরুগায়ম্*, কর্মের দ্বারা যে মহান গতি তোমাকে দিতে পারত, মূল কথা যজ্ঞাদির দ্বারা মানুষ যে শ্রেষ্ঠ বস্তু লাভ করতে পারে তাকেই নচিকেতা ছেড়ে দিয়েছেন। *প্রতিষ্ঠাম্*, তোমার নিজেরই বিরাট প্রতিষ্ঠা হয়ে যেতে পারত, তুমি সম্রাট হতে পারতে সেটাও ছেড়ে দিয়েছ। *দৃষ্টা*, এর সব কিছুকে তুমি বিচার করে প্রত্যাখ্যান করে দিলে। ইহলোকে যা কিছু শ্রেষ্ঠ এবং পরলোকে যা কিছু শ্রেষ্ঠ সব কিছুকে বিচার করে তুমি ছেড়ে দিয়েছ। তুমি না বুঝে কিছু ছেড়ে দাওনি, জেনে বুঝে ভালো করে বিচার করেই ছেড়েছ।

ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ, এই সংসারের, সংসার মানে ইহকাল আর পরকাল, এই দুটো কালের যত রকমের ভোগ হতে পারে সব ভোগকে বিচার করে নিজের বুদ্ধি দিয়ে নিজে থেকেই তুমি সব ত্যাগ করে দিলে, হে নচিকেতা! তুমি তাই ধন্য। একটা জিনিষ আমাদের মনে রাখতে হবে, কঠোপনিষদ যে কালে রচিত হয়েছে সেই কালে ভারতভূমিতে যজ্ঞেরই একমাত্র প্রাধান্য ছিল। যজ্ঞের মধ্যে দিয়ে যখন আত্মবস্তুর দিকে নিয়ে যাচ্ছেন তখন সেখানে যজ্ঞের প্রভাব একটু থেকে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আজ আমরা খুব সহজ ভাবে কর্মের নিন্দা করে দিতে পারি, তবে বেশির ভাগ সময়ই শাস্ত্র না পড়ে, না বুঝেই বলে থাকি, কিন্তু অত সহজ নয়। মন দিয়ে, কল্পনা করে জগতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তুকে ধারণা করতে পারি তার সবটাই কর্ম বা যজ্ঞ আমাদের এনে দিতে পারে। এটাকেই এই মন্ত্রে বলছেন *কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং*। একদিকে এই কর্ম আমাদের হিরণ্যগর্ভ পদ দিচ্ছে অন্য দিকে আবার এই পৃথিবীতে আমাদের নানান রকম ঐশ্বর্য দিচ্ছে। আমরা মুখে বলে দিতে পারি আমার এসব কিছু লাগবে না, আমি ঈশ্বরকেই চাই, কারণ হিরণ্যগর্ভ পদের ব্যাপারে, জগতের ঐশ্বর্যের ব্যাপারে আমাদের কোন ধারণাই নেই।

মানুষের সততার বিচার কিভাবে হয়? যদি কেউ এসে বলে তুমি যদি একটা মিথ্যা কথা বলে দাও তাহলে তোমাকে দশ হাজার টাকা দেব। আমরা যারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি, স্বাভাবিক ভাবেই বলব, মিথ্যা কথা বলার কোন প্রশ্নই নেই। আচ্ছা এক লাখ টাকা দেওয়া হবে। তাতেও সবাই না বলবে। আচ্ছা দশ লাখ। এবার সবাই একবার চিন্তা করতে শুরু করবেন। এক কোটি? তখন ভেতরে রীতিমত চাঞ্চল্য শুরু হয়ে যাবে। একটি লোক চার্চে ডোনেশান দিতে গিয়ে ফাদারকে বলছে – হাজার ডলার ডোনেশান দেব কিন্তু আপনাকে একটা ভুল কাজ করে দিতে হবে। ফাদার বললেন, গেট আউট এখানে এসব হয় না। এবার ভদ্রলোক এক হাজার থেকে দশ হাজার, সেখান থেকে বাড়তে বাড়তে যেই দশ লাখে পৌঁছেছে তখন ফাদার একটা ডাণ্ডা নিয়ে মারার জন্য তেড়ে এসেছেন, এবার তোমার মাথাটাই ফাটিয়ে দেব। ভদ্রলোক তখন খুব ঠাণ্ডা মাথায় বলছে, আপনি কেন লাঠি নিয়ে দৌড়ে আসছেন, আপনি কি এগুলো একেবারেই পছন্দ করেন না? ফাদার বলছেন, না, তুমি খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছ, সেইজন্য লাঠি নিয়ে দৌড়ে এসেছি। সততা, পবিত্রতা এগুলো সব আপেক্ষিক শব্দ। কোন অবস্থায়, কোথায় মানুষ পিছলে যাবে জানে না। সবটাই একটা মূল্য সাপেক্ষ, ঠিক মূল্যটা দিয়ে দিলে তাকে দিয়ে যা খুশী করিয়ে নেওয়া যায়। সবাইকে দিয়ে কি পারা যাবে? না, সবাইকে দিয়ে পারা যাবে না। সেইজন্য এখানে নচিকেতার প্রশংসা করছেন। আমাদের সমস্যা হল জগতের সুখ, সম্পদ, ঐশ্বর্যের কোন ধারণাই আমাদের নেই, আমাদের চাহিদাও অনেক কম। কিন্তু যখনই পরিস্থিতি অন্য রকম হয়ে যাবে, প্রলোভনের হাতছানি এলে কোথায় মূল্যবোধ ছিটকে বেরিয়ে যাবে বুঝতেই দেবে না। একটু সাধন-ভজন করার পরেই মনে হবে আমার মন, বুদ্ধি খুলে গেছে, তখনই মনে হবে জগতকে উপদেশ দিতে শুরু করলে হয়। হৃদয়রামের তাই হয়েছিল, হৃদয়রাম দেখছে সেও আলোময় ঠাকুরও আলোময়, চিৎকার করে বলছে, মামা! মামা! আমরা একি করছি, চল আমরা জগতকে উপদেশ দিই। ঠাকুর বলছেন, ওরে! চুপ চুপ, এগুলো কিছুই না। হৃদয়ের মত অবস্থা আমার আপনার সবারই হতে পারে। কারণ আমাদের বাস্তবিক অবস্থা হল সবাই অভাবগ্রস্ত অকিঞ্চন কাঙালী, সেইজন্য মনে করছি আমি ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত। যে লোক কোন দিন ভোগ কি জিনিষ দেখেনি, যার ভোগের কোন অভিজ্ঞতাই নেই তার কাছে ত্যাগ হল মুখের কথা। নচিকেতার সামনে যমরাজ ইহকাল পরকালের যত রকম ঐশ্বর্য হতে পারে সব ঐশ্বর্যকে দেখিয়ে দিলেন, তাও নচিকেতার মন সেদিকে গেল না। কাদের মন যাবে না? যাঁরা একটা উচ্চতম আদর্শকে প্রত্যক্ষ করেছেন। শুধু আদর্শকে নিয়ে চললে

হবে না, আদর্শের কথা মুখে বললে হবে না, ঐ উচ্চতম আদর্শকে প্রত্যক্ষ করতে হবে, তখন বলতে পারবে আমার এসব কিছুই লাগবে না। যারা শুধু উপর উপর আদর্শকে নিয়ে চলে তাদের আদর্শচ্যুত করে দেওয়া কিছুই নয়। কিন্তু যাদের আদর্শটাই ধর্ম, এটাই আমার জীবনধারা তারা কখনই প্রলোভনে প্রলুব্ধ হবে না।

জহরলাল নেহরুর একটা লেখা আছে Experience of a lathi charge, সেখানে নেহরুজী গান্ধীজীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় সত্যাগ্রহীদের উপর বৃটিশ পুলিশের নির্মম লাঠিচার্জের বর্ণনা দিচ্ছেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলছে, এক সিপাহী একটা তেল চুকচুকে নতুন লাঠি নিয়ে মারার জন্য এগিয়ে আসছে, সেই লাঠি এখনও কারুর মাথায় পড়েনি। নেহরু ভেতরে ভেতরে একটু ভয় পেয়ে কড়া করে সিপাহীকে বললেন, এখান থেকে সরে যাও। সিপাহী নেহরুর কথা শুনল না, আর যতক্ষণে তিনি হাত তুলবেন ততক্ষণে লাঠিটা এসে নেহরুজীর মাথায় পড়েছে। মাথা ফেটে রক্ত বেরিয়ে এসেছে। খুব হৈচৈ শুরু হয়ে গেছে, দু-তিনজন ঝাঁপিয়ে পড়ে নেহরুজীকে ওখান থেকে সরিয়ে এনেছে। গান্ধীজীকে যখন পুলিশ লাঠি মারতে আসত উনি হাতও তুলতেন না। আমি অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত, এমনই অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত যে গান্ধীজীকে সবাই পূজা করছে কিন্তু নেহরুজীকে করছে না, এটাই দুজনের মধ্যে তফাৎ। গান্ধীজীকে আজ শুধু ভারতেই নয় সারা বিশ্ব জানে। কেন জানে? গান্ধীজী ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁর ধর্ম হল আমি অহিংসাতে প্রতিষ্ঠিত হব। আমরা সত্যাগ্রহ করতে এসেছি, ইংরেজের পুলিশ আমাদের উপরে লাঠি চালাবে। চালাবে তো চালাক। গান্ধীজী হাত তুলছেন না, লাঠি সোজা এসে গান্ধীজীর মাথা উপর পড়ছে, মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেল। তখনও তাঁর মুখে কোন বিকার নেই, কোন চিকিৎসাও করাচ্ছেন না, জলপট্টি ছাড়া কিছু করবেন না। আদর্শ তাঁর কাছে কোন পথ নয়, এটাই তাঁর way of life। অহিংসা গান্ধীজীর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে, এটাই তাঁর স্বভাব। নচিকেতারও এখানে স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে, আমার এটাই চাই। এটাকে পাওয়ার জন্য আমাকে কি করতে হবে বলুন। তুমি ওসব ছেড়ে দাও তার বদলে তোমাকে ইহকাল আর পরকালে যত রকমের সুখ ভোগ হতে পারে সবটাই দিয়ে দিচ্ছি। আমার কোন ভোগ লাগবে না, আমার ওটাই চাই। এই জিনিষকে প্রশংসা করাও খুব কঠিন। কোন কিছুর প্রতি যারা জীবনে খুব সমর্পিত, যেমন একজন স্ত্রী স্বামীর প্রতি খুব সমর্পিত, তার কাছে কোন প্রলোভনা আসার পরেও তিনি যদি ঐ জিনিষকে ধরে রাখতে পারেন তখন এই ধরণের মানুষই নচিকেতার এই ভাবকে কিছুটা বুঝতে পারবে, তার বাইরে কেউ উপলব্ধি করতে পারবে না।

সন্তানের প্রতি মায়ের যে দায়বদ্ধতা, যে ভালোবাসা সেখানে মায়ের আর কোন দিকে দৃষ্টি থাকে না। একজন মা কিভাবে তার সন্তানের জন্য সব কিছু ছেড়ে দিতে পারে, মায়ের এই ভাবকে যদি কেউ অনুভব করতে পারে তাহলে সে নচিকেতার এই ভাব একটু বুঝতে পারবে। গান্ধীজীরও এই একই ভাব। যদি কোন মাকে বলা হয় তোমার সন্তানকে যদি তুমি দুধ খাওয়াও তাহলে তোমার মাথাটা ফাটিয়ে দেওয়া হবে। তখন সেই মা কি করবে? খুব হলে মা তাকে বলবে, ওরকমটি করবেন না। নেহরুজী ঠিক এটাই করছিলেন, পুলিশকে বললেন তুমি এখান থেকে সরে যাও। কিন্তু গান্ধীজীর কথা পড়লে আমাদের বিশ্বাস হয় না। গান্ধীজী যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর নোয়াখালী গেলেন তখন সবাই তাঁকে এত করে বলল সঙ্গে একজন দেহরক্ষী নিয়ে যান। কিন্তু তিনি কোন দেহরক্ষী না নিয়ে একটা কোলাপুরী চটি পড়ে এগিয়ে গেলেন। মুসলমানরা রাস্থায় কাঁটা ছড়িয়ে রেখেছিল। গান্ধীজী দেখলেন, দেখার পর চটি জোড়া খুলে ব্যাগে রেখে খালি পায়ে হাঁটতে থাকলেন। পা দিয়ে দর দর করে রক্ত ঝড়ছে, তাঁর কোন বিকার নেই। সামনে থেকে নাথুরাম গুলি চালিয়ে দিল, গান্ধীজী 'হে রাম!' বলে লুটিয়ে পড়লেন। কল্পনা করা যায়! কোন স্তরে মন চলে গেলে এই জিনিষ হতে পারে! গান্ধীজীর কাছে এসে প্রলোভনের সমস্ত শক্তি যেমন নিস্তেজ হয় যেত, তেমনি ভয়ও তাঁর সামনে মাথা তুলতে পারত না। প্রলোভন আর ভয়কে সব সময় একসাথে দেখতে হয়। প্রলোভনের উল্টোটাই ভয়। আমরা বলতে পারি আমার কিছু লাগবে না। কিন্তু ভয় আছে? যদি বলা হয় কাল থেকে বেলুড় মঠ গেলে ভাত বন্ধ, পরের দিনই বেলুড় মঠ আসা বন্ধ করে দেবে। এগুলো সহজে বোঝা যায় না, মনে করছি সব ঠিক আছে, কিন্তু মস্তিষ্কের মতিগতি খুব ভালো করে বিশ্লেষণ করতে শুরু করলে তখন ধরা পড়ে। গান্ধীজীর কাছে এসব কোন ব্যাপার ছিল না। তাঁকে যদি বলা হয় আপনাকে ভারতের সম্রাট করে দেওয়া হবে, আপনি সব বন্ধ করে দিন। গান্ধীজী বলবেন, আমার কোন কিছুই লাগবে না, আমার একটাই লাগবে ইংরেজ ভারত ছাড়। তোমাকে লাঠি দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হবে, তবুও তিনি বলবেন ইংরেজ ভারত ছাড়।

যমরাজ এটাই বলছেন, *ধৃত্যা ধীরো নাচিকেতোহত্যস্রাক্ষীঃ*, এখানে যে শুধু লোভ প্রলোভনের কথা বলা হচ্ছে তা নয়, নচিকেতাকে যদি ভয়ও দেখানো হত তাতেও সে ওখান থেকে সরে আসত না। ভগবান বুদ্ধকে মাড় এসে ভয় দেখাচ্ছে, প্রলোভন দেখাচ্ছে, যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করছে, এত কিছু করেও আদর্শ থেকে তাঁদের সরিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আবেগের কোন রূপই আর প্রভাবিত করতে পারবে না। নচিকেতাকে যমরাজ তাই বলছেন, হে নচিকেতা! তুমি অতি শ্রেষ্ঠ পুরুষ। এই মন্ত্রকে নিয়ে বা এই ধরণের জিনিষকে নিয়ে আমরা যখন চিন্তা ভাবনা করব, নিজেকে যখন মনে হবে আমার কিছু লাগবে না, আমি ঠাকুরকেই চাই তখন বিচার করে দেখতে হবে, কিছু লাগবে না ঠিক আছে কিন্তু যদি বলা হয় শুধু ঠাকুরকে চাইলে দুঃখ-কষ্ট নিতে হবে, তখন সবাই পিছিয়ে আসবে। কিন্তু স্বভাবে যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, this is may way of life তখন আর কিছুই গ্রাহ্য করবে না। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন, মেয়েদের প্রসব যন্ত্রণার সময় কাতর হয়ে সব মেয়েরাই বলে আর মরতে স্বামীর কাছে যাব না। কিন্তু ঠাকুরের ঐ শারীরিক যন্ত্রণার সময়, পুরো শরীরটা কঙ্কালসার হয়ে গেছে তখনও তিনি বেদান্তচর্চা ছাড়ছেন না। শরীর থেকে মন সরে গেছে, শরীর আছে কি নেই, খেতে পারছেন কি পারছেন না, কোন ভ্রুক্ষেপই নেই। এটাই অব্যাভিচারী ভালোবাসা। ধৈর্য ধরে উপনিষদ পাঠ করছি, শ্রদ্ধাপূর্বক আলোচনা শুনে যাচ্ছি, এটুকুই আমাদের সম্বল। যিনি হিরণ্যগর্ভের সঙ্গে এক হয়ে গেলেন তাঁর মনের উপর সমস্ত আধিপত্য এসে গেছে, অণিমা, লঘিমাদি যত রকম যোগশক্তি হতে পারে সবটাই তাঁর মুঠোয়, নচিকেতা এর সবই ছেড়ে দিয়েছেন। এইভাবে শিষ্যের স্তুতি করার পর এবার ঠিক ঠিক বিদ্যার স্তুতি করছেন –

তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।।১/২/১২।।

(যে আত্মা দুর্জ্ঞেয়রূপে অবস্থিত, হৃদয়গুহায় প্রতিষ্ঠিত ও অনর্থবহুল শরীরে অনুপ্রবিষ্ট বলে আত্মাকে অতি কষ্টে অনুভব করতে পারা যায়, ধীর ব্যক্তি সেই সনাতন ও স্বপ্রকাশ আত্মাকে অধ্যাত্মযোগ সহায়ে সাক্ষাৎ পূর্বক দ্বন্দ্বময় সংসার থেকে মুক্ত হয়ে যান।)

যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেন তিনি শোক আর হর্ষের পারে চলে যান। কিন্তু সমস্যা হল *তং দুর্দর্শং*, আচার্য বলছেন *দুঃখেন দর্শনমস্যেতি দুর্দর্শঃ*, আত্মবিদ্যা, আত্মজ্ঞান এতই সূক্ষ্ম আর এত গভীর যে বহু কষ্টে এই আত্মবিদ্যার দর্শন হয়। আর এই আত্মবিদ্যা *গূঢ়ম্*, অত্যন্ত গূঢ়। আচার্য *গূঢ়ম*কে ব্যাখ্যা করে বলছেন, *প্রাকৃতবিষয়বিকারবিজ্ঞানৈঃ প্রচ্ছন্নমিত্যেতৎ*, নানা রকম সাংসারিক বিষয়ের মধ্যে আত্মবিজ্ঞান একেবারে ঢাকা পড়ে আছে। এই মন দিয়েই আমাদের আত্মজ্ঞানকে পেতে হবে, এই মনের ভেতরেই আত্মজ্ঞান লুকিয়ে আছে কিন্তু মন প্রাকৃত বিষয়ের দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে আচ্ছাদিত। ফিজিক্সের জ্ঞানে, কেমস্ট্রির জ্ঞানে, বায়োলজির জ্ঞানে, মুখ্যমন্ত্রীর জ্ঞানে, প্রধানমন্ত্রীর জ্ঞানে, নেতাদের কেলেঙ্কারীর জ্ঞানে, রেল ভাড়া বৃদ্ধির জ্ঞানে, ইনকাম ট্যাক্সের জ্ঞানে, সব কিছুর জ্ঞানে মন একেবারে আচ্ছাদিত হয়ে আছে, এত কিছুর জ্ঞানের ভেতরে কোথায় এই আত্মজ্ঞান বসে আছে কে তাকে খুঁজে পাবে! মনের গুহার মধ্যে সে চুপচাপ বসে আছে। ঠাকুর বলছেন কোন একটা বিদ্যাতে যদি বেশি এগিয়ে থাকে তার দ্বারা ঈশ্বর জ্ঞান হয় না। প্রাকৃত বিষয় মানে জগতের যে কোন বিষয়ের জ্ঞান, যদি কেউ একটা বিষয়ে অনেক এগিয়ে থাকে তার দ্বারা আত্মবিদ্যা হবে না।

গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্, উপনিষদে বুদ্ধিকে প্রায়ই গুহা রূপে বর্ণনা করা হয়, এই বুদ্ধি দিয়েই আত্মবিদ্যাকে জানা যায়। আমরা মনে করি ঈশ্বর দর্শন মানে ঠাকুর সামনে এসে দাঁড়িয়ে যাবেন, তা কখনই নয়, দর্শন ভেতরেই হয়। *গহ্বরেষ্ঠং*, এই যে নানান রকমের অনিষ্ট, শরীর, ইন্দ্রিয় এগুলোর একেবারে ভেতরে বসে আছেন। তার মানে এই আত্মজ্ঞানের মধ্যে দুটো জিনিষ জড়িয়ে আছে। একটা হল বুদ্ধি ও বুদ্ধির কার্য, বুদ্ধির কার্য আবার জগতের নানান রকমের বিষয়ের মধ্যে ছড়িয়ে আছে, তার মধ্যে এই আত্মজ্ঞান হারিয়ে আছে। আর এই বুদ্ধির মধ্যেই আত্মতত্ত্ব লুকিয়ে আছে, আত্মজ্ঞানও যা আত্মতত্ত্বও তাই, মনও যা মনের কার্যও তাই। কিন্তু জিনিষটাকে বোঝানর জন্য বলা হচ্ছে, আমাদের চেতনা শরীরের সাথে, ইন্দ্রিয়ের সাথে, মনের সাথে জড়িয়ে রয়েছে। তাহলে এবার ভাবুন কোথায় সেই শরীর, সেই শরীরের পেছনে ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের পেছনে মন আর মন প্রাকৃত বিষয় সমূহকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রেখেছে, তার পেছনে এই আত্মবিদ্যা লুকিয়ে আছে,

এরপর কার সাধ্যি এই আত্মবিদ্যার কাছে পৌঁছাতে পারবে। সেইজন্য বলছেন *গহ্বরেষ্ঠং*। যদি আমাকে আত্মবিদ্যাকে খুঁজতে হয় তাহলে আগে আমাকে শরীরের পারে যেতে হবে, তারপর ইন্দ্রিয়ের পারে যেতে হবে, ইন্দ্রিয়ের পারে যাওয়ার পর মনের মধ্যে যে নানা রকমের বিষয় আগে থেকেই ঢুকে আছে সেগুলোর পারে যেতে হবে, শেষে শুদ্ধ মনের পারে যেতে হবে। অসম্ভব ব্যাপার, সেইজন্য কেউই আত্মজ্ঞান পায় না। এখানে পর পর বলছেন *তং দুর্দর্শং*, দুর্জ্ঞেয়, আত্মার দর্শন পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। তার কারণ কি? এই এই তার কারণ। আর বলছেন *পুরাণম্*, ইনি সবার আদি সনাতন পুরুষ, তাঁর আদি কেউ নেই, সেইজন্য বলছেন *পুরাণম্*। বেদে যাঁর কথা বলতে গিয়ে বলছেন *সহস্রশিরসা পুরুষঃ*, যে পুরুষের কথা বলছেন তিনি সেই পুরুষ।

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং, এই যে *পুরাণম্*, যিনি দেবতাদেরও আদি পুরুষ, এই আদি পুরুষকে একমাত্র অধ্যাত্মযোগ দিয়ে ধীর পুরুষরা জেনে যান। অধ্যাত্মযোগ মানে, মনকে যখন অন্যান্য সব বিষয় থেকে সরিয়ে শুধু আত্মতত্ত্বতে লাগিয়ে দেওয়া হয় তাকে বলা হয় অধ্যাত্মযোগ। অধ্যাত্ম শব্দের অর্থও তাই, সব রকম বিষয় থেকে মনকে সরিয়ে আত্মজ্ঞানে লাগিয়ে দেওয়া। আমাদের মন শরীরের সাথে, ইন্দ্রিয়ের সাথে জড়িয়ে আছে, মন নানান বিষয়ের জঞ্জালে আবৃত হয়ে আছে। কিন্তু সব কিছু থেকে সরে এসে মনকে যদি আত্মতত্ত্বে লাগিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেই আদি পুরুষকে জেনে যাবে। যদি সেই আদি পুরুষকে জেনে যাও তাহলে *মত্বা ধীরো*, আগে মতি শব্দ নিয়ে আসা হয়েছে, ঐ জিনিষটাকে জানা, অর্থাৎ ঐ জিনিষে মতি হয়ে যাওয়া, যদি জেনে যায় আমিই সেই আসল তখন তিনি শোক আর হর্ষ এই দুটোর পারে চলে যান। তখন তার কোন কিছু পেলে আনন্দও হবে না, আর কোন কিছু চলে গেলে দুঃখও হবে না। গান্ধীজী এত মার খেলেন, এতবার জেলে গেলেন আর ভারত যখন স্বাধীন হল সেদিন কত আনন্দের দিন কিন্তু পতাকা উত্তোলনে তিনি এলেনও না। হরিজনদের কলোনিতে ঘর পরিষ্কার হচ্ছিল সেখানে তিনি তাদের সাথে কাজ করছেন। তাঁর কাছে বোধ বলে কিছু নেই, লক্ষ্য বলে কিছু নেই, এটাই আমার জীবনের ধারা। পুলিশ যখন মারছে তখনও তিনি নির্বিকার, জেলে পুরে দিচ্ছে তখনও নির্বিকার আর ভারত স্বাধীন হয়ে গেল তখনও নির্বিকার। তিনি আবার বললেন, কংগ্রেসের কাজ হয়ে গেছে এবার তাহলে কংগ্রেসকে dissolve করে দেওয়া হোক। এগুলিকে একটু চিন্তা ভাবনা করলে গিয়ে বোঝা যায় শোক আর হর্ষের পারে চলে যাওয়াটা কি জিনিষ। গান্ধীজীর একমাত্র উদ্দেশ্য ইংরেজকে ভারত ছাড়া করা, ইংরেজ চলে যাচ্ছে কিন্তু বলছেন ইংরেজও আমার বন্ধু তোমার প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নেই, তুমি অতিথি হয়ে আবার এসো, তোমাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাব, কিন্তু রাজা হয়ে আর তোমাকে থাকতে দেব না। অথচ ভারত স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর তার মধ্যে কোন ধরণের বিকার নেই। এ জিনিষ কল্পনাই করা যায় না। সাধারণ ধর্ম পালন করেই গান্ধীজী যদি এই অবস্থায় চলে যেতে পারেন, সেখানে আত্মজ্ঞানে কি হবে ভাবা যায়! ভগবান গীতায় সেই কথাই বলছেন *যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ*, এমন বিরাট কিছু পেয়ে গেছে যেটা পাওয়ার পর সব কিছুই অতি তুচ্ছ হয়ে গেছে।

এগারো আর বারো নম্বর মন্ত্রে এমন কিছু কথা বলছেন যেগুলো আমাদের মনে অনেক রকম সংশয় তৈরী করে। সেইজন্য দুটো মন্ত্রকে এক সঙ্গে একটু আলোচনা করে আমরা পরের মন্ত্রে যাব। মহৎ হওয়ার ইচ্ছা মানুষের চিরন্তন। আর শ্রেষ্ঠত্বের উপলব্ধি, জগতে আমার জন্য যা কিছু মহৎ আছে, আমি তা পেতে চাই, এই আকাঙ্খাও মানুষের স্বাভাবিক। আমি মহৎ হতে চাই আর জগতের শ্রেষ্ঠতমকে পেতে চাই, এই দুটোকে মানুষ কিভাবে পেতে পারে? কেউ বলবেন কর্ম দ্বারা পেতে পারে, কেউ বলবেন জপ-ধ্যান করে পেতে পারে। ইদানিং কালে বলে টাকাই সব কিছু, টাকা থাকলেই সব কিছু হয়ে যায়। মাওবাদীরা বলে শক্তির উৎস বন্দুকের নল। হাতে বন্দুক থাকলে টাকাও আসবে ক্ষমতাও আসবে। এগুলো হল আঞ্চলিক দর্শন, এদের দর্শনকে ভুল বলা হচ্ছে না। এর উল্টোটাও অনেক বলে, টাকা দিয়ে সব কিছু হয় না বা বন্দুক দিয়ে সব কিছু হয় না। তার মানে কেউ কেউ অন্য কিছু মনে করছে। ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ইতিহাসকে খুব ভালো করে অনুধাবন করলে দেখা যাবে ভারতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাব প্রভাব বিস্তার করেছে। একটা সময় মানুষ ভাবত কর্ম দিয়েই সব কিছু পাওয়া যায়, আবার একটা সময় এই ভাব এসেছিল জপ-ধ্যান করলেই সব হয়ে যাবে। বাল্মীকি রামায়ণের যুগে আবার তপস্যার উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছিল, মনে করত তপস্যা দিয়েই সব কিছু পাওয়া যেতে পারে। এখন এগুলোকে কেউ বেশি গুরুত্ব দেয় না, পপুলার ধর্ম বলেও কিছু নেই। সব মানুষ এখন টাকার পেছনে ছুটছে। যুগে যুগে এই ভাবের পরিবর্তন হতে থাকে। ভারতে স্বধর্ম পালন করার

উপর বেশি জোর দেওয়াটা অনেক দিন ধরে চলেছিল। বিশেষ করে মহাভারত আর গীতা যেদিন থেকে ভারতে জনপ্রিয় হল সেদিন থেকে কিছু দিন আগে পর্যন্ত স্বধর্ম পালনের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। আমি আমার স্বধর্ম পালন করে যাবে, স্বধর্ম পালন করলেই আমার যা আসার এসে যাবে। সেইজন্য ভারতের একজন গৃহবধু যত কষ্টই পাক সে তার স্বধর্মক কখনই ছেড়ে দিত না। ব্রাহ্মণদের গলা কেটে দিচ্ছে তাও সে তার নিজের ধর্ম ত্যাগ করত না। কিন্তু বৈদিক যুগ থেকে ভারতে কর্মই বেশি প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। স্বধর্মের পেছনেও কর্মের প্রাধান্যই বেশি। কর্ম ঠিকই কিন্তু আমি স্বধর্মের মাধ্যমে কর্ম করতে চাই। ঠাকুরও বলছেন কর্মকাণ্ড আদিকাণ্ড। আদিকাণ্ড আমরা বেদের মাধ্যমে পাই, আদিকাণ্ডে বলা হয় যজ্ঞাদি কর্ম করলে সবই পাওয়া যাবে। আদিকাণ্ডই আরও উন্নত হয়ে মহাভারতে এসে বলা হল স্বধর্ম করলেই সব পাওয়া যাবে। চিন্তা-ভাবনা আরও উন্নত হতে হতে এখন বলছে জপ-ধ্যান করলেই সব পাওয়া যাবে, আরও সংক্ষেপে বলছেন ঈশ্বরে ভক্তি করলেই সব হবে। তুমি শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি কর, মা কালীকে ভক্তি কর। এখন ভক্তদের মধ্যে এই ভাব খুব জনপ্রিয় হয়ে গেছে, ঠাকুরকে ধরে রাখ বা কৃষ্ণের ভজনা করে যাও তাতেই সব পাবে।

খুব গভীরে গিয়ে যদি এই জিনিষটাকে দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে, দুটি ভাব খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। একটা হল কর্মের ভাব, কোন না কোন ভাবে আমাকে কাজ করে যেতে হবে। যখন বলছে টাকা দিয়ে সব হয় তখনও কর্মের ভাব থাকছে, যখন বলছে বন্দুকের নলই শক্তির উৎস হবে সেখানেও কাজের ব্যাপারটা থাকছে। স্বধর্মে তো কাজ পুরোমাত্রায় থাকছে। দ্বিতীয় হল, কাজের সাথে কোন না কোন রূপে আত্মজ্ঞানের ব্যাপারটা এসে যায়, হয় আত্মজ্ঞান রূপে বা ঈশ্বরে ভক্তি রূপে। যেখানে কর্মের প্রাধান্য থাকছে না, যদিও বলা হয় জপ-ধ্যানও কর্ম, ঠিকই কিন্তু জপ-ধ্যানকে আমরা এখানে ভক্তি রূপে দেখছি। একটা ভাবে কর্মের প্রাধান্য আরেকটি ভাবে জ্ঞান ভক্তির প্রাধান্য। কর্ম আর জ্ঞান-ভক্তি এই দুটোকে নিয়ে সব সময় একটা দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। কারণ মানুষের স্বভাবই হল কর্ম করা। আমরা জ্ঞান-ভক্তির যত কথাই বলি না কেন, ধীরে ধীরে জ্ঞান-ভক্তিও কর্মের মধ্যে নেমে যায়। সন্ন্যাসীদের একটাই কাজ আত্মজ্ঞান লাভ বা ঈশ্বর দর্শন করা। কিন্তু সন্ন্যাসীদের মনে সেবা ভাবটাও থাকে। ইদানিং তাই সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে কাজের প্রাধান্য ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। কারণ মানুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন স্বাভাবিক ভাবেই কর্মে প্রবৃত্ত হতে চায়। বেদের সময় ছিল যজ্ঞ, যজ্ঞ দিয়ে তুমি সব কিছু পেয়ে যাবে, তোমার শত্রুকে নিধন করতে চাও যজ্ঞ কর, ধন-সম্পদ চাই, সন্তানও চাই, যজ্ঞ করলে সব পাবে। যজ্ঞাদির ভাব থেকে সরে পরে এল তপস্যার ভাব। তপস্যা করলে সব কিছু পাওয়া যাবে। বিশ্বামিত্র শুধু তপস্যাই করে গেলেন।

স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং, এখানেও কর্মের প্রশংসা করছেন। যজ্ঞাদি কর্ম দিয়ে মানুষ সব কিছু পেতে পারে। সব কিছু পেতে পারে মানে, মনের জগতে শ্রেষ্ঠতম যেটা হতে পারে সেটাও পাওয়া যায়। কিন্তু নচিকেতা সেটাকেও ত্যাগ করে দিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রে বলে বীজ মন্ত্র জপ করলে সব কিছুই পাওয়া যাবে, ঠাকুরের নামে আমরা বলি তিনি সবই দেন। কিন্তু একটু বিচার করলে দেখা যাবে একই লোকের পক্ষে দুটো জিনিষ পাওয়া কখনই সম্ভব নয়। যোগ আর ভোগ কেউ একসঙ্গে পেতে থাকবেন, এই জিনিষ কখনই সম্ভব নয়। তত্ত্বের দিক দিয়েও কখনই সম্ভব নয়, কারণ দুটোই বিপরীত ধর্মী। একসঙ্গে আমি আলো আর অন্ধকার চাইব তা কখন হয় না। ভগবান আর ভগবানের মায়া দুটো বিপরীত জিনিষ, একদিকে আমি বলছি আমার ব্রহ্মলোক চাই আবার অন্য দিকে বলছি আমার আত্মজ্ঞান চাই, দুটো এক সঙ্গে কখনই হয় না। হয় আমাকে বলতে হবে আমি ভগবানকে চাইছি নয়তো বলতে হবে আমি তাঁর মায়াকে চাইছি। কঠোপনিষদের মূল বিষয় আত্মজ্ঞান। তাই উপনিষদের ঋষিরা দেখাচ্ছেন আত্মজ্ঞান পেতে হলে কিভাবে সব কিছু পাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করতে হবে। এখানে সব কিছুকে ছাড়ার ব্যাপারটাকে একটু একটু বর্ণনা করছেন যাতে উপনিষদের কথা যাঁরা শুনছেন তাঁদের একটা ধারণা হতে পারে যে জিনিষটা কত কঠিন। এই দুটি মন্ত্রে *কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং* দিয়ে শুরু করে যমরাজ দেখাচ্ছেন নচিকেতা জগতের যেটা শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি হতে পারে সেই অনন্তফলস্বরূপ হিরণ্যগর্ভ পদকেও ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। নচিকেতার ত্যাগের কথা বলতে গিয়ে যমরাজ বর্ণনা করে দেখাচ্ছেন যজ্ঞাদি কর্ম করলে মানুষ কি কি পেতে পারে।

ইদানিং বাজারে কিছু কিছু জালিয়াতি কোম্পানীর উদ্ভব হয়েছে, কোম্পানীগুলি ইয়ং ছেলেমেয়েদের মার্কেটিংএর কাজে নামাবার জন্য অনেক রকম প্রলোভন দেখায়। প্রথমে বলবে এই মার্কেটিংএর কাজ করলে তুমি চাইলে এত টাকা আয় করে নিতে পারবে। ওরা এমন একটা টাকার কথা বলবে যেটা অসম্ভবও মনে হবে না, কিন্তু কোন দিন কেউ আয় করতে পারেনি। হয়ত বলে দিল মাসে এক লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করতে পারবে। কিন্তু এক লাখ টাকা বলে দেওয়ার পরেও তার মনে পুরো ছবিটা পরিষ্কার হয় না। তখন বলবে তুমি কি জান এই এক লাখ টাকা দিয়ে তুমি কি কি করতে পারবে? একটা চার কামরার বড় ফ্ল্যাট বুক করতে পার, একটা গাড়ি রাখতে পার। একটা ছবি তার মনের মধ্যে আস্তে আস্তে তৈরী করে দিতে থাকে। সব শুনে ছেলেটির চোখটা যখন ঝাঁঝড়া হয়ে গেল তখন সে ঐ কোম্পানীর খপ্পড়ে ফেঁসে যায়। এরপর কাজ করতে গিয়ে দেখে দিনে চব্বিশ ঘন্টা খেটে মাসে তার তিন হাজার টাকাও আয় হচ্ছে না। কিন্তু তার সামনে ঐ ছবিটা ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, আজ না হোক দু-চার মাস পর থেকে টাকা আসতে থাকবে। আর দু-চারজন লোকের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বোকা বানিয়ে রাখে। যতক্ষণ না এই ছবিটা দাঁড় করাবে ততক্ষণ তাদের মস্তিষ্ক নিতে পারবে না। যমরাজ এগারো নম্বর মন্ত্রে এই ছবিটা দাঁড় করিয়ে দেখাচ্ছেন যজ্ঞ দিয়ে কি কি হয়, কর্ম দিয়ে কি কি হয়। এমনকি অণিমাদি যে যোগসিদ্ধিকে জগতে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয় সেই অণিমাদিও যজ্ঞের দ্বারা পেতে পার। কিন্তু তুমি এর সব কিছুকে ছেড়ে দিয়েছ।

পরের মন্ত্রে এসে যমরাজ বলছেন, তবে কি জান এই আত্মতত্ত্বের অনুভব করা অত্যন্ত কষ্ট। কারণ *তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্*, এখানে মূল শব্দ হল গহ্বরেষ্ঠং। কঠোপনিষদে গুহা শব্দটা একাধিকবার এসেছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আত্মবিদ্যাকে বলা হয় দহরবিদ্যা, দহর শব্দের অর্থও গুহা, তাই দহরবিদ্যা মানে গুহাবিদ্যা, গুহা থেকেই এসেছে গুহ্যবিদ্যা। কেন গুহ্যবিদ্যা বলছেন? আচার্য এখানে ব্যাখ্যা করে বলছেন, আমাদের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির মধ্যে এক বিশাল আড়ম্বর চলছে, যেখানে শব্দ আছে, বিচার আছে। সমস্ত আড়ম্বরের পেছনে সেই আত্মা লুকিয়ে আছেন। যদি এই আত্মার কাছে পৌঁছাতে হয় তাহলে আমাকে এই বিশাল আড়ম্বর অর্থাৎ স্তূপীকৃত জঞ্জালকে ঠেলে ঠেলে সরিয়ে সেখান পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। যমরাজ তাই বলছেন *গহ্বরেষ্ঠং*, সব থেকে গভীরে, মনের গভীরে একটি জায়গাতে আত্মজ্ঞান লুকিয়ে আছে। তাই বলে এই নয় যে ঐ গভীরে আত্মজ্ঞানকে কেউ লুকিয়ে রেখেছে। বলতে চাইছেন, আমরা যে এই বিশাল আড়ম্বরের নামে যে জঞ্জাল সৃষ্টি করে রেখেছি, এই জঞ্জালের ভারে আত্মজ্ঞান চাপা পড়ে আছে। আমাদের পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে একজন কাউকে কি দেখতে পাই যে নিজের শরীর বাদে অন্য কোন চিন্তা-ভাবনা করছে? তাহলে যারা সমস্ত রকম কষ্টকে উপেক্ষা করে, পয়সা খরচ করে এখানে উপনিষদের কথা শুনতে আসছেন, অন্যদের সাথে বিচার করলে বলতে হবে এদের নিশ্চয়ই মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু এই মাথা খারাপ হওয়ার পেছনে কিছু চিন্তা ভাবনা কাজ করছে? এটা পরিষ্কার যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পার্থিব জগৎ থেকে বৌদ্ধিক জগতে এনারা যাওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে একটি লোকও পাওয়া যাবে না যে চিন্তনের জগতে থাকতে চাইছে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে সবাই খবর কাগজের আবর্জনার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। মস্তিষ্ককে অকেজো করার সব থেকে শক্তিশালী যন্ত্র হল খবরের কাগজ। আর টেলিভিশন তো মানুষের বৌদ্ধিক মেকানিজমটাই বিকল করে দিয়েছে। টেলিভিশন শুধু শব্দ নিয়ে আসছে না, শব্দের সাথে চিত্রকেও নিয়ে এসে হাজার হাজার সংস্কার তৈরী করে মস্তিষ্ককে সম্পূর্ণ ভাবে অলস করে দিচ্ছে। খবর কাগজ আর টেলিভিশনের করালগ্রাস থেকে কোন রকমে যদিও বা বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু তারপরেই সে অমুক লেখক ঠাকুরের নারীমুক্তির উপর কি প্রবন্ধ লিখেছে, স্বামীজী কবে কবে হাসির কথা বলেছেন, বিদেশে তিনি কতবার আইসক্রিম খেয়েছিলেন এই ধরণের কাহিনী আর প্রবন্ধের মধ্যে হারিয়ে যাবে। এগুলো তাও ধর্মের ব্যাপার নিয়ে লেখা কিন্তু এর বাইরে বাকি সব লেখা অতি সাধারণ। এখানেও সে মনের জগতে ঢুকতে চাইছে না। বিজ্ঞানের কোন ম্যাগাজিনের গ্রাহক হতে, অথবা সাহিত্য, কলা বা সঙ্গীতে উৎসর্গীকৃত কোন মাসিক পত্রিকার গ্রাহক হতে ইদানিং কাউকেই দেখা যায় না। চিন্তা ভাবনা যদি উচ্চমানের রচনাতে না লাগায়, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে, বিজ্ঞানের ব্যাপারে যদি না লাগায় তাহলে কোথায় সেই চিন্তাকে লাগিয়ে রেখেছে? দেহের উপর। কারণ মানুষ সব সময় এই দুটো স্তরেই বিচরণ করে দেহ আর মন। যদি চিন্তার স্তরে না থাকে তাহলে বুঝতে হবে দেহের স্তরে আছে। এর কোথাও

কোন ব্যাতিক্রম দেখা যাবে না। দেহের পারে যখন যাবে তখন আসবে চিন্তার জগৎ। চিন্তার জগতে প্রবেশ করা মানে, বড় বড় গেট পেরিয়ে এবার মহা জালের মধ্যে ফেঁসে গেল। কারণ চিন্তার জগৎ অত্যন্ত সূক্ষ্ম জগৎ, তার জালটাও খুব সূক্ষ্ম। এই সূক্ষ্ম জাল থেকে কেউ বেরিয়ে যেতে পারে না। ঐ জাল থেকে বেরিয়ে পৌঁছাতে হবে আত্মজ্ঞানে। এই ব্যাপারটা পদার্থ বিজ্ঞানের Theory of Relativity দিয়ে খুব ভালো বোঝা যায়।

আইনস্টাইন তাঁর Theory of Relativity থিয়োরীতে বলছেন, কোন বস্তুতে আউটপুট শক্তি দিয়ে দিলে বস্তু চলতে শুরু করবে। চলতে চলতে যেমন যেমন তার গতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে তারপর একটা অবস্থায় গিয়ে নিউটনের নিয়ম আর খাটবে না। নিউটনের নিয়মে যত শক্তি দেওয়া হবে ওর গতি তত বাড়তে থাকবে। কিন্তু আইনস্টাইনের নিয়মে তা হয় না। আইনস্টাইনের থিয়োরীতে বলা হয় একটা অবস্থার পর অন্য ইক্যুয়েশান আসা শুরু হয়ে যায়। মনে করা যাক এক গ্রাম ওজনের কোন বস্তুকে যদি ৯৯.৯% আলোর গতিতে চালাতে হয় তাহলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত শক্তির সমষ্টিকে এক করে ঐ বস্তুর উপর প্রয়োগ করতে হবে, কিন্তু তাতেও সে আলোর গতিকে প্রাপ্ত করতে পারবে না। অথচ আমরা ঐ গতিতে আলোকে সব সময় দেখে যাচ্ছি, কিন্তু আমাকে যদি এক গ্রাম ওজনের কোন বস্তুকে, এক গ্রামও ছেড়ে দিন, .০০১ গ্রাম, আমার নখাগ্রকেও যদি প্রকাশের গতির কাছাকাছি নিয়ে যেতে চাই তাহলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সব শক্তিকে টেনে এনে যদি ওর মধ্যে লাগিয়ে দেওয়া হয় তাও প্রকাশের গতি পাবে না। প্রকাশের গতিতে যদি চলতে হয় তাহলে তার একটাই পথ। Mass যদি জিরো হয়ে যায় অর্থাৎ ভরশূন্য হলে তবেই একমাত্র সে প্রকাশের গতি পেয়ে যাবে, এছাড়া দ্বিতীয় আর কোন পথ নেই। কিন্তু তার mass যত কমই হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না, ও আর চলতে পারবে না। এর মধ্যে থিয়োরীর কিছু নেই, পুরোটাই mathematical। আইনস্টাইনের থিয়োরী আসতেই লোকেরা প্রথমে চমকে উঠেছিল, এতদিন নিউটনের হিসেবে সঙ্গে সঙ্গে হিসেব করে বার করে দেওয়া যেত একটা জিনিষকে ঠেলতে হলে কত এনার্জি আউটপুট দিতে হবে। কিন্তু এই হিসাবে আলোর গতিতে কখনই সে যেতে পারবে না। ওখানে গিয়ে আইনস্টাইনের থিয়োরী কাজ করতে শুরু করে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত এ্যটম বোমা আছে, যাবতীয় যা শক্তি আছে সব শক্তি দিয়ে দিলেও সে প্রকাশের গতি নিতে পারবে না, সব ছেড়ে দিয়ে বসে যাবে, আর চলতে পারবে না। আধ্যাত্মিক জীবনেও ঠিক তাই হয়। আমাদের মনের ওজন যদি .০০১ গ্রামও ওজন হয় এবার আমরা যত এগোব আমাদের তত শক্তি বেশি লাগবে। সেইজন্য সাধক যখন এগোতে শুরু করেন তখন প্রথমের দিকে তর তর করে এগিয়ে যাবেন। ঘরবাড়ি ছেড়ে দিল, জপ-ধ্যানে বসে গেল, মা-বাবা ভাই-বোনদের ভুলে গেল, কামিনী-কাঞ্চনের দিকে কোন দৃষ্টি নেই, কিন্তু এরপর যত এগোবে তত তাঁর পক্ষে এগনো কঠিন হয়ে যায়। চিন্তার জগতে খুব ছোট্ট একটা বাসনাও যদি থাকে, এবার সে যত এগোবে তত সে শক্তির যোগান চাইবে। আইনস্টাইনের নিয়ম স্থূল জগতে যেভাবে চলে আধ্যাত্মিক জগতেও সেই নিয়ম একই ভাবে চলে। বাসনা সম্পূর্ণ ভাবে যদি শূন্য না হয়ে থাকে, পুরোপুরি নির্বাসনা যদি না হয় সে আর এগোতে পারবে না। নির্বাসনা যেমনি হয়ে গেল তারপর আর কোন শক্তিও লাগবে না। এটাই আশ্চর্যের। আলো জ্বলছে তার মধ্যে ফোটনগুলো যে আলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে ফোটনের কাছে এগুলো কোন ব্যাপারই নয়, অথচ ফোটন প্রকাশের গতিতে যাচ্ছে, তাকে কেউ অতিক্রম করে যেতে পারবে না।

জগতে যে যত উপরে যেতে চাইছে তাকে তত কর্ম করতে হবে, জগতের সুখ যে পেতে চাইছে তাকে কর্ম করতে হবে, স্বর্গের সুখ চাইলে তার থেকে আরেকটু বেশি কর্ম করতে হবে, ব্রহ্মলোকের সুখ পেতে গেলে আরও বেশি কর্ম করতে হবে। কিন্তু তারপরে আর সে যেতে পারবে না। কর্ম তাকে ব্রহ্মলোক পর্যন্তই নিয়ে যাবে, এরপর যত কর্মই সেই করুক না কেন, প্রকাশের গতি কোন দিন সে পাবে না। প্রকাশের গতি পেতে হলে অন্তর্জগতের ওজনকে শূন্য হতে হবে, অন্তর্জগতের ওজন শূন্য করে দেওয়া মানে নির্বাসনা, মনের মধ্যে ইহজগত আর পরকালের কোন বাসনা যেন না থাকে। নির্বাসনা হওয়া যা আত্মজ্ঞানও তাই। সেইজন্য বলছেন *গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্*। আত্মতত্ত্ব এত গভীরে লুকিয়ে আছে যে, আলোর গতিতে না গেলে সেখানে পৌঁছান যাবে না। নির্বাসনা না হলে কেউ আত্মতত্ত্বে পৌঁছাতে পারবে না। একটা জিনিষ আলোর গতিতে চলছে, সেই জিনিষকে যদি কেউ ধরতে ইচ্ছে করে তাকেও সেই গতিতেই চলতে হবে। তাঁকে জানার জন্য আমাকেও তাঁর মত হতে হবে। সামান্যতম বাসনাও যদি একটু থেকে যায় তাহলে তাঁকে ধরার গতি আর কোন দিন পাবে না। ঠাকুর খুব সহজ ভাবে বলে দিলেন সুতোর একটু আঁশ বেরিয়ে থাকলে ছুঁচে ঢুকবে না। কারণ *গহ্বরেষ্ঠং*, ঐ

জায়গাটা একেবারে one pointed। আমরা শরীরের আড়ম্বর থেকে বেরোতেই পারছি না, শরীরের আড়ম্বর কমে গেলে শব্দের আড়ম্বর শুরু হয়ে যায়। যাঁরা একটু চিন্তার জগতে বিচরণ করেন তাঁরা শব্দের আড়ম্বর সৃষ্টি করে দেন। শব্দের আড়ম্বর থেকেও বেরিয়ে গেল, কিন্তু সেখান থেকে আরও সূক্ষ্ম আড়ম্বর সৃষ্টি হয়ে গেল, বিচারের আড়ম্বর। বিচারের আড়ম্বর থেকে আর বেরোতে পারবে না। যত বড় বড় দার্শনিক, বড় বড় বিজ্ঞানী, বড় বড় সাধু মহাত্মা সবাই চিন্তার জগতের যে মহাসূক্ষ্ম জাল, সেই জালের মধ্যে একেবারে ফেঁসে আছে। ওখান থেকে তাঁরা আর এগোতে পারছেন না। সেইজন্য বলছেন *গহ্বরেষ্ঠং*, আত্মতত্ত্ব একেবারে সূক্ষ্মতম। আত্মতত্ত্ব অনেক রকম ছিদ্রযুক্ত জাল দিয়ে আচ্ছাদিত করা আছে। প্রথম ফুটো দিয়ে তো কোন রকমে ঢুকে যাবে, কিন্তু এরপর যেমন যেমন এগোতে থাকে তত জালের ফুটো গুলো সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম হতে থাকে। শেষ যে ছিদ্র, ঐ ছিদ্রকে যদি পার করতে হয় তাহলে তাকে একেবারে ওজন শূন্য হতে হবে, মন সম্পূর্ণ চিন্তাবিহীন হতে হবে, তা নাহলে আর আত্মতত্ত্বকে জানা যাবে না। ঠিক এই জিনিষটাকেই বারো নম্বর মন্ত্রে প্রথমে বলছেন *তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্*।

সমস্যা হল, আত্মজ্ঞান আমাদের ভেতরেই আছে, বাইরে কিছুই নেই। আরও মজার ব্যাপার হল ভেতরেও কিছু নেই আপনিই সেটা। এসব কথা আমরা হাজার বার শুনেছি, হাজার বার পড়েছি কিন্তু যতক্ষণ নিজে থেকে যদি ধারণা না করতে পারি ততক্ষণ এই জিনিষগুলো কখনই আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে না। আত্মজ্ঞানের চেষ্টা, আত্মজ্ঞানকে খোঁজা এগুলো বাইরে কোথাও নেই সব আমাদের ভেতরেই আছে। কিন্তু এই মনকে সূক্ষ্ম করার জন্য প্রচুর কর্ম করা দরকার। মনকে শুদ্ধ পবিত্র করার জন্য, সূক্ষ্ম করার জন্য প্রচণ্ড খাটতে হয়। জপ-ধ্যান করাটাও খাটা, শাস্ত্র অধ্যয়ন করাও খাটা, না খাটলে শুরু হয় না, এগুলো করা মানে সবে শুরু হল। কেউ যদি আত্মজ্ঞানের কথা বলতে আসে বা শুনতে চায় তাহলে গুরু বা আচার্য প্রথমেই জিজ্ঞেস করবেন, দিনে কত ঘন্টা জপ-ধ্যান করা হয়? দিনে আট ঘন্টা দশ ঘন্টা জপ-ধ্যান হচ্ছে? না, জপ-ধ্যান করি কিন্তু অতটা সময় হয় না। তাহলে তুমি আত্মতত্ত্বকে নিয়ে কোন কথা বলতে এসো না, আত্মতত্ত্ব নিয়ে কথা বলার এখনও তোমার পাত্রতা আসেনি। দ্বিতীয় জানতে চাইবেন, তোমার খাওয়া-দাওয়া কি রকম? ঝোলভাত হলেই হয়ে যায় তো, না আরও চার রকমের পদ লাগে? ঝোলভাতে হয়ে যায় তবে মাঝে মাঝে একটু বেশি পদ লাগে। তাহলে তুমি এখন আসতে পার, আত্মজ্ঞানের উপদেশ শোনার যোগ্যতা এখনও তোমার আসেনি। তৃতীয় জানতে চাইবেন, কত লোকের সাথে তোমাকে এখনও কথাবার্তা বলতে হয়? লোকের সঙ্গ ভালো লাগে? বেশি না, চার পাঁচজনের সাথে এখনও কথাবার্তা হয় আর দু-একজনের সঙ্গ ভালো লাগে। তুমি এখন আসতে পার, তোমার দ্বারা আত্মজ্ঞান হবে না, কারণ এখনও একা একা থাকতে পারছ না, এখনও তোমার চারজনের সঙ্গ দরকার হয়। এই কথাগুলো তাদের জন্যই বলা হল যারা আত্মতত্ত্বের দিকে যাত্রা সবে শুরু করতে যাচ্ছে। এই কথাগুলো উপনিষদেরও নয়, কথামৃত থেকে বলা হল। ঠাকুর বলছেন সংসারকে যখন পাতুকুয়া মনে হবে আর আত্মীয়স্বজনকে কালসাপ মনে হবে তবে শুরু হবে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ঠাকুর বলছেন শুধু ভাত ঝোল হলেই হয়ে যায় পাঁচ রকমের আড়ম্বর করে না। এখান থেকে মন সূক্ষ্ম হতে শুরু হয়, ত্যাগ আর সাধনা দুটো পাশাপাশি চলতে থাকে।

আত্মতত্ত্ব কত সূক্ষ্ম হতে পারে, নচিকেতাকে যমরাজ একটা ধারণা দিয়ে দিলেন, *গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্*। এটাকেই আচার্য আরেকটু বিস্তারিত করে বলেছেন। আমরা নিজেরা যদি এর অর্থ করে পড়ি তখন পড়ে এক রকম মনে হবে। কিন্তু আরও গভীরে যখন যাওয়া শুরু হবে তখন ক্রমশ বোঝা যাবে এই আত্মতত্ত্বের কত বিশাল বিস্তার। একটা হল জেনে নেওয়াটাও ভালো, শুনে রাখছি সেটাও ভাল। আগেকার দিনে তাই ব্রহ্মচারীদের উপনিষদ মুখস্ত করিয়ে দেওয়া হত। মুখস্ত করাটাও একটা কর্ম, এই কর্মের জন্য মনও একটু সূক্ষ্ম হয়। কিন্তু এর সত্যকে যদি নিজের জীবনে নামাতে হয়, শুধু উপনিষদই নয় যে কোন শাস্ত্রের উপদেশকে, তখন কত কঠিন মনে হবে। শরণাগতির অনুশীলনেও একই জিনিষ, শুধু জপ-ধ্যান নিয়ে পড়ে থাকার চেষ্টা করা হোক সেখানেও একই জিনিষ মনে হবে। এটা কখনই ভাবা উচিৎ নয় যে কঠোপনিষদে যে তত্ত্বের কথা বলা হচ্ছে এগুলো বেশি কঠিন আর জপ-ধ্যান করা তত কঠিন নয়। তা কিন্তু নয়, জপ-ধ্যানেও ঐ একই জিনিষ হতে হবে। যে জপ-ধ্যান করতে যাচ্ছে তাকেও সংসারকে পাতুকুয়ো আর নিজের লোকদের কালসর্প

বলে মনে করতে হবে। যমরাজ এটাই এখানে নচিকেতাকে ধারণা করিয়ে দিতে চাইছেন যে, আত্মতত্ত্ব কত সূক্ষ্ম আর আত্মতত্ত্বকে জানা আরও কত কঠিন। পরের মন্ত্রে যমরাজ বলছেন –

এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্যঃ
প্রবৃহ্য ধর্ম্যমণুমেতমাপ্য।
স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা
বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে।।১/২/১৩।।

(এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করে এবং 'আমিই আত্মা' এই ভাবে সম্যক রূপে গ্রহণ করে, তারপর ধর্মসহায়ে দেহাদি থেকে নিদিধ্যাসন পূর্বক আত্মাকে পৃথক করতে সক্ষম হয় এবং তার ফলে সে আনন্দের আকর সূক্ষ্ম আত্মাকে লাভ করে আনন্দই উপভোগ করে। আমি মনে করি যে, নচিকেতার জন্য ব্রহ্মরূপ গৃহের দরজা উন্মুক্ত হয়ে গেছে।)

নচিকেতাকে যমরাজ বলছেন এতক্ষণ আত্মতত্ত্বের যত কথা বলা হয়েছে এগুলো সব আত্মতত্ত্বের ভূমিকা। যমরাজ একটু পরেই আত্মতত্ত্বের মূল বিষয়ে প্রবেশ করতে শুরু করবেন। এখানে বলছেন যদি আত্মতত্ত্বকে জানতে হয় তাহলে প্রথমে আচার্যের কাছে মন দিয়ে খুব ভালো করে শুনতে হয়, শোনার পর ধারণা করতে হয়। *এতচ্ছ্রুত্বা*, এই আত্মতত্ত্ব *শ্রুত্বা*, আত্মবিদ আচার্যের কাছ থেকে শ্রবণ করার পর, *সম্পরিগৃহ্য*, সম্যকভাবে অর্থাৎ গভীর ভাবে ভালো করে ধারণা করতে হবে। কিভাবে ধারণা করতে হবে? আত্মভাবে, আমি আলাদা ঈশ্বর আলাদা, আমি আলাদা আমার ইষ্ট আলাদা, এভাবে নয়, আত্মভাবে ধারণা করতে হবে। আত্মতত্ত্বে যাঁর কথা বলা হয়েছে, এটা আমি নিজে, এই ভাব নিয়ে আসতে হবে। *মর্ত্যঃ* শব্দের অর্থ মরণধর্মা। মানুষ মাত্রেই মরণধর্মা। প্রথম বল্লীতে নচিকেতা বলছিলেন *সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ*, মানুষ জন্মাচ্ছে মরছে আবার জন্মাচ্ছে আবার মরছে। প্রথমের দিকের আলোচনায় বলা হয়েছিল আমাদের চারিপাশে যারা আছে তাদের কেউই চিন্তনের জগতে যেতে চাইছে না। উপনিষদের কথা যাঁরা শুনতে আসছেন তাঁদের বাড়ির লোকেরা বলছে, উপনিষদের কথা শুনে তোমার কি লাভ হবে? এরা জন্ম নিয়ে সারা জীবন কি করছে? জন্মাল, খাওয়া-দাওয়া করল, কিছু দিন বেঁচে থাকল তারপর একদিন মরে গেল, এটাকেই বলছেন মরণধর্মা। এরা নিজের কাছেও মরণধর্মা অপরের কাছেও মরণধর্মা, এর বাইরে আর তাদের কোন অবদান নেই। দশটা লোককে যদি মেরে দিত তাও একটা দাগী আসামী, খুনী বলে পরিচিতি থাকত, সেটা করারও ক্ষমতা নেই। অথবা দশ জনের জন্য ভালো কিছু করে দিল যে তাদের জীবনের এমন পরিবর্তন হয়ে গেল যে দশ জন লোক তার দশটা মুর্তি দশ জায়গায় বসিয়ে দিল। তাও করতে পারছে না। দশটা বই রচনা করে দেবে, তাও পারবে না। এবার তার বংশের দিকে আর আশেপাশের পরিচিতদের বংশের পেছনের দিকে তাকালে এমন কাউকে আমরা জানি না যে কেউ একটা মহৎ কাজ করেছে! বাবা, ঠাকুরদাকে নিজের কাছে বিরাট মনে হবে, সত্যিই তাই, নিজের অস্তিত্বের কাছে তাঁদের বিশেষ মূল্য আছে। কিন্তু অপরের কাছেও কি এই মূল্য আছে? এরাই মরণধর্মা, জন্মেছে মরে গেল। তার জীবনী যদি লেখা হয়, সেই জীবনীতে তার জীবনের ব্যাতিক্রমী কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না। সবাই মরণধর্মা, সেইজন্য বলছেন *মর্ত্যঃ*।

মরণধর্মা মরণধর্মাকেই আঁকড়ে নিজের অস্তিত্বকে অল্প একটু জায়গার মধ্যে সঙ্কুচিত করে রেখেছে। যমরাজ বলছেন *মর্ত্যঃ*, অত্যন্ত সাধারণ মানুষও যদি একবার ঠিক করে নেয় এবার আমি নিজেকে বিস্তার করতে চাই, তাহলে তাকে কি করতে হবে? *এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য*, একজন আচার্যের কাছে যাও, তাঁর কাছে গিয়ে এই আত্মতত্ত্বের কথা শ্রবণ কর আর *সম্পরিগৃহ্য*, শোনার পর সম্যক রূপে ধারণা কর। কিভাবে ধারণা করবে? আত্মভাবে, আত্মতত্ত্বে যাঁর কথা বলা হচ্ছে এটা আমি নিজে, আত্মার স্বভাব মানে এটা আমারই স্বভাব।

প্রবৃহ্য ধর্ম্যমণুমেতমাপ্য, শরীরের ধর্ম, মনের ধর্ম সব কিছুর ধর্ম থেকে নিজেকে বার করে নিয়ে এস। আত্মভাবে আত্মজ্ঞানকে গ্রহণ করার অর্থ একটাই, তুমিই আত্মা, এই আত্মতত্ত্ব তোমারই বুদ্ধি ও মনের গুহাতে ঢাকা পড়ে আছে। একটা খড়ের গাদায় একটা দেশলাই কাঠি চাপা পড়ে আছে। খড়ের মতই দেখতে কিন্তু ওর মাথায় একটু বারুদ দেওয়া আছে। কোন রকমে ঐ দেশলাই কাঠিটাকে যদি বার করে আনা হয় তখন ঐ দেশলাই কাঠি দিয়ে পুরো খড়ের গাদাকেই পুড়িয়ে ভস্ম করে দেওয়া যাবে। আচার্য ধর্মকে এখানে বলছেন *ধর্মাদনপেতং ধর্মং*, আত্মজ্ঞানের একটা বিশেষ ধর্ম রয়েছে, এই ধর্ম মরণধর্মা নয়। আচার্য বলছেন এর আগের

মন্ত্রে যে আত্মতত্ত্বের ব্যাপারে একটু আভাস দেওয়া হল আর পরের মন্ত্রগুলিতে যার ব্যাখ্যা করা হবে, সেখানে আত্মতত্ত্বের যে স্বভাব বা ধর্মের কথা বলা হবে, *ধর্ম বিশিষ্ট অণুমেতমাপ্য*, অত্যন্ত সূক্ষ্ম এই আত্মাকে শরীর থেকে সম্পূর্ণ রূপে আলাদা করতে হবে।

স মোদতে মোদনীয়ং, এখানে আত্মার দুটো বিশেষণ ব্যবহার করছেন, একটা বিশেষণ হল *অণু* আরেকটি বিশেষণ *মোদনীয়ম্*। *অণু* হল যে জিনিষটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম আর *মোদনীয়ম্* মানে যে জিনিষটা আনন্দ দেয়। *লব্ধ্বা*, ঐ বিশাল খড়ের গাদার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া দেশলাই কাঠিটা যদি পেয়ে গেল তখন একটা ঘর্ষণেই পুরো খড়ের গাদা নিমেষের মধ্যে ভস্ম হয়ে যাবে। আমাদের জীবনে যত আসক্তি, যত ভালোবাসা, যত রাগ দ্বেষ, কাউকে পছন্দ করি কাউকে পছন্দ করি না, কোন বস্তু প্রিয়, কোন বস্তু অপ্রিয়, পুরো জীবনটা যেন একটা খড়ের গাদা। আর এর মধ্যেই আত্মতত্ত্ব একটা ছোট্ট দেশলাই কাঠির মত পড়ে আছে। ঐ খড়ের গাদা থেকে এই আত্মতত্ত্বকে খুঁজে বার করতে থাক, সারা জীবন ধরে খুঁজতে হবে, এই জন্মে যদি না পাওয়া যায়, পরের জন্মেও খুঁজে যেতে হবে। যদি খুঁজে বার করা যায় তখন জন্ম-জন্মান্তরের এই জঞ্জাল নিমেষে সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আবর্জনা পুড়ে যাওয়ার পর সে নিজের স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। প্রথমে অণু, একেবারে সূক্ষ্ম, তাকে খুঁজে যাচ্ছে। পাওয়ার পর কি হচ্ছে? শুধু আনন্দ আর আনন্দ। কারণ আত্মাই তো আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। কিন্তু যে আবর্জনার ভেতর থেকে সে এতদিন বেরোতে পারছিল না, এই আবর্জনাই অন্যের কাছে কত ভালোবাসার জিনিষ, কত আনন্দের বস্তু। রেশমের সুতো দিয়ে আমাদের বেঁধে রাখা হয়েছে, রেশমের এই বন্ধনকে কেউ বন্ধন রূপে দেখে কেউ আবার কোমল স্পর্শ ভেবে সুখের অনুভব পায়। কিন্তু ঐ বন্ধন থেকে যখন মুক্তি পেয়ে যায় তখন যে কী আনন্দ, বলছেন *স মোদতে*, আত্মতত্ত্বকে পেয়ে সে আনন্দ করে। বিভিন্ন প্রকরণাদি গ্রন্থে বর্ণনা করা হয় যে আত্মজ্ঞানের অনুভূতি হওয়াতে সে আনন্দ করে, *স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা*।

আমরা যাঁরা শাস্ত্রের কথা শুনছি আগে কেউ কেউ আমরা মৃত্যুধর্মা ছিলাম, বাড়ি লোকেরা, বাবা-মা ও পরিবেশ আমাদের শিক্ষা দিয়ে এসেছে জীবনে খাওয়া-দাওয়াটাই সব, লেখাপড়া শিখে একটা ভালো চাকরি জোগাড় কর, তারপর একটা বিয়ে করে নাও, স্ত্রী তোমাকেও দেখবে তোমার বাবা-মাকেও দেখবে, এই প্রশিক্ষণেই আমরা সবাই বড় হয়ে এসেছি। কিন্তু একটা সময় চেতনা একটু জাগ্রত হওয়াতে আমি জানতে চাইলাম, এগুলোই কি জীবনের সব কিছু? এর বাইরেও কি কিছু আছে? আমি সব জানতে চাই। এবারে যমরাজ বলছেন, এরপর যা যা তোমাকে বলব, সেটাকে যখন তুমি তোমার স্বভাব রূপে জানবে, ঐ অণু পরিমাণ সূক্ষ্ম জিনিষকে অর্থাৎ মন থেকে যখন আত্মাকে বার করতে সক্ষম হবে তখন সেই আত্মাকে পেয়ে তোমার শুধু আনন্দ আর আনন্দই হবে। আত্মজ্ঞান মানে যে শুধু জাগতিক ত্যাগ, ত্যাগ করে করে মানুষ যে নিজেকে শুকিয়ে ফেলবে তা নয়, আত্মজ্ঞান মানে একটা বৃহৎ আনন্দের অপেক্ষায় মানুষের এগিয়ে যাওয়া।

বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে, ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানরূপ যে প্রাসাদ, সেই প্রাসাদের দরজাকে শুধু একটু *ঠেলার* অপেক্ষা, একটা *ঠেলে* দিলেই খুলে যাবে আর ভেতরে প্রবেশ করে যাবে। হে নচিকেতা! আমি মনে করি নচিকেতা সেই প্রাসাদের দরজার দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে, যে প্রাসাদে ঢুকলেই ব্রহ্মজ্ঞান, আরেকটু সামান্য বাকী আছে। এর আগে আগে বললেন, *শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ*, মানুষ আত্মতত্ত্বের কথা শোনার সুযোগই পায় না। আমরা শান্ত মনে যদি বিচার করে দেখি, আমাদের কিন্তু মনে হবে, যমরাজ এখানে নচিকেতাকে যেভাবে বলছেন *বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে*, আমি মনে করি নচিকেতা সেই বাড়ির দরজার দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে, একটা টোকা মারলেই দরজা খুলে যাবে, আমরাও কিন্তু নচিকেতার মত পৌঁছে গেছি। হয়তো নচিকেতার মত একেবারে দোরগোড়ায় পৌঁছে যাইনি, কিন্তু বাড়িটা এবার দেখা যাচ্ছে। বাকিদের কাছে ঐ বাড়িটা দৃশ্যমানও নয়। কিন্তু আমাদের কাছে দৃশ্যমান, দু পা এগিয়ে গেলেই দরজার কাছে চলে যাব। আরেকটু বিচার করলে দেখা যাবে এখানে যাঁরা শাস্ত্র কথা বা উপনিষদ শুনতে আসছেন তাঁরা কেউই এখন আর জাগতিক সমৃদ্ধি, সাংসারিক সুখের পেছনে পাগলের মত ছুটছেন না, কিছুটা বয়সের জন্যও আবার কিছুটা তাঁদের চিন্তা ভাবনা আর জ্ঞান বিকাশের জন্যও। বেশির ভাগই গুরুর কাছে দীক্ষাদি নিয়ে গুরুর নির্দেশ মত জপ-ধ্যান করছেন, নিয়মিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন, চিন্তন, মনন ও মন্থনও করছেন, এতেই তো

অনেকটা এগিয়ে গেছেন। এরপর শুধু আত্মভাবে চিন্তন করে নেওয়া আর শরীর থেকে উৎক্রমণ, মানে পুরো আবর্জনার মধ্যে যে আসল জিনিষটা হারিয়ে আছে ওটাকে টেনে বার করে নিয়ে আসা।

এই কজন মুষ্টিমেয় ছাড়া বাকি যারা আছে তাদের এ জন্মে তো কিছুই হবে না, কোন জন্মে হবে কিনা তাও কোন নিশ্চয়তা নেই, কারণ এরা সব ডেড ম্যাটার। যে কোন বস্তুর যেমন বাহ্যিক রূপটুকু পাল্টায়, মাটিতে একটা ছোট্ট বীজ ফেলে দিলে কিছু দিন পরে ওখান থেকে গাছ হয়ে ফুল হয়ে যায়, মাটিটাই পাল্টে যাচ্ছে, বাতাস আলো এগুলো পাল্টায় না। ফুলটা খসে পড়ে গেল আবার সে মাটি হয়ে গেল। শুধু রূপ পাল্টাচ্ছে। চারিদিকে দিনরাত যাদের দেখছি তারা শুধু রূপ পাল্টাচ্ছে, রূপ পাল্টানো ছাড়া এদের কিছুই হয় না। সেইজন্য যমরাজ সবাইকে বলে দিলেন মরণধর্মা। কিন্তু যাঁদের কাছে ঐ বাড়িটা দৃশ্যমান হয়ে গেছে তাঁরা আর মরণধর্মা থাকছেন না। যমরাজ নচিকেতাকে যেমন বলছেন, আমি মনে করি নচিকেতা ঐ বাড়ির দরজার কাছে পৌঁছে গেছে, এখন সে শুধু একটা টোকা মেরে বাড়ির ভেতরে অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে ঢুকে যাওয়ার অপেক্ষায়। যাঁরাই এই ব্যাপারে একটু মন দেন – আমি জানতে চাই, সচেতন ভাবে জানার ইচ্ছে জেগেছে, এবার এই ইচ্ছেটাকে উঠেপড়ে কার্যকর করে দিলেই হয়ে যাবে। মনের জগতে তুমি যাকে নিয়ে এসেছ তাকে এবার বাস্তবিক জগতে পাল্টে দিলেই হয়ে যাবে। বাকিরা তো মনের জগতেও কিছু নিয়ে আসতে পারছে না। যারা ঠাকুরকেই মানে না তাদের কাছে ঠাকুরের দর্শন পাওয়ার কথা বলাটাই অবান্তর। যখন কেউ তত্ত্বগত ভাবে বলতে শুরু করল আমি ঠাকুরের দর্শন চাই, এবার সে অনেকটা এগিয়ে গেল। ঠিক তেমনি কেউ যখন সচেতন ভাবে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে শুরু করে দিল, শ্রবণ করতে শুরু করে দিল, শাস্ত্রের কথাকে চিন্তন করতে শুরু করল তখন সে অনেকটাই এগিয়ে গেল। কিন্তু যখন বলতে শুরু করল আমি ঐ জিনিষটাকে পেতে চাই, পাওয়ার জন্য আমাকে যা করতে হবে আমি একটু একটু করে করতে থাকব, তখন তো সে প্রায় নচিকেতার মতই হয়ে গেল। অল্প একটু প্রলোভন যেটুকু আছে, শরীরের ধর্ম অনুযায়ী যতটা আছে এবার যত এগোতে থাকবে সেটাও পুরোপুরি খসে যাবে। তাহলে তো হয়েই গেল, নচিকেতা হয়ত দরজার কাছে চলে গেছে, সে না হয় নচিকেতার একটু পেছনেই আছে। নচিকেতা ইউনিভার্সিটির দরজায় দাঁড়িয়ে আছে আর সে না হয় জিটি রোডে দাঁড়িয়ে আছে, এর বেশি কিছু না। এই যে যমরাজ বলছেন, *বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে*, কঠোপনিষদের এটাই প্রেরণাদায়ক বাণী, এটাই আমাদের কাছে সঞ্জীবনী শক্তি। এই মন্ত্রে একই সাথে বিদ্যার স্তুতি আর শিষ্যের স্তুতি করা হচ্ছে, যা কিনা খুব বিরল দেখা যায়। গুরুর মুখে নিজের প্রশংসা শোনা মানে নচিকেতার এবার ধীরে ধীরে প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু এই কথাকে আক্ষরিক অর্থে নিলে অনেকগুলো প্রশ্ন উঠে আসে যার উত্তর হয় না। পরের মন্ত্রে নচিকেতা বলছেন –

অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তৎ পশ্যসি তদ্বদ।।১/২/১৪।।

(নচিকেতা বললেন, ধর্ম থেকে ভিন্ন, অধর্ম থেকে ভিন্ন, কার্য ও কারণ থেকেও পৃথক এবং ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান ভিন্ন বলে বস্তুকে আপনি প্রত্যক্ষ করছেন, সেটাই আমাকে বলুন।)

নচিকেতা যমরাজকে আবার প্রশ্ন করছেন। নচিকেতার যা বয়স এবং বুদ্ধি তাতে এই ধরণের প্রশ্ন তার পক্ষে করা একটু অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। প্রশ্নে আত্মার ধর্ম বা আত্মার গুণ, যে গুণ দিয়ে আত্মার ধারণা করা যায় তার বর্ণনা করা হয়েছে। নচিকেতা কোথাও এই শব্দগুলো আগে হয়ত কখন শুনেছিল বলে প্রশ্ন করেছে বা মেধাবী হওয়ার জন্য যমরাজের কাছে কিছু কিছু কথা যে ইতিমধ্যে শুনেছে সেখান থেকে একটা ধারণা করে প্রশ্ন করছে। এই দুটোর বাইরে তৃতীয় একটা সম্ভবনাও থাকতে পারে, যে ঋষি কঠোপনিষদকে ছন্দোবদ্ধ করেছেন তিনি আমাদের সুবিধার্থে নচিকেতার মুখ দিয়ে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়েছেন। গীতাতে অর্জুন যখন প্রশ্ন করছেন *স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা*, সেখানেও তখন অন্য বিষয় নিয়ে ভগবান বলছিলেন, মাঝখানে হঠাৎ অর্জুনের প্রশ্ন ঐ জায়গাতে খাপছাড়া মনে হতে পারে। কিন্তু খাপছাড়া নয়। আচার্য শিষ্যকে অনেক কথা বলে যাচ্ছেন সেখানে হঠাৎ শিষ্য কোন প্রশ্ন করলে অবান্তর মনে হয়, কিন্তু সেই প্রশ্নেরও একটা যোগসূত্র থাকে। অর্জুন নিজেও একজন মহাত্মা ছিলেন, অনেক সাধুসঙ্গ করেছেন, শাস্ত্রের কথা শুনেছেন। কিন্তু এখানে নচিকেতা অত্যন্ত কঠিন একটি বিষয়, আত্মার ধর্মকে নিয়ে প্রশ্ন করছেন।

নচিকেতা প্রশ্ন হল, *অন্যত্র ধর্মাৎ*, এই যে আত্মতত্ত্বের কথা বলতে যাচ্ছেন এই আত্মতত্ত্ব ধর্ম সাধন থেকে আলাদা। আচার্য ধর্ম সাধনকে ব্যাখ্যা করছেন *শাস্ত্রীয়াৎ ধর্মানুষ্ঠানাৎ*, যখন শাস্ত্রীয় ধর্মের অনুষ্ঠান হয়, অর্থাৎ শাস্ত্রে যেমন ভাবে যজ্ঞ যাগের অনুষ্ঠান করতে বলা হয়েছে, বিধি-নিষেধের কথা বলা হয়েছে, উপলব্ধি আদির কথা বলা হয়েছে, এর মধ্যে যখনই কোন ধর্ম পালন করা হয় তখন ক্রিয়া, কর্মফল আর সাতটি কারক এই নটি জিনিষ জড়িত থাকে। শুধু ধর্ম সাধনেই নয়, সংসারের যে কোন কাজে এই নটি জিনিষ সব সময় থাকবে। খাওয়ার মত সামান্য কাজেও কারক, ক্রিয়া ও ফল এই নটি অঙ্গ থাকবে। আমি খাচ্ছি, আমি ভাত খাচ্ছি, আমি হাত দিয়ে ভাত খাচ্ছি, আমি থালা থেকে হাত দিয়ে ভাত তুলে খাচ্ছি, এই ভাবে সাতটি কারক সৃষ্টি হয়। খাওয়াটা ক্রিয়া, খাওয়ার জন্য শরীরের পুষ্টি হল, বলবৃদ্ধি হল এটাই ফল। যে কোন ক্রিয়াতে এই নটি জিনিষ জড়িয়ে থাকে, এই নটি ক্রিয়ার বিস্তার। কিন্তু ধর্ম সাধনের সময় অতিরিক্ত দশম একটি এসে যোগ হয়, শাস্ত্র যেমনটি বলেছে তেমনটি করা। অধর্ম পালন যখন হয় তখনও দশম থাকে, সেটা হল শাস্ত্রে যেমনটি বলেছে তার বিপরীত করা, জেনেই করুক আর না জেনেই করুক। এর সাথে কিছু কিছু কার্য আছে যেগুলো লৌকিক কার্য, যে কার্যগুলো শাস্ত্রের কোন ব্যাপার নয়। ভারতের দুর্ভাগ্য যে ভারতে সব কিছুকে শাস্ত্রের মধ্যে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। জলপান করা থেকে শুরু করে হাঁচি দেওয়া পর্যন্ত সব কিছুকেই শাস্ত্র বিধি দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল। হাই তুললে মুখের কাছে আঙুল দিয়ে তুড়ি মারে, হাই তোলাকেও ধর্ম বেঁধে দিয়েছে। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, ভারতের সর্বনাশের মূলে এই অতিরিক্ত বিধি। ইদানিং ভারতে সেই একই সমস্যা চলছে, ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড পড়লে অবাক হয়ে যেতে হয় এই ভেবে যে কত আইন যে ভারতবর্ষে আছে যার কোন শেষ নেই। সেইজন্য আইনকেই কেউ গ্রাহ্য করতে চায় না, ধর্মেও ঠিক তাই হয়, এত বেশি বিধি-নিষেধ করে রেখেছে যে কেউ আর গ্রাহ্যই করতে চাইছে না, ধর্মকেই পুরোপুরি বাদ দিয়ে রেখেছে।

কালীঘাটে ছাগ বলি দিলে ধর্মীয় অনুষ্ঠান, কিন্তু একজন লোককে খুন করলে সেটা অধর্ম। পশুকে বলি দেওয়া ধর্মীয় কাজ আর মানুষ মারা অধর্মীয় কাজ। দুটো কাজেই শাস্ত্র জড়িয়ে আছে। একটাতে বিধি আরেকটাতে নিষেধ। কিন্তু বাকি নটি কারক ও ক্রিয়ার বিস্তার থাকছে। নচিকেতা বলছেন *অন্যত্র ধর্মাৎ*, ধর্মের সাথে আত্মজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই, ধর্ম পালন করে কখনই আত্মজ্ঞান হয় না। ধর্ম আর অধর্ম বুদ্ধির এলাকার জিনিষ। কোন জিনিষকে ভালো বলছি, কোন জিনিষকে মন্দ বলছি, কোন জিনিষকে প্রিয় বলছি, কোন জিনিষকে অপ্রিয় বলছি এর সবটাই মনের এলাকা। ধর্মটাও মনের এলাকা অধর্মও মনের এলাকা। আত্মজ্ঞান মনের এলাকার পুরোপুরি বাইরে, সেইজন্য আত্মজ্ঞান ধর্ম ও অধর্মের বাইরে। মনের সাথে আত্মজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। আত্মজ্ঞান হল স্বাভাবিক চৈতন্য।

ঈশ্বরকে বোঝা খুব সহজ কিন্তু আত্মার ব্যাপারটা বোঝা অত্যন্ত কঠিন। আত্মার ব্যাপারে কাউকে বোঝাতে গেলে যিনি বোঝাবেন তাঁরও ঘাম ছুটে যাবে আর যাকে বোঝান হবে তারও বুঝতে গিয়ে দম বেরিয়ে যাবে, যেটুকু বুঝবে সেটাও ভুলভাল বুঝে নেবে। কিন্তু ঈশ্বরের ব্যাপারে সহজে বুঝিয়ে দেওয়া যায়। কারণ, এই জগতে যাকে সব থেকে ক্ষমতাবান মনে করছি তাকে বৃহৎ করে দিলে ঈশ্বরের ধারণা হয়ে যাবে। যেমন রাজার ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের ব্যাপারে আমাদের স্পষ্ট ধারণা আছে, রাজাকে বৃহৎ রূপে ভাবলে সেটাই ঈশ্বরের অবধারণা হয়ে যাবে। ঈশ্বর সব কিছু দেখছেন। কিভাবে দেখছেন? রাজার কাছে যেমন সব স্পাইরা থাকে ঠিক সেই রকম ভগবানের চররা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেহের ধারণা আমাদের সবারই আছে, ক্ষমতার ধারণাও সবারই আছে, লোকেরা জানে মন্ত্রী হয়, ডিএম হয়, এসপি হয়, এদের ক্ষমতা জানা আছে। এবার যত মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী, ডিএম, এসপি সবার ক্ষমতা একত্র করে সেটাকে কোটি গুণ বাড়িয়ে দিলে ভগবান হয়ে যাবেন। কিন্তু ঈশ্বরের এই ধারণাও সম্পূর্ণ ভুল, ঈশ্বরের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। যতক্ষণ আত্মার ব্যাপার না জানা যায় ততক্ষণ ঈশ্বরের ব্যাপারেও কিছুই জানা যাবে না। আত্মার ব্যাপারেই যদি ধারণা করতে না পারে, ঈশ্বরের ব্যাপারে কি ধারণা করবে! কারণ আত্মাকে যখন মনের আবরণ দিয়ে দেখা হয় তখন তিনি ঈশ্বর। আমরা আসল জিনিষই জানলাম না তার ঢাকনাকে কি করে জানব। সোনা জিনিষটাই জানি না, সোনা দিয়ে কি কি জিনিষ হতে পারে আমি কি করে জানব! সোনা দিয়ে কি কি হয় জানার আগে আমাকে সোনার ব্যাপারে জানতে হবে। আত্মাকেই আমরা ধারণা করতে পারছি না, চৈতন্যকেই বুঝতে পারছি না কিন্তু আমরা ঈশ্বরকে বুঝে ফেলি। আমরা মনে করছি ঈশ্বরের ব্যাপারে আমাদের ধারণা করা সহজ, আসলে আমরা কেউই

ঈশ্বরের ব্যাপারে কিছুই বুঝি না। ক্ষমতা, ঐশ্বর্য এগুলোর ব্যাপারে একটা ধারণা আছে বলে ওগুলোকে বিস্তার করে ঈশ্বরের ব্যাপারে একটা আজব ধারণা করে থাকি।

আমরা মনে করি মনেই সব বোধ হয়। মনে কখনই বোধ হয় না। মনের পেছনে যে চৈতন্য সত্তা আছেন সেই আত্মাই সব কিছু বোধ করছেন। কিন্তু এর আগে বলে দিয়েছেন *গহ্বরেষ্ঠং*, চৈতন্য সত্তার উপর এমন মোটা মোটা চাদর চাপা আছে যার জন্য আমরা আত্মার ব্যাপারে জানতে পারি না, বুঝতে পারি না। যে চৈতন্য সব কিছু বোধ করছেন, বুঝছেন, তিনিই আত্মা। আত্মা যখন ব্যক্তি স্তরে আবৃত থাকেন তখন তাঁকে জীব বলছে আর সমষ্টির স্তরে যখন বিশ্বমনকে ঢেকে রাখেন তখন তাঁকে ঈশ্বর বলছে। আমরা জীব জানলাম না, আত্মা জানলাম না, ঈশ্বরকে কোথা থেকে জেনে যাব! ঈশ্বরের ব্যাপারে আমরা যা কিছু জানি সবই ভুলভাল জানছি। আমাদের কোন সংশয়ই তাই দূর হয় না। মনের জগতে আমাদের শরীর চলছে, সংসার চলছে, আমাদের আশেপাশে সব কিছু চলছে, এই মনের জগতে যেটা আমাদের ভালো লাগে সেটাই *সুখানশয়ী রাগঃ*, কিছু জিনিষ পছন্দের আবার কিছু জিনিষ অপছন্দের। এগুলোকে নিয়মিত করার জন্য মহাপুরুষরা দুচারটে কথা বলে দিয়েছেন, এরকমটি করবে আর এরকমটি করবে না, সেটাই হয়ে গেল ধর্ম আর অধর্ম, যার সাথে আত্মার কোন সম্পর্কই নেই। এটাকেই নচিকেতা বলছেন *অন্যত্র ধর্মা*ৎ।

*অন্যত্র অধর্মা*ৎ, আত্মার সাথে ধর্মের যদি কোন সম্পর্ক না থাকে তাহলে কি অধর্মের সঙ্গে আত্মা যুক্ত? শাস্ত্রীয় বিধির সাথে যেমন আত্মার কোন সম্পর্ক নেই, শাস্ত্রীয় নিষেধের সাথেও আত্মার কোন সম্পর্ক নেই। মূল কথা মনের সাম্রাজ্যে যাবতীয় যা কিছু আছে তার সাথে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই। তাহলে ধর্ম পালন করা কি আবশ্যক? অবশ্যই আবশ্যক, কারণ ধর্ম পালন না করলে মন শুদ্ধ হবে না, যে সূক্ষ্ম মন দিয়ে আত্মার ধারণা করবে ধর্ম পালন না করলে সেই সূক্ষ্ম মনই তৈরী হবে না। অধর্ম যতক্ষণ না ত্যাগ করবে ততক্ষণ মন ধর্মের দিকে যাবে না। ধর্মে যতক্ষণ মন না যাবে ততক্ষণ মন পবিত্র হবে না, স্বচ্ছ আর সূক্ষ্ম হবে না। মন স্বচ্ছ আর সূক্ষ্ম না হলে আত্মতত্ত্বের কথা যতই শ্রবণ করুক না কেন কিছুই ধারণা করতে পারবে না। আত্মতত্ত্বের অতি সূক্ষ্ম কথাগুলোকে যে ধারণা করবে, ধারণা করে যে আত্মস্থ করবে সেই ক্ষমতাই নেই। কারণ এখনও অধর্ম থেকে সরে আসেনি, ধর্ম পালন করেনি বলে কোন কর্মও করেনি।

*অন্যত্র অস্মা*ৎ *কৃত অকৃতা*ৎ, কৃত আর অকৃত গীতাতে ভগবান অন্য অর্থে বলছেন। কৃত আর অকৃত হল কর্তব্য আর অকর্তব্য। আচার্য এখানে কৃতকে বলছেন কার্য আর অকৃতকে বলছেন কারণ। গীতায় ভগবান বলছেন *নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন*, যিনি আত্মজ্ঞানী এই জগতে তাঁর কোন কর্তব্য কর্ম থাকে না, কোন কর্ম না করলেও তাঁর কিছু আসে যায় না। এখানে কৃত আর অকৃত শব্দের অর্থ অন্য অর্থে করেছেন। সেইজন্য বলা হয় ভাষ্য ছাড়া উপনিষদ কখনই বোঝা যায় না, তা নাহলে ভুলভাল অর্থ বেরিয়ে আসবে। একই প্রসঙ্গে গীতায় কৃত ও অকৃত শব্দের অর্থ আলাদা আবার কঠোপনিষদে আলাদা অর্থ। এখানে কৃত মানে কার্য জগৎ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রূপে যে স্থূল জগৎ দেখছি এটাকেই বলছেন কৃত। অকৃত মানে, এই কার্যের পেছনে অর্থাৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পেছনে যে কারণ রয়েছে, সেই কারণকে বলছেন অকৃত, মানে সূক্ষ্ম জগতের কথা বলছেন। স্থূল জগৎ আমরা যা দেখছি এর বাইরে হলেন আত্মা, আর সূক্ষ্ম জগৎ যে এই স্থূল জগতকে চালাচ্ছেন আত্মা তারও পারে। স্থূল জগৎ আর সূক্ষ্ম জগৎ কোন জগতের সাথেই আত্মার কোন সম্পর্ক নেই।

তার সাথে বলছেন *অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ*, এও নয় যে আত্মা অতীতে কখন ছিল বা ভবিষ্যতে আসবে, যেমন একটা গাছের বীজ, অতীতে বীজ ছিল সেখান থেকে গাছ হয়ে গেছে এখন আর বীজ নেই। বা এখন নেই পরে হবে, আত্মা এরকমও কিছু নয়। অতীত আর ভবিষ্যতকে যখন কেটে দেওয়া হল তখন এই অর্থে বর্তমানকেও কেটে দেওয়া হচ্ছে যে, আত্মার সাথে অতীতের যেমন কোন সম্পর্ক নেই, বর্তমানেরও কোন সম্পর্ক নেই, তেমনি ভবিষতের সাথেও কোন সম্পর্ক নেই। এখানে বলতে চাইছেন আমাদের অস্তিত্ব দেশ, কাল আর বস্তুতে আবদ্ধ কিন্তু আত্মা দেশেও আবদ্ধ নয়, কালেও আবদ্ধ নয় আর বস্তুতেও আবদ্ধ নয়। আত্মা স্থূলও নয় কারণও নয়, আগে কখন আত্মা ছিল এখন নেই বা এখন আছে পরে থাকবে না, তাও নয়। তাহলে আত্মা তিন কালেই আছে। না, এই কথাও বলা যায় না। এই জন্যই বলা যায় না, কারণ খুব যুক্তি দিয়ে দেখলে দেখা যাবে আত্মার সাথে কালের কোন সম্পর্কই নেই। তবে আমরা মন্দবুদ্ধি সম্পন্ন, আমাদের জন্য অতীতও

ছিল, বর্তমানও আছে আর ভবিষ্যতও থাকবে। কিন্তু কালের সাথে আত্মার কোন সম্পর্কই নেই। আমরা যেমন বলি তিনটে ঘর বিশিষ্ট একটা বাড়ি, সেই বাড়ির ছাদ তিনটে ঘর জুড়ে রয়েছে। যখন বলছে জিনিষটা গতকাল ছিল আজকে আছে আর কালও থাকবে তখন আমরা ভাবি যে খুব বড় কোন জিনিষের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু আত্মা হল সমুদ্রের মত, সমুদ্রে ঢেউ খেলছে। কিসের ঢেউ খেলছে? ভূত কালের ঢেউ, বর্তমান কালের ঢেউ আর ভবিষ্যত কালের ঢেউ, আর কালাতীতও রয়েছে, অর্থাৎ এর বাইরেও রয়েছে। ভূত, ভবিষ্যত আর বর্তমানের বাইরে কি হয়? যেটা হয় সেটা ধারণা করতে পারবে না। সৃষ্টি যখন হয় সৃষ্টির শুরুতেই জন্ম হয় সময়ের, ঐ সময়ের বাইরেও তিনি। তাহলে কি সেটা অতীত? তাও বলা যাবে না। বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে এই কথাগুলির কিছু কিছু ধারণা করা যাচ্ছে, কিন্তু আগেকার দিনে এগুলোকে ধারণা করাই যেত না।

নচিকেতার মূল প্রশ্ন হল *যৎ তৎ পশ্যসি তদ্বদ*, এই ধরণের যে বস্তু যাকে ধর্ম দিয়ে পাওয়া যায় না, অধর্ম দিয়ে পাওয়া যায় না, যেটা স্থূল নয়, সূক্ষ্ম নয়, যে বস্তু তিন কালের মধ্যে আবদ্ধ নয়, হে যমরাজ! আত্মতত্ত্ব আপনার কাছে তত্ত্ব রূপে কিছু নেই, আপনি সাক্ষাৎ এই আত্মতত্ত্বকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, আপনি যেটা দেখছেন *তদ্বদ*, আমাকে সেটা বলুন। মজার ব্যাপার হল, নচিকেতা যে আত্মতত্ত্বের কথা যমরাজকে বলতে বলছেন, সেই আত্মতত্ত্বকে নচিকেতাই প্রশ্নের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে বলে দিলেন। যমরাজও এবার সেই আত্মতত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে প্রথমে বলছেন –

সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি – ওমিত্যেতৎ।।১/২/১৫।।

(উত্তরে যমরাজ বলছেন 'বেদসমূহ যে ঈপ্সিত বস্তুকে নির্দেশ করেন এবং সর্ববিধ যে তত্ত্ব প্রতিপাদন করে, যে বস্তুর অভিলাষী হয় মানুষ ব্রহ্মচারীর ব্রত পালন করে সেই ঈপ্সিত তত্ত্ব তোমাকে সংক্ষেপে বলছি – তা হল ওম্' ।)

ঠাকুর বলছেন সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী প্রণবে লয় হয়, এই জিনিষটাই এখানে বলছেন। *সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি, আমনন্তি* হয় প্রতিপাদন অর্থে, জিনিষটাকে স্পষ্ট করে বলা। *সর্বে বেদা*, ঋক, সাম, যজু আর অথর্ব, এই চারটে বেদ যেটা প্রতিপাদন করতে চাইছে। এখানে এসে কর্মকাণ্ডী বা পূর্বমীমাংসক আর বেদান্তীদের মধ্যে অশান্তি লাগে। পূর্বমীমাংসকরা এই মন্ত্রকে এক ভাবে ব্যাখ্যা করবেন, বেদান্তীরা আবার অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করেন। আবার এই জায়গা থেকেই বেদান্তের শুরু। কর্মকাণ্ডীরা বলেন যজ্ঞ দিয়ে বেদের সব কিছুই পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে বলছেন তা নয়, বেদ আমাদের একটা বিশেষ জায়গায় নিয়ে যায়, সেই জায়গার সাথে এই সংসারের কোন সম্পর্ক নেই। গীতাদির ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বেদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন বেদ মানে যা দিয়ে ঈশ্বর প্রাপ্তি বা ভগবান লাভ হয়। বস্তুবাদের দিক দিয়ে বেদের কখনই এই অর্থ হবে না। গায়ত্রীমন্ত্রে যেমন ভর্গো শব্দকে ভাষ্যকাররা তিনটি অর্থ করছেন, ভর্গো শব্দের প্রথম অর্থ অন্ন, এটাই ঠিক ঠিক বেদের অর্থ, হে ভগবান! আমাকে প্রচুর অন্ন দাও, সম্পদ দাও। ভর্গো শব্দের দ্বিতীয় অর্থ আলো, সেখানে প্রার্থনা করছেন হে সূর্যদেবতা! আমার পাপ নাশ কর। কিন্তু গায়ত্রীমন্ত্রের ঠিক ঠিক অর্থ বলতে আমরা জানি, আমার ধীকে, আমার মেধাকে তোমার দিকে প্রচোদিত কর, যাতে আমি তোমার দিকে এগোতে পারি। আচার্যও বেদের এই অর্থ করেই বলছেন, বেদ মানে যা দিয়ে পরমাত্মাকে পাওয়া যায়। এখানে এই কথাই বলছেন *সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি*। উপনিষদ মানেও তাই, বেদের যা সাধারণ অর্থ উপনিষদ সেখান থেকে পুরো অন্য দিকে নিয়ে যায়। বেদে পঞ্চাশ রকম জিনিষ থাকতে পারে, কিন্তু বেদ যে মূল কথা বলতে চাইছে সেটা উপনিষদ বলে দিচ্ছে। কথামৃতে ঠাকুরের অনেক রকম কথা আছে, 'আমি লুচি খাব', 'মশলার বেটুয়া নিয়ে আয়', 'আমি বাহ্যে যাব' এই ধরণের অনেক কথা আছে। তার সাথে কিছু কিছু গ্রাম্য কথাও আছে, গ্রাম্য গানও আছে, হাসিঠাট্টা রয়েছে। তাই বলে এই কথাগুলোকে কথামৃতের মূল বক্তব্য রূপে কখনই নেওয়া যাবে না। কথামৃতের একমাত্র তাৎপর্য হল ঈশ্বর দর্শন, ঈশ্বর লাভ। বেদেও পঞ্চাশ রকমের জিনিষ আছে কিন্তু বেদের একমাত্র তাৎপর্য হল পরমাত্মা লাভ, আচার্য বলছেন *যৎ পরমাত্মনং লভ্যতে*, যেটা দিয়ে পরমাত্মাকে পাওয়া যায় সেটাই বেদ। এই মন্ত্রেও তাই বলছেন, *সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি*। বেদে যা কিছু আছে শত্রুকে

কি ভাবে নাশ করতে হবে, কিভাবে রাজ্য পেতে হবে, সন্তান কিভাবে পাওয়া যেতে পারে, প্রচুর অর্থ প্রাপ্তি কিভাবে করা যেতে পারে, এগুলোর কোন দাম নেই।

তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি, যত রকম তপস্যার কথা বলা হয়, সব তপস্যার উদ্দেশ্য হল পরমাত্ম বস্তুকে লাভ করা। *যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি*, এই কটি শব্দ অত্যন্ত মূল্যবান, মানুষ যে জগতের সমস্ত সুখ, আমোদ-আহ্লাদ ছেড়ে দিয়ে ব্রহ্মচারী হয়ে যেতে পারে ভাবলেই অবাক হয়ে যেতে হয়। আগেকার দিনে শিষ্য বা ছাত্রকে গুরুগৃহে বাস করতে হত। গুরুগৃহে বাস মানে, সাত বছর হতে না হতেই গুরুগৃহে চলে আসতে হত। মা-বাবার আদর, স্নেহকে ছেড়ে দিয়েছে, মাসি, পিসি, ঠাকুরমা, দিদিমার ভালোবাসা ছেড়ে দিয়েছে, বাড়ির ভালো-মন্দ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে যে আমোদ-আহ্লাদ সব ছেড়ে গুরুগৃহে বাস করতে চলে এসেছে। কেন? একটা কিছু পাওয়ার জন্য। সেই জিনিষটা কি?

যমুনার তীরে এক সাধু থাকতেন। এক নাপিত শুনতে পেল যে এই সাধুর কাছে গেলে অনেক কিছু পাওয়া যায়। এই আশায় সে সাধুর কাছে গিয়ে বলছে 'বাবা! আমাকে কিছু দিন যাতে আমার জীবনে শান্তি আনন্দ আসে'। সাধু তাকে নদীর একটা দিকে নির্দেশ করে বলছেন 'অনেক দিন আগে আমাকে একজন একটা পরশমণি দিয়েছিল, সেই পরশমণি তো আমার কোন কাজে আসবে না তাই ওখানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। ওখানে গিয়ে খুঁজে দেখ পেয়ে যাবে'। নাপিত গিয়ে একটু খুঁজতেই পরশমণিটা পেয়ে গেছে। নাপিত বাক্স খুলে নড়ুন, কাঁচিতে ঠেকাতেই সব সোনা হয়ে গেছে। নাপিতের আনন্দের আর শেষ নেই। হঠাৎ নাপিতের চেতনা এল। সাধুর কাছে গিয়ে বলছে 'প্রভু! আপনি কী এমন বস্তু লাভ করেছেন যার জন্য এই পরশমণিকেও ফেলে দিয়েছেন। দুটো টাকার জন্য মানুষ কত কি করছে, আর আপনার কাছে পরশমণি থাকতেও তাকে ফেলে দিলেন। এই পরশমণি থেকেও কোন অমূল্য ধন নিশ্চয় আপনি পেয়েছেন তবেই তো আপনি পরশমণিকে ছেড়ে দিতে পেরেছেন'। পুরো জগৎ কামিনী-কাঞ্চনের পেছনে ছুটছে। সৎ ভাবেই হোক আর অসৎ ভাবেই হোক এই দুটি পাওয়ার জন্য মানুষ পাগলের মত ছুটে চলেছে। কামিনী-কাঞ্চন যদি জীবনে পাওয়ার না থাকে তখন আলস্য এসে ধরে আর তা নাহলে এদিক ওদিক লাফিয়ে বেড়াতে থাকে। এই তিন ধরণের মানুষই আছে। তিড়িং বিড়িং করে চারিদিকে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, কামিনী-কাঞ্চনের পেছনে দৌড়াচ্ছে আর তা নাহলে আলস্যে বলদের মত নেতিয়ে পড়ে থাকে, এই তিন শ্রেনীর বাইরে চতুর্থ আর কোন শ্রেনী পাওয়া যাবে না। ব্রহ্মচারী এই তিনটেরই বাইরে চলে গেছে, না আছে তার মধ্যে আলস্য, না আছে তার মধ্যে ছটফটানি আর না আছে কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি কোন স্পৃহা। 'হে ব্রহ্মচারী! তুমি কি কর'? 'আমি গুরুগৃহে বাস করি'। 'গুরুগৃহে তোমাকে কি করতে হয়'? 'কিছুই বিশেষ করতে হয় না, গুরুর একটু সেবা করি, জঙ্গল থেকে কাঠ নিয়ে আসি আর ভিক্ষা করে দু মুঠো চাল নিয়ে আসি'। 'তা ভাই তুমি কি নপুংসক'? 'আমি কেন নপুংসক হতে যাব'! 'তোমার বাড়িতে কি খাওয়া-পড়ার কোন ব্যবস্থা নেই'? 'সবই আছে'। 'তাহলে তুমি কেন এখানে পড়ে আছ'? 'ব্রহ্মচারী কেন গুরুগৃহে পড়ে থাকে তুমি কী করে বুঝবে! বিষয়াসক্ত মন যাদের, কামিনী-কাঞ্চনে যারা ডুবে আছে তারা কোন ধারণাই করতে পারবে না ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে কেন সেই ছোটবেলা থেকে বছরের পর বছর পড়ে থাকে'।

জয়রামবাটীর একটি ঘটনা। একটি যুবক এসেছে, দেখতে সুন্দর, কী সুন্দর গান করে! আগামীকাল মায়ের কাছ থেকে গেরুয়া নিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে কাশী চলে যাবে। সেখানে রাধু, মাকু, নলিনীদিরা সবাই ছিল, তারা বলছে 'এই বয়স, সুপুরুষ আর একে কিনা মা সন্ন্যাসী করে দিচ্ছেন, কাল ঘরবাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাবে'। শ্রীমা শুনে প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট হয়ে বলছেন 'বিষয়াসক্তে তোদের মনটা নিকৃষ্ট হয়ে গেছে তোরা এর বাইরে আর কিছু চিন্তা করতে পারিস না'। একবার কেউ ভাবছে না, এমন কি জিনিষ আছে যেটা পাওয়ার জন্য মানুষ সব কিছু ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। শ্রীমা নলিনীদিকে আরেক দিন বলছেন 'এই জন্মটা দিয়ে কিনে নিয়ে যেতে পারতিস'। মানুষ কোন দামী জিনিষকে টাকা দিয়ে কেনে আর অদামী জিনিষকে খেলো মনে করে অবহেলা করে। নলিনীদি, মাকু, রাধু, পাগলীমামী সবাই মায়ের বংশে জন্ম নিয়েছে, ঠাকুরের ভাবধারায় বড় হচ্ছে, স্বামীজী, ঠাকুরের পার্ষদ সবাইকে দেখছে, সারদানন্দজী মহারাজ সব সময় সঙ্গে সঙ্গে থাকছেন, অথচ সবাই কী প্রচণ্ড ঘোর সংসারী, কী বিষয়ী! কেউ টেনশানে, কেউ ডিপ্রেশানে কেউ পাগলামীতে ভুগে যাচ্ছে, মা

বলছেন এই জন্মটা দিয়ে কিনে নিয়ে যেতে পারতিস। আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের সব শ্রেষ্ঠ উচ্চ দিকপালরা তখন শ্রীমার পাশে ওঠাবসা করছেন। লোকে টাকা দিয়ে, নিজের প্রাণ দিয়ে এমন সুযোগ পায় না। হিন্দীতে একটা খুব সুন্দর দোঁহা আছে যার অর্থ হল মলয়গিরিতে শুধু চন্দন কাঠই হয়, সেখানকার জংলী আদিবাসীরা চন্দন কাঠ জ্বালিয়েই রান্নাবান্না করে। খুব মূল্যবান জিনিষ সব সময় কাছে থাকলে সেই জিনিষের মূল্য আমরা বুঝতে পারি না। কোন মহৎ লোকের খুব কাছে যারা থাকে তারা সেই লোকের মহত্বকে বুঝতে পারে না। মায়ের যারা কাছের লোক তারা কোন দিন মায়ের মূল্য বুঝতে পারল না, ঠাকুরের পরিবারের লোকরা কোন দিন ঠাকুরকে চিনতে পারল না। মা কারুর জ্যাঠিমা, কারুর খুড়ী, কারুর পিসি এরা কেউই মাকে একবারও বুঝবার চেষ্টা করল না, মায়ের মধ্যে কী এমন আছে, যাঁকে দেখার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে লোক ছুটে আসছে! মায়ের ছোট ভাই অভয়ই একমাত্র মাকে একটু শ্রদ্ধা করত। অভয়ের কথা শুনে স্বামীজীও অবাক হয়ে বলছেন মায়ের বংশে এই রকম লোকও থাকতে পারে, পড়াশোনা করা, বিচার-বুদ্ধি আছে! বংশে যদি কোন মহাপুরুষ আসেন, তিনি যে মহাপুরুষ, আমি যে তাঁর বংশে জন্ম নিয়েছি, এই বোধ আসার জন্য একটা বুদ্ধির দরকার। বেলুড় মঠের আশেপাশে কয়েক লক্ষ লোক বাস করে, তারা কি কেউ কখন ভাবে এই বেলুড় মঠটা কি জিনিষ একটু বোঝার চেষ্টা করে দেখা যাক, এরা কারা যারা এত পড়াশোনা করে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন, দেশ বিদেশ থেকে কত লোক এখানে ছুটে আসছে, বিখ্যাত লোকরা আসছেন। কাদের কাছে আসছেন? যাঁরা কাঙালী ভিখারী। সন্ন্যাসীর কাছে কিছুই নেই, না আছে অর্থ, না আছে কোন ক্ষমতা কিন্তু পিএম, সিএম থেকে শুরু করে সবাই তাঁদের কাছে দৌড়ে আসছে। কেউ একবারও খোঁজ নিয়েও দেখে না কেন তাঁরা এভাবে ছুটে আসছেন এই কাঙালী ভিখারীদের কাছে! একবার যদি মাথায় আসে তখন তাঁরা জানতে চাইবেন, *যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি*, কিসের আশায় তুমি এই জগতের সমস্ত রকম সুখ আহ্লাদ ছেড়ে দিয়েছ? কিছু তো একটা রহস্য আছে, কিছু না পেয়ে থাকতে পার কিন্তু কিছু তো ব্যাপার আছে। কি রহস্য থাকতে পারে যে যার জন্য সে তার বাবা-মা পরিবার সব ছেড়ে দিয়েছে, নিরাপত্তা ছেড়ে দিয়েছে, কোন কিছু থেকে যে তৃপ্তি পাবে সেটাও ছেড়ে দিয়েছে, আলস্য ছেড়ে দিয়েছে, কর্ম না করার প্রবণতা ছেড়ে দিয়েছে, কর্মপ্রবণতা ছেড়ে দিয়েছে, মানুষ জীবন চালাতে যে সম্বলকে অবলম্বন করে থাকে, সব সম্বলকে ছেড়ে এখানে এসে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে। খাওয়া-দাওয়া? যা পাবে, যা দেবে তার বাইরে আর কিছু খেতে পারবে না। আমোদ-আহ্লাদ, মনোরঞ্জন বলে কিছু নেই। কেন এই পথ বেছে নিলেন! তখনই এই প্রশ্ন আসে *যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি*, বেদ না হয় বুঝি না, তপস্যার কোন ধারণা না থাকতে পারে কিন্তু *ব্রহ্মচর্যং চরন্তি*, এ তো চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে। কিছু তো পাচ্ছে। তখন যমরাজ বলছেন, নচিকেতা! তোমাকে খুব সংক্ষেপে বলছি জিনিষটা কি, বেদ যার কথা বলছে, তপস্যা যেখানে নিয়ে যাচ্ছে, যার জন্য মানুষ সব কিছু ত্যাগ করে দেয় সেটা হল – *তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি – ওমিত্যেতৎ*। সংগ্রহ মানে খুব সংক্ষেপে, সংক্ষেপে হল *ওম্ ইতি এতৎ*। বেদের তাৎপর্য ওম্, তপস্যার তাৎপর্য ওম্ আর সব কিছু ত্যাগের তাৎপর্য ওম্, জপ-ধ্যানের তাৎপর্য ওম্, যাবতীয় কর্ম করার তাৎপর্য ওম্। ওম্‌কে এখানে পরমাত্মার বাচক রূপে বলছেন। ওম্‌ই পরমাত্মা। তার মানে ওম্ মানে ওঙ্কার নয়, এখানে বলছেন পরমাত্মা। খ্রীশ্চানরা কেন সেন্টস হয়ে যান? মুসলমানরা কেন দরবেশ হয়ে যান? পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করার জন্য। এখানে পরমাত্মা শব্দ ব্যবহার না করে ওম্ বলছেন।

সাধারণ মানুষের পক্ষে উপনিষদ একেই অত্যন্ত কঠিন শাস্ত্র, তার মধ্যে কঠোপনিষদ আবার আরও কঠিন। যিনি বলছেন অনেকবার কঠোপনিষদ পড়ার চেষ্টা করেছি কিন্তু কিছুই মাথায় ঢুকছে না, তাহলে বুঝতে হবে তাঁর বুদ্ধি আছে। বুদ্ধি যাদের কম তারা একবার দুবার পড়েই মনে করে কঠোপনিষদের সব বুঝে ফেলেছি। কিন্তু একটু একটু করে বুদ্ধি যখন খুলতে শুরু করে তখন বোঝা যায় কঠোপনিষদের অর্থ বোঝা কত কঠিন। যে বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারবে যে আমি বুঝতে পারছি না, এই বুদ্ধিটাও মানুষের থাকে না। প্রথমবার যাঁরা কঠোপনিষদ শ্রবণ করেন তাদের কাছে খুব কঠিন মনে হবে। কিন্তু তাও শুনে যেতে হবে। প্রথমে কর্ণ শুদ্ধি হবে, শুনতে শুনতে মনের শুদ্ধি হবে তারপর মন্ত্রগুলি একটু একটু ভেতর বসতে শুরু করবে। যাঁরা দীর্ঘ দিন পবিত্র জীবন যাপন করে যাচ্ছেন, যাঁদের বুদ্ধি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়ে গেছে, এরপর যে আচার্যের মুখ থেকে কঠোপনিষদের মন্ত্রের ব্যাখ্যা শ্রবণ করবেন তাঁকেও খুব উচ্চমানের হতে হবে, তবে গিয়ে কঠোপনিষদের ভাবগুলি ঠিক ঠিক মনের মধ্যে বসবে।

প্রথমে বলছেন *সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি*, বেদ যাঁর স্তুতি করছেন, বেদের সার যা। পরের লাইনে বলছেন *তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি*, যাঁকে প্রাপ্ত করার জন্য মানুষ তপস্যা করে যাচ্ছে। গঙ্গাসাগর মেলায় বা অন্যান্য তীর্থস্থানে অনেক সাধু কাঁটার উপর বা পেরেকের উপর শুয়ে থাকেন, সবাই মনে করে সাধুরা কী কঠোর তপস্যা করছেন। কিন্তু তপস্যা করলেই তো হবে না। কি উদ্দেশ্যে মানুষ তপস্যা করছে, কেন নিজেকে কষ্ট দিচ্ছে? উদ্দেশ্য হল পরম যিনি তাঁকে পাওয়া। আর বলছেন *যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি*, মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে ব্রহ্মচারী হয়ে গুরুগৃহে বাস করে। ব্রহ্মচারী মানে ঘরবাড়ি ত্যাগ করে, সব সুখ বিসর্জন দিয়ে অন্য ধরণের জীবনচর্চাকে বেছে নেওয়া। ব্রহ্মচারী মানে যে শুধু বিবাহ করবে না তা নয়, সব ধরণের সুখ সে ছেড়ে দিয়েছে। গুরুগৃহে ভালোমন্দ খাওয়া-পড়া, আমোদ-আহ্লাদ করা, কোনটাই নেই। ভারতীয় পরম্পরাতে আচার্যই শিষ্যদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। গুরুর যতটুকু জমি-জায়গা থাকত সেটুকুতে যা চাষবাশ হত তাই দিয়ে সবার গ্রাসাচ্ছন করতে হত। শিষ্যদের থেকে কোন অর্থও নেওয়া হত না। ভিক্ষা করতে হত, গুরু কখন বিদ্যার্থীদের নিয়ে রাজা বা জমিদারের কাছে গিয়ে শাস্ত্রের বচন শোনাতেন, তাতে রাজা খুশী হয়ে কিছু দক্ষিণা দিতেন, এভাবেই তাঁদের জীবননির্বাহ চলত। আচার্যরাও শিষ্যদের সন্তানের মতই দেখতেন। নিজের বাড়িতে সব রকম সুখের উপকরণ আছে, তবুও সব ছেড়ে কষ্টকর জীবন বেছে নিত। রাজা রামচন্দ্র গুরু বশিষ্ঠের কাছে শিক্ষা নিতে যেতেন, বিশ্বামিত্রের সাথে বেরিয়ে গেলেন, শ্রীকৃষ্ণ রাজসুখ পরিত্যাগ করে সন্দিপনী মুনির আশ্রমে চলে গেলেন। কিসের জন্য এই ত্যাগ? যখন ত্যাগ করা হয় তখন সেই ত্যাগের পেছনে কিছু পাওয়ার আশা থাকে। মায়েরা কত উপোস করে, কত লোক একাদশীর ব্রত করছে, কিন্তু কেন করছে জানে না। শাশুড়ি শিখিয়ে দিয়েছে, মায়েরাও উপোস করে যাচ্ছে। এই উপোসে কোন ফল হয় না। ফল তখনই হবে, যে উদ্দেশ্যে ত্যাগ-তপস্যা করছে সেই উদ্দেশ্য যদি স্পষ্ট থাকে। সেই উদ্দেশ্যও আবার আভ্যন্তরীন হতে হবে।

বিদেশীরা এক সময় মূল্যবোধের উপর অনেক লেখালেখি করত। সেখানে একটা তত্ত্বকে তাঁরা দাঁড় করালেন, Values for value's sake। আমি সত্য কথা কেন বলব, কারণ আমি সত্য কথা বলতে চাইছি। আমি কেন চুরি করব না, কারণ আমি সেই রকম হতে চাইছি। স্বামীজী এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে বলছেন, কখনই এই রকম হতে পারে না। মূল্যবোধ, চরিত্র গঠন এগুলোও একটা ত্যাগ। কেউ যখন চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছে, সে বলছে আমি ঘুষ নেব না, আমি অপরের স্ত্রীর দিকে তাকাব না। আপনি চাকরি করছেন কিছু টাকা পাওয়ার জন্য, সেই টাকার বাইরে যদি ঘুষ পাওয়া যায় আপনি ছাড়বেন কেন! দশ হাজার মাইনের চাকরি করছেন, সেখানে মাসে পঞ্চাশ হাজার ঘুষ পাওয়া যাচ্ছে, আপনি ছাড়বেন কেন! আপনি মুর্খ তাই ছাড়তে চাইছেন। কেউ যদি বলে values for value's sake, আমি সৎ তাই আমি সততার অনুশীলন করছি, এর মত মুর্খ কেউ আছে! সেইজন্য দেখা গেল, যে দর্শন এই ধরণের মূল্যবোধ, চরিত্র গঠনের শিক্ষা দেয় সেই দর্শন দাঁড়াতে পারল না। বিদেশে মূল্যবোধের অনুশীলন করতে গিয়ে বলে মেয়েরা সৎ হবে, মেয়েরা পর পুরুষের দিকে তাকাবে না। এরপর সে যদি প্রশ্ন করে কেন তাকাব না? তাকে কি উত্তর দেওয়া হবে? ভারতেই দিল্লী, বোম্বের মত হায়ার সোসাইটিতে মেয়েরা এখন কোন কিছুই কেয়ার করে না, যা খুশী তাই করছে। তারা কি ভুল কিছু করছে? কোন ভুল করছে না। তার কারণ আপনি যখন বলছেন মূল্যবোধ মূল্যবোধের জন্য, চরিত্র চরিত্রের জন্য, তখন তারা বলে দিচ্ছে আমার মূল্যবোধের দরকার নেই, আমার চরিত্রেরও কোন দরকার নেই। কিন্তু আমরা যদি দেখি মূল্যবোধ মানে আরেকটা কিছুকে পাওয়ার জন্য, চরিত্র গঠন মানে আরেকটা কিছুকে পাওয়ার জন্য, মানুষের সামনে যদি একটা বৃহৎ উদ্দেশ্য থাকে, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এর কোন একটি, একটা আদর্শ প্রাপ্তির উদ্দেশ্য থাকে, তখন মূল্য সেই উদ্দেশ্যের জন্য দেওয়া হয়। মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কখনই উদ্দেশ্য হতে পারে না, ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কখনই কারুর উদ্দেশ্য হতে পারে না। ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হওয়া মানে সেই ত্যাগের দ্বারা সে আরেকটা কিছু পেতে চাইছে। বেশি টাকা দিয়ে কেউ সস্তার জিনিষ নিয়ে আসে না। আমার হাতে হাজার টাকা আছে, সেই টাকাকে আমি কখন ফেলে দেব? পনেরশ টাকার জিনিষ যদি পেয়ে যাই তখন হাজার টাকাটা হাতে থেকে ফেলে দেব। মানুষ যে ত্যাগ করে, মানুষ যে তপস্যা করে, আরও বড় কিছু পাওয়ার জন্যই করে। এই যে তপস্যা করার কথা বলা হচ্ছে, ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য সে ঘরবাড়ি, আমোদ-আহ্লাদ, সুখ ভোগ ছেড়ে দিচ্ছে, কিসের জন্য? যমরাজ বলছে, খুব সংক্ষেপে তোমাকে বলছি *ওমিত্যেতৎ*। পরে বিস্তারিত ভাবে বলবেন, কিন্তু এখানে খুব সংক্ষেপে বলে দিলেন। এই

ওম্‌কে পাওয়ার জন্য মানুষ তপস্যা করে, ব্রহ্মচর্য পালন করে। যদি ওম্‌কে পাওয়ার উদ্দেশ্য না থাকে তাহলে বেদ ও অন্যান যত শাস্ত্র আমরা অধ্যয়ন করছি, এই অধ্যয়নের কোন দাম নেই, তপস্যা যা কিছু করছে, তারও কোন দাম নেই, চরিত্র পালন করছে, তারও কোন দাম নেই। এই যে বলা হয় সৎ হও, চরিত্রবান হও, কেন সৎ হবে, চরিত্রবান হতে হবে কেউ জানে না।

মানুষ যে চরিত্র গঠনের চেষ্টা করবে, ব্রহ্মচর্যের অনুশীলন, গুরুগৃহে বাস, ত্যাগের অনুশীলন করবে, এর পেছনে একটা মহৎ উদ্দেশ্য থাকতে হয়। কিন্তু পরম্পরাতে আমাদের বলে দেওয়া হয়েছে একাদশী ব্রত করতে হয়, শিবরাত্রির উপোস করতে হয়, সবাই তাই করে যাচ্ছে। কিন্তু কেন করছে, কেন করছে না, এর কোন কিছুই তাদের জানা নেই, যার জন্য এগুলো কোন ফলও দেয় না। জীবনের বৃহৎ উদ্দেশ্য ওম্ প্রাপ্তি, সেই ওম্ প্রাপ্তিতে এরা সাহায্য করে। এরা মানে কারা? অধ্যয়ন, ত্যাগ, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য। আমাদের কোন বৃহৎ উদ্দেশ্যই নেই। তাহলে এগুলো করে লাভটা কি? কিছুই লাভ নেই। নৌকার নোঙর ফেলে সারা রাত হাল টেনে যাচ্ছে। ভোরবেলা দেখছে নৌকা যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। এটাই আমাদের প্রধান সমস্যা। যে সমস্যা আগে বিদেশে ছিল, বিদেশে তাও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ বরাবরই ছিল, সেই সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে তারা মূল্যবোধ, চরিত্র গঠন এগুলোর অনুশীলন করত। ভারতবর্ষে কিছুই নেই, ছিল একমাত্র ধর্ম, সেই ধর্মকেও ভারত ছেড়ে দিয়েছে। ধর্ম পালন করাটা এখন বিদ্রুপের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাকি কোন কিছুই ভারতে দাঁড়াতে পারছে না। বাড়ির ছেলেদের যদি বলা হয় তোমরা চরিত্রবান হও, তারা বলবে আমার চরিত্রবান হয়ে কী হবে? আপনার কাছে এর কোন উত্তর নেই। কারণ কোন দিন এর উত্তর ছিল না। উত্তর আছে যদি বৃহৎ কোন কিছুকে এদের জীবনের সামনে দিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু এই বৃহতের জন্য প্রথম থেকে তাকে প্রস্তুতি দিতে হয়। ভারতবর্ষে প্রস্তুতি করাটাও উঠে গেছে। জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ, এই উদ্দেশ্যকে আমরা ফেলে দিয়েছি। তারপরেও বলে যাচ্ছি তোমরা সচ্চরিত্রের হও। সচ্চরিত্র তো হওয়া দূরের কথা, যে যেখানে যা পারছে করে যাচ্ছে। শীলহানি, খুন, ডাকাতি, ছিনতাই হয়েই চলেছে, উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সবাই ঘুষ নিচ্ছে আর এক অপরকে বলে যাচ্ছে তোমার সৎ হও, ভালো হও। জীবনের দর্শনটা কি তাই কেউ জানে না, যারা জানে তারাও এই দর্শনকে এখন কোথাও দাঁড় করাতে পারছে না। এটাই এখানে বলছেন, সব কিছুর মূলে একটাই উদ্দেশ্য, খুব সংক্ষপে তা হল *ওমিত্যেতৎ*।

সৃষ্টিতে যা কিছু আছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু ভাব, শব্দ আর বস্তু এই তিনটি স্তরে থাকে। এই তিনটির মধ্যে বস্তু রূপে সব দেশ, কাল আর পাত্রে আবদ্ধ হয়ে আছে। যেমন গ্লাশ, গ্লাশ একটা দেশে আছে, একটা কালে আছে আর একটা বস্তুর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। গ্লাশ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাই এর একটি নাম গ্লাশ। গ্লাশ এই শব্দেরও পেছনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ আছে, তাকে বলছেন ভাব। আগেকার দিনে সংস্কৃতে বস্তুর পেছনের ভাব আর বস্তুর নাম দুটোকেই তাঁরা শব্দ রূপে দেখতেন। শব্দের দুটো রূপ, একটি অনুচ্চারিত রূপ আরেকটি উচ্চারিত রূপ, অনুচ্চারিত রূপটাই ভাব আর উচ্চারিত রূপ হল তার নাম। যেমন একজন এসে বলল, এখানে পুলিশ আসছে। শোনার পর আমার মনে একটা ভাব তৈরী হল পুলিশ আসছে। ঐ ভাবটা শব্দে পরিণত হয়ে আমি মুখ দিয়ে কাউকে বললাম। মুখ দিয়ে যদি নাও বলি ভেতরে ভেতরে একটা শব্দ হতে থাকবে। তারপর দেখছি সত্যিই পুলিশ আসছে। এই ব্যাপারটাই স্থূল থেকে সূক্ষ্ম আর সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়। তার মানে, ভাব, শব্দ ও বস্তু তিনটে কোথাও মিলে এক হয়ে যায়। কারণ বস্তু রূপে সব কিছু আলাদা দেখছি আমি আলাদা, আপনি আলাদা, তার মধ্যে এ মেয়ে সে পুরুষ, বস্তুর মধ্যে কোনটা জড় আবার কোনটা চেতন। সব কিছুর সাথে নানান রকমের তফাৎ পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন যেমন আলাদা আলাদা বস্তু তেমন তেমন তাদের নামও আলাদা আলাদা। আলাদা আলাদা নামের যত শব্দ আছে, সব শব্দ গুলো আরও সূক্ষ্ম হয়ে একটি ভাব বা আইডিয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল, এই ভাবটাই অনুচ্চারিত। এই জায়গাতে সব নাম অনুচ্চারিতের মধ্যে চলে এল, এরপর সব জিনিষটা একটা ভাব নিয়ে একটি শব্দের মধ্যে দাঁড়িয়ে যায়। অনুচ্চারিত হলেও দুটো বস্তুর ভাব কিন্তু সব সময় আলাদা হবে। চকের ভাব আর পেনের ভাব আলাদা। এই ভাবটাই অত্যন্ত সূক্ষ্ম। এই ভাবগুলো নানান রকম শাখা প্রশাখাতে বিস্তার হওয়ার আগে একটা জায়গায় গিয়ে একটা শব্দে দাঁড়িয়ে থাকে, যেখান থেকে টুকরো টুকরো হয়ে আবার অনেক হয়ে যায়। সব ভাব যেখানে এক হয়ে থাকে, দর্শনের পরিভাষায় তার নাম স্ফোট। স্ফোট হল সেই অবস্থা যেখানে বস্তুর কোন বৈচিত্র্যকরণ হয়নি বা বলা

যেতে পারে বহুতে বিভাজন হয়নি। এই স্ফোটেরই আরেকটি নাম ওঁ। তাহলে ওঁ হল, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি ধ্বণি, সমষ্টি বিচার। যেখানে কোন ধরণের বিভাজন হয়নি সেই অবস্থাকে বলে ওঁ। এর বিভাজন যখন হয় তখন অনেকগুলি ভাবে বিভাজিত হয়, তারপর সেই ভাব থেকে অনেকগুলো শব্দে বিভাজিত হয় আর সমস্ত শব্দ থেকে বস্তুতে বিভাজিত হয়। আমাদের মন সব সময় বহির্মুখী হওয়াতে আমরা শব্দ আর বস্তুর মধ্যে যে সম্বন্ধ, এই সম্বন্ধকে দাঁড় করাতে পারি না, আর বললেও বুঝতে পারি না। ঋষিরা দেখেন শব্দও যা বস্তুও তাই, নামও যা নামীও তাই। ঠাকুরও বলছেন নাম আর নামী অভেদ। শ্রীকৃষ্ণ বলাও যা আর শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলাও তাই কোন তফাৎ নেই। তাহলে কেউ প্রশ্ন করতে পারে, ডাল-ভাতের চিন্তা করলে কি আমার পেট ভরে যাবে? হ্যাঁ ডাল-ভাতের চিন্তা করলেও পেট ভরে যাবে, কিন্তু যদি আপনি সেই অবস্থায় যান, যে অবস্থায় গিয়ে বস্তু আর শব্দ এক হয়ে যায় তখন কিন্তু পেট ভরে যাবে। এগুলো নিয়ে আবার মজার মজার কাহিনী আছে।

সোমশর্মা নামে এক ভিখারী ছিল। ভিক্ষা করে আটা, ছাতু যা পেত সেখান থেকে সামান্য যা উদ্বৃত্ত হত সেটাকে একটা হাড়ির মধ্যে রেখে দিত। একদিন সোমশর্মা শুয়ে শুয়ে ভাবছে, হাড়িটা ছাতুতে অনেকটা ভরে গেছে, কিছু দিন পর পুরোটাই ভরে যাবে। হাড়িটা ভরে গেলে সেই ছাতু বিক্রী করব, বিক্রী করার পর কটি টাকা হবে, সেই টাকা দিয়ে আমি একটা ব্যবসা শুরু করব। ব্যবসা করে আমার আরও অনেক টাকা হবে, সেই টাকাকে ব্যবসায় লাগিয়ে আরও অনেক টাকা যখন হয়ে যাবে তখন আমি একটা ভালো বাড়ি বানাব, এক সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করব, আমার তিন চারটে বাচ্চা হবে, বাচ্চাগুলো দুষ্টুমি করবে। তখন আমি স্ত্রীকে বলব, তুমি বাচ্চাগুলোকে সামলাতে পারছ না, দেখছ না ওরা চেঁচামেচি করছে, এই দেখ আমি কি করে ওদের শান্ত করছি। এই ভেবে হাতের ডাণ্ডাটা এমন ভাবে চালিয়েছে যে হাড়িটা গেল ভেঙে আর সব ছাতু সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। ওখানেই সব কাহিনী শেষ। তাহলে এতক্ষণ সোমশর্মার কী হচ্ছিল? আমরাও সারাটা দিন বসে বসে সোমশর্মার মতই করে যাচ্ছি। বাইরে জগৎ বলে কিছু নেই, সবটাই আমাদের মনের মধ্যে। আমাদের মনের আবেগগুলো বহির্জগতে ততটা প্রকাশ পায় না, যতটা অন্তর্জগতে প্রকাশ পায়। বহির্জগৎ থেকে অন্তর্জগতে সুখের অনুভব অনেক বেশি। বিয়ে বাড়িতে যাওয়ার আগে ভাবছে আজ ওখানে খুব ভালো খাওয়া-দাওয়া হবে, ভেবে ভেবে যা আনন্দ আসল খাওয়াতে কখনই সে আনন্দের অনুভব হবে না। সেইজন্য কল্পনার জগতে যারা বেশি বিচরণ করে তাদের ঐ কল্পনা বাস্তবের সাথে কখনই মেলে না। চিন্তার জগতেই তার সন্তুষ্টি হয়ে যায়, বাস্তব জগতে এসে সন্তুষ্টি হয় না বলেই জীবনে যত অশান্তি লেগে থাকে। ব্যবহারিক জীবন চালাতে কল্পনার জগৎ কখনই ভালো নয়। কল্পনার জগতে সন্তুষ্টি, আনন্দ অনেক বেশি, ব্যবহারিক জীবনে সেই আনন্দ বা তুষ্টি হয় না। তার উপর আবার শরীরের ধর্ম আছে, খাওয়া-দাওয়া করলে শরীর পুষ্টি পায়। কিন্তু যোগীরা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর না খেয়েই থেকে যান, চিন্তা করলেই তাঁদের সব কিছু হয়ে যায়। ইদানিং এ্যথলেটিকে যারা দৌড়বীর, তারা মনে মনে অনুশীলন করে যে আমি দৌড়াচ্ছি, তাতেই তাদের পেশী মজবুত হয়ে যায়। কারণ মন থেকেই সব কিছু হয়। এগুলো অবশ্য আলাদা বিষয়।

মূল জিনিষ হল বহির্জগতের বস্তুর যা নাম সেই বস্তুও তাই, যেমন আম, আম এই নাম যা আম জিনিষটাও তাই, তার সাথে আমের যে বিচার সেটাও তাই। ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করেন তখন তিনি চিন্তা করেন। ঈশ্বর যখন বলছেন সৃষ্টি হোক তখন তাঁর মনে সৃষ্টির ভাবটা আছে। ঈশ্বর তো আমার আপনার মত কেউ নন যে তিনি আমাদের মত চিন্তা করবেন। তিনি শুদ্ধ চৈতন্য, চৈতন্যের বাইরে কিছু নেই। সেইজন্য চৈতন্যের মনে আমের একটা ভাব আছে, সেই ভাব মূর্ত রূপ হয়ে যায় যখন সে শব্দ পায় বা আম এই নাম পায়। আরও মূর্তরূপ হয়ে যায়, যখন সে ত্রিমাত্রিক আকার পেয়ে বস্তু রূপ পেয়ে যায়। তাহলে চারটে ধাপ এসে গেল, প্রথমে অভিন্ন অবস্থা যখন ওঁ অবস্থায় আছে, ঐ অভিন্ন অবস্থা থেকে বিভিন্নতা শুরু হয়ে গেল, তখন এসে গেল আমের ভাব, তৃতীয় ধাপে সেখান থেকে এসে গেল আম শব্দ আর চতুর্থ ধাপে বস্তু রূপে আম এসে গেল। শুধু তাই না, এবার কৃষি বিজ্ঞানীরা নানা রকম permulation combination করে আমের হাজার রকম প্রজাতি তৈরী করে দেবে। অথচ আমের সব কিছুকে টানতে শুরু করলে একটা জায়গায় আম শব্দে গিয়ে দাঁড়াবে। তারও পেছনে রয়েছে সেই ওঁ। এই যে তিনটে স্তর, বস্তু, নাম আর ভাব, যদি খুব গভীরে গিয়ে দেখা হয় তখন দেখা যাবে বাস্তবে এই তিনটের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। আমাদের মন খণ্ডিত হয়ে থাকার জন্য সব কিছুকে আমরা খণ্ড খণ্ড দেখি, কিন্তু যাঁর মনের খণ্ডত্ব নাশ হয়ে গেছে তিনি পুরোটাই এক অভিন্ন রূপে দেখেন।

স্ফোট আর ওঁ, এখানে দুটো জিনিষ বোঝার আছে। বোঝার সুবিধার্থে আমরা মনে করতে পারি সেই চৈতন্য হল এক অনন্ত সমুদ্র, যা সব কিছুকে ছেয়ে আছে। তিনি ইচ্ছা করলেন আমি এক আমি বহু হব, এই চিন্তা করতেই সেই চৈতন্যের মহাসমুদ্রে একটা ছোট্ট জায়গায় একটা ছায়া পড়ে গেল। এই যে চিন্তা করলেন আমি বহু হব, এটাই মায়া। এই আমি ভাবটা যখনই এল তখনই চৈতন্য যেন বিভাজিত হয়ে গেল। চৈতন্যের মহাসমুদ্রে যেন এবার একটা বিভাজন রেখা এসে গেল। একটি single line এসে গেল, এই lineকেই বলছেন স্ফোট বা ওঁ। স্ফোট বা ওঁএর এই দিকটা হল সৃষ্টি আর এই দিকটা হল চৈতন্য। বোঝানর জন্য বলা হচ্ছে, আসলে চৈতন্যেই সব কিছু ছেয়ে আছে। সেইজন্য চৈতন্য, সৃষ্টি, জগৎ, মায়া এগুলোকে ধারণা করা খুব কঠিন, চৈতন্য ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু চৈতন্য যেন ঢাকা পড়ে গেল, ঐ ঢাকাটুকুকে বলছেন স্ফোট বা ওঁ।

ওঁ তিনটে শব্দের সম্মিলিত শব্দ – 'অ' 'উ' আর 'ম' তিনটে শব্দ মিলিয়ে ওঁ উচ্চারিত হয়। 'য়' বাদ দিলে সমস্ত বর্ণমালা 'অ' থেকে শুরু হয়ে 'ম' তে শেষ হয়। 'অ' কণ্ঠের সব থেকে নীচ থেকে বের হয় আর 'ম' মুখের সব থেকে শেষে বেরোয়, শুরু হয় 'অ' থেকে আর শেষ হয় 'ম' তে গিয়ে, আমাদের vocal chord 'অ' থেকে শুরু হয়ে 'ম' তে গিয়ে শেষ হয়। মাঝখানে যে বাতাসটা ঘুরপাক খায় সেটাকে 'উ' দিয়ে বোঝান হয়। সেইজন্য 'অ', 'উ' আর 'ম' বলছেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত রকম ধ্বণি হতে পারে সব ধ্বণি 'অ', 'উ' আর 'ম'এর সম্মিলিত ধ্বণি ওঁ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। একতারাতে একটিই তার, কিন্তু ঐ একটি তারের উপর বিভিন্ন ভাবে আঘাত দিয়ে সমস্ত রকমের সুরের সৃষ্টি করা হচ্ছে। 'অ' 'উ' আর 'ম' সেই একতারা, জগতে যত রকম ধ্বণি হতে পারে সব ধ্বণি এই 'অ' 'উ' আর 'ম'এর মধ্যে বাঁধা। অতীতে যে শব্দ হয়ে হারিয়ে গেছে, বর্তমানে যত রকমের শব্দ হতে পারে আর ভবিষ্যতে যত শব্দ আসবে সব এই ওঁ থেকেই সৃষ্টি। একক রূপে যখন দেখা হয় তখন ওঁ, বহু রূপে যখন দেখা হয় তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত নাম, যত শব্দ সেটাই হল জগৎ আর অন্য দিকে শব্দেরই মূর্ত রূপ এই জগৎ বা বস্তু। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় যত বস্তু আছে, যে বস্তুর আমরা কল্পনা করতে পারি, যে বস্তু এখন নেই কিন্তু ভবিষ্যতে আসবে, বিজ্ঞানীরা যে বস্তুর এখনও কল্পনা করতে পারেনি কিন্তু হাজার বছর পর যে বস্তুগুলো আসবে সব বস্তুরই নাম থাকবে, নাম আর বস্তু কখনই আলাদা হবে না। তাই না, ঐ বস্তুর যে ভাব আগে আসবে, সেই ভাবের অভিন্ন রূপই হল ওঁ।

ওঁ বা স্ফোটই সেই বিভাজন রেখা যে রেখা থেকে সৃষ্টির সীমানা শুরু হয় আর সৃষ্টির সীমানাও এই বিভাজন রেখাতে গিয়েই শেষ হয়। সৃষ্টির দিক দিয়ে ওঁ হল সেই সীমানা যেখানে সৃষ্টি শেষ। আবার অনন্ত চৈতন্য সমুদ্রের দিক থেকে ওঁ হল সেই সীমানা যেখান থেকে সৃষ্টির শুরু। সৃষ্টিতে যা কিছু আছে একটি তৃণখণ্ড থেকে শুরু করে ব্রহ্মা পর্যন্ত সবাই এই ওঁ বা স্ফোটের মধ্যে বাঁধা, ওঁএর বাইরে কেউ যেতে পারে না। আর ওঁ উচ্চারণের পর 'ম'এর পর যে নৈঃশব্দতা নেমে আসে সেটাই সচ্চিদানন্দ সাগরকে ইঙ্গিত করে। ওঁএর ধ্বণি টুকরো হতে শুরু হওয়া মানে সেখান থেকে শব্দের উৎপত্তি শুরু, সেই শব্দেরই মূর্ত রূপ এই বহির্জগৎ। ওঁএর শেষ ধ্বণি নৈঃশব্দে লয় হয়ে গিয়ে যেখানে শান্তি নেমে আসে সেটা যেন পেছনের দিকে যেতে শুরু করছে, যেতে যেতে যেখানে গিয়ে মন থেমে গেল সেই জায়গাটাই চৈতন্যের মহাসমুদ্র। সবটাই চৈতন্য, কিন্তু একত্ব থেকে বহুত্বের ভেদ এসে যায় বলে সব কিছু অন্য রকম মনে হয়। যেখানে একত্ব সেখানেই শুদ্ধ চৈতন্য আর যেখানে বহুত্ব সেটাই সৃষ্টি। বহুত্ব আর অবহুত্বের মাঝখানে যে বিভাজন রেখা, সেটাই স্ফোট বা ওঁ। ঋষিরা ধ্যানের গভীরে এই জিনিষটাকে বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করেন। প্রণবেরও যখন ধ্যান করেন তখন ধীরে ধীরে তাঁরা দেখতে পান বস্তু বলে কিছু নেই, যা কিছু আছে সব মনের ভেতরে, সবটাই ভাবের জগৎ। ভাবের জগতকেও যখন গুটিয়ে নিয়ে আসতে থাকেন, গোটাতে গোটাতে সব কিছু ওঁএ দাঁড়িয়ে যায়। ওঁএর কাছে পৌঁছে গেল মানে তিনি এখন সৃষ্টির শেষ সীমাতে পৌঁছে গেলেন। কিন্তু এই সীমাকে তিনি আর অতিক্রম করে যেতে পারবেন না। ঠাকুর বলছেন যোগী এই নাদকে ভেদ করে পরমাত্মার সাক্ষাৎ করেন। এই নাদকে ভেদ করা মানে, সৃষ্টির এই সীমারেখা অর্থাৎ ওঁ কে ফুটো করে বেরিয়ে গিয়ে পরমাত্মার দর্শন করেন।

ওঁএর বিভাজন রেখার ঐ পারটাই পরমাত্মা। কিন্তু পরমাত্মার দর্শন কোন দিন হবে না। কেন হবে না? কারণ এই যে বিভাজন রেখা ওঁ, এই রেখাকে ভেদ করা যায় না। অনেক চেষ্টা করে খুব বড় জোর আমরা ওঁ পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারি। ওঁএ পৌঁছান মানে ব্রহ্মার সাথে বা ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে যাওয়া, কালী, শ্রীকৃষ্ণ,

বিষ্ণু, শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে এক হয়ে যাওয়া, বিষ্ণুলোকে চলে যাওয়া, রামকৃষ্ণলোকে চলে যাওয়া। এরপর আর আমরা যেতে পারব না। এরপর যেতে হলে ধ্যানের গভীরে, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ তোতাপুরীর নির্দেশে মা কালীর মুর্তিকে জ্ঞানখড়্গ দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন, এই না করা হলে কখনই স্ফোটের এই বিভাজন রেখাকে ভেদ করা যাবে না। আমরা অনেক কথাই শুনি, তিনিই কৃপা করে পার করে দেন ইত্যাদি। এগুলো ইদানিং কালের তথাকথিত ব্রহ্মজ্ঞানীদের কথা। এদের কথাকে কে বিশ্বাস করবে! বড় বড় ঋষিরা যে কথা বলে গেছেন, ঠাকুর যে কথা বলে গেছেন এনাদের কথা বাদ দিয়ে অন্যের কথাকে তো আমরা নিতে পারি না। ঠাকুর বলছেন যোগীরা নাদ ভেদ করে পরমাত্মার সাক্ষাৎ করেন।

মুসলমানরা আল্লা বলছে, খ্রীশ্চানরা গড বলছে এবং সব ধর্মে বিভিন্ন রকম নাম ও প্রতীকের প্রচলন আছে। কিন্তু সমস্ত রকম প্রতীক ও নামের মধ্যে ওঁ হল সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞান সম্মত। কারণ ওঁ এর তাৎপর্য হল ওঁ তিনটে জিনিষকে সূচিত করে, সেইজন্য ওঁএর বিশেষ মাহাত্ম্য। ওঁ জগতের যাবতীয় সব কিছুকে সূচিত করে। কারণ বস্তু মানেই শব্দ বা নাম, শব্দ মানেই ভাব, ভাবের যে একত্ব এটাই ওঁ, সেইজন্য জগৎ মানে ওঁ। আবার ওঁ হল শেষ স্ফোট, সাধনা করে উচ্চতম যে জায়গায় পৌঁছাচ্ছে সেটাই ওঁ। আবার ওঁএর পারেই সচ্চিদানন্দ, সেইজন্য বলা হয় ওঁ আবার নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মকেও ইঙ্গিত করে। নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মকে নির্দেশিত করছে বলে ওঁ সেই সচ্চিদানন্দরই নাম, নাম ঠিক নয়, কারণ নাম বললে বস্তু হয়ে যাবে, সচ্চিদানন্দ তো কোন বস্তু নন, ওঁ সেই সচ্চিদানন্দকে ইঙ্গিত করে। ওঁ আবার সগুণ ঈশ্বরও, শিব, কালী, দুর্গা, কৃষ্ণ, রাম, রামকৃষ্ণ সবই ওঁ। জগৎ অর্থাৎ আমি আপনি সব কিছু ওঁ, সগুণ ঈশ্বর ওঁ আবার নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মকে ওঁ ইঙ্গিত করছে।

স্ফোট, যাকে সচ্চিদানন্দ ও সৃষ্টির বিভাজন রেখা বলছি, এরও বিভিন্ন দর্শনে আলাদা আলাদা নাম হয়ে যায়। স্ফোটকেই কেউ বলছেন মায়া, কেউ বলছেন শক্তি বা কালী বা মহাকাল, কেউ বলছেন প্রকৃতি, স্ফোটরই সব আলাদা আলাদা নাম। যোগ সাধনায় এই বিভাজনের জায়গাটাকে বলছেন স্ফোট, কারণ যোগীরা বাস্তবিক এই ধ্বণি শুনতে পান। শুধু হিন্দু ধর্মের যোগীরাই শুনতে পান না, মুসলমান সাধকরাও শুনতে পান, খ্রীষ্টান সাধকরাও শোনেন, তবে ওনারা অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করেন। অনাহত ধ্বণি স্ফোটেরই আরেকটি নাম। অনাহত মানে যিনি আহত হননি। শব্দ মাত্রই আহত হওয়া, আহত হওয়া মানেই টুকরো হয়ে গেছে। অনাহত হল one single। জন্মদিনে একটা বড় কেক তৈরী করে একটা জায়গায় সাজিয়ে রাখা হল, কেকটা অনাহত। যার জন্মদিন সে ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিবিয়ে দেওয়ার পর ছুরি দিয়ে কেকটাকে টুকরো করে দিল, অনাহত কেকটা এবার আহত কেক হয়ে গেল। অনাহত মানে one whole in single, ওটাই যখন টুকরো হতে শুরু হয়ে যায় তখন শব্দ রূপে বেরোতে থাকে, নাম রূপে বেরোতে থাকে, এই নামটাই ত্রিমাত্রিক জগতে বস্তু রূপে আমাদের সামনে প্রতিভাসিত হয়।

এই স্ফোট বা ওঁ এ পৌঁছান, জাগতিক রূপে নয় পারমার্থিক রূপে পৌঁছানর জন্যই মানুষ ত্যাগ তপস্যাদি করে, এখানে পৌঁছাবার জন্যই মানুষ বেদ অধ্যয়ন করে। ওঁ পাওয়ার উদ্দেশ্য যদি না থাকে তাহলে সব ত্যাগ, তপস্যা, অধ্যয়ন অরণ্যে রোদন হয়ে যায়। খুব বড় সাধুকে এক মহিলা এসে জিজ্ঞেস করছে 'বাবা! আপনার কাম জয় হয়েছে'? সাধুবাবা বললেন 'সময় এলে বলব'। সাধুবাবার যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে, শ্বাস ওঠা শুরু হয়ে গেছে, তিনি বুঝে গেছেন আমার মৃত্যুর সময় হয়ে গেছে, তখন তিনি এক শিষ্যকে বললেন 'গ্রামে অমুক মহিলা আছে তাকে ডেকে নিয়ে এস'। মহিলাও বৃদ্ধা হয়ে গেছে। মহিলাকে ডেকে আনার পর সাধুবাবা বলছেন 'মা! এবার তোমাকে আমি বলতে পারি যে আমি কাম জয় করেছি'। এই কথা বলার পরেই সাধুবাবা মারা গেলেন। সেখান থেকে এক বিখ্যাত প্রবাদ হয়ে গেছে, 'পুড়বে সাধু উড়বে ছাই তবে সাধুর গুণ গাই'।

এই কাহিনীটি কোন আশ্রমের একজন বরিষ্ঠ সাধু আরেকজন কনিষ্ঠ সাধুকে বলছিলেন। কনিষ্ঠ সাধুটি কাহিনী শোনার পর খুব অভিভূত হয়ে যান। পরে তিনি তারই সমবয়সী এক বন্ধুকে কাহিনীটা বলেন। বন্ধুটি গৃহস্থ ছিল, কিন্তু তার বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। দুজন দুজনকে খুবই ভালোবাসত। বন্ধুকে সাধু কাহিনীটা শোনার পর বন্ধু বলছে 'কাম জয় করে নিয়েছে তাতে হলটা কি'! বন্ধু এভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করাতে সাধুটি খুব নিরুৎসাহ বোধ করতে লাগল। উৎসাহ নিয়ে একটা সুন্দর কাহিনী বলার পর ভেবেছিল বন্ধু বলবে কী দারুণ!

কিন্তু সে এক কথাতে হেসে উড়িয়ে দিল 'সাধুর যদি কাম জয় হয়েই থাকে তাতে হলটা কি'! বন্ধুর কথাতে সন্ন্যাসীর চিন্তার জগতে খুব সমস্যা হয়ে গেল, কে ঠিক? তার আশ্রমের বরিষ্ঠ সাধু ঠিক, নাকি তার বন্ধু ঠিক? অনেক দিন পরে কঠোপনিষদের এই মন্ত্রটিকে নিয়ে সন্ন্যাসী যখন খুব বিচার করতে শুরু করলেন তখন তাঁর সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল, তার বন্ধুই কিন্তু ঠিক বলেছিল। সন্ন্যাসী যদি কোন নারীর মুখ দর্শন না করে থাকে তাতে হলটা কী! মীরাবাঈয়ের ভজনে বলছে, দুধ আর নিরামিশ খেলেই যদি হরি পাওয়া যেত তাহলে বাছুর, গোয়ালারা তারা তো দুধ খেয়েই থাকে, তাতে হলটা কী! মীরাবাঈয়ের ভজনেই আবার আছে, পাথর পূজা করলে যদি হরি পাওয়া যায় তাহলে আমি পাহাড় পূজা করব, এই ধরণের অনেক কথা বলছেন। কেন বলছেন? যদি তোমার উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ না হয়, যদি ওঁ প্রাপ্তি তোমার উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে কাম জয় করে কোন কিছুই হবে না। যদি ঈশ্বর লাভই উদ্দেশ্য হয়, যদি ওঁ বা স্ফোটে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই উদ্দেশ্য হয় তাহলে কিন্তু কাম এমনিতেই আর আসবে না। তাই বন্ধু যেটা বলেছিল কাম যদি জয় হয়েই থাকে তাতে হলটা কী, একেবারে ঠিক কথাই বলেছিল। ওঁ যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে কাম জয়ের ব্যাপারটাই আর থাকে না। পতন কার হয়? যদি ওঁ সাধনাতে, ঈশ্বর জ্ঞানে যদি ঠিক ঠিক মন থাকে, শরীরের ধর্মানুসারে যেমন খিদে পায়, জল পিপাসা পায়, তেমনি কাম ভাবও আসবে, কিন্তু কাম জয় করার কোন চেষ্টাই সে করবে না, এগুলো তখন আর তাঁর কাছে কোন ব্যাপারই থাকে না।

মূল কথা হল, ভারতবর্ষে সাধারণ লোক বলুন, সাধু বলুন সবাই মূল্যবোধের কথা, চরিত্র গঠনের কথা যা বলছে, ত্যাগের কথা যা বলছে সবটাই ভুল ভাবে রাখা হচ্ছে, পুরো জিনিষটাকে উল্টো করে রাখছে। ঘোড়ার পেছনে গাড়ি না রেখে গাড়ির পেছনে ঘোড়াকে লাগিয়ে রাখা হয়েছে। যদি ওঁ প্রাপ্তি উদ্দেশ্য না থাকে তাহলে কাম জয়ের কোন অর্থ হয় না, ত্যাগের কোন অর্থ হয় না, বেদ ও শাস্ত্র অধ্যয়নের কোন অর্থ হয় না। সন্ন্যাসীর সেই বন্ধু বুঝে বলেছিল কি না বুঝে বলেছিল আমাদের জানা নেই, কিন্তু এই বক্তব্যকেই উপনিষদের উচ্চভাবের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলে দেখা যাবে যদিও তার যুক্তিটা ভুল মনে হতে পারে কিন্তু তার সিদ্ধান্তটা সঠিক। যুক্তিকেও ভুল বলা যায় না, কারণ আমাদের কাছে যুক্তিও যা সিদ্ধান্তও তাই। উদ্দেশ্য যদি ঈশ্বর লাভ না হয়, উদ্দেশ্য যদি আত্মজ্ঞান লাভ না হয় তাহলে বাকি সব কিছুই অর্থহীন। উদ্দেশ্য যদি আত্মজ্ঞান হয় তাহলে বাকি কোন কিছুই আর আসবে না। যদি কোন ব্রহ্মচারীকে প্রশ্ন করা হয়, আপনি কেন কষ্ট করে ব্রহ্মচর্য পালন করছেন? এই প্রশ্নটা ঠিক একই রকম প্রশ্ন হবে যদি বাবা ছেলেকে জিজ্ঞেস করে, আহা! তুমি কেন এত কষ্ট করে রোজ তিন-চার ঘন্টা পড়াশোনা করছ? বিদ্যার্জন করার জন্য ছেলেকে পড়াশোনা করতেই হবে, ওঁ প্রাপ্তির জন্য তাকে গুরুগৃহে বাস করতেই হবে, ওঁ সিদ্ধির জন্য তাকে ত্যাগ করতেই হবে, ওঁ সিদ্ধির জন্য তাকে বেদ অধ্যয়ন করতেই হবে। অপরের কাছে এগুলো গাধার খাটনি মনে হবে, কিন্তু তার কাছে এগুলোই আবশ্যিক অনুশীলন। এই অনুশীলন না করলে সে ওঁ বা স্ফোটে গিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না। এই কথাই যমরাজ নচিকেতাকে এখানে বলছেন, *তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি – ওমিত্যেতৎ*। এর পরের দুটি মন্ত্রে যমরাজ বলবেন ওঁ সাধনা করলে মানুষ কি কি পেতে পারে।

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ।।১/২/১৬।।

(এই অক্ষরই প্রসিদ্ধ অপরব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ এবং এই অক্ষরই সুনিশ্চিত পরমব্রহ্ম। এই অক্ষর পুরুষকেই সম্যক জেনে যিনি যা কামনা করেন তাঁর তা-ই সিদ্ধ হয়)

মন্ত্রের মূল শব্দ হল অক্ষর। অক্ষর মানে, যাঁর কোন ক্ষয় হয় না। অক্ষর বলতে সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মকেই বোঝায়। আবার অক্ষর বলতে ওঁকেও বোঝায় আর অক্ষর বলতে বর্ণমালার অক্ষরকেও বোঝায়। অক্ষর বলতে বর্ণমালার অক্ষরও যা, ওঁও তাই আর ঈশ্বরও তাই। কেন এক? এই নিয়েই এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম, যিনি সচ্চিদানন্দ, যিনি নির্গুণ নিরাকার তিনি মায়াকে অবলম্বন করার পর প্রথম যে রূপে গোচর হন সেটাই স্ফোট বা ওঁ। এটাই মায়া, এটাই শক্তি, এটাই প্রকৃতি, এটাই কাল, উপনিষদ বলছেন অক্ষর। একদিকে যেমন অক্ষর বলতে বোঝায় যার কখনই নাশ হয় না, কিন্তু এই অক্ষর আপেক্ষিক অর্থে অক্ষর। আপেক্ষিক এই অর্থে বলছেন কারণ সৃষ্টি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ওঁ থাকবে, সৃষ্টি যখন থাকবে না তখন

ওঁ এর কি হবে? সচ্চিদানন্দের সাথে লয় হয়ে যাবে। এই অর্থে আপেক্ষিক যে সৃষ্টির সাথে এর একটা সম্পর্ক আছে। বর্ণমালার অ আ ক খ এগুলোও অক্ষর এবং বাস্তবিক অর্থেই অক্ষর। কারণ যতক্ষণ সৃষ্টি আছে ততক্ষণ বস্তু থাকবে, বস্তু হল ভাব বা বিচারের বাহ্যিক মূর্ত রূপ। ভাব মানেই সৃষ্টি। কিন্তু যিনি সৎ, তিনিই চিৎ ও তিনিই আনন্দ, সেইজন্য ভাব বলতে আমরা যা বুঝি ভগবানের মনে সেই ধরণের কোন ভাব থাকে না। কারণ যিনি সৎ যাঁর সত্তা আছে তিনিই চিৎ, তিনিই চৈতন্য আর তিনিই আনন্দময়, সৎ, চিৎ আর আনন্দ এই তিনটে আলাদা কিছু নয়। সৃষ্টি হলেই ওঁ বা স্ফোট এসে গেল, এবার চিন্তা শুরু হয়ে গেল। যে চিন্তনটা শুরু হয়ে গেল, সেই চিন্তনেরই আন্তরিক রূপ হয়ে গেল ভাব আর তার বাহ্যিক রূপ হয়ে গেল বস্তু। ভাব আর বস্তু ছাড়া কিছু নেই। ভাব আর বস্তুর আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখলাম প্রত্যেক বস্তুর একটি নাম আছে, যে কোন নাম শব্দ দিয়ে চিহ্নিত হয়, আর যে কোন শব্দ 'অ' থেকে শুরু করে 'ম'এর মধ্যে বাঁধা। যে চুয়ান্নটি অক্ষর নিয়ে বর্ণমালা, এর কখনই নাশ হবে না। কতদিন নাশ হবে না? যত দিন সৃষ্টি আছে। সৃষ্টি মানেই অক্ষর, অক্ষর মানেই সৃষ্টি। সেইজন্য মা কালীর গলায় মুণ্ডমালা, মুণ্ডমালা কিছুই নয় এটাই বর্ণমালার প্রতীক রূপ। এই যে স্ফোট এটাই বিভাজন রেখা, এটাই মা কালী, এটাই ওঁ আর তার অভিব্যক্তি চুয়ান্নটি বর্ণ দিয়ে। মা কালী হলেন ঐ চুয়ান্নটি বর্ণ, সৃষ্টির আদি মানেই এই চুয়ান্নটি বর্ণ। সেইজন্য মা কালী হলেন বর্ণস্বরূপা।

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম, এই অক্ষর সচ্চিদানন্দও নয় আর বর্ণমালার অক্ষরও নয়, এখানে অক্ষর মানে ওঁ। *এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম*, এই অক্ষর দিয়ে ব্রহ্মকে পাওয়া যায় বা বলা যেতে পারে ওঁই ব্রহ্ম। *এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্*, এই অক্ষরই পরম্। কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লীর ষোল নম্বর মন্ত্রের এই ভাব অন্যান্য উপনিষদ ও বিভিন্ন শাস্ত্রেও প্রতিফলিত হয়েছে, যেখানে বলছেন ওঁ সাধনা করলে সব কিছু পাওয়া যায়। বেদ বা অন্যান্য শাস্ত্র পাঠ করার সময় বলে দেওয়া হয় এই শাস্ত্র পাঠ করলে কি লাভ হবে। সেইজন্য গ্রন্থস্তুতি বা বিদ্যার স্তুতি করতে হয়। এখানে বলা মুশকিল মন্ত্রে ওঁএর স্তুতি করছেন, নাকি এটাই বাস্তবিক। কিন্তু বলতে চাইছেন ওঁ ব্রহ্ম আর ওঁই পরম্। ব্রহ্ম বলতে আমরা সব সময় জানি নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম। কিন্তু এই মন্ত্রে ব্রহ্ম বলতে সগুণ ব্রহ্ম বা অপর ব্রহ্মকে বোঝাচ্ছেন, যিনি নির্গুণ নিরাকার তাঁকে বলছেন পরম্। উপনিষদ অনেক প্রাচীন গ্রন্থ, চার-পাঁচ হাজার আগেকার পুরনো ভাবগুলিই উপনিষদে এসেছে, কিন্তু তার মধ্যেও কিছু কিছু শব্দকে পরে বিশেষ ভাবে বিন্যাস করা হয়েছে যাতে কোন রকম সংশয় না হয়। আজকে আমরা ব্রহ্ম বলতে নির্গুণ ব্রহ্ম আর সগুণ ব্রহ্ম বলছি, নির্গুণ সগুণ কোনটাই না বললে ব্রহ্ম বলতে সব সময় বোঝায় নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম, যিনি চৈতন্যময়, যিনি সব জায়গায় ব্যপ্ত হয়ে আছেন। যদি তাঁকে ঈশ্বর রূপে বলতে হয় তখন তাঁর উপর গুণ আরোপ করে দিয়ে বলি সগুণ। কঠোপনিষদ অনেক প্রাচীন উপনিষদ, তখনও সব কিছু এতটা স্পষ্ট আকার পায়নি। যদিও ব্রহ্ম মানে বৃহৎ কিন্তু এখানে ব্রহ্ম বলতে অপর ব্রহ্ম। অপর ব্রহ্ম মানে স্ফোটে বাঁধা হয়ে আছেন, এই অপর ব্রহ্মই কখন ব্রহ্মা হয়ে যান, কখন সগুণ ঈশ্বর হয়ে যান। স্ফোটের পারে যিনি শুদ্ধ ব্রহ্ম, তাঁকে বলছেন পরমব্রহ্ম। নির্গুণ ব্রহ্মের আরেকটি নাম তাই পরমব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম। পুরো বক্তব্য ঠিক ঠিক জানা না থাকলে শব্দের অর্থ করতে গিয়ে অনেক সংশয় হয়। নির্গুণ ব্রহ্মের মোটামুটি চারটে নাম, নির্গুণ ব্রহ্ম, ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম ও পরমব্রহ্ম। আরেকটি খুব প্রচলিত নাম হল সচ্চিদানন্দ। কিন্তু সগুণ ব্রহ্মে এসে অনেক নাম এসে যায়। এখানে বলছেন ওঁ যাঁকে অক্ষর বলা হচ্ছে, এই অক্ষরই অপর ব্রহ্ম, এই অক্ষরই পরমব্রহ্ম।

কিন্তু যে অর্থে আমরা এক মনে করি সেই অর্থে এক নয়, প্রতীক রূপে এক। যদি প্রতীক রূপে এক না হত তাহলে গুরু যখন মন্ত্র দিলেন 'ওঁ নমঃ শিবায়' তার মানে সে ব্রহ্ম পেয়ে গেল, কিন্তু তাতো পাচ্ছে না, কারণ এই অক্ষর প্রতীক রূপে এক। প্রতীক আর বাস্তবে একটু তফাৎ থাকে। বাচ্চাকে যখন আকাশে চাঁদ দেখানো হয় তখন আঙুলের ডগাকে চাঁদের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয় এই আঙুলের ডগার দিকে তাকাও তাহলেই তুমি চাঁদ দেখতে পাবে। বাচ্চা আঙুলের ডগাতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখে, চাঁদের দিকে তার দৃষ্টি যায় না। ওঁ হল আঙুলের ডগা। আঙুলের ডগার বাইরে আর কোন জিনিষকে তাই চাঁদ দেখানোর জন্য ব্যবহার করা যাবে না। বাচ্চা যেমন আঙুলের ডগাকেই দেখতে থাকে আমাদেরও তেমনি বাচ্চাদের মত অবস্থা হয়, আমরা ওঁকেই আক্ষরিক ভাবে নিয়ে নিই। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে ওঁ হল প্রতীক। তাহলে প্রতীককে কেন বলছেন এই অক্ষরই ব্রহ্ম? কারণ প্রতীক আর প্রতীক দিয়ে যাকে ইঙ্গিত করা হয় এই দুটো কখনই আলাদা নয়। কেমেস্ট্রির ছাত্রকে যদি CO_2 বলে দেওয়া হয় তখন তার কাছে সবটাই স্পষ্ট হয়ে যায়, কার্বনডাই অক্সাইড, তার

মলিক্যুলার ওয়েট এত, তার ফিজিক্যাল প্রপার্টি এই এই, তার কেমিক্যালস প্রপার্টি এই এই। কিন্তু কেমেস্ট্রির ব্যাপারে যে অনভিজ্ঞ তার কাছে CO_2 মানে শুধুই CO_2 । কিন্তু যিনি CO_2কে সাক্ষাৎ করেছেন, যিনি তার প্রপার্টিস গুলোকে অধ্যয়ন করেছেন তিনি CO_2র অর্থ ঠিক ঠিক বুঝবেন। এখন CO_2র দুটো রূপ এসে যাচ্ছে, প্রতীক রূপে থেকে যাচ্ছে আর বাস্তবিক রূপে থেকে যাচ্ছে। এখানে এনারা বলতে চাইছেন ঐ বাস্তবের কাছে যদি তোমাকে পৌঁছাতে হয় তাহলে তোমাকে প্রতীকের সাহায্য নিতে হবে। কার্বনডাই অক্সাইডকে জানার জন্য CO_2র সাহায্যই তাকে নিতে হবে। সাহায্য নেওয়ার পর ধীরে ধীরে তার ঐ আইডিয়াটা পরিষ্কার হবে, যেমন যেমন তার জ্ঞান বৃদ্ধি হবে তেমন তেমন সে জিনিষটাকে অনুভব করবে। আচার্য তাই বলছেন ওঁ এখানে প্রতীক, এই প্রতীকের সাহায্য নিয়ে তুমি আসল বস্তুকে জানতে পারবে।

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ, ছান্দোগ্য উপনিষদ এবং মাণ্ডুক্য উপনিষদে বলছেন, যিনি ‘অ’ ‘উ’ আর ‘ম’য়ের ‘অ’ কে জয় করেন তিনি জগতকে জয় করে নেন, যিনি এক পাদ জয় করেন তিনি এতটা জয় করেন ইত্যাদি, এগুলোর অর্থ কিন্তু ওঁকে নিয়ে নয়। বেদ অধ্যয়ন করে করে মানুষ দেখে যে বেদের যেটা মূল বক্তব্য ত্রিসন্ধ্যা করলেই সেটা হয়ে যায়। ত্রিসন্ধ্যা করলে যা হয়, গায়ত্রীমন্ত্র জপ করলে সেই একই জিনিষ হয়। আর গায়ত্রীমন্ত্র জপ করলে যা হয়, শুধু ওঁ জপ করলে একই জিনিষ হয়। এত লোক দীক্ষা নিয়ে জপ করছে কিন্তু কারুরই কিছু হচ্ছে না। ঠাকুর বলছেন কলকাতার নষ্টা মেয়েরা এত জপ করে কই কিছুই তো হয় না। কোন দিনই কিছু হবে না। কারণ ওঁএর সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। এগুলোর সম্পর্ক রয়েছে তাঁর সাথে ওঁ যাঁর প্রতীক তাঁর সাধনাতে। তাঁর সত্তা যতটা মনে প্রতিভাসিত হবে তত তার শক্তি বাড়বে। ঠাকুরের যত ধ্যান করা হবে তত ঠাকুরের সত্তা ভেতরে আসতে থাকবে। যত ঠাকুরের সত্তা বাড়বে তত তার শক্তি বাড়বে, লোকে তত তাঁকে জানবে, মানবে। ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরের কৃপা যার উপর হয় সবাই তার বশে চলে আসে।

সাধক যেমনটি অপর ব্রহ্ম বা পরব্রহ্মের উদ্দেশ্য নিয়ে সাধনা করবেন তাঁর সিদ্ধিও তেমনটি হবে। কঠোপনিষদের এই ভাব অন্য উপনিষদেও এসেছে আর পরে এই ভাবকে প্রত্যেকটি সাধনার পদ্ধতির অঙ্গ করা হয়েছে। যেমন তন্ত্র সাধনাতে বলা হয়, মায়ের সাধনায় সাধকের সঙ্কল্প যা তার সাধনার সিদ্ধিও সেই সঙ্কল্প অনুযায়ী হবে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও এই একই ভাব নিয়ে আসা হয়েছে। সুরথ রাজা আর সমাধি বৈশ্য যখন মায়ের সাধনা করতে গেলেন তখন তাঁদের দুজনের সঙ্কল্প বা মনের ইচ্ছা আলাদা। সাধনার শেষে একজন বর পেলেন আগামী কল্পে তিনি মনু হয়ে জন্ম নেবেন, আরেকজন তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি পেয়ে গেলেন। এই জিনিষটাকেই এখানে বলছেন *এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ*, এই ওঙ্কারকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে অক্ষরকে জেনে তিনি যা ইচ্ছা করবেন তাঁর তাই হবে।

বেদের মূল তত্ত্বগুলির সারকে একটা সূত্রের মধ্যে দাঁড় করিয়ে যখন তার উপর একটা কাহিনী দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন তখন সেটাই হয়ে যায় পুরাণ। ঐ সারতত্ত্বকে যখন ব্যাখ্যা করা হচ্ছে তখন সেটাই হয়ে যায় উপনিষদ। ঐ সারতত্ত্বকে আধার করে যখন আমাদের আচার-ব্যবহারকে ঠিক করে দেওয়া হয় তখন সেটাই হয়ে যায় মনুস্মৃতি। আর ঐ সারতত্ত্বকেই সামনে রেখে বিধি উপাচার দিয়ে যখন সাধনা করা হয় তখন সেটাই পূজা-অর্চনা হয়ে যায়। সারটাই মূল, বেদের সার হল *যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ*, যদি কেউ এই অক্ষরের সাধনা করেন তিনি যেমনটি ইচ্ছা করবেন তেমনটি পাবেন। এই সার যখন পুরাণে যায় তখন এসে যায় মার্কণ্ডেয় পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ নিয়ে এল চণ্ডী, চণ্ডীতে বলছেন তুমি যদি রাজা সুরথের মত মায়ের উপাসনা করো তাহলে তুমিও মনু হয়ে জন্মাবে, আর তুমি যদি পরিবারের হাতে মার খেয়ে মায়ের উপাসনা কর তখন তুমি সমাধি বৈশ্যের মত হয়ে যাবে। রাজা সুরথকে শত্রুর হাতে লাঞ্ছিত হয়ে হয়েছিল, তার রাজ্য কেড়ে নিয়েছিল, হাতি ঘোড়া সব কেড়ে নিয়েছিল, তখনও সুরথের ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা হয়নি, তার রাজ্যভোগের ইচ্ছে থেকে গেছে, তাই তার সঙ্কল্প হল আমি মনু হয়ে জন্মাব। আর সমাধিকে তার স্ত্রী-পুত্র একজোট হয়ে পিটিয়ে সব কেড়ে নিয়েছে। সমাধি বাড়ি থেকে পালিয়ে জঙ্গলে এসে বলছে আমার আর কিছু লাগবে না। স্ত্রীর কাছে মার খাওয়ার পর জগতে আর তো তার কোথাও দাঁড়াবার জায়গাই নেই। ঠাকুর বলছেন, স্ত্রী নাকি গাছের ছায়া, যার ছায়ায় এসে মানুষ নাকি জিরোয়। সেই স্ত্রীই সমাধিকে এমন মার দিয়েছে যে বলছে আমার

আর কিছু লাগবে না। সমাধি তাই মুক্তির সঙ্কল্প নিয়ে মায়ের উপাসনায় নেমে গেল। মায়ের উপাসনা মানেই ওঁ উপাসনা, কারণ স্ফোট আর কালী এক। ঠাকুর বলছেন কালী আর ব্রহ্ম এক, এখানেও বলছেন ওঁ আর ব্রহ্ম এক। অক্ষরের উপাসনা করলে তুমি যেমনটি চাও তোমার তেমনটি হবে। কিন্তু আচার্য 'যেমনটি চাও তেমনটি হবে'কে পরিভাষিত করতে গিয়ে বলছেন, যদি কেউ পরব্রহ্ম বা পরমব্রহ্মের উপাসনা করে তাহলে সে ঐ পরমব্রহ্মের জ্ঞান পেয়ে যাবে, যদি কেউ অপর ব্রহ্মকে চায় তখন তাঁকেই প্রাপ্ত করবে।

বলা হয়, ষোল আর সতের নম্বর মন্ত্র মধ্যম সাধকদের জন্য। মধ্যম সাধক মানে যাদের এখনও সামান্য বাসনা থেকে গেছে। ঈশ্বর প্রাপ্তি বলার অর্থ নিজের অস্তিত্বকে রেখে দেওয়া। যাঁরা নিজের অস্তিত্বকে রেখে দিতে চাইছেন তাঁরাই ঈশ্বর প্রাপ্তির কথা বলেন। আর যখন অদ্বৈত জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বলা হয় সেখানেও ঈশ্বরকেই জানা হয় কিন্তু বোধ স্বরূপে জানা হয়। প্রাপ্তি আর বোধ স্বরূপে জানা দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। ভক্তিশাস্ত্রে তিন ধরণের প্রাপ্তির কথা বলা হয়, ঈশ্বরের আরাধনা করলে ভক্তের সালোক্য, সামীপ্য আর সারূপ্য এই তিনটি জিনিষ প্রাপ্ত হয়। এগুলো সবই প্রাপ্ত করা, কিন্তু সাযুজ্য মানে ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে যাওয়া। আমরা ভাবি আমি আলাদা ঈশ্বর আলাদ, ঈশ্বর রাজার মত কোথাও বসে আছেন। মৃত্যুর পর আমি তাঁর কাছে চলে গেলাম, তাঁর আলোময় শরীর, আমার আত্মাও আলোময়, এই আলো সেই আলোতে মিলে গেল। কিন্তু ব্যাপারটা একেবারেই তা নয়। সেই জিনিষেরই জ্ঞান হয় যে জিনিষের সাথে আমাদের মন এক হয়ে যায়। সাযুজ্য হওয়া মানে জ্ঞানপ্রাপ্তি, তাঁর স্বরূপকে জেনে যাওয়া, ঈশ্বরের মধ্যে ঢুকে যাওয়া নয়। এই জ্ঞান – তাঁর স্বরূপ আর আমার স্বরূপে কোন ভেদ নেই, দুটো এক। জ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর ঈশ্বর শব্দটা আর আসতে পারে না। ভক্তিশাস্ত্রে যদিও সাযুজ্যের কথা বলা হয় কিন্তু যুক্তিতে ঠিক দাঁড়ায় না। তবে রামানুজ এনারা গাছ আর গাছের পাতার উপমা নেন, ঈশ্বর যেন বৃক্ষ, জীব হল সেই বৃক্ষের পাতা। মাধ্বাচার্য সেব্য সেবকের কথা বলেন। এনারা সবাই বড় ঋষি আর প্রণম্য, কিন্তু আমাদের আচার্য যেমনটি বলে গেছেন ঠিক তেমনটি ধরে আমাদের এগোতে হবে। তিনি বলছেন দুটো জিনিষ হয়, যদি অপর ব্রহ্ম হয় তাহলে তাঁকে প্রাপ্ত করা হবে আর পরমব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম যদি হন তাহলে তাঁকে জানা। তার ফলে কি হয় –

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।।১/২/১৭।।

(এই ওঙ্কারোপাসনা অপরব্রহ্ম প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ, উপাসনাই পরব্রহ্ম প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধনা। এই অক্ষর সাধন অবহিত হলে ব্রহ্মলোকে পূজিত হন।)

দুটো মন্ত্রেই জ্ঞাত্বা শব্দকে নিয়ে আসা হয়েছে ঠিকই কিন্তু সুসম্বদ্ধ ভাবে রাখা হয়নি। কিন্তু আচার্য তাঁর ভাষ্যে পুরো জিনিষটাকে সাজিয়ে দিয়েছেন। বলছেন *এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্*, অপর ব্রহ্ম বা পরমব্রহ্মকে পাওয়ার জন্য যত রকমের আলম্বন হতে পারে সমস্ত আলম্বনের মধ্যে ওঁ শ্রেষ্ঠ। আলম্বন কি কি? বেদচর্চা আলম্বন, গায়ত্রীমন্ত্র আলম্বন আর সন্ধ্যাবন্দনা আলম্বন। কঠোপনিষদ এই মন্ত্রে শ্রেষ্ঠ আলম্বনের কথা বলছেন। ঠাকুর একটু অন্য ভাবে বলছেন, বেদ ত্রিসন্ধ্যাতে লয় হয়, সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী প্রণবে লয় হয়। ঠাকুর যে অর্থে লয় বলছেন আর এখানে যে অর্থে শ্রেষ্ঠ আলম্বন বলছেন দুটো একই, যেমন দুধ থেকে দই, দই থেকে মাখন আর মাখন থেকে ঘি তৈরী হল, তখন এভাবেও বলা যায় দুধ ঘিতে লয় হল। দুধ থেকে ঘি শ্রেষ্ঠ আর দুধের পরিণতি ঘি, একই কথা। বিভিন্ন ভাবকে অবলম্বন করে বলা হচ্ছে, ঠাকুর লয়ের ভাব নিচ্ছেন আর এখানে শ্রেষ্ঠের ভাব নেওয়া হয়েছে। তাঁকে পাওয়ার আমরা যত রকম আলম্বনের কথা চিন্তা করতে পারি তার মধ্যে *এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠম্*। শ্রেষ্ঠতম এই জন্যই বলছেন, যেমন গায়ত্রীমন্ত্র জপ করলেও সেই জায়গায় নিয়ে যাবে ঠিকই কিন্তু শেষে গায়ত্রীমন্ত্রের সার সেই ওঙ্কারে এনে ফেলবে। উপনিষদের সাধনাই ওঁ সাধনা। শাস্ত্রের মূল যিনি তাঁকেই সব সময় স্তুতি করা হয়। তন্ত্র সাধনায় মায়ের বীজমন্ত্রের স্তুতি করা হয়। বিভিন্ন মানুষের মনের গঠন বিভিন্ন রকম হওয়ার জন্য শুধু একটা জিনিষকে দিয়েই সাধনা হতে পারে না। তাই স্বাভাবিক ভাবেই কেউ ওঁ দিয়ে সাধনা করবেন, কেউ হ্রীং দিয়ে সাধনা করবেন, কেউ ক্লীং দিয়ে সাধনা করবেন। যিনি যেটাকে অবলম্বন করে সাধনা করেন তাঁর কাছে সেটাই শ্রেষ্ঠ। প্রণব দিয়েই সাধনা করুক আর বীজ দিয়েই সাধনা করুক শেষে সব সাধনাই গিয়ে দাঁড়াবে স্ফোটে গিয়ে। স্ফোট আর যে মন্ত্র আমরা জপ

করছি দুটো কিন্তু আলাদা। ওঁ যিনি জপ করছেন, এই ওঁ কিন্তু অ উ আর ম দিয়ে বিভক্ত, আর এখানে যে স্ফোট বলা হচ্ছে এই স্ফোট অবিভক্ত। কেউ হ্রীং জপ করুক কি ক্লীং জপ করুক শেষ পর্যন্ত এই সাধনা তাকে টেনে নিয়ে যাবে সেই অক্ষরে যেখানে কোন ছেদ নেই, অবিভক্ত। তবে সাধকরা সাধনার শেষ অবস্থায় দেখেন সেই ওঁ, ঐ ওঁকে তাঁরা আর ভেদ করতে পারেন না। ঐ অবস্থায় তাঁরা যে অনাহত ধ্বণি শুনতে পান সেই ধ্বণি ওঁ এর সাথে অনেক মিল, তাই ওঙ্কার সাধনাকে শ্রেষ্ঠ বলাই ঠিক।

এতদালম্বনং পরম্, এই অক্ষর পরমব্রহ্মের আলম্বন, সেইজন্য সব দিক দিয়ে ওঁ শ্রেষ্ঠ। যেমন কেউ হ্রীং বীজমন্ত্রে সাধনা করছেন। তন্ত্রে হ্রীং হল মায়াবীজ। যিনি হ্রীং বীজমন্ত্রে সাধনা করে সিদ্ধি পান তিনি আসলে মায়ার সিদ্ধি পেয়ে যান। মায়ার সিদ্ধি মানেই স্ফোট, ওঁ দিয়ে সাধনা করে সিদ্ধি পেলে তাঁকেও স্ফোটে নিয়ে যাচ্ছে। তাহলে ওঁকে কেন শ্রেষ্ঠ বলা হচ্ছে? এইজন্যই শ্রেষ্ঠ বলা হচ্ছে, ওঁ একদিকে যেমন অপর ব্রহ্মের আলম্বন আবার ওঁ পরমব্রহ্মেরও আলম্বন। কিন্তু হ্রীং বীজকে কখনই পরমব্রহ্মের আলম্বন বলা যাবে না। ওঁ পরমব্রহ্মের প্রতীক, এই প্রতীক সার্বজনীন ভাবে স্বীকৃত হয়ে আছে। অপর ব্রহ্মে অনেক কিছুই আসতে পারে, হ্রীং, ক্লীং অনেক কিছুই আসতে পারে কিন্তু এরা কখনই পরমব্রহ্মের প্রতীক নন। সেইজন্য ওঁ সাধনাকে বলছেন শ্রেষ্ঠ। ওঁ অপর ব্রহ্মের সাথেও জুড়ে আছে আবার অন্য দিকে পরমব্রহ্মের সাথেও জুড়ে আছে। ওঙ্কার সাধনা উপনিষদেরই সাধনা, উপনিষদের ওঙ্কার সাধনা একটা আলাদা বিষয় রূপেই দাঁড়িয়ে গেছে, অনেক বড় বড় পণ্ডিতরা উপনিষদের ওঙ্কার সাধনার উপর অনেক প্রবন্ধাদি রচনা করেন। তবে প্রবন্ধাদি পড়ে ঠিক ঠিক ধারণা হয় না। কেউ যদি নিজে ঠিক ঠিক অনুভব করতে চান মন্ত্রে কি বলতে চাইছেন, তাহলে একান্তে তিনি যদি চিন্তন করেন তবেই বুঝতে পারবেন কি বলতে চাইছেন। জগৎ মানেই বিভাজন, জগৎ মানেই বহু, জগৎ মানেই নানাত্ব। এই বহুত্ব যখন ধীরে ধীরে একত্বের দিকে এগোতে শুরু হয় তখন বস্তু বিলয় হয়ে যায় নামে, রূপ লয় হয়ে যায় শব্দে। ঐ শব্দ এখনও বহুর মধ্যে ঘুরছে, কারণ যত বস্তু তত শব্দ। সত্যি বলতে শব্দ বস্তুর তুলনায় বেশি, কারণ যে বস্তু এখনও আসেনি তার শব্দগুলো আছে, যে বস্তুর নাশ হয়ে গেছে তার শব্দগুলো থেকে গেছে। যেমন শুটকো কল, পাল্কি, এই জিনিষগুলো হারিয়ে গেছে কিন্তু শব্দ ও ভাব রূপে থেকে গেছে। বাংলা ভাষা যদি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েও যায় কিন্তু স্ফোটের মধ্যে পাল্কির যে শব্দ ও ভাব আছে এর কোন দিন নাশ হবে না। বিশ্বের সব ঘটকে যদি নাশ করে দেওয়া হয়, কিন্তু স্ফোটে ঘট ভাব রূপে থেকে যাবে, এই ঘটের কোন দিন নাশ হবে না। বাইবেলে যখন বলছেন In the beginning there was word, and the word was with God and word was God তখন এই একই জিনিষ বলছেন। Word, স্ফোট আর ওঁ তিনটে একই জিনিষ, সৃষ্টির কোন জিনিষ ওর বাইরে কখনই যেতে পারে না। তাই পাল্কি জিনিষটাও ভাব রূপে সব সময়ই ঈশ্বরের মধ্যে আছে। কিভাবে আছে? সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বীজ রূপে, যখন সময় আসবে তখন পাল্কি শব্দ রূপে ফুটে উঠবে। ঐ শব্দকে যখন কেউ ধরে নেবে তখন সে বস্তু রূপে একটা আকার দিয়ে দেবে। সেইজন্য ওঁ হল পরম। খ্রীষ্টানরা ওঁ না বলে বলেন লোগোস, গ্রীকরাই লোগোস বলত আর বাইবেলে word বলছেন। এই জিনিষটা যে উপনিষদেই আছে তা নয়, বিশ্বের অন্যান্য ধর্মেও এই বিষয়ের উপর অনেক আলোকপাত করা হয়েছে। সাধনার রাজ্যে সাধক যে দেশ আর যে ধর্মেরই হন না কেন, তাঁরা সবাই একই কথা বলেন। কিন্তু পরে তাঁদের অনুগামীরাই অশান্তি তৈরী করে।

এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে, এর মধ্যে দুটি সাধনার কথা বর্ণনা করা হচ্ছে – একটা অপর ব্রহ্মের সাধনা আরেকটি পরব্রহ্মের সাধনা। যাঁরা নির্গুণ নিরাকারের সাধনা করেন অর্থাৎ পরব্রহ্মের সাধনা করেন তাঁরা তাঁর জ্ঞান পেয়ে যান, জ্ঞান পেয়ে তিনি ধন্য হয়ে যান। *কুলং পবিত্রং জননীং কৃতার্থায়* যখন বলা হয় তখন এনাদের কথাই বলা হয়। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই ধরণের সাধকদের জানা যায় না। কারণ তাঁরা এমন নিরিবিলিতে কোথায় লোকচক্ষুর আড়ালে জপ-ধ্যান তপস্যা করে যাচ্ছেন কাকপক্ষীরাও টের পায় না। তোতাপুরী পরমব্রহ্মের সাধক ছিলেন, ঠাকুরের কাছে যদি না আসতেন কেউই তাঁর নাম জানতে পারতেন না। কিন্তু যাঁরা অপর ব্রহ্মের উপাসক, সগুণ ব্রহ্মের উপাসক তাঁরা এই জগতেই মহিমান্বিত হয়ে যান। কি রকম মহিমান্বিত হয়ে যান? সগুণ ব্রহ্মের উপাসক সগুণ ব্রহ্মের সাথে এক হয়ে যান, এক হয়ে যাওয়ার পর এবার সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার সাথে সাথে তাঁরও উপাসনা শুরু হয়ে যায়।

আমরা অতি সাধারণ মানুষ, আমাদের কাছে অপর ব্রহ্ম আর পরমব্রহ্ম খুব উঁচু কথা। কিন্তু উচ্চতত্ত্বের কোন শাস্ত্র যখন আমাদের অধ্যয়ন করতে হয় তখন বোঝার চেষ্টা করতে হয় কি বলতে চাইছেন। আচার্য যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন আমরাও সেভাবেই আলোচনা করছি। সচ্চিদানন্দের দুটি রূপ – একটা নির্গুণ নিরাকার অন্যটি সগুণ সাকার। যিনি নির্গুণ নিরাকারের সাধনা করেন তিনি ওঁ সাধনা দিয়ে তাঁকে জেনে যান। যিনি সগুণ সাকারের সাধনা করেন তিনিও তাঁকে ওঁ সাধনার দ্বারা পেয়ে যান। ওঁ হল মূল, যার দ্বারা নির্গুণকে জানা যায় আর সগুণকে পাওয়া যায়। নির্গুণকে জানতে পারলে সে চিরদিনের জন্য মুক্ত হয়ে ধন্য হয়ে গেল, এরপর তাঁকে লোকে জানতেও পারে নাও জানতে পারে। কিন্তু যাঁরা সগুণ উপাসক তাঁরা ঈশ্বরকে প্রাপ্ত করেন, সেইজন্য তিনি মহিমান্বিত হন। কারণ সগুণ ঈশ্বর মহিমাবান, বেদে বলছেন *এতাবানস্য মহিমা*। এই জগৎ, সৃষ্টি সব তাঁরই বিস্তার, মহিমা মানে বিস্তার। সগুণ ব্রহ্মের যা যা গুণ সগুণ ব্রহ্মের উপাসক সেই সেই গুণ পেয়ে যান। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঠাকুরের, ঠাকুরকে যিনি পেয়ে গেলেন তিনি তাঁর সৃষ্টিকেও পেয়ে গেলেন। দুটো বেশি টাকা হলেই লোকেরা তার পেছনে ঘুর ঘুর করতে থাকে, আর সমস্ত সৃষ্টির মালিক হয়ে গেলে তো লোকেরা ঘুর ঘুর করবেই। সগুণ ঈশ্বরের যিনি সত্যিকারের উপাসক তাঁর নাম-যশ এমনিতেই আসবে, ঐশ্বর্য এমনিতেই আসবে। কারণ *এতাবানস্য মহিমা*, এই সৃষ্টিই ভগবানের মহিমা, এটাই তাঁর বিস্তার। তাঁকে পেয়ে গিয়ে তিনি এখন রাজার ব্যাটা। রাজার যা যা সম্পত্তি সেই সম্পত্তি এখন তাঁরও হয়ে যাবে। এই কথাই এখানে বলছেন, যাঁরা দ্বৈত উপাসক, অপর ব্রহ্মের উপাসনা করছেন তাঁরা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য পান। কিন্তু যাঁরা ঠিক ঠিক ভক্ত তাঁরা ঐশ্বর্যের দিকে যান না। দক্ষিণেশ্বরে হাজরা থেকে থেকে বলতেন, তিনি ঐশ্বর্যবান তিনি তো ঐশ্বর্য দিতেই পারেন। ঠাকুর বলছেন, আগের জন্মে হাজরা নিশ্চয় কাঙাল ছিল, সব সময় ঐশ্বর্য ঐশ্বর্য করে। দ্বৈত আর অদ্বৈত সাধনায় কোন তফাৎ নেই, অপর ব্রহ্ম আর পরমব্রহ্মে কোন তফাৎ নেই। কিন্তু যাঁরা অপর ব্রহ্মের সাধনা করেন তাঁরা তাঁকে পেয়ে মহিমান্বিত হন। যাঁরা পরমব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁরা তাঁকে জেনে ধন্য হয়ে যান, জগতের ঐশ্বর্যের দিকে তাঁর কোন দৃষ্টিই নেই। যাঁরা মন্দ, মধ্যম উপাসক তাঁদের জন্য এগুলো, কিন্তু যাঁরা ঠিক ঠিক উপাসক তাঁরা এত কিছুর আলোচনাই করবেন না।

সংক্ষেপে এই মন্ত্রের মূল ভাব হল, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমাদের ভাষায় যদি বলা হয় তাহলে বলা হবে ওঁ সাধনার দ্বারাই সগুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় আর অদ্বৈত জ্ঞানও ওঁ দিয়েই হয়। পরমব্রহ্মকে পাওয়ার জন্য গায়ত্রী আদি যত রকমের মন্ত্র আছে তার মধ্যে ওঁ হল শ্রেষ্ঠ আলম্বন। অপর ব্রহ্ম বা সগুণ ব্রহ্মকে পাওয়ার জন্যও ওঁ শ্রেষ্ঠ আলম্বন। মূল বক্তব্য হল এই জীবনে তুমি যা কিছু পেতে চাও ওঁ দিয়েই সব পেয়ে যাবে। এর আগেই বলছেন *সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি* অর্থাৎ সবাই যে ত্যাগের পথে যাচ্ছে, তপস্যা করছে, ব্রহ্মচর্য পালন করছে আর শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন করছে তারা সবাই এই ওঁ সাধনার জন্যই এত কিছু করছে।

এখানে যদিও নির্গুণ ব্রহ্মের বর্ণনা চলছে কিন্তু যদি ঠিক ঠিক দেখা যায় তাহলে *অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মা*ৎ মন্ত্রের আলোচনাতে অপর ব্রহ্মেরই বর্ণনা চলছিল। এর আগেও বলা হয়েছে আর এখনও বলা হচ্ছে উপনিষদ সচ্চিদানন্দ বা ভগবানের দুটি রূপের কথা বলছেন, একটা তাঁর সাকার রূপ আরেকটি তাঁর নিরাকার রূপ। ব্রহ্মসূত্র রচনা হওয়ার পরে পরে আচার্য সেখানে দেখাচ্ছেন যদিও উপনিষদে সাকার ও নিরাকার, সগুণ ও নির্গুণ দুটোরই আলোচনা করা হয়েছে তথাপি অদ্বৈত, নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মই উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়। অন্যান্য শাস্ত্রে হয়ত নির্গুণের কথা বলা হয়েছে কিন্তু সগুণ সাধনাই তাঁদের উদ্দেশ্য। উপনিষদে সগুণের কথা বলা হলেও আসল প্রতিপাদ্য বিষয় হল নির্গুণ। ভগবানের দুটো রূপই হয়, সগুণ রূপও হয় নির্গুণ রূপও হয়। সব শাস্ত্রই দুটো রূপকে নিয়েই আলোচনা করে, কিন্তু মুখ্য আর গৌণ রূপে যদি দেখা হয় তখন দেখা যাবে উপনিষদের মুখ্য হল নির্গুণ আর গৌণ হল সগুণ। অন্যান্য শাস্ত্রে সগুণ মুখ্য হয় আর নির্গুণ গৌণ হয়ে যায়। আচার্য খুব স্পষ্ট করে বলছেন *অপরস্য চ ব্রহ্মণো মন্দমধ্যমপ্রতিপত্তৄন্ প্রতি*, প্রথমের দিকে যে সাধনার কথা বলা হল এটা হল মধ্য আর মন্দ সাধকদের জন্য। তার মানে সগুণ সাকারের সাধনা যিনি করছেন, তিনি হয় মধ্যম আর তা নাহলে মন্দ সাধক। আচার্য এক কথায় উড়িয়ে দিচ্ছেন, যারা সগুণ সাধনা করেন তাঁরা মন্দ সাধক, অর্থাৎ বলতে চাইছেন যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সাধনা করেন, যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা করেন তাঁরা মন্দ বা মধ্যম সাধক। আচার্যের এই দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য সবাই আচার্যের উপর ক্ষিপ্ত। ক্ষিপ্ত হওয়ারই কথা, ঠাকুরের যিনি জপ-ধ্যান করছে তিনি মন্দ সাধক ঠাকুরের কোন ভক্তকে বললে সেও আচার্যের উপর রেগে যাবে।

তোতাপুরীও দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরকে দেখে বলছেন এত বড় উচ্চ আধার কিন্তু এ কী করছে, শুধু মা মা করে যাচ্ছে! এখানে সাধনার শুরু করাকে নিয়েই বলছেন, যারা ঠাকুরের ভাবে আসবে তারা মন্দ সাধক বা মধ্যম সাধক। আচার্যের এটা এক বিরাট সমস্যা ছিল, তিনি সব কিছুকেই নিয়ে যাবেন, যেতে যেতে মাঝখানে দুম্ করে এমন একটা বাক্য বলে দেবেন যেটা দিয়ে সবটাকেই উল্টে ফেলে দেবেন। সেইজন্য যাঁরা আচার্যের ভাষ্য নিয়ে চলেন তাঁরা একেবারে কট্টর, আর যাঁরা ভক্ত তাঁরা আচার্যের নাম শুনলেই কানে গঙ্গাজল ঢালবে।

আচার্যের ভাষ্য আর উপনিষদের এই জায়গাটা খুব জটিল। রাজা মহারাজ স্বভাবেই ভক্ত ছিলেন আর প্রথম বয়সে ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করতেন। অন্য দিকে নরেন্দ্রনাথ ছিলেন ঘোর অদ্বৈতী, তিনিও ব্রাহ্ম সমাজে যেতেন। দুজনেই ব্রাহ্ম সমাজে কখনও হয়ত শপথ নিয়েছিলেন যে আমরা মুর্তি পূজাতে থাকব না। পরে নরেন্দ্রনাথ রাজা মহারাজকে বকাঝকা শুরু করে দিলেন, ব্রাহ্ম সমাজে শপথ নিয়ে তুমি মন্দিরে মা কালীকে গিয়ে প্রণাম কর ইত্যাদি। ঠাকুর জানতে পেরে একদিন নরেনকে ডেকে বলছেন – রাখালের ভক্তির ভাব, তুই তোর অদ্বৈতের ভাব দিয়ে ওর ভক্তি ভাব নষ্ট করে দিস না। এসব ঘটনার কথা শোনার পর অনেকের মনে প্রশ্ন আসা খুবই স্বাভাবিক, ঠাকুর একদিকে ভক্তি ভাবকে নষ্ট করতে নিষেধ করছেন আবার অন্য দিকে অদ্বৈত ভাবকে শ্রেষ্ঠ বলছেন। ঠাকুর রাজা মহারাজের মত উচ্চ আধ্যাত্মিক আধারকে বলছেন তুই অদ্বৈতের কথা শুনবি না। ঠাকুর তাহলে অদ্বৈত ভাবকে শ্রেষ্ঠ কেন বলছেন? আর আমরা সবাই জন্ম থেকেই অদ্বৈতের কথা শুনে শুনে বড় হচ্ছি। রাজা মহারাজ কে? ঠাকুরের মানসপুত্র, সঙ্ঘের প্রথম অধ্যক্ষ, ঠাকুর আবার তাঁকে কৃষ্ণের সখা বলছেন, ঐ উচ্চ আধ্যাত্মিক আধার যিনি তাঁকে ঠাকুর বলছেন অদ্বৈতের কথা শুনবি না, শুনলে তোর ভাব নষ্ট হয়ে যাবে। আর আমরা আজ দীক্ষা নিয়ে পরের দিন থেকে অদ্বৈত ছাড়া কথাই বলতে চাই না। অথচ অত উচ্চ আধারকে ঠাকুর অদ্বৈতের কথা শুনতে নিষেধ করছেন। আসলে আমরা কেউই কোন আধারই নই। ঠাকুর আর রাজা মহারাজ যে স্তরে এই কথাগুলো বলছেন সেই স্তরে আমরা এই জন্মে কেন, আদৌ কোন জন্মে পৌঁছাতে পারব কি না ঠিক নেই। আমাদের কাছে এসব ঘটনা শুধু শোনার জন্য, তথ্য হয়ে ভেতরে শুধু জমা হচ্ছে, ভাব বলে কিছু নেই। ঠাকুর প্রায়ই উপমা দিতেন, পেটে গর্ভ হয়েছে, ছ মাস হতেই গর্ভ নষ্ট হয়ে গেল। ভক্তির ভাব বহু কষ্টে দাঁড় করাল, হঠাৎ অন্য একটা ভাব আসতেই ভাব নষ্ট হয়ে গেল। আমার আপনার ক্ষেত্রে কি হয়? গর্ভ হওয়ার জন্য যে বীজটা ভেতরে পড়বে, পড়ার পর যার উপর আধ্যাত্মিক ভাব দাঁড়াতে শুরু করবে সেই বীজটাই এখনও পড়েনি। মাস্টারমশাই যখন ঠাকুরের কাছে গেছেন ঠাকুর তখন তাঁকেও জিজ্ঞেস করছেন – তোমার কি ভাব? সাকার ভালো লাগে না নিরাকার ভালো লাগে? তখনও মাস্টারমশাইয়ের কোন ভাবই তৈরী হয়নি। তারপর থেকে ধীরে ধীরে তাঁর ভাব উন্নত হতে থেকেছে।

কিন্তু আচার্যের সময় বা উপনিষদে যেখানে অপর ব্রহ্মের কথা বলছে আর আজ আমরা যে অপর ব্রহ্মের কথা বলছি, দুটোতে একটা বিরাট তফাৎ হয়ে গেছে। উপনিষদে যে অপর ব্রহ্মের কথা বলছেন বা আচার্য শঙ্কর যখন বলছেন মন্দ বা মধ্যম অধিকারী বা রাজা মহারাজকে ঠাকুর যেখানে ভক্তির কথা বলছেন, আজকের দিনে আমাদের যে সাধন পদ্ধতি তাতে দুটোর মধ্যে একটা বড় পার্থক্য এসে গেছে, এই পার্থক্য নিয়ে এখনও খুব সামান্য আলোকপাত করা হয়। খুব গভীর ভাবে চিন্তন না করলে তফাৎটা ধরা যাবে না। তফাৎটা না ধরতে পারলে পরের দিকে শাস্ত্র পড়তে গিয়ে দ্বৈত, অদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈতের চুলচেরা তর্কের মধ্যে পড়ে বুদ্ধি বিভ্রম হয়ে পুরো সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে যেতে হবে, কাজের কাজ কিছুই হবে না। উপনিষদ প্রথম দিকে শুরু করতে গিয়ে বলছেন যদি তুমি কোন ফল চাও তাহলে যজ্ঞাদি কর। যজ্ঞ করলে যে কোন ফল, টাকা চাই, সন্তান চাই, সম্পদ চাই সব পাবে। যজ্ঞের ব্যপ্তি যত বড় হবে ফলও তত বড় হবে। ক্রিয়া করে, যজ্ঞ করে, যজ্ঞের সাথে উপাসনা করে একজন মানুষ শ্রেষ্ঠ কি ফল পেতে পারে? উপনিষদ বলছেন হিরণ্যগর্ভ পদ পেয়ে যাবে। স্বর্গলোক যেমন হিরণ্যগর্ভও একটা লোক, কিন্তু সেখান থেকেও আবার ফেরত আসতে হবে। কারণ হিরণ্যগর্ভ পদও ক্রিয়ার ফল, ক্রিয়ার ফল শেষ হয়ে গেলে আবার ফেরত চলে আসতে হবে। কিন্তু অনেক উচ্চস্তরে চলে যাওয়ার ফলে অনেক পূণ্য অবশিষ্ট থাকবে, সেই পূণ্যে অনেক ভালো ঘরে এসে জন্ম নেবে। এরপর তার আবার ওরকম নাও হতে পারে আবার হতেও পারে। সুরথ রাজাও মায়ের তপস্যা করল, পূজা করল, সেই ফলের জন্য সে মনু হয়ে জন্ম নিল। মনু হয়ে জন্ম নেওয়াটা বিরাট আহামরি কিছু নয়। আহামরি কার জন্য? যার মনে কামনা বাসনা আছে, আমি বড় কিছু একটা হতে চাই, তার জন্য।

কিন্তু যেদিন থেকে ভক্তির আন্দোলন শুরু হয়েছে, আচার্য শঙ্করের সময়েও ভক্তি আন্দোলন ছিল, যদিও এতটা প্রচলিত ছিল না, কিন্তু মীরাবাঈ, চৈতন্য মহাপ্রভু হয়ে এই ভক্তির ঢেউ যেদিন ঠাকুরের কাছে এসে পৌঁছাল তখন দ্বৈত আর অদ্বৈতের সমন্বয় হয়ে গেল। ঠাকুরের কাছে এসে দ্বৈত আর অদ্বৈতের যখন সমন্বয় হয়ে গেল তখন পুরো জিনিষটাই অন্য রূপে দাঁড়িয়ে গেল। আমরা যখন বলছি ঠাকুরের সাধনা মানে অপর ব্রহ্মের সাধনা, ঠাকুরের সাধনা মানে সগুণ ব্রহ্মের সাধনা তখন সেখানে ঠাকুরের যে রূপ আর হিরণ্যগর্ভের যে রূপ তাতে কোন তফাৎ নেই। তাহলে কি ঠাকুরের সাধনা তারাই করবে যারা মধ্যম সাধক? না, ঠাকুরের সাধনা উচ্চতম সাধকরাই করবেন। অদ্বৈত সাধক যেমন উচ্চতম ঠিক তেমনি শ্রীকৃষ্ণের সাধকও উচ্চতম, ঠাকুরের সাধকও শ্রেষ্ঠতম সাধক। তাহলে তো আচার্যের কথার বিপরীত হয়ে গেল। আচার্য বলছেন সগুণ ব্রহ্মের উপাসক মধ্যম বা মন্দ সাধক, আমরাও বলছি মধ্যম বা মন্দ। কিন্তু বর্তমান কালে যে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা, যেমন আমরা ঠাকুরের উপাসনা করছি, এর মধ্যে মন্দও হতে পারে মধ্যমও হতে পারে কিন্তু এর মধ্যে আবার উচ্চতমও থাকতে পারে, যেমন রাজা মহারাজ। রাজা মহারাজ যখন দ্বৈত সাধনা করছেন তখন তিনি সাধারণ সাধক নন অত্যন্ত উচ্চমানের সাধক, তিনি নরেন্দ্রনাথ থেকে কোন অংশেই ছোট আধারের নন। নরেন্দ্রনাথ অদ্বৈত সাধনা করছেন আর রাজা মহারাজ করছেন দ্বৈত সাধনা, কিন্তু দুজনই উচ্চতম সাধক। যদিও এখানে আচার্যের বক্তব্যের বিপরীত মনে হবে, কিন্তু আচার্য শঙ্করের বক্তব্যের বিরুদ্ধে কখনই যাবে না। তাহলে কোথাও একটা গোলমাল আছে বুঝতে হবে।

গোলমালটা হয়ে আছে সাধনার বিধিতে। বেদের কাল থেকে লোকে কর্ম করত, যজ্ঞ করত, সাধনা করত যাতে উচ্চলোক পেতে পারে। আর ঐ উচ্চলোকের উচ্চতম লোক হল হিরণ্যগর্ভ পদ বা অপর ব্রহ্ম। কিন্তু দ্বৈত সাধনায় যিনি সত্যিকারের কৃষ্ণভক্ত, তাঁর কাছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিটা কোন ক্রিয়া নয়, তাঁর কাছে এটা ভালোবাসা। ভালোবাসা দিয়ে যখন সাধনা হয় তখন সেখানে কোন ক্রিয়া থাকে না। সেইজন্য ঠাকুর যে বৈধী ভক্তি আর প্রেমা ভক্তির কথা বলছেন, বৈধী ভক্তি সাধককে যখন অপর ব্রহ্মে নিয়ে যাবে তখন সে হয়ে যাবে মধ্যম সাধক। প্রেমা ভক্তি যখন অপরব্রহ্মের কাছে নিয়ে যাবে তখন সে হয়ে যাবে শ্রেষ্ঠ সাধক। ঠাকুর যে সমন্বয় করলেন বা চৈতন্য মহাপ্রভু যে সমন্বয় করলেন তাঁরা কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মে করছেন না, তাঁরা সমন্বয় করছেন সগুণ ব্রহ্মে নিয়ে গিয়ে, সমন্বয় করছেন অপর ব্রহ্মে নিয়ে গিয়ে। আবার কর্ম দিয়ে সমন্বয় করছেন না, করছেন ভক্তি দিয়ে, যে ভক্তিতে অহং বলে কিছু নেই, আমি বলে কিছু থাকছে না, শুধু তুমি বা তিনি থাকছেন। সাধনার পদ্ধতি পুরো অন্য রকম হয়ে গেল। উপনিষদে আচার্য যখন বলছেন অপর ব্রহ্মের সাধক মধ্যম বা মন্দ সাধক তখন তিনি মেনেই চলছেন যে যজ্ঞ ক্রিয়া ও ধ্যান ধারণা করে অপর ব্রহ্মে পৌঁছাবে। ওখানে আচার্য একবারও ভালোবাসার কথা বলছেন না। কিন্তু গীতাতে এসে আচার্য যখন ভালোবাসার কথা নিয়ে এলেন তখন তিনি কখনই বলছেন না যে যিনি ভক্তি সাধন করছেন তিনি মধ্যম বা মন্দ সাধক, সেখানে তিনি বলছেন না যে তাঁরা নিকৃষ্ট জায়গায় যাবেন, কিন্তু উপনিষদে বলছেন। কারণ এখানে কর্ম, যজ্ঞাদি করে পৌঁছানর কথা বলা হচ্ছে। কোন ভক্ত যদি বলে আমি সারাদিন এত জপ করছি, এত শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি, এত ধ্যান-ধারণা করছি আমি ঠাকুরকে পাব। অবশ্যই পাবে, কিন্তু অপর ব্রহ্মকে পাবে। কারণ তখন তিনি মন্দ সাধক বা মধ্যম সাধক। কিন্তু যিনি বলছেন ঠাকুর ছাড়া আমি আর কিছু জানি না, আমার মন প্রাণ জুড়ে শুধু ঠাকুর, জগতের কোন কিছুই আমার লাগবে না, ঠাকুরই আমার সব, আমি কেন তাঁর জপ করতে যাব! মানুষ কেন জপ-ধ্যান করে? একটা লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্যই করে। আমার আবার কিসের লক্ষ্য, আমি তো এতেই আছি, ঠাকুর ছাড়া আমার আর কিছু নেই। এই ভাব যার মধ্যে এসে গেছে, সে এবার ভক্তির পরাকাষ্ঠায় চলে গেছে, ভক্তির এই পরাকাষ্ঠাই জ্ঞান। সেইজন্য শেষ অবস্থায় ভক্তি আর জ্ঞান এক। তফাৎ শুধু জ্ঞানে আত্মজ্ঞান হয় আর ভক্তিতে ঈশ্বর জ্ঞান হয়। ঠাকুরের ভাবে এসে একটা শেষ সিদ্ধান্ত হল তিনি চাইলে তাঁর ভক্তকে মুক্তিও দিয়ে দিতে পারেন বা আত্মজ্ঞান দিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু ভক্ত সাধারণত মুক্তি নিতে চাইবে না, ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে যাওয়ার তাঁর কোন আগ্রহ নেই।

তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে যিনি ভগবান আর ব্রহ্মা রূপে যিনি ভগবান এই দুটোতে কি কোন পার্থক্য আছে? অবশ্যই আছে, বিরাট পার্থক্য আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবের যখন সাধনা হয় তখন তাঁর ঈশ্বর রূপের, তাঁর সচ্চিদানন্দ রূপের সাধনা হয়, কিন্তু ব্রহ্মার যখন সাধনা হয় বা ঠাকুরেরই সাধনা যদি জপ, ক্রিয়া, পূজা, পাঠ,

যজ্ঞ, উপাচারদি দিয়ে হয় তখন সেটাই অপর ব্রহ্মের সাধনা হয়ে যাবে। এরাও রামকৃষ্ণলোকেই যাবে কিন্তু আবার ফেরত আসতে হবে। কিন্তু যিনি প্রেমাভক্তি দিয়ে, ভক্তির পরাকাষ্ঠা দিয়ে ঠাকুরের সাধনা করেছেন, ঠাকুর ছাড়া আর তাঁর কিছু নেই তাঁকে আর ফেরত আসতে হবে না। ঠাকুরের ভাবধারায় এসে এই ভাব নতুন আঙ্গিকে সংযোজিত হয়ে গেল। যদিও গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান এই সাধনার কথা এভাবেই বলেছেন আর আচার্য শঙ্করও ঠিক এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। গীতা উপনিষদের মত শাস্ত্র অনেকগুলো ভাব, পদ্ধতিকে নিয়ে চলে, ঠিক ভাবে সব কিছুকে যদি সমন্বয় না করা হয় তাহলে সব ভাব আর পদ্ধতিগুলোর মধ্যে সংঘাত লেগে গিয়ে সব ছিটকে বেরিয়ে যাবে। উত্তরকাশীতে এক রামভক্ত সাধু ছিলেন। একবার তাঁর কাছে এক ঘোর অদ্বৈতী সাধক এসেছেন। সাধক রোজ রামভক্ত সাধুকে গিয়ে বোঝাতেন এগুলো সব মায়া, ঈশ্বরের রূপ এটাও মায়া। হঠাৎ সেই সাধুটির মনে হল, আমি কি এতদিন মায়ার উপাসনা করে আসছি! এই চিন্তা করতে করতে শেষে তাঁর মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল। কেন এমন হল? কারণ তিনি সমন্বয় যোগ জানতেন না। ঠাকুর মায়া দিয়ে আসুন, ঠাকুর শক্তি দিয়ে আসুন, ঠাকুর সাক্ষাৎ আসুন, যেভাবেই আসুন না কেন ঠাকুর ঠাকুরই। তাঁকে পাওয়ার জন্য পথ কি নিয়েছেন সেটাই প্রধান। যদি কর্ম সাধনার পথ নিয়ে থাকেন তাহলে আপনি মন্দ সাধক বা মধ্যম সাধক, আপনাকে আবার ফেরত আসতে হবে। যদি প্রেমাভক্তির আশ্রয় নিয়ে থাকেন, যেখানে আমিত্বের সম্পূর্ণ বিলোপ, তখন আর আপনাকে ফেরত আসতে হবে না। হয় আপনি ঠাকুরের মধ্যে লয় হয়ে যাবেন নয়তো ঈশ্বরকোটি হয়ে ঠাকুরের সাথে ঘুরতে থাকবেন। আমার মুক্তি হল কি হল না, এই ব্যাপারে তাঁর কোন মাথা ব্যাথা থাকে না, যাঁকে তিনি ভালবাসেন তিনি তাঁর সাথে আছেন, তাঁর আর চিন্তা কিসের।

দু বছরের শিশু এখনও ভালো করে কথা বলতে পারে না, কিন্তু সে মায়ের আঁচলটা সব সময় ধরে আছে। মা যেখানে তাকে নিয়ে যাচ্ছে সেখানেই চলে যাচ্ছে, রেলওয়ে স্টেশনে নিয়ে যাচ্ছে সেও সেখানে চলে যাচ্ছে। বাসে করে নিয়ে যাচ্ছে তো বাসেই যাচ্ছে, বেশি কথাও বলতে পারে না। শিশুটি যে বলবে আমি ট্রেনে না গিয়ে বাসে কেন যাচ্ছি তাও বলতে পারছে না। মায়ের সাথে আছে এটাই তার কাছে বড়। মা বিয়ে বাড়িতে গেল সেখানেও সে যাচ্ছে, মা শ্রাদ্ধ বাড়িতে যাচ্ছে সেখানেও মায়ের সাথে আছে। শ্রাদ্ধ বাড়িতে হঠাৎ দেখছে মা কাঁদছে, অবাক হয়ে ভাবছে মা কাঁদছে কেন! কিন্তু জিজ্ঞেস করার উপায় নেই, কথাই বলতে পারে না। খুব হলে মায়ের চোখের জলটা মুছতে যাবে, তার বেশি আর কিছু করতে পারবে না। এই ধরণের সাধক যাঁরা, যাঁরা নিজেদের আমিত্বকে সম্পূর্ণ নাশ করে দিয়েছেন এনারা ঈশ্বরের কাছে দেড় দু বছরের বাচ্চার মত হয়ে যান। কিন্তু যাঁরা কর্ম সাধনা করছেন তাঁরা কি বলবে? আমাকে দিনে দশ হাজার জপ করতে হবে, আমাকে বড় করে সত্যনারায়ণের পূজা করতে হবে। বেশির ভাগ ভক্তই এই দ্বিতীয় শ্রেণীর, এই বৈধী ভক্তি নিয়েই চলে। যাঁরা বৈধী ভক্তি নিয়ে চলেন তাঁরাই মন্দ সাধক ও মধ্যম সাধক। এদের সবারই আবার জন্ম নিতে হবে। এই কথাই আচার্য বলতে চাইছেন। *অন্যত্র ধর্মাদান্যত্রাধর্মাৎ* থেকে শুরু করে *এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে* পর্যন্ত যে আলোচনা চলছে, এই আলোচনা হল মন্দ আর মধ্যম সাধকের।

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তফাৎ কিন্তু পর ব্রহ্ম আর অপর ব্রহ্মে নয়। আগেকার দিনে তফাৎ হবে, কারণ তখনকার দিনে জ্ঞানমার্গই পরমব্রহ্মের সাধনার একমাত্র পদ্ধতি ছিল। ঘোর অদ্বৈতীরা এই একটি পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে ঈশ্বর মানবে না, রূপ মানবে না, অবতার মানবে না। বর্তমান অধ্যাত্ম সাধনা এই চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে এসেছে। যেদিন থেকে ভক্তির আন্দোলন শুরু হয়েছে সেদিন থেকে পুরো জিনিষটা স্পষ্ট হয়ে গেছে, সাধনা মানে জ্ঞানমার্গ নয়, সাধনা মানে ভক্তিমার্গ নয়, সাধনা মানে আমিত্বের নাশ। আমিত্বের নাশ যদি জ্ঞানমার্গ দিয়ে হয় তাতেও কোন অসুবিধা নেই, আমিত্বের নাশ যদি ভক্তিমার্গ দিয়ে হয় তাতেও কোন অসুবিধা হবে না। যোগমার্গ, কর্মমার্গ যে মার্গ দিয়েই যান না কেন, মূল হল আমিত্বের নাশ। উপনিষদের যুগে আমিত্ব নাশের একমাত্র পথ ছিল জ্ঞানমার্গ। জ্ঞানমার্গ ছাড়া আরেকটি পথ ছিল কর্মমার্গ। কর্মমার্গে আমিত্ব থেকে যাবে। এই কর্মমার্গকেই স্বামীজী যেদিন নিষ্কাম কর্ম দিয়ে নিয়ে এলেন, সেবাযোগের উপর যেদিন থেকে তিনি জোর দিলেন সেদিন থেকে এই কর্মমার্গের খোলনলচেটোই পুরো পাল্টে গেল। কর্মমার্গে আমিত্ব থেকে যায় কিন্তু সেবাযোগে বা নিষ্কাম কর্মযোগে আমিত্ব থাকে না। স্বামীজীর নিষ্কাম কর্মযোগও সাধককে অদ্বৈত জ্ঞানে নিয়ে যাবে। আচার্য শঙ্কর যে কর্মের কথা বলছেন সেই কর্ম কোন দিন অদ্বৈত জ্ঞানে নিয়ে যাবে না। আচার্যও মেনে চলছেন যে ঐ কর্মে আমিত্ব থেকে যাবে। কিন্তু তখনকার দিনে ওটাই সাধনার একটা প্রধান বিধি ছিল।

ঠাকুরের আগমনের পর পুরো জিনিষটাই একটা সুসংবদ্ধ রূপ পেয়ে গেছে। স্বামীজীর চারটে যোগের মূল হল আমিত্বের নাশ। যে কোন পথ দিয়েই যদি আমিত্বের নাশ হয়, সে পর ব্রহ্মের সাধনা করুক, অপর ব্রহ্মের সাধনা করুক, সগুণ সাধনা করুক, নির্গুণকে করুক, ভেড়াকে ইষ্ট বলে দেখুক তার সেই অদ্বৈত জ্ঞানই হবে। কাকে আলম্বন করছে সেটা কখনই গুরুত্ব নয়, আলম্বনের পদ্ধতিটা কি সেটাই গুরুত্ব।

তখনকার দিনে এত রকমের পথ ছিল না। তাই বলে কি তাদের পথ সঙ্কুচিত ছিল? না, সঙ্কুচিত ছিল না। এই কারণেই হিন্দু ধর্মকে বলে ধর্মরাষ্ট্র, একজন ঋষি কি বলে দিলেন সেখানেই হিন্দুরা থেমে থাকেনি। ঋষিরা নতুন নতুন পথের অনুসন্ধান করে গেছেন, নতুন নতুন পথ নিয়ে এসেছেন। স্বামীজী চারটে যোগের কথা বলে দিলেন, এখানেই কি সব থেমে থাকবে? কিছুই থেমে থাকবে না। আরেকজন ঋষি এসে আরও নতুন কিছু বলবেন। কিন্তু মূল সব সময় থাকবে আমিত্বের নাশে। আমিত্বের নাশ মানেই জ্ঞান, এবার আপনি একে জ্ঞান বলুন ভক্তি বলুন আর যাই বলুন তাতে কিছুই এসে যায় না। ঠাকুর শম্ভুনাথকে বলছেন, ঈশ্বর যদি তোমাকে দেখা দিয়ে বলেন তুমি কি চাও বল, তুমি কি তাঁর কাছে কটা হাসপাতাল, কটা ডিসপেন্সারি চাইবে! আমাদের মনে হতে পারে, ঠাকুরের এই কথার পরেও স্বামীজী কেন কর্মযোগের কথা বলছেন? স্বামীজীর কথা কি ঠাকুরের বিরোধী হয়ে গেল? ঠাকুরের কথার সাথে স্বামীজীর কোন বিরোধ হচ্ছে না। প্রথমটাতে আমিত্ব থেকে যাচ্ছে, হাসপাতাল, ডিসপেন্সারির করার মধ্যে শম্ভুনাথ মল্লিকের মধ্যে আমিত্ব থেকে যাচ্ছে। স্বামীজীর প্রবর্তিত কর্মযোগে আমিত্ব নাশ হয়ে যাচ্ছে। আমিত্ব থাকা আর না থাকাতেই পরিষ্কার হয়ে যাবে আমি মধ্যম সাধক না মন্দ সাধক। আচার্য যে মধ্যম আর মন্দ সাধকের কথা বলছেন তার মূল কারণ হল, অপর ব্রহ্মের সাধনা মানেই স্বর্গ প্রাপ্তি, স্বর্গ প্রাপ্তি মানে ব্রহ্মলোক। যারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির কামনা করে সাধনা করছে এরা মন্দ সাধক। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা যারা করছে তারা রামকৃষ্ণলোক পাওয়ার জন্য সাধনা করে না। হয় তারা ঠাকুরকে পাওয়ার জন্য সাধনা করছে, আর তা নাহলে ঠাকুরের অখণ্ড রূপকে পাওয়ার জন্য করছে। এরা কখনই মন্দ বা মধ্যম হবে না। কামনা রহিত যে কোন সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধন। আচার্য এটাই বলতে চাইছেন, এতক্ষণ যে সাধনার কথা বলা হচ্ছে এই সাধনা তাদেরই জন্য যাদের মধ্যে কামনা আছে।

ওঁ যাঁর আলম্বন, সগুণ ব্রহ্মের আর নির্গুণ ব্রহ্মেরই আলম্বন বলুন, এবার সেই ব্রহ্মের আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছেন। আত্মবিদ্যার কথা বলা, উপনিষদের যেটা আসল কাজ, পরের মন্ত্র থেকে শুরু হয়। আগে একটু একটু করে নিয়ে আসা হচ্ছিল এবার ঠিক ঠিক ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা শুরু করছেন।

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্-
> নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
> ন হন্যতে হন্যমানে শরীরের।।১/২/১৮।।

(ব্রহ্মের জন্ম নাই, মৃত্যুও নাই। আত্মা কারণান্তর হতে উৎপন্ন হন নাই, আত্মা থেকেও কিছু উৎপন্ন হয়নি। এই আত্মা জন্মহীন, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। শরীর নাশ হয়ে গেলেও আত্মার নাশ হয় না।)

মানুষ সব কিছু ত্যাগ করে, তপস্যা করে, ব্রহ্মচর্য ব্রত ধারণ করে জগতের সব আমোদ-আহ্লাদ ছেড়ে দেয় কিসের জন্য? ওঁ সাধনা করার জন্য। ওঁ সাধনা করে যাঁকে পাওয়া যাবে তাঁর কি কি বৈশিষ্ট্য, তাঁর কি স্বভাব, তারই বর্ণনা করছেন। যদিও আত্মা বা ব্রহ্মের স্বভাবের কথা বলছেন কিন্তু একটা জিনিষকে পরিভাষিত করতে গিয়ে শব্দের সীমানা দিয়ে যেভাবে বেঁধে দেওয়া হয় আত্মা বা ব্রহ্মে সেভাবে শব্দের সীমানাতে বাঁধা যায় না। কোন জিনিষকে পরিভাষিত করার দুটি পথ, একটা পথ হল বিপরীতার্থক বা পরস্পর বিরোধী কথা দিয়ে আর তা নাহলে নেতি নেতি করে। ইতি ইতি করেও বলা হয় কারণ সবটাই নেতি নেতি করে বলে দিলে আমাদের মনে সংশয় আসতে পারে জিনিষটাই হয়ত নেই। মূলতঃ বিরোধী কথা নিয়ে আসা হয়। যেমন বলা হয় ইনি চৈতন্যময়, চৈতন্যময় যদি না বলা হয় তাহলে জিনিষটাকে অচৈতন্য বা জড় মনে হতে পারে। সৎ রূপে যদি না বলা হয় তাহলে লোকেদের মনে সংশয় হবে জিনিষটা নেই। কিন্তু এগুলো আত্মার ঠিক পরিভাষা নয়। আমরা যেমন নাম, রূপ, গুণ দিয়ে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ব্যাপারে পরিচিত হই, সেভাবে আত্মা বা ব্রহ্মকে পরিভাষিত করা যায় না। সৎ, চিৎ ও আনন্দ দিয়ে তাঁকে ইঙ্গিত করা হয়, সৎ, চিৎ ও আনন্দ কিন্তু তাঁর

পরিভাষা নয়। আমরা বলি আত্মার ধর্ম, ধর্ম শব্দটাও আত্মার ক্ষেত্রে ঠিক হবে না, কারণ আগেই বলে দিয়েছেন *অন্যত্র ধর্মাদান্যত্রাধর্মাদ্*। কোন জিনিষের যদি আমাকে সাধনা করতে হয় আগে সেই জিনিষের একটা ধারণা থাকা দরকার। ধারণা না থাকলে সাধনায় এগোবে কি করে! এখানে যখন বলছেন *ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্* - তখন এখানে ষড়্বিকারের একটা ধারণা দিয়ে দিলেন। একটা জিনিষকে জানার সময় ষড়্বিকার দিয়ে জানা হয়। জগতে দু রকমের জিনিষ হয়, একটা মৌলিক আর আরেকটি যৌগিক। মৌলিক জিনিষ অবিকারী আর যৌগিক জিনিষ বিকারী। যৌগিক মানে অনেকগুলি উপাদানের মিশ্রণ, যার মধ্যে অবয়ব রয়েছে। যারই অবয়ব আছে তারই জায়তে, অস্তীতে, বর্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষিয়তে আর বিনশ্যতে এই ছটি বিকার থাকবে। জগতের সব বস্তুর এই ছটি বিকার থাকবে।

প্রথম হল জায়তে, যদি সে বিকারী হয় তাহলে তার জন্ম হবেই। যদি জানা যায় কোন কিছুর জন্ম হয়েছে তাহলে সে ষড়্বিকারের মধ্যে পড়ে যাবে। ষড়্বিকারের মধ্যে পড়া মানে জিনিষটা গোলমেলে। জন্ম হওয়া মানেই সেই জিনিষটা অস্তীতে, অর্থাৎ কিছু দিন থাকবে। আমি কল্পনা থেকে একটা জিনিষকে জন্ম দিয়ে দিলাম, তাহলেই ওটার কথা বেরোবে, তাকে থাকতে হবে, ওর অস্তিত্ব অর্থাৎ সত্তা থাকবে। আর এর স্বভাব হল বর্ধতে, যেমন যেমন সে রসদ পাবে তেমন তেমন সে বর্ধিত হতে থাকে। কোন কিছুর বৃদ্ধি হওয়াও একটা বিকার। বিপরিণমতে, একটা জিনিষ আরেকটা জিনিষে পরিণত হয়, যেমন দুধ দইয়ে পরিণত হয়, সরষের দানা তেলে পরিণত হয়। অপক্ষিয়তে, কিছু দিন থাকার পর তার ক্ষয় হতে শুরু হয়। শেষে বিনশ্যতে, নাশ হয়ে যায়। যেটা অস্তীতে ছিল, তার অস্তীত্বটা চলে যায় আর জায়তে, যেটা জন্ম হয়েছিল তার নাশ হয়ে যায়। খুব সংক্ষেপে জন্ম, বৃদ্ধি ও বিনাশ তিনটে বললেই সবটা বলা হয়ে যায়, কিন্তু এনারা ছটি বিকারের কথা বলেন। অনেক সময় দেখা যায় কোন কিছু অনেক দিন ধরে আছে, এত দিন ধরে আছে যে তার জন্ম আর অস্তিত্ব নিয়ে কেউ জানে না, কিন্তু তারও বিপরিণমতে, পরিবর্তন হয়, তাই দিয়ে ধরা পড়ে যায় যে এটা বিকারী বস্তু। কোন জিনিষকে অবিকারী তখনই বলা হবে যার মধ্যে এই ছটি বিকারের কোন বিকারই যদি না থাকে। কোন না কোন বিকার থাকবেই। কিন্তু এই ছটির একটি বিকারও যদি দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে বুঝতে হবে এটা বিকারী। বলছেন *ন জায়তে ম্রিয়তে*, প্রথমটা *জায়তে* শেষে *ম্রিয়তে*, জন্ম নেই মৃত্যু নেই। যদি বলে দেওয়া হয় জন্ম নেই মৃত্যু নেই তাহলে মাঝখানে চারটে বিকারকেও নাকচ করা হয়ে গেল। যার জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না, এর মধ্যে তার অন্য চারটে পরিবর্তনকেও ধরা হয়ে গেল, অর্থাৎ ছটি বিকারের কোন বিকারই তার হয় না। *ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ*, এটা হল একটা।

যদিও মন্ত্রে জন্ম আর মৃত্যু এই দুটি বিকারের কথা বলছেন, কিন্তু অনেক সময় খুব কাব্য করে বলা হয়, জীবনের নাশ বলে কিছু নেই, আছে শুধু পরিবর্তন, তুমি আজ আছ কাল মরে পঞ্চভূতে লয় হয়ে যাবে, তোমার আবার কিসের নাশ। ছিলে তুমি সাড়ে তিন হাতে, মরে গিয়ে হয়ে গেলে দেড় সের ছাই। সেই ছাই চলে গেল ক্ষেতে, সেখান থেকে তুমি হয়ে যাবে শস্য, তাই তোমার নাশ নেই। সত্যিই কি তাই? একেবারেই না, তোমার বিপরিণমতেই বলে দিচ্ছে তুমি আগাগোড়া বিকারী। পদার্থ বিজ্ঞানীরা বলছেন energy neither be created neither be destroyed। এই কথাকে আধার করেই বলা হয় sum total of energy in the universe is always same। তাহলে দাঁড়ায় এনার্জির জন্ম নেই মৃত্যু নেই, এনার্জিই তো আত্মা হয়ে গেল। আমাদের ঋষিরা বলবেন, না বাপু এনার্জিকে আমরা আত্মা বলতে পারব না, কারণ এনার্জি সব সময় তার রূপ পাল্টাচ্ছে। Potential energy kinetic energy হচ্ছে heat energy motionএ চলে যাচ্ছে। হাতের তালু ঘষে দিন মোশানটা তাপে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে, এই তাপ বিপরিণমতে, সেইজন্য এনার্জি আত্মা নয়। তাহলে প্রাণই আত্মা, কারণ প্রাণের জন্ম নেই মৃত্যু নেই, কিন্তু প্রাণও তার আকার পরিবর্তন করে, বিপরিণমতে, সেইজন্য প্রাণ আত্মা নয়। গ্লাশে গরম জল রেখে দিলে আধ ঘন্টার মধ্যে জল ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, অপক্ষিয়তে, তাপের নাশ হয়ে গেল। Sum total of energy তো ঠিকই আছে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এনার্জি একটা থেকে আরেকটাতে ক্রমাগত পাল্টাচ্ছে। কিভাবে পরিবর্তন হচ্ছে? এনার্জি বস্তু হয়ে যায়, বস্তু আবার এনার্জি হয়ে যায়, এনার্জি সেইজন্য আত্মা নয়। যা কিছুই নিয়ে আসা হোক আর যেভাবেই নিয়ে আসুক না কেন, ছটি বিকারের যে কোন একটি বিকার তার মধ্যে আসবে। সেইজন্য ছটি বিকারকে সব সময় রাখতে হয়। আমাদের ঋষিরা শুধু যদি জায়তে ম্রিয়তে রেখে দিতেন আর এভাবেই যদি চলত আর এরপর কাউকে

এই মন্ত্র বলে দিলে সেও বলে দেবে উপনিষদ যা বলছে ঠিকই তো বলছে, এটাই তো এনার্জি, এনার্জির জন্ম নেই মৃত্যু নেই। আর *বিপশ্চিৎ*, যাঁর বোধ করার ক্ষমতা আছে, চৈতন্যবান, এনার্জিই যখন মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে কাজ করে তখনই তো সে চৈতন্যবান। সব কিছু মিলে গেল, এনার্জিই আত্মা। বিদেশীরা প্রমাণিত করে দিল মনই চৈতন্যের জন্ম দেয়, মনের থেকে উৎপন্ন মানেই এনার্জি, এনার্জি মানেই চৈতন্য। যেদিক দিয়েই নিয়ে যাবে সেদিক দিয়ে এনার্জিই শেষ কথা। এরা বলবে আমি উপনিষদের কথাই তো বলছি। সেইজন্য ভাষ্য সহ উপযুক্ত আচার্যের কাছে উপনিষদ অধ্যয়ন না করা হলে মন্ত্রের অর্থ পুরো তালগোল পাকিয়ে যাবে। প্রথম বিকার আর শেষ বিকার বলে দিলেন, স্বাভাবিক ভাবেই মাঝখানের চারটে বিকারকেও বলে দেওয়া হল। এখানে সব থেকে প্রধান বিকার হল বিপরিণমতে, যে বিকারের জন্য এনার্জিকে নাকচ করে দেওয়া হচ্ছে। এনার্জি বস্তুতে রূপান্তরিত হচ্ছে, বস্তু আবার এনার্জিতে রূপান্তরিত হচ্ছে, এই ব্যাপারটা আইনস্টাইন এসে বললেন। আইনস্টাইনের আগে যদি বলা হত তখনও সেটা ঠিক হত না, কারণ বাচ্চা বয়সেই ফিজিক্সে পড়তে হয় sum total of potential energy and kinetic energy all the same, কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখন দেখিয়ে দিচ্ছেন পদার্থ কিভাবে এনার্জিতে পাল্টে যায় আবার এনার্জি পদার্থে পাল্টে যায়। এই যে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে, এটাই প্রমাণিত করে দিচ্ছে প্রাণ আত্মা নয়।

বিপশ্চিৎ, বিপশ্চিৎকে আচার্য বলছেন মেধাবী, যাঁর মেধা আছে, যিনি সব কিছুকে গ্রহণ করতে পারেন। এখানেও বলছেন আর পরেও বিভিন্ন জায়গায় বলা হয় যে আত্মার কাজই হল ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যা কিছু সে পায় সব আত্মাতে গিয়েই লয় হয়, আত্মাই সব কিছুকে বোধ করে, বোধ করাটাই আত্মার কাজ। সেইজন্য বলছেন মেধাবী, আত্মা হলেন মেধাবী। বোধ কখন বুদ্ধি দিয়ে হয় না, একমাত্র আত্মাই আত্মা দিয়ে বোধ করেন, আত্মা *বিপশ্চিৎ*।

নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ, যদি এমন হয়ে থাকে যে অন্য কোন ভাবে আত্মা উৎপন্ন হয়ে থাকে। না, অন্য কোন ভাবে আত্মা আসেনি। অন্য কোন ভাবে যে আপনি নিয়ে আসবেন তাও না, আর এমনও নয় যে *কশ্চিদর্থান্তরভূতঃ*, আচ্ছা ঠিক আছে অন্য কিছু থেকে আত্মার উৎপন্ন হয়নি, কিন্তু নিজের থেকেই নিজের জন্ম হয়েছে। বলছেন, না তাও নয়। অন্য কোন কারণে আত্মা কোথাও থেকে আসেনি, কোন কিছু থেকে তাঁর জন্ম হয়নি। কেন জন্ম হয়নি বলছেন? আত্মা *অজঃ*, আত্মা অজন্মা। নিজে থেকেও তাঁর জন্ম হয়নি অপর কোন কিছু থেকেও জন্ম হয়নি। সেইজন্য এখানে বলছেন *অজো নিত্যঃ*। আর কি? *শাশ্বতোহপক্ষয়বিবর্জিত*, শাশ্বত মানে যাঁর অপক্ষয় হয় না। ষড়্‌বিকারের পঞ্চম বিকার অপক্ষয় আত্মার হয় না, মানে আত্মার যে একটু একটু করে ক্ষয় হতে থাকবে, তা কখনই হয় না। তাই আত্মা হলেন শাশ্বত, শাশ্বত মানেই নিত্য। যখনই নিত্য বলা হয়ে গেল তার মানে তাঁর কখনই ক্ষয় হবে না। তার সাথে বলছেন অজঃ, আত্মার জন্ম নেই। নিত্য আর শাশ্বতের মধ্যে দেশ ও কালেরও একটা ব্যাপার থেকে যায়। গতকালও ছিল, আজকেও আছে আর আগামীকালও থাকবে, সেইজন্য বলছেন নিত্য আর আত্মার কখনই কোন ধরণের নাশ হয় না। কোন ধরণের নাশ হয় না, তাই তিনটে কালেই সমান ভাবে থাকেন। তিনটে কালেই যে সমান থাকে তার কখনই নাশ হয় না। এগুলো সবই একটার সাথে আরেকটা জুড়ে আছে। সেইজন্য একটা বলে দিলেই সবটাই বলা হয়ে যায়, কিন্তু সবার বুদ্ধি তো আর এত তীক্ষ্ণ নয়, সেইজন্য যাঁরা শুনছেন তাঁদের জন্য আরেকটু ব্যাখ্যা করে বলে দিচ্ছেন।

আর বলছেন *পুরাণঃ*, আচার্য পুরাণের সংজ্ঞা দিচ্ছেন *পুরাণঃ পুরাপি নব এবেতি*, পুরনো কিন্তু একেবারে নতুনের মত। যখন বিভিন্ন জিনিষের অবয়বকে মিলিয়ে একটা আলাদা জিনিষকে দাঁড় করান হয় তখন সেই জিনিষকে নতুন বলা হয়। আচার্য এখানে ঘটের উপমা দিচ্ছেন, মাটি, জল, চাক, আগুন এগুলো মিলিয়ে একটা ঘটের জন্ম হয়, ঘট হল নতুন। আত্মা নিত্য নতুন। কেন নিত্য নতুন? যাঁদের আত্মজ্ঞান হচ্ছে তাঁদের কাছে নতুন রূপে এল, অথচ আত্মা অতি পুরনো, চিরদিনই আছেন। পুরাণ মানে তার বৃদ্ধি নেই, ষড়্‌বিকারে বর্ধতে আছে, বর্ধতের ব্যাপারটা থাকছে না। আত্মা চিরকালই আছেন, অথচ যাঁদের আত্মজ্ঞান হয়ে গেল তাঁদের কাছে নতুনের মত হয়ে এল। আত্মার কথা যাঁরা শ্রবণ করছেন তাঁদের কাছে নতুনের মত লাগছে। এই প্রজন্ম চলে গিয়ে নতুন প্রজন্ম আসবে, তাদের কাছেও আত্মার কথা নতুনের মত লাগবে। তাই বলছেন পুরনো অথচ নতুনের মত। এখান থেকেই পুরাণ শব্দ এসেছে। পুরাণের কাহিনীগুলো পুরনো কিন্তু একেবারে

নতুনের মত, শোনার পর মনে হবে সাম্প্রতিক কালের ঘটনা, বর্তমান কালেও নতুন বলে বোধ হয়। পুরনো জিনিষকে যখন নতুন বলে বোধ হয় তখন তাকে বলা হয় পুরাণ।

অজঃ, নিত্যঃ, শাশ্বতঃ এই ধরণের বৈশিষ্ট্য যাঁর তিনি আকাশের মত অবিকারী। আকাশকে আমরা আত্মার সব থেকে কাছের উপমা ভাবতে পারি। আকাশ হল অবিকারী, আকাশকে খণ্ডিত করা যায় না। মাঝখানে একটা দেওয়াল তুলে দিয়ে বলছি এই ঘর আর ঐ ঘর আলাদা। কিন্তু আকাশ আকাশই, সব আকাশ এক। ভারত পাকিস্থানের সীমান নিয়ে কত লড়াই কত বিবাদ, কিন্তু আকাশ এক, ভারত পাকিস্থানের সীমারেখা টেনে দিয়ে আমরা আলাদা করে রেখেছি। মাটিকে আমরা খণ্ডিত করতে পারি কিন্তু আকাশকে আমরা কিভাবে খণ্ডিত করব, কখনই করা যাবে না। যেহেতু তিনি আকাশের মত, যাঁর বিভাজন কৃত্রিম, বাস্তবিক নয়, যাঁকে খণ্ডিত করা যায় না, সেইহেতু তাঁকে বলছেন *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*। আত্মাকে কেউ বধ করতে পারে না, আত্মাও কাউকে বধ করতে পারেন না। এর দ্বারা সমস্ত ক্রিয়ার অভাব আর এর উপরেও সমস্ত ক্রিয়ার অভাব হয়ে গেল। এখানে বলছেন বধ করা যায় না, এর সাথে সাথে অন্য ক্রিয়াও নিষেধ হয়ে যাচ্ছে। একে যেমন বধ করা যাবে না, তেমনি একে দগ্ধ করা যাবে না, সিক্ত করা যাবে না, শুষ্ক করা যাবে না, এইভাবে সমস্ত রকমের ক্রিয়ার অভাব হয়ে যায়। গীতায় ভগবান যে বলছেন *নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ* সেখানেও একই কথা বলছেন। আত্মার উপর যে কোন ক্রিয়ারই অভাব, কারণ তিনি অবিকারী। যে জিনিষের অঙ্গ আছে, অবয়ব আছে তাকেই সিক্ত করা যাবে, তাকেই কেটে আলাদা করা যাবে, কিন্তু যে জিনিষ অখণ্ড একটি বস্তু তাকে কি করে আলাদা করবে! এই জিনিষ ধারণা করাও কঠিন, কারণ one single জিনিষ আমরা কখনও দেখি না। এই জগতে one single জিনিষ নেই, আগে জানত এ্যাটম one single জিনিষ, সেইজন্য বলত এ্যাটমকে ভাঙা যাবে না। কিন্তু পরে যখন এ্যাটমকে ভেঙে দিল তখন আরও অনেক জিনিষ বেরিয়ে এসেছে। এ্যাটমও নানা রকম অবয়ব দিয়ে তৈরী। যে জিনিষটা বিভিন্ন রকম অঙ্গ দিয়ে নির্মিত সেই জিনিষের উপরই ক্রিয়া করা যায়। পরের মন্ত্রে বলছেন –

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।।১/২/১৯।।

(হননকারী যদি মনে করে যে আত্মাকে হত্যা করব, বা হত ব্যক্তি যদি মনে করে আমি হত হয়েছি, তবে এরা দুজনেই অজ্ঞ। কেন না আত্মা কাউকে হত্যাও করেন না, কিংবা নিজেও হত হন না)

এই মন্ত্রটিও পরে গীতাতে নেওয়া হয়েছে। নচিকেতা আত্মার ব্যাপারে যমরাজকে প্রশ্ন করেছিলেন মৃত্যুর পর কিছু আছে কিনা। এরপর যমরাজ আত্মার ধর্মের ব্যাপারে বলতে শুরু করে প্রথমে বলছেন *ন জায়তে ম্রিয়তে* বা আর শেষে বলছেন *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*। তাতে লোকেরা মনে করতে পারে যুদ্ধে এ ওকে মারল, ও তাকে মারল, সেখানে তাহলে কে কাকে মারছে? সেইজন্য এই মন্ত্রে বলছেন, যারা লৌকিক পুরুষ অর্থাৎ অনাত্মজ্ঞ তাদের দৃষ্টিতে তারা ঠিকই বলে কিন্তু যাঁরা আত্মজ্ঞ তাঁদের দৃষ্টিতে কেউ মরে না। আত্মজ্ঞের দৃষ্টিতে বলছেন *হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্*, যদি হন্তা মনে করে অর্থাৎ যে মারছে সে যদি মনে করে আমি তাকে মেরে দিয়েছি, আর যে মারা যাচ্ছে সে যদি মনে করে আমাকে মেরেছে, তাহলে বুঝতে হবে *উভৌ তৌ ন বিজানীতো*, এরা উভয়েই জানে না যে *নায়ং হন্তি ন হন্যতে*, আত্মা কাউকে মারেনও না আর মরেনও না। ব্রহ্মজ্ঞ আর অনাত্মজ্ঞ দুজনের মধ্যে তফাৎ এই জায়গাতে অর্থাৎ ক্রিয়া আর ক্রিয়া বিরোধে এসেই ধরা পড়ে। এখানে মারা আর মার খাওয়া উপলক্ষ মাত্র। এই দুটো ক্রিয়াকে আলম্বন করে প্রত্যেকটি ক্রিয়ার অভাব। যেমন গিরিশ ঘোষ ঠাকুরকে বকলমা দিলেন। বকলমা দেওয়ার পর গিরিশ ঘোষ বলছেন, যদি সম্ভব হয় করব। ঠাকুর বলছেন, এখন আর তুমি এই কথা বলতে পার না, কারণ তুমি আমাকে বকলমা দিয়ে দিয়েছ। এই কথা না বলে বলবে তাঁর ইচ্ছা হলে হবে। কাউকে Power of Attorney দিয়ে দেওয়ার পর সে আর কিছু করতে পারবে না, যাকে Power of Attorney দেওয়া হয়েছে সেই সব করবে। ঠিক তেমনি যিনি আত্মজ্ঞ তিনি কোন ক্রিয়ার মধ্যেই ব্যক্তির সম্পর্ক বা আত্মার সম্পর্ক দেখেন না।

এখানে বলছেন *হন্তা চেন্মন্যতে*, যে মনে করে আমি মেরেছি, আমি হল এখানে মূল কথা। আমি বলতে কে? অধ্যাত্ম শাস্ত্রের পুরোটাই 'আমি' কে পরিভাষিত করতে চলে যায়। জীবন শুরু হয় অহং অস্মি বা

অভিনিবেশ, আমি আছি থেকে আর এই জীবনচক্রের শেষ হয় অহং ব্রহ্মাস্মিতে গিয়ে। দুটোতেই অহং অস্মি থাকছে কিন্তু শুধু ব্রহ্ম এই একটি শব্দকে মাঝখানে বসাতে আমাদের কোটি কোটি জন্ম লেগে যায়। একটা এক কোষী প্রাণীরও চেতনা আছে যে আমি আছি, সে তাই খাবারের দিকে এগিয়ে যায়, বিনাশ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। মানুষের মধ্যেও অহং অস্মি আমি আছি এই বোধ আছে। কিন্তু এই আমিটা কে? যখনই বিচার করতে যাওয়া হবে তখন এই আমিকে একটা গতিশীল দেখাবে, অনবরত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যতই পরিবর্তিত হতে থাকুক না কেন শেষ পর্যন্ত আমি শরীর, আমি মন, এই বোধের মধ্যেই ঘুরতে থাকবে। এই যে আমি, আমি বোধ, অহং বোধ এই আমিকেই লোকে মনে করে আমি। অনাত্মজ্ঞ আর আত্মজ্ঞের মধ্যে এটাই তফাৎ। অনাত্মজ্ঞ নিজের দেহ, মন, বুদ্ধির মধ্যে যে সংঘাত, এই সংঘাতের সাথে নিজেকে এক মনে করে। যিনি আত্মজ্ঞ তিনি আমি বলতে জানেন সেই সর্বব্যাপী আত্মা। আত্মজ্ঞ পুরুষ যখন আমি বলেন তখন তিনি আত্মাকেই উপলক্ষ করে আমি বলছেন। কথামৃত খুব খুঁটিয় পড়েলে দেখা যাবে ঠাকুর কখন আমি শব্দটা ব্যবহার করতেন না। আমার জন্য না বলে বলতেন এখানকার জন্য দিয়ে যেও। আমি যদিও বা কখন বলতেন তখন তিনি আত্মার অর্থেই আমি বলতেন, আমি তাকে বললুম, আমি বললুম মানে, চেতনার যে সেই স্তর যেখান থেকে এই কথা বেরোচ্ছে, ঐ অর্থে বলছেন, আমরা যে অর্থে আমি বলতে দেহ, মন, বুদ্ধি ভাবি ঐ অর্থে নয়। ঐ অর্থে ঠাকুর কখনই আমি ব্যবহার করতেন না। লোকব্যবহারার্থে ঠাকুর যে আমি বলতেন তাতে আমি বলতে যে বোধ সেই বোধ ঠাকুরের কখনই ছিল না, ওনার সব সময় সেই সর্বব্যাপী আত্মার বোধটাই থাকত। আত্মজ্ঞ আর অনাত্মজ্ঞের মধ্যে পার্থক্য যদি বুঝতে হয় তাহলে তাঁর কার্যকে আর তাঁর প্রতি অপরের কার্যকে দেখতে হবে। সত্যিকারের আত্মজ্ঞ পুরুষকে যদি কেউ একটা চড় মারে তিনি বলবেন গালে খুব ব্যাথা লাগল তবে আমার লাগেনি গালের লেগেছে। সেইজন্য মৃত্যু, যেটা ঐ অহং অস্মি বোধকেই নাশ করে দিচ্ছে তার তুলনায় ব্যাথা, কোন কিছু হারিয়ে যাওয়া, কোন ক্ষতি হয়ে যাওয়া এগুলো অনেক মামুলি। জীবনের মূল্য শ্রেষ্ঠ, কিন্তু জীবন নাশ হয়ে গেলেও আত্মজ্ঞ পুরুষের ঐ বোধটাই হয় না। এগুলো ধারণা করা আমাদের পক্ষে সত্যিই খুব কঠিন, বাস্তবে আমরা এই ধরণের ঘটনা দেখতে পাই না। কিন্তু একেবারেই যে দেখা যায় না তাও নয়। ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনায় আমরা দেখি যে যেখানে জীবনকে মূল্য না দিয়ে মানুষ অন্য কিছুকে মূল্য দিয়েছে। দেশপ্রেমিক বা সৈনিকদের উপমা নিয়ে আসা যায়, কিন্তু এখানে এদের উপমা পুরোপুরি ঠিক হবে না। কারণ দেশপ্রেমিক বা সৈনিক যখন নিজের মাতৃভূমিকে ভালোবাসে তখন সে বলে আমি দেশের জন্য প্রাণ দিতে রাজী আছি, কিন্তু তখনও সে চেষ্টা করে যদি বাঁচার কোন পথ থাকে। এর খুব ভালো উপমা হল, মুসলমানরা যখন রাজস্থানে আক্রমণ করত তখন সেখানকার মেয়েরা জহর ব্রত নিয়ে নিতে, তারা তাদের সতীত্বের সাথে নিজেদের এক করে নিয়েছিল। ব্রাহ্মণরা বলতেন তুমি আমার গলা কেটে দেবে দাও তবুও আমি মুসলমান হব না। তাঁর কাছে তাঁর ধর্ম, তাঁর সম্মান জীবনের থেকে অনেক মূল্যবান। রাজস্থানের মেয়েরা হাসতে হাসতে মৃত্যুকে বরণ করে নিত, আর একজন দুজন নয়, হাজারে হাজারে। নিজের স্বামী ছাড়া আমার মরে যাওয়া অনেক ভালো। তারা যে হতাশায় মৃত্যুকে বরণ করত তা নয়, মরার সময় রীতিমত শৃঙ্গার করে নিত। এই জিনিষ কল্পনা করা যায় না। বিদেশীরা এই নিয়ে অনেক কথা বলে, আহা! এই সুন্দর জীবনটাকে তারা এভাবে অকারণে বিসর্জন দিয়ে দিল। অকারণে মানে! মুসলমানদের বিয়ে করলে কি খুব ভালো হত! আগেকার দিনে মেয়েদের কাছে সম্মান বা শালীনতার এত মূল্য ছিল যে তারা জীবনকে কোন গ্রাহ্যই করত না। অন্য ধরণের মেয়েও ছিল যারা জীবনকে মূল্য দিত। এই জায়গাতে এসে গোলমাল হতে শুরু করল। দায় এড়াবার জন্য আর সম্পত্তির ভাগ না দেওয়ার জন্য বিধবাদের পুড়িয়ে মারত, এগুলো বর্বরতার নিদর্শন। কিন্তু এখনও দেখা যায় যাকে ভালোবেসেছে সে ছেড়ে দিতেই গলায় দড়ি দিয়ে দিচ্ছে, তার কাছে জীবনের কোন মূল্য নেই। ফিল্ম অভিনেত্রীর কাছে সাফল্য, নাম-যশটাই আমি, এই শরীরটা তাদের আমি নয়। এগুলো না পেলে চরম হতাশায় গলায় দড়ি দিয়ে দিচ্ছে। অন্য দিকে জহর ব্রতে কোন হতাশার চিহ্ন নেই। তারা আগে থাকতেই বলে দিচ্ছে যদি এই রকমটি হয় তাহলে আমি চিতায় প্রবেশ করব।

সক্রেটিসের জীবনে মূল্যের ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার বোঝা যায়। সক্রেটিস সত্যের আদর্শকে নিজের জীবনের থেকেও বেশি মূল্য দিয়ে গেছেন। সবাইকে সত্যের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। এথেন্সের কারাগারে তাঁকে রুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। সক্রেটিসের পক্ষে অনেক প্রভাবশালী লোক ছিল, তারা বলছে জেল থেকে আপনাকে

বার করে নেওয়ার প্ল্যান করা হয়েছে, জেলের কিছু রক্ষীকে টাকা দিয়ে আমরা আপনাকে লুকিয়ে বার করে নিয়ে যাব। সক্রেটিস অবাক হয়ে বলছেন 'তোমরা কী বলছ! যে আদর্শের জন্য আমি সারা জীবন কাটালাম সেই আদর্শকে এই তুচ্ছ শরীরের জন্য ত্যাগ করে দেব! আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব'। সক্রেটিসকে যখন বিষপান করতে দেওয়া হল, তিনি আরামসে সেই বিষ পান করে নিলেন, পান করে আবার জিজ্ঞেস করছেন কি করলে তাড়াতাড়ি বিষ সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে যাবে? বলা হল, পায়চারী করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পায়চারী করতে শুরু করে দিলেন। তখনও তিনি দর্শনের আলোচনা করে যাচ্ছেন। গায়ে কাঁটা দেওয়ার মত ঘটনা। মৃত্যুকে জয় করে নিয়েছেন, শরীরের কোন মূল্যই নেই। আমি সত্যে প্রতিষ্ঠিত, আমি সত্যকে নিয়েই কথা বলি, আর ধর্মপ্রচারই আমার জীবন শৈলী। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল অমুক লোকের থেকে মুরগী কেনেছিলাম তার দাম দেওয়া হয়নি। এক শিষ্যকে বলে দিলেন মুরগীর দাম দেওয়া হয়নি ওকে মূল্যটা দিয়ে দিও। জ্যামিতিতে অর্কিমিডিসের বিশাল অবদান। তখনকার দিনে গ্রীস দেশে সবাইকে যুদ্ধ করতে হত। একবার যুদ্ধের সময় তিনি জ্যামিতির কিছু সমস্যার সমাধান করছিলেন আর ঠিক সেই সময় বিরুদ্ধ দলের সৈন্যরা অর্কিমিডিসকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। এবার তাঁকে শত্রুরা মেরেই ফেলবে। অর্কিমিডিস তখন খুব গম্ভীর ভাবে বলছেন 'দাঁড়াও! আমাকে আগে জ্যামিতির এই সমস্যাগুলো শেষ করে নিতে দাও আর আমার মৃত্যুর পর জ্যামিতির এই ফিগারগুলো তোমরা নষ্ট করে দিও না'। সৈন্যরা ঠিক তাই করল, জ্যামিতির ফিগারগুলো তৈরী হয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে অর্কিমিডিসকে শেষ করে দিল। ফিগার গুলোও নষ্ট করল না। অর্কিমিডিসের আত্মা বিদ্যাতে প্রতিষ্ঠিত। আমি মরে যাই তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু আমার আত্মা এই বিদ্যার যেন নাশ না হয়। সক্রেটিসের আত্মা কোথায়? মূল্যবোধে তাঁর আত্মা প্রতিষ্ঠিত, মূল্যবোধের সাথে আমি কোন কিছুর বিনিময়ে আপোষ করব না।

রাজস্থানের মেয়েরা চিতায় প্রবেশ করে যাচ্ছে বা সক্রেটিস ও অর্কিমিডিসের কথা বলা হল, সবারই ক্ষেত্রে শরীরের থেকে আত্মার ভাব বৃহৎ হয়ে গেছে। আর শেষ যেটা হয় সেটা উপনিষদ বর্ণনা করছেন, তিনি নিজেকে বৃহতের সঙ্গে এক মনে করেন। স্বামীজী একজন আত্মজ্ঞ পুরুষ আর সক্রেটিস আদর্শে প্রতিষ্ঠিত, দুজনের মধ্যে কি কোন তফাৎ আছে? মূলতঃ তফাৎ কিছু নেই, কিন্তু আমরা আত্মজ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়ে থাকি, জ্ঞানের তুলনায় আমরা মূল্যবোধকে একটু কম মূল্য দিই। তাই মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠিত পুরুষকে আমরা এক ধাপ নীচে দেখি। কিন্তু বিদেশীদের কাছে মূল্যবোধই শেষ কথা। এগুলো বুদ্ধিজীবিদের তর্কের বিষয়। কিন্তু আমাদের বক্তব্য মানুষ যে শুধু তার দেহ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারকেই আত্মা ভাবে তা নয়, এর বাইরেও অনেক কিছুর সাথে আত্মভাব জড়িয়ে থাকে। সন্তানের উপরে কোন বিপদ এলে মা নিজের জীবন বিপন্ন করে সন্তানকে রক্ষা করবে। রাজস্থানের মেয়েরা যে চিতায় প্রবেশ করত তারা খুব শান্ত মনে রীতিমত সাজগোজ করে নিত। অর্কিমিডিসকে সৈন্যরা মেরে ফেলবে তখনও তিনি বলছেন, এই জ্যামিতিক ফিগারগুলো নষ্ট করো না, পরে এগুলো কাজে লাগবে। শুধু ভারতেই নয় সারা বিশ্বে এই ধরণের বহু দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে।

এখানে বলছেন *হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং*, শুধু কাটাকাটি নয় যে কোন ক্রিয়ার অভাব। ক্রিয়াতেই ধরা পড়ে যায়। সক্রেটিস যদি বলতেন, ঠিক আছে আমাকে জেল থেকে কায়দা করে বার করে নিয়ে যাও, আমার শরীরটাই সব, মরেই যদি যাই তাহলে আর কি লাভ হবে। তাতে কিন্তু সক্রেটিসকে নিয়ে হাসাহাসি হত না। খুব হলে কেউ বলবে, আপনি এত মূল্যবোধের কথা বলেন আর আপনি নিজে অন্য রকম করছেন? কিন্তু আত্মজ্ঞ পুরুষ যদি এই রকম করেন, তাহলে বুঝতে হবে তাঁর এখনও আত্মজ্ঞান হয়নি। অনাত্মজ্ঞরাই একমাত্র এই ধরণের আচরণ করতে পারে।

আচার্য শঙ্কর শেষের দিকে একটা খুব দামী কথা বলছেন, শ্রুতি প্রমাণ ও যুক্তি দিয়ে এটাই দেখা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞানীর দ্বারা এই চিন্তন কখনই সম্ভব নয় যে কারুর মৃত্যু হতে পারে। একটা জিনিষ সত্য কিনা জানার জন্য তিনটে জিনিষ লাগে – শ্রুতি, যুক্তি আর অনুভূতি। শ্রুতি প্রমাণ মানে উপনিষদ বলছেন আত্মজ্ঞ পুরুষ কখন মৃত্যুকে মূল্য দিতে পারেন না, কারণ সর্বব্যাপীর আবার মৃত্যু কিসের! যুক্তি দিয়েও যদি দেখা হয় তাহলে তাই হবে, তিনি তো সর্বত্র বিদ্যমান, যিনি সর্বত্র বিদ্যমান তার আবার মৃত্যু কিভাবে হবে! আমরা তৃতীয় যেটা যোগ করলাম, আচার্য যেটা এখানে যোগ করছেন না, যদিও অন্যান্য জায়গায় যোগ করেন কিন্তু

এখানে করেননি, আমরা যে কটি ঘটনার উল্লেখ করলাম, যেমন সক্রেটিস বা স্বামীজী আলেকজাণ্ডারের যে কাহিনী বলেছিলেন এগুলো সবই প্রত্যক্ষ অনুভূতি। যে মানুষ কোন আদর্শকে ভালোবাসতে শুরু করে দেয় বা ভাবরাজ্যে চলে যায় তার কাছে শরীরের কোন দাম থাকে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যদি বলা হয় আপনার সমস্থ সাহিত্য রচনা পুড়িয়ে দেওয়া হবে আর তা না করতে দিলে আপনার মৃত্যু হবে, আপনি কোনটা চাইছেন? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিঃসঙ্কোচে বলবেন আমাকে মৃত্যু দিয়ে দিন, এই সাহিত্য অমূল্য এগুলো যেন চিরদিন থাকে। যাঁরা ঠিক ঠিক চিন্তন রাজ্যে বিচরণ করেন তাঁরা শরীরের কোন মূল্য দেন না। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানী চিন্তার জগতে থাকেন না, তাঁর অস্তিত্ব একটা অন্য স্তরে বিচরণ করে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সব কিছুর সাথে নিজেকে এক দেখেন। সেইজন্য যুক্তিতে এটাই হয় যে, তিনি কখন নিজেকে শরীরের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারবেন না। তফাৎটা কোথায়? সক্রেটিস মূল্যবোধকে ভালোবাসছেন, রাজস্থানের মেয়েরা তাদের মর্যাদা, সতীত্বকে ভালোবাসছে, অর্কিমিডিস বিদ্যাকে ভালোবাসছেন, ভালোবাসার জন্য সবাই নিজের দেহকে উৎসর্গ করছেন। কিন্তু যিনি আত্মজ্ঞ তাঁর কোন কিছুর প্রতি ভালোবাসা নেই, জগতের সব কিছুতে তিনি নিজেকেই দেখছেন। আত্মজ্ঞের সাথে বাকিদের এটাই তফাৎ। ব্যাপারটা এই রকম হবে, একজন এসে বলল, আমি আপনাকে শেষ করে দেব। কিভাবে শেষ করবে? আপনার জামাটা নিয়ে চললাম। আমার জামা নিয়ে চলে গেলে আমি কি শেষ হয়ে যাব নাকি! আত্মজ্ঞের কাছে ঠিক এই ব্যাপারটাই হয়। যদি বলা হয় আপনার শরীর দু টুকরো করে দেওয়া হবে। আত্মজ্ঞের কাছে শরীরটা জামার মত। জামা দু টুকরো করে দিলেও তিনি তো থেকেই যাচ্ছেন। শরীর চলে গেলে তিনি চাইলে আরও দশ খানা শরীর সঙ্গে সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দিতে পারবেন। কারণ সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষমতা তাঁর মধ্যে। ঠাকুরের শরীর চলে গেলে কী আছে, তিনি তো অবতার, চাইলে তিনি কালই আবার একটা শরীর নিয়ে অবতীর্ণ হয়ে যেতে পারেন। আত্মজ্ঞ পুরুষের কাছে শরীরের আর কোন মূল্য থাকে না। আত্মজ্ঞ আর অনাত্মজ্ঞের মধ্যে তফাৎ ধরা পড়ে ক্রিয়া নিয়ে। তিনি কি মনে করছেন তাঁর উপর ক্রিয়া হচ্ছে, তিনি কি মনে করছেন তিনি কোন ক্রিয়া করছেন? এটাই এই মন্ত্রে বলছেন। কিন্তু যদি এই রকম হয়, শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি দিয়ে দেখছি যে, কোন ক্রিয়া হয় না, কিন্তু যেখানে কোন ক্রিয়াই হয় না সেখানে আমি জানব কি করে, জানার কিছু তো একটা পথ থাকতে হবে। তখন এই কুড়ি নম্বর মন্ত্রে এর উত্তর দিচ্ছেন –

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাহস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়ম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ।।১/২/২০।।

(সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর এবং বিশাল থেকে বিশালতর এই আত্মা প্রত্যেক জীবের হৃদয়গুহায় অবস্থিত। নিষ্কাম পুরুষ অন্তঃকরণের শুদ্ধতা বশতঃ আত্মার দর্শন করে শোকাতীত হয়ে যান।)

কঠোপনিষদে এই মন্ত্রের একটা বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। *অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্* আত্মার ব্যাপারে উপনিষদের এটি একটি খুব প্রচলিত ভাব। আত্মা সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম আর মহৎ থেকেও মহৎ। কেন সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম আর কেন মহৎ থেকে মহৎ? অস্তিত্ব আছে মানেই আত্মা আছেন, কারণ আত্মা হলেন সৎ, চিৎ ও আনন্দ। কোন জিনিষের অস্তিত্ব থাকলে আমরা বলছি আছে, আছে বলা মানেই সৎ, সৎ মানেই আত্মা। যেটা সূক্ষ্মতম, আগেকার দিনে বটবৃক্ষের বীজের তুলনা করতেন, বটবৃক্ষের বীজ অতি ক্ষুদ্র, তিল, সরষে এগুলোও খুব ছোট। পদার্থ বিজ্ঞানের দৌলতে আমরা এখন জানি ইলেক্ট্রন প্রোটন, আমরা জানি কোয়ার্ক্স, কোয়ার্ককে তাও শুধু গাণিতিক পদ্ধতি দিয়ে জানা যায়। যদি বলা হয় কোয়ার্ক আছে, আছে বলা মানেই সেখানে আত্মা আছেন, কারণ আছে মানেই সৎ আর সৎ মানেই আত্মা। বিজ্ঞান যতই পেছনে নিয়ে যাক, আগামীকাল যদি কোয়ার্কের পেছনে আরও কিছু বার করে নেয় তাহলে সেখানেও আত্মা থাকবেন, কারণ তার অস্তিত্ব এসে গেল। যেখানেই কোন কিছুর অস্তিত্ব এসে গেল সেখানে তখনই আত্মা এসে যাবেন। যেখানে আত্মা নেই সেখানে তার অস্তিত্বও নেই। যেমন কেউ বলল গাধার শিং, গাধার শিংএর কোন অস্তিত্ব হয় না, তাই সেখানে আত্মা নেই, আত্মা নেই সেইজন্য গাধার শিংএর অস্তিত্বও নেই। যে কোন জিনিষের যার অস্তিত্ব নেই তার আত্মা নেই, বা যেখানে আত্মা নেই সেখানে সেই জিনিষের অস্তিত্ব নেই।

আত্মার বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে এবার বলছেন আত্মা অণু, সব থেকে ছোট। এতই ছোট যে, যে ছোট জিনিষের আমরা কল্পনাই করতে পারি না। বিজ্ঞান যে অণুকে জানে, সেই অণুতেও আত্মা বিদ্যমান, আর *মহতো মহীয়ান্*। এই জগতে মহৎ কে? ব্রহ্মা, ব্রহ্মার থেকে কেউ বড় হতে পারবে না। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে তিনি। সেখানেও আত্মা আছেন। কারণ আত্মা না থাকলে ব্রহ্মারও অস্তিত্ব নেই। বটবৃক্ষের ছোট্ট বীজ সেটাও আত্মা আবার এই জগতে যিনি মহৎ সেই ব্রহ্মা সেটাও আত্মা। নাম রূপের খেলার মধ্যে যেটা অণু সেটাও তিনি, যেটা মহৎ সেটাও তিনি। সেইজন্য বলছেন *অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্*। তাই বলে কি আত্মা অণুতে আর মহতে গিয়ে শেষ হয়ে যায়? কেন শেষ হয়ে যাবে! বোঝার জন্য ইলেক্ট্রনের কথা বলতে পারি, যদিও ইলেক্ট্রন সব থেকে অণু নয়, আত্মা ইলেক্ট্রনের থেকেও অণু। কারণ ইলেক্ট্রনের মধ্যে যে আকাশ রয়েছে সেখানেও আত্মা বিদ্যমান। আমরা যত ক্ষুদ্র ভাবতে পারি আত্মা তার থেকেও ক্ষুদ্র। এই কারণে যত ছোট পার্টিকেলসই বিজ্ঞান নিয়ে আসুক না কেন, বেদান্তের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন দিন বিরোধ হবে না। আগামীকাল কেউ যদি প্রমাণিত করে দেন ব্রহ্মা মহৎ নন, তাঁর থেকেও বড় আছে, বিজ্ঞানীরাও বলছেন এই ইউনিভার্সের বাইরেও অনেক ইউনিভার্স আছে, আছে তো আছে তাতে বেদান্তের কিছুই যায় আসে না।

আরও আশ্চর্যের যে *আত্মাহস্য জন্তোর্নিহিত গুহায়াম্*, অথচ সেই আত্মা প্রত্যেকটি বস্তুর হৃদয় গুহার মধ্যে বিরাজ করে আছেন। আমাদের বুদ্ধিরূপ গুহার মধ্যেও বিরাজমান আর ইলেক্ট্রন প্রোটনের ভেতরেও আত্মা বিরাজমান। একটা এ্যাটমের যে সার, তার যে সত্তা সেটাও আত্মা, আর যিনি ব্রহ্মা তাঁরও যে সত্তা সেটাও আত্মা। কেন বলছেন হৃদয়রূপী গুহাতে আত্মা বিরাজমান? *তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো*, ক্রতু মানে যেখানে ক্রিয়া হয়, যজ্ঞকেও ক্রতু বলা হয়। আর *অক্রতু* মানে যিনি কোন ক্রিয়া করেন না, যিনি নিষ্কাম কর্মী যাঁর মধ্যে কোন কামনা বাসনা নেই। যাঁরা সন্ন্যাসী, খুব উচ্চমানের সাধক তাঁরা হলেন অক্রতু। *তম্ পশ্যতি*, এই রকম অক্রতু যাঁরা তাঁরা আত্মাকে বাস্তবিক দেখতে পান, এটা শুধু কোন তাত্ত্বিক কিছু নয়। যিনি অক্রতু বা যিনি নিষ্কাম কর্মী তিনি কখন কামনা রহিত হন? আচার্য বলছেন *দৃষ্টাদৃষ্টবাহ্যবিষয় উপরতবুদ্ধিরিত্যর্থঃ*, এই জগতে যা কিছু আছে, পরের জগতে যা কিছু আছে কোনটাকেই তিনি পেতে চান না। এই জগতে পাওয়ার যা কিছু আছে তা হল দৃষ্ট বস্তু, পরের জগৎ অর্থাৎ মৃত্যুর পরে যে জগৎ তাকে বলছেন অদৃষ্ট বস্তু। তিনি এই জগতের সুখও কামনা করেন না আর স্বর্গের সুখও কামনা করেন না। এই জগতে খাওয়া-পড়া-নিদ্রা কোন কিছুতেই তাঁর আগ্রহ নেই, অথচ তিনি অলস তো ননই উপরন্তু একজন সুদক্ষ কর্মী, অথচ কোন কিছুতেই তাঁর আগ্রহ নেই। তিনি যা কিছু করেন সবটাই অপরের মঙ্গলের জন্য করেন। আর *ধাতুপ্রসাদাৎ*, ধাতু শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, শরীরের ক্ষেত্রে যখন ধাতু আসে তখন ধাতু মানে ইন্দ্রিয়, যিনি ধারণ করেন তাঁকে বলা হয় ধাতা, ধাতা থেকে ধাতু। জগতের সমস্ত বস্তুকে আমরা ধাতু দিয়ে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দিয়ে ধারণ করি। হাত দিয়ে বস্তুকে ধরছি, চোখ দিয়ে দৃশ্য ধরছি, সেইজন্য এর নাম ধাতু। চোখ না থাকলে সুন্দর দৃশ্যের কোন দাম নেই, কান না থাকলে মিষ্টি শব্দের কোন দাম নেই। *ধাতুপ্রসাদাৎ*, ইন্দ্রিয়গুলি যখন আমাদের উপর কৃপা করবে তখনই আমাদের জ্ঞান হয়। ইন্দ্রিয় যদি আমাদের কৃপা না করে, ইন্দ্রিয় যদি রাস্তা না ছেড়ে দেয়, ইন্দ্রিয়গুলি যদি উপরত না হয়ে যায় তাহলে বস্তুর জ্ঞান আমাদের হবে না।

শেষে বলছেন *মহিমানমাত্মনঃ*, অক্রতু যাঁরা, যাঁরা খুব উচ্চমানের সাধক, নিষ্কাম পুরুষ তাঁরা আত্মার মহিমাকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন, সেই আত্মাকে দেখতে পান যাঁর বৃদ্ধি নেই, যাঁর ক্ষয় নেই। আত্মাকে দেখার পর তিনি বীতশোক হয়ে যান। তাঁর আর কোন ধরণের শোকও হয় না আর কোন কিছুতে আহ্লাদিতও হন না। তিনি চিরন্তন শান্তি ও অনন্ত আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান। *ধাতুপ্রসাদাৎ* এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ, ইন্দ্রিয় থেকে সরে আসা। কারণ ইন্দ্রিয় যদি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে থাকে তাহলে মন কখনই শান্ত হবে না। মন শান্ত না হলে আত্মজ্ঞান কখনই হবে না।

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ এর আরেকটা ব্যাখ্যাতে বলছেন, আত্মাকে যে মহৎ বলা হচ্ছে তার কারণ আত্মার একটি মাহাত্ম্য হল আত্মার কখন কোন পরিবর্তন হয় না। বড়ও হন না ছোটও হয়ে যান না। আত্মা যখন অণুতে চলে যান তখন তিনি তাই হয়ে যান না আবার ব্রহ্মাতে যখন চলে যাচ্ছেন তখনও তাই হয়ে যান না, এটাই তাঁর মাহাত্ম্য। তার কারণ, যে আকারেই দেখান, এ্যাটমিকেই দেখান আর ব্রহ্মাতেই

দেখান, এটাই তাঁর মায়া। সেইজন্য আত্মা ছোটর সাথে ছোটও হয়ে যান না, বড়র সাথে বড়ও হয়ে যান না। অথচ ছোট বড় দেখায়। কোন পরিবর্তন না হওয়ার জন্য ভালোর সঙ্গে ভালো দেখায় মন্দের সাথে মন্দ দেখায়, অথচ আত্মা কখনই ভালোও হন না আবার মন্দও হন না। মন্দের সাথে মন্দ হলেও মন্দ পুরুষ আত্মাকে দেখতে পাবে না। দেখা যায় এই মায়া যখন আত্মার উপর বন্ধন রূপে আসে তখন যারা মন্দ কাজ করে তাদের কাছে মায়া বেশি বন্ধন হয়, যাঁরা শুভ কর্ম করেন তাঁদের জন্য এই শুভ কর্মই বন্ধন নাশের কারণ হয়। সেইজন্য যাঁরা অক্রতু, যাঁরা ইন্দ্রিয় সমুদয়কে দমন করে নিয়েছেন, এনারা শুভ কর্ম দিয়ে ঐ অবস্থায় পৌঁছে যান। নিষ্কাম কর্ম আর ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করা দুটো একই জিনিষ। অশুভ কাজ কোনটা? স্বার্থপরতার ভাব নিয়ে কাজ করাই অশুভ কাজ। স্বার্থশূন্যে কোন কিছুই অশুভ হয় না। নিঃস্বার্থ ভাবে যে কাজই করা হোক না কেন, কখনই সেই কাজ অশুভ হবে না। নিঃস্বার্থ ভাবে যদি কেউ চুরিও করে কখনই তা মন্দ কাজ হবে না। ভালো মন্দকে নির্ধারিত করাও একটা বড় সমস্যা। যাঁরা মূল্যবোধ রচনা করেন তাঁরা ভালো মন্দকে বিভিন্ন ভাবে পরিভাষিত করেন। খ্রীষ্টান আর ইসলাম থিয়লজিতে ভালো মন্দকে সুস্পষ্ট ভাবে লাইন টেনে দেওয়া হয়েছে। যদি কোরান বা বাইবেলে মন্দ বলে থাকে তাহলে তা মন্দ, ভালো বলে থাকলে সেটা ভালো। যদি কোন কিছু না বলা থাকে, তাহলে দেখতে হবে হাদিসে কি বলেছে। হিন্দুদের কাছে এগুলো কোন সমস্যাই নয়। এখানে একটা জিনিষই ভালো মন্দের মাপকাঠি, স্বার্থপর নাকি স্বার্থহীন। যে কাজ স্বার্থ বুদ্ধিতে করে সেটাই অশুভ, নিঃস্বার্থ ভাবে যে কাজই করে সেটাই শুভ। তার মানে এখানে কাজের কোন মূল্য নেই, মূল্য হল দৃষ্টিভঙ্গীর। হিন্দু ধর্মের মূল্যবোধ আর অন্যান্য ধর্মের মূল্যবোধে এখানেই বিরাট তফাৎ হয়ে যায়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের এত পণ্ডিত, এত জ্ঞানীগুণী পুরুষ থাকতেও কেউ এগুলোকে নিয়ে কোন আলোচনা করেন না। ভালো কোনটা, কোনটা শুভ, কোনটা ভুল, মূল্যবোধ ঠিক কি, এগুলোকে বিচার করার জন্য কোন একটা মানদণ্ড থাকতে হবে। কিন্তু আমরা বলে দিচ্ছি অমুক শাস্ত্রে, বাইবেলে, কোরানে বলা আছে। এখানে আত্মাকে নিয়েই বলছেন কিন্তু বলছেন তুমি যত নিজের দিকে তাকাচ্ছ তত তুমি ক্ষুদ্র, তত তুমি মন্দ, তত তুমি অসুর স্বভাবের। যত তুমি নিজেকে বিস্তার করছ ততই তুমি মহৎ। সত্যিকারের নিঃস্বার্থ ভাবে তুমি যদি কাউকে খুনও কর, একে খুন করতে হবে কারণ এ অত্যন্ত খারাপ লোক, ওকে মেরে দিলে সমাজের শান্তি হবে, এতে আমার কিছু আসে যায় না, এই খুনে কোন দিন তোমার পাপ হবে না। আত্মজ্ঞানী তাই যে কাজই করেন সেই কাজে কখনই কোন পাপ থাকে না, কারণ তাঁর আমিত্ব বোধের সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না। আত্মজ্ঞানীর আমি পুরোপুরি আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে আছে, স্বার্থপরতা কি জিনিষ জানেনই না। তিনি কাউকে মারেনও না, মারলে সেই বোধও আসবে না। গীতায় ভগবান এই কথাই বলছেন *হত্বাপি স ইঁমাল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে*, তিনি যদি সমস্ত লোকের নাশ করে দেন তাতেও তিনি বন্ধনে পড়বেন না, কারণ সেখানে তাঁর কোন স্বার্থ জড়িয়ে নেই। তিনি চাইলে কি স্বার্থপর হতে পারেন? কখনই হতে পারবেন না। কারণ যিনি একবার জেনে গেছেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে আমি এক, তিনি চাইলেও নিজেকে এই শরীরে মনকে নামিয়ে আনতে পারবেন না। আমি জানি দাঁতটাও আমার, জিহ্বাও আমার, দাঁতে কামড় পড়ে জিহ্বাটা কেটে গেছে, আমি কি পারব একটা হাতুড়ি দিয়ে আমার দাঁতকে ভেঙে দিতে! আত্মজ্ঞানী জানেন এটাও আমি ওটাও আমি।

কঠোপনিষদের ভেতরে আমরা যত ঢুকব তত কঠিন থেকে কঠিনতর মনে হবে। অথচ ভাবলে অবাক লাগে, স্বামীজী তিরিশ বছর বয়সে উপনিষদের সব কিছু আত্মস্থ করে নিয়ে জ্ঞানযোগের উপর তাঁর সব বিখ্যাত ভাষণ দিলেন। স্বামীজীর জ্ঞানযোগ কঠোপনিষদেরই ব্যাখ্যা। স্বামীজী কঠোপনিষদের ব্যাখ্যা করছেন তাতেই কত কঠিন মনে হচ্ছে, আর তার যে উৎস সেটা কত কঠিন হতে পারে! ব্যাখ্যা সব সময় সরল হয়, কিন্তু জ্ঞানযোগ হল ব্যাখ্যা আর তার মূল হল কঠোপনিষদ। অথচ কঠোপনিষদকে বলা হয় সমস্ত উপনিষদের মধ্যে একটু সহজ, বাকি উপনিষদ আরও কঠিন। ভারতের পুরো ধর্ম, ধর্মের যা কিছু আমরা দেখছি, সব উপনিষদের উপর আধারিত। শ্রীমা যখন বলছেন 'আমি শরতেরও মা আমাজাদেরও মা', এই ভাবও উপনিষদ থেকেই আসছে। হিন্দু ধর্মের যে কোন কথাকে চোখ বন্ধ করে তুলে নেওয়ার পর যদি এর উৎসের অনুসন্ধান করা হয় তখন দেখা যাবে উপনিষদই এর উৎস। সেইজন্য উপনিষদ যদি ঠিক ঠিক বোধগম্য না হয় কোন দিন হিন্দু ধর্মকে বোঝা যাবে না। মহাভারতের এক লক্ষ শ্লোক, ভাগবত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা থেকে শুরু করে অবধূত গীতায় যা কিছু আছে সব উপনিষদ থেকে বেরিয়েছে। স্বামীজী তাই বারবার বলছেন Go back to

Upanishads, কারণ উপনিষদই হল ঠিক ঠিক ভারতের ধর্ম। উপনিষদের ভাবকে আত্মস্থ না করা পর্যন্ত ধর্ম জিনিষটা কি কেউ বুঝতে পারবে না।

এখন আমরা যে কটি মন্ত্র আলোচনা করতে যাচ্ছি সব কটি মন্ত্রের অন্তর্নিহিত ভাব অত্যন্ত গভীর, দু-চার দিন শুনে কিছুই ধারণা হবে না। তবুও শুনে যেতে হবে। শোনার পর নিজেরা যদি এর নিয়মিত চর্চা না করি কোনদিন উপনিষদের অর্থ ও তত্ত্ব পরিষ্কার হবে না। চর্চা মানে শুধু চিন্তন নয়, যা কিছু শুনছি, অধ্যয়ন করছি, এরপর যেটুকু বুঝেছি বা ধারণা করেছি সেটাকে নিজের মত করে লেখার অভ্যাস করতে হবে। লেখা মানেই মস্তিষ্ককে সুসংগঠিত করা। যে ছাত্রছাত্রীরা লিখে লিখে পড়াশোনা করে তারা বেশি নম্বর পায়। পড়া বা শোনার সময় মনে হবে সব বুঝে গেছি কিন্তু লিখতে গেলে কিছুই আর বের হতে চায় না। মুখে বলতে গেলে অনেক কিছুই অনর্গল বলে দিতে পারে কিন্তু লেখার সময় বক্তব্যকে গুছিয়ে লিখতে পারে না। কারণ কথাগুলো তার ভেতরে ঢোকেনি। কোন কিছুকে মনের মধ্যে ঢোকানর পথ হল লেখা। কোন মন্ত্র ভালো লাগল, কোন আলোচনা ভালো লাগল সেটাকে লিখলে মনের ভেতর থেকে সহজে বেরিয়ে যেতে পারবে না। বারো বছর, চব্বিশ বছর গুরুগৃহে শিক্ষা সমাপ্ত করার পর শিষ্য বাড়িতে ফিরে যাওয়ার সময় সমাবর্তন সমারোহতে আচার্য নিজের শিষ্যকে শেষ উপদেশ দিয়ে বলছেন – তুমি এবার বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, সেখানে বাবা-মাকে ভগবানের মত দেখবে আর স্বাধ্যায় এবং প্রবচনকে কখন ছেড়ে দেবে না। অর্থাৎ নিয়মিত শাস্ত্র অধ্যয়ন আর শাস্ত্রের আলোচনা চালিয়ে যাবে।

কুড়ি নম্বর মন্ত্রের মূল বক্তব্য অণুর মধ্যেও যা বৃহতের মধ্যেও তাই। ঋষিরা পদার্থ বিজ্ঞানের ইলেক্ট্রন প্রোটন জানতেন না, আচার্যরা তাই উপমা নিতেন তৃণের অগ্রভাগের বা বটবৃক্ষের বীজ, অণোরণীয়ান্ বলার পর বস্তু বিশেষ কিছু পরে থাকল না। আগামীকাল যদি অণু থেকেও কোন সূক্ষ্ম জিনিষ বেরিয়ে আসে তার মধ্যেও আত্মা থাকবেন। যেখানেই কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকবে সেখানেই আত্মা থাকবেন। যেখানে আত্মা নেই সেটা অস্তিত্ব বিহীন, অলীক বস্তু হয়ে যাবে। অন্য দিকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সব থেকে বৃহৎ হলেন ব্রহ্মা। পৌরাণিক মতে সৃষ্টিতে ব্রহ্মাই প্রথম সৃষ্ট বস্তু, ব্রহ্মার মধ্যেও আত্মা। সেইজন্য আত্মাকে অণু রূপেও দেখায় আবার বৃহৎ রূপেও দেখায়। অথচ এই আত্মা প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়গুহায় থাকেন। হৃদয়গুহায় মানে মনের ভেতর। ঋষিরা যাঁরা যোগ সাধনা করতেন তাঁরা বলতেন সব কিছু এই মন দিয়েই হয়। মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে করতে মন যখন একাগ্র হতে শুরু হয়, তখন তিনি দেখেন এই হৃদয় কোন স্থূল হৃদয় নয়। যোগীরা সাধারণত মনকে হৃদয়ে একাগ্র করেন, যোগ সাধনাতেও হৃদয়ে ধ্যান করার কথাই বলা হয়। গুরু যেখানে ধ্যান করতে বলে দিয়েছেন সেখানে ধ্যান করতে করতে মন যখন একাগ্র হতে শুরু হয়, তখন তিনি বাস্তবিক দেখতে পান একটা পদ্মফুল যেন অধোমুখী হয়ে আছে। পদ্মফুলের বর্ণনা তন্ত্রশাস্ত্রেও আছে, যোগশাস্ত্রেও আছে আবার উপনিষদও বলছেন। ধ্যান করতে করতে ধ্যান যখন গভীর হয় তখন যোগী দেখেন যে পদ্মফুল হৃদয়ে অধোমুখী ছিল সেটা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে প্রস্ফুটিতে হয়ে যায়। শেষে দেখেন সেই পদ্মই জ্যোতির্ময় এক আলো, এই আলো বাইরের স্থূল আলো নয়, এই আলোই দিব্য চৈতন্য আলো। বাস্তবিকই তাঁরা এই রকমটি দেখেন। সুফি সাধকরাও এই আলোর বর্ণনা করছেন, মরমীয়া খ্রীষ্টান সাধকরাও বর্ণনা করছেন।

মন্ত্রের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল *ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ*, ধাতু বলছেন ইন্দ্রিয়কে, যারা ধারণ করে, ইন্দ্রিয়ই সব কিছুকে ধারণ করে। *ধাতুপ্রসাদাৎ* মানে ইন্দ্রিয় যখন কৃপা করা, ইন্দ্রিয়ের কৃপা করা মানে ইন্দ্রিয় সংযম যখন করা হয়। ইন্দ্রিয়কে সংযমিত না করা হলে কোন দিন জ্ঞান হবে না। বলা হয় আত্মজ্ঞান সর্ব অবস্থায় স্বতঃ প্রমাণ, মানে জ্ঞান সব সময় সামনেই আছে। তাহলে জ্ঞান হচ্ছে না কেন? কারণ জ্ঞান প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। যেমন আমি ঘরে বসে আছি, ঘরের বাইরে প্রচুর আলো বাতাস সব সময় আছে, কিন্তু আমি ঘরের দরজা জানলা সব বন্ধ করে রেখেছি, ফলে ঘরে আলো বাতাস কিছুই আসতে পারছে না। আলো বাতাস কিভাবে নিয়ে আসা হবে? আলো বাতাসকে নিয়ে আসা যাবে না, কারণ আলো বাতাস অপর্যাপ্ত ভাবে এমনিতেই আছে, এর প্রতিবন্ধকতাকে সরিয়ে দিতে হবে। প্রতিবন্ধকটা কি? আত্মাকে বলা হল *নিহিতং গুহায়াম্*, ওখানে আত্মার উপর একটা প্রতিবন্ধক দেওয়া আছে। যেমন জলের বাঁধ দেওয়া হয়, তেমনি আত্মজ্ঞানে বাঁধ দেওয়া আছে। এই বাঁধ হল নানা রকমের কামনা-বাসনা, যেগুলো ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পুর্তি হয়।

ধাতু যখন কৃপা করে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের যখন সংযমন হয়ে যায় তখন জ্ঞানী আত্মার মহিমা, আত্মার যে স্বরূপ, তাঁর যে বিস্তার সেটাকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

আত্মার মহিমা প্রত্যক্ষ করার পর সব থেকে যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল তিনি শোকরহিত হয়ে যান। শোক মানুষের কেন হয়? মানুষ নিজেকে অনেক কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে। আমি তাকে ভালোবাসি, তার মানে আমি তার সাথে নিজেকে জড়িয়ে নিলাম। আমার সেই বিরাটত্বকে আমি অণুত্বের মধ্যে নামিয়ে দিলাম। অণুর স্বভাবই হল তার নাশ হয়ে যাবে, ছোট জিনিষের স্বভাবই হল সে কাল চলে যাবে। কাল সে আমাকে ছেড়ে চলে গেলে, মরে গেলে আমার শোক হবে। আমাদের ইন্দ্রিয় আর মন এত কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে আছে আর এত জিনিষের সাথে জড়িয়ে আছে যার ফলে একটা না একটা ঘটনা সব সময়ই ঘটতেই থাকে। টাকা-পয়সা থেকে শুরু করে, নানা রকমের সম্পর্ক, সম্বন্ধ, নানা রকমের ভাব, কত কিছুর সাথে যে জড়িয়ে আছে, যে কোন একটাতে একটু টোকা পড়তেই কষ্ট এসে মনকে বিষাদগ্রস্ত করে দিচ্ছে। রূপকথার কাহিনীতে কোন এক রাক্ষসের প্রাণ এক ভ্রমরার মধ্যে ছিল। আমাদের সমস্যা হল আমাদের প্রাণ হাজার হাজার ভ্রমরার মধ্যে রাখা আছে, যে কোন একটা ভ্রমরার ঠ্যাঙ ধরে টান মারলেই আমরা বাবাগো মাগো বলে চিৎকার শুরু করে দিই। রাক্ষসটা তো খুব ভাগ্যবান যে একটা ভ্রমরার মধ্যে ওর প্রাণ সংরক্ষিত। আমাদের প্রাণ, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, সম্পত্তি, জিনিষপত্র হাজারটা জিনিষের মধ্যে সংরক্ষিত, কোন একটাতে একটু টোকে মারলেই আমাদের ব্যাথা লাগে। সেইজন্য বলছেন *ধাতুপ্রসাদাৎ*, ইন্দ্রিয়গুলিকে যখন সব কিছু থেকে গুটিয়ে নিল তখনই তিনি মহিমান্বিত হয়ে যান, তখন দেখেন আমি তো বিরাট, আমি কেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষের সাথে নিজেক জড়াব। এরপর তাঁর আর কোন শোক, দুঃখ হবে না। পরের মন্ত্রে বলছেন –

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ।
কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি।।১/২/২১।।

(আত্মা উপবিষ্ট থেকেও দূরে গমন করেন, শয়নে থেকেও সর্বত্র বিচরণ করেন। সেই আনন্দ ও আনন্দহীন অথচ নিরুপাধিক স্বয়ংপ্রকাশ আত্মাকে আমার মতো বিবেকী ব্যক্তি ভিন্ন অপর কে জানতে পারে?)

আসীনো দূরং ব্রজতি, আত্মা এক জায়গায় উপবিষ্ট থেকেও দূরে গমন করেন, *শয়ানো যাতি সর্বতঃ*, আত্মা যদি শয়ন করে থাকেন তখনও তিনি সর্বত্র বিচরণ করেন। *কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি*, এই বিপরীত উপাধি ধর্মবিশিষ্ট স্বয়ংপ্রকাশ আত্মাকে আমি ছাড়া আর কে জানতে পারবে? যমরাজ নচিকেতাকে বলতে চাইছেন এই আত্মতত্ত্ব কেউ জানতে পারবে না। এই যে বলছেন আত্মা বসে থেকে সব জায়গায় গমন করেন আর শয়নে থেকেও তিনি সর্বত্র অবস্থান করে থাকেন, এটাকে ধারণা করার জন্য বেদান্তের একটা খুব নামকরা তত্ত্বকে বুঝতে হবে তা নাহলে এই মন্ত্রের অর্থ বোঝা যাবে না।

আমাদের অস্তিত্ব মনকে কেন্দ্র করে, আমরা যা কিছু দেখছি, জানছি সব কিছু মনকে কেন্দ্র করে চলতে থাকে। যোগশাস্ত্রে পাঁচ ভাবে জ্ঞান আহরণের কথা বলা হয় – প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। আমরা যে জগতকে দেখছি এই জগতের জ্ঞান আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আসছে। দ্বিতীয় মিথ্যা কল্পনা, শব্দ আছে, শব্দের সমাহার আছে কিন্তু বস্তু নেই, যেমন বন্ধ্যাপুত্র। শব্দের দিক থেকে বন্ধ্যাপুত্রের অর্থ হয়, কিন্তু এর অস্তিত্ব কখন হয় না। তৃতীয় বিকল্প, কল্পনাতে সব কিছু চলছে, বিশেষ করে সেই কল্পনাগুলি, যে কল্পনাগুলি সত্য হতেও পারে আবার সত্য নাও হতে পারে, কিন্তু এখন নেই। চতুর্থ স্মৃতি, অতীতে অনেক কিছু ঘটে গেছে, চুপচাপ বসে আছে মাথার মধ্যে অতীতের ঘটনাগুলো স্মৃতি হয়ে অনবরত আসছে যাচ্ছে। পঞ্চম নিদ্রা। নিদ্রার আবার দুটি অবস্থা – স্বপ্নের অবস্থা আর সুষুপ্তির অবস্থা। যোগশাস্ত্রে স্বপ্ন আর সুষুপ্তিকে, অর্থাৎ স্বপ্ন দেখা আর স্বপ্ন দেখা বন্ধ হয়ে যাওয়া, দুটোকে পৃথক ভাবে দেখা হয় না। কিন্তু বেদান্তে স্বপ্ন আর সুষুপ্তি দুটোকে পৃথক ভাবে দেখা হয়। স্বপ্ন আর সুষুপ্তিকে পৃথক দেখার উপরই বেদান্ত দাঁড়িয়ে আছে, এই দুটোর তফাৎ বেদান্তের একটি বড় স্তম্ভ। যোগশাস্ত্রে স্বপ্ন আর সুষুপ্তিকে নিয়ে অত বেশি তফাৎ করা হয় না, কারণ যোগশাস্ত্র জিনিষটাকে অন্য ভাবে নিয়ে চলে গেছে। বিভিন্ন দর্শন সত্যের দিকে এগোনর পথে তাঁরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে যান। সেইজন্য বিভিন্ন দর্শনের পথ বিভিন্ন রকম, তাই বেদান্তের পথ আলাদা, যোগের পথ আলাদা।

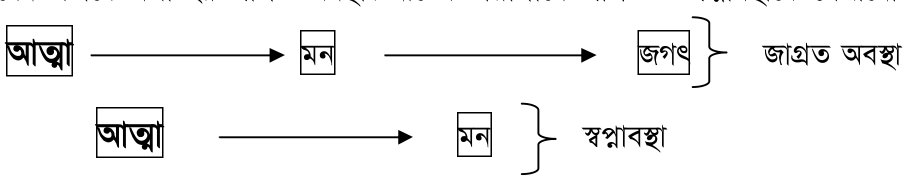
যোগ মতে জাগ্রত অবস্থায় প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প আর স্মৃতি এই চারটে অবস্থা চলতে থাকে। ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা সব কিছু জানছি, আমি সবাইকে দেখছি, অন্যরা আমাকে দেখছে। মন একটু শান্ত হলে বাইরের পাখির আওয়াজ, ঘরে পাখার আওয়াজ আমাদের কানে আসছে বুঝতে পারি, নাকে কোন সুগন্ধ আসছে, গরম অনুভব হচ্ছে, এই যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জগতের বিভিন্ন জ্ঞান আহরণ চলছে এটাকে বলছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রমাণ যদি সঠিক হয় তাহলে এই প্রমাণকে কোন প্রশ্ন করা যাবে না, সঠিক এই অর্থে বলা হচ্ছে যেমন পাখার আওয়াজ আমিও শুনছি আপনিও শুনছেন, সেইজন্য এটা প্রমাণ, একে কোন দিন প্রশ্ন করা যাবে না। অন্যান্য শাস্ত্র বা দর্শন এর উপর যতই আলোচনা করুক না কেন, হিন্দু শাস্ত্র এই নিয়ে বিশেষ কিছু বলতে যাবে না। আপনিও দেখছেন, আমিও দেখছি, আপনিও শুনছেন আমিও শুনছি, এরপর এর অকাট্যতা নিয়ে কোন কথা বলা যাবে না। এরপর যে বিপর্যয়ের কথা বলছেন, সেখানে প্রমাণের কোন প্রশ্নই নেই, কারণ বস্তুই নেই, মিথ্যা বা অলীক। কিন্তু মনের একটা অবস্থা চলতে থাকে যেখানে মন শব্দকে নিয়ে খেলা করছে। আর বিকল্প, কবিরা যেমন কোন জিনিষের কল্পনা করছেন, বিজ্ঞানীরা আগে থেকে কোন জিনিষের কল্পনা করে নিচ্ছেন, সেটাকে পরে বাস্তবায়িত করে দিলেন। শেষে আসছে স্মৃতি, মনের মধ্যে অতীতের সব কিছু সঞ্চিত হয়ে আছে, চুপচাপ বসে আছি অতীতের ছবিগুলি মনের মধ্যে মত ভেসে ওঠে, সেগুলোকে নিয়ে মন খেলা করে যাচ্ছে। এই চারটে জিনিষই চলে জাগ্রত অবস্থায়। কিন্তু বেদান্তের দৃষ্টিতে জাগ্রত অবস্থা বলতে তারা সাধারণতঃ জোর দেন পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা যা কিছু গ্রহণ করছি। স্মৃতি বা কল্পনাকে বেদান্ত অত গুরুত্ব দেয় না। বেদান্ত আর যোগের মধ্যে এটা একটা বড় পার্থক্য, যোগ একভাবে নিয়ে যাচ্ছে বেদান্ত আরেক ভাবে নিয়ে যাচ্ছে।

বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গীতে মেনে নিচ্ছি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা কিছু জগতের জ্ঞান আহরণ করা হয় এটাই জাগ্রত অবস্থা। জাগ্রত অবস্থা মানে, আমি জেগে আছি, সচেতন আছি আর পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে সজাগ ভাবে জগতকে ভেতরে নিচ্ছি। দ্বিতীয় অবস্থা হল স্বপ্নের অবস্থা। স্বপ্ন নিয়ে বিভিন্ন দার্শনিকরা বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দেন। প্রায়ই দেখা যায় যে, আমি ঘুমোচ্ছি, ঘুমের মধ্যে স্বপ্নও দেখছি আর সেই সময় কেউ এসে দরজায় টোকা দিল, দরজায় টোকা দেওয়াটাও তখন স্বপ্নের কাহিনীর মধ্যে ঢুকে যায়। কিংবা গায়ে মশা কামড়াচ্ছে, সেটাকেও স্বপ্ন নিজের মত করে জড়িয়ে নেয়। অনেক আবার বলেন, যে জিনিষগুলি অতীতে অনুভব হয়েছে, সেগুলোকে স্বপ্নে নিজের মত সাজিয়ে নেয়। নিজের সময়ে ফ্রয়েড খুব নামকরা মনস্তাত্ত্বিক ছিলেন, স্বপ্নের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা তাঁর প্রধান কাজ ছিল। একটা সময় শুধু স্বপ্নকে নিয়ে মনস্তাত্ত্বিকরা মানুষের ব্যক্তিত্বের বিচার বিশ্লেষণ করে তার কি কি সমস্যা আছে বুঝে নিয়ে সেই অনুসারে চিকিৎসা করতেন। এখন অবশ্য এই পদ্ধতি অপ্রচলিত হয়ে গেছে।

জাগ্রত অবস্থায় যা কিছু হয় সব মন দিয়েই হয়, কিন্তু বেদান্ত মতে মন জড়, আত্মাই সব কিছু, আত্মা মনকে দুটো অবস্থায় চালিত করে। এভাবেও বলা যেতে পারে, আত্মা হল চৈতন্যের আলো, যে আলোর প্রভাবে জড় মনও আলোকিত হয়ে যায়। যেমন টিউব লাইটের মধ্যে ইলেক্ট্রিসিটি যাচ্ছে, ইলেক্ট্রিসিটির জন্য টিউবের ভেতরের গ্যাস আলোকিত হচ্ছে। গ্যাসের আলোকে গ্রহণ করছে টিউবের কাঁচ, বলছি টিউব জ্বলছে। কিন্তু আসলে টিউব জ্বলছে না, জ্বলছে টিউবের ভেতরের গ্যাস বা টিউবের ভেতরে ইলেক্ট্রিসিটি। আসল ইলেক্ট্রিসিটি। টিউবের কাঁচ ভেঙে গেলে আর আলো জ্বলবে না। ঠিক তেমনি আমাদের মন যদি ভেঙে যায় তখন আত্মা থাকলেও মন কিছু করতে পারবে না। কিন্তু টিউব ভেঙে গেল বলেই যে ইলেক্ট্রিসিটি চলে গেছে তা নয়, অন্য একটা টিউব লাগিয়ে দিলে আবার আলো জ্বলে উঠবে। কিন্তু ইলেক্ট্রিসিটি যদি চলে গেলে কোন টিউবই জ্বলবে না। আত্মা আর মনের ঠিক এই সম্পর্ক। মন হল একটা হাতিয়ার আর আত্মা মনের পেছনে চৈতন্য শক্তি। মন এখন খুব সক্রিয়, সবাই খুব সচেতন ভাবে কঠোপনিষদের কথা শুনছি, আত্মা এখন বহির্জগতকে সাঁ সাঁ করে শুষে নিচ্ছে। বিজ্ঞানীদের মতে, আপনি বসে আছেন, আপনার উপর আলো পড়ছে, আলো প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখে আসছে, চোখ থেকে সেই প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কে যাচ্ছে, মস্তিষ্ক থেকে মনে যাচ্ছে, মন থেকে আত্মার কাছে যাচ্ছে, আত্মা তখন আপনাকে জানল, আপনি বসে আছেন। আত্মা কিন্তু তাকে জানছে না, এই জিনিষটা ধারণা করা খুব কঠিন। যারা প্রথমবার শুনবে তাদের কাছে জিনিষটা আজব মনে হবে। কিন্তু এই ব্যাপারটা ধারণা না হলে কোন দিন বুঝতে পারব না বেদান্ত আসলে কি বলতে চাইছে আর কেন বলতে চাইছে।

চোখ দিয়ে যে ইমেজ মস্তিষ্কে গিয়ে পড়ছে তাতে কিছু হয় না। কিছু যে হয় না এর প্রমাণ কি? রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, যেতে যেতে রাস্তার অনেক কিছুই আমি দেখছি কিন্তু সব কিছু আমার চোখে পড়ে না। কিন্তু চোখ সব কিছুর ইমেজ নিয়ে চলেছে। ক্লাশে শিক্ষক পড়িয়ে যাচ্ছেন ছাত্রদের কান খোলা কিন্তু শিক্ষকের সব কথা তাদের ভেতরে ঢুকছে না। দেখে মনে হবে খুব মনযোগ দিয়ে শুনে যাচ্ছ, কানও খোলা কিন্তু কোন কথাই তার কানে যাচ্ছে না। যদি শিক্ষক জিজ্ঞেস করেন কি বললাম, কিছুই বলতে পারবে না। তাহলে শিক্ষকের কথা কোথায় যাচ্ছে? সব শব্দই কান দিয়ে ভেতরে যাচ্ছে। জলাশয়ে পাথর ছুঁড়লে জলের ভেতরেই যাবে। কিন্তু আসল হল, জলাশয়ের জল ঐ পাথরকে ধাক্কা মারছে কিনা। শিক্ষকের কথাগুলিকে মন যদি প্রতি ধাক্কা মারে তবেই ছাত্রের জ্ঞান উৎপন্ন হবে। এর উপমা হল, জলাশয়ে পাথর ছুঁড়লে জলাশয় ঐ পাথরের প্রতি একটা প্রতিক্রিয়া ছোড়ে। জলাশয় কিভাবে প্রতিক্রিয়া ছোড়ে? ঢেউ রূপে। এই ঢেউ হল জ্ঞান। যে কোন আইডিয়া বা ইমেজ মনের উপর এসে পড়ল, পড়ার পর এই খবরটা আত্মার কাছে যেতেও পারে আবার নাও যেতে পারে। মন ওদিকে যদি কোন মনযোগ না দেয়, মন একাগ্র না থাকলে ঐ খবর আত্মা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না। কিন্তু আত্মার কাছে যদি চলে যায় তখন আত্মা একটা সংকেত দিয়ে দেয়। চৈতন্য সত্তা যিনি আছেন তিনি একটা সংকেত দিলেন, সংকেত দেওয়ার পর মন থেকে একটা প্রতিক্রিয়া হয়, এই প্রতিক্রিয়াকে বলে জ্ঞান। ভেতর থেকে যদি প্রতিক্রিয়া না আসে তাহলে কোন দিন জ্ঞান হবে না। সেইজন্য বলা হয় বাচ্চাদের কোন কিছু শেখানোর সব থেকে ভালো পদ্ধতি হল তাকে যদি বলা হয় এক চড় মারব, সঙ্গে সঙ্গে সে শিখে নেবে। কারণ চড় মারার জন্য তার শারীরিক একটা কষ্ট অনুভব হয়, সেই কষ্ট থেকে মস্তিষ্কে একটা প্রতিক্রিয়া তৈরী হয়, ঐ প্রতিক্রিয়ার সাথে কথাটা গিয়ে জুড়ে যায়, এরপর আর সে কখন বড়দের কথা ভুলতে পারবে না। ইদানিং ছেলেরা পড়াশোনা করতে চায় না, অবাধ্য, কারুর কথা শুনতে চায় না, তার কারণ এখন শাসন করাটাই উঠে গেছে। মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়া আমরা যে অর্থে প্রতিক্রিয়া করছি সেই অর্থে নয়, আসলে মস্তিষ্ক সক্রিয় হয়ে যায়। আগেকার দিনে স্কুলে, বাড়িতে ছেলেমেয়েদের শিক্ষক থেকে শুরু করে বাবা-মা সবাই কড়া শাসনে রাখতেন। ইদানিং শাসন করতে গেলেই অশান্তি, পুলিশ কেস থেকে শুরু করে শিক্ষকের চাকরি নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে যাবে। দেশের শিক্ষা জগতে দুরবস্থা হওয়ার এটাও একটা অন্যতম কারণ। শাসন না করলে মস্তিষ্ক সচল হবে না, সচল হলেই মস্তিষ্ক প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করবে, প্রতিক্রিয়া তৈরী করাটাই জ্ঞান।

বেদান্ত মতে জ্ঞানের এটাই পদ্ধতি – জগৎ সব সময় মনকে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে, মনের পেছনে আত্মা আছেন বলে মনকে চৈতন্যময় মনে হয়, সেই মন আত্মাকে সব খবর দিচ্ছে। খবর পেয়ে আত্মা একটা প্রতিক্রিয়া পাঠাচ্ছে মনকে, মন ঐ প্রতিক্রিয়া দিয়ে জগতকে ধরছে, এটাই জ্ঞান। তাহলে জাগ্রত অবস্থায় জ্ঞান কিভাবে হবে? যখন আত্মা নিজেকে ছাড়েন, আত্মা যদি নিজেকে না ছাড়েন তাহলে জ্ঞান কখনই হবে না। যেমন বাচ্চারা নিজের মনের প্রতিক্রিয়াকে ছাড়ছে না, মনকে সক্রিয় হতেই দিচ্ছে না। কিন্তু মনের এই কার্যশীলতাকে আমাদের ঋষিরা মানেন না। ঋষিরা বলছেন, আত্মা তাঁর নিজের চৈতন্য সত্তাকে মন দিয়ে ছাড়েন। এখন মন যদি আত্মার কাছে নাই যায় তখন কি হবে? আত্মার কাছে তাহলে খবর যাবে না, কারণ প্রহরী মনকে আত্মার ওখানে ঢুকতে দিচ্ছে না। অথবা যে কোন কারণে আত্মা কোন প্রতিক্রিয়া করল না, যেটা আমরা বাচ্চাদের উপমাতে আলোচনা করলাম, তখনও জ্ঞান হবে না। জ্ঞানের এই পুরো পদ্ধতিকে বলছেন জাগ্রত অবস্থা। বেদান্ত মতে জাগ্রত অবস্থার সংজ্ঞা হল, আত্মা যখন মনের দ্বারা জগতকে অনুভব করেন বা বোধ করেন এটাকে বলা হয় জাগ্রত অবস্থা। নীচের ডায়াগ্রামে জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থাকে দেখানো হয়েছে।



স্বপ্নাবস্থায় জগৎ নেই বা জগতের সামান্য অনুভবও যদি স্বপ্নের মধ্যে আসে বেদান্ত সেটাকে আলাদা বেশি গুরুত্ব দেবে না। স্বপ্নাবস্থায় জগৎ থাকছে না, আত্মা আর মনই আছে। ঘুমন্ত অবস্থায় আত্মা মনের ভেতরে যা কিছু স্মৃতি হয়ে আছে সেখান থেকে সব কিছু আত্মা নিতে থাকেন। তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে মনের কল্পনা, অলীক জিনিষগুলো তখন কোথায় যাবে? বেদান্ত এই নিয়েও কোন আলোচনা করে না, অন্য কোন

দর্শনে হয়ত কোন আলোচনা থাকতে পারে। বেদান্ত হিন্দু ধর্মের সব রকম দর্শনের মতকে সমন্বয় করতে থাকে। চিন্তন, কল্পনাদি যা কিছু আছে বেদান্ত এগুলোকেও জগতের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করে দেয়, তবে তা বহির্জগৎ না হয়ে মনের জগৎ হবে, ঐ মনের জগতটাও জাগ্রত অবস্থাতেই থাকবে। ঘুমন্ত অবস্থায় বহির্জগতের কোন কিছুই নেই, আর তখন সে স্বপ্ন দেখছে। মনের মধ্যে আগে থেকেই যে জিনিষগুলো রয়েছে বা মনের মধ্যে একটু যে অনুভূতি রয়েছে সেটাকে সে আর সেই রূপে দেখছে না। যেমন, ঘুমিয়ে আছে আর সেই সময় দরজায় কেউ টোকা মারল, তখন সে স্বপ্নেই দেখছে কোথায় একটা লড়াই চলছে আর সেখানে গুলি চলছে। হঠাৎ যেই ঘুমটা ভেঙে গেল তখন নিজেই বুঝতে পারে দরজায় কেউ টোকা মারছে। জিনিষটা যেমনটি আছে মন স্বপ্নে ঠিক তেমনটি নিচ্ছে না, না নিয়ে মন সব কিছুকে নিজের মত করে নেয়। কি করে নিচ্ছে? পেছনে আত্মচৈতন্য আছেন বলেই নিচ্ছে। এই অবস্থাকে বলছেন স্বপ্নাবস্থা, আত্মা তখন শুধু মনের মধ্যেই ঘুরছে, জগৎ যেভাবে ছিল সেইভাবে আর জগতকে সে নিচ্ছে না।

যোগশাস্ত্রের যে স্বপ্নাবস্থা সেটা আবার বেদান্তে দুটো হয়ে যায়, একটা স্বপ্ন আরেকটি সুষুপ্তি, যখন গভীর নিদ্রাবস্থায় চলে যায়। গভীর নিদ্রায় কি হয় –

আত্মা ⟶ অজ্ঞান } সুষুপ্তি অবস্থা (গভীর নিদ্রা)

এখানে অজ্ঞান শব্দ খুব বিশেষ অর্থবোধক। এই অজ্ঞানকে বেদান্তের অজ্ঞানের সাথে এক করা যাবে না। গভীর নিদ্রা থেকে ওঠার পর অনেক সময় দিনরাতের বোধ থাকে না। গভীর নিদ্রায় প্রথম যে জিনিষটা হয় তা হল তখন কোন বোধ থাকে না। কিন্তু এই জ্ঞান থাকে যে, আমার কোন কিছু বোধ নেই, এই জ্ঞানটাই খুব বিচিত্র জ্ঞান। আত্মার কখনই অজ্ঞানের অবস্থা হয় না, আত্মা সব সময় জ্ঞানের অবস্থায় থাকেন। সুষুপ্তিতেও আত্মার জ্ঞান থাকে কিন্তু তখন আত্মা অজ্ঞানের জ্ঞান করেন। এই যে উপরের ডায়াগ্রামে অজ্ঞান শব্দ বলা হচ্ছে এই অজ্ঞান হল, সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মা যে অজ্ঞানের জ্ঞান করে সেই অজ্ঞান। জাগ্রত অবস্থায় আত্মা জগতের জ্ঞান করে, স্বপ্নাবস্থায় আত্মা মনের জ্ঞান করে আর সুষুপ্তিতে অজ্ঞানের জ্ঞান করে। এই জায়গাতে এসে একদিকে একা বেদান্ত আর অন্য দিকে সব দর্শন একজোট হয় বেদান্তের সাথে ফাটাফাটি শুরু করে দেয়। খুব তুখোড় পণ্ডিত ছাড়া আত্মা কেন অজ্ঞানকে জ্ঞান করে এগুলোর বিরুদ্ধে বা সপক্ষে সঠিক যুক্তিতর্ক দাঁড় করাতে পারবেন না। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রয় অবস্থার উপর পুরো বেদান্ত দাঁড়িয়ে আছে। যদি কোন ভাবে এই জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকে অন্য ভাবে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় তাহলে বেদান্ত ওখানেই চুরমার হয়ে যাবে। বেদান্ত বলেই দিচ্ছে এই অজ্ঞানটাও একটা জ্ঞান। এই যে বোধ, ঘুম ভাঙার পর যখন বলছে আমি এমন গভীর নিদ্রায় ছিলাম যে আমার কিছু মনে নেই, এটাও তো জ্ঞান। অজ্ঞানের যে জ্ঞান এই জ্ঞানটাও একটা পজিটিভ জিনিষ, ঘুম ভাঙার পর যখন বলছে, খুব সুখে ঘুমিয়েছিলাম। কোন মানুষই সুষুপ্তি থেকে বেরিয়ে এসে বলে না যে আমি খুব কষ্টে ছিলাম। তাহলে সুষুপ্তিতেও বোধ থাকছে, বোধ না থাকলে সুখ বোধ কোথা থাকে আসছে! আর তার সাথে আরেকটি বোধ, আমার কিন্তু ভাই কিছু মনে নেই। তাহলে সুখ আর অজ্ঞান এই দুটো যখন মিশে থাকে তখন তাকে বলে সুষুপ্তি।

আত্মার স্বভাবই চৈতন্যময়, আত্মার কাজ জ্ঞান নেওয়া, জ্ঞান নেওয়া মানে বোধ করা। আত্মা তিন ভাবে বোধ করেন – মন দিয়ে জগতকে জাগ্রত অবস্থায় বোধ করেন, মন দিয়ে মনকেই স্বপ্নাবস্থায় বোধ করেন আর সুষুপ্তিতে আত্মা শুধুমাত্র মনের অস্তিত্বকে বোধ করেন। মনের অস্তিত্বকে বোধ করা কি রকম? ভাই! আমার কিছু মনে নেই, এটাই অজ্ঞানের বোধ আর তার সাথে সুখ বোধ, আমি সুখে ছিলাম। এবার আমরা মনকে ছেড়ে দিচ্ছি, আত্মা জগতের বিভিন্ন বস্তুতে গিয়ে একবার একে দেখছে, একবার ওকে দেখছে। আর স্বপ্নের মধ্যে যখন আছে তখন সে এই হাতি তৈরী করছে, এই ঘোড়া তৈরী করছে, আর যত রকম বিচিত্র জিনিষ তখনও দেখে যাচ্ছে। সুষুপ্তি অবস্থায় সব দেখাদেখি বন্ধ, কাউকে আর দেখে না। তাহলে আগের জ্ঞান এখন কোথায় থাকছে? আত্মা কিন্তু কোন কিছুতেই নিজেকে সীমিত করছেন না। যখন কোন কিছুকে সীমিত করছেন না তখন আত্মা কোথায়? আত্মা তখন সব কিছুতে ছড়িয়ে গেছে। কারণ আত্মা হলেন সবারই পূর্ণ, সবারই বিস্তার। আত্মা যখন কোন কিছুর সাথে জড়িয়ে থাকে না তখন সে সবারই সাথে জড়িয়ে আছে। ভগবান বুদ্ধ বা যিশু কোন একজনকে ভালোবাসতেন না, তাই ওনারা সবাইকেই ভালোবাসতেন। মানুষ নিজের

স্ত্রী, পুত্র, স্বামীকে ভালোবাসছে, তার ভালোবাসাটা এই কজনের মধ্যে সীমিত হয়ে গেল। জীবাত্মা মনের মাধ্যমে জগতের সব কিছুকে ধরে, একবার ওকে ছেড়ে তাকে ধরছে, তাকে ছেড়ে অন্য কাউকে ধরছে। স্বপ্নের অবস্থাতেও ঠিক তাই হয়, একে ধরছে তাকে ধরছে। সুষুপ্তিতে এসে আর কোন ধরাধরি নেই। আত্মার যে স্বরূপ সেই স্বরূপে সে চলে গেছেন। স্বরূপে চলে যাওয়াতে ইন্দ্রিয়গুলি পুরোপুরি শান্ত হয়ে আছে। গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ব্যক্তির হাত তুলে ছেড়ে দিলে ধপাস করে পড়ে যাবে, ইন্দ্রিয়ের কোন কাজ করার ক্ষমতা থাকে না। স্বপ্নেও এভাবে পড়বে না, কিন্তু সুষুপ্তিতে একেবারে মড়া মানুষের মত শরীরটা পড়ে থাকে। সুষুপ্তিতে মানুষের শরীর পাথরের মত হয়ে যায়, এক জায়গা থেকে তুলে আরেক জায়গায় নিয়ে গেলেও কিছুই টের পাবে না। স্বপ্নে তুলে নিয়ে গেলে নানা রকমের বোধ আসবে।

যদিও উপনিষদের আলোচ্য নয় কিন্তু আমাদের জ্ঞাতার্থে একটা জিনিষ বলে দেওয়া যায়। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর তাঁরও এই তিনটি অবস্থা থাকে, তাঁরও জাগ্রত অবস্থা আছে, তাঁরও স্বপ্নাবস্থা আছে তাঁরও সুষুপ্তি আছে। ঈশ্বরের জাগ্রত অবস্থাকে বলে স্থূল জগৎ, ঈশ্বরের নিদ্রা অবস্থা যে অবস্থায় শুধু মনের জিনিষগুলি থাকে সেটাকে বলছেন সূক্ষ্ম জগৎ আর ঈশ্বরের সুষুপ্তি অবস্থাকে বলে কারণ অবস্থা। জীবের জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থাকে ঈশ্বরের ক্ষেত্রে বলছেন স্থূল জগৎ, সূক্ষ্ম জগৎ আর কারণ অবস্থা। তারপরেই থাকে মহাকারণ।

মনের যেমন এই তিনটে অবস্থা, জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, ঠিক তেমনি সাধনাতেও এই তিনটে অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সাধনার শুরুতে মন বেশির ভাগ সময় স্থূল জগতেই বিচরণ করে। সাধনা করতে করতে ধীরে ধীরে মন স্থূল জগৎ থেকে সূক্ষ্ম জগতে প্রবেশ করতে শুরু করে। সূক্ষ্ম জগতে সবাই প্রবেশ করতে পারে না। অর্জুনকে ভগবান যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন, সূক্ষ্ম রূপেই দেখিয়েছেন। ভগবানের স্থূল রূপই এই বিরাট রূপ, যে রূপ আমরা সব সময় দেখছি। কারণ শরীরে শুধু বোধটুকু থাকে, সেখানে আমি আছি আর তিনি আছেন, এর বাইরে আর অন্য কোন কিছু থাকে না। সুষুপ্তির পরেও একটা অবস্থা থাকে যাকে বলা হয় তুরীয় অবস্থা। তুরীয় অবস্থায় শুধু আত্মাই আছেন, সেখানে মনও নেই, জগতও নেই, অজ্ঞানও নেই, সব কিছুর লয় হয়ে গিয়ে শুধু আত্মাই আছেন। জীবাত্মার দিক থেকে বলা হয় তুরীয় অবস্থা আর ঈশ্বরের দিক থেকে বলা হয় মহাকারণ, ঈশ্বরের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ সব মহাকারণে গিয়ে লয় হয়ে যায়। তুরীয় আর মহাকারণ এক। জীবাত্মা যখন তুরীয় অবস্থায় চলে যায় তখন ঐ দিক থেকে সে মহাকারণকে বোধে বোধ করে তখন দেখে আরে তাই তো এগুলো তো কখনই ছিল না। এই জিনিষগুলো ছিল কি ছিল না এর মধ্যে যাচ্ছি না, কিন্তু এটাই বাস্তব। বেদান্তে তখন বলে এগুলো কখন ছিলই না। যেটা তুরীয় সেটাই মহাকারণ, তখনই দেখে আমিই সেই আত্মা, আমিই সেই পূর্ণব্রহ্ম। তাহলে এসব কি হচ্ছিল? কিছুই তো ছিল না, কিছু না থাকলে কিছু হবেটা কী করে! সব কিছু আমি শুধু ভাবছিলাম। এসব কথা খুব উচ্চ অবস্থার কথা, আমরা আর এর মধ্যে যাচ্ছি না। আমরা জিনিষটাকে বোঝানোর জন্য একটু আলোচনা করে নিলাম।

আমরা তুরীয় অবস্থাকে সরিয়ে দিচ্ছি। আলোচ্য বিষয় মন্ত্রের *আসীনো দূরং ব্রজতি*। আত্মা সুমেরুবৎ অচল, সর্বব্যাপী, আত্মা তাই কোথাও যান না, আমিও কোথাও যাচ্ছি না। কিন্তু চোখ একবার একে দেখছে একবার তাকে দেখছে, একবার একে জানছে, একবার তাকে জানছে আর মন এক্ষণে সূর্যে চলে যাচ্ছে, এই মনই আবার এক্ষণে চন্দ্রমায় চলে যাচ্ছে। আমিত্ব বোধ, আমি তোমার কথা ভাবছিলাম, মানে মন ওখানে চলে গেছে। কিন্তু মনতো কোথাও যেতে পারে না, মন তখনই যেতে পারবে যখন আত্মা যাবে। কিন্তু আত্মা কোথায় আছেন? আমারই শরীরের মধ্যে বিরাজ করে আছেন, সেইজন্য বলছেন *আসীনো দূরং ব্রজতি*, আত্মা বসে আছেন শরীরের মধ্যে আর এই সমগ্র জগতের যেখানে খুশী ঘুরে আসছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে কোন জায়গায় চলে যাচ্ছে। আমি এখানে বসে আছি, বসে বসে যখনই আমি সৌরজগতের কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বের কোন ব্রহ্মাণ্ডের কথা চিন্তা করছি বা expanding universeএর কথা বা edge of universeএর কথা ভাবছি মন তখন সেখানে চলে গেছে। কিন্তু মন আত্মা ছাড়া যেতে পারে না, কারণ আত্মা ছাড়া তো চিন্তন হবে না। এই যে আমি জগতকে চিন্তা করছি, সুদূর তারার দিকে তাকাচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে সুদূর তারাকে নিয়ে নিলাম, কত তীব্র বেগে মন দৌড়ে গিয়ে ধরছে। শুধু একটাকে ধরছে না, একবার এটা ধরছে, একবার ওটা ধরছে। কিন্তু মন যে ধরবে তার জন্য আত্মাকে দরকার, কিন্তু মন জড়, জড় তো কোথাও যেতে পারবে না। তাহলে কে

যাচ্ছে? আত্মাই যাচ্ছেন। কিন্তু আত্মা তো শরীরের মধ্যে বসে আছেন। শরীরের মধ্যে বসে আছেন তাই বলছেন *আসীনো*, শরীরে *আসীনো* হয়ে আছেন কিন্তু *দূরং ব্রজতি*, যত দূরেই হোক আত্মা সেখানে চলে যাচ্ছেন।

পরের অংশে বলছেন *শয়ানো যাতি সর্বতঃ, শয়ানঃ* মানে ইন্দ্রিয়ের শান্তি। শয়ন করা মানে ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ বিরাম। পূর্ণ বিরাম হওয়া মানেই সুষুপ্তির অবস্থা। সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মা নিজেকে আর কোন কিছুর সাথে জড়ান না, তার মানে আত্মা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে এক হয়ে গেলেন। জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় আত্মা এর ওর সাথে, স্ত্রীর সাথে, সন্তানের সাথে, টাকা-পয়সার সাথে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিল, এখন আর কোন কিছুর সঙ্গে আত্মা জড়িয়ে নেই, সেইজন্য বলছেন *আসিনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ*। আত্মা এই শরীরের মধ্যেই বসে থাকেন, কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় আর স্বপ্ন অবস্থাতেও আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, স্বপ্নে আমি দেখছি এই আমেরিকা চলে গেলাম, এই দিল্লী চলে গেলাম। কে যাচ্ছে? আত্মাই যাচ্ছেন, কিন্তু আত্মা কোথাও যান না, অথচ মনে হচ্ছে যেন যাচ্ছেন। *আসীনঃ* যখন বলছেন তখন জাগ্রত আর স্বপ্ন এই দুটি অবস্থার কথা বলছেন। *শয়ানঃ* তে সুষুপ্তির অবস্থা বর্ণনা করছেন। যখন বসে থাকে তখন জাগ্রত আর স্বপ্ন অবস্থায় পুরো জগতকে নিচ্ছে। নিচ্ছে মানে, এর আগে প্রতিক্রিয়ার কথা বলা হয়েছিল, আত্মা যদি কোন কিছুতে প্রতিক্রিয়া না করেন তাহলে কিন্তু জ্ঞান হবে না। জ্ঞান হওয়া মানে, আমি দেখছি রাস্তার ঐ দিক দিয়ে আমার বন্ধু চলে যাচ্ছে, বন্ধু চলে যাচ্ছে এই জ্ঞান, রাস্তার ওখানে আমার বন্ধু, 'বন্ধু' আর 'ওখানে', তার মানে আমার চেতনা অত দূর চলে গেছে। পদার্থ বিজ্ঞানী বলব, আলো তোমার বন্ধুর গায়ে প্রতিফলিত হয়ে তোমার কাছে এল। বেদান্ত যে এই ব্যাপারটা জানে না তা নয়, বেদান্ত বলবে ঠিকই বলছে, কিন্তু তাতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। জ্ঞান হওয়া মানে, আমার ভেতরে যিনি চৈতন্য আছেন তিনি যখন চোখ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বেরিয়ে গিয়ে ওকে ধরবে তখনই জ্ঞান হবে। চৈতন্য কোনটাকে চোখ দিয়ে ধরছে, কোনটাকে হাত দিয়ে ধরছে, সবটাতেই ধরছে মানে গিয়ে ধরে নেওয়া। অথচ তিনি কোথাও যান না। সুষুপ্তি অবস্থাতে গভীর নিদ্রাতে পড়ে আছে, তখন আত্মার যে সর্বব্যাপীত্ব, যেন সব জায়গাতে যান।

আমাদের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বলছেন আত্মা কোথাও যান না, কিন্তু যখন বোধ করছি আমার বন্ধু ওখানে আছে, তাহলে সেখানে কে যাচ্ছে? মনও যদি সেখানে যায় তাহলে আত্মাই তো জানছেন। আসলে এখানে একটা শব্দ নেই, যে শব্দ অন্যান্য জায়গাতে নেওয়া হয়েছে, সেই শব্দটা হল 'ইব', ইব শব্দের অর্থ যেন। পুরোটা যদি পড়া না থাকে তাহলে শব্দের অর্থ একটু উল্টোপাল্টা হয়ে যায়। উপনিষদ মানেই সমস্ত উপনিষদের জ্ঞান। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলছেন *লেলায়তী ইব*, যেন নড়ছেন, *ধ্যায়তী ইব*, যেন ধ্যান করছেন। আত্মা সর্বব্যাপী, সব জায়গাতে আছেন কিন্তু আমি যখন মনে করছি যে আপনার চেতনা এল, সেখান থেকে আরেকজনের চেতনা এল, তার থেকে আরেকজনের চেতনা এল। তাহলে এই যে কারুর কারুর চেতনা হওয়ার কথা বলা হচ্ছে, অথচ চেতনা সর্বব্যাপী, এই দুটো কি করে মিলবে? মেলা সম্ভব নয়, সেইজন্য বলছেন ইব, যেন, মনে হচ্ছে যেন যাচ্ছে কিন্তু বাস্তবিক যাচ্ছে না। দেখছে জন্ম হল, মৃত্যু হল, কিন্তু বাস্তবিক কোন জন্ম নেই কোন মৃত্যু নেই। এই জিনিষটাকেই মন্ত্রের পরের লাইনে ব্যাখ্যা করছেন।

মাণ্ডুক্যকারিকা বেদান্তের খুব বিখ্যাত গ্রন্থ, সমগ্র গ্রন্থে শুধু জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটে অবস্থার আলোচনা করে গেছেন। কারণ যতক্ষণ বিচার না করা হয়, এই তিনটে অবস্থা ঠিক কি জিনিষ, তিনটে অবস্থায় আত্মা ঠিক কি আচরণ করেন, ততক্ষণ জগতের লীলাখেলা বোঝা যাবে না। অবস্থাত্রয় বেদান্তের মূল স্তম্ভ। ঠাকুর যখন জ্ঞানীর কথা বলছেন, তখন তিনি সেই জ্ঞানীদের কথাই বলছেন যাঁরা শুধু অবস্থাত্রয়ের বিচার করতে থাকেন। অবস্থাত্রয়ের বিচারে ভক্তি, অবতার তত্ত্ব কোন কিছুই দরকার হয় না। হরিদ্বারে এক মহাত্মা ছিলেন। এক সাধু এসে তাঁকে একটা বই দিয়ে বলছেন, আপনি এই বইটা পড়বেন। মহাত্মা তখন সাধুজীকে বলছেন, জীবনে আমি তিনটে বইই পড়েছি – জাগ্রত, স্বপ্ন আর সুষুপ্তি, আমার আর কোন বই লাগবে না।

আত্মা এই তিনটে অবস্থা থেকে বিলক্ষণ। কারণ এই তিনটে অবস্থারই পরিবর্তন হয়, কিন্তু আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। পরের লাইনে গিয়ে বলছেন, *কস্তং মদামদং দেবং*। আত্মা হল মদ আর অমদ। মদ মানে আনন্দ বা হর্ষ। আত্মা একে ধরছে, তাকে ধরছে, যাকেই ধরছে তাকে ধরে সে আনন্দই পাচ্ছে। যাকে ভালোবাসি তার কথাই আমরা চিন্তা করি বা যে বস্তুকে ভালোবাসছি সেই বস্তুরই চিন্তা করি। তার মানে আত্মা

আনন্দ পাচ্ছে। যাকে ভালোবাসে তার কথা চিন্তা করে, তার কাছে গেলে আনন্দ পায়। যাকে ভালোবাসে না তার থেকে দূরে সরে থাকতে চায়। দূরে সরে আসা মানে ওদিকে না যাওয়া। অথচ আত্মা কখন আনন্দিত হন না। কেন আনন্দিত হন না? কারণ আনন্দিত হয় মন, আনন্দিত হয় ইন্দ্রিয়গুলি। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের মিলন হলে মনের মধ্যে আনন্দের ভাব আসে। ভালো খাওয়া-দাওয়া হলে আমরা বলি, খেয়ে আজ কি আনন্দই না পেলাম। কে পেল এই আনন্দ? আমি বলছি আমি পেলাম। এই আমিটা কে? আমি তো সেই শুদ্ধ আত্মা। আমি রূপে আমি আনন্দ পাচ্ছি কিন্তু আত্মার কখন আনন্দ হয় না। তাহলে একই জিনিষে আনন্দ পাচ্ছে আবার আনন্দ পাচ্ছে না। কিন্তু আমি তো জানছি আমি আনন্দ পেয়েছি। তাহলে একই সাথে আমার মদ হচ্ছে আবার অমদও হচ্ছে। আমি বলছি আমি হাওড়া গেলাম, কিন্তু আত্মা তো সর্বব্যাপী। আমি হাওড়া কি করে যেতে পারি! এগুলো হয়ত আমরা ধারণা করতে পারছি না। একটা গল্প বললে বুঝতে পারব। কাশীতে একদিন এক চণ্ডাল মাংস নিয়ে যাওয়ার সময় আচার্য শঙ্করের সাথে ছোঁয়া লেগে যায়। আচার্য তখন রেগে গিয়ে চণ্ডালকে বলছেন দূরম্ অপসর রে চণ্ডাল, রে! চণ্ডাল দূরে সরে যা। কিন্তু সে তো চণ্ডাল ছিল না, সাক্ষাৎ শিব ছিলেন। শিব আচার্যকে বলছেন, আপনি তো বলে দিলেন দূরে সরে যেতে, কিন্তু আপনি বলুন আমি কোথায় সরে যাব? এই শরীরকে যদি আপনি সরে যেতে বলে থাকেন, কিন্তু এই শরীর তো জড়। জড় কী করে সরবে? আর আপনি যদি আত্মাকে সরে যেতে বলে থাকেন, তাহলে আত্মা তো সর্বব্যাপী, আত্মা সরে যাবেটা কোথায়? দুটো ক্ষেত্রেই আপনি অযৌক্তিক কথা বলেছেন। আচার্য সঙ্গে সঙ্গে বুঝলেন, আরে! সাধারণ লোক কখন এই রকম কথা বলতে পারে না। তাহলে ঠাকুর কি কখন বলেননি ওহে সর? ঠাকুর কি কখন বলেননি আমি খাব? ঠাকুর কি কারুর উপর রাগ করতেন না? এটাই খুব জটিল। যার জন্য শাস্ত্র, বিশেষ করে খুব উচ্চস্তরের শাস্ত্র সাধারণ লোকেদের পক্ষে ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন।

আচার্য সেইজন্য বলছেন সত্তা দুই প্রকার, ব্যবহারিক সত্তা আর পারমার্থিক সত্তা। ব্যবহারিক দৃষ্টি বা লোকদৃষ্টিতে আমি খাচ্ছি, সে যাচ্ছে, আনন্দ পাচ্ছে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। পারমার্থিক দৃষ্টিতে যা হচ্ছে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তার বিপরীত হচ্ছে, ঠিক সেই রকম ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যা কিছু হচ্ছে পারমার্থিক দৃষ্টিতে তার পুরো বিপরীত। যাওয়াটা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে হয়, খাওয়া, কাউকে মারা, মারা যাওয়া, জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ, শোক, প্রাপ্তি হওয়া, হানি হওয়া সবই ব্যবহারিক দৃষ্টিতে হচ্ছে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে এগুলো কিছু নেই। তার মানে, এই আমিত্ব কখন মদ রূপে থাকছে কখন অমদ রূপে। কখন আনন্দ নিয়ে আছে আবার কখন আনন্দের বাইরে। এখানে আনন্দের বাইরে মানে বাংলার নিরানন্দ নয়। আত্মার স্বরূপই হল আনন্দ, এগুলোতে আত্মার কোন কিছু আসে যায় না। কখন চলছেন আবার কখন চলছেন না, এই যে বলছেন *আসীনো দূরং ব্রজতি*, শুয়ে আছেন অথচ সর্বব্যাপী। সবটাই বিপরীত ধর্মী। আপনি বললেন ঠাণ্ডা আগুন নিয়ে এস। ঠাণ্ডা আগুন কি করে নিয়ে আসবে! গরম গরম বরফ নিয়ে এস। কি করে আনবে? পারমার্থিক দৃষ্টিতে আর ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আত্মা পুরোপুরি বিপরীত ধর্মী। যখন বলছেন *আসীনো দূরং ব্রজতি*, *দূরং ব্রজতি* হল পারমার্থিক দৃষ্টি কিন্তু *আসীনো* ব্যবহারিক দৃষ্টি। *শয়ানো যাতি সর্বতঃ*, এখানে *সর্বতঃ* পারমার্থিক আর *শয়ানো* হল ব্যবহারিক, ইন্দ্রিয়ের শান্তি। তাই বলছেন, এটাকে মানুষ কোন দিন ধারণা করতে পারবে না। এই যে মদ আর অমদ, সচ্চিদানন্দ আর মায়া, সাধারণ মানুষ ধারণা করতে পারবে না।

তাই যমরাজ বলছেন *কস্তং মদামদ দেবং*, দেব মানে আত্মা, আত্মার আরেকটি নাম দেব, যিনি শ্রেষ্ঠ, *মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি*, আমি ছাড়া এটা কে বুঝতে পারবে! আমি মানে শ্রেষ্ঠ পুরুষ, বিবেকী পুরুষ ছাড়া কেউ কোন দিন বুঝতে পারবে না। অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধি ছাড়া এটাকে কেউ ধারণা করতে পারবে না। কঠোপনিষদে যমরাজ নচিকেতাকে বলছেন, দেখো! আত্মা সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিষ, বিপরীত জিনিষকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধি ছাড়া ধারণা করা যাবে না। এর আগে যমরাজ নচিকেতার অনেক সুখ্যাতি করেছেন, নচিকেতারও সূক্ষ্ম বুদ্ধি। কিন্তু এখানে যমরাজ নিজের কথা বলছেন। শুধু কঠোপনিষদেই নয়, অন্যান্য উপনিষদেও আচার্যরা নিজের নামে শিষ্যকে এই ধরণের কথা বলছেন, তুমি ঠিক জায়গাতেই এসেছ। সব আচার্যরা আত্মার ব্যাপারে বলতে পারেন না। না পারার সব থেকে বড় সমস্যা হল বিপরীত ধর্মী, একদিকে *আসীনো* আবার *দূরং ব্রজতি*, একদিকে *শয়ানো* অন্য দিকে *সর্বতঃ*, একদিকে মদ আরেকদিকে অমদ। যত রকম বিপরীত ধর্মী মনে করতে পারি সবটাই আত্মাতে আছে। একদিকে জন্ম-মৃত্যু আছে, অন্য দিকে তাঁর জন্ম-মৃত্যু নেই, একদিকে আসা-যাওয়া

হচ্ছে অন্য দিকে আত্মা কোন কার্যই করেন না। সেইজন্য আচার্য সহজ করার জন্য পারমার্থিক সত্তা আর ব্যবহারিক সত্তা বলছেন। ব্যবহার কালে এর সব কিছুই সত্য কিন্তু পারমার্থ কালে এর কোনটাই সত্য নয়। এটাই মায়া, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আত্মাকে যে রকম দেখায় এটাই মায়া। মায়া মানে আমরা যেটাকে সত্য বলে জানি, এটাও সত্য, এটাকে না করে দিচ্ছেন না, কিন্তু পারমার্থিক সত্য নয়।

আচার্য এখানে চিন্তামণির উপমা নিয়ে এসেছেন। চিন্তামণি এমন এক মণি, যার মনে থাকে সে অন্যের মনে যা কিছু হয় চিন্তামণিতে প্রতিবিম্বিত হতে দেখে। চিন্তামণিকে যদি আমি দেখতে থাকি তাহলে আমি জানতে পারব ওর মনে কি হচ্ছে। আচার্য বলছেন, আত্মার ভেতরে পুরো জিনিষটা ভাসছে। চিন্তামণি বলে কিছু হয় কিনা আমাদের জানা নেই, কিন্তু প্রবাদ আছে। চিন্তামণিতে সবার চিন্তাগুলো প্রতিবিম্বিত হয়ে যাচ্ছে। পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, পুরো সৃষ্টিটা চিন্তামণির মত আত্মাতে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। পারামার্থিক দৃষ্টিতে কিন্তু আত্মাতে কিছু নেই। আমরা অনেক সময় আয়নার প্রতিবিম্বের কথা বলি। ছোট বাচ্চাকে যদি আয়নাতে কোন কিছুর প্রতিবিম্ব দেখিয়ে দেওয়া হয় সে ঐ প্রতিবিম্বকেই সত্য বলে মনে করবে, সত্য মনে করে প্রতিবিম্বকে সে ধরতে যাবে। পাখিরাও আয়নাতে তাদের প্রতিবিম্ব দেখে বোকা বনে যায়, অন্য পাখি মনে করে আয়নাতেই ঠোকরাতে থাকে। ঠিক তেমনি আত্মাতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিবিম্বিত হয়ে আছে। আপনি বলবেন বস্তু না থাকলে আয়নাতে প্রতিবিম্ব হবে কোথা থেকে! সেইজন্য এখানে আয়নার কথা না বলে চিন্তামণির কথা বলছেন। সচ্চিদানন্দ তো চৈতন্যময়, তিনি চিন্তা করলেন, চিন্তা করতেই এই পুরো জগৎ দাঁড়িয়ে গেল। এগুলোকে যে এনারা যুক্তি দিয়ে চিন্তা-ভাবনা দিয়ে দাঁড় করাচ্ছেন তা নয়। মনের শেষ অবস্থায়, সমাধির অবস্থাতে মন যখন সম্পূর্ণ শান্ত, নিশ্চল, নিশ্চেষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন তিনি দেখেন, আরে তাইতো, জগৎ তো কখন ছিলই না। জ্ঞানীরা এই অবস্থার পর আর কোন কাজ করতে পারেন না। ঠাকুর বলছেন সমাধিতে একুশ দিন থাকলে শরীর চলে যায়। ঠাকুরই শুধু এই কথা বলছেন না, এটাই যোগের প্রবাদ। কারণ, সমাধিবান পুরুষ ঐ অবস্থা থেকে আর এই জগতে মন নামাতে পারেন না। কুঁড়ে ঘরে থাকার পর হঠাৎ একদিন যদি জানতে পারে এই রাজমহলটা তার, এরপর সে আর কোন দিন কুঁড়ে ঘরে ঢুকবে না। জ্ঞানীর কাছে জগৎটা কুঁড়ে ঘরের মত হয়ে যায়, সেইজন্য তিনি আর এই জগতে মনকে নামাতে চান না। ঐ অবস্থায় থাকতে থাকতে কিছু দিন পর তাঁর শরীরের পতন হয়ে যায়। একুশ দিনটা সব থেকে বেশি দিন, তার আগেও শরীর চলে যায়। কিছু কিছু জ্ঞানীর যে মন জগতে ফেরত চলে আসে, যেমন ত্রৈলঙ্গস্বামী, তাঁরাও আর কোন কর্মানুষ্ঠান করেন না, তাঁদের কাছে সবটাই মিথ্যা বলে বোধ হয়। তোতাপুরীর কাছেও সব কিছু মিথ্যা বোধ হত, কারণ তিনি জ্ঞানের ঐ অবস্থায় চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু মিথ্যা বোধ হওয়া সত্ত্বেও জগতকে উপদেশ দিচ্ছেন, এটা খুবই ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রম একমাত্র অবতার বা অবতারের সঙ্গীদের মধ্যে দেখা যায়।

অনেক বলবেন, বেদান্তে অবতার আবার কোথা থেকে আসছেন! এখানে আবার সেই বিপরীত ভাব এসে গেল, মদ আর অমদ। ব্যবহারিক সত্তা এসে গেল অবতারও এসে যাবেন, জগতকে উপদেশ দেওয়াও এসে যাবে, সবই এসে যাবে। পারমার্থিক সত্তাতে যিনি প্রতিষ্ঠিত, এখানে প্রতিষ্ঠিত শব্দটা গুরুত্বপূর্ণ, তিনি আর ব্যবহারিকের দিকে তাকান না। যিনি ব্যবহারিকে আছেন পারমার্থিক দিকে তাঁর তাকানোর ক্ষমতাই নেই। একমাত্র যিনি অবতার আর অবতারের পার্ষদ, তাঁরাই এই দুটোর মধ্যে বাচ খেলেন। এটাই ভাবমুখে থাকা, ভাবমুখে থাকা মানে তিনি জগতকেও দেখছেন আবার পারমার্থিক সত্তাকেও দেখছেন। তিনি দেখছেন এই জগৎ চিন্তামণির মধ্যে প্রতিবিম্বিত। তা সত্ত্বেও তিনি কর্ম করেন। কারণ চিন্তামণির প্রতিবিম্বে যাদের মুখ দেখছেন তখন বাস্তবিক দেখছেন, তাদের দুঃখ-কষ্টও পুরোপুরি বাস্তবিক দেখেন। তখন তিনি করুণায় আপ্লুত হয়ে মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার জন্য শিক্ষা দেন। পারমার্থিক দৃষ্টিতে এই দুঃখ-কষ্ট মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু তাঁদের কাছে তখন এটাই বাস্তব। এখানেও সেই একই সমস্যা, জ্ঞানীরা বলবেন অবতারের ক্রিয়াও মিথ্যা, সাধনাও মিথ্যা। কিন্তু সেই বিপরীত ধর্মী এসে যাচ্ছে। আচার্য সেইজন্য এক জায়গায় বলছেন, মুক্তিই স্বাভাবিক সবাই মুক্তই আছে, বন্ধনটাই কল্পনা মুক্তি কল্পনা নয়, ঈশ্বরই সত্য ঈশ্বর কল্পনা নন, জগতটাই কল্পনা। এই কথা শোনার পর আচার্যের বিরোধীরা বলবেন, তাহলে শাস্ত্র পড়ার কি দরকার, এত পরিশ্রম করে সাধনা করে কি হবে? আচার্য তার জবাবে বলছেন, সব কিছু পারমার্থিক সত্য হতে পারে, কিন্তু যারা আছে তার তো এই জিনিষটা জানে না। যার কাছে এই জগতটাই সত্য, কষ্টটাও সত্য, তার জন্য শাস্ত্রও দরকার,

সাধনাও দরকার, অবতারও দরকার, ঈশ্বরও দরকার। যখন জেনে যাওয়ার তখন জেনে যাবে কিন্তু তাই বলে তাঁরা অদ্বৈতম্ ভাবকে কখনই ছাড়বেন না। ঠাকুরও বলছেন অদ্বৈতম্, অদ্বৈতমের সাথে কখনই আপোষ করবেন না। তুমি যদি ধারণা না করতে পার তাহলে তুমি খুব সাধারণ জিনিষ নিয়ে থাক। সেইজন্য আগেকার দিনে সবাইকে বেদান্ত পড়তে দেওয়া হত না। মুষ্টিমাত্র কয়েকজনকে বলতেন, তাও আবার খুব ঘষে মেজে নেওয়ার পর, প্রথমে প্রকরণ গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করাবেন, তারপর উপনিষদ, গীতা মুখস্ত করাবেন, এরপর ধীরে ধীরে এগুলোকে ব্যাখ্যা করবেন, এভাবে অনেক বছর লেগে থাকার পর উচ্চ অদ্বৈতের তত্ত্ব কথা বলতেন। এত কিছু করার পরেও যে সবার কাছে আত্মতত্ত্ব স্পষ্ট হয়ে যেত তা নয়। সেইজন্য যমরাজ বলছেন *কস্তং মদামদং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি*, আমি ছাড়া অর্থাৎ অত্যন্ত সুক্ষ্ম বুদ্ধি ছাড়া এই জিনিষ ধারণা করা অসম্ভব। কেন অসম্ভব? কারণ আত্মতত্ত্ব, আত্মার ব্যাপার অত্যন্ত দুর্বিজ্ঞেয়। কেন দুর্বিজ্ঞেয়? আত্মা হলেন বিপরীত ধর্মী, আত্মা চলছেন আবার চলছেন না, শুয়ে আছেন অথচ সর্বব্যাপী, মদ আবার অমদও। পারমার্থিক দৃষ্টিতে আত্মা এই রকমই অথচ ব্যবহারিক দৃষ্টিতে মনে হয় এগুলো হচ্ছে। এই একই জিনিষকে পরের মন্ত্রে অন্য ভাবে বলছেন –

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি।।১/২/২২।।

(বিভিন্ন দেহে অশরীরিরূপে অবস্থিত এবং অনিত্যবস্তুর মধ্যে নিত্যরূপে বিরাজমান সেই সুবিশাল ও সর্বব্যাপী আত্মাকে সাক্ষাৎ করে ধীমান ব্যক্তি শোকহীন হয়ে যান।)

আত্মজ্ঞানের বাস্তব দিককে দেখাচ্ছেন। *অশরীরং*, শরীরের মধ্যে বাস করেন অথচ অশরীরি। আত্মা আকাশের মত। আত্মার স্বরূপকে ঠিক ঠিক বোঝার জন্য আকাশ হল সব থেকে কাছের উপমা। আকাশের কোন স্বরূপ নেই, আকাশ মানে উপরে এই আকাশের কথা বলছেন না, আকাশ মানে স্পেস। আকাশের কোন আকার নেই, অথচ এই আকাশই আবার আকার ধারণ করে। কিভাবে আকার ধারণ করে? গ্লাশের মধ্যে যে আকাশ সেই আকাশ গ্লাশের আকাশ ধারণ করেছে, বোতলের আকাশ বোতল আকার ধারণ করেছে। কোথাও লম্বা স্পেস, কোথাও চৌকো স্পেস আবার কোথাও গোলাকার স্পেস। স্পেস গোল কি করে হল? স্পেস চৌকো কি করে হল? কোন ভাবেই হয়নি, বোতলটা গোল, বাক্সটা চৌক, আকাশও গোল, চৌক এইসব হয়ে গেছে। আত্মা আকাশ থেকেও সূক্ষ্ম আবার আকাশ থেকেও সর্বব্যাপী। সর্বব্যাপীর মধ্যে দেবতাদের শরীর আছে, পিতৃদের শরীর আছে, অসুরদের শরীর আছে, মানুষের শরীর আছে, সাপ-বিছের শরীর আছে, গাছপালার শরীর আছে, সব শরীরের মধ্যে আত্মা বিদ্যমান, আত্মা শরীরি হয়ে গেলেন। আমরা যেমন বলে থাকি, এই জায়গাটা কেমন? জায়গা আবার কেমন হবে! জায়গা তো উন্মুক্ত, জায়গা মানে আকাশ। একটা গোল পাত্র নিয়ে এস, গোল পাত্র মানে গোলাকার আকাশ। আকাশ আবার গোলাকার কি করে হবে! আকাশের কোন আকার হয় নাকি? হবে না কেন, যদি সেখানে একটা প্রতিবন্ধক লাগিয়ে দেওয়া হয়। একটা প্রতিবন্ধক নিয়ে এলে আকাশ এবার দুই প্রকার হয়ে গেল – একটা নিরাকার আকাশ আরেকটি সাকার আকাশ। ঠিক তেমনি আত্মা হলেন অশরীরি, আত্মার আবার শরীর হবে কী করে! তিনি তো সর্বব্যাপী। কিন্তু যেমনি কোন শরীর চলে এল আত্মাকে তখন শরীরের মত মনে হয়, দেবতার মধ্যে দেবতার মত, অসুরের মধ্যে অসুরের মত আর মানুষের মধ্যে মানুষের মত আবার সাপ-বিছের মধ্যে সাপ-বিছের মত, তাই বলছেন *অশরীরং শরীরেষু*।

অনবস্থেষু অবস্থিতম্, অনিত্য বস্তুর মধ্যে সেই নিত্য বস্তুই অবস্থিত। একটা কাগজের টুকরো, জ্বালিয়ে দিলেই শেষ, কাগজ অনিত্য বস্তু, অথচ সেই নিত্য আত্মা কাগজের টুকরোতেও বিদ্যমান। তিনি নিত্য হয়েও অনিত্যের মত ব্যবহার করেন। অশরীরি হয়েও শরীরির মত ব্যবহার করেন। যিনি জ্ঞানী তিনি বুঝতে পারেন যত শরীর আছে সব শরীরের মধ্যে আত্মা বিদ্যমান কিন্তু তিনি অশরীরি, আমি সেই আত্মা, আমি দেহ নই। আর যাবতীয় যত অনিত্য বস্তু আছে সব অনিত্য বস্তুর মধ্যে যে জিনিষটা সার্বজনীন, সেটাই আত্মা। জ্ঞানী পুরুষ অনিত্যের দিকে দৃষ্টি দেন না, শরীরের দিকে তাকান না। কারণ তিনি জানেন এই শরীরের পেছনে সেই অশরীরি রয়েছেন, অনিত্যের পেছনে নিত্য রয়েছে। যেমন গঙ্গা আর তার ঢেউ। অনেকে ঢেউকেই দেখে, আবার অনেকে গঙ্গাকেই দেখেন। ঢেউ যেমনই হোক তিনি দেখেন সেই গঙ্গা।

তার সাথে দেখেন *মহান্তম্*, আত্মার থেকে বৃহৎ কিছু নেই। আমরা যা কিছু বৃহৎ ভাবতে পারি তিনি তাই, ব্রহ্মাও তিনি, বিষ্ণুও তিনি। বৃহৎকেই যদি আত্মা ভাবি তাহলে তিনি সেই বৃহতে গিয়ে সীমিত হয়ে

যাবেন। তাই বলছেন *মহান্তম্*। তাহলে আত্মা বলতে কি ব্রহ্মা, আত্মা কি মহৎ বা আত্মা কি সমষ্টি মন? না, *বিভূম্*, তিনি সর্বব্যাপী। আত্মাকে ব্যক্তি রূপে প্রতিপন্ন করা যাবে না। ব্যক্তি রূপে প্রতিপন্ন তো করাই যাবে না, এমনকি কোন কিছুর সঙ্গে জুড়ে দেওয়াও যাবে না এবং কোন কিছুর সাথে তুলনা করাও যাবে না। আমাদের মন ব্যষ্টি মন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মন বৈষয়িক বা সমষ্টি মন। ঠিক আছে মেনে নেওয়া হচ্ছে সব চাইতে বৃহৎ যে মন, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে সমষ্টি মন, যেখান থেকে সব সৃষ্টি হয়, তাহলে আত্মা তো মহান্তম্ সেইজন্য আত্মা হলেন হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ সমষ্টি মন। না, আত্মা হিরণ্যগর্ভও নন, কারণ তিনি বিভূম্, সর্বব্যাপী। ঐ জায়গাতে কোন সীমারেখা টানা যাবে না, কোন সীমাবদ্ধতা চলবে না, সব ব্যাপারেই অনন্ত। *মত্বা ধীরো ন শোচতি*, আত্মাকে এই ভাব নিয়ে দেখার কথা বলছেন না, যাঁর মধ্যে আত্মার এই ভাব এসে গেছে, যখন নিজেকে এই ভাবের আলোতে দেখেন তখন তিনি আর কোন কিছুর জন্য শোক করেন না। যখন আমি বলছি, এই আমি হল প্রত্যগাত্মা। প্রত্যগাত্মা মানে, আমার ভেতরে যে সত্তা রয়েছেন তাঁকে বলছেন প্রত্যগাত্মা। সাধারণ মানুষের দেহবোধটাই প্রবল, কিন্তু কোন মানুষই নিজের দেহকে পুরোপুরি আমি বলে মনে করে না, পশুরা হয়ত ভাবতে পারে। কিন্তু কোন মানুষই, যতই সে স্থূল প্রকৃতির হোক, সে জানে আমার দেহের পেছনে কিছু একটা আছে সেটাই আসল আমি। মানুষ জানে আমার দেহের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয়ে চলছে, এই বোধটুকু সবারই থাকে।

ভেতরে যে সত্তা আছেন, এই প্রত্যগাত্মাতে এসে গোলমাল লাগে। এখানে এসে কেউ ভাবে আমি মন, কেউ ভাবে আমি বুদ্ধি, কেউ ভাবে আমি অহঙ্কার, কেউ ভাবে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার মিলিয়ে আমি। কিন্তু ধীর পুরুষ দেখেন, আমি হলাম অশরীরি, যত শরীর আছে তার মধ্যে আমি অশরীরি। অনিত্য যত বস্তু আছে তার মধ্যে সেই নিত্য বস্তু। আর *মহান্তম্*, আমিই সেই আত্মা, ধীর পুরুষ নিজেকে তখন দেখেন আমি সেই সর্বব্যাপী। যিনি নিজেকে সর্বব্যাপী জেনে গেলেন তিনি কাকে নিয়ে আর কি নিয়ে শোক করবেন! ভগবান বুদ্ধও যা রাস্তার ভিখারীও তাই। এখানে মনে রাখতে হবে, এই ভাব তত্ত্ব রূপে ভাবতে গেলে সবেতে গোলমাল লেগে যাবে। যতক্ষণ উপলব্ধি না হয় ততক্ষণ এই অবস্থা বোঝা যাবে না। উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত এগুলো সব শব্দ মাত্র, এর কোন দাম নেই। কিন্তু একই সাথে বলা যায়, যদিও এটাই একমাত্র সত্য কিন্তু এই সত্যকে বোঝা যায় না। ধ্যান, ধারণা করে করে মন যত শুদ্ধ হবে তত বুঝতে পারবে যে, যত শরীর আছে সব শরীরের মধ্যে সেই আত্মাই বিরাজ করছেন। কিন্তু তাঁর প্রকাশে তারতম্য আছে, কারুর মধ্যে আত্মার প্রকাশ বেশি, কারুর মধ্যে কম। আত্মার প্রকাশ কম বেশি নির্ভর করে জ্ঞানের স্তরের উপর। যাঁর জ্ঞান যত সূক্ষ্ম তাঁর মধ্যে আত্মার শক্তির প্রকাশ তত বেশি। যিনি নিজেকে মহান্ রূপে, বিভু রূপে দেখছেন, বুঝতে হবে তাঁর মধ্যে আত্মার পূর্ণ প্রকাশ হয়ে গেছে, আত্মার প্রকাশে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। কিন্তু তার আগে অনেক আবরণের নীচে আত্মা চাপা পড়ে ছিল। পশুপাখিরা নিজেদের শরীরের মধ্যে ঐ জ্ঞানকে চাপা দিয়ে রেখেছে। সাধারণ মানুষও নিজের শরীর মনের মধ্যে জ্ঞানকে আবরণ দিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখেছে। যারা এদের থেকে আরেকটু উন্নত তারা মন বুদ্ধির বিস্তার করছে। কিন্তু যাঁরা সত্যিকারের ঋষি তাঁদের মধ্যে জ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশ। জ্ঞানের প্রকাশ মানেই আত্মার প্রকাশ। মানুষ মানুষের মধ্যে প্রভেদ চৈতন্যের প্রকাশের তারতম্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়। স্বামীজী বলছেন, Each soul is potentially divine, goal is to manifest this divinity, manifestation এর মানেই হল প্রকাশের বাধাকে সরিয়ে দেওয়া। বাধা মানেই শরীর, মনের বোধ, শরীর মনের বোধটাই বাধা। এই বাধা যেমন যেমন সরতে থাকে তেমন তেমন আত্মার প্রকাশ বাড়তে থাকে। Highest manifestation যখন হয় তখন দেখে আমি সেই সর্বব্যাপী। তখন দেখেন রাস্থায় যে ভিখারী বসে আছে সেই ভিখারীও আমি, যে রাজ সিংহাসনে বসে আছে, সেই রাজাও আমি, যে খুন করছে সেই খুনীও আমি, যাকে খুন করা হচ্ছে সেও আমি। তখন তাঁর কোন কিছু থেকে, কারুকে দেখে আনন্দও হয় না, শোকও হয় না। এটাই আধ্যাত্মিকতার উচ্চতম অবস্থা। পরের মন্ত্রে গিয়ে বলছেন –

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।।১/২/২৩।।

(এই আত্মাকে বহু বেদ আয়ত্তের দ্বারা, ধারণাশক্তি সহায়ে, কিংবা বহু শাস্ত্র শবণের দ্বারাও জানা যায় না। আত্মা যাঁকে অনুগ্রহ করেন, তিনি আত্মাকে লাভ করেন, তাঁর কাছেই আত্মা স্বীয় রূপ প্রকটিত করেন।)

মন্ত্রের প্রথম স্তবকে তিনটে শব্দকে নিয়ে বলছেন – প্রবচন, মেধা আর শ্রুতেন। প্রবচন শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য বলছেন, যত রকম বেদ আছে তার জ্ঞানকে স্বীকার করা। উপনিষদে যখন প্রবচন শব্দ আসে সচরাচর তার অর্থ হয় আলোচনা। এখানে আচার্য অর্থ করছেন *অনেকবেদস্বীকরণেন*, এর অর্থও তাই, চারটে বেদ বা বেদের যত মন্ত্র আছে এর আলোচনা করে করে এর অর্থ বোঝার চেষ্টা করাকে প্রবচন বলছেন। প্রবচন শুধু মুখস্ত করাই নয়, অর্থ সমেত মন্ত্র মুখস্ত করে বুঝে নেওয়া। *নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো*, নানা রকমের শাস্ত্র, বেদ, উপনিষদাদি যা কিছু আছে এর অর্থ গ্রহণ করে বা স্বীকার করে আত্মাকে পাওয়া যাবে না।

ন মেধয়া, মেধা শব্দের অর্থ শাস্ত্রের অর্থ গ্রহণ ও ধারণ করার শক্তি। মেধাবী মানে শাস্ত্রের যা অর্থ, কি বলতে চাইছে, সে চটপট ধর নিচ্ছে। মেধা না থাকলে শাস্ত্রের অর্থ কোন দিনই বোঝা যাবে না। শাস্ত্র যদি না বুঝতে পারে কোন দিনই আত্মজ্ঞান হবে না। মেধা মানে সূক্ষ্ম বুদ্ধি, সূক্ষ্ম বুদ্ধি মানে সার জিনিষটাকে ধরে নেওয়ার ক্ষমতা। এখানে মেধা বলতে বিজ্ঞান, ভূগোলের মেধা নিয়ে বলছেন না, বৈজ্ঞানিকদের যে মেধা থাকে, সেই মেধাকে নিয়েও বলছেন না। মেধাকে স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন, শাস্ত্রের অর্থ ধারণা করা, বলছেন এই মেধা দিয়েও আত্মজ্ঞান হবে না। আর বলছেন *ন বহুনা শ্রুতেন*, শুধু বেদ নয়, বেদ ছাড়াও অন্যান্য যত শাস্ত্র আছে, সব শ্রবণ করে যাচ্ছে তাতেও আত্মজ্ঞান হবে না। প্রথমে বলছেন নানা রকমের বেদের কথা, দ্বিতীয় বলছেন বেদের যে বক্তব্য সেটাকে ধারণ করা আর তৃতীয় বলছেন বিভিন্ন শাস্ত্রের কথা শ্রবণ করা। বেদ না হয় ধারণা করতে পারছে না, আর ধারণা করারও দরকার নেই, তাহলে কি ভক্তিশাস্ত্র ধারণা করলে হবে, চণ্ডী ধারণা করলে কি হবে? না, তাতেও হবে না।

তাহলে আত্মাকে কিভাবে পাওয়া যাবে? তৃতীয় লাইনে এসে বলছেন *যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যোঃ*, আত্মা যাঁকে বরণ করেন একমাত্র তিনিই আত্মাকে পান। প্রথমে বললেন শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে আত্মাকে পাওয়া যাবে না। আমরা প্রায়ই বলি, ঠাকুর বলছেন অনেক শাস্ত্র পড়ে কী হবে? শাস্ত্র অধ্যয়ন করে কি তাঁর কৃপা পাওয়া যায় বা তাঁকে পাওয়া যায়? এটা নতুন কিছু নয়, উপনিষদই বলে দিচ্ছেন শাস্ত্র দিয়ে তাঁকে পাওয়া যাবে না। আর শেষে বলছেন, *তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্*, আত্মা যখন কাউকে বরণ করেন তখন তিনি নিজেই তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে যান, আত্মা নিজেই তাঁর কাছে নিজেকে অনাবৃত করে দেন। এখানে কয়েকটি কথা বলে দিলেন, শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে হবে না, বিচার করলেও হবে না, শাস্ত্রের অর্থ ধারণা করলেও হবে না, আত্মা যাঁকে বরণ করেন একমাত্র তাঁর কাছেই তিনি নিজেকে উন্মোচন করে দেন।

আমরা যেমন বলি ঠাকুর নরেনকে এই সংসারের চক্রব্যুহ থেকে টেনে নিলেন, ঠাকুর টেনে নেওয়াতে নরেন স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে গেলেন। ভক্তিগীতিতেও তাই বলছে, কারে দাও মা ব্রহ্মপদ কারে কর অধোগামী। এই কথাই কি এই মন্ত্রে বলতে চাইছেন? না, কখনই তা বলতে চাইছেন না। মন্ত্রের দুটো অংশ। প্রথম অংশে শাস্ত্র অধ্যয়নের কথা বললেন, শাস্ত্র অধ্যয়নের মধ্যে সব কিছুই এসে যাচ্ছে, দান, ভজন, জপ, ধ্যান, তীর্থাদি। এখানে শাস্ত্রের কথা বিশেষ ভাবে বলছেন, শাস্ত্র মুখস্ত করা, শাস্ত্রের অর্থ বোঝা, বুঝে ধারণা করা, কিন্তু আসলে শাস্ত্র দিয়ে যত রকমের শুভ কর্ম হতে পারে সব শুভ কর্মের কথাই বলতে চাইছেন। এর মধ্যে জপ-ধ্যানও আছে, পূজাও আছে, মন্দিরে যাওয়াও আছে, যজ্ঞও আছে, দান, তীর্থাদি করা সবই ধরা আছে। তার কারণ, আমরা একটা জিনিষ অনেকবার আলোচনা করেছি, তা হল কোন কর্ম দিয়ে কখনই জ্ঞান প্রাপ্তি হয় না। শাস্ত্র অধ্যয়ন করাটাও কর্ম, তাই শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা কখনই জ্ঞান প্রাপ্তি হবে না। যজ্ঞ করেও যেমন কোন দিন জ্ঞান হবে না, তেমনি বেদ অধ্যয়ন করেও কোন দিন জ্ঞান হবে না। তাহলে সেই প্রথম থেকে সবাইকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করার কথা কেন বলে আসছেন? এই জায়গায় এসে হিন্দু ধর্মের বেদান্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা নেয়। বেদান্তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, হিন্দু ধর্মের উচ্চতম গ্রন্থ বেদ ও উপনিষদই বলে দিচ্ছেন বেদ উপনিষদ অধ্যয়ন করে তোমার কিন্তু কোন দিন উচ্চতম জ্ঞান প্রাপ্তি হবে না। অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ এই কথা কখনই বলতে পারবে না। ইসলাম ধর্মে কারুর বলার সাহস হবে না যে, কোরান পাঠ করে তুমি কোন দিন আল্লাকে পাবে না। যদি কেউ বলে বাইবেল পাঠ করে তুমি কোন দিন যিশুকে পাবে না, তাকে

খ্রীষ্টান ধর্ম থেকে বার করে দেবে। ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মগ্রন্থই শেষ কথা। একমাত্র হিন্দু ধর্মই তাদের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থের ব্যাপারে বলছে, শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তোমার কিন্তু জ্ঞান প্রাপ্তি হবে না। কারণ অধ্যয়ন করাটাও কর্ম, কর্ম মানেই অজ্ঞান, অজ্ঞান দিয়ে কখন জ্ঞানকে পাওয়া যায় না।

তাহলে জ্ঞান কিভাবে পাওয়া যাবে? আসলে জ্ঞান কেউ পায় না। এই কথা প্রথম যারা শুনবে তারা কিছুতেই ধারণা করতে পারবে না। জ্ঞান হল স্বতঃ প্রমাণ, সব সময়ই জ্ঞান আছে, নতুন করে জ্ঞানকে কখন নিয়ে আসা হয় না। এনারা সব সময় উপমা নিয়ে আসেন, বাতাস সর্বদা প্রবাহিত হচ্ছে, প্রকাশ সব জায়গাতে আছে ইত্যাদি, অর্থাৎ এই জ্ঞান সব সময়ই আছে। তাহলে গোলমালটা কোথায়? কারণ জ্ঞান প্রতিবন্ধক হয়ে আছে, জ্ঞানকে আটকে রাখা আছে। কে আটকে রেখেছে? নানান জিনিষের সাথে যে একাত্ম বোধ হয়ে আছে, এই একাত্ম বোধ জ্ঞানের প্রকাশকে আটকে রেখেছে। আমি শরীর, আমি ওকে ভালোবাসি, আমাকে কাজ করতে হবে, আমার এই উপলব্ধি চাই, এগুলোই উচ্চতম জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন, যজ্ঞ, জপ-ধ্যান, তপস্যার দ্বারা এই প্রতিবন্ধকতা গুলিকে অপসারিত করা হয়। বোঝানর জন্য যোগশাস্ত্রে উপমা দিয়ে বলছেন *ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ*। বৃষ্টির সময় মাঠে আল দিয়ে জল ধরে রাখা হয়। চাষের সময় ঐ জলকে চাষীরা ক্ষেতে নিয়ে আসে। আমরা বলছি জলা আনা হল, কিন্তু আদৌ জল আনা হয়নি। জল আগে থেকেই আছে, কিন্তু আটকে রাখা আছে। জলের ঐ প্রতিবন্ধকটা ভেঙে দেয়, মাঠে যে বাঁধ দেওয়া আছে, ঐ বাঁধকে একটু কেটে দেয়। কেটে দিতেই জল আপনা থেকেই হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসে।

জ্ঞান সর্বকালে, সর্বত্র, সর্বদা স্বতঃ বিদ্যমান, আপনা থেকেই আছে, কিন্তু জানা যায় না। কারণ জ্ঞান আবৃত হয়ে আছে। বোঝাবার জন্য অনেক রকম উপমা নেওয়া হয়, যেমন লণ্ঠনের কাঁচকে প্রথমে কাগজ দিয়ে, কাগজের উপর পাতলা একটা কাপড়, সেই কাপড়ের উপর একটা মোটা চাদর দিয়ে খুব ভালো করে আচ্ছাদিত করে রাখা হয়েছে, এখন লণ্ঠনের আলো দেখা যাবে না। আলো দেখতে হলে আবরণগুলোকে সরাতে হবে। ঠিক তেমনি জ্ঞান যদি প্রাপ্ত করতে হয় তাহলে তার প্রতিবন্ধক গুলো সরিয়ে দিতে হবে। জ্ঞানকে কখন জানা হয় না, জ্ঞান স্বতই আছে, যে জিনিষ সর্বত্র, সর্বকালে, সর্বদা বিদ্যমান তাকে আর জানবে কি করে! আর জানা মানেই ক্রিয়া। আমরা যে অর্থে জানা বলি সেখানে ক্রিয়া জড়িয়ে আছে। আমি তাকে জানলাম, এখানে ক্রিয়া জড়িয়ে আছে, আত্মজ্ঞানে কোন ক্রিয়া থাকে না। আত্মজ্ঞানটাই জ্ঞান, আত্মাই জ্ঞান নেন। আত্মজ্ঞান মানে নিজেকে জানা, নিজেকে জানা কখনই ক্রিয়া হয় না, নিজে নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। আমি যদি ভৌতিক অর্থে বলি আমি আমাকে পেতে চাই, তখন কি আমাকে কোন ক্রিয়া করতে হবে? আমাকে কোন ক্রিয়া করতে হবে না, কারণ আমি তো নিজেতেই আছি। অপরকে যদি ধরতে চাই তাহলে আমাকে তার কাছে যেতে হবে, গিয়ে হাতটা তার দিকে বাড়াতে হবে। নিজের উপর কখন কোন ক্রিয়া হয় না। জ্ঞান আত্মাই পান। আত্মা যদি নিজেকে জানতে চান তাঁকে কোন ক্রিয়াই করতে হবে না। অনর্থক যা কিছু করে যাচ্ছিল সেগুলো করা বন্ধ করে দিতে হবে। প্রবচন, শ্রুতি, অধ্যয়ন, মেধা এই জিনিষগুলো অত্যন্ত জরুরি। এগুলো শুভ কর্ম, যা ঐ প্রতিবন্ধক গুলিকে নাশ করে। এই প্রতিবন্ধক গুলিকে যদি নাশ না করা হয় তাহলে এই জ্ঞান কোন দিন হবে না। এখানে যে জিনিষটা বলছেন তার মধ্যে অন্যান্য মন্ত্রকে মিলিয়ে আনা হচ্ছে।

জ্ঞান কিভাবে হয়? *যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ*, আত্মা যাঁকে বরণ করেন। এই জায়গাতে এসে মন্ত্রের ব্যাখ্যা খুব জটিল হয়ে যায়। ভক্তরা যেমন বলেন ঠাকুর নরেনকে বেছে নিয়েছেন, ভক্তরা যেমন সব ব্যাপারে বলেন তাঁর ইচ্ছা হলে হবে, ঠাকুর কৃপা করলে হবে। আমরাও বলি ঠাকুর যাঁকে চান তাঁকে মুক্তির দিকে নিয়ে যান, যাঁকে পছন্দ করেন না তাঁকে মায়া দিয়ে বদ্ধ করে রাখেন। তাই যদি হয় তাহলে তো ঠাকুরের উপর পক্ষপাত দোষ এসে যাবে। ঠাকুর কেন কাউকে মুক্তির দিকে ঠেলে দেবেন আর কেনই বা কাউকে মায়া দিয়ে বাঁধবেন! সেইজন্য যাঁরা বেদান্ত চর্চা করেন তাঁরা বলেন, ভক্তি আর দ্বৈতকে বুঝতে আর অপরকে বোঝাতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। আমরা মনে করি উপনিষদ খুব কঠিন, কিন্তু ভক্তির তুলনায় উপনিষদ অনেক সহজ, কারণ উপনিষদের বক্তব্য অনেক সঙ্গতিপূর্ণ। ভক্তিশাস্ত্রে এত রকমের বিরোধী ভাবের সমাবেশ হয়ে আছে যে ভক্তিশাস্ত্র অপরকে বোঝান বা নিজে বোঝা খুব কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু একবার বেদান্ত বুঝে নিলে বা বেদান্তের দৃষ্টিতে যদি ভক্তিশাস্ত্রকে দেখা হয় তখন সব কিছু অনেক সহজ হয়ে যায়।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ, আত্মা যাঁকে বরণ করেন, এর মধ্যে দুটো ব্যাপার। শরণাগতিতে বলা হয়, তাঁর শরণাগত হয়ে গেলে তিনিই সব কিছু করবেন বা দ্বৈতবাদে বলা হয় সব কিছু তাঁর ইচ্ছাতেই হয়। বেদান্ত মতে কিন্তু তা নয়। তাহলে এখানে কেন বলছেন আত্মা যাঁকে বরণ করেন? উপনিষদের সামগ্রিক ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করলে এর অর্থ অন্য রকম দাঁড়ায়। আমরা দু রকম ইচ্ছার কথা শুনে থাকি, একটা ঈশ্বরের ইচ্ছা, ইংলিশে খুব নামকরা কথা Divine Will, আর নিজের ইচ্ছা, অর্থাৎ নিজের চেষ্টা, যাকে বলছেন পুরুষকার, ইংলিশে Self Effort। পুরো খ্রীষ্টান দর্শন এই দুটোকে নিয়ে লড়াই করতেই চলে গেছে, Divine Will কতটুকু আর Self Effort নিজের চেষ্টা কতটুকু। একজন আবার হিসাব করে দেখিয়ে দিলেন Divine Wil এত পারসেন্ট আর বাকিটা Self Effort। শাস্ত্র ঠিক ভাবে অধ্যয়ন না করা হলে এই ধরণের ভুলভাল কথা বেরিয়ে আসে। এখানে শুধু আত্মজ্ঞানকে নিয়ে বলা হচ্ছে, অন্যান্য চেষ্টাকে নিয়ে উপনিষদ কিছু বলবে না। উপনিষদ একমাত্র বলছেন আত্মজ্ঞান কিভাবে হয়। কি বলছেন? আত্মা যখন বরণ করেন। এটাকেই টেনে নিয়ে গিয়ে ভক্তিশাস্ত্রের সব কিছুর সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ঠাকুর যখন বলছেন ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটিও নড়ে না, সেখানে তিনি ঠিকই বলছেন, কারণ চৈতন্য সত্তা না থাকলে কোন কিছুই হয় না। কিন্তু এই জায়গাতে কি বলতে চাইছেন খুব ভালো করে বোঝার প্রয়োজন আছে। বেদান্ত কখনই পূজা-অর্চনাকে নাকচ করছে না। অনেকের ভুল ধারণা যে, বেদান্তী, অদ্বৈতবাদীরা পূজা-অর্চনা মানে না, কিন্তু তাঁরা সব মানেন। কিন্তু তিনি নিজেকে ঈশ্বর থেকে অভিন্ন মনে করেই মানেন। তিনি মনে করেন আমি ক্ষুদ্র আর তিনি সেই বৃহৎ কিন্তু আমরা একই সত্তা, এই ক্ষুদ্র ঐ বৃহতের পূজা করছে ঠিকই কিন্তু স্বভাবতঃ দুজনের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কিন্তু বেদান্ত এর থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিষকে নিয়ে আসে। তিনি বৃহৎ কেন আর আমি ক্ষুদ্র কেন? প্রতিবন্ধকের কারণে। নানা রকমের বন্ধন হেতু আমি আমাকে অমুক ভাবছি, আপনি নিজেকে অমুক ভাবছেন আর আমরা তাঁকে ঈশ্বর বলে জানছি। আমার যে প্রতিবন্ধক, আমার নাম-রূপ-ব্যক্তিত্বকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয়, যে জিনিষগুলির জন্য ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলছি, সেগুলোকেও যদি সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন তুমিও যা আমিও তাই। কিন্তু আমার আর ঠাকুরের ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমিও যা আর ঠাকুরও তাই, এই এক কখনই হবে না। তখন আত্মা ব্রহ্ম হয়ে যাবে। জ্ঞানের অবস্থায় আমি ঠাকুরের সাথে কখনই এক হব না। জ্ঞানের অবস্থায় আত্মা ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যায়। আমি বোধ যেমনি এসে যাবে তেমনি ঠাকুরও এসে যাবেন। ঠাকুর সব সময় ভগবান, জীব সব সময় সীমিত। আমি বোধ আসা মানেই আমি সীমিত হয়ে গেলাম আর ঠাকুর বৃহৎ হয়ে গেলেন। সীমিত আর বৃহতের নাশ হবে তখনই যখন সব প্রতিবন্ধক নাশ হয়ে যাবে। কার প্রতিবন্ধকের নাশ? নিজেরও প্রতিবন্ধকের নাশ আর তাঁর প্রতিবন্ধকেরও নাশ। যখন আমার এই ক্ষুদ্র আমিটা চলে যাবে আর তার সাথে তাঁর ঐ বৃহৎ আমিটাও চলে যাবে তখন দেখবে যা ছিল তাই আছে।

কিন্তু এর সাধন পদ্ধতি, শাস্ত্র অধ্যয়ন করা, শাস্ত্রের অর্থ ধারণা করা, আরও যা কিছু করছে এগুলোই প্রতিবন্ধককে সরাচ্ছে। প্রতিবন্ধক সরানোর এই ইচ্ছাটাও কোথা থেকে আসবে? এর মধ্যে চেষ্টা লাগাতে হয়। *যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ,* আত্মা যাঁকে বরণ করেন, এই লাইনটাই খুব জটিল। আচার্য এখানে খুব পরিষ্কার করে কিছু বলছেন না, এই যে চেষ্টা, যে জায়গাতে শাস্ত্র অধ্যয়ন, শাস্ত্রের অর্থ ধারণা করা, এই জিনিষগুলো যখন শুরু করবে এই শুরু করাটাও আত্মার কৃপাতেই হয় কিনা। এখানে এসে রীতিমত খুব জটিল এই কারণেই হয়, আগেকার দিনে ব্রাহ্মণ সন্তানরাই উপনিষদাদি অধ্যয়ন করতেন। ওনাদের কাছে এটাই ছিল ধর্ম, এটাই তাঁদের জীবনধারা ছিল, এটাই তাঁদের করতে হত। এখন আমরা যেভাবে চেষ্টা করে উপনিষদ অধ্যয়ন করতে চাইছি, ওনাদের কাছে এটাই জীবনধারা ছিল। রোজ স্নান করা, দাঁত ব্রাশ করার মত উপনিষদ অধ্যয়নটাও ওনাদের নিত্যদিনের রুটিন ছিল। এভাবে অধ্যয়ন করতে করতে তাঁদের উপনিষদের শব্দ জ্ঞান হয়ে যেত ঠিকই। কিন্তু এরপর উপনিষদের অর্থের যে ঠিক ঠিক জ্ঞান, সেই জ্ঞান কিভাবে আসবে? ঐ জায়গাতে জ্ঞানীই হোক, ভক্তই হোক যেই হোক, সবার ক্ষেত্রেই এক জিনিষ হবে – আত্মা যদি বরণ করেন।

আত্মার বরণ করাকে যদি বেদান্তের দৃষ্টিতে খুব সরল ভাবে বিচার করতে হয় তাহলে আমাদের একটু শান্ত মনে এভাবে ভাবা যেতে পারে – বেদান্তের দৃষ্টিতে আমি আমার চৈতন্য স্বরূপকে জানতে চাইছি অর্থাৎ আমি আত্মজ্ঞান চাইছি। এবার ভাবতে হবে এই 'আমি'টা কে? এই আমি সেই আত্মা। তাহলে যে আত্মা আগে জগতের জ্ঞানে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন সেই আত্মা এবার নিজেকে জানতে চাইছেন। তাঁর নিজের জ্ঞানকে

কে আটকে রেখেছিল? তিনিই আটকে রেখেছিলেন। কিন্তু এবার তিনি নিজেকে জানতে চাইছেন। চৈতন্যকে জানার এই আগ্রহ একমাত্র চৈতন্যরই আসতে পারে। আমাদের ভাষায় বলতে পারি, যখন আমার মনে ইচ্ছা জাগল যে আমি আত্মজ্ঞান পেতে চাই। তার মানে, আমার মধ্যে চেতনা যিনি আছেন তিনি এবার চৈতন্যময় হতে চাইছেন। এর আগে পর্যন্ত চেতনা জগতকে দেখতে চাইছিলেন, যেটা আমার ইচ্ছা বলে প্রতীত হচ্ছিল। তোমার কাছে থাকতে আমার খুব ভালো লাগে, আমি মনে করছি এটা আমারই ইচ্ছা। কিন্তু সেখানেও চৈতন্য মনের দ্বারা জগতকে ভালোবাসতে চাইছে। আত্মজ্ঞান মানে চৈতন্য এবার মনকে ছেড়ে নিজের কাছে থাকতে চাইছে। শেষ পর্যন্ত যা কিছু করার সব আত্মাই করছে, যখন জগতকে জানছে তখন আত্মাই জানছে আর যখন নিজেকে জানছে তখনও আত্মাই জানছে। কিন্তু মাঝখানে একটা মিথ্যা আমি ভাব এসে যাচ্ছে, আসলে আত্মা যখন মনের মাধ্যমে জগতকে দেখেন তখন মন একটা আমিত্ব পেয়ে যায়, সেইজন্য ঐ আমিত্বকে বজায় রাখার জন্য এখানে বলছেন বরণ করেন। বরণ করাটা কিছু না, বরণ করা মানে আমার ভেতরে যে চৈতন্য সত্তা সে বলছে এবার আমি নিজেতেই থাকতে চাই, নিজেকেই বরণ করতে চাই।

কিন্তু মন সহজে আত্মাকে নিজের মধ্যে থাকতে দেবে না। ঠাকুর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন, একজন মহিলা একজনকে উপপতি করেছিল। উপপতি যদি তাকে না দেখে তখন সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে উপপতির জামা ধরে বলতে থাকে 'তবে রে! তোর জন্য আমার সব কুল, শীল গেল এখন তুই আমাকে দেখবি না'! আত্মা আর মনের সম্পর্ক ঠিক উপপতি আর মহিলার মত। মন সেই জাঁদরেল মহিলা, মন আত্মাকে বলবে এতদিন তুমি আমাকে দিয়ে সব ভোগ করলে আর এখন বলছ আমাকে ছেড়ে দেবে! মামার বাড়ির আবদার পেয়েছ নাকি! মন আত্মাকে ছাড়বে না, আঁকড়ে ধরে রাখে। আত্মা যদি বলে আমি এবার আমার মত থাকব, মন তখনই বলবে আমি তোমাকে তোমার মত থাকতে দেব না, তোমাকে আমার সাথেই থাকতে হবে। মন আর আত্মার এই লড়াই চিরন্তন। আমরাও কত ভাবি শাস্ত্র পড়ব, জপ-ধ্যান করব কিন্তু মন করতে দেয় না। মন তখন বলে, ইয়ার্কি পেয়েছ, এতদিন আমাকে দিয়ে জগতের ভোগ করলে আর এখন আমাকে একা পড়ে থাকতে বলছ! সেইজন্য আমাদের শাস্ত্রই বলে দেয় খুব ধীরে ধীরে একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে জগৎ থেকে মন তুলতে হয়। কিন্তু কখন জগৎ থেকে মন তুলতে শুরু করবে? আত্মা যদি ঠিক করে আমার আর এই জগৎ লাগবে না। আমাদের সমস্যা হল আমরা সব সময় মনে করি মনই শ্রেষ্ঠ। মনকে যখন শ্রেষ্ঠ মনে করে, ঠাকুর যাকে বলছেন কাঁচা আমি, তখনই বুঝতে যত গোলমাল হয়ে যায়। ভক্তিশাস্ত্রে ঠিক এই সমস্যায় পড়তে হয়। ভক্তিশাস্ত্রে এমন ভাবে সব কিছু আমাদের কাছে উপস্থাপিত করে তাতে আমার আমিত্বটাই আমার কাছে শ্রেষ্ঠ হয়ে যায় বলে আর ওটাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। বেদান্তে এই সমস্যাটা হয় না। বেদান্তে আমিত্ব, আমি মানেই মন, যে আমি অহঙ্কারের সাথে জুড়ে আছে, বেদান্তে ঐ আমির অস্তিত্বের কোন দাম নেই। জ্ঞান আদি যাবতীয় যা কিছু সবই আত্মার।

আত্মাকে যদি একটা আলো মনে করা হয়, আলোটা মন রূপ কাঁচের লেন্স দিয়ে বেরোচ্ছে। কাঁচ দিয়ে বেরিয়ে আসার জন্য আত্মার আলো নানান রকম রঙ নিয়ে নিচ্ছে। এবার আত্মা যদি বলে আমি তোমাকে আর আলো দেব না। মন কিন্তু আত্মাকে ছাড়বে না। তাহলে তো আমরা বলতে পারি মন আত্মার মতই শক্তিশালী। মন কখনই আত্মার মত শক্তিশালী হবে না। আসলে আত্মার এত দিনের অভ্যাস আত্মা নিজেই ছাড়তে পারে না। আত্মা ভাবছে আমি ওকে ছেড়ে দেব কিন্তু সে নিজেই মনকে পুরোপুরি ছাড়তে পারে না, এতদিনের অভ্যাস কিনা, একদিনে ছাড়তে পারে না। সেইজন্য নিজের আত্মার শক্তি আনতে হয়। শক্তি আনা মানে, একটা মেয়ে একটা ছেলের হাত ধরে নিজেই চেঁচাচ্ছে 'আমার হাত ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি'। মেয়েটা চেঁচিয়েই যাচ্ছে 'আমাকে ছাড়, তুমি আমার হাতটা ছেড়ে দাও'। লোকেরা ভাববে মেয়েটির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ছেলেটা বলছে 'আমি কোথায় তোমাকে ধরে রেখেছি, তুমিই তো আমাকে ধরে রেখেছ'। আত্মা মনকে ধরে রেখেছে আর বলে যাচ্ছে আমাকে ছেড়ে দাও। আমরাও বলছি, আমি জপ-ধ্যান করতে চাই, ঈশ্বর লাভ করতে চাই, আত্মজ্ঞান লাভ করতে চাই, কিন্তু কিছুই করছি না। কেন করছি না? কারণ আমি নিজে শুদ্ধ আত্মা রূপে আমার মন ইন্দ্রিয়কে আঁকড়ে আছি, আর মেয়েটির মত বলে যাচ্ছি 'আমাকে ছাড়, আমাকে ছেড়ে দাও'। আমিই ধরে রেখেছি, আমাকে ছাড়বে কে? কিন্তু কোথাও তো আমাদের শুরু করতে হবে। এই শুরুটা কে করবে? আত্মাই শুরু করেন। কি করে শুরু করেন? *যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ*, আত্মা বরণ করেন। বরণ ঠিক

করেন না, আসলে ছাড়েন। কিন্তু সব কিছু আমরা মনের দিক থেকে দেখি বলে এভাবে না বলে বলছেন তিনি যদি বরণ করেন। আমাদের যে অস্তিত্ব, আমাদের যে বোঝাপড়া যা কিছু আছে সব আমিত্বকে নিয়ে, সেইজন্য বোঝানর জন্য বলছেন এই আমিত্বকে তিনি যখন বরণ করেন। বরণ করেন মানে যখন তিনি ইচ্ছা করেন এবার আমি আমার স্বরূপে অবস্থিত হব, তবেই আত্মজ্ঞান হয়, তা নাহলে হবে না।

এবার এই জিনিষটাকে ঈশ্বরের উপর যদি নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে পুরো ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। ঈশ্বরের কৃপা মানেই আত্মার কৃপা। ঈশ্বর মানে চৈতন্য আত্মা মানেও চৈতন্য। তিনি কৃপা করা মানে তিনি চৈতন্য রূপে কৃপা করেন। চৈতন্য রূপে কৃপা করা মানেই কৃপা সব সময় ভেতর থেকেই আসে, কৃপা কখনই বাইরে থেকে আসে না। ঠাকুরের কাছে আমরা অনেক কিছুই চাইছি, চাকরি চাইছি, টাকা চাইছি, সুখ-শান্তি চাইছি, ব্যাধি সারাতে চাইছি। ঠাকুরের কাছে চাইলে তিনি কি আমাদের এগুলো দেন? এই নিয়েও অনেক জটিলতা আছে। ঠাকুরও বলছেন দেন, মায়ের পায়ে পড়ে খুব করে কান্নাকাটি করে ছেলে বলছে, মা তোর পায়ে পড়ছি আমাকে দুটি পয়সা দে, মা তখন বিরক্ত হয়ে দুটি পয়সা দিয়ে দেন, কিন্তু সাধারণ অবস্থায় দেন না। ঠাকুরও দেন না। কখন কদাচিৎ যেন লেগে যায়, তখন মনে করি তিনিই দিচ্ছেন। সেটা আবার পুরো আলাদা একটা দর্শন, আমরা এখানে সেই দর্শনে যাচ্ছি না।

বেদান্ত বলে, তুমি যা কিছু পাবে তোমার প্রারব্ধের জোরেই পাবে, যেমনটি কর্ম করেছ সেই কর্মানুসারেই যা পাওয়ার পাবে। এর মধ্যে ঈশ্বর কখনই হস্তক্ষেপ করেন না। ঈশ্বর কখন হস্তক্ষেপ করেন? একমাত্র আপনি যখন জ্ঞান চাইবেন। কিভাবে হস্তক্ষেপ করেন? চৈতন্য রূপে। কিভাবে হস্তক্ষেপ করেন? যেটাকে ধরে আছেন সেটাকে ছাড়িয়ে দিয়ে, তাছাড়া তিনি আর কিছুই করেন না। জাগতিক প্রার্থনাদি করে কারুর কোন দিন কিছু হয়নি, কোন দিন হবেও না। কিন্তু একবার খুব শুদ্ধ মনে ঠাকুরের কাছে আন্তরিক ভাবে প্রার্থনা করুন – হে ঠাকুর! আমার ভক্তি চাই। সেদিন থেকেই আপনার মধ্যে ভক্তি আসতে শুরু হয়ে যাবে। ঠাকুর তাই বারে বারে বলছেন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা সব সময় জ্ঞান ভক্তির জন্যই করতে হয়। জ্ঞানও যা ভক্তিও তাই। জ্ঞান মানে, আমি আঁকড়ে ধরে রেখে বলছি আমাকে ছাড়। আমাকে কে ছাড়বে! আমিই তো ধরে রেখেছি। জ্ঞানীর প্রার্থনা করা মানে, ওহে ভাই! নিজেকে ছাড়। হিন্দী সিনেমার একটা গান ছিল 'ইয়ে লাল রঙ মুঝে ছোড়েগা', কোন দিন নহি ছোড়েগা, লাল রঙ তোমাকে কি ছাড়বে, তোমাকেই ছাড়তে হবে। আত্মজ্ঞান মানে ঠিক তাই, তুমি যে জগতটা আঁকড়ে ধরে রেখেছ এটাকে ছাড়। যতই আমরা শাস্ত্র পড়ি, যতই শাস্ত্র শুনি না কেন কোন দিন ছাড়াছাড়ি হবে না। তাহলে কবে ছাড়াছাড়ি হবে? যখন ও নিজে থেকে ছাড়বে। এটাই বলছেন *যমেবৈষ বৃণুতে*, আত্মা যাঁকে বরণ করেন। তখন কি হয়? তখন নিজের স্বরূপে অবস্থিত হয়ে যায়। এরপর নতুন কিছু কি হয়? নতুন কিছু হয়ও না, নতুন কিছু আসেও না। আলতু-ফালতু পাঁচ রকম জিনিষকে নিয়ে নিজেকে যে জড়িয়ে রেখেছিল, সব কিছু খসে পড়ে যায়। তখন নিজেই অবাক হয়ে দেখে আমি এই জঘন্য অবস্থার মধ্যে পড়ে ছিলাম! এই দু-পয়সা জিনিষের জন্য এত কান্নাকাটি করেছিলাম!

তাই পুরুষকার খুব দরকার, পুরুষকার মানেই প্রতিবন্ধকতাকে সরান। কিন্তু পুরুষকার দিয়েও হয় না, আগেও হয় না, পরেও হয় না, আত্মজ্ঞান আত্মার কৃপাতেই হয়। আত্মার কৃপা কখন হয়? আত্মা যে প্রকৃতিকে জড়িয়ে রেখেছে, এই জড়িয়ে রাখাটা যখন আত্মা ছেড়ে দেয়। ঠিক ঠিক প্রার্থনা সব সময় হয় ত্যাগ বৈরাগ্যের জন্য, জ্ঞান ভক্তির জন্য। কিন্তু আত্মা এই গোলমালটাই করে, একেই আত্মা মনের দ্বারা জগতকে ধরে রেখেছে, এরপর ঐ জগতের আরও হাজারটে জিনিষকে জড়িয়ে এটাও চাইছে ওটাও চাইছে। আত্মার ধর্ম তা নয়, জিনিষ জিনিষের মত চলে, বস্তু বস্তুর মত চলে, বস্তুর ধর্ম আলাদা আত্মার ধর্ম আলাদা। কৃপা করা মানে অনেক হয়েছে এবার ছাড়ো, আর নয় এবার নিজের রাস্তায় চল। Divine Will দিব্য কৃপা মানেই আত্মা এবার নিজের রাস্তায় চলতে চাইছে। আসলে Divine Will ছাড়া তো আর কোন will হয় না, মন প্রকৃতির এলাকার, প্রকৃতির এলাকা মানেই জড়ের এলাকা, জড়ের নিজস্ব will কী করে থাকবে! গ্লাশ, বোতল এদের কোন ক্ষমতাই নেই আমাকে ধরে নেবে! আমার ক্ষমতা আছে এদের ধরে নেওয়ার। ঠিক তেমনি মনেরও ছিটেফোঁটা দম নেই যে আত্মাকে ধরবে, ধরে আত্মাই। মাটিতে অনেক জল ঢালতেই মাটি পাঁক হয়ে গেল, এবার কি করে বলব কে কার সঙ্গে মিশে আছে, দুটো মিশে এক হয়ে গেছে। ঠিক তেমনি চৈতন্য আর জড়

মিলে মিশে এমন হয়ে যায় যে বোঝা যায় না জড়ের সাথে চৈতন্য মিশে আছে নাকি চৈতন্যের সাথে জড় মিশে আছে। আমরা সব সময় জড় অর্থাৎ মনের প্রাধান্যই দেখতে পাই। উপনিষদ বলে দিচ্ছেন প্রাধান্য চৈতন্যের। মাটিকে যদি পাঁক থেকে আলাদা করতে যায় কোন দিন আলাদা হবে না, আগুনে দিয়ে দিলে বা সূর্যের আলোতে রেখে দিলে জল শুষ্ক হয়ে মাটি বেরিয়ে আসবে। সাধনা মানে তাই। পাঁচটা জিনিষের সাথে আমরা জড়িয়ে আছি, সেখান থেকে নিজেকে তুলে আনাটাই সাধনা। কিন্তু প্রথম ইচ্ছাটা যে আসবে সেটাও তাঁরই ইচ্ছা। তিনিই হাসছেন, তিনিই কাঁদছেন তিনিই আবার বলছেন আমার কান্না-হাসি কোনটাই লাগবে না।

ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দেখলে আমাদের মনে হয় নরেনের উপর ঠাকুর কৃপা করলেন, ঠাকুর কয়েকজনের উপর কৃপা করলেন। কারণ মানুষ, ভক্ত, অবতার সব কিছুকে নিয়ে যখন দেখছি তখন এই রকমই মনে হয়। ঠাকুরের কি এখানে কোন পক্ষপাতিত্ব করছেন? একেবারেই না, যেখানে দেখছেন শুদ্ধ সাত্ত্বিক আধার তাঁদের তিনি বেছে নিচ্ছেন। কাঁচে সূর্যের আলো বেশি প্রতিবিম্বিত হয় কিন্তু পাথরে কম প্রতিবিম্বিত হয়, আমরা কি বলব সূর্য পক্ষপাতিত্ব করছে? সূর্যের কোন পক্ষপাত নেই, কাঁচ স্বচ্ছ তাই বেশি প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। নরেন, রাখাল কাঁচের মত শুদ্ধ আধার তাই ঠাকুর তাঁদের টেনে নিচ্ছেন। জন্ম-জন্মান্তর ধরে নিজের মনকে তাঁরা শুদ্ধ করে গেছেন। সাধারণ ভাষায় ঠাকুরকে যদি অবতার মনে করি আর তাঁদের যদি জীব রূপে দেখি তাহলেও সেই এক জিনিষ হবে। শুদ্ধ আত্মা কোন একটা অবস্থায় গিয়ে বললেন এবার আমি পূর্ণ শুদ্ধ হতে চাই, ব্যস্ এরপরই প্রতিবন্ধকগুলো নাশ হতে শুরু করে দিল। জাগতিক দৃষ্টিতে দেখলে আরও কয়েকটা জিনিষ দেখা যায়, বেদান্ত মতে ঈশ্বর আর ব্রহ্ম আলাদা কিছু নন। ঠাকুর যেমন বলছেন তিনিই সব জোটপাট করে দেন, সব ব্যবস্থার সুযোগ করে দেন এর অর্থ হল তিনিই ত্যাগ বৈরাগ্যের ব্যবস্থা করে দেন। কারণ সব কিছুর শেষ মালিক আত্মাই, তিনি প্রকৃতিকে যেমন খুশী নাচিয়ে নিতে পারেন।

এইভাবে বিচার করলে ভক্তিশাস্ত্র আর বেদান্তে কোন অমিল পাওয়া যাবে না। ভক্তিশাস্ত্র বুঝতে গেলে একটু অসুবিধা হয় ঠিকই, কিন্তু বেদান্ত ঠিক ঠিক জানা থাকলে কোথাও কোন অসুবিধা হয় না। জীবাত্মা যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন তখন তিনি নিজেকেই প্রার্থনা করেন, কিন্তু নিজের থেকে যিনি উপরে তাঁর কাছেই প্রার্থনা করেন। কথামৃতে ঠাকুরকে একজন বলছেন, যখন মানুষ প্রার্থনা করে তখন সে নিজকেই প্রার্থনা করে। ঠাকুর শুনে বলছেন 'ও খুব উঁচু কথা, ঐ কথা বলতে নেই'। সাধারণ লোকেদের জন্য এসব কথা নয়। কিন্তু সবাই এখন উপনিষদ পড়তে চাইছে, পড়াতে গেলে তাদের এগুলো ব্যাখ্যা করতে হয়। বেদান্তের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, মানুষ যখন প্রার্থনা করে তখন নিজেরই উচ্চ সত্তা, নিজের পাকা আমি, নিজের যিনি সমষ্টি স্বরূপ তাঁর কাছেই প্রার্থনা করে। আমি এই ব্যষ্টি স্বরূপে থাকতে চাই না, আমি যেন আমার সমষ্টি রূপে এসে যেতে পারি। কিন্তু এত দিনের অভ্যাস সে ছাড়তে পারে না। ঠাকুর আবার হাতির উপমা দিচ্ছেন, হাতিকে যতই স্নান করিয়ে দেওয়া হোক সে আবার গায়ে ধুলো ছিটাবে। যেমনি মানুষ প্রার্থনা থেকে বেরিয়ে আসে আবার সব নোংরা নিজের গায়ে নিতে শুরু করে।

শেষ পর্যন্ত মন্ত্রে দুটো অংশ হয়ে যায়, প্রথম অংশে আমি আত্মজ্ঞান চাই, আত্মজ্ঞান পাওয়ার জন্য আমি অধ্যয়ন করছি, যজ্ঞ করছি, জপ-ধ্যান করছি, এতে কিন্তু কিছুই হবে না, কিন্তু এগুলো সাহায্য করবে। তাহলে হবে কিভাবে? আমাদের ভেতরে চৈতন্য সত্তা যখন উঠে দাঁড়াবেন, তার মানে আমি যখন ভেতর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলব আমার আর কিছু লাগবে না। প্রচলিত প্রবাদে বলছে, ঠাকুরও বলছেন 'গুরু বৈষ্ণব আর শাস্ত্রের কৃপা হল, এক কৃপার বিনু সব কৃপাই বৃথা গেল' এক কৃপা মানে আত্মকৃপা। আত্মকৃপা যদি না হয় তাহলে সব বিফলে চলে যাবে। আত্মকৃপা মানেই আত্মার কৃপা, আর আত্মার কৃপা মানেই নিজের কৃপা। আমরা এগুলো কিছু না বুঝে মুর্খের মত বলে যাচ্ছি, রামকৃষ্ণলোকে ঠাকুর বসে আছেন, তিনি যখন কৃপা করবেন তখন হবে, তিনি আমার মনের মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছেন না বলে কিছু হচ্ছে না। এগুলোই সব থেকে ফাঁকিবাজীর কথা। ঠাকুরের ভারি বয়ে গেছে আমাদের মত কয়েকজন মুর্খকে ভক্ত বানাতে। ঠাকুর কলকাতায় থাকলেন, কিন্তু কাউকেই তিনি পাল্টাতে গেলেন না। আর তৎকালীন বঙ্গ সমাজে কজন ঠাকুরকে বুঝতে পেরেছিলেন? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, কেশবচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কত নামকরা লোক, একজনও কেউ ঠাকুরকে চিনতে পারলেন না, কেশব সেন অল্প একটু জেনেছিলেন। জানল

তখনকার দিনের কয়েকজন অচেনা, নামডাকশূন্য সম্বলহীন যুবক। ঐ প্রস্তুতি যদি না থাকে অবতারও কারুর জন্য কিছু করেন না। অবতার তত্ত্বই বলুন আর যাই বলুন তিনি কৃপা করা মানেই আত্মকৃপা, আত্মকৃপা মানেই আত্মা যখন আপনাকে বরণ করে নেন, আপনাকে মানে মনকে। বরণ করার আসল অর্থ হয় সাংসারিক ভাবকে ত্যাগ করে দেওয়া। পাকা আমি কাঁচা আমিকে পাকড়াও করে বলতে থাকে, জগতকে জড়িয়ে থেকে তোমার কোন লাভ নেই, এবার আমার সাথে বেরিয়ে চলে এস।

মন্ত্রের প্রথম লাইনে বলছেন কর্ম দিয়ে তাঁকে পাওয়া যাবে না। আত্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছা যদি উদয় হয় তবেই একমাত্র হবে। ঠিক ঠিক আত্মজ্ঞানের ইচ্ছা কখনই মনের হয় না। কেই যদি জমিদারী পেয়ে যায়, সম্পত্তি পেয়ে যায় সে কি আর কখন সেই জমিদারী ছাড়তে চাইবে! মন এতদিন জমিদারী চালাচ্ছিল সে কেন অত সহজে ছেড়ে দেবে! তিনি কৃপা না করলে কিছু হবে না এগুলো যুক্তি তর্কে দাঁড়ায় না, সেইজন্য বলে আত্মকৃপা। কিন্তু অর্থটা হল মহান যিনি, বিভু যিনি, তিনি যখন বলেন আমি ক্ষুদ্রের সঙ্গে আর জড়িয়ে থাকব না, এটাই আত্মকৃপা। আত্মকৃপা মানে, মনের ভেতর থেকে ঠিক ঠিক ইচ্ছার উদয় হওয়া, আমি আমাকে জানতে চাই। দ্বিতীয় পয়েন্টে বলবে তাহলে তুমি কেন আলতু ফালতু কাজ করে বেড়াচ্ছ, নানান ঝঞ্ঝাটে কেন জড়াচ্ছ? একদিকে তুমি বলছ ভক্ত, তুমি আত্মজ্ঞান চাইছ অন্য দিকে তুমি কেন নাম-যশের পেছনে দৌড়াচ্ছ? তার মানে তুমি অন্য কথা বলছ, তোমার এখনও আত্মকৃপা হয়নি। আত্মকৃপা হওয়া মানেই আমার আর কিছু লাগবে না। তাহলে কি শুয়ে বসে দিন কাটাবে? তাও নয়, আলস্যও মনের অবস্থা, আলস্যের মধ্যেও থাকবে না। মনের মধ্যে যত আবর্জনা আছে, ধ্যান করে সব আবর্জনাকে সরিয়ে দেবে। এগুলো প্রতিবন্ধক, পুরনো সংস্কারকে না সরালে প্রতিবন্ধক কখনই যাবে না। সংস্কার দুদিন পরেই আবার তেড়ফুড়ে বেরিয়ে আসবে। এতদিনের সংস্কার তাকে ছাড়বে কেন, সহজে তাকে বেরিয়ে যেতে দেবে না, দুদিন পরেই আবার পাকড়াও করে নিয়ে আসবে। ঠাকুর বলছেন অশ্বত্থ গাছ আজ কেটে দাও কাল আবার ফেকড়ি বেরিয়ে যাবে। ভক্তিশাস্ত্রের সাধনা বা বেদান্তের অবস্থাত্রয় বিচার, নিত্যানিত্য বিবেক বিচার সব ঐ প্রতিবন্ধককে সরানোর জন্য। এক হল এগুলোকে ঝেঁটিয়ে বার করে দেওয়া, আর দ্বিতীয় নিশ্চিত হওয়া, এগুলো আবার যেন ফিরে না আসে। শুধু বার করে দিলেই হবে না, দেখতে হবে আবার যেন ঢুকে না পড়ে। ঠাকুরও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কথা বললেন কিন্তু তাতে তাঁদের উপর কোন প্রভাব পড়ল না। তার মানে মনের প্রস্তুতি না থাকলে কোন প্রভাবই পড়বে না। প্রভাব কেন পড়ে না? তখন বলছেন –

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমনসো বাহপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।।১/২/২৪।।

(যে পাপাচরণ থেকে বিরত হয়নি, যে সংযতেন্দ্রিয় নয়, যার সমাহিত চিত্ত হয়নি আর যে অণিমাদি ফলকামনায় অস্থির চিত্ত তারও পরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা এই দুর্বিজ্ঞেয় আত্মাকে লাভ করতে পারবে না।)

আগে বললেন *যমেবৈষ বৃণুতে*, আত্মা যাঁকে বরণ করেন তিনিই আত্মাকে জানতে পারেন আর এখানে বলছেন *প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ*। তুমি এই আত্মাকে পাবে। কিভাবে পাবে? *প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ*, প্রজ্ঞার দ্বারা। মনে হবে বিপরীত কথা বলছেন, কিন্তু কোন বিরোধ নেই। একই কথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছেন। প্রজ্ঞা মানে বিশুদ্ধ জ্ঞান, একেবারে প্রকৃষ্ট জ্ঞান। কি রকম প্রকৃষ্ট জ্ঞান? *নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ*, যারা এখনও নিষিদ্ধ কর্ম থেকে বিরত হয়নি, আত্মা তাকে কোন দিন বরণ করবেন না। আত্মা বরণ করবেন না মানে, আত্মার জ্ঞান তার কোন দিন হবে না, শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি কোন দিন খুলবেই না। কারণ তাদের মন এখনও সীমিতের মধ্যে জড়িয়ে আছে। *নাশান্তো*, অশান্ত মানে যাদের মধ্যে এখনও ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য আছে, পা নাড়ছে, হাত নাড়ছে, চোখ নাড়ছে, নখ খাচ্ছে, সব সময় দৌড়ে দৌড়ে কাজ করে যাচ্ছে, এগুলোই ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য। যাদের মধ্যে এখনও কর্ম প্রবণতা প্রবল তাদের দ্বারা হবে না। *নাসমাহিতঃ*, নিষিদ্ধ কর্ম থেকে সরে এসেছে, ইন্দ্রিয়কেও নিয়ন্ত্রণে এনেছে কিন্তু মন এখনও পুরো নিয়ন্ত্রিত হয়নি, এদের দ্বারাও হবে না। *যমেবৈষ বৃণুতে*, আত্মা যাঁকে বরণ করেন, কাকে বরণ করেন? এই গুণগুলো তার মধ্যে থাকতে হবে – মন শুদ্ধ, ইন্দ্রিয় অচঞ্চল, মন সমাহিত। আর *নাশান্তমানসো*, সব গুণ তার মধ্যে আছে কিন্তু *অশান্তমানসঃ*, *অশান্তমানসঃ* শব্দের অর্থ হল, তার একাগ্রতা এসে গেছে কিন্তু এবার সে এই একাগ্রতার ফল কামনা করছে। ভক্তরা এসে মাকে বিরক্ত করত, এত জপ-ধ্যান

করলাম তাও তাঁকে পেলাম না! শ্রীমা বলছেন, ঈশ্বর কি আলু পটল যে জপ-ধ্যান করে পেয়ে যাবে! ফলের আকাঙ্খা থাকলে কোন দিন হবে না। ঠাকুর গল্প বলছেন, দুই যোগী তপস্যা করছে, একজন নারদকে জিজ্ঞেস করছে কবে আমার ঈশ্বর দর্শন হবে। নারদ বললেন তোমার এখনও সাত জন্ম লাগবে। শুনে সেই যোগী হতাশ হয়ে বলছে, এখনও সাত জন্ম! আরেকজন যোগী জানতে চাইলে নারদ বললেন এই তেঁতুল গাছে যত পাতা আছে তত জন্ম লাগবে। শুনেই সেই যোগী আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করে দিয়েছে, আমারও ঈশ্বরের দর্শন হবে! এই যোগীর কোন ফলাকাঙ্খা নেই। আমি এত চেষ্টা করছি, এখনও ফল আসছে না, এটাও মনের চাঞ্চল্য। প্রজ্ঞা মানেই মনের মধ্যে কোন ধরণের চাঞ্চল্য নেই। চাঞ্চল্যরহিত মনেই আত্মা প্রতিবিম্বিত হন। আত্মজ্ঞানের প্রতিফলন মানেই মনে কোন চাঞ্চল্য নেই। মনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় দুশ্চরিত্র থেকে। দুশ্চরিত্র থেকে যদি সরে আসে তখন ইন্দ্রিয় থেকে চাঞ্চল্য হয়, ইন্দ্রিয়ও যদি বশে এসে যায়, মনের নিজের চাঞ্চল্য থেকে যায়, এটা তৃতীয় স্তর। মনের চাঞ্চল্যও যদি নিয়ন্ত্রণে এসে যায়, তখন সামান্য একটু চাঞ্চল্য থাকে – আমার ফল চাই, আমি যে সাধনা করছি তার ফল। ঐটুকু চাঞ্চল্যও যদি বন্ধ হয়ে যায় তখন মেধা যেটা ছিল সেটাই পাল্টে হয়ে যায় প্রজ্ঞা, প্রকৃষ্ট জ্ঞান। আগে বুদ্ধি ছিল, যে বুদ্ধি দিয়ে জগতের জ্ঞান হয়, সেই বুদ্ধিটা মেধা হয়ে গেল, মেধা হয়ে যাওয়া মানে শাস্ত্রার্থ ধারণ করার ক্ষমতা এসে গেছে, সেই মেধা পাল্টে হয়ে গেল প্রজ্ঞা, এই প্রজ্ঞা দিয়ে সে এবার আত্মজ্ঞান পেয়ে যাবে। বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়ে প্রজ্ঞার স্তরে যখন চলে গেল, এইবার সে আত্মজ্ঞান পাবে। *যমেবৈষ বৃণুতে* ঠিকই বলছেন, কিন্তু তার শর্তগুলি এখানে বলে দিলেন। দুশ্চরিত্র, ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য, মনের চাঞ্চল্য আর ফলাকাঙ্খা এগুলো সবই প্রতিবন্ধক। এই প্রতিবন্ধকতাকে যতক্ষণ অতিক্রম করে না আসছে ততক্ষণ আত্মজ্ঞান হবে না।

এখানে শব্দটা হল *প্রজ্ঞানেন*, প্রজ্ঞার যে কার্য তাকে বলছেন প্রজ্ঞান্। আত্মজ্ঞান মেধা দিয়ে হয় না, বুদ্ধির কার্য দিয়েও হয় না, হয় প্রজ্ঞা দিয়ে। প্রজ্ঞার কার্যই হল প্রজ্ঞান, প্রকৃষ্ট জ্ঞান। প্রকৃষ্ট জ্ঞানকে ধারণ করাকে বলে প্রজ্ঞা। এর আগে আগে আত্মার যে স্বরূপের কথা বলা হয়েছে, *মহান্তং, বিভূম, আত্মানাম,* এর জ্ঞানকেই বলছেন প্রজ্ঞান। এই জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান নয়, সাধারণ জ্ঞান মানে জাগতিক জ্ঞান বা কোন বিষয়ের জ্ঞান। অন্যান্য জ্ঞান বিদ্যা দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে প্রাপ্ত করা যায়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান মানে, আমিই সেই আত্মা এই জ্ঞান। অন্যান্য জিনিষকে পেতে হলে কার্য ক্রিয়াদি করতে হয় কিন্তু আত্মজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞান্ লাগে, অর্থাৎ আমিই সেই এই প্রজ্ঞান্। প্রজ্ঞানের কার্য করে প্রজ্ঞা। যেমন অনেক রকমের জ্ঞানের কথা বলা হয়, সাধারণ জ্ঞান, আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান ঠিক তেমনি শাস্ত্রে অনেক রকম আত্মার কথা বলা হয়, দেহকেও কখন আত্মা বলা হয়, মন ও বুদ্ধিকেও কখন আত্মা বলছেন, ঐটাকে আলাদা করার জন্য বলছেন প্রজ্ঞান্। প্রজ্ঞান্ কি? আমি সেই আত্মা, যে আত্মার বর্ণনা আগে আগে দেওয়া হয়েছে। আমার ভেতরে যিনি আছেন তিনিই সর্বব্যাপী – এই জ্ঞান দিয়ে আত্মাকে জানা যায়, এর বাইরে অন্য কোন পথ নেই। জগতের কোন কিছুকে পেতে চাইলে সেই বস্তুকে গিয়ে ধরতে হয়, ধরার আগে সেই বস্তুকে বুঝতে হয়, বস্তুর জ্ঞান লাভ করতে হয়। আত্মজ্ঞান সেই অর্থে জ্ঞান নয়। কিন্তু যখন বলছেন প্রজ্ঞান্ দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় তখন কোন না কোন ভাবে জ্ঞানের কার্য থাকছে, এখন সেই কার্য আত্মাই করুন বা শুদ্ধ মনই করুন তাতে কিছু আসে যায় না। ঠাকুর বলছেন শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ বুদ্ধি এক। আত্মজ্ঞান যখন বলছি তখনও মন আর বুদ্ধি কোন না কোন ভাবে জড়িয়ে আছে। কিন্তু কিভাবে জড়িয়ে আছে সেটা আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। বলছেন, আত্মা যিনি তিনি আর মনের সাহায্য নেন না, মনের তখন আলাদা কোন অস্তিত্ব থাকে না, আত্মার সাথেই সে এক হয়ে যায়, বুদ্ধিও সেই আত্মার সাথে এক হয়ে যায়, এই অবস্থাকে বলছেন প্রজ্ঞা। আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা শব্দের ব্যবহার করছি ঠিকই কিন্তু প্রজ্ঞা শব্দের ঠিক ঠিক অর্থ হল যেটা দিয়ে আত্মজ্ঞান হয়। প্রজ্ঞার কাজ হল প্রজ্ঞান ঐ বিশেষ জ্ঞান – আমার ভেতরে যিনি আছেন তিনিই সর্বব্যাপী – এই জ্ঞানকে ধরে রাখা। প্রজ্ঞা হল মনের সেই অবস্থা যে অবস্থায় সে বুঝে নেয় আমিই সেই আত্মা। কিন্তু এই মন সেই সাধারণ মন নয় যে মন দিয়ে এই জগৎ চলে। ঐ অর্থে বুঝতে হলে তাহলে বলতে হয়, মনের অবস্থাটা এমন পাল্টে যায় যে মন খুব তীক্ষ্ণ হয়ে যায় তখন আমরা তাকে বলছি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বা মেধা, ঠিক তেমনি মন এমন শুদ্ধ হয়ে গেল যে মনের মধ্যে অশুদ্ধির লেশ মাত্র নেই তখন তাকে বলছেন প্রজ্ঞা। কিন্তু প্রজ্ঞা দিয়ে একটাই কাজ হয়, তাহল প্রজ্ঞানের কাজ, যেটা দিয়ে ঈশ্বরের জ্ঞান প্রাপ্তি হয়।

যখন কোন সাধক আচার্যকে পেল, শাস্ত্রজ্ঞান পেল, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হয়ে গেল, সাধনা করে সব চাঞ্চল্যকে বন্ধ করে দিয়েছে তখন তার ব্রহ্মজ্ঞান হয়। শেষ মন্ত্রে গ্রন্থস্তুতি করে বলছেন –

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ।।১/২/২৫।।

(ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ই যাঁর অন্ন স্থানীয় আর মৃত্যু যাঁর ব্যঞ্জনসদৃশ, যেখানে তিনি স্বমহিমায় বিরাজিত, সেখানে কে তাঁকে এইভাবে যথার্থ রূপে জানতে পারবে?)

অন্নকে মানুষ যেমন অবলীলায় ভক্ষণ করে নেয়, ঠিক তেমনি আত্মার কাছে ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় অন্নের মত। ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের কথা বলার কারণ, সমাজে সাধারণ মানুষ এই দুজনকেই শ্রেষ্ঠ মানুষ রূপে জানে। তাই বলছেন, সমাজের যাঁরা শ্রেষ্ঠ স্থানীয় আত্মা তাঁদের এমনিই গিলে ফিলবে। কারণ আত্মা থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। এটা গেল সমাজের ব্যাপারে, আর মনুষ্যলোকে শ্রেষ্ঠতম কে? তিনি হলেন যমরাজ। বলছেন যমরাজও তাঁকে ভয় পান। কারণ মৃত্যুও তাঁর অধীনে, সেইজন্য বলছেন *মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং*, মৃত্যু তাঁর কাছে চাটনির মত। ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়কে তাও অন্নের মত বলছেন কিন্তু মৃত্যুকে বলছেন চাটনির মত। কারণ এই জগতের সবাই, সে ব্রাহ্মণ হোক, ক্ষত্রিয় হোক, মৃত্যু হোক এরা সকলেই সেই মায়ার জগতের। মায়ার জগতের মানে ব্যবহারিক জগতের, ব্যবহারিক জগতের মানে আমরা যে জগতকে অনুভব করছি এই জগৎ experiential worldএর সৃষ্টি আর আত্মা হলেন intuitive world, তিনিই সবারই মালিক, প্রকৃতিরও মালিক। প্রকৃতি আত্মার কাছে কিছুই না, রাজযোগে বলছেন পুরুষ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিজের Majestyকে দেখে আর প্রকৃতিকে দেখে একটা ছোট্ট কণার মত পড়ে থাকতে। ঐ ছোট্ট কণার মধ্যেই রয়েছেন দেবতারা আর তার মধ্যেই রয়েছে মানুষ, তার মধ্যেই রয়েছে ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়, এরপর আত্মার কাছে এরা কোথায় দাঁড়াবে! আত্মার সামনে এদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না, এ্যটম বোমার সামনে যেমন মশা মাছি। বলছেন এই যাঁর Majesty যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ, যে মৃত্যুকে সবাই ভয় পায়, এনারাই আত্মজ্ঞানের কাছে কিছুই না, সাধারণ মানুষ আত্মার কী মাহাত্ম্য বুঝবে, কী মহিমা ধারণা করতে পারবে! সম্ভবই নয়।

এই প্রসঙ্গ আবার পরে বলবেন। এই যে *যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ* বলছেন, আসলে যিনি ঈশ্বর তিনিই আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম। কঠোপনিষদে আত্মা বা ঈশ্বরের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকেই বিভিন্ন ভাবে বলছেন। এর আগে যেমন বলছেন *যমেবৈষ বৃণুতে*, তিনি ইচ্ছাময়। কিন্তু ভক্তরা যে অর্থে বলেন সব তাঁর ইচ্ছা, সেই অর্থে নয়, এখানে পুরো অন্য অর্থে বলছেন। এই জগৎ তাঁর ইচ্ছা ছাড়া চলতে পারে না, ঠাকুর বলছেন, তাঁর ইচ্ছা বিনা গাছের পাতাটাও নড়তে পারে না। চৈতন্য যদি না থাকে তাহলে কোন কিছুই চলবে না, প্রকৃতি, শক্তি কোন কিছুই চলবে না। তিনিই সর্বত্র পরিব্যপ্ত হয়ে আছেন বলেই সব কিছু চলছে। বাকি যা কিছু চলছে সব কিছুকে বন্ধ করে যখন তাঁকে ধরতে চাইছে তখনই বলছেন তিনি তাঁকে বরণ করেছেন। এই মন্ত্রে এসে বলছেন তিনি সর্বশক্তিমান। বাড়ির বাচ্চার ইচ্ছার মতই সবাইকে চলতে হয়, বাচ্চা যা খেতে চাইবে বাড়ি সবাইকে তাই খেতে হয়, ও যখন ঘুমোতে চাইবে বাকিদের তখন ঘুমোতে হয়, টিভিতে যে চ্যানেল সে দেখবে বাড়ি সবাইকে সেই চ্যানেলই দেখতে হয়, কিন্তু বাচ্চা সর্বশক্তিমান নয়। এখানে যখন *যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ* বলছেন তখন ভগবানকে সর্বশক্তিমান বলে দেওয়া হল। তিনি কি রকম সর্বশক্তিমান? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যাঁরা এত শ্রেষ্ঠ এরা তাঁর কাছে কিছুই নয়। মানুষের কাছে এই তিনজনই শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ, রাজা আর জীবন, রাজা বলতে ক্ষত্রিয়। জীবনের মালিক হলেন যমরাজ, সেই মৃত্যুও তাঁর কাছে কিছুই নয়। কারণ চৈতন্য যদি না থাকে তাহলে কোনটাই কিছু নয়। এখানে এসে দ্বিতীয় বল্লী শেষ হয়ে যায়। তৃতীয় বল্লীর আলোচনা শুরু করার আগে আমাদের কিছু জিনিষ নিয়ে আলোচনা করে নিলে অনেক কিছু বুঝতে সুবিধা হবে।

প্রথম অধ্যায়

তৃতীয়বল্লী

শ্রুতি বা শাস্ত্র কেউই বলেন না যে কর্মের দ্বারা বা সংস্কারের দ্বারা কোন মানুষ জ্ঞানের শেষ ধাপের দিকে এগোতে পারবে। শেষ ধাপে গিয়ে ঠিক কি হয় ব্যাখ্যা করা যায় না। একটা হতে পারে যিনি জীবাত্মা আছেন তিনি পরমাত্মার কাছে প্রার্থনা করছেন – হে প্রভু! আমাকে তোমার দাস করে নাও। বেদান্তের দৃষ্টিতে তা হয় না, বেদান্তের দৃষ্টিতে বলবে উপাধি পরিচ্ছিন্ন জীব নিজেই উপাধি বিহীন জীবের কাছে প্রার্থনা করে, আমার আর এই উপাধি লাগবে না। ঠাকুর খুব সহজ উপমা দিয়ে বলছেন, মা যখন সংসারের কাজকর্ম করে তখন বাচ্চার মুখে চুষনি ধরিয়ে দেয়। চুষনি হল উপাধি। কিছুক্ষণ পর বাচ্চার খেয়াল হয় মাকে দেখতে পাচ্ছি না। তখন সে চুষনি ফেলে দিয়ে মা বলে ডাকে। বাচ্চা চুষনি ফেলে মা বলে চিৎকার করতেই মা ভাতের হাড়িটা নামিয়ে দৌড়ে এসে বাচ্চাকে কোলে তুলে নেয়। এখানে কে কাকে বরণ করছে? এই জিনিষটা খুব গভীর ভাবে বোঝার চেষ্টা করলে ঈশ্বর দর্শনের ব্যাপারটা কিছু বোঝা যায়। মা আর সন্তান কিন্তু দুই নয়, এক। বাচ্চা যেমন নিজেকে মায়ের থেকে আলাদা মনে করে না তেমনি মাও নিজেকে বাচ্চা থেকে আলাদা মনে করে না। অথচ দুজন আলাদা। তাই না, বাচ্চাকে ব্যস্ত রাখার জন্য মা তার মুখে চুষনি বা খেলনা ধরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু কোন কারণে একটা অবস্থায় গিয়ে বাচ্চা বলছে আমার আর চুষনি খেলনা কিছুই লাগবে না। সে মা বলে চিৎকার করে ওঠে। বাচ্চা কাকে ডাকছে? নিজেকেই ডাকছে, ওর মধ্যে তো বোধ নেই যে আমি আর মা আলাদা। মা তখন গিয়ে তাকে বরণ করে নেয়। মা কিসের বরণ করবে, মাও তো বাচ্চা থেকে আলাদা মনে করছে না, মা আর বাচ্চা একই সত্তা। সাংসারিক দৃষ্টিতে দুটো আলাদা সত্তা বলে মনে হয়, কিন্তু যে মাতৃত্বের বোধ করেছে তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় দু তিন মাসের বয়সে বাচ্চা যখন ছিল তখন তার কি মনে হত। সব মা একাত্ম বোধের কথাই বলবে। কিন্তু তাও বাচ্চার মুখে চুষনি দিত কিনা? অবশ্যই দিত। কিন্তু এখানে আমরা উপমা নিচ্ছি, উপমার সাথে সব কিছু মিলবে না। এখানে একাত্ম অথচ আলাদা, সেখান থেকে আবার একাত্ম, এই জিনিষটাকে বোঝার চেষ্টা করছি। এই বল্লীতে যখন রথ ঘোড়া আসবে তখন আচার্য বলবেন এই রূপকের সাথে ঐ জায়গার সমানতা আছে। সব কিছু মিলবে না, কিন্তু একটা জিনিষকে বোঝানর জন্য বলা হচ্ছে। দু তিন মাসের সন্তানও যা মাও তাই, অথচ দুজনের মধ্যে একটা বিভাজন রয়েছে। একটা দেওয়াল সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে, মায়ই করছে। কিন্তু কোন কারণে সন্তান বলছে আমার আর এগুলো লাগবে না। সন্তান তখন কিছুই বোঝে না। ঠিক এই ধরণের কিছু একটা হয়।

উপলব্ধিবান বড় বড় ঋষি-মুনিরাও বলছেন চেষ্টা সবাইকেই করতে হয়। ঠাকুরের সাধন-জীবনের বর্ণনা আমরা যত পরিষ্কার পাই, এত পরিষ্কার systematic আর কোথাও পাওয়া যাবে না। তিনি শুনেছেন কমলাকান্ত, রামপ্রসাদ মায়ের দর্শন পেয়েছেন। শোনার পর ঠাকুরের চেষ্টা শুরু হয়ে গেল। আজ আমরা তাঁকে অবতার বলছি ঠিকই, কিন্তু তখন তাঁর কী তীব্র ব্যাকুলতা। চেষ্টা করে যাচ্ছেন। চেষ্টা করতে করতে শেষের দিকে ব্যাকুলতার তীব্রতাকে তিনি আর নিতে পারছেন না, বলছেন আমার গলাই কেটে দেব। তখন হঠাৎ মা কালী ঠাকুরের হাতটা ধরে নিলেন। মা কালী হাত ধরলেন এর অর্থ কি? চৈতন্য শক্তি সর্বশক্তিমান, তিনি এমন কিছু একটা করলেন যাতে ঠাকুরের মনে হল তাঁর হাত আটকে গেছে। এটাই স্বাভাবিক যা কিছু হয় সব চৈতন্য দিয়েই হয়। ঠাকুর যেন বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। ঠাকুর তীব্র ব্যাকুলতার দ্বারা একটা সাধনার পথকে অনুসরণ করে সেই প্রথম অখণ্ড বোধে চলে গিয়ে দেখছেন শুধু মা আছেন, এখানেও ঠিক এই অবস্থার বর্ণনা করছেন। ঠাকুরের প্রথম মা কালীর দর্শন আর এখানে *যমেবৈষ বৃণুতে* দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। মা কালীর কোন বৈষম্য দোষ নেই। বেদান্তের দৃষ্টিতে উপাধি পরিচ্ছিন্ন আত্মা বলছেন আমার আর উপাধি লাগবে না। আত্মা চাইলেও যিনি সর্বশক্তিমান তিনি তখনও তাঁর বন্ধনকে সরিয়ে দিতে চাইবেন না। ঐ তীব্র ব্যাকুলতাতেও মা কালী ঠাকুরকে দর্শন দিচ্ছিলেন না। কেন তিনি বন্ধন সরিয়ে দিতে চান না, এই ব্যাপারটা কখনই জানা যাবে না। জানতে চাওয়া মানেই বুদ্ধি দিয়ে চৈতন্যের কার্যকে বুঝতে চাওয়া। কিন্তু চৈতন্যের তুলনায় বুদ্ধি অত্যন্ত নিকৃষ্ট। প্রধানমন্ত্রীর দফতরের দারোয়ানকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা ভাই, সরকারের নিউক্লিয়ার পলিসি নিয়ে কি হতে যাচ্ছে একটু বলতে পার? দারোয়ান তখন বলবে, আমার কথা ছেড়ে দিন, মিনিস্ট্রির যিনি সেক্রেটারী তিনিও বলতে পারবেন না। বুদ্ধি দিয়ে চৈতন্যের কার্যকে বিচার করাও ঠিক সেই রকম। সেইজন্য

তিনি কেন একটা সীমা রেখে দেন এই ব্যাপারটা আমাদের কাছে কোন দিন পরিষ্কার হবে না। ঠাকুর বলছেন, কখন ভাবি তিনি ভালো, কখন ভাবি তিনি মন্দ। কিন্তু ঈশ্বর কি কখন মন্দ হন? কখনই নয়। ঠাকুর আসলে বলতে চাইছেন ঈশ্বরের কার্যকলাপ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা যাবে না। তবে রাজার কাছে কাছে যিনি সব সময় থাকেন তিনি কিছু কিছু জানতে পারেন। শুদ্ধ বুদ্ধি ঠিক সেই রকম, শুদ্ধ বুদ্ধি চৈতন্যেরর সব থেকে কাছের লোক, সেইজন্য সে চৈতন্যের কিছু কিছু জিনিষ ধরে নেয়। শুদ্ধ মন মানে সচ্চিদানন্দের অনেক কাছে চলে গেছে। অশুদ্ধ মন হল সরকারী অফিসের দারোয়ানের মত অনেক দূরে আছে। কিন্তু সরকারের সাথে তারও সম্পর্ক আছে, প্রধানমন্ত্রী তিনি ভারত সরকারের প্রধান আর দারোয়ান সেও ভারত সরকারেরই লোক। শুদ্ধ মন আর অশুদ্ধ মন অনেকটা এই ধরণের। এই জিনিষটাকে মাথায় রেখে আমরা এখন তৃতীয় বল্লীর আলোচনা শুরু করছি, প্রথম মন্ত্রে বলছেন –

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতঃ।।১/৩/১।।

(স্বকৃত কর্মের অবশ্যম্ভাবি ফল ভোগকারী যে দুজন অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভোগায়তন শরীরমধ্যে পরব্রহ্মের উত্তম উপলব্ধি স্থান বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট আছেন, তাঁদেরকে ব্রহ্মজ্ঞগণ ও যাঁরা পঞ্চাগ্নিক বা ত্রিণাচিকেত তাঁরাও আলো ও ছায়ার মত পরস্পর বিলক্ষণ বলেন।)

মন্ত্রের ভাষ্যে আচার্য প্রথমেই বলছেন *বিদ্যাবিদ্যে নানাবিরুদ্ধফলে ইত্যুপন্যস্তে*, এর আগে ব্রহ্মবিদ্যা ও অবিদ্যা কিভাবে আলাদা আলাদা বিবিধ ফল দেয় সেই প্রসঙ্গে কিছু কিছু বলেছেন। কিন্তু বিদ্যা কি, অবিদ্যা কি, এদের স্বরূপ কি, তাদের ফল কি এগুলোকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি, এবার বিদ্যা, অবিদ্যা এবং এদের স্বরূপ নিয়ে তৃতীয় বল্লীতে রূপকের সাহায্যে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করতে যাচ্ছেন। প্রাপ্তব্য আর গন্তব্য, এই দুটোকে সহজ ভাবে বোঝানর জন্য শুরু করছেন দুটি আত্মাকে নিয়ে।

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে, উপনিষদ নিয়ে গভীর ভাবে চর্চা করা থাকলে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, এই মন্ত্র আমাদের সামনে অনেকগুলো দর্শনকে একসাথে খুলে দিচ্ছে। মন্ত্রে শরীরের মধ্যে দুটি আত্মার কথা বলছেন – জীবাত্মা আর পরমাত্মা। এই ভাব এত কঠিন আর জটিল যে, সরাসরি এর অর্থ করে দিলে বিচিত্র বিচিত্র সিদ্ধান্ত এসে যাবে। কিন্তু বেদান্তের দৃষ্টিতে দেখলে পুরো জিনিষটা খাপে খাপে বসে যাবে। এই মন্ত্রের ছবি মুণ্ডকোপনিষদেও এসেছে, *দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া*, একই দেহরূপী বৃক্ষে দুটি পাখি বাস করে। একটি পাখি কখন বৃক্ষের তিক্ত ফল, কখন কটু ফল ভক্ষণ করছে কখন আবার মধুর ফল খাচ্ছে। মধুর ফল খেয়ে আনন্দে সেখানেই বসে থাকে আর তিক্ত ফল খেয়ে বিরক্ত হয়ে একটু একটু করে উপরের দিকে যেতে থাকে, সেখানে দেখে তার মত আরেকটি পাখি সব সময় একই জায়গায় বসে আছে। সেই পাখি কোন ফল খায় না অথচ নির্বিকার। উপরের দিকে উঠতে উঠতে এক সময় দেখে নীচের পাখি কখন ছিলই না। উপরের পাখিটিই এই রকম চিন্তা-ভাবনা করছিল। মুণ্ডকোপনিষদের এই মন্ত্রটি আবার স্বামীজীর খুব প্রিয়। এবার দেখা যাক এই মন্ত্রে কত রকম জটিলতা এসে যাচ্ছে। প্রথমেই এখানে দেহকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয়, দেহের মধ্যে দুটি আত্মাকে নিয়ে আসছেন। *দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া* মন্ত্রে আর এই মন্ত্রে একই কথা বলতে চাইছেন, দুটো মন্ত্রের মধ্যে তত্ত্বগত কোন তফাৎ নেই শুধু বর্ণনায় পার্থক্য। দুটো মন্ত্রেই বলছেন এই শরীরে দুটি আত্মা – জীবাত্মা ও পরমাত্মা। মজার ব্যাপার হল পরমাত্মার ধর্ম জীবাত্মা নেয় না, কিন্তু জীবাত্মার ধর্ম পরমাত্মার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই কথাই মন্ত্রে বলতে চাওয়া হয়েছে। কথামৃতেও ঠাকুর এক জায়গায় নিজের দিকে ইঙ্গিত করে বলছেন – এর ভেতরে দুই আছে, এক তিনি আর তাঁর ভক্ত। ঠাকুরের কথাও দুটি মন্ত্রের সাথে পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে। ঠাকুরের কথা আর এই দুটি মন্ত্রের বক্তব্য কি? আমরা যেমন যেমন এগোতে থাকব আর যখন পুরো ছবি পেয়ে যাব তখন এর বক্তব্য পরিষ্কার হয়ে যাবে। এক হলেন সেই শুদ্ধাত্মা যিনি সর্বব্যাপী, তিনিই আছেন। কিন্তু তিনি নিজের শক্তিতে বা নিজেরই মায়াতে যেন আবৃত করে দিচ্ছেন। এই আবৃত করে দেওয়াটা বাস্তবিক নয়। বাস্তবিক নয় কেন? কারণ যিনি অখণ্ড, আনন্দময় যাঁর স্বরূপ, তাঁর স্বভাব কখন পাল্টাতে পারে না। যা কিছু হবে সবই কল্পিত হতে হবে, মায়া হতে হবে। বাস্তবিক কখনই হবে না,

যেটা হবে সেটাও ক্ষণিকের জন্য হবে। এবার এই দুটির খেলা চলতে থাকবে। দুটির খেলা কেন? যিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা তিনি তো সর্বব্যাপী, তাঁকে তো থাকতেই হবে, তিনি ছাড়া শুধু শরীর কেন, এই সংসারই থাকবে না। তিনি যদি না থাকেন তাহলে সবটাই শূন্য হয়ে যাবে। তিনি আছেন বলেই এই শরীর, এই জগৎ আছে। আর তিনি মায়ার আবরণ দিয়ে রেখেছেন বলেই আমি বোধ আছে।

এই জিনিষটাকে আচার্য এক জায়গায় খুব সুন্দর ভাবে নিয়ে এসেছেন, সেখানে তিনি বলছেন, যখনই আমরা কোন বস্তুর কথা বলি তখন দুটো বুদ্ধি কাজ করে। যেমন আমি বললাম এটা চক, চক বলার সময় দুটো একসাথে কাজ করে। আমি বলতে চাইছি এটা চক, ইংরাজীতে বলবে this is a piece of chalk, প্রবাসী বাঙালীরা সব কিছুর সাথে একটা ‘হচ্ছে’ লাগিয়ে দেবে, এটা হচ্ছে চক। ভাষার দিক দিয়ে প্রবাসী বাঙালীরা ঠিকই বলছে, ইংরাজীতে যেমন বলবে this is a piece of chalk, হিন্দীতে বলবে ইয়ে চক হ্যায়। এখানে দুটো জিনিষ আছে, একটা হল ‘হচ্ছে’ বা ইংরাজীতে is বা হিন্দীতে হ্যায়। ‘হচ্ছে’ আমরা বলি না ঠিকই কিন্তু ইংরাজীতে বলবে this is mike, this is chalk, this is glass, is শব্দটা তিনটে বস্তুতেই চলছে কিন্তু বস্তুগুলো পাল্টে যাচ্ছে। অস্তিত্ব অর্থাৎ সত্তা এখন দুটোতে চলছে, একটা isnessএ অর্থাৎ অস্তিতে, জিনিষটা আছে আর বস্তুতে। অস্তি অর্থাৎ এই সদ্‌বুদ্ধি সব সময় থাকছে, বস্তুর যদি নাশ হয়ে যায় তখনও অস্তি বুদ্ধি থাকবে। গ্লাশটা ভেঙে গেল, তখনও কিন্তু এই বোধ আছে যে, গ্লাশ ছিল এখন চলে গেছে, অস্তি বোধ যায় না। জগতের সমস্ত বস্তুকে যদি নাশ করে দেওয়া হয়, শুধু জগৎ যদি থাকে তখনও কিছু না কিছু থাকবে। সৃষ্টিতে কিছু নেই কিন্তু তখনও ব্রহ্মা আছেন। ব্রহ্মার প্রথম বোধ হয় অহং অস্মি, আমি আছি, ব্রহ্মার অস্তি বোধ এসে গেল। অস্তি বোধ যদি না থাকে সৃষ্টি থাকবেই না। অস্তি বোধ চলে গেলে একমাত্র সচ্চিদানন্দই থেকে যান। সৃষ্টি মানেই এই দুটো অহং অস্মি বা আমি আছি, থাকবেই। শুধু অস্মি যদি হয়ে যায় তখন আর সৃষ্টি নেই, শুধু সচ্চিদানন্দই তখন আছেন, সত্তা মাত্রম্ থাকেন, সত্তার বোধ শুধু তাঁরই। কিন্তু এর সাথে যদি আরেকটি শব্দ ‘আমি’ এসে যায়, আমি আছি এসে যায় তখনই দুটি সত্তা এসে যায়, একটা আমি আরেকটি আছে। চকের ক্ষেত্রে দুটো সত্তা চক ও আছে। ঠিক তেমনি আমি আছি, তুমি আছ এখানেও ‘আছি’ দুটোতেই থাকছে কিন্তু আমি আর তুমি আলাদা। ‘আছি’টা সেই সত্তা যিনি সচ্চিদানন্দ, যিনি শুদ্ধ পরমাত্মা। এই যে ‘আমি’ এটাই মায়ার দ্বারা সীমিত সত্তা। সত্তা তাহলে দুটো হয়ে গেল, একটা অখণ্ড সত্তা, সত্তা মাত্রম্। আর দ্বিতীয় সত্তা দেশ, কাল ও পাত্রে সীমিত সত্তা। এই দুটো সত্তা সব সময়ই থাকছে। এটাকেই বলছেন *দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া*। এখানেও একটা সীমিত সত্তা আরেকটি পূর্ণ সত্তাকে নিয়ে বলছেন। এই দুটি সত্তা এক সঙ্গে চলে, যেখানেই সৃষ্টি সেখানেই এই দুটি সত্তাকে থাকতেই হবে। এর থেকে একটা সত্তা চলে গেলে আর সৃষ্টি চলবে না। যদি সত্তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়, যেমন বৌদ্ধ দর্শনে সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন ওটাই হয়ে যাবে শূন্যবাদ। শুদ্ধ সত্তা না থাকলে কিছুই থাকবে না, সেটা তখন অনীশ্বর হয়ে যাবে। জগতে অনীশ্বর বলে কিছু হয় না। ঈশ্বরের আরেকটি নাম সত্তা, সত্তা মানে আছে। এমন কিছু জিনিষ যদি হয় যেখানে ঈশ্বর নেই তাহলে ‘আছে’ জিনিষটা সেখান থেকে নাশ হয়ে যাবে, তার মানেই সত্তা বিহীন বা অস্তিত্ব বিহীন হয়ে গেল। যদি বলা হয় বন্ধ্যাপুত্র, বন্ধ্যাপুত্র অস্তিত্ব বিহীন, সেখানে ঈশ্বর নেই। কিন্তু যেখানেই পুত্র সেখানে তিনি আছেন, যেখানে বন্ধ্যা সেখানেও তিনি আছেন। কিন্তু যেমনি বন্ধ্যাপুত্র এসে গেল সেখানে তার অস্তিত্বও নেই ঈশ্বরও নেই। বন্ধ্যাপুত্রের মধ্যে ঈশ্বর নেই যখন বলছেন তখন ঠিকই বলছেন। যদি কখন এমন কোন জিনিষকে চিন্তা করা হয় বা ভাবা হয় যার মধ্যে ঈশ্বর নেই, তখন বুঝতে হবে এটা শুধু শব্দ মাত্র। আর আমিত্বের যদি নাশ হয়ে যায় তাহলে শুদ্ধ সত্তাই থেকে যাবে, তখন সৃষ্টিও থাকবে না।

কিন্তু এরপরেও জগতের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে যায়, যেমন চক, মাইক, গ্লাশ এগুলোর যে গুণ সমুদয় রয়েছে, এই গুণগুলোকে আমরা শুদ্ধ আত্মার উপর আরোপ করে দিই, শুদ্ধ আত্মার উপর যা কখনই আরোপ করা যায় না। কেউ মারা যাওয়ার পর আমরা বলি তিনি মারা গেছেন, এই তিনি বলতে বোঝায় সেই শুদ্ধ আত্মা। তিনি মারা গেছেন বলার মধ্যে কোথাও একটা ভুল ভাব এসে যাচ্ছে, মনে করছি তাঁর যে বাস্তবিক সত্তা সেই সত্তার বুঝি নাশ হয়ে গেল, যা কখন নাশ হয় না। অনিত্য বস্তু, সীমিত বস্তুর পরিবর্তন হতে থাকে কিন্তু মানুষ ভুল করে ভাবে আসল যে পূর্ণ সত্তা, যিনি নিত্য তাঁর যেন পরিবর্তন হচ্ছে। তৃতীয় বল্লী এবার এই জিনিষটাকে কেন্দ্র করেই এগিয়ে যাবে। দুটো সত্তাকেই দেখাবেন, একটা পূর্ণ সত্তা আরেকটি কল্পিত সত্তা,

যাকে আমরা এই জগৎ বলছি। কল্পিত সত্তা এই জন্যই বলা হয়, যিনি শুদ্ধ সত্তা তিনি কখন খণ্ডিত বা বিভাজিত হতে পারেন না। যেমন উত্তর মেরুতে সবটাই বরফ, কিন্তু সেই বরফকেই কোথাও উঁচু দেখাচ্ছে কোথাও নিচু দেখাচ্ছে, উঁচু বরফকে দেখে বলছি বড় পাহাড়, নিচু বরফকে বলছি নিচু পাহাড়। পাহাড় সাধারণ কিন্তু উঁচু নিচুটা আলাদা। উঁচু পাহাড় নিচু পাহাড় বলতে গিয়ে আমরা কোথাও যেন পাহাড়ের যে সত্তা সেই সত্তার উপর উঁচু নিচু ভাব আরোপ করে দিচ্ছি। ঠিক এই জিনিষটাকেই আলোচনা করতে গিয়ে শুরু করছেন *ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে*। ভেতরে দুটি সত্তা পূর্ণাত্মা আর জীবাত্মা। কিন্তু আমরা এখানে যেভাবে সত্তাদি নিয়ে বলছি বেদান্ত এভাবে দেখে না। ভক্তরা আবার অন্য ভাবে দেখবেন, ঠাকুর যেমন বলছেন, এর ভেতরে দুটি আছে, এক তিনি আছেন আর এক তাঁর ভক্ত আছে। দ্বৈত দৃষ্টিতে সব সময় দুটো আলাদাই হবে। দ্বৈত দৃষ্টিতে সত্তা মাত্রম্ যিনি তিনি ভগবান, সর্বশক্তিমান আর ঐ সীমিত আমি যে সে হল জীব, এই জীব হল দাসের দাস তার দাস। যার যার দৃষ্টির উপর নির্ভর করবে এই দুটি সত্তাকে সে কিভাবে দেখবে।

ঋতম্ শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য বলছেন *ঋতং সত্যম্ অবশ্যম্ভাবিত্বাৎ*, ঋতম্ মানে *সত্যম্* আর *অবশ্যম্ভাবি*, যার ফল হবেই হবে। ঋতম্ মানে যে নিয়মের উপর আধার করে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলছে, যে নিয়মকে কখনই পাল্টান যায় না। যেখানে যত নিয়ম আছে, ফিজিক্সের নিয়ম, বায়োলজির নিয়ম, কেমেস্ট্রির নিয়ম, সব নিয়ম এই ঋতমেরই অঙ্গ, এই নিয়মকে কেউ কখন অতিক্রম করতে পারবে না। সেইজন্য ঋতমের একটা নাম সত্য এবং আরেকটি নাম ধর্ম, যদিও এগুলোর মধ্যে সামান্য একটু তফাৎ থেকে যায়। ভগবানের একটা নাম ওঁ, তিনি এই জগতে শক্তি রূপে আছেন আর তিনি ধর্ম রূপে, যে ধর্ম অবশ্যম্ভাবি, সেই রূপে তিনি জগতকে চালাচ্ছেন। তিনিই আধার তিনিই আধেয়। তিনিই নিজের শক্তি দিয়ে সৃষ্টি হয়েছেন, তিনিই বিধান হয়েছেন, তিনিই জগৎ হয়েছেন। স্বামীজী ঠাকুরের স্তবে এই জিনিষটাই বলছেন, ওঁ হ্রীং ঋতম্, ওঁ ঠাকুরেরই নাম, হ্রীং ঠাকুরেরই নাম আর ঋতমও ঠাকুরেরই নাম। ওঁ হল ঠাকুরের পরমব্রহ্ম রূপ, হ্রীং হল ঠাকুরের শক্তির রূপ যেটা দিয়ে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে এবং আছে আর ঋতম হল বিধান যা কিনা কখন পাল্টানো যায় না। এই বিধানের জন্যই দিনের পর রাত আসে, রাতের পর দিন হয়, জন্ম হলে মৃত্যু হয়, মৃত্যুর পর জন্ম হয়, জগৎ যে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে চলছে, ঋতমের জন্যই চলছে।

মানুষ যে শুভ কর্ম করছে তার ফল হবেই হবে। কিন্তু এই শুভ কর্মের ফল কে পান করেন? বলছেন আমাদের ভেতরে যিনি চৈতন্য সত্তা, তিনি এই ফল পান। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে সুকৃতির পান চৈতন্য সত্তা করেন, দুষ্কৃতির পান কে করেন? ভালো কর্মের ফল ভগবান নিচ্ছেন খারাপ কর্মের ফল কে নিচ্ছেন? আচার্য তাঁর ভাষ্যে শুধু একটা কথা বলছেন *সুকৃতস্য স্বয়ংকৃতস্য কর্মণঃ ঋতম্*, আচার্যের ভাষ্যে শব্দটা হল *স্বয়ংকৃত*, আমরা যেটাই করেছি সেটাই *স্বয়ংকৃত*। আমাদের ভাষায় সুকৃত শব্দের অর্থ শুভ কর্ম। আচার্য কিন্তু ব্যাখ্যাতে *স্বয়ংকৃত* বলছেন, *স্বয়ংকৃত* মানে শুভ আর অশুভ দুটো কর্মই ওখানে যাবে। জীবাত্মা কখনো উপরের দিকে যায়, কখনো নীচের দিকে যায়, কখন শুভ গতি পায় কখন অশুভ যোনি পায়, স্বয়ংকৃতে শুভ আর অশুভ দুটো না থাকলে কখন তা সম্ভব হত না। স্বয়ংকৃত না বলে সুকৃত বললে এই জিনিষ হবে না। সুকৃত যখন বলছেন তখন শুধু সুকৃত অর্থেও আসতে পারে। মন্ত্রে ছোট একটা শর্ত লাগান আছে যাতে বোঝা যায় এখানে সুকৃতি বলতে যদি শুভ কর্ম না বোঝায় তাতে দোষের কিছু হবে না। কারণ, পরেই বলছেন যিনি ব্রহ্মবিদ, যিনি ত্রিণাচিকেত, যিনি পঞ্চাগ্নি করেছেন তাঁরা এই কথা বলছেন। ব্রহ্মবিদ মানে যিনি ব্রহ্মকে জানেন, পঞ্চাগ্নি গৃহস্থ যে শুভ কর্মে রত আর ত্রিণাচিকেত নামে যে বিশেষ যজ্ঞের কথা আগে বলা হয়েছে, যাঁরা এই যজ্ঞ করেছেন, এনাদের কাছে অশুভ কর্ম বলে কিছু থাকে না। আর এই কথা বলছেন যমরাজ নচিকেতাকে। সেইজন্য শুধু শুভকর্মের কথাই যদি বলা হয় তাতে দোষের কিছু নেই। আর অন্যান্য জায়গায় শুভ অশুভ কর্মের কথা তো বলছেনই। কেউ যদি প্রশ্ন করে আমি যে যজ্ঞ করছি এই যজ্ঞের ফল কে ভোগ করছেন? যজ্ঞের ফল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না, তোমার অন্তর্যামীই এর ফল ভোগ করছেন। এখানে তিনজনের নাম করছেন, ব্রহ্মবিদ, ত্রিণাচিকেত আর পঞ্চাগ্নি এনাদের দ্বারা কোন অশুভ কর্ম হয় না। কিন্তু আচার্য বলছেন স্বয়ংকৃত, যার মধ্যে শুভ কর্ম আর অশুভ কর্ম দুটোই এসে যায়। আর সাধারণ ভাবে যদি বলা হয়, মানুষ যে কর্ম করে সেই কর্মের ফল কোথায় যায়? বলছেন তার ভেতরে যিনি অন্তর্যামী আছেন তিনি এই কর্মের ফল ভোগ করেন। কর্মবাদে বলা হয় মানুষ যা কিছু কর্ম করছে তার ফল সে পাবেই পাবে। যেমনটি তুমি বীজ বপন করবে তেমনটি তোমার ফসল হবে।

যদি জিজ্ঞেস করা হয় এই কথা কে বলেছে? জগতে হামেশাই দেখা যায় যারা ভালো কাজ করে তারা মার খায়, আর যারা খারাপ কাজ করছে তারা তর তর করে এগিয়ে যায়। তখন বলবে বেদে এই কথা বলেছে, বেদে বলা আছে মানে ঋষিরা বলেছেন। কোন ঋষিরা বলছেন? তখন বলছেন, ব্রহ্মবিদরা বলছেন, ত্রিণাচিকেত অগ্নির চয়ন যাঁরা করেন তাঁরা বলছেন আর যাঁরা পঞ্চাগ্নির আবাহন করেন তাঁরা বলছেন। অনেকে বলতে পারে আমরা এদের মানি না। তাহলে ভাই তোমাকে আর এগুলো মানতে হবে না। এই আলোচনা চলছে যমরাজ আর নচিকেতার মাঝখানে, দুজনেরই এই তিনজনের প্রতি শ্রদ্ধা আছে, সেইজন্য তাঁদের কথাকে মান্যতা দিতে হবে। আমরা যেমন বলি ঠাকুর এই কথা বলেছেন, ঠাকুর যখন বলেছেন তখন এটাই সত্য। কিন্তু ঠাকুর বলেছেন বলে সেই কথাকে সবাই সত্য বলে মেনে নাও নিতে পারে। যারা ঠাকুরের কথাকে মানবে না তারাও কারুর না কারুর কথা মানে। কর্মবাদ, মুক্তি, স্বর্গ-নরক, পুনর্জন্ম এই জিনিষগুলো ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না, যুক্তি দিয়েও জানা যায় না। এর একমাত্র প্রমাণ শ্রুতি প্রমাণ। শ্রুতি প্রমাণ কেন? কারণ এখানে বলছেন ব্রহ্মবিদ, যাঁদের আত্মজ্ঞান হয়েছে তাঁরা এই রকমটি বলেন, যাঁরা বিশেষ যজ্ঞ ত্রিণাচিকেতের চয়ন করেছেন তাঁরাও এই রকমই বলেন আর যাঁরা পঞ্চগ্নির চয়ন করেন তাঁরাও এই কথাই বলছেন। তাঁদের কথা কেন মানতে হবে? এই কথা বলে এনাদের কোন স্বার্থসিদ্ধি হচ্ছে না। যদি বলা হয় বিজ্ঞানে যা কিছু বলছে সবটাই ধাপ্পা, কোয়ান্টাম ফিজিক্স তো আমাদের বোকা বানাচ্ছে, না কেউ কোয়ান্টাম ফিজিক্সকে দেখেছে, না তার কোন প্রমাণ আছে। বৈজ্ঞানিকরা শুনে খুব রেগে যাবে, রেগে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। তারা তখন বলতে শুরু করে বিজ্ঞানীরা সবাই এত জ্ঞানী পুরুষ তাঁদের ধাপ্পা মারার কী দরকার! কেনই বা তাঁরা মিথ্যা কথা বলতে যাবেন। তাহলে ঋষিরা মুক্তির কথা বললে সেটা তোমাদের ধাপ্পা মনে হয় আর বিজ্ঞানীরা কোয়ান্টাম ফিজিক্সের কথা বললে তোমাদের সত্য মনে হয়। তখন এরা বলবে বিজ্ঞানীরা নিঃস্বার্থ। তাহলে যিশু ফাদার ইন হেভেন বলতে বলতে ক্রুশিফাইড হয়ে গেলেন, যিশু ধাপ্পা দিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ পূজারী হয়ে জীবন কাটিয়ে দিলেন সেটা ধাপ্পা, ভগবান বুদ্ধ নিজের সাম্রাজ্য ছেড়ে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সেটা ধাপ্পা আর তোমাদের বৈজ্ঞানিকদের কোন স্বার্থ নেই তাঁরা যেটা বলছেন সেটাই সত্য, এটা কী ধরণের যুক্তি! একটা জায়গায় গিয়ে সবাইকে থেমে যেতে হয়।

প্রত্যক্ষ প্রমাণকে কেউ সন্দেহ করবে না। কিন্তু কখন সখন দেখা যায় আমি এক রকম প্রত্যক্ষ করছি সেটা আপনি অন্য রকম প্রত্যক্ষ করছেন। যেমন ছোট বাচ্চা ট্রেন চলতে শুরু করলে ওর মনে হবে প্ল্যাটফরমটা পেছনের দিকে চলতে শুরু করেছে। বিপরীত প্রমাণকে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করে দিতে হয়। প্রত্যক্ষ আর অনুমান প্রমাণ অর্থাৎ যুক্তি, এই দুটোকে নিয়েই জগৎ চলে। দুটোর পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল অপরোক্ষ অনুভূতি। ধ্যানের গভীরে গিয়ে যে জ্ঞান হয় সেই জ্ঞানের কাছে এই দুটো জ্ঞান অনেক নীচে পড়ে থাকে। সাধনার অবস্থায় ঠাকুর বলছেন তিনি দেখছেন দক্ষিণেশ্বরের গাছপালা, মানুষ, বাড়ি-ঘর সব কিছু ছায়ার মত। আমরা যেভাবে সব কিছু solid রূপে আলোময় দেখছি, কিন্তু তিনি ছায়ার মত দেখছেন। এর অন্য realityটা ঠাকুরের কাছে অনেক বেশি গভীর। বা নরেনকে বলছেন আমি ঈশ্বরকে দেখেছি, তোকে যেমন দেখছি তার থেকে বেশি স্পষ্ট দেখেছি। কথামৃতে এগুলো পড়ি ঠিকই কিন্তু ধারণা করতে পারি না। উপনিষদ সেই একই কথা বলছে যে কথা ঠাকুর বলছেন। ঠাকুরের কথার দাম আমাদের কাছে এই জন্যই বেশি কারণ ঠাকুর কোন কিছু না পড়েই বলছেন, পরে দেখা যাচ্ছে শাস্ত্রেও একই কথা বলছেন। তাতে ঠাকুরের মাহাত্ম্যও বাড়ছে না, বেদের মাহাত্ম্যও ক্ষুণ্ন হচ্ছে না, দুটো স্বতন্ত্র উৎস, দুটো স্বতন্ত্র উৎস একই কথা বলছে। ঠাকুর কিন্তু জানতেন না বেদে উপনিষদে কি আছে, গীতায় কি আছে, পরে উনি শুনেছেন। ঈশ্বরকে তিনি আরও স্পষ্টতর দেখছেন, তার মানে প্রত্যক্ষ প্রমাণে যে জ্ঞান হয়, যুক্তি প্রমাণে যে জ্ঞান হয় তার তুলনায় অপরোক্ষ অনুভূতির জ্ঞান আরও স্পষ্টতর হয়। অপরোক্ষ কেন বলছেন? অপরোক্ষের উল্টো হয় পরোক্ষ, ঈশ্বরীয় জ্ঞান ইন্দ্রিয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দিয়ে হয় না, পরোক্ষ (indirect) দিয়েও হয় না, সেইজন্য বলা হয় অপরোক্ষ (non-indirect)। অপরোক্ষে যে অনুভূতি হয় তার যে বাস্তবিকতা, তার যে সত্য এর স্থান তাঁদের কাছে অনেক উঁচুতে। এই যে বলা হল *নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ*, তার মানে আত্মজ্ঞান যাঁদের হয়েছে তাঁরা এই সব কটি অবস্থাকে পেরিয়ে গেছেন, তাঁর চরিত্র শুদ্ধ, তাঁর ইন্দ্রিয় শান্ত, মন শান্ত। এই ধরণের মন যাঁদের তাঁরা বলছেন *ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে*, যে কোন কর্মের ফল অন্তর্যামী ভোগ করেন।

আইনস্টাইন বিজ্ঞানকে দেখার অনেক পদ্ধতির পরিবর্তন করলেন ঠিকই কিন্তু তাঁকেও আগে বিজ্ঞানের পুরনো পদ্ধতিতেই পড়াশোনা করে বড় হতে হয়েছে। সবাই পরিবর্তন করতে চাইছে, ধর্ম থেকে শুরু করে বিজ্ঞান সব কিছুতে পরিবর্তন নিয়ে আসতে চাইছে। যাঁরাই বিজ্ঞানে পরিবর্তন নিয়ে এসেছেন আগে তাঁদের পুরো জিনিষটাকে জানতে হয়েছে। ডাক্তারী বিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা, যে বিদ্যাই হোক, পরিবর্তন করতে হলে আগে তাকে পুরনো পদ্ধতি বা পুরনো বিদ্যাকে ভালো করে জানতে হবে। পরিবর্তন মানে কখনই ভেঙে গড়া নয়, পরিবর্তন মানে যেটা আছে সেটাকে আস্ত রেখে তার উপর নতুনকে দাঁড় করানো। সেইজন্য আমরা যে শব্দ ব্যবহার করি তা হল outgrow। তার মানে যেটা আছে সেটা থেকে বড় হয়ে গেল। তার জন্য আগে পুরনো সিস্টেমকে জানতে হবে। যিনি বিজ্ঞান পড়তে চাইছেন তাঁকে আগে নিউটনের মেকানিকসকে জানতে হবে, আইনস্টাইনের থিয়োরী জানতে হবে, কোয়ান্টাম ফিজিক্স জানতে হবে। জানার পর দেখছেন ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে না, তখন তিনি আরেকটা থিয়োরী এনে সেটাকে ব্যাখ্যা করবেন। কিন্তু প্রথমেই কেউ যদি বলতে শুরু করে আমি নিউটন, আইনস্টাইন কাউকেই মানি না, তাহলে সেখানেই তাকে বিজ্ঞান পড়া বন্ধ করে দিতে হবে। ধর্মের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টোটা হয়, একটি শাস্ত্র কেউ পড়ে দেখেনি, একজন ঋষি-মুনির কথা জানে না, কোন সাধুসঙ্গ করেনি, প্রথমেই শুরু করবে আমি ধর্মটর্ম মানি না। এই পথে তুমি যদি এগোতে চাও, এই পথে তুমি যদি কিছু যোগ করতে চাও আগে তোমাকে জানতে হবে এতে কি আছে। কিন্তু প্রথমেই এসে বলবে আমি সব কিছুর পরিবর্তন চাই। পরিবর্তন তুমি অবশ্যই করবে, তোমার সেই অধিকার আছে কিন্তু তার আগে অষ্টম-কষ্টম কাটুক তারপর কাশফুল খাবে। প্রথমে ঋষিরা যা বলে গেছেন সেগুলো তোমাকে মেনে চলতে হবে। যমরাজ নচিকেতাকে এটাই বলছেন, তুমি তো আত্মার ব্যাপারে জানতে চাইছ। তখন যমরাজ আত্মার প্রথম পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন, যা কিছু কর্মের ভোগ, তা শুভই হোক আর অশুভই হোক, আত্মা করেন।

এখানে সংক্ষেপে বলে দিলেন, পরে আরও ব্যাখ্যা করে বলবেন কিভাবে এই ফল তিনি পান। শুরুতে মন্ত্রের আলোচনায় বলা হল পরমাত্মা আর জীবাত্মা এক সঙ্গে আছেন, তিনি সৎ রূপেও আছেন আবার সীমিত রূপেও আছেন। কয়েকটি মন্ত্রের পরেই বলবেন উপাধি যখন এসে যায় তখনই তিনি সীমিত রূপে দেখান। কিসের উপাধি? যখন শুদ্ধ আত্মা নিজেকে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির সঙ্গে জুড়ে নেয় তখন আমিত্ব এসে যায়, এই আমিটাই মায়া। মন্ত্রের শেষ দুটি লাইনে বলছেন যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী, আর যাঁরা কর্মী অর্থাৎ যাঁরা পঞ্চাগ্নি করেছেন, যাঁরা তিনবার নাচিকেত অগ্নির চয়ন করেছেন অর্থাৎ যাঁরা উচ্চতম যজ্ঞ করেছেন, তাঁরা বলছেন শুভ কর্মের অবশ্যম্ভাবি ফল জীবাত্মা আর পরমাত্মা দুজনেই পান করেন। কিন্তু পরমাত্মা কি করে কর্মের ফল ভোগ করবেন! যুক্তিতে দাঁড়ায় না। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রে দাঁড়াবে। পূজা অর্চনাদিতে ভগবানকে যা কিছু অর্পণ করা হয় আমরা মনে করি উনি সব কিছু গ্রহণ করেন। কিভাবে গ্রহণ করেন সেই ব্যাপারে ভক্তিশাস্ত্র অনেক রকম কথা বলে, যাই বলা হোক না কেন আমরা অর্পণ করি আর তিনি গ্রহণ করেন। বেদান্তী কক্ষণ অর্পণ করবেন না, তাঁর কাছে এর কোন মূল্য নেই। কিন্তু ভক্ত জানে ঈশ্বরকে অর্পণ করছি। এখানেও তাই বলছেন, *ঋতং পিবন্তৌ*, *তৌ* মানে দুজন, দ্বিবচনে বলা হচ্ছে, তাই দুজন এসে যাচ্ছে। কে এই দুজন? জীবাত্মা আর পরমাত্মা। তাহলে তো বেদান্তে বিরাট সমস্যা হয়ে যাবে, কারণ দুটো সত্তা এসে যাচ্ছে। তার থেকে আরও মারাত্মক সমস্যা হল, পরমাত্মা ভোক্তা হয়ে যাচ্ছেন যেহেতু তিনি কর্মের ফল ভোগ করছেন। এই মন্ত্রের বক্তব্য যদি সত্যি হয় তাহলে ভক্তিই প্রধাণ হয়ে যাবে যেখানে বেদান্তে আর দাঁড়াতেই পারবে না।

এই সমস্যা যাতে না হয় তার জন্য আচার্য একটা শব্দ যোগ করছেন, এটাকে বলে ছত্রিন্যায়। ইদানিং সবাই ছাতা নিয়ে চলে, কিন্তু আগেকার দিনে সবাই ছাতা নিয়ে চলত না, একমাত্র বড়লোকই ছাতা নিয়ে যেতে পারত। সেই ছাতা আবার এখনকার মত ছোট ফোল্ডিং ছাতা ছিল না, বড় ছাতা নিয়ে চলত, ঐ ছাতাকে আবার ছাতার মালিকের মাথার উপর একজন ধরে রাখত। রাজা বা জমিদার নিজের হাতে ছাতা নিয়ে চলবে কল্পনাই করা যাবে না। রাজা বা জমিদার যাওয়ার সময় সাথে আরও চার পাঁচজন লোক যেত বলে পুরো একটা দল চলত। ছাতা যাওয়া মানেই সঙ্গে আরও চার পাঁচজন লোক চলতে থাকা। সাধারণ লোক ছাতা নিয়ে যাবে না, বড়লোকরাই যাবে। বড়লোক থাকলে তার চারটে মোসায়েব থাকবে, রাজা থাকলে তার সেনাপতি মন্ত্রীরা সঙ্গে থাকবে। দূর থেকে যারা দেখত তারা বলত ছাতাওয়ালারা যাচ্ছে। ছাতা কিন্তু একজনের মাথাতেই

আছে, রাজার মাথায়, কিন্তু যখন বলছে তখন সবাইকে মিলিয়েই বলছে। আচার্য বলছেন, এই জায়গায় ছত্রিন্যায় আনতে হবে, ছত্রিন্যায় যদি না আনা হয় তাহলে এখানেই বেদান্ত দর্শনের ভিত নড়ে যাবে। আরও সমস্যা হল, অন্যান্য জায়গায় যে অন্য রকম কথা বলা হয়েছে সেই কথার সাথে কোন মিল থাকবে না। এনারা সব সময় বলেন, শাস্ত্রের কথা এক থাকবে, দু রকমের কথা কখনই বলবেন না। পরম সত্তা কখনই দুই হতে পারে না, সত্তা একটাই। তবে হ্যাঁ, আমরা যে মন দিয়ে সেই সত্তাকে দেখছি সেই মন দিয়ে তাঁকে বিভিন্ন রকম দেখাবে। এখানেও সেই বিভিন্ন রকম দেখাচ্ছে, কিন্তু সামগ্রিক যে অর্থ সেই অর্থের কোন পরিবর্তন হবে না। আচার্য তাই বলছেন, দু রকম দেখার ব্যাখ্যা খুব সহজে হয়ে যায় যদি ছত্রিন্যায় নিয়ে আসা হয়।

পাড়ার এক বড় মস্তান দুজন ভালো লোকের সাথে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, লোকেরা দেখে বলবে – দ্যাখ দ্যাখ বদমাইশটা যাচ্ছে। কিন্তু তার সাথে যে দুটো ভালো লোক যাচ্ছে সেটা বলবে না। একটার প্রাধান্যকে নিয়ে বাকি সব কিছুকে জড়িয়ে নেওয়া হয়, এটাই সংস্কৃতে ছত্রিন্যায়। ছাতা একজনের মাথায় আছে বাকিরা রোদে যাচ্ছে কিন্তু বলছে ছাতাওয়ালারা যাচ্ছে। ভোগ করছে জীবাত্মা, কিন্তু জীবাত্মার সাথে পরমাত্মাও আছেন বলে বলা হয় তিনি ভোগ করছেন। শাব্দিক অর্থে নিলে হয়ে যাবে ভগবান ভক্তি গ্রহণ করেন। কোন ভক্তি শাস্ত্র নয়, উপনিষদই এই কথা বলছে, *ঋতং পিবন্তৌ*, ভগবান সুকৃতি পান করেন। দ্বৈতবাদীরা তাই বলছেন ভগবানকে ভালো জিনিষ অর্পণ করলে তিনি অবশ্যই গ্রহণ করবেন। এখানে বলতে চাইছেন, দুটি সত্তা সবার ভেতরে আছেন যাঁরা সুকৃতি পান করেন। আমরা যখন ভালো কিছু করছি, সাধুসেবা করলাম, ঈশ্বরে ভক্তি করলাম তখন তার একটা ভালো ফল আসে। এই ভালো ফলটা কে পায়? এই ফল কি শরীর পায়, নাকি মন পায়? বলছেন এই ফল জীবাত্মা পায় আর জীবের সঙ্গে তার যে আসল সত্তা পরমাত্মা তিনিও আছেন বলে লোকে মনে করে তিনিও পান। লোকে মনে করে শুদ্ধ আত্মা যিনি তিনিও এই ফল ভোগ করছেন। এটা কি করে জানা যাচ্ছে? পরের লাইনে বলছেন –

গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে। এই সত্যকে ধ্যানের গভীরে জানা যায়। গুহা শব্দ আগেও এসেছে পরেও আসবে, গুহা হল বুদ্ধিস্থিত গুহা। ধ্যান করার সময় বলা হয় হৃদয়াকাশে ধ্যান করছেন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথে হৃদয়াকাশে চৈতন্য জ্যোতির দর্শন হয়, সেইজন্য ঐ জায়গাকে বলছেন গুহা। শরীর ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এই গুহাকে দেখা যায় না, কিন্তু ধ্যানের গভীরে হৃদয়াকাশে যোগীরা বাস্তবিক এই গুহাকে দেখতে পান। *গুহাং প্রবিষ্টৌ*, খুব সূক্ষ্ম মনের সহায়ে যোগী যখন গভীরে চলে যাবেন তখন তিনি দেখেন আত্মা ঐ বুদ্ধিরূপী গুহাতে অবস্থিত। গুহার ভেতরে কেউ যদি প্রবেশ করে তাহলে বাইরের জগৎ সম্বন্ধে তার আর কোন জ্ঞান থাকে না। ঠিক তেমনি ধ্যানে মন গভীরে চলে গেলে তখন বহির্জগতের কোন জ্ঞান থাকে না, সেইজন্য ঐ জায়গাকে গুহা বলছেন। *গুহাং প্রবিষ্টৌ*, গুহার ভেতরে তিনি বসে আছেন আর সেখান থেকেই সব কিছু চলছে। *পরমে* বলতে বলছেন শ্রেষ্ঠ। দেহটা একটা আকাশ কারণ স্পেস দেহকে ধরে আছে, ইন্দ্রিয়গুলিও যেন আকাশ, বুদ্ধিও যেন আকাশ, ঠাকুর চিদাকাশের কথা বলছেন, কিন্তু সব আকাশের থেকে শ্রেষ্ঠতম আকাশ হল এই আকাশ, বাহ্যিক আকাশের তুলনায় এই আকাশ সূক্ষ্মতম, তাই বলছেন *পরমে*। *পরার্ধে*, অর্ধ মানে স্থান আর পর মানে পরব্রহ্ম, *পরার্ধ* মানে পরব্রহ্মের স্থান। পরমব্রহ্মের স্থান সর্বত্র কিন্তু মানুষের শরীরে প্রকাশ্য ভাবে দেখা যায় বুদ্ধিরূপী গুহাতে, ধ্যানের গভীরে হৃদয়াকাশে তাঁকে যোগীরা দর্শন করেন। হৃদয়াকাশ বলে কিছু নেই, যেহেতু মনের দ্বারা ধ্যান করা হয় আর মনের গভীরে পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎ হয় বলে হৃদয়াকাশ বলা হয়। চৈতন্যের অনুভূতি এই হৃদয়াকাশেই হয়, তাই এই হৃদয়াকাশই পরব্রহ্মের স্থান। তাই বলা হয় হৃদয় ঈশ্বরের বাসস্থান, জ্ঞানীরা যাকে বলছেন পরমব্রহ্মের বাসস্থান ভক্তরা তাকেই বলছেন ঈশ্বরের বাসস্থান, আমরা বলছি অন্তর্যামী। আবার যখন বলি আমার মন বলছে তখন নিজের বুকে হাত রেখে বলি। বাস্তবিক ধ্যান এখানেই হয়। যাঁরা ধ্যানাদি করছেন তাঁদের ঈশ্বর জ্ঞান এখানেই হয়।

সেইজন্য বলছেন, যখন জ্ঞান হয় তখন দেখেন যেন দুটি সত্তা আছে। তিনিই আসল ভোক্তা। ভুলেও যেন মনে না করি ইন্দ্রিয় ভোগ করছে, মন ভোগ করছে, এরা কেউই ভোগ করে না। আসল ভোক্তা হলেন সেই জীবাত্মা। তাহলে জীব বললেই তো শেষ হয়ে যেত, আমার যিনি অন্তর্যামী তিনি জীব, তিনিই ভোক্তা বলে দিলেই তো যেত। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এই জায়গাতে ওনারা দুটো সত্তাকে নিয়ে আসেন। দুটোকে পৃথক

ওনারা করতে চাইছেন, তোমার অশুদ্ধ মনের সঙ্গে আত্মা যখন নিজেকে জড়িয়ে নিচ্ছেন সেটা যেন একটি সত্তা, কিন্তু ঐ সত্তা নিজের বাস্তবিক সত্তা থেকে কখনই আলাদা হয় না, সেইজন্য দুটোকে পৃথক রূপে দেখান হয়। এখান থেকেই জীবাত্মা পরমাত্মার ধারণা আসছে, ঠাকুর এটাকেই ভক্ত আর তার ইষ্টের কথা বলছেন আর এখানে উপাধি সহিত আর উপাধি বর্জিত আত্মার কথা বলছেন। যোগীরা এই জিনিষটা বাস্তবিক দেখেন, তবে যা দেখেন হৃদয়ের ভেতরেই দেখেন, *গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে*। অথচ দুটির স্বভাব, প্রকৃতি, ধর্ম পুরো আলাদা। কি রকম আলাদা? *ছায়াতপৌ*, রৌদ্র আর ছায়ার মধ্যে যেমন কোন মিল নেই। এখানে আলো আর অন্ধকারের তুলনাকে আনা যাবে না, কারণ সূর্যের প্রকাশ না থাকলে ছায়া হবে না, কিন্তু আলোর অনুপস্থিতিটাই অন্ধকার। এখানে তা হবে না। ঐ প্রকাশ আছে বলেই ছায়া আছে, ছায়ার অস্তিত্ব ঐ প্রকাশের জন্য। এই দুটি সত্তা আলো আর ছায়ার মত বিপরীত ধর্মী, কিন্তু থাকছে একই সাথে, *দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া*। কেন বিপরীত ধর্মী? যদিও তাঁকে ভোক্তা বলা হয় আসলে তিনি ভোক্তা নন।

ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ, এই কথা যে শুধু ব্রহ্মবেত্তারাই বলেন তা নয়, যাঁরা পঞ্চাগ্নি করছেন, গৃহস্থরা পঞ্চাগ্নি করতেন আর যাঁরা ত্রিনাচিকেতার মত যজ্ঞাদি করে খুব উচ্চ অবস্থা লাভ করেছেন তাঁরাও একই কথা বলেন। প্রথমের দিকে আমরা বলেছিলাম যখন ঐ দৃষ্টিতে দেখেন তখন পুরো ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যায়। সেই শুদ্ধ আত্মাই আছেন, কারণ তিনি না থাকলে সবটাই অনীশ্বর হয়ে যাবে। সেই শুদ্ধ আত্মার উপর যখন মায়ার ছাপ, মায়ার ছাপ মানে যখন শুদ্ধ আত্মা নিজেকে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সব কিছুর সাথে একাত্ম করে নিচ্ছেন তখন শুদ্ধ আত্মা যেন একটা আলাদা সত্তা আর জীবাত্মা যেন একটা আলাদা সত্তা হয়ে গেল। আসল যে সত্তা তাঁর দিকে কেউ দৃষ্টি দেয় না, লোকে মনে করে তিনিই যেন ভোগ করছেন, আসলে তিনিই ভোগ করেন যিনি নিজেকে দেহেন্দ্রিয়াদি ও মনের সাথে জুড়ে রেখেছে। পরের মন্ত্রে এসে বলছেন –

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্।
অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি।।১/৩/২।।

(যজ্ঞকারিগণের যেটি দুঃখসাগর পার হওয়ার উপায় সেই নাচিকেত অগ্নিকে এবং ভয়শূন্য সংসার সমুদ্র অতিক্রম করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের কাছে যিনি অবিনশ্বর পরমাত্মা তাঁকেও আমরা জানতে সমর্থ হয়েছে।)

মন্ত্রের দ্বিতীয় লাইনে দুটো শব্দ এসেছে, *অভয়ম্* আর *পারম্*। মানুষ মাত্রেই ভেতরে এই একটা ভয়, সংসারে আমরা কেউই চিরস্থায়ী নই, আজ আছি, কাল থাকব কিনা জানি না। অস্থায়ী অস্তিত্ব জনিত ভয়ের পারে যাঁরা যেতে চান, *অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং*, ভয়ের পার থেকে অভয়ের পারে যাওয়ার জন্য *যঃ সেতুঃ*, তাঁদের জন্য যা সেতুর মত, *ঈজানানাম্*, যাঁরা যজ্ঞাদি কর্ম করেন, যে অগ্নি তাঁদের সংসারের শোক, মোহ, দুঃখের পারে নিয়ে যায়, সেই অগ্নিকে আমরা যেন জানতে পারি আর ওটাকে যেন ধারণ করতে পারি।

তৃতীয় বল্লীর দ্বিতীয় মন্ত্রে সগুণ ব্রহ্ম আর নির্গুণ ব্রহ্মের কথা বলছেন। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করলে মানুষ সংসারের নানান রকমের ভয়, শোক, মোহের পারে চলে যায়। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা মানেই কর্ম, যজ্ঞাদি। যাঁরা কর্ম করেন, যাঁরা যজ্ঞ করেন তাঁরা সেই ক্ষমতা পান যে ক্ষমতা দিয়ে মানুষ জ্ঞান লাভ করে। আর নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করলে তাঁরা অমর হয়ে যান, চিরদিনের মত সব রকম ভয়, শোক, মোহের নাশ হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি মনে করে আমি শুধু সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাই করব তখন এক রকম হয়, আর কেউ যদি মনে করে আমি শুধু নির্গুণ ব্রহ্মেরই উপাসনা করব তখন তারও অন্য রকম হয়ে দুজনের কাছেই সমস্যা আসে। মুণ্ডকোপনিষদে এই জিনিষটাকেই ব্যাখ্যা করে বলছেন *দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে – পরা চৈবাপরা চ*, পরা বিদ্যা আর অপরা বিদ্যা দুটোই দরকার। বেদ আদি গ্রন্থের অধ্যয়ন আর যজ্ঞাদি কর্মকে বলছেন অপরা বিদ্যা আর পরা বিদ্যা হল মানুষ যখন আত্মজ্ঞানকে পায়। যমরাজ নচিকেতাকে বলছেন, হে নচিকেতা! আমরা যেন এই দুটোকেই ধারণ করতে পারি। ঠিক এই ধরণের মন্ত্র ঈশোপনিষদেও এসেছে, সেখানেও বলছেন বিদ্যা আর অবিদ্যা দুটোকেই সঙ্গে নিতে হয়। ওখানে অবিদ্যা মানে কর্ম আর বিদ্যা মানে দেবতা বিষয়ক জ্ঞান, বলছেন দুটোরই দরকার। যাঁরা সাধন ভজন করেন তাঁদেরও সগুণ ব্রহ্ম আর নির্গুণ ব্রহ্ম দুটোই নিতে হয়। মাঝে মাঝেই এই বিষয়কে নিয়ে আলোচনা চলবে, ঈশোপনিষদে খুব বিস্তারিত আলোচনা আছে।

মানুষ যখন সংসারে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে বা যখন সেই শক্তি অর্জন করে বলতে পারে আমি ব্রহ্মলোক পর্যন্তও চলে যেতে পারি তখনই সেই মানুষ ঠিক ঠিক জ্ঞানের অধিকারী হয়। কথামৃত ও অন্যান্য গ্রন্থাদি নিজে থেকে পড়ে অনেকেই খুব জোর গলায় বলতে থাকেন, ঈশ্বর দর্শনই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু তারা ঠাকুরের আরেকটা কথা বলতে ভুলে যান, ঠাকুর ঢিমে তেতালা কখনই পছন্দ করতেন না বা ঠাকুর বলছেন যারা লেজে হাত দেওয়া গরুর মত শুয়ে পড়ে এদের দ্বারা কিছুই হবে না, ঠাকুর এদের সহ্যও করতেন না। এই পছন্দ বা সহ্য না করার মধ্যে দিয়ে ঠাকুর আসলে শক্তির জাগরণ চাইছেন। এই কথাগুলো স্বামীজী যখন Complete Worksএ বলছেন সেখানে তিনি সরাসরি শক্তির কথাই বলছেন। আর উপনিষদেও এই একই কথা বলছেন *যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্*।

যজ্ঞাদি দিয়ে, কর্ম আদি করে কর্মীরা যাঁকে পেতে পারেন, অর্থাৎ জগতের শ্রেষ্ঠতম যেটা পাওয়া যেতে পারে, সেই শ্রেষ্ঠতমকে পাওয়ার বিদ্যা ও শক্তি যেন তোমার থাকে। এই বিদ্যা ও শক্তি অর্জন করার পর সে যখন বলে দিচ্ছে জগতের কোন শ্রেষ্ঠতমই আমার লাগবে না, এবার সে শুদ্ধ জ্ঞানের দিকে যাবে। যদি কেউ মনে করে আমাকে কিছু করতে হবে না, চোখ-কান বন্ধ করে সরাসরি ভগবানের দিকে এগোব, তার আর কোনটাই হবে না, এই জগতেরও কিছু হবে না, ঐ জগতেরও কিছু হবে না। ঠাকুরও বলছেন যার আছে হেথা তার আছে সেথা। এই জিনিষটা খুবই জটিল, কারণ এর বিপরীত কথাই আমরা কথামৃতে ও বিভিন্ন জায়গায় পাই। কিন্তু সম্পূর্ণ চিত্রটা জানা থাকলে কোন সংশয় হবে না। বলহীনদের দ্বারা কখনই আত্মজ্ঞান হবে না, যতক্ষণ শক্তি না আসছে ততক্ষণ কিছুই হবে না। যারা জপ-ধ্যান করছে তাদের কি হবে? যারা জপ-ধ্যান করছে তারাও বুঝতে পারে যে আমার ভেতরে শক্তির জাগরণ হচ্ছে। ভেতরে শক্তির জাগরণ যখন শুরু হয় তখন একটা সময় সে ঐ শক্তিটাই চায়, যে শক্তিতে সে মনে করবে এই জগতকে আমি আমার হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে পারি। এই শক্তি যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ সে ঈশ্বর জ্ঞানের জন্য প্রস্তুত নয়।

সগুণ ব্রহ্মের উপসনার শ্রেষ্ঠ অবস্থা হল ব্রহ্মলোক, বলছেন ব্রহ্মলোক পাওয়ার ক্ষমতা যেন তোমার থাকে। ব্রহ্মলোক পাওয়ার পরে যখন বলবে আমার কোন লোকই লাগবে না, তখন সে ওখান থেকে বেরিয়ে আসে। মন্ত্রে এটাই বলছেন, আমাদের যেন এই ক্ষমতা হয় আমরা যেন দুটোই পেতে পারি। যাঁরা যজ্ঞাদি কর্ম করেন তাঁদের জন্য যেটা সেতু, *ব্রহ্ম যৎ পরম্*, সেই পরমব্রহ্মকে পাওয়ার জন্য যেটা সেতুস্বরূপ আর *অভয়ং তিতীর্ষতাং পারম্*, যাঁরা অভয়পদকে পেতে চাইছেন, এই সংসার সমুদ্রের পারে যেতে চাই, এই দুটো বিদ্যাকেই পাওয়ার সামর্থ আমাদের যেন হয়। *নাচিকেতং শকেমহি*, আমরা যেন তাঁকে জানার শক্তি পাই। কাকে জানার সামর্থ? যে ব্রহ্মকে জানলে মানুষ দুঃখের পারে চলে যায়, আর যে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করে মানুষ অভয়পদ পায়। দুঃখের পারে মানুষ যায় সগুণ সাকারের উপাসনা করে। কারণ সগুণ উপাসনার দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠ যা কিছু হতে পারে সবেরই সে মালিক হয়ে যায়, দুঃখ বলে তখন কিছু থাকে না। কেড়ে নিয়েই মানুষকে দুঃখ দেওয়া হয়, কারোর ক্ষমতাই নেই তার কাছ থেকে কেড়ে নেবে, কারণ সে শ্রেষ্ঠতম। আর বলছেন *অভয়ম্*, যেখানেই দুই সেখানেই ভয়। ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিতেও কিন্তু ভয়শূন্য হবে না, ভয়শূন্য একমাত্র ব্রহ্মবেত্তাই হন, যিনি দেখছেন আমিই আছি, আমি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই। সেইজন্য সগুণ ব্রহ্ম আর নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনায় এই দুটো জিনিষকে নিয়ে আসা হয়েছে – দুঃখের পারে যাওয়া আর *অভয়ম্*। সগুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি না হলে সেই শক্তি হবে না যে শক্তিতে সে সব দুঃখের পারে চলে যাবে, সগুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি সব সময় হয় কর্ম দিয়ে। বেদের সময় কর্ম মানেই যজ্ঞ, সেইজন্য বলছেন *ঈজানানাম্*, যাঁরা যজন করেন তাঁদের কথা বলছেন। আর অভয়পদ আত্মজ্ঞানীরাই পান। অক্ষর ব্রহ্মের দুটি রূপ, সগুণ ব্রহ্ম আর নির্গুণ ব্রহ্ম, এরমধ্যে সগুণ ব্রহ্ম তাঁর উপাসককে সব দুঃখের পারে যেতে সক্ষম করেন আর নির্গুণ ব্রহ্ম অভয়পদ দেন। যমরাজ বলছে, এই দুটোকেই আমরা যেন পাই। শুধু সগুণ সাকার নয়, কারণ আবার ফিরে আসতে হবে। আর শুধু নির্গুণ নিরাকার উপাসনা কোন দিন হবে না। সগুণ সাকারের উপাসনা না করা হলে নির্গুণ নিরাকারে উপাসনা কোন দিনই হবে না। সমস্যা হল, কতকগুলো প্রচলিত ধারণ আমাদের মাথায় বসে গেছে, যার জন্য কিছু না বুঝেই বলে দিই ধ্যান-জপ করে, তীর্থাদি করে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না। ঠাকুরও অনেক জায়গায় কর্মের নিন্দা করছেন ঠিকই কিন্তু তিনিও ঢিমে তেতালার নিন্দা করছেন, ক্লীবতাকে পছন্দ করতেন না। কর্ম মানেই নিজের ভেতর শক্তি সঞ্চার করা, যজ্ঞ করা, সেবা করা এগুলো করলে নিজের ভেতরে শক্তি

আসে। শক্তি যত আসতে থাকবে মানুষ তত ছোটখাটো দুঃখ-কষ্টের ঊর্ধ্বে চলে যাবে। উপনিষদের ভাষায় সগুণ সাকারের উপাসনা করলে সে যা চাইবে তাই পেতে পারবে, তার কোন অভাব বোধ থাকবে না।

নির্গুণ নিরাকার কি সগুণ সাকার থেকে কোন আলাদা জিনিষ নাকি! পাটনা স্টেশনের একদিকে দিল্লী অন্য দিকে কলকাতা, সগুণ সাকার আর নির্গুণ নিরাকার কি এই রকম কোন জিনিষ? যিনি সগুণ তিনিই নির্গুণ, মন বুদ্ধি দিয়ে যখন দেখে তখন সগুণ সাকার রূপে দেখে, মন বুদ্ধির পারে যখন বোধ করে তখন নির্গুণ নিরাকার রূপে দেখে। গীতায় বলছেন *অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে,* অব্যক্তকে প্রাপ্তি করতে যদি সরাসরি চলে যায় ভগবান বলছেন তার আর দুঃখের শেষ থাকবে না, প্রচুর কষ্ট হবে। অব্যক্তকে প্রাপ্তি করতে যে শক্তি লাগে, সেই শক্তি মানুষের মধ্যে থাকে না। মানুষের মধ্যে দেহবোধটাই বেশি। তাই যমরাজ বলছেন, হে নচিকেতা! আমরা যেন সামর্থ পাই। কিসের সামর্থ? সগুণ সাকারকে পাওয়ার আর নির্গুণ নিরাকারকে পাওয়ার। সগুণ সাকারকে পেলে শক্তি আসবে, দুঃখের পারে যাবে আর নির্গুণ নিরাকারকে পেলে অভয় প্রাপ্তি হবে। জীবনের উদ্দেশ্য অভয় প্রাপ্ত করা, কোন ভয় যেন না থাকে। ভয় মানে, আমার কাছে যে জিনিষটা আছে সেটা হারিয়ে যাওয়ার ভয়, নষ্ট হয়ে যাওয়া বা চলে যাওয়ার আশঙ্কা যে বৃত্তি সৃষ্টি করে, এটাই ভয়। কিন্তু যখন দেখছি আমি ছাড়া কেউ নেই তখন আমার জিনিষ আমি ছাড়া আর কে নিতে পারবে! একমাত্র অদ্বৈত অবস্থাতেই অভয় হয়। দুঃখেরও পারে যেন যেতে পারি আর ভয়ের পারেও যেন যেতে পারি। দুঃখের পারে যাওয়ার জন্য সগুণ সাকারের দরকার আর ভয়ের পারে যাওয়ার জন্য নির্গুণ নিরাকারের দরকার।

বিজ্ঞান বলে মন, বুদ্ধি এগুলো একটা ভাব এটাই আমি। বেদান্ত বলে চৈতন্য সত্তা আছেন, চৈতন্য সত্তা যে জায়গাতে নিজেকে মন বুদ্ধির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেন সেটাই আমি। এখান থেকেই শুরু হয় তৃতীয় মন্ত্রের। যমরাজ বলছেন –

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।।১/৩/৩।।

(জীবাত্মাকে রথস্বামী ও শরীরকেই রথ বলে জানবে; বুদ্ধিকে রথচালক ও মনকেই লাগাম বলে জানবে।)

জীবনের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী কেমন হওয়া দরকার, জীবনকে সঠিক ভাবে দেখার পর জীবনকে কিভাবে চালিত করতে হবে, এসব নিয়েই এখন নচিকেতাকে যমরাজ পর পর বলতে যাচ্ছেন। আমি বোধ, জগৎ বোধ সবারই আছে আর জীবন যেন একটা যাত্রা এই বোধও সবারই আছে। জগতের মাঝখান দিয়ে জীবন একটা যাত্রার মত চলে যাচ্ছে, আমরা প্রায়ই বলি Journey of life। তাহলে জীবন যাত্রাটা কি? সংসারের মাঝখান দিয়ে জীবনে চলে যাচ্ছে, এর মধ্যে একটা হল সংসার, একটা হল চলে যাওয়া আরেকটি হল আমি আপনি, এই তিনটি জিনিষকে নিয়ে জীবন যাত্রা। সংসারকে বিশ্লেষণ করে পদার্থ বিজ্ঞানী খুব হলে বলবেন শক্তির সমুদ্র, তা না হলে বলবেন ইলেক্ট্রন প্রোটন কোয়ার্ক্স এগুলোর মিশ্রণ বা বলতে পারেন বিভিন্ন এ্যটমের খেলা। ভেঙে ভেঙে একেবারে শেষ অবস্থায় বিভিন্ন এ্যটমসেই দাঁড়াবে। এরও নীচে চলে গেলে বলবেন ইলেক্ট্রন প্রোটন ইত্যাদি, আরও নীচে গেলে কাইনেটিক এ্যণার্জি, পোটেনশিয়াল এনার্জি বা নিউক্লিয়ার এনার্জিতে চলে যাবেন। এটাকেই বেদান্ত অন্য ভাবে নিচ্ছে। কট্টর বিজ্ঞানী বলবে, এ্যটমের উপরে আর যেতে পারবে না। ওদের কাছে জল আর জল থাকে না, জল হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের এ্যটম। সাঁতার কাটার সময় আমরা বলি জলে সাঁতার কাটছিলাম। যদি আমাদের বলা হয় তোমরা হাইড্রোজেন অক্সিজেনের এ্যটমের মাঝখান দিয়ে যাত্রা করছিলে, আমাদের উদ্ভট শোনাবে। কিন্তু এটাই সত্য। বেদান্ত ঠিক তাই বলছে। বেদান্ত এই সংসার দেখছে না, দেখছে পাঁচটি তন্মাত্রা, রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ। ইলেক্ট্রন, প্রোটন যাই হোক না কেন পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়েই আমরা সব কিছু জানছি, ওনারাও তাই পাঁচটি শ্রেনীবিভাগ করে দিয়েছেন। যদিও ইন্দ্রিয় দশটি কিন্তু চোখ, কান, নাক, ত্বক ও জিহ্বা এই পাঁচটিকেই ইন্দ্রিয় বলা হয়, এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় অনুভব করে আর বাকি পাঁচটি ইন্দ্রিয় ক্রিয়া করে। যে পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব হয় তাকে বলছেন জ্ঞানেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় যে যে ভাবে বস্তুকে জানতে পারে, সেই ভাবে বেদান্ত পাঁচ ভাবে ভেঙে দিচ্ছে – শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। সংসার মানেই এই পাঁচটি তন্মাত্রা। এই পাঁচটি তন্মাত্রার বাইরে সংসারে আর কিছু নেই।

সুন্দর দৃশ্য দেখছি, শিশুর নিষ্পাপ মুখ দেখছি, সুন্দর ছবি দেখছি এনারা বলবেন এখানে রূপ তন্মাত্রা ছাড়া কিছু নেই। খুব উচ্চমানের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনছি, বলবেন শব্দ তন্মাত্রা ছাড়া কিছু নেই। পাঁচটি তন্মাত্রাকে আমরা পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করছি। তাহলে সংসারের মাঝখান দিয়ে জীবন যাত্রা চলার অর্থ হল পাঁচটি তন্মাত্রা আর পাঁচটি ইন্দ্রিয়, পাঁচটি ইন্দ্রিয় চলে যাচ্ছে পাঁচটি তন্মাত্রার মাঝখান দিয়ে। ব্যাপারটা একটু কল্পনা করলে খুব সহজ ভাবে বুঝে যাব। আমরা এখন তন্মাত্রার কথা ভুলে তার জায়গায় পাঁচটা রঙ ভেবে নিচ্ছি। পাঁচ রঙের বল দিয়ে গোটা ঘরটা ভরে আছে। আর এই ঘরে পাঁচটি শিশুকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পাঁচটি শিশুর কোমড়েই একসাথে অপরের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে। একজন শুধু সাদা বল নেয়, আরেকজন শুধু নীল বল নেয়, আরেকজন শুধু লাল রঙের বলের দিকে দৌড়ে যায়, অন্য একজন শুধু সবুজ বল নিতে চায় আর পঞ্চম জন শুধু হলুদ বল চাইছে। এরপর পাঁচটি শিশুর মধ্যে কি অবস্থা হবে? যখন দেখছে ঐ জায়গাতে প্রচুর নীল বল আছে, যে নীল বল নিতে চাইছে সে সেদিকে দৌড়ে যেতে চাইবে, বাকিরা যারা আছে তারা অন্য দিকে টানতে থাকবে বা তার সাথেই সেদিকে যাবে। একটা যেখানে যাবে বাকিদেরও সেখানেই যেতে হবে। যদি দুটো রঙের বল এক জায়গায় প্রচুর থাকে তাহলে দুটো শিশুই ওখানে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর লাল, নীল আর সবুজ এই তিনটি রঙের বল একই জায়গায় যদি ঢিপি হয়ে থাকে তখন ঐ জায়গাতে তিন জনই হুমড়ি খেয়ে পড়বে। বাকি দুটোর এখন কি হবে? দুজনও এদের সাথে হুমড়ি খাবে। এদের সাথে বাকি যে কর্মেন্দ্রিয়রা রয়েছে তারাও হুমড়ি খেয়ে পড়বে। আমাদের জীবন মানে ঠিক তাই। একজন সুন্দরী নারী মিষ্টি গলায় ডাকছে, তখন দুটো তন্মাত্রা এসে গেল – রূপ আর শব্দ। এরপর সুন্দরী নারী বলছে এসো তোমাকে আদর করি, তখন তিনখানা ইন্দ্রিয় চঞ্চল হয়ে গেল, বাকি দুটো ইন্দ্রিয়কে তোয়াক্কা না করে পাগলের মত রূপ, শব্দ আর স্পর্শ ঝাঁপিয়ে পড়বে। তিনটে ক্ষমতাশালী ইন্দ্রিয় তাকে টানছে। একটা যদিও হয়, শুধু দেখতে সুন্দর, রূপ তন্মাত্রা বাকি চারটেকে নিয়ে যদি এগিয়ে যায় তাহলে ঐ নারীর যে দেহরক্ষীরা আছে তারা এমন মার মারবে যে সেটা স্পর্শে গিয়ে বুঝতে পারবে। চোখ যদি বলে চল, তখন ত্বক বলবে গতবার প্রচুর মার খেয়েছিলাম এবার থাক। তখন সে পিছিয়ে আসবে। আমাদের সমগ্র জীবন যাত্রা এই পাঁচটি তন্মাত্রা দিয়েই চলছে। ঠাকুর বলছেন, সুন্দরী যুবতী কিন্তু তার গায়ে বোঁটকা গন্ধ। সুন্দরী যুবতী চক্ষু ইন্দ্রিয়কে টানছে আর অন্য দিকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলছে ঐ দুর্গন্ধের ধারে কাছে আমি যাচ্ছি না। পরাশর মুনির তাই হয়েছিল, সত্যবতীর রূপে এমন মুগ্ধ হয়ে গেছেনে যে সত্যবতীর গায়ের মাছের আঁষটে গন্ধকেও পরাস্ত করে দিলেন। কিন্তু পরে লোকেদের যাতে কষ্ট না হয় সেইজন্য বর দিয়ে দিলেন যে তোমার শরীরে পদ্মফুলের গন্ধ হয়ে যাবে। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় সব সময় নিজের নিজের পছন্দের জিনিষের পিছনে ধাবিত হতে চাইছে। নিজে যখন যাবে তখন সে বাকি চারটেকেও টেনে নিয়ে যাবে।

পাঁচটি শিশুর কোমড়ে পরস্পরের সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা, এদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাদের মা আছে। কিন্তু মায়ের সমস্যা হল বাচ্চাগুলো যেখানে যাবে মাকেও তাদের পেছনে পেছনে সেখানে যেতে হবে। মা তাদের নিয়ন্ত্রণও করছে আবার তাদের পেছনে পেছনেও যাচ্ছে। মায়ের পেছনে একজন বাবা আছেন। বাবা স্বভাবতই কড়া ধাঁচের মানুষ। বাচ্চাদের মারধোর দেন, দরকার পড়লে মাকেও ধমকে বা পিটিয়ে সোজা করে দেন। যে বাড়ির বাবা খুব কড়া সেই বাড়ি ঠিক ঠিক চলে আর যে বাড়ির বাবা নড়বড়ে সেই বাড়ি অন্য রকম চলে। তাহলে দাঁড়াল, পাঁচ শিশু, তাদের পেছনে মা আর তাদের সবার পেছনে বাবা, তারও পেছনে পুরো বাড়ি আর সব রকম বেলুনের খেলা চলছে। এই ছবিকে কল্পনা করলে বোঝা যাবে আমাদের জীবন যাত্রা ঠিক এভাবেই চলছে। জীবন যাত্রা মানে যেখানে আমি যাচ্ছি। কোথা দিয়ে যাচ্ছি? এই জগতের মাঝখান দিয়ে। জগতটা কি? জগতকে কাঁটা ছেড়া করা হলে জগতের অর্থ হবে, জগৎ মানে পাঁচটি তন্মাত্রা। আমিকে কাঁটা ছেড়া করলে তিনটে জিনিষ বেরিয়ে আসে – জ্ঞানেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় যার মাধ্যমে খবর সরবরাহ করে মন আর মন যাকে খবর দেয় সে হল বুদ্ধি। বুদ্ধি সরাসরি ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, মনের মাধ্যমে তাকে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বা সামাজিক দৃষ্টিতে এই কাহিনীকে যদি নেওয়া হয় তাহলে এখানেই কাহিনী শেষ হয়ে যায়। লৌকিক দৃষ্টিতে জীবনকে দেখলে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এদের যৌথ খেলটাই জীবন। বেদান্ত কিন্তু এর থেকে আরেক ধাপ পেছনে চলে যায়। কোথায় যায়? *ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে*, যিনি এই শুভ কর্মের ফল পান করেন তিনিই আত্মা, বেদান্ত শেষে নিয়ে যান আত্মাতে।

আমরা যেমন রঙিন বল, পাঁচটি বাচ্চার রূপকের সাহায্যে পঞ্চ তন্মাত্রার খেলাকে বোঝালাম, বাচ্চার পেছনে মা জড়িয়ে, মায়ের পেছনে বাবা জড়িয়ে আছে, সবটাই রূপক। এই জীবন যাত্রাকে, সংসার যাত্রাকে যমরাজ এখানে রথের রূপকের মাধ্যমে উপস্থাপিত করছেন। আমরা যে শব্দগুলো ব্যবহার করলাম রথের সাথে এই শব্দগুলোর খুব সুন্দর সাযুজ্য রয়েছে। সংসার যাত্রার এই যাত্রাপথের চারিদিকে পঞ্চ তন্মাত্রা ছড়িয়ে আছে, এটাই বিষয়। বিষয় মানে কামিনী-কাঞ্চন বা যত রকমের ভোগের বিষয় হতে পারে সবটাই পাঁচটি তন্মাত্রার সমাহার ও প্রতিসমাহারে সংসার রূপে দাঁড়িয়ে আছে। এটাই যেন জীবন যাত্রার পথ, এই পথের উপর দিয়ে রথ চলেছে। রথের পাঁচটি ঘোড়া। রথে সাধারণত চারটি ঘোড়া থাকে কিন্তু এখানে পাঁচটি ঘোড়ার কল্পনা করা হয়েছে। এক একটি ঘোড়া এক একটি তন্মাত্রাকে গ্রহণ করতে পারে। তাই এই পাঁচটি ঘোড়া সমগ্র সংসারকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা রাখে। রথের ঘোড়া যখন চলে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য লাগাম থাকে। মন হল সেই লাগাম, যদিও পাঁচটি ঘোড়ার জন্য পাঁচটি লাগাম থাকার কথা, কিন্তু একই মন পাঁচটি দিকে ছড়িয়ে পাঁচ জায়গায় এক সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু সারথির হাতে যখন পাঁচটি লাগাম আসে তখন ওটা একটি লাগামই হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণের রথের ছবিতেও দেখা যায় পাঁচটি লাগাম শ্রীকৃষ্ণের হাতে এসে এক হয়ে গেছে। কিন্তু উনি কায়দা করে একবার এই লাগাম টানছেন আরেকবার ঐ লাগাম টানছেন। পাঁচটি লাগাম আলাদা, একটা ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে ঐ ঘোড়ার লাগামকে টানতে হবে, সারথিরা এই ব্যাপারে অভিজ্ঞ তাঁরা বুঝতে পারেন আমাকে কোন লাগামটা টানতে হবে। সারথিকে বলছেন বুদ্ধি। রথে রথের মালিক বসে আছেন।

এবার রথ রাস্তা দিয়ে ছুটছে। কোন রাস্তা? বিষয় রাস্তা দিয়ে ছুটছে, পঞ্চ তন্মাত্রার উপর দিয়ে পাঁচটি ঘোড়ার রথ ছুটছে। সারথি আছেন, আরোহীও আছেন, ঘোড়ার লাগাম আছে, ঘোড়াও আছে – এবার রথ ছুটছে। রথে যদি দুর্দান্ত ঘোড়া বা জংলী ঘোড়া লাগানো থাকে তাহলে সেই ঘোড়াদের আর সামলানো যাবে না। ঘোড়া ভালো কিন্তু লাগামটা দুর্বল তাতেও ঘোড়া সামলান যাবে না। লাগামও ভালো ঘোড়াও ভালো কিন্তু সারথিটা অপদার্থ, তাহলেও রথ চলবে না। এই তিনটের মধ্যে কোন একটার যদি গোলমাল থাকে তাহলে সবটাই গোলমাল হয়ে যাবে। কে গোলমাল করবে? গোলমাল একজনই করবে, সে হল ঘোড়া। ঘোড়া যদি সত্যিকারের খুব ভালো ঘোড়াই হয় এরপর লাগাম যদি দুর্বল হয়ে থাকে আর সারথিও যদি দুর্বল থাকে ঘোড়াগুলো হয়ত কোন রকমে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবে। কিন্তু ঘোড়া যদি হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় কিংবা ঘোড়া যদি রাস্তা ছেড়ে মাঠের দিকে চলে যায় তাহলে যাত্রাটাই ভণ্ডুল হয়ে যাবে, আর কিছু করা যাবে না। গন্তব্যস্থলে ঠিক ঠিক ভাবে যদি পৌঁছাতে হয় তাহলে ঘোড়াগুলো ঠিক থাকতে হবে, লাগাম যেন শক্তপোক্ত হয় আর সারথিকেও কুশল হতে হবে। তিনটে জিনিষের ব্যাখ্যা হয়ে গেল, এবার থেকে গেল রথের আরোহী বা যাত্রী, যেটা পরের মন্ত্রে ব্যাখ্যা করবেন।

এই পুরো জিনিষটাকে মাথায় রেখে এবার আমরা এই মন্ত্রের আলোচনা করছি। বলছেন *আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু*, এখানে *রথিন্* মানে রথের যিনি যাত্রী বা রথের যিনি মালিক, এই আত্মাকে জান। আত্মাকে পরের মন্ত্রে আরেকটু পরিষ্কার করে বলবেন। কিন্তু প্রথম মন্ত্রে বলেছেন *ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে*, সুকৃতকে যিনি পান করেন তিনিই আত্মা। কিন্তু পরে আবার একটু আলাদা করবেন। পান দুজনই করেন, ছায়া আর তাপ, আলো অন্ধকার। যিনি নির্বিকার তাঁর কথা এখানে বলা হচ্ছে না, এটাকে পরে আরও স্পষ্ট করবেন। *শরীরং রথমেব তু*, এই শরীরটাই যেন রথ। জীবন যাত্রা শরীরকে দিয়েই হয়, তাই শরীরটাই রথ। *বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ*, বুদ্ধি হল সারথি আর লাগাম হল মন।

বুদ্ধিকে বলা হয় নিশ্চয়াত্মিকা, নিশ্চিত মানে এটাই করতে হবে। সেইজন্য যাদের বুদ্ধি দৃঢ় নয় জীবনে তারা কিছুই করতে পারে না। শাস্ত্র জ্ঞান আর গুরুর উপদেশ থেকেই বুদ্ধি দৃঢ় হয়, এছাড়া বুদ্ধি আর কোন ভাবেই দৃঢ় হতে পারে না। সেইজন্য নিম্ন শ্রেনীর প্রাণীদের বুদ্ধি থাকে না। বুদ্ধি হল শাস্ত্র আর গুরুর উপদেশ। তাহলে আমেরিকা, আফ্রিকার লোকেদের কি বুদ্ধি আছে? সারা বিশ্বে কোন না কোন শাস্ত্র কার্যকর আছে, হয় কোরাণ আছে নয়তো বাইবেল আছে, আবার যারা পুরোপুরি শাস্ত্র মানে না তারা ethicsএর বইকেই শাস্ত্র বলে মানে। যেমন কনফ্যুসাসের ধর্মে ethicsএর একটা দাম আছে, সেটাও শাস্ত্রের মতই। গুরু যে কোন লোকই হতে পারেন, শুধু যিনি দীক্ষা দিচ্ছেন তিনিই নন, মা বাবা সবাই গুরু। শাস্ত্রের কথা গুরুর মুখ দিয়ে যখন

আসে, তাই দিয়েই বুদ্ধি শক্তিমান হয়। যদি শাস্ত্র ঠিকমত অধ্যয়ন না করা হয়ে থাকে, গুরুর কথাকে বরণ করে ঠিক মত ভেতরে যদি বসান না হয়ে থাকে বুদ্ধি কখনই সবল হবে না। সেইজন্য গুরু সঙ্গের খুব দরকার, গুরু যাকেই করে থাকুন না কেন তাতে কিছু আসে যায় না, আর শাস্ত্র সঙ্গ, এই দুজনের সঙ্গ যদি না হয়ে থাকে তাহলে কোন দিন বুদ্ধি শক্তিমান হতে পারবে না। মানুষ যখন বলে আমি নিজে এই কথা ভেবেছি, আমার মন এই কথা বলছে ইত্যাদি, সেটাও সে কোথাও না কোথাও শাস্ত্রে আগে পড়েছে বা কোন উপন্যাস, গল্প, নাটকে শাস্ত্রেরই কথাকে অনুভব করেছে। বন্ধুও কখন গুরু রূপে উপদেশ ও পরমার্শ দেয়, মা-বাবাও গুরু রূপে শিক্ষা দিচ্ছেন। আমাদের বুদ্ধি সব সময় বাইরে থেকেই তৈরী হয়, ভেতর থেকে হয় না।

মন হল সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক, এটা করব কি করব না, এটা ভালো না খারাপ। বুদ্ধি ঠিক করে দেয় – এই কাজ করবে না, এই কাজ করবে, এটা ভালো এটা খারাপ। পঞ্চ ইন্দ্রিয় সব সময় নিজের সুখ খোঁজে। তার জন্য ইন্দ্রিয়কে কখনই দোষ দেওয়া যায় না, কারণ সুখের সন্ধান করাই ইন্দ্রিয়ের কাজ। ইন্দ্রিয় সুখের সন্ধান করা বন্ধ করে দিলে বুঝতে হবে তার মাথায় গোলমাল আছে, তাকে ডাক্তার দেখাতে হবে। যে মানুষ সুন্দর চেহারার প্রতি আকৃষ্ট হয় না, সুন্দর গান শুনতে চায় না, মিষ্টি কথা শুনতে চায় না, সেই মানুষের মাথায় অবশ্যই গোলমাল আছে। আর মনের মধ্যে যদি চাঞ্চল্য না থাকে, আমি এই কাজ করব কি করব না, তাহলে তার মাথাতেও অবশ্যই কোন গোলমাল আছে। এরপরও যদি গোলমাল করে তাহলে বুঝতে হবে তার বুদ্ধিতে গোলমাল আছে। তার ট্রেনিং ঠিক হয়নি বা ট্রেনিং ঠিক ছিল কিন্তু কোন একটা কারণে বুদ্ধি বিস্মৃত হয়ে গেছে। যেমন অর্জুনের হয়েছিল, অর্জুন সবই জানত, আমাকে ধর্মযুদ্ধ করতে হবে, কিন্তু যেই দেখল আমার নিজের লোকেদের বধ করতে হবে, এই নেগেটিভ ইমোশান তাঁকে হতাশার দিকে নিয়ে চলে গেল। এরপর অর্জুনের ধর্ম আর কর্মের বিস্মৃত এসে গেল। শ্রীকৃষ্ণ তখন আবার নতুন করে অর্জুনের মধ্যে ধর্মকে ঢাললেন। ধর্ম ঢালাতে অর্জুনের যে স্মৃতিটা বিস্মৃতিতে চলে গিয়েছিল সেটা আবার স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। নতুন কিছু ভগবান করেননি, ধর্মের কথাগুলিকেই আবার ঝালিয়ে দিলেন, এরপর অর্জুনের বুদ্ধি যেমনটি ছিল তেমনটি হয়ে গেল। বুদ্ধি তৈরী হতে একটা দীর্ঘ প্রস্তুতি লাগে। অনেক দিন ধরে শাস্ত্রের কথা শুনে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে দুর্বলতা আসছে আবার তাকে জয় করে নিচ্ছে, এভাবে চলতে চলতে বুদ্ধি ধীরে ধীরে দৃঢ় হতে থাকে। আসল মুহূর্তে বুদ্ধিও আমাদের ধোকা দিয়ে দিতে পারে। কারণ ইন্দ্রিয়ের এমন তোড় আসবে, মনের এমন চাঞ্চল্যতা আসবে তাতে বুদ্ধি নড়ে যেতে বাধ্য। তখন বোঝা যায় তার ট্রেনিং কতটা জবরদস্ত ছিল। জবরদস্ত ট্রেনিং যদি নাও থাকে কিন্তু তার একটুও যদি বোধ থাকে আমাকে এই ধরণের খারাপ কাজ করতে নেই তখন সে নতুন করে বুদ্ধিকে জোগান দেয়। হয়ত জপ করতে শুরু করল, সাধুসঙ্গ করতে শুরু করল, এই করে সে তার বুদ্ধির শক্তিকে জোগান দিতে থাকে। শক্তি বৃদ্ধি মানে বুদ্ধির শক্তিকে বৃদ্ধি করা। মনের শক্তিকে বাড়ান যাবে না, কারণ মন কখন বুদ্ধির কথা শোনে আবার কখন ইন্দ্রিয়ের কথা শোনে। মা যেমন কখন ছেলের পক্ষ নেয়, কখন বাপের পক্ষ নেয়। মা কখন যে ছেলেকে বাঁচাতে এগিয়ে যাবে আর কখন যে স্বামীকে রক্ষা করতে এগিয়ে যাবে কোন ঠিক নেই। ছেলে বড় হয়ে গেছে, বাবার সাথে ছেলের ঝগড়া লেগেছে, মা একবার ছেলেকে সামলায় আরেকবার বাপকে সামলায়। এটাই এখানে বলছেন, তোমার জীবন যাত্রাতে তোমার এই শরীরটাই সেই রথ, যে রথকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে পাঁচটি ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করছে পাঁচটি লাগাম, লাগাম হল তোমার মন। কিন্তু ঘোড়াগুলোর লাগাম রয়েছে সারথির হাতে, সারথি হল বুদ্ধি। সারথি যদি ঠিক থাকে তাহলে ঘোড়াগুলো ঠিকঠাক ভাবে চলবে। রথী কে? যিনি এই পথের যাত্রী, তিনি আত্মা। কোন আত্মা? সেটাই পরের মন্ত্রে এই রূপককে টেনে নিয়ে বলছেন –

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ।।১/৩/৪।।

(জ্ঞানীরা ইন্দ্রিয়সমূহকে অশ্ব এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলিকে অশ্বগণের গমনের পথ বলে থাকেন, তাঁরা শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন-সংযুক্ত জীবাত্মাকেই ভোগকর্তা বলেন।)

মনীষীরা হলেন ঋষিরা, যাঁরা এই রূপককে নিয়েছেন, সেই মনীষীরা এর মধ্যে আরও কিছু জিনিষ যোগ করছেন। বলছেন *বিষয়াংস্তেষু গোচরান্*, পঞ্চ তন্মাত্রা, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ, এটাই পথ যে পথের

উপর দিয়ে ঘোড়া রথকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ঘোড়া যেভাবে দৌড়ায় ইন্দ্রিয়গুলো ঠিক সেইভাবে দৌড়াতে থাকে। কঠোপনিষদেই যে এই রূপক নিয়ে আসা হয়েছে তা নয়, পুরো বেদান্ত এই রূপকের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। অক্টোপাস যেমন হাত বাড়িয়ে সব কিছু হাতড়াতে থাকে ঠিক তেমনি ইন্দ্রিয়গুলো সব সময় হাতড়াতে থাকে, চোখ সব সময় দেখতে থাকে, কান শোনার চেষ্টা করছে। কিন্তু বিজ্ঞান যেভাবে বলছে আলো আমাদের চোখে এসে পড়ছে, সেখান থেকে একটা আকৃতি তৈরী হওয়ার পর আমরা জানছি, বেদান্ত সেভাবে নেবে না। বেদান্ত বলে আলো পড়ছে ঠিকই, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মন থেকে যে প্রতিক্রিয়া বেরিয়ে আসে, সেটাই হল জানা। ক্যামেরাতে ছবি তুললে ক্যামেরার লেন্সের সামনে যা কিছু থাকবে সবটারই ছবি এসে যাবে। চোখ ক্যামেরার মত নেয় না। চোখ ঠিক বুঝতে পারে এ আমার বন্ধু, এ আমার শত্রু, এটা আমার প্রিয়, এটা আমার অপ্রিয়, বাকি দৃশ্যগুলোকে সে মুছে ফেলে। কারণ মন জানে, বাকি জিনিষগুলো তার কোন কাজে আসবে না, তাই ফেলে দেয়। ক্যামেরা প্রিয় অপ্রিয় দেখে না, সে পুরো দৃশ্যটাই বন্দী করে নেয়। কিন্তু চোখকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনবরত দৃশ্য নিয়েই যাচ্ছে, সেইজন্য ইন্দ্রিয়ের উপমা দিচ্ছেন ঘোড়ার সাথে।

আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তা, প্রথমে বললেন *আত্মানং রথিনং বিদ্ধি*, কিন্তু তার আগে বলেছেন *ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে*, ওখানে জীবাত্মা ও পরমাত্মার কথা বলছেন এখানে শুধু আত্মা বলছেন। এই জায়গাতে এসে দুটিকে আরও একত্রীকরণ করছেন। বলছেন *আত্মেন্দ্রিয়*, এই আত্মা বলতে শরীর। শাস্ত্রের এটাই সমস্যা, আত্মার অর্থ কোন জায়গায় শরীর, কোন জায়গায় মন, কোন জায়গায় বুদ্ধি আবার কোন জায়গায় শুদ্ধ আত্মা বোঝা মুশকিল। এখানে আত্মার অর্থ শরীর। আত্মা মানে আমি, এরপর আমি আমাকে কিভাবে দেখছি সেইভাবে আত্মার অর্থ দাঁড়াবে। আমি যদি আমাকে শরীর মনে করি তাহলে শরীরটাই আত্মা। যদি মন রূপে দেখি মনই আত্মা, বুদ্ধি রূপে দেখলে বুদ্ধিই আত্মা। আর যিনি মন, বুদ্ধিকে জড়িয়ে জীবাত্মাকেই আমি মনে করছেন তাঁর কাছ ওটাই আত্মা, ঠিক তেমনি যিনি নিজেকে শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ দেখেন তাঁর জন্য ওটাই আত্মা। শরীরকে যে আত্মা রূপে দেখে সে ঘোর বিষয়ী, যে বুদ্ধিতে নিজেকে আত্মরূপে দেখছে সে বুদ্ধিজীবি, বা বৈজ্ঞানিক বা সাহিত্যিক বা মনীষী হতে পারে। জীবাত্মাতে যে নিজেকে দেখে সে একজন ধার্মিক পুরুষ, তখন সে শুভ কর্ম করতে চাইবে আর অশুভ কর্ম থেকে দূরে থাকতে চাইবে। যিনি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দে নিজেকে আমি রূপে দেখেন তিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ। আমি নিজেকে কিভাবে দেখছি সেই অনুসারে আত্মার পরিভাষা পাল্টে যাবে। পুরো আধ্যাত্মিক উত্থান খুব সরল। পরে বলবেন ঐ যে আত্মা সেটাও আপনার ভেতরে, আত্মার বাইরে কিছু নেই। আত্মা মানে সব সময় আমি, আমার 'I' consciousness, পুরো শাস্ত্র খুব সহজ একটা কথাতে বলছেন, তুমি যে দেহকে মনে করছ আমি, এই দেহ থেকে তুমি বেরিয়ে এস। আমরাও সবাই তাই করছি। বাচ্চা সব সময় খেলা করে, মা এসে বলছে একটু পড়াশোনা কর। প্রত্যেক সন্তানকে বাবা-মা যখন বলছে মন দিয়ে পড়তে আসলে তখন বাচ্চার চেতনাকে দেহ থেকে টেনে বুদ্ধিতে নিয়ে আসা হচ্ছে। তারপর পড়াশোনা করে পাশটাশ করে বিয়ে থা হওয়ার পর আবার সে দেহ চেতনায় ফিরে যায়। শুয়ে শুয়ে টিভি দেখা, নাটক নভেল পড়া, নিউজপেপার পড়া আর এটা খেলে প্রেসার হবে, ওটা খেলে ডায়বেটিস হবে, সব সময় দেহের চিন্তাতেই পড়ে থাকে। এর থেকে আরেক ধাপ উপরে যে তাকেও বড়রা ছোটবেলায় উপদেশ দিয়েছেন, তুমি শুভ কর্ম কর, বাজে কাজ করবে না, জোর করে তাকে একটু জীবাত্মার বোধ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ইদানিং কালে এই উপদেশ দেওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে।

ঋষিরা বলছেন, তুমি দেহ বোধকেও ছাড়, বুদ্ধিকেও ছাড় আর জীবাত্মার বোধটাও ছাড়। তবে দেহ, মনের বোধ থেকে সরে এসে জীবাত্মার বোধে থাকাটা অনেক ভালো, কিছু না হলেও সংসার থেকে তোমাকে সরিয়ে নিয় এসো। *আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তম্*, এটাই সংসারীদের লক্ষণ, দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন এই তিনটের সাথে নিজের আত্মাকে জড়িয়ে রেখেছে। এখানে বুদ্ধিকে নিয়ে বলছেন না, যদিও বুদ্ধিকেও ধরা আছে, কিন্তু দেহ, ইন্দ্রিয় আর মনকে এই জন্যই বলছেন যে এদের সাথে আত্মাকে জড়িয়ে রাখাটাই সংসারীদের লক্ষণ। শুধু দেহ দিয়েই তো খাওয়া-দাওয়া হয় না, খাওয়াটা মুখ দিয়ে যায়, একটা জিনিষকে শুধু স্পর্শ করলেই হয় না, তাকে দেখতেও হয় শুনতেও হয়। তাই দেহ আর ইন্দ্রিয় সব সময় জড়িয়ে আছে। শুধু দেহ বলে কিছু হয় না, শুধু দেহ হলে ওটা পাথর হয়ে যাবে। দেহের সাথে ইন্দ্রিয় জড়িয়ে থাকে। আবার ইন্দ্রিয়ের সাথে মন সদা যুক্ত হয়ে আছে। দেহ আছে ইন্দ্রিয় আছে কিন্তু মন না যুক্ত হলে তার কোন জিনিষের বোধ হবে না। যখন বলছি

আমি, এই আমি কে বোধ করছে? দেহের বোধ করার ক্ষমতা নেই, সে জড়, ইন্দ্রিয়তো বোধ করতেই পারবে না, কিন্তু কেউ কেউ সচরাচর মনে করে দেহ পারবে না, ইন্দ্রিয় পারবে না, কিন্তু দেহ, ইন্দ্রিয় আর মন এই তিনটে মিলে যে সংযোগ হয় তখন সে বোধ করতে পারে। সাংখ্যবাদীরা বলেন, পান, চুন আর খয়ের তিনটে একসাথে মুখে দিলে মুখটা লাল হয়ে যাবে। অথচ পান লাল নয়, চুন লাল নয় আর খয়েরও লাল নয়, কিন্তু তিনটের যখন মুখের লালার সাথে সংযোগে হয় তখন মুখটা লাল হয়ে যায়। ঠিক তেমনি দেহ চেতন নয়, ইন্দ্রিয় চেতন নয় আর মনও চেতন নয়, কিন্তু তিনটে যখন মিলে যায় তখন চৈতন্য এসে যায়। চৈতন্য আসছে কি আসছে না তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু বলছেন নিজেকে এই তিনটের সঙ্গে যে জড়িয়ে রেখেছে, তাকেই বলা হয় ভোক্তা। কিন্তু আমরা এখানে শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি, শুধু দর্শন পড়ছি না।

এর আগে অস্তিত্বের আলোচনায় বলা হয়েছিল, সৎ বুদ্ধি সর্বত্র সর্বকালে থাকে আর অসৎ বুদ্ধি বা সীমিত বুদ্ধি বস্তুর সাথে পরিচ্ছিন্ন থাকে। ঠিক সেই ভাবে বলেছেন *ঋতং পিবন্তৌ, ছায়াতপৌ*, দুটোতে দুটি আত্মার কথা আসছে, শুদ্ধ আত্মা আর ভোক্তা। ভোক্তা কে? যিনি সীমিত। সীমিত কোথায়? দেহ, ইন্দ্রিয় আর মনে সীমিত। আমি মনে করছি আমি দেহ, আমি মন, এই মনে করাটা শুদ্ধ চৈতন্যের কাজ। শুদ্ধ চৈতন্য ছাড়া অন্য কেউ মনে করতে পারবে না। কিন্তু যখন দেহ ইন্দ্রিয় আর মনের সাথে জড়িয়ে নিজেকে মনে করছে, তখন তাকেই বলছেন ভোক্তা, তাকেই বলছেন জীব। জীব মানে, অস্তি বুদ্ধি, আমি আছি এই বোধ যার সব সময় থাকে। কিন্তু সীমিত রূপে আছে, যেমন এই গ্লাশ আছে, বোতল আছে, গ্লাশ আর বোতলে গিয়ে সীমিত হয়ে গেল। কিন্তু আছেটা কখনই সীমিত হয় না, impersonal রূপে, অখণ্ড রূপে যে অস্তি ঐ অস্তি কোথাও সীমিত হয় না। তার মানে এই অস্তিই গ্লাশ, বোতল রূপে আরোপ হচ্ছে। তেমনি শুদ্ধ আত্মা কখনই খণ্ডিত হন না। কিন্তু তিনি যখন দেহ, ইন্দ্রিয় আর মনের সাথে নিজেকে জড়িয়ে নেন তখন তাঁকে ভোক্তা বলছেন। আমি ভোগ করছি, ভালো খাওয়া-দাওয়া হলে বলছে কী দারুণ খেলাম, ভালো ঘুম হলে বলবে কী দারুণ ঘুমালাম, কী মজা পেলাম, এগুলো কার অনুভব হচ্ছে? সব অনুভব হয় শুদ্ধ আত্মার। কিন্তু শুদ্ধ আত্মা সেই সচ্চিদানন্দ তিনি নন, যে শুদ্ধ আত্মা নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন দেহেতে, মনেতে আর ইন্দ্রিয়তে, সেইজন্য বলছেন ভোক্তা। আসল সত্তা তাহলে দুটি হয়ে গেল শুদ্ধ আত্মা আর পরিচ্ছিন্ন আত্মা।

পরিচ্ছিন্ন আত্মা নিজেকে দেহ, ইন্দ্রিয় আর মনে সীমিত করে রেখেছেন, এই সীমাটা কি তাঁর বাস্তবিক নাকি কাল্পনিক? আচার্য বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন, *ধ্যায়তীব লেলায়তীব*, যেন ধ্যান করছে, যেন চেষ্টা করছে। আত্মা বাস্তবিক কিছুই করেন না, যেন করেন। এই কথা বলার পর আচার্য বলছেন, যদি তাই না হয় *আত্মতয়া প্রতিপত্তিরুপপদ্যতে, নান্যথা; স্বভাবানতিক্রমাৎ*, যে কোন বস্তু নিজের স্বভাবকে কখনই অতিক্রমণ করতে পারে না, স্বভাব যায় না মলে, মরে গেলেও স্বভাব কিন্তু পাল্টাবে না। *স্বস্য ভাব*, নিজের যে ভাব, আমার যে আমিত্ব, আমি যেটা এটা কোন দিন পাল্টাবে না। কিন্তু আমরা তো কখনই বলি না যে বদমাইশ লোক কোন দিন ভালো হবে না। আমাদের চলিত কথাকে শাস্ত্রে নিয়ে এলে সমস্যা হয়ে যায়। এখানে কিন্তু একবারও বলছেন না যে দুষ্ট লোক ভালো হবে না আর ভালো লোক দুষ্ট হবে না। জিনিষটা হল স্বভাব, যেমন জলের স্বভাব নিম্নগামী বা শীতল করা। আগুনের স্বভাব তাপ দেওয়া, হঠাৎ এ রকম কোন দিন হবে না যে একদিন দেখছি আগুন জ্বলছে কিন্তু সেখান থেকে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। বস্তুর এই স্বভাব কোন দিন পাল্টাবে না, তার যে inherent property, যেটা তার মূল, সেটা কোন দিন পাল্টাবে না। আত্মার স্বভাব কি? আত্মা কখন কোন ক্রিয়া করে না, কোন চিন্তন করে না। আত্মার এই স্বভাবের কথা পুরো উপনিষদ জুড়ে বলা হয়েছে। এখানে যে বলছেন আত্মা ভোক্তা, এটাই কল্পিত। কল্পিত না হলে আত্মা একবার ভোক্তা হয়ে যাবেন আরেকবার নির্বিকার হয়ে যাবেন। একটা single কথা দিয়ে শুদ্ধ আত্মাকে জানা যাবে সেটা হল নির্বিকার বা নির্গুণ নিরাকার। নিরাকার মানেই নির্বিকার, যার মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় না। অথচ এখানে আত্মার পরিবর্তন হতে দেখাচ্ছে, আত্মা এখানে ভোক্তা আর পুরো উপনিষদের উদ্দেশ্যই হল আত্মাকে মুক্তিতে নিয়ে যাওয়া, আত্মা চিরমুক্ত। কিন্তু তিনি যদি কখন মুক্ত কখন বদ্ধ হন, তাহলে আত্মার স্বভাব পাল্টে যাচ্ছে। অথচ বলছেন আত্মার কখন কোন পরিবর্তন হয় না, কিন্তু এখানে পরিবর্তন হচ্ছে। তাহলে বলতে হবে আত্মার এটাই স্বভাব, যেমন যে জন্মেছে সে মরবে। আত্মার এই স্বভাব হতে পারে। কারণ শাস্ত্র অন্য রকম বলছেন, স্বভাব কখন পাল্টাতে পারে না। কিন্তু এখানেই বলছেন *ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিনঃ*, একদিকে বলছেন

আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না, আর অন্য দিকে বলছেন আত্মা ভোক্তা, তার মানে আত্মার বন্ধনও আছে। যদি বন্ধনই হয় আর যদি সেই বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে যায়, তার মানে কদিন পর আবার বন্ধনে পড়বে। চোর আজকে জেলে আছে, কাল ছাড়া পাবে, আবার পরের দিন চুরি করে জেলে যাবে। আত্মার যদি বন্ধন থেকে মুক্তি হয়ে যায় তাহলে আবার বন্ধনে পড়বে। তাহলে আজ বন্ধন কাল মুক্তি আবার বন্ধন আবার মুক্তি এই যদি চলতে থাকে সবাই প্রাণপাত করে মুক্তির চেষ্টা করতে যাবে কেন! শ্রুতি বলছেন *যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি*। মানুষ সারা জীবন গুরুগৃহে বাস করে, সব ভোগ-বাসনা ত্যাগ করে ব্রহ্মচর্য পালন করে মুক্তির চেষ্টা করে গেল, তারপর তার মুক্তি হয়ে গেল, পরক্ষণেই আবার সে বন্ধনে পড়ে গেল, এত পরিশ্রম করে লাভ কি হল! তাহলে সংসার ধর্মটাই তো ঠিক ধর্ম, খাও পিও মৌজ কর। মুক্তির চেষ্টা করার কি দরকার! খুব সহজ যুক্তি, বন্ধন যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে আবার তাকে বন্ধনে পড়তে হবে। একটা দড়ি দিয়ে যদি কাউকে বাঁধা হয়, বাঁধার পর খুলে দেওয়া হল, সেই দড়ি দিয়ে আবার তাকে বাঁধা যেতে পারে। আচার্য এই কথাই বলছেন যে কোন বস্তু তার স্বভাবকে কখনই পাল্টায় না। আত্মার স্বভাবই অপরিবর্তনশীল, নির্বিকার। কিন্তু দেখছি আত্মা সব সময় পরিবর্তনশীল, এই ভোক্তা, ভোক্তা মানেই বদ্ধ, তারপরেই মুক্তি। কী করে সম্ভব! তাহলে গোলমালটা কোথায়? বলছেন *ধ্যেয়তীব লেলায়তীব*, যেন ধ্যান করছেন, যেন ভোগ করছেন, যেন বন্ধনে আছেন, 'যেন' বলছেন। আচার্য গীতার ভাষ্যেও বলছেন ভগবান যেন জন্মগ্রহণ করেন, যেন এই কর্মগুলো করেন। গীতাতেই আবার ভগবান বলছেন *জন্মকর্ম চ মে দিব্যম্* লোকেরা অবতারের কর্মকে বুঝতে পারেনা। কেন বলছেন যেন? কারণ আত্মা কখনই জন্মগ্রহণ করেন না, আত্মা কখনই কোন কর্ম করেন না, অথচ মনে হয় যেন করছেন। এটাই মায়া। এই যে আমি কথা বলছি, আমি বলছি বলাটা কি সত্য না মিথ্যা? অবশ্যই সত্য। কিন্তু কে বলছে এই কথা? আমার ভোকাল কর্ড বলছে, মাইক্রোফোন দিয়ে ধ্বণির বিস্তার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি মনে করছি আমি বলছি। আমার ভেতরে যিনি চৈতন্য সত্তা তিনি আমার ভোকাল কর্ডের সঙ্গে একাত্ম বোধ করেছেন। এই একাত্ম বোধটা কি বাস্তবিক নাকি কাল্পনিক? যদি বাস্তবিক হয়, যদি আমাকে সব বন্ধন থেকে বার করে নেওয়া হয় এরপর আবার আমি বন্ধনে পড়ব। একাত্ম বোধটা যদি কাল্পনিক হয় তাহলে বন্ধন থেকে ছাড়া পেয়ে গেলে আর বন্ধনে পড়ব না। তাই যদিও এখানে ভোক্তা বলা হচ্ছে কিন্তু আসলে আত্মা কখনই ভোক্তা হন না। তখন আচার্য অন্যান্য উপনিষদ থেকে দেখাচ্ছেন আত্মা কখনো কাজ করেন না, কিন্তু মনে হয় যেন কাজ করছেন। ঐ দৃষ্টিতে দেখলে অর্থ স্পষ্ট হয়ে যায়।

অন্যান্য দর্শন বিশেষ করে দ্বৈতবাদীরা এর অর্থ স্পষ্ট আলাদা করে বলে দেয় জীবাত্মা আলাদা পরমাত্মা আলাদা। জীবাত্মা সব সময় দেহ, ইন্দ্রিয়, মনের সাথে যুক্ত হয়ে অশুদ্ধ হয়ে আছে। আর *যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য* এর অর্থও করে পরমাত্মা যাকে বরণ করেন তিনি তাকে শুদ্ধ করে দেন। ভক্তিগীতিতেও বলছে কারে দাও মা ব্রহ্মপদ কারে কর অধোগামী। উপনিষদের যে যে জায়গায় অন্য রকম মন্ত্র আছে তারও ব্যাখ্যা সেইভাবে করে বেরিয়ে যাবে। সেইজন্য উপনিষদাদি গ্রন্থ পড়া খুব কঠিন। কারণ যেমনি অন্যান্য ভাষ্যকারদের ভাষ্য পড়বে তখন মনে হবে ইনিই ঠিক বলছেন। তবে আচার্যের ভাষ্য অনেক বেশি সঙ্গতিপূর্ণ। অন্যান্য ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যায় সঙ্গতি কম দেখা যায়। তাঁরা চারটে মন্ত্রকে ঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করে দেবেন কিন্তু বাকি চল্লিশটা মন্ত্রকে ঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন না। উপনিষদের অনেক মন্ত্র আছে, যদি ঠিক ঠিক ভাবে দেখা হয় এই মন্ত্রগুলির অর্থ গোঁড়া অদ্বৈতের সঙ্গে যেন মেলে না। পরেই আরেকটি মন্ত্র আসবে যার ভাব অদ্বৈতের সঙ্গে মিলবে না। কিন্তু আচার্য শঙ্কর সব কটিকেই অদ্বৈত দর্শনের সাথে মিলিয়ে দেখিয়ে দেবেন। এই যে *আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তম্* বলছেন, আচার্য বলছেন, ঠিকই তো বলা হয়েছে, এটাই দেখাচ্ছে, আমিও তো দেখছি আমি কাজ করছি, ভোগ করছি। কিন্তু বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলছেন *ধ্যায়তীব লেলায়তীব*, যেন ধ্যান করছেন, আত্মার সবটাই যেন। সবটাই যেন, যা কিছু হচ্ছে সবটাই মায়া। মায়া কিন্তু মিথ্যা নয়, দেখাচ্ছে কিন্তু এটা তাঁর বাস্তবিক স্বভাব নয়। কারণ বাস্তবিক স্বভাব যদি হয় তাহলে আত্মার এই বন্ধন এই মুক্তি, এই মুক্তি এই বন্ধন চলতেই থাকবে। এই অর্থ নিলে উপনিষদের অন্য মন্ত্রের অর্থের বিরোধী হয়ে যাবে। ঠাকুর বলছেন আমার একটা কথা যদি মিথ্যা হয় আমার সব কথাই মিথ্যা। কেউ রেগে গেলে আমরা বলি, তোমার কথার কোন ঠিক নেই, এই এক রকম কথা বলছ পরক্ষণেই অন্য রকম কথা বলবে। উপনিষদ এক জায়গায় এক রকম কথা বলবেন আবার অন্য জায়গায় অন্য রকম কথা বলবেন, কখনই তা হয় না। এই কথা বলার পর বলছেন –

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ।।১/৩/৫।।

(যে বুদ্ধি অসমাহিত মনের সাথে সর্বদা যুক্ত থাকাতে বিবেকহীন হয়, তার ইন্দ্রিয়সমূহ সারথির দুষ্ট অশ্বের মতই দুর্দমনীয় হয়।)

কিন্তু যদি এমন হয়, বুদ্ধি রূপী সারথি যে বসে আছে যার কথা আগে বলা হল, সে যদি অবিজ্ঞানবান হয়? এখানে শব্দটা হল অবিজ্ঞান, কখন 'জ্ঞান' শব্দ আসে কখন 'বিজ্ঞান' শব্দ আসে। বিজ্ঞান শব্দ এলে এর অর্থ করার সময় খুব সাবধান হতে হয়, বুঝতে হবে এই জায়গাতে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। জ্ঞান শব্দ বিভিন্ন অর্থে আসে। প্রথম অর্থ যিনি জ্ঞানমার্গে প্রথম চলতে শুরু করেছেন। জ্ঞানের দ্বিতীয় অর্থ যিনি বিষয়কে তাত্ত্বিক ভাবে বুঝে নিয়েছেন, তৃতীয় অর্থ যিনি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত এবং জ্ঞানকে কাজে লাগাচ্ছেন। এই তিনটেকেই জ্ঞানী বলে। কিন্তু তাত্ত্বিক জ্ঞান আর জ্ঞানকে কার্যে পরিণত করা এই দুটোকে পার্থক্য করার জন্য অনেক সময় জ্ঞানের কার্যকরী দিকটাকে বিজ্ঞান বলা হয়। গীতাতেও জ্ঞান বিজ্ঞান শব্দ এসেছে, ঠাকুরও অনেকবার জ্ঞান বিজ্ঞান শব্দ বলছেন। শুধু যদি জ্ঞান শব্দ থাকে তাহলে প্রাসঙ্গিকতা দেখে বুঝে নিতে হয় তাত্ত্বিক জ্ঞানের কথা বলছেন নাকি কার্যকরী জ্ঞানের কথা বলছেন। শুধু বিজ্ঞান শব্দ বলা হলে ওখানে আর কোন সংশয় থাকবে না। এখানে বুদ্ধিকে বিজ্ঞানবান বলছেন, জ্ঞানবান বলছেন না। জ্ঞানবান মানে সে জানে কিন্তু জ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারছে না। যে বুদ্ধি কাজে লাগানো যায় না সেই বুদ্ধি বুদ্ধি নয়। জ্ঞানবানের কোন দাম নেই, যিনি বিজ্ঞানবান তাঁরই দাম। বিজ্ঞানবান হলেন যিনি জ্ঞানকে ঠিক সময় কাজে লাগিয়ে দিতে পারেন। আমাদের বেশির ভাগই জ্ঞানী, একটা শব্দ প্রায়শই ব্যবহার করা হয় জ্ঞানপাপী, জ্ঞানপাপী মানে জ্ঞান আছে কিন্তু জ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারছে না। ভালো করেই জানে যে পড়াশোনা করতে হয়, কিন্তু পড়াশোনা করতে ইচ্ছে চাইছে না, এই জ্ঞানের কোন দাম নেই। সেইজন্য এখানে জোর দিয়ে বলছেন *যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবতী*, যার সারথী অবিজ্ঞান, কথাগুলো জানে কিন্তু কাজে লাগাতে পারছে না।

একেই অবিবেকী। কিসে অবিবেকী? প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তিতে, কোন জায়গাতে মন লাগাতে হবে আর কোন জায়গা থেকে মনকে সরাতে হবে এই ব্যাপারে তার সম্যক ধারণা নেই। তার সঙ্গে *অযুক্ত*, অযুক্ত মানে বিক্ষিপ্ত চিত্ত, একটা জায়গায় স্থির থাকতে পারছে না। দুর্যোধন জানে কোনটা করতে হবে কোনটা করতে নেই, কিন্তু যেটা করার সেটা করবে না, যেটা না করার সেখান থেকে সরে আসে না, প্রবৃত্তি নিবৃত্তিটা তার পরিষ্কার নয়। বিক্ষিপ্ত চিত্ত হওয়াতে তার মন একাগ্র নয়, একাগ্র না হওয়ার জন্য সারথী যে লাগামটা ধরে আছে সেই লাগামটা ঢিলেঢালা হয়ে যায়। কথায় বলে, লাগাম ছাড়া। ফলে কি হয়? *তস্যেন্দ্রিয়ান্যবশ্যানি*, এই ধরণের সারথি হলে ঘোড়াগুলো তার নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। একজন দুর্বল সারথি, ভালো রথ চালাতে পারে না, তাকে যদি দুষ্ট ঘোড়া দিয়ে দেওয়া হয়, সেই সারথির পক্ষে ঘোড়াদের চালনা করা খুব কঠিন হয়ে যাবে। ঠিক তেমনি বুদ্ধি যদি দুর্বল হয় তাহলে তার মন ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে না। দুর্বল বুদ্ধির বিশ্লেষণ করছেন অবিবেকী বা অবিজ্ঞানবান, কোথা থেকে সরতে হবে, কোথায় মনকে লাগাতে হবে বুঝতে পারে না। আর *অযুক্ত*, নিজের লক্ষ্যের প্রতি একাগ্র নয়, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটে পুরুষার্থের সাথে সারথী যুক্ত থাকতে পারে না। ফলে কি হয়? একটা নির্দিষ্ট পথ দিয়ে যাচ্ছে, ঘোড়াগুলো টেনে রাস্তা থেকে সরে অন্য দিকে টেনে নিয়ে গেল। এর বিপরীত কি রকম হয়?

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ।।১/৩/৬।।

(কিন্তু যে বুদ্ধিরূপ সারথি সর্বদা সংযত মনের সাহায্যে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি বিচারে নিপুণ হয় তার ইন্দ্রিয়সমূহ ভালো শিক্ষণপ্রাপ্ত অশ্বের মত বশবর্তী ও আজ্ঞাধীন থাকে।)

কিন্তু যার বুদ্ধি এর বিপরীত বিজ্ঞানবান অর্থাৎ কুশল, সে জানে আমাকে কোথায় থামতে হবে, কোথায় চলতে হবে, কোথায় যেতে হবে আর কোথায় যেতে হবে না, তার সাথে যুক্ত, সেই সারথীর ঘোড়াগুলো পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে। বিজ্ঞানবান জানেন আমাকে এটা করতে হবে, এটা করা যাবে না, শুধু জানেনই না, কিভাবে কার্যে পরিণত করতে হবে সেটাও ভালো ভাবে জানেন। বিজ্ঞানবান সারথী সব সময় যুক্ত, তিনি জানেন এটাই আমার লক্ষ্য, নিজের লক্ষ্য তাঁর কাছে স্পষ্ট আর প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিও পরিষ্কার জানেন। এখানে দুটো গুরুত্বপূর্ণ

শব্দ হল বিজ্ঞানবান আর যুক্ত। শুধু যুক্ত যদি কেউ হয়, তাতেও জীবন চলবে না আর শুধু বিজ্ঞান যদি থাকে তাতেও জীবন চলে না।

যুক্ত মানে লক্ষ্য স্পষ্ট। ছাত্রের লক্ষ্য কি? পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া। এবার সে যুক্ত হয়ে গেল, পরীক্ষায় আমাকে পাশ করতেই হবে, সে সৎ ভাবেই হোক আর অসৎ ভাবেই হোক। বর্তমান সমাজ যুক্ত হওয়ার জন্য বলছে আমাকে এটা পেতেই হবে, টাকা আমাকে পেতেই হবে, সৎ ভাবেই হোক বা অসৎ ভাবেই হোক। এখানে তাই দ্বিতীয় শর্ত লাগিয়ে দিচ্ছেন – বিজ্ঞানবান, প্রবৃত্তি নিবৃত্তির ব্যাপারে পরিষ্কার থাকতে হবে, তোমার যে ফল as important as goal, you cannot compromise। তুমি শুধু রাস্তাটা ভালো জানো কিন্তু জানো না এটা করতে নেই এটা করা উচিৎ, এটাই তখন বিধবাদের ধর্ম হয়ে যাবে। বিধবাদের ধর্ম কি? সবই জপ-ধ্যান করছে, শুচি অশুচি করছে, খুব নিয়ম-নিষ্ঠা পালন করছেন কিন্তু কোথায় যাচ্ছে জানে না। এটাকেও আটকাচ্ছেন। পরিষ্কার জানতে হবে আমাকে এই জায়গায় যেতে হবে। দ্বিতীয়, এটা করা যাবে, এটা করা যাবে না। লক্ষ্য আর পথ দুটোকেই সমন্বিত হতে হবে। শুধু লক্ষ্যপ্রাপ্তিও নয় আর শুধু পথ ভালো করাটাও নয়, দুটোকেই সমান ভাবে থাকতে হবে। উপনিষদের এইসব মন্ত্রগুলো অত্যন্ত মূল্যবান, একেবারে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন বিজ্ঞান আর যুক্ত। সারা জীবন খুব সৎ ভাবে জীবন কাটিয়েছে, বয়স থাকতে প্রচুর কাজ করে গেছে, বয়স হয়ে গেছে আর কাজ করতে পারছে না, এখন কি করবে? জানে না। কারণ জীবনে কোন লক্ষ্য ছিল না। পথ নিয়েছিল ঠিকই, জপ-ধ্যান, শৌচ সব নিষ্ঠা সহকারে করে গেছে কিন্তু যুক্ত নয়, আমি সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করতে চাই, এই লক্ষ্যে যুক্ত হয়নি। অন্য দিকে আবার বলছে আমি সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করতে চাই, কিন্তু পথ ঠিক রাখতে পারছে না। মুখে বেদান্তের বড় বড় তত্ত্ব, অন্য দিকে নোংরা কাজ করে যাচ্ছে। ঠাকুর বলছেন, তুমি একদিকে বলছ ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা অন্য দিকে নোংরা কাজ করে বেড়াচ্ছ। ঠাকুরকে বলছে, জগৎ মিথ্যা তাই আমার কাজগুলোও মিথ্যা। ঠাকুর শুনে বলছেন তোমার বেদান্ত জ্ঞানে আমি ইত্যাদি করি। তার মানে শুধু লক্ষ্য ঠিক রাখলেও হবে না পথটাও ঠিক রাখতে হবে। বিজ্ঞান আর যুক্ত একসঙ্গে চলে। এখানে সেই কথাই বলছেন, *যস্ত বিজ্ঞানবান্ ভবতি*, বিজ্ঞানবান হতে হবে, বিজ্ঞানবান মানে যাদের বুদ্ধি অত্যন্ত কুশল তার সাথে বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে আর *যুক্তেন মনসা সদা*, মন সব সময় যুক্ত থাকবে, পথ একেবারে স্পষ্ট হবে লক্ষ্যও খুব স্পষ্ট হতে হবে। এই না হলে দুষ্ট ঘোড়াগুলো পথভ্রষ্ট হয়ে ছিটকে যাবে। যাদের দুটোই পরিষ্কার তাদের ক্ষেত্রে বলছেন ভালো ঘোড়াগুলো আয়ত্তাধীনে থেকে যেমন লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়, বিজ্ঞানবান আর যুক্ত যিনি তাঁকেও লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়।

উপনিষদে সাধনার কথা খুব কম বলা হয়েছে, কিন্তু কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় বল্লীর তিন নম্বর মন্ত্র থেকে আট নম্বর মন্ত্র, এই ছটি মন্ত্র, আর নয় নম্বর মন্ত্রকেও যদি নেওয়া হয় তাহলে এই সাতটি মন্ত্রকে সাধন জীবনের প্রাণ বলা হয়। এর বাইরে সাধন জীবন বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। এই কটি মন্ত্রে ভালো মন্দ দুটো দিককেই বলে দেওয়া হয়েছে, শুধু কর্তব্যটাই বলেননি অকর্তব্যকেও বলে দিয়েছেন। আট নম্বর মন্ত্রে বলছেন –

যস্তুবিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি।।১/৩/৭।।

(আবার যে বুদ্ধিরূপ সারথি কর্তব্যাকর্তব্য-বিবেকহীন, অসংযত চিত্ত, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হয়, সেই সারথীর সাহায্যে উক্ত রথী মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয় না, বরং জন্মমৃত্যুরূপ প্রবাহে পতিত হয়।)

আগে বিবেকবুদ্ধিরূপ সারথির কথা বললেন। এই বিবেক যুক্ত বুদ্ধি কার হয়? গুরুর কাছে শাস্ত্রের কথা শুনে নিজের জীবনকে সেই ভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। যদি শাস্ত্রজ্ঞ গুরু না হয় বা গুরু যদি শাস্ত্রের কথা ভুলভাল বলে থাকেন বা সদ্‌গুরু পেয়েছে, শাস্ত্রও শুনছে কিন্তু নিজে কোন চেষ্টা করছে না, এই তিনটের একটা যদি গোলমাল থাকে তাহলে বুদ্ধিও গোলমেলে হবে। তিনটে জিনিষ ঠিক থাকতে হবে – প্রথম হল কি ধরণের শাস্ত্র শুনছে। আজকাল অনেক স্বঘোষিত গুরু প্রচুর প্রবচন দিতে থাকেন, যদি জিজ্ঞেস করা হয় আপনি কোন শাস্ত্র থেকে এই কথা বলছেন, এদের কাছে কোন উত্তর নেই। বেশির ভাগ গুরু কোন শাস্ত্র থেকে না বলে নিজেদের মন থেকেই বলতে থাকেন। ছোটবেলায় পরিবারে বড়দের কাছে শুনেছেন, পরে এদিক সেদিক

থেকে কিছু শুনেছেন, সবটা মিলিয়ে চলতি কা নাম গাড়ির মত বলে যান। গুরু যে কথা বলবেন তার একটা পরম্পরা থাকা চাই, কিন্তু এদের কোন কথারই পরম্পরা নেই। আবার অনেকে শাস্ত্রের কথা নিজের মত ব্যাখ্যা করে যান, এদেরও পরম্পরা বিদ্যা নেই। সেইজন্য বলছেন গুরু মিলে লাখ লাখ শিষ্য মিলে লাখো মে এক। এই ধরণের গুরু প্রচুর পাওয়া যায়, সদ্‌গুরু পাওয়া খুব দুষ্কর। সদ্‌গুরু যদি পেয়েও যাই, তাঁর কথা শুনতে খুব ভালো লাগছে, কথাগুলো খুবই যৌক্তিক মনে হচ্ছে, সব ঠিক মনে হচ্ছে, কিন্তু তাঁর কথাকে জীবনে কাজে লাগাতে পারছে না এই নিয়ে হিন্দু ধর্মে মনস্তত্ত্বের উপর অনেক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গীতাতে ধৃতি আদিকে নিয়ে আলোচনা করছেন, যোগশাস্ত্রেও আলোচনা করছেন। গুরু আর শাস্ত্রের কথা শুনে কাজে লাগানো খুব কঠিন। দুর্বল মনের শিষ্যদের গুরুর কাছে অনেক বেশি থাকতে হয়। গুরু আবার দুর্বল শিষ্যদের কোন উপদেশ দেন না, শুধু কাজ করিয়ে যান। যাদের মন এখনও তৈরী হয়নি, তাদের প্রচুর কাজ করতে হবে, শুধু সেবা করে যেতে হবে। সেবা করে করে, কাজ করতে করতে বুদ্ধিটা যখন একটু খোলে তখন গুরু একটা কি দুটো কথা বলে দেন। আর খুব হলে মুখস্ত করতে লাগিয়ে দেবেন। এত কিছু করার পর যখন বুদ্ধিটা তৈরী হবে, তখন সেই বুদ্ধিই হল কুশল বুদ্ধি, এবার সে সব জানে।

মহাভারতে একটা নামকরা কাহিনী আছে। গুরু একবার কিছু দিনের জন্য আশ্রমের বাইরে যাবেন, যাওয়ার আগে প্রধান শিষ্যকে ভার দিয়ে গেলেন সব দেখাশোনা করার জন্য। আগেকার দিনের ব্রাহ্মণদের একাধিক স্ত্রী থাকত, তাদের মধ্যে সব থেকে কনিষ্ঠের বয়স খুব কম থাকত। কনিষ্ঠ স্ত্রী বলছে, আমার এখন স্বামীসঙ্গ করার ইচ্ছে জেগেছে, তুমি প্রধান শিষ্য, তোমাকে আমাদের দেখাশোনার ভার দিয়ে গেছেন, তাই তুমিই আমার এই ইচ্ছা পূরণ করে দাও। শিষ্য তখন গুরুপত্নীকে বলছে, গুরু আমাকে সেই কাজগুলোই করতে বলে গেছেন যে কাজগুলো শাস্ত্রবিহিত, নিষিদ্ধ কর্ম করতে বলেননি। এই হল ঠিক ঠিক বুদ্ধির দৃষ্টান্ত। সে প্রধান শিষ্য, সবটাই তার জানা আছে, শাস্ত্র জানে, গুরুর আদেশও জানে, গুরুপত্নীর যে চাহিদা সেটাও জানে। আমাদের শেষ গুরু বুদ্ধিই হয়, বুদ্ধি ছাড়া আর কেউই শেষ গুরু হতে পারে না। বুদ্ধি ভগবানরই রূপ, ঠাকুরও বলছেন, শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি আর শুদ্ধ আত্মা এক। আত্মা মানেই ঈশ্বর, ঈশ্বর মানেই বুদ্ধি, তবে অশুদ্ধ বুদ্ধি নয়। উচ্চতম জ্ঞান সব সময় বুদ্ধি থেকেই আসে, কারণ সেই বুদ্ধি ঈশ্বর রূপে বা গুরু রূপে জ্ঞান দেন। গুরুও যা ঈশ্বরও তাই, আত্মাও যা শুদ্ধ বুদ্ধিও তাই। শিষ্য বুঝতে পারছে, আমার গুরু বৃদ্ধ হয়েছেন, গুরুপত্নীর বয়স অল্প সেইজন্য তার মনে কাম ভাব জেগেছে। গুরুর আজ্ঞা তো লঙ্ঘন হয়েছেই, গুরু বলে দিয়ে গিয়েছিলেন গুরুপত্নীদের যা যা হুকুম হবে সব তালিম করে দিতে। গুরু যথা সময়ে ফিরে আসার পর প্রধান শিষ্য গুরুকে সব বলেই দিল। শুনে গুরু খুব খুশী হয়ে গেলেন। গুরু খুশী হলে কি হবে! গুরুপত্নী তো রাগে অপমানে ফুঁসছে, সেও প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য শিষ্যকে এমন জায়গায় পাঠিয়ে দিল যাতে আর বেঁচে ফিরে না আসতে পারে। গুরু আবার তাঁর আশীর্বাদে শিষ্যকে কিভাবে কিভাবে রক্ষা করলেন। মহাভারতের বিরাট লম্বা কাহিনী। এটাই বুদ্ধি, শাস্ত্রের কথা গুরুর মুখে শ্রবণ করার পর আসে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি আসার পর প্রথম হল সে জানে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। ।

দ্বিতীয় যেটা আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ, তা হল সেই বুদ্ধি অনুসারে সব কিছু করার ক্ষমতা রাখা, অন্য রকম করা যায় কিন্তু সে করবে না, কারণ তার বুদ্ধির জোর বেশি, আমি এই রকমটিই করব। আমরা অনেক সময় বলি, আমি যখন বলে দিয়েছি করব তখন আমি করবই করব, তোমার সর্বনাশ আমি করেই ছাড়ব, ইত্যাদি যে কথাগুলো বলছি এগুলো বুদ্ধির কাজ নয়, নিজের অহঙ্কারের তুষ্টির জন্য বলছি। বুদ্ধি হল সে জানে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। প্রত্যেকটি যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি তাতে দশটা ভালো দশটা খারাপ বা দু খানা ভালো পঁচিশ খানা খারাপ, তখনও দেখা শাস্ত্র মতে কোনটা ঠিক আর যে শাস্ত্র মত গুরুর মুখ দিয়ে এসেছে, এটাকে পালন করার ক্ষমতা যাঁর আছে তিনিই বিজ্ঞানবান্। বিজ্ঞানবান্ মানে তাঁর সেই ক্ষমতা আছে, এটাই ঠিক আমি এটাই করব, এর বাইরে আমি যাব না। এর বিপরীত হল *যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবতি*, অবিজ্ঞানবান্ মানে হয় সে জানেই না কোনটা ভুল কোনটা ঠিক, আর নয়তো করার ক্ষমতা নেই। দুর্যোধন বলছেন, আমি জানি ধর্ম কি কিন্তু করতে ইচ্ছে যায় না, আর অধর্ম কোনটা সেটাও জানি কিন্তু সেখান থেকে আমার মনকে আমি সরাতে পারি না। যে বুদ্ধিকে তুমি কাজেই লাগাতে পারবে না, সেই বুদ্ধি থাকলেও কি আর না থাকলেও কি! বৃহত্তর সমাজে শাস্ত্রের কথা সবাই নাও জানতে পারে, কিন্তু কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল সবাই জানে, কিন্তু সেটাও

কাজে লাগাতে পারে না। এরাই অবিজ্ঞানবান্‌, এই যে এক বিশেষ শক্তি, যে শক্তিতে সে এই জ্ঞানকে কার্যকর করতে পারবে সেই ক্ষমতাটা তার নেই। এর থেকেও খারাপ হল অমনস্ক, অমনস্ক মানে অসংযতচিত্ত। বাংলা অন্যমনস্ক আর এই অমনস্কের মধ্যে সামান্য একটা তফাৎ আছে। মনের সংজ্ঞা হল সঙ্কল্পাত্মক-বিকল্পাত্মিকা, এই কাজটা করব কি করব না, মন সব সময় দোদুল্যমান, এটাই অমনস্ক, কোন একটাতে মন স্থির থাকছে না। বুদ্ধি কিন্তু বলে দিচ্ছে তোমাকে এই রকমটিই করতে হবে, কিন্তু মন চঞ্চল, তার মধ্যে এখনও সংশয়, কে জানে বাপু কি হবে, এটাই অমনস্ক। মনের এই চাঞ্চল্যতার জন্য কোন কিছুকে মানুষ ধরে রাখতে পারে না, অর্থাৎ তার ধৃতি নেই। এরাই অবিজ্ঞানবান, বুদ্ধি দুর্বল, মন দুর্বল।

ব্রহ্মচারী অবস্থায় অনেক রকম শাস্ত্র পড়ছে, শাস্ত্র পড়ে মনে অনেক রকম প্রশ্ন আসে। ব্রহ্মচারীরা মহারাজদের কাছে প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়। মহারাজরাও দু চারটে কথা বলে দেন। তারপরেও যদি প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয় তখন মহারাজরা শুধু একটা কথাই বলে দেন – খুব করে কাজ কর, এখন শুধু কাজ করে যাও। ব্রহ্মচারী ভাবছে, ঠাকুর বলছেন এই জীবনেই ঈশ্বর লাভ করতে হবে আর এদিকে ব্রহ্মসূত্র, উপনিষদ, গীতা দামী দামী শাস্ত্র থাকতে বলছেন কিনা কাজ করে যেতে। একটা বয়সের পরে ব্রহ্মচারীরা বুঝতে পারে কেন মহারাজরা কাজ করতে বলতেন। যার জন্য দেখা যায় যাঁরা প্রথম অবস্থায় প্রচুর কাজ করেছেন বিদ্যা কিন্তু তাঁদেরই বরণ করেছেন। যাঁরা জীবনে প্রচুর কাজ করেননি তাঁদের কথাকে বিশ্বাসও করা যায় না। জীবনে যাঁদের প্রচুর ঝামেলা আসেনি, অনেক সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়নি, সাদাসিধে ভাবে জীবন অতিবাহিত হয়ে গেছে, এদের কথাকে বিশ্বাস করতে নেই। জীবনে অনেক মার না খেলে বুদ্ধি খুলবে না। তাহলে বেদের সময়কার ব্রহ্মচারীদের তো সহজ সরল জীবন ছিল, তাঁদের কি করে বুদ্ধি খুলেছিল? একেবারেই তা নয়, গুরু শিষ্যদের এক মুহূর্তের জন্য শান্তিতে থাকতে দিতেন না, কত রকম ঝামেলার মধ্যে ঠেলে দিতেন। মহাভারতে যা সব বর্ণনা আছে, উপমন্যুর কথা, সত্যকামের কাহিনী পড়লে শিউড়ে উঠতে হয়। কটি ঘাটের মড়া গরু দিয়ে শিষ্যকে বলে দিলেন যখন এই কটি গরু থেকে হাজারটে গরু হয়ে যাবে তখন আসবে আমার কাছে উপদেশ নিতে। সে বেচারী এখন একা একা কোন জঙ্গলে পড়ে আছে, আশেপাশের গ্রাম থেকে দু মুঠো ভিক্ষা করে দিন কাটাচ্ছে, আর কি খাচ্ছে, কি পড়ছে তার কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। হাজারটা গরু হয়ে যাওয়ার পর গুরুর কাছে এসেছে উপদেশ নিতে। কাজ না করলে কখন বুদ্ধি খুলবে না। কাজ মনকে ধীরে ধীরে শক্তি দিতে শুরু করে, মন যখন শক্তিমান হয়ে যায় তখন সে আর অমনস্ক থাকে না। সাদা কাগজে যদি একটা লাইন টানতে দেওয়া হয় আর সেই লাইন যার যত সোজা থাকবে তার মন তত সমনস্ক বুঝতে হবে। কিছু লিখতে দিলে আমরা লাইনগুলোকে সোজা রাখতে পারি না, হয় লাইনগুলো উপরের দিকে যাবে নয়তো নীচের দিকে যাবে। হস্তলিপি বিশারদরা বলেন লাইন যদি উপরের দিকে যায় তাহলে বুঝতে হবে এর মধ্যে excitement আছে, আর যদি নীচের দিকে যায় তাহলে বুঝতে হবে এর মধ্যে এখন depression চলছে, লাইন যদি সোজা থাকে তাহলে মন সাম্য অবস্থায় আছে।

বুদ্ধি থেকে মনের স্তরে নেমে দেখা যায় মনের ক্ষমতা আরও দুর্বল। শুধু দুর্বলই নয় তার সাথে *সদাঽশুচিঃ*, এখানে অশুচি মানে শুচি অশুচির কথা বলছেন না, অশুচি মানে ইন্দ্রিয়ের উপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। অশুচিকে এখানে মনের দিক থেকে বলা হচ্ছে। মনের দুটি দিক, একটা মন বুদ্ধি রূপে কাজ করে, যেখান থেকে সে নির্দেশ পায় আর অন্য দিকে সে ইন্দ্রিয়গুলিকে নির্দেশ দেয়। মন খুব আজব জিনিষ, এক দিকে সে নিজেই মালিক হয়ে বুদ্ধি রূপে নিজেকে আদেশ দেয় আবার একই মন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সব কিছু সংগ্রহ করে তাকেই আবার নির্দেশ দিতে থাকে। মন এই প্রভু এই ভৃত্য আবার তার একটা নিজস্ব সত্তা আছে। এখানে তাই একটি বাক্যে সবটাই মনকে কেন্দ্র করে বললেন। কিন্তু মনের তিনটে দিক, একটা দিক বুদ্ধি, যে নিশ্চায়ত্মক, দ্বিতীয় দিক সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মিকা আর তৃতীয় ইন্দ্রিয়গুলির উপর প্রভুত্ব কায়েম করে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা। মন চঞ্চল মানে মন ইন্দ্রিয়প্রেরিত। যখনই ইন্দ্রিয় তার নিজের বিষয় বা ভোগের জিনিষ পেয়ে যায় সেখানে মন তার লাগামটা ছেড়ে রেখে দেয়, এটাই অশুচি। যে কাজকে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ বলছে সেই কাজে নেমে যাওয়াকে অশুচি বলছেন। শাস্ত্রে কোন কিছুকে নিষিদ্ধ বলা মানেই সেগুলি ইন্দ্রিয়জনিত। ঠাকুর বলছেন কলিতে মনের পাপ পাপ নয়। আমি ভাবছি আমার কিছু টাকা হলে ভালো হত, তা সৎ উপায়েই হোক আর অসৎ উপায়েই হোক। এখন যা দিনকাল, এই যুগে এই ধরণের পাপের কোন দাম নেই। কিন্তু সন্ন্যাসীদের জন্য

মনের পাপও পাপ। যদি কেউ অসৎ ভাবে টাকা আয় করতে নেমে যায়, তার মানে সে তার ইন্দ্রিয়গুলোকে ছেড়ে দিলেন, এটাই অশুচি। যখনই বলছে মন অশুচি বা মন অশুদ্ধ, বুঝতে হবে সে ইন্দ্রিয়গুলিকে বেশি ছাড় দিয়ে রেখেছে। ফলে তার মনে কিছু কিছু জিনিষ ঘটতে থাকে, কিন্তু মূল হল ইন্দ্রিয়গুলোকে ছেড়ে দেওয়া।

এখন বুদ্ধি তাকে বলল এই রকমটি কর, মন তখন বলছে করব কি করব না। কিন্তু আদেশ দেওয়ার সময় মন ইন্দ্রিয়কে বলছে ঠিক আছে গোলমালটা করে নাও। যেখানে অবিজ্ঞানবানকে নিয়ে বলছেন সেখানে আরও বাজে অবস্থা, বুদ্ধি তখন বলবে এটা করা ঠিক নয় তবে একবার যখন করতে চাইছ করে নাও, এই বলে মনের সাথে আপোষ করতে চাইবে। শ্রীমার কাছে একজন সন্ন্যাসী হতে এসে বলছে 'মা আমি সংসারে ফিরে যেতে চাইছি, ঠাকুরও তো সংসার করতে নিষেধ করেননি'। শ্রীমা বলছেন 'অবশ্যই তুমি সংসারে ফিরে যাবে, যাও বাবা তোমার ভালো হোক'। শ্রীমার কাছে যাঁরা ছিলেন, ছেলেটি চলে যাবার পর তাঁরা মাকে বলছেন, মা! আপনি এ কী করলেন! মা বলছেন 'পুরো কথামৃতে তার একটা কথাই মনে আছে যে, ঠাকুর তো সংসার করতে নিষেধ করেননি। কিন্তু ঠাকুর যে এত ত্যাগ, বৈরাগ্যের কথা বলছেন সেই দিকে তার দৃষ্টি নেই'। অথচ সে শাস্ত্রের কথাই বলছে। ঠাকুর কিন্তু তার আগে একটা শর্ত লাগিয়ে দিয়েছেন, যারা পারবে না তারা সংসার করবে। কথামৃতেই বর্ণনা আছে, একজন এসে বলছেন, সবাই যদি সন্ন্যাসী হয়ে যায় তাহলে সংসার কার্য চলবে কি করে। ঠাকুর বলছেন, দায়ীত্বটা কি তোমার, যাদের সংসার করার ইচ্ছে তারা করুক না। কেউ চাইলেই কি সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে পারবে? বেলুড় মঠের আশেপাশে কত লক্ষ লক্ষ লোক আছে তাদের যদি বিনা পয়সাতেই ক্লাশ শুনতে বলা হয় তাও কজন আসবে! খিচুড়ি খেতে আসতে পারবে কিন্তু শাস্ত্রের কথা শোনার জন্য দুই এক জনই আসবে। শ্রীমার কাছে যে সন্ন্যাসী হতে এসেছিল সে শাস্ত্রের ততটুকুই নিচ্ছে, যতটুকুতে তার মনের মত কাজটা হয়ে যাবে। সেও কথামৃত থেকেই বলছে, ঠাকুর তো সংসার করতে বারণ করেননি। ঐ বুদ্ধির মধ্যে যুক্তি আছে, তর্ক আছে, শাস্ত্র আছে, গুরু আছে সবটাই জড়িয়ে আছে, এটাই অবিজ্ঞানবান্। বুদ্ধি হয়ত চালাকি করে বলে দিল, একবার না হয়ে করে নিলে ঠিক আছে, তার সাথে মনও সেই রকম খেলছে আর সব শেষে সব কিছু ইন্দ্রিয়ের উপর ছেড়ে দিচ্ছে।

মন শুধু ভেবেই চলে, এক দিকে ইন্দ্রিয়ের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, অন্য দিকে বুদ্ধিরও জোর নেই। এই রকম যার মন, বুদ্ধি তার কি অবস্থা হবে? *ন স তৎপদমাপ্নোতি*, সে পরম পদ লাভ করতে পারে না। *পদম্* মানে সেই অক্ষরের পরমপদ, যার বর্ণনা নয় নম্বর মন্ত্রে করা হবে। অভয়পদ, যাঁকে বলছেন অক্ষরপদ, ঈশ্বরের সাথে এক হওয়ার যে জ্ঞান, সেই অনন্ত পদ অবিজ্ঞানবান্ অমনস্ক, অশুচি যারা তারা পায় না। অক্ষর পদ না পাওয়ার ফল কি? মুক্তি তাদের হয় না, কৈবল্য হয় না, কৈবল্য তাদের হয় না বলে *সংসারং চাধিগচ্ছতি*, মৃত্যুর পর আবার এখানেই ফিরে আসে। সংসারের অর্থই হল জন্ম-মৃত্যুরূপী খেলা। কৈবল্য মানে কেবল, শুধুমাত্র সেটাই আছে অন্য আর কিছু নেই, দুই বলে কিছু নেই, এটাই কৈবল্য।

উপনিষদে পুনর্জন্মবাদের ধারণা একটু একটু করে আসতে শুরু হয়ে গিয়েছিল। কেনোপনিষদ বা ঈশাবাস্যোপনিষদে পুনর্জন্মবাদের কথা নেই, কঠোপনিষদে বেশ কয়েকটি মন্ত্রে পুনর্জন্মবাদের কথা বলা হয়েছে, ছান্দোগ্য উপনিষদেও পুনর্জন্মবাদ প্রসঙ্গ এসেছে। গীতাদির মত গ্রন্থ পুনর্জন্মবাদের উপরই দাঁড়িয়ে আছে। এই মন্ত্রে পুনর্জন্মবাদের কথা বলছেন, যদি তোমার মুক্তি না হয় তাহলে *সংসারং চাধিগচ্ছতি*। যাঁরা পুনর্জন্মবাদ মানে না তাঁরা এইসব মন্ত্রকে নিজের মত ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু এখান থেকেই পুনর্জন্মবাদ এসে যাচ্ছে। পুনর্জন্মবাদ না মানা হলে ধর্মের কোন প্রাসঙ্গিকতাই থাকবে না। শুধু হিন্দু ধর্মই নয়, ইসলাম, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন সব ধর্মেই পুনর্জন্মবাদ আছে। কিন্তু ভৌতিক দেহের পুনর্জন্ম একমাত্র ভারতীয় ধর্ম অর্থাৎ হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ও জৈন ধর্মেই এসেছে। ভৌতিক পুনর্জন্মের বিরুদ্ধে ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্মে প্রচুর যুক্তিতর্ক আছে। কিন্তু তাত্ত্বিক ভাবে গভীর চিন্তন করলে দেখা যাবে, শারীরিক রূপে পুনর্জন্মকে যদি না মানা হয় তাহলে জীবন খুবই কষ্টদায়ক, পীড়াদায়ক হয়ে যায়। তার থেকেও বাজে হল, জীবনটাই খুব অযৌক্তিক হয়ে যায়, তৃতীয় ঈশ্বরের মধ্যে নানান রকমের বৈষম্য দোষ এসে যায়। শারীরিক পুনর্জন্মকে মেনে নিলে ধর্ম দর্শনের সব রকম দোষের নিবারণ হয়ে যায়। পুনর্জন্মবাদ মানে, আগের আগের জন্মে আমি এমন কিছু করেছি যার ফলস্বরূপ আজ আমার এই শরীর, এই মন আর এই পরিস্থিতি পেয়েছি। যদি মনে হয় এর একটিও আমার কাছে সুখদায়ক নয়, আমি যদি এগুলোকে শোধরাতে চাই তাহলে আমাকে এক্ষুণি শুরু করে দিতে হবে। নিজে

থেকে এগুলো শোধরাবে না, আরও যদি গোলমাল পাকায় আরও নীচের দিকে গোত্তা মারবে। পুনর্জন্মবাদের মূল ভাব হল, আমার বর্তমান আমার জন্যই হয়েছে আর আমার হাতেই রয়েছে ভবিষ্যতকে ঠিক করা। ঠিক হয় কর্মের দ্বারা, শুভ কর্ম করতে থাকলে এগুলো ঠিক হয়ে যায়। দান করা, তীর্থে যাওয়া, সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ, ব্রত পালন এগুলো করলে কর্ম পাল্টায়। পুনর্জন্মবাদকে যদি না মানা হয়, যদি মৃত্যুতেই সব কিছু শেষ হয়ে যায়, এতে দুই রকমের সিদ্ধান্ত এসে যায়। মৃত্যু মানেই সব শেষ, এর আগে পেছনে কিছু নেই, বর্তমানের ভাবনাটাই প্রবল হয়ে ওঠে, এই ভাবনাই জীবনকে নৈরাশ্যমূলক করে দেয়। এত কিছু করা, এত পরিশ্রম, শুধু জেনেটিকের প্রভাবে একটা সন্তানের জন্ম দিয়ে সারা জীবন দিয়ে দেওয়া, নিজের জন্য কিছুই হল না, কেমন একটা নৈরাশ্যপূর্ণ জীবন!

ইসলাম বলছে, মৃত্যুর পর আল্লা একদিন তোমার বিচার করে তোমাকে অনন্তকালের জন্য স্বর্গে নয়তো নরকে পাঠিয়ে দেবেন। প্রথমত এটাই খুব অযৌক্তিক হয়ে যাবে যদি প্রশ্ন করা হয় একটা বাচ্চা জন্মাবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মরে গেল, এই বাচ্চা এখন কোথায় যাবে? তার তো কোন কর্মই হয়নি যে কর্ম দিয়ে তাকে স্বর্গে বা নরকে পাঠাবেন। যুক্তিতেই দাঁড়াচ্ছে না। পাঁচ বছর, সাত বছরের বাচ্চার কথা না হয় ছেড়ে দিলাম, জীবনে একটা সময় আমার খুব ভোগের ইচ্ছা হয়েছিল ভোগ সম্বরণ করতে পারিনি তাই ভোগ করেছি, কিন্তু এখন আমার মধ্যে ত্যাগের প্রবল ইচ্ছা জেগেছে, তাহলে আমার কি হবে? যিনি আল্লা বা গড উপরে বসে আছেন তিনি কি আমার ঐ ভোগ করেছিলাম বলে চিরদিনের জন্য নরকে পাঠিয়ে দেবেন? নিজেকে তখন কেমন একটা অসহায় মনে হয়, ঈশ্বরের নিদানকে খুব কঠোর মনে হয়। আরও বাজে ব্যাপার, একটা শিশু খুব খারাপ কোন রোগ নিয়ে জন্ম নিয়েছে। কিছু দিন আগে খবরের কাগজে বেরিয়েছে ইংল্যাণ্ডে বারো চোদ্দ বছরের একটি বাচ্চা ঠাকুরমার কোলে মারা গেল যার ফিজিক্যাল বয়স হল একশ তিন বছর। কি একটা জেনেটিক ব্যাধি হয় যাতে রোগীর চার গুণ করে বয়স বাড়তে থাকে। একটা বাচ্চা জন্ম নিল, জন্ম নিয়ে কিছু দিন পর সে তার মায়ের বয়সকে অতিক্রম করে গেল, তারপর তার ঠাকুরমার বয়সকেও অতিক্রম করে গেল, তারপর মরে গেল। ভগবান কেন তাকে এই দুঃখ-কষ্ট দিয়ে সৃষ্টি করলেন? সারাটা জীবন সে তার রোগের বিরুদ্ধেই লড়াই করতেই কাটিয় দিল! আরেকজনকে বড়লোকের বাড়ির ছেলে করে পাঠিয়ে দিলেন, যার অঢেল সুখ, সৌন্দর্য সবই আছে। ভগবানের এই বৈষম্য দোষ কেন? যারা Personal God মানে, ঈশ্বরের ইচ্ছাকে মানে তাদের কাছে এসব প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। আমাদের কাছে কোন সমস্যা নেই, তুমি এই রকমটি করেছিলে তাই আজ তোমার এই রকমটি হয়েছে। তুমি যদি ভালো কিছু করতে থাক তাহলে আগামী জন্মে কিছু শোধরাবে, এক জন্মে হয়ত শোধরাবে না, ঠিক হতে চার পাঁচ জন্ম লেগে যাবে।

এই কথাই যমরাজ বলছেন, *সংসারং চাধিগচ্ছতি*, সংসারের মধ্যে বারবার ঘুরঘুর করতে থাকে। এখান থেকে সে আর বেরোতে পারে না। কেন পারে না? তিন জায়গায় তার বিরাট ঘাটতি রয়ে গেছে, অবিজ্ঞানবান্, অমনস্ক আর অশুচি। তুমি শুচিতে থাকতে পার কিন্তু তোমার মনে চাঞ্চল্য আছে, মন তোমার নিয়ন্ত্রণে কিন্তু বুদ্ধি নিয়ন্ত্রণে নেই, তোমাকে সংসারের পারে নিয়ে যেতে পারবে না, ঘুরিয়ে সংসারে এনে ফেলে দেবে। তিনটের একটাতে গোলমাল থাকলেই বাকি দুটোতেও দোষ এসে যাবে। যদিও আমরা বলি বুদ্ধি মনকে নিয়ন্ত্রণ করে, মন ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু যার ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণে নেই, উপর পর্যন্ত তার কিছুই নিয়ন্ত্রণে নেই। ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণে থাকা মানে অন্য সব কিছু নিয়ন্ত্রণে থাকবে তা নয়। আগের বল্লীতে *নাবারিতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো* মন্ত্রে দেখাচ্ছেন যে দুশ্চরিত্র ইন্দ্রিয় তার নিয়ন্ত্রণে নেই, কিন্তু সব কিছু নিয়ন্ত্রণে হয়ে যাওয়ার পর এখন সে নিজেকে বিরাট মহাত্মা মনে করছে আর শুধু চিন্তা করে যাচ্ছে আমার কবে জ্ঞান হবে, কবে সব কিছুর অবসান হবে, এই জগৎ আর কত দিন চলবে! সব কিছুকে দাঁড়িপাল্লা দিয়ে লাভ-লোকসানের হিসাব করে যাচ্ছে। যে বলছে আমার কবে হবে এরাই বেণে বুদ্ধির, এদের কোন দিনই হবে না, সংসারে ঘুরে ঘুরে আসতে থাকবে। কিন্তু অন্য দিকে সব কিছুতে সংযত, নিয়মিত শাস্ত্র পড়ছে কিন্তু বুদ্ধিটা গোলমাল হয়ে আছে, সেইজন্য হিসাব করে যাচ্ছে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই অন্য রকম হয়ে যাবে, যার কথা পরের মন্ত্রে বলছেন –

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে।।১/৩/৮।।

(কিন্তু যিনি বিবেকবুদ্ধি রূপ সারথির সাথে যুক্ত এবং সংযতমনা ও সর্বদা পবিত্র, তিনি সেই পদই প্রাপ্ত হন, যেখান থেকে তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না।)

এখানে তার বিপরীত বলছেন, তাঁর নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। *ভবতি সমনস্কঃ*, অমনস্কের বিপরীত সমনস্ক, মন সম্পূর্ণ বশে আর *সদা শুচিঃ*, কখনই ইন্দ্রিয়বর্গকে স্বাধীনতা দেবেন না, যতটুকু দরকার ততটুকুই ইন্দ্রিয়কে করার ছাড় দেন। তাহলে তাঁর কি হয়? *স তু তৎ পদমাপ্নোতি*, সেই পদ তাঁরা পেয়ে যান। কোন পদ পেয়ে যান? *যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে*, যে পদ পেয়ে গেলে আর ওখান থেকে জন্ম নিতে হবে না। *যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে* এই জিনিষটাকেই যদি ইসলাম, খ্রীষ্টান, জুদাই, পার্সি ধর্মে বলা হয় তাহলে প্রশ্ন হবে ওখান থেকে জন্ম নিতে হবে না ঠিকই, কিন্তু তাহলে কোথায় থাকবে? এইসব ধর্ম বলবে চিরদিনের জন্য হয় নরকে বা স্বর্গে থাকবে। আমরা এটা মানি না। আমরাও বলছি তোমাকে আর আসতে হবে না, যেমন এখানে বলছেন তাঁকে আর জন্ম নিতে হবে না। কিন্তু স্বর্গই হোক আর নরকই হোক সবই অস্থায়ী, চিরদিনের জন্য কিছু হয় না। যখন সেই একত্বের অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, এখানে সেই অবস্থাকে পদ বলছেন, সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না। কিন্তু তার আগে তিনটে জিনিষ চাই, ইন্দ্রিয়ের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, মনের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আর বুদ্ধির উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। লোভ, প্রলোভনের দিকে মন যাবে না, মনের মধ্যে কোন সংশয় থাকবে না, সে জানে আমাকে এটাই করতে হবে আর বুদ্ধিতেও চাঞ্চল্য এই অর্থে আসবে না যে, আমি এত সৎ লোক, আমি এত ভালো লোক, ঠাকুরের উপর সব ছেড়ে দেয়েছি তাতেও আমার কেন এই রকম হচ্ছে, বা এই অস্থিরতা কবে আমি তাঁর দেখা পাব, কবে আমার জ্ঞান হবে, কবে আমি মুক্তি পাব ইত্যাদি। যাদের ভেতরে এই অস্থিরতা থাকবে তাদের দ্বারাও *স তু তৎ পদমাপ্নোতি* হবে না। কিন্তু যাঁরা মনেরও পারে চলে যান এটাই তখন তাঁদের জীবনচর্চা হয়ে যায়, আধ্যাত্মিকতাই তখন তাঁর জীবন ধারা। তাঁর কাছে পথ আর লক্ষ্য দুটো আলাদা নয়, লক্ষ্যটাই পথ পথটাই লক্ষ্য হয়ে যায়।

আমাদের জীবনের লক্ষ্য কি? ভালো করে বিচার করলে দেখা যাবে, আমরা জানিই না জীবনে আমরা কি চাইছি। জীবনটা যেন নদীর জলধারার মতে প্রবাহিত হয়ে চলে যাচ্ছে। পাশের লোক বা পাড়ার লোক কিছু করছে আমাকেও কিছু করতে হবে, কিন্তু একবারও ভেবে দেখি না, আমি কি করছি, কেন করছি, কি করতে চাইছি। 'আমি আত্মজ্ঞান পেতে চাই'। 'আপনার কাছে আত্মজ্ঞানের পরিভাষা কি'? 'আমিই সব কিছু হয়েছি'। 'সেটা জেনে আপনার কি হবে'? 'তখন কাউকে হিংসা দ্বেষ করব না, কোন কিছুর জন্য শোক মোহ হবে না'। 'এরজন্য আত্মজ্ঞানের কি দরকার! এখন থেকেই শুরু করে দিচ্ছেন না কেন, আপনাকে তো কেউ আটকাচ্ছে না'। আমরা নিত্য ঠাকুরের জপ করছি, কৃষ্ণ, ঠাকুর থেকে শুরু করে কত রকম ঠাকুরের পূজো করছি, কিন্তু কারুর ভেতর থেকে হিংসা, দ্বেষ, শোক, মোহ কোনটাই বিদায় নিচ্ছে না। আসলে বাসন মাজা, কাপড় কাচার মতই ঠাকুরের পূজা, জপ করাটাও আমাদের একটা রুটিন মাফিক কাজ হয়ে গেছে। অথচ বাসন মাজা, কাপড় কাচা আর ঠাকুরের পূজার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। বাসন মাজছি তারই মধ্যে ঠাকুরের নাম জপ হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরকে দেখা মানে তিনিই সব কিছু হয়েছেন। সব কিছুর মধ্যে ঠাকুরকে দেখার চেষ্টা আমরা একবারও করি না। বাড়িতে ঝগড়া হচ্ছে, তখন দেখছি এটাও তো ঠাকুরেরই রূপ। যদি আমি ঠাকুরকে সত্যিই ভালোবাসি, যদি ঠাকুরকে সত্যিই পেতে চাই তাহলে আমাকে এভাবেই অনুশীলন করতে হবে। সেইজন্য লক্ষ্য আর পথ দুটো আলাদা করে কিছু হয় না। যাই হোক এখানে বলছেন তিনি সেই পদ পেয়ে যান যেখান থেকে আর তাঁকে জন্ম গ্রহণ করতে হয় না। পরের মন্ত্রে রথ রূপকের উপসংহার করছেন –

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপগ্রহবান্ নরঃ।
সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।।১/৩/৯।।

(অধিকন্তু যে রথী ব্যক্তি বিবেকবুদ্ধিরূপ সারথিযুক্ত, যাঁর মন বল্গাস্বরূপ তিনিএই জন্ম-মৃত্যুরূপ মার্গের পারে সর্বব্যাপক চৈতন্যের সেই শ্রেষ্ঠ স্থান অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব লাভ করেন।)

এতক্ষণ রথ রূপককে নিয়ে যে আলোচনা চলছিল এই মন্ত্রে সেই আলোচনার পরিসমাপ্তি করছেন। এর অর্থ খুব সহজ, যাঁর সারথি বিজ্ঞানবান, মন যাঁর নিয়ন্ত্রণে তিনিই সেই পরম পদ প্রাপ্ত হন। আত্মজ্ঞান উপলব্ধির জন্য যে কিছু কিছু প্রাক-শর্ত আছে সেগুলোর ব্যাপারে আমাদের সচেতন করে দিচ্ছেন। যোগ সাধনার ক্ষেত্রে সাধক যেমনটি আছে তাকে ঠিক তেমনটি গ্রহণ করে সেই অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে উপরের দিকে টেনে নিয়ে

যাওয়া হয়। আমাদের কতকগুলি প্রচলিত ধারণা চলে আসছে যেমন, ঈশ্বর যাকে বেছে নেন, যাদের সংস্কার আছে বা যাঁরা সন্ন্যাস ধর্ম নিয়েছেন, যাঁরা ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম নিয়েছেন, এই ধরণের সমস্ত প্রচলিত ধারণাকে এখানে বাতিল করে দেওয়া হল। এখানে আমি আপনি যেমনটি আছি ঠিক তেমনটি ধরছেন। পাঁচ থেকে আট এই চারটি মন্ত্র, নবম মন্ত্রকেও নেওয়া যায় কিন্তু নবম মন্ত্রে একটু তফাৎ আছে, এই পাঁচটি মন্ত্রে আমাদের জীবন যাত্রা আর আধ্যাত্মিক যাত্রা, আধ্যাত্মিক যাত্রাকেও যদি জীবন যাত্রার মধ্যে গণ্য করা হয় তাহলে সমগ্র জীবন যাত্রাকেই এখানে চারটি জিনিষ রথ, ঘোড়া, লাগাম আর সারথি দিয়ে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়েছে। রথের যিনি আরোহী তাঁর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে না, এর পরেই রথের আরোহীকে অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ নিয়েও আলোচনা করবেন। একটা স্তরে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছিল আত্মা, ঈশ্বর অনেক কিছুই বলা হয় কিন্তু সাধক আর সাধনার উপর বেশি আলোকপাত করা হয় না। এখানে সেটাই রথের রূপক দিয়ে ব্যাখ্যা করে দিলেন।

রথ রূপকের চারটি জিনিষ গুরুত্বপূর্ণ, প্রথম রথ নিজে, দ্বিতীয় রথের অশ্ব, তৃতীয় তার লাগাম আর রথের সারথি। রথ মানে শরীর, অশ্ব হল ইন্দ্রিয় সমুদয়, লাগাম মন আর সারথি হল বুদ্ধি। এই চারটেই ঠিক থাকতে হবে, এই চারটের একটা যদি দুর্বল থাকে তাহলে সে আর এগোতে পারবে না। সাধু-সন্ন্যাসীদেরও তাঁদের শরীর খুব মজবুত রাখতে হয়। দুর্বল শরীর, ব্যাধিগ্রস্ত শরীর দিয়ে কিছু করা যাবে না। পরে সাধন ভজন করতে করতে বা জীবন চালাতে গিয়ে শরীরটা ভেঙে যাচ্ছে সেদিকে তাঁরা আর বেশি নজর দেন না। শরীর যদি চাবুকের মত মজবুত ও ব্যাধি মুক্ত না থাকে, ইন্দ্রিয় যদি তীক্ষ্ণ না থাকে, ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে দুটোই দরকার তীক্ষ্ণ হবে আর অন্য দিকে নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে, এই না হলে সাধক সাধনার জীবনের কঠোরতার ধকল নিতেই পারবে না। প্রথমটাই হল শরীর, সুস্থ সবল শরীর না হলে আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য বিবেচিতই হবে না। স্বামীজী মঠ মিশনের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের জন্য অনেক নিয়ম করে দিয়ে গেছেন, তার মধ্যে একটা নিয়ম হল প্রতিদিন সবাইকে খেলাধুলো, শরীরচর্চা করতে হবে। মজবুত শরীর আর শক্তিশালী ইন্দ্রিয় তৈরী করতে হবে। কিন্তু মনকে তার থেকেও শক্তিশালী হতে হবে, যে মন ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

কঠোপনিষদ স্বামীজীর খুব প্রিয় ছিল, কঠোপনিষদের অনেক উপমা তিনি বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছেন। স্বামীজী বলছেন দুর্দান্ত ঘোড়ার শক্তি বেশি নাকি ঐ অশ্বারোহী যে নিজের ইচ্ছে মত সেই ঘোড়াকে চালিত করছেন তাঁর শক্তি বেশি! ঘোড়ার সওয়ার, যে দুর্দান্ত ঘোড়াকে বশে রেখেছে তার শক্তি অনেক বেশি। আলেকজাণ্ডারের ঘোড়া বাক্কাস এমনই দুর্দান্ত ঘোড়া ছিল যে কাউকে কাছে আসতে দিত না। আলেকজাণ্ডারের বয়স তখন বারো বছর, কিন্তু তিনি ঐ ঘোড়াকে বাগে নিয়ে এলেন। কাহিনীতে বলে যে, ঘোড়াটা বিশাল বড় ছিল। সূর্যের দিকে পেছন করে দাঁড়িয়েছিল, নিজের বিশাল ছায়াকে দেখে ঘোড়াটা ঘাবড়ে যাচ্ছিল। আলেকজাণ্ডার বুঝতে পেরেছিল, তিনি এসে ঘোড়ার মুখটা সূর্যের দিকে করে দিলেন, ছায়াটা পেছনে চলে গেল। তাতেই ঘোড়ার ভয় অনেকটা কমে গেল। ঘোড়াটা দুরন্ত, সে দৌড়াচ্ছে, কিন্তু আলেকজাণ্ডারের ক্ষমতা তার থেকে অনেক বেশি, ঐ ঘোড়াকেও তিনি বাগে নিয়ে এসেছেন। উপনিষদ এখানে শক্তির কথা বলছেন। ঠাকুর বলছেন ফোঁস করবি কিন্তু বিষ ঢালবি না। ভেতরে এমন শক্তি যে একবার শুধু ফোঁস করেছে তাতেই সবাই জেনে যাবে তার ভেতরটা কেমন। বিষ ঢালার কোন প্রশ্নই নেই। এই শক্তির মধ্যে কোন অহঙ্কার থাকবে না, কোন ধরণের স্বার্থ বুদ্ধি প্রয়োগের ইচ্ছে থাকবে না। সবটাই তার শুভদায়ক, কিন্তু প্রত্যেক পদক্ষেপে শক্তি বিচ্ছুরিত হবে। আমেরিকায় স্বামীজীর একটা ঘটনা আছে। ওখানে একটা জাহাজ লঞ্চ হচ্ছিল। তখনকার দিনে জাহাজ লঞ্চ দেখার জন্য দর্শকরা একটা নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত গিয়ে দেখতে পারত। স্বামীজী খুব ইচ্ছে হল কাছে গিয়ে দেখা। তিনি হাঁটতে হাঁটতে ঐ নির্দিষ্ট ঘেরা জায়গাটা পার করে এগিয়ে গেছেন। একেবারে কাছে গিয়ে তিনি জাহাজ লঞ্চ করা দেখলেন। যাঁরা স্মৃতিকথা লিখেছেন তাঁরা লিখছেন স্বামীজীর হাঁটা চলা সবেতে এমন একটা রাজকীয় তেজস্বিতা ছিল যে কেউ তাঁকে বাধা দিতে এগিয়ে এল না। এই হল ক্ষমতা, আশেপাশের সব শক্তি নিজে থেকেই দমে যাচ্ছে, সবাই দেখেই তাঁকে সমীহ করছে।

শরীর প্রাণশক্তিতে সতেজ, ইন্দ্রিয়ও তেমনি তীক্ষ্ণ আর মনটাও তেমনি, মন একবার শুধু ইন্দ্রিয়কে না বলে দিয়েছে, এরপর আর ইন্দ্রিয় এগোতে পারবে না। স্বামীজীর জীবনেই একটা ঘটনার বিবরণ আছে,

স্বামীজীকে কোন কবিরাজী ওষুধ দেওয়া হয়েছিল, যার জন্য জল খাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ ছিল। কেউ একজন বললেন, জল না খেয়ে থাকবেন কি করে! স্বামীজী বললেন, দাও। বলেই পুরো জলটা ঢক ঢক করে পান করে সঙ্গে সঙ্গে আবার মুখ দিয়ে বার করে দিলেন। যতটা জল ভেতরে নিয়েছিলেন ততটাই জল বার করে দিলেন। মনের উপর স্বামীজীর এত নিয়ন্ত্রণ যে ইন্দ্রিয় আর সেটাকে নিতে পারছে না। এগুলো শুনলে আমাদের বিশ্বাস হতে চায় না। বিশ্বাস না হোক তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু আমরা জানি একজন মহাপুরুষ আর একজন সাধারণ মানুষের মধ্যে তফাৎ হল ইন্দ্রিয়ের। ঠাকুর কাহিনী বলছেন, দুজন চাষী খাল কেটে ক্ষেতে জল আনবে। খাল কাটতে শুরু করেছে। একজন চাষীর স্ত্রী এসে বলল 'আর কত খাল কাটবে, তোমার অত বাড়াবাড়ি না করলেও চলবে, চলো তেল মেখে স্নান করে খেয়ে নাও'। সেই চাষী বলছে 'তুই যখন বলছিস তাহলে চল'। আরেক চাষীর স্ত্রীও একই কথা বলাতে সে রেগেমেগে স্ত্রীকে বলছে 'খেপী তোকে আজ কেটেই ফেলব, জানিস না চাষ না হলে না খেয়ে মরতে হবে'! কথামৃতে এই গল্প আমরা সবাই পড়েছি। এই হল মনের জোর। আর সব শেষে বুদ্ধি। বুদ্ধি শুদ্ধ হয়ে গেলে বুদ্ধিই আত্মা হয়ে যায়। অশুদ্ধ বুদ্ধির একটা দিক হল, কার্যে প্রয়োগ করার ক্ষমতা কম, আরেকটি দিক হল একটা অস্থিরতার ভাব থাকে, কবে হবে, এত কিছু করলাম তাও কিছু হলো না এই ধরণের ছটফটানিটা থাকে। আমাদের প্রায়ই শুনতে হয় 'এত তো তুমি ঠাকুরকে ভক্তি করলে তাও তো কিছু হল না' কিংবা 'এত দিন তো আমি সৎ ছিলাম কই কিছুই তো হলো না'। এখানে তা নয়, আমি যা কিছু করছি কোন ফলের আশা নিয়ে করছি না। জীবন যাত্রাতে এই চারটের মধ্যে একটা যদি দুর্বল থাকে তাহলে সমস্যায় পড়তে হবে। চারটেই যদি সবল থাকে, চারটেই যদি একসাথে সমান ভাবে, সমান তালে চলে তবেই জীবনে সাফল্য আসবে। জীবনে কোন সমস্যা যদি থাকে, জীবনে যদি কোন দুঃখ-কষ্ট থাকে, ভালো করে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এই কটি মন্ত্রে যা যা বলা হয়েছে সেগুলোকে যেখানে যেখানে মানা হয়নি সেখানেই দুঃখ-কষ্ট আর সমস্যা এসেছে। হয় তার শরীর দুর্বল ছিল বলে কষ্ট পেয়েছে, নয়ত ইন্দ্রিয় দুর্বল ছিল, নয়তো মন দুর্বল ছিল, নাহলে বুদ্ধি দুর্বল ছিল। প্রত্যেকটি দুঃখ-কষ্টের পেছনে এই কটি জিনিষের দুর্বলতাই দায়ী, অথচ সারাটা জীবন নিজের কষ্টের জন্য অপরকে দোষারোপ করে এসেছে। জগতে খুব কম লোক আছেন যাঁরা সব দোষ নিজের উপর টেনে নিতে পারেন। নিজের কাঁধে যিনি সব দোষ নিতে পারেন তিনিই তো মহাপুরুষ। কিন্তু সবাই আমরা দুর্বল, দুর্বল বলেই অপরকে দোষ দিচ্ছি। স্বামীজী বারবার বলছেন শক্তি শক্তি, উপনিষদ শুধু শক্তির কথা বলছেন, মাভৈঃ মাভৈঃ। স্বামীজী তাই প্রার্থনা করছেন, হে জগদম্বা! আমাদের কাপুরুষতা দূর কর, আমাদের দুর্বলতা দূর কর। কারণ আমাদের শরীর দুর্বল, ইন্দ্রিয় দুর্বল, মন দুর্বল আর বুদ্ধি দুর্বল। আমাদের সমস্যারও তাই অন্ত নেই। সমস্যা মানেই অপরের উপর দোষারোপ শুরু হয়ে যায়। যখন কারুর ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারে না তখন সব দোষ ভগবানের উপর চাপিয়ে দেয়। সব জল শেষে সমুদ্রেই যায়, যেখানকার যত দোষ সব ভগবানের ঘাড়ে যায় আর ভালো যত সব নিজের উপর নিয়ে নেয়। সবার সামনে খোলাখুলি অকপটে নিজের দোষ স্বীকার করার ক্ষমতাই মহাপুরুষের লক্ষণ। যিনি মহাপুরুষ তাঁর কখন দুঃখ-কষ্টের অনুভবই হবে না, কারণ চারটে জিনিষেই তিনি শক্তিমান। হ্যাঁ, একটা কিছু করছিল সেখান থেকে কিছু ভুল হয়ে গেছে। কি করছিল, কি হয়ে গেছে এটাই এখানে ব্যাখ্যা করছেন।

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু, বিজ্ঞান অর্থাৎ বিবেকযুক্ত পুরুষ, তাঁর বুদ্ধি বিবেকে পরিপূর্ণ। *মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ*, মন একেবারে সমাহিত, সম্পূর্ণ একাগ্র মন। ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এরা আগে আমরা আলোচনা করেছি। *প্রগ্রহবান*কে আচার্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন *প্রগৃহীতমনাঃ সমাহিতচিত্তঃ*, সমাহিত চিত্ত মানে মনকে যখন একটা বিষয়ের উপর একাগ্র করে রাখা হয়। সমাহিত চিত্ত কি, মানুষ কেন অসংযত চিত্ত হয়, কেন সমাহিত চিত্ত হতে পারে না, এগুলো ভালো করে বোঝা দরকার। খুবই সহজ ব্যাপার, একটি ছেলে যখন কোন মেয়েকে সত্যিকারের প্রচণ্ড ভালোবাসে ছেলেটির কাছে তখন জগৎ ভুল হয়ে যায়। ছেলেটি যদি সত্যিই ভালোবাসে তাহলে সে অন্য কোন মেয়ের দিকে কখনই আর তাকাবে না। আমাদের জীবনে এটাই মূল সমস্যা, অন্য কোন সমস্যা নেই। জগতে সবারই এই একটাই সমস্যা, কেউই সমাহিত চিত্ত নয়। আমরা কেউ জানি না জীবনে আমরা কি চাইছি। সমাহিত চিত্ত মানে, আমি এটাই চাই, এর বাইরে আমার আর কিছু লাগবে না। যে বলছে আমি এটাই চাই তার আর চিত্ত অসংযত হবে না। আধ্যাত্মিকতার সমস্ত কিছু, শুধু আধ্যাত্মিকতাতেই নয়, জীবনের যে কোন সাফল্যের জন্য একটাই কথা – You have to have a very clear idea what you

want in your life। জীবনের কোন স্পষ্ট লক্ষ্য নেই বলে আমরা মার খাচ্ছি। সব কিছুকে গুটিয়ে নিয়ে আসার পর আমাদের জীবনের সাধনা চারটে জিনিষে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায় – বিদ্যা, সম্পদ, সেবা ও ত্যাগ। বিদ্যা, আমি নিজেকে যে কোন একটা বিদ্যার প্রতি সমর্পিত করলাম বা সম্পদ, আমি দেশের সম্পদ তৈরী করছি বা সেবা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সবারই প্রতি আমি সেবার আদর্শ নিলাম, আমি ভাব কোথাও নেই অথবা ত্যাগ, ঈশ্বরের জন্য বা আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য আমি আমার সর্বস্ব ত্যাগ করলাম।

আগেকার দিনে এই চারটেই অন্য রূপে ছিল, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। কিন্তু ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষতে একটু তফাৎ এসে যায়, বর্তমান যুগে বিদ্যা, সম্পদ, সেবা ও ত্যাগ এই চারটেই যুগোপযোগী। এখন ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ঠিক ঠিক ভাবে এই যুগে দাঁড়ায় না। ধর্ম, অর্থাদি এই চারটেকে অনুসরণ করলে যাঁরা আইনস্টাইনের মত বড় পণ্ডিত তাঁদের জন্য আর কোন পুরুষার্থ থাকছে না, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্য কোন লক্ষ্য থাকছে না। কিন্তু বিদ্যা, সম্পদ, সেবা ও ত্যাগে সবারই লক্ষ্য এসে যাবে। ধর্ম, অর্থাদি চারটে অনেক আগেকার তত্ত্ব, এই চারটে ছিল শুধু ধর্মজীবনকে কেন্দ্র করে, আর তখনকার দিনে যাঁরা ধর্মজীবন অতিবাহিত করতে চাইতেন তাঁরাই এই চারটের মধ্যে যে কোন একটি বা একের অধিকে নিজেকে বেঁধে রাখতেন। কিন্তু যদি কেউ নিজেকে পুরোপুরি বিদ্যার প্রতি সমর্পিত করে দেয়, যদি কেউ বলে দেশের সম্পদ তৈরী করার জন্য আমি নিজেকে উৎসর্গ করে দেব বা সেবার প্রতি আমি নিজেকে সমর্পিত করলাম বা ঈশ্বরের জন্য আমি পূর্ণ ত্যাগে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলাম, এরপর তার আর কখনই অসমাহিত চিত্ত হবে না। এই যে আচার্য বলছেন *প্রগৃহীতমনাঃ সমাহিতচিত্তঃ*, তার মানে I want this, এরপর তার আর কখনই অসমাহিত চিত্ত হবে না। ওখানে শুধু বিজ্ঞানবান্ কেন বলছেন? তোমার এই চাঞ্চল্য যাতে না হয়, আমার কবে হবে, এই এতটুকু। ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্যের মূলে এই একটাই কারণ, আমাদের স্পষ্ট ধারণা নেই আমি জীবনে কি চাইছি, এর থেকেও বাজে হল চার জায়গা থেকে আমরা শুনে একটা ঠিক করে নিয়ে নিয়েছি, কিন্তু আমরা ওটা চাই না। আমরা কি চাইছি? মৌজমস্তি। মৌজমস্তি তো কখন জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না।

সমাহিত চিত্ত মানে সারা জীবনই সমাহিত চিত্ত। এমনকি মৃত্যু শয্যায়েও সমাহিত চিত্তের অনুশীলন করছেন। বিজ্ঞানবান্ মৃত্যু শয্যাতেও তাই অনুশীলন করেন। এর আগে দ্বিতীয় বল্লীতে আমরা অর্কিমিডিসের কাহিনী বলেছিলাম। অর্কিমিডিস মরতে যাচ্ছেন তখনও তিনি বলছেন জ্যামিতির এই ফিগারগুলো যেন নষ্ট না হয়। ঠিক তেমনি ফরাসীর একজন নামকরা গাণিতজ্ঞ Evariste Galois, মাত্র কুড়ি বছরে মারা যান। তৎকালীন ফ্রান্সে ডুয়েলে প্রথা ছিল, এক অপরকে চ্যালেঞ্জ করবে, লড়াই হবে, একজন আরেকজনকে গুলি করে মারবে। কিন্তু Evariste Galois গুলিগালা, মারামারিতে কোনদিনই অভ্যস্ত ছিলেন না। কিন্তু কিছু ভুল বোঝাবুঝিতে এই গাণিতজ্ঞকে একজন চ্যালেঞ্জ করে দিয়েছে। তখনকার দিনে ফ্রান্সে কেউ যদি চ্যালেঞ্জ করে দেয় তাকে সেই চ্যালঞ্জ গ্রহণ করে নিতে হবে। কিন্তু রাজার তরফ থেকে এসব নিষেধ ছিল। সন্ধ্যেবেলা চ্যালেঞ্জ হয়েছে, সকালে ডুয়েল হবে আর তাঁর নিজের ভাই এ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে যাবে। Galois নিজের ভাইকে বলছে আমার জীবনের আর সাত আট ঘণ্টা সময় অবশিষ্ট। এরপর সারাটি রাত তিনি গণিতের একটা নামকরা থিয়োরীর উপর কাজ করতে থেকে গেলেন। সারা রাত কোন খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, ঘুম নেই ঐ থিয়োরীর উপর কাজ করে যাচ্ছেন। কারণ তিনি জানেন, ভোর হবে আমাকে ডুয়েলে লড়তে যেতে হবে। ইনি গুলি তাগ করতেও জানেন না, প্রতিপক্ষ দক্ষ বন্দুকবাজ। ভাই কাঁদছে, অনেক চেষ্টা করে যাচ্ছে যদি কোন ভাবে দাদাকে বাঁচানো যায়। কিন্তু তিনি বলে যাচ্ছেন, ভদ্রলোকের এক কথা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ঐ থিয়োরির উপর কাজ করে গেছেন। কাজ শেষ করে ভাইকে বলে দিলেন, এই থিয়োরীটা সামলে রাখবে। এরপর বেরিয়ে গেলেন, তাই হল, প্রতিপক্ষ গুলি চালাল তিনিও মারা গেলেন। এই হল সমাহিত চিত্ত, বিদ্যার প্রতি সম্পূর্ণ ভাবে এমন সমর্পিত যে, নিজের শরীরের বিশ্রাম, খাওয়া-দাওয়ার প্রতি কোন দৃষ্টি নেই, মৃত্যুর প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। আমাদের সমস্যা হল আমাদের জীবন চলছে একমাত্র শরীরের সুখ আর ইন্দ্রিয়ের ভোগকে কেন্দ্র করে। এর বাইরে আমরা আর কিছু ভাবতেই পারি না। এই শরীরটাও একটা কিছুর জন্য, ইন্দ্রিয়ের সুখও কিছুর জন্য, সেইজন্য মানুষ সমাহিত চিত্ত হয় না। কিন্তু যে ঠিক করে নিয়েছে আমি আত্মজ্ঞানের দিকে এগোচ্ছি বা ঈশ্বরের দিকে এগোচ্ছি, তার কখনই অসমাহিত চিত্ত হবে না। বিশ্বামিত্র ঋষি বা অন্যান্য ঋষিদের যেসব কাহিনী শুনে আসছি, এগুলো কাহিনীই, বাস্তবে এই জিনিষ কখনই হতে পারে না।

বিশ্বামিত্রের সাথে মেনকার যে গোলমাল হয়েছিল তখন তিনি আদৌ ঋষির পদমর্যাদায় যাননি। যে কোন সাধু, সন্ন্যাসীদের যা কিছু গোলমাল হয় তার মানে তখনও তাঁর কাছে সব কিছু পরিষ্কার হয়নি। যে একবার পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর বলছে আমার ঈশ্বর জ্ঞানই চাই, আমার আত্মজ্ঞান চাইই চাই, তার কিসের গোলমাল হবে! কোন প্রশ্নই নেই। জাগতিক জীবনে একটা মানুষ একটা মেয়েকে ভালোবাসলে অন্য মেয়ের দিকে তাকায় না, সেখানে যে মানুষ একবার ভগবানের দিকে ঘুরে গেছে সে কি আর কখন অন্য দিকে তাকাতে পারবে! ভোগের দিকে তার দৃষ্টি যাবে তা কি কখন সম্ভব! সেইজন্য বলছেন *সমনস্কঃ*, সেইজন্য এখানে বলছেন *মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ*, সংযত চিত্ত।

তার ফলে কি হয়? এই ধরণের যিনি বিজ্ঞানবান্, যিনি একেবারে পবিত্র, *সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি*, সংসারের যে গতি, জন্ম-মৃত্যুর যে গতি, তিনি এই গতির পারে চলে যান। পারে চলে যাওয়ার পর কি পান? *তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্*। সংসারের যত রকম বন্ধন আছে সব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তিনি সেই বিষ্ণুকে পান, যিনি পরমপদ। *তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্*, এই অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরণের মন্ত্র যেখানে যেখানে এসেছে সেখানে সেখানে রামানুজমরা খুব জোর দিয়েছেন। ওনার বলছেন, উপনিষদই তো বলছেন *তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্*, বিষ্ণুই শেষ কথা। আচার্য এটাকেই ভাষ্যে বলছেন – *তদ্বিষ্ণোঃ ব্যাপনশীলস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনোঃ বাসুদেবাখ্যস্য*। পরম্পরাতে আমরা দুজন বিষ্ণুকে জানি, দ্বাদশাদিত্যের ইন্দ্রাদি দেবতাদের মধ্যে একজন দেবতা হলেন বিষ্ণু, যিনি বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারতেন। পরের দিকে এসে এই বিষ্ণুকে ভগবানের সাথে এক করে দেওয়া হয়েছে। সেই ভগবান বিষ্ণুর কথা বেদেই এসেছে, উরুক্রম যাঁর নাম, যিনি লম্বা লম্বা পা ফেলতে পারেন, যিনি দু পায়ে সমস্ত ত্রিলোককে মেপে নিয়েছিলেন। মুশকিল হল, বিষ্ণু শব্দকে ব্যাকারণগত ভাবে ব্যাখ্যা করলে এক রকম হয়ে যায় আবার শব্দের ব্যুৎপত্তিগত ভাবে করলে অন্য রকম হয়ে যায়। আমাদের পরম্পরাতে হুটহাট করে কোন নাম দেওয়া হয় না, সংস্কৃতে তো কোন ভাবেই হবে না। সংস্কৃতে কোন কিছুর নামকরণের সময় তার যা যা গুণ আছে সেই গুণকে আধার করে নাম দেওয়া হয়। বিষ্ণু শব্দের অর্থ যিনি ব্যাপনশীল, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যিনি বিভু রূপে ছড়িয়ে আছেন। আচার্য এখানে যোগ করছেন বাসুদেব, বাসুদেব শব্দের অর্থও তাই, যিনি সব কিছুতে বাস করেন, তাই বিষ্ণুও যা বাসুদেবও তাই। বাসুদেব আবার শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম। যার ফলে বসুদেব, বাসুদেব, বিষ্ণু, কৃষ্ণ সব এক করে একজনকেই বলা হতে থাকল। ভাগবতেও তাই বলছেন *কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং*। এমনি কোন হঠাৎ করে বলে দিচ্ছেন না, উপনিষদই বলছেন *তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্*। পরম পদ কেন? কারণ সেখানে গিয়ে আর ফিরে আসতে হয় না। ফেরত আসবেনই বা কোথা থেকে! যিনি অখণ্ডত্বে প্রতিষ্ঠিত, তিনি কি করে আর কোথায় ফেরত আসবেন! যেখানেই খণ্ড সেইখানেই পরিবর্তন হয়। আমরা যে খাবার খাচ্ছি, সেখানে ভাত আছে, ডাল আছে, সব্জীও আছে, খাওয়ার সময় একটু ওখান থেকে একটু এখান থেকে খাই, কারণ সবটাই খণ্ডিত। কিন্তু পুরো জিনিষটাই যখন এক হয়ে গেলে তখন কোথায় কি পাল্টাবে! পাল্টাবার তো কিছু নেই।

আত্মা বলতে আমি, এই আমি যতক্ষণ নিজেকে দেহ বলে মনে করবে ততক্ষণ সে একবার তাকে ভালোবাসবে, আবার তাকে ছেড়ে অন্য কাউকে ভালোবাসবে। মন কখন এটা পেয়ে আনন্দিত হবে কখন ওটা পেয়ে নিরানন্দ হবে। বুদ্ধিও ঠিক তাই। কিন্তু *তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্*, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে যিনি এক হয়ে গেলেন, তিনি কোথা থেকে কোথায় ফিরবেন। যুক্তিতেই দাঁড়াবে না। একবার সর্বব্যাপীর সাথে এক হয়ে গেলে এরপর তিনি যাবেনটা কোথায়, যাওয়ার কোন সুযোগই আর নেই। সেইজন্য বলছেন তাঁর কোন আসা-যাওয়া হয় না। আসা-যাওয়া বন্ধ করার জন্য প্রথমে জন্ম-মৃত্যু রূপী সংসারের পারে যেতে হবে। সংসারের পারে যেতে হলে দুটো চাই *বিজ্ঞানসারথির্যস্তু* আর *মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ*, সারথিকে বিজ্ঞানবান হতে হবে, সে জানে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল আর সেটাকে পালন করার ক্ষমতাও আছে, দ্বিতীয় *প্রগ্রহবান্ নরঃ*, সমাহিত চিত্ত। সমাহিত চিত্ত মানে তিনি এখন এক মন দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। এতে যে পতন নেই তা নয়, রথের সাথে ঘোড়া আছে, লাগাম আছে, বিষয়বস্তু আছে, এগুলো যে কোন সময় এদিক ওদিক করে দিতে পার, কিন্তু সে জানে আমাকে ওখানে যেতে হবে। অর্জুন ধনুর্বিদ্যা পরীক্ষা দেওয়ার সময় শুধু পাখির চোখ দেখছেন, আর কিছু দেখছেন না। সমাহিত চিত্তের জন্য আগে বুদ্ধি খুব শক্তিশালী হওয়া দরকার, বুদ্ধি শক্তিশালী না হলে কোন দিন সে সমাহিত চিত্ত হতেই পারবে না। আর অসমাহিত চিত্ত মাঝে মাঝে এদিক ওদিক মনকে ছেড়ে দিচ্ছে।

এই দুটো জিনিষ একেবারে পরিষ্কার থাকতে হবে – আমি আমার পথ বেছে নিয়েছি, আমি এবার চললাম। তার সাথে একমাত্র যে যন্ত্র বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিও যেন কোন ভাবে ডান দিক বাম দিক না করে। আচ্ছা এখন একটু বিশ্রাম করে নাও। কিন্তু না আমার এটাই পথ আমার আর কোন বিশ্রাম নেই। যিনি এভাবে আত্মজ্ঞানের দিকে এগিয়ে পড়েন তাঁর আর কোন কিছুর সাথে কোন ধরণের আপোষ হবে না।

যিনি খণ্ডিত তিনি খণ্ডের সাথে বাস করেন। ফলে এই শরীর থেকে এই শরীর, মনের এই অবস্থা থেকে সেই অবস্থায় যেতে থাকেন। কিন্তু যিনি অখণ্ড, পূর্ণ হয়ে গেলেন তাঁর আর কোথাও যাওয়ার সুযোগই নেই। বিষ্ণু, যিনি সর্বব্যাপী, তাঁর সাথে তিনি এক হয়ে যান। রথ রূপকের দ্বারা সংসার গতির বর্ণনা করা হয়েছে। যদি তার লক্ষ্য স্থির না থাকে মন চঞ্চল হবে, বুদ্ধি দুর্বল হবে। একবার যদি লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে যায়, পৌরুষের সাথে দৃঢ় হয়ে বলতে পারবে আমি এটাই চাই, তখন তার বাকি জিনিষগুলো খসে পড়ে থাকবে। সমস্যা সব সময় হয় লক্ষ্যকে নিয়ে। চারটে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে ছিটকে যাবে। কি চায়? নিজের ইন্দ্রিয় সুখ ছাড়া কিছুই চায় না, কিন্তু ইন্দ্রিয় সুখ আবার সুখ নাকি! ইন্দ্রিয় সুখ যদি সুখ হত সারা জীবন করা যেত। লক্ষ্য সেটাই হয় যেটা মানুষ মৃত্যু পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারবে। অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকবে তখনও করবে। মা যতই অসুস্থ থাকুক নিজের সন্তানের সেবা করেই যায়। মৃত্যু শয্যাতেও মা সন্তানের সেবাই করবে। আদর্শ বা লক্ষ্যের প্রতি এই রকম নিষ্ঠা থাকা চাই। কিন্তু মায়েরা নিজের সন্তান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সেবাতে যদি নেমে যায় এবার সে উপরের দিকে উঠে আসবে। ঠিক তেমনি বিদ্যা বা দেশের সম্পদ বৃদ্ধিতে নিজেকে সমর্পিত করে দিচ্ছে। এরপর কোন অবস্থাতেই, সুস্থ অবস্থাতেও কারুর সেবা নেব না, অসুস্থ অবস্থাতেও কারুর সেবা আমি নেব না। এই দৃঢ় সঙ্কল্প যদি হয়ে যায় তাহলে আর তার কোন দিন ডান দিক বাম দিক হবে না। সাধন জীবন কেমন হতে পারে তার একটা ধারণা এখানে দিয়ে দিলেন এবার তার ব্যবহারিক দিক দিয়ে দেখাবেন আধ্যাত্মিক উন্নতি যখন হয় তখন কিভাবে হয়।

উপনিষদ আত্মতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করে আত্মার স্বরূপকে প্রকাশিত করে দিচ্ছেন। পরের তিনটি মন্ত্রে সিদ্ধির যে পথ সেই পথের সংক্ষেপে বর্ণনা করছেন। সাধন জীবনে আসার জন্য কারা উপযুক্ত এর উপর ঠাকুর অনেক কথা বলছেন। কথামৃতে যদিও এক জায়গাতে কথাগুলি গুছিয়ে বলা নেই, ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। প্রথম সাতটি মন্ত্রে সাধনার পদ্ধতি নিয়ে বললেন। আর সাধনাতে যখন এগোতে শুরু করেন তখন সাধক কি করে বুঝবেন যে সিদ্ধি আসা শুরু হয়েছে? কথামৃতে ঠাকুর সিদ্ধির কথাও বলছেন কিন্তু ভক্তি পথের ব্যাপারে একটু বেশি বলছেন। যেমন বলছেন, ঈশ্বরের নাম করলে বা শুনলে চোখ দিয়ে প্রেমাশ্রু নির্গত হয়, শরীরে রোমাঞ্চ হয় ইত্যাদি। আবার বলছেন অনেকক্ষণ জপ করতে থাকলে ঠোঁট নড়তে থাকে, তার সাথে জ্যোতি দর্শনাদির কথাও বলছেন। বেদান্তের পুরোটাই একটা প্রণালীবদ্ধ আকার রাখা হয়েছে। এটাই পরে যোগশাস্ত্রেও নেওয়া হয়েছে। তাই দেখা যায় বেদান্ত যা বলছে যোগশাস্ত্রও তাই বলে, যদিও পতঞ্জলীর যোগসূত্র আরও অনেক বেশি সুসংবদ্ধ। যখন সাধক সাধনায় এগোতে শুরু করেন, মন যখন তার একাগ্র হতে থাকে তখন তিনি কিভাবে বুঝবেন তাঁর মন একাগ্র হচ্ছে, এই জিনিষটাকে যোগশাস্ত্রে খুব সুন্দর ভাবে পর পর সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। উপনিষদ এত বিস্তারিত ভাবে নিয়ে যাওয়া হয়নি। উপনিষদ একটা overall idea দিয়ে দেন। ভাষ্যকাররা এগুলোকেই বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করে দেখিয়ে দেন কিভাবে হয়।

আত্মজ্ঞানের পথিক বা ঈশ্বর দর্শন যাঁর উদ্দেশ্য তাঁর সাধনার জীবন কিভাবে চলে কঠোপনিষদের এই কটি মন্ত্রে খুব সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। খুব সহজ সরল সাধনা হল চরণামৃত পান কর, বাতাসা খাও, খিচুড়ী খাও আর সকাল বিকাল ঠাকুরের দুটি নাম কর, এই করলেই মৃত্যুর সময় ঠাকুর এসে নিয়ে যাবেন। কিন্তু ঋষিরা, যাঁরা আত্মবিদ্যাকে জানেন, তাঁরা এই জিনিষটাকে কিভাবে দেখছেন আমাদের জানা দরকার। তার আগে এই জগতকে কিভাবে দেখছেন সেটাকে বুঝতে হবে। বিজ্ঞান মানে, যেখানে যুক্তি দিয়ে সব কিছু দেখা হয়, সেই বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জগতের ব্যাখ্যা হল, জগতের যে কোন জিনিষ ভাঙতে ভাঙতে শেষে গিয়ে কয়েকটি মলিক্যুলস, মলিক্যুলের নীচে এ্যটম আর এ্যটমের পর তার আর কোন ব্যক্তি সত্তা থাকে না। হাইড্রোজেন এ্যটম আর অক্সিজেন এ্যটমের ব্যক্তি সত্তা আছে। এর নীচে আর কোন ব্যক্তি সত্তা বলে কিছু থাকে না। তখন এনার্জি রূপেই হোক আর পার্টিকেলস রূপেই হোক, তারা indistinguishable হয়ে যায়,

একটাকে আরেকটা থেকে আলাদা করা যায় না। ইলেক্ট্রন, প্রোটন বা আরও নীচে কোয়ার্কে চলে গেলে তখন আর তাকে distinguish করা যায় না। যেমন জলের কখন এ্যটম হবে না, জল সব সময় মলিক্যুল ফর্মে থাকে। আবার কিছু জিনিষ এ্যটম ফর্মেও থাকে আবার মলিক্যুল ফর্মেও থাকে, যেমন অক্সিজেন, হাইড্রোজেন। ওটাকে ভেঙেও ওর ভেতরে চলে গেলে তখন তার আর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বলে কিছু থাকে না।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জগতের মূল ভিত্তি কি? আমাদের মত সাধারণদের কাছে মলিক্যুলই শেষ কথা। যারা কেমেস্ট্রি নিয়ে চর্চা করে তারা বলবে এ্যটম পর্যন্ত ঠিক আছে। বিজ্ঞানের শুধু technical knowledge নিয়ে যাঁরা চলেন, তাঁরা বলবেন আমরা ইলেক্ট্রন প্রোটনের স্তরেই থাকব, জগতকে এরাই ধরে আছে। আর আইনস্টাইনের স্তরের বিজ্ঞানী বলবেন আমাদের কাছে পার্টিকেল বলে কিছু নেই, আমরা শুধু এনার্জি নিয়েই খেলা করি। এনার্জিই কখন পার্টিকেল রূপে থাকে আবার পার্টিকেল কখন এনার্জি রূপে থাকে। এই হল জগতের ব্যাপারে বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী। জগতের ব্যাপারে এই দৃষ্টিভঙ্গী জেনে নিলে আমাদের কী লাভ হবে? কেন! ডাক্তারদের অনেক উপকার হবে, অমুক এ্যন্টিবায়োটিকে একটা মলিক্যুল যোগ করা হয়েছে যার জন্য তার stability অনেক কার্যকরী হবে, এই খবর ডাক্তারদের অনেক উপকারে আসবে। কিন্তু ইলেক্ট্রন প্রোটনের স্তরে গিয়ে মেডিক্যাল প্র্যাক্টিসানারদের কোন লাভ নেই। কিন্তু যারা সত্যিকারের বিজ্ঞানী যারা ঐ ফিল্ডে কাজ করছে, তাদের কাজে লাগবে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাখ্যা করা বেদান্তের কাজ নয়। শুধু বেদান্ত কেন, কোন ধর্মেরই কাজ নয়। প্রায়ই প্রশ্ন করা হয় ধর্ম কি যুক্তি সম্মত? যদি প্রশ্ন করা হয় যুক্তি সম্মত বলতে তুমি কি বোঝাচ্ছ, তখন তারা আর কিছু বলতে পারে না। এক একটা বিজ্ঞানের এক একটা উদ্দেশ্য, ডাক্তারদের ইলেক্ট্রন প্রোটনের প্রপার্টিকে জেনে কোন কাজে লাগবে না। তারা দেখবে কোন মলিক্যুলের যদি কোন পরিবর্তন থাকে, তাতে মানুষের শরীরে তার কি প্রভাব পড়বে। অন্য দিকে ন্যানো ফিজিক্সের কাছে ইলেক্ট্রন প্রোটনের প্রপার্টিকে জানা খুব জরুরী। যারা কম্প্যুটারের বেসিক লেভেলে কাজ করছে তাদের কাছে অপ্টিক্যাল ফাইভার এবং আরও কত রকমের টেকনোলজি আছে এগুলো জানা খুব দরকার। যারা কেমিক্যাল নিয়ে কাজ করছে তাদের এ্যটম মলিক্যুলের নীচে আর কিছু দরকার পড়ে না। জগতকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞান চলে কিন্তু ধর্ম শুরু হয় মানুষকে কেন্দ্র করে। ধর্মের একমাত্র কাজ হল মানুষের জাগতিক অবস্থান, যেখানে তার সুখ আছে দুঃখ আছে, হাসি আছে কান্না আছে, তাকে এই অবস্থার পারে নিয়ে যাওয়া। পারে নিয়ে যাওয়াটা খ্রীষ্টানদের কাছে এক রকম অর্থ, মুসলমানদের কাছে অন্য অর্থ, কৃষ্ণ ভক্তদের কাছে আরেক অর্থ আর বেদান্তীদের কাছে আরেকটা অর্থ। যেহেতু আমরা উপনিষদ অধ্যয়ন করছি তাই এই মুহুর্তে বেদান্তই আমাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

বেদান্তের একটিই উদ্দেশ্য, আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান সবারই আছে, আগেও এই নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। আত্মা মানে আমি, আমি বোধ। আমি বোধ সবারই আছে, কুকুরও জানে পেট ভরে খেলে তার আনন্দ হয়। আত্মার বোধ, আত্মজ্ঞান সবারই আছে, শুধু আত্মার পরিভাষা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে তফাৎ হয়ে যায়। মায়ের কাছে তার সন্তানই সব কিছু, মা বলছে সন্তানই তার আত্মা, সন্তান মরে গেলে আমি আর বাঁচব না। কিছু দিন আগে কুমির একটা বাচ্চাকে টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছিল, মা জলে নেমে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করে কুমিরের মুখ থেকে বাচ্চাকে টেনে নিয়ে এসেছে। মায়ের কাছে নিজের জীবনের থেকে তার সন্তানের জীবনের দাম অনেক বেশি। একদিক থেকে সন্তান তার আত্মাই, কারণ সে তার শরীরের অঙ্গ। ধর্মের দৃষ্টিতে বাবা সন্তানকে নিজের আত্মা বলে মনে করে। আবার বিশ্বের শতকরা নিরানব্বুই পয়েন্ট নয় ভাগ লোকের কাছে আত্মার পরিভাষা আমি এই দেহ। খাচ্ছে দাচ্ছে আর ভোঁস ভোঁস করে নিদ্রা যাচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপধ্যায় বলছেন আহার, নিদ্রা আর মৈথুন এটাই জীবনের উদ্দেশ্য। তিনি ভুল কিছু বলছেন না। গণতন্ত্রে যেটা বেশি লোক জানে মানে সেটাই ঠিক। কিন্তু ধর্মের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে শোক আর মোহের পারে নিয়ে যাওয়া। যেখানে চোখের জল চিরদিনের জন্য মুছে দেওয়ার উদ্দেশ্য, সেখানে নিজের সন্তানকে আত্মা মনে করলে বা দেহকে, মনকে, বুদ্ধিকে আত্মা মনে করলে সেই উদ্দেশ্য সার্থক হবে না। এই উদ্দেশ্য সাধনের পথ পুরো অন্য ধরণের, বহির্মুখী মনকে ভেতরের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে দেখছে যে ব্যাপারটা অন্য রকম।

মন অন্তর্মুখী হয়ে গেলে জগতের রূপটাই পুরো পাল্টে যায়। এটা থিয়োরিটিক্যাল কিছু নয়, এটাই বাস্তব। বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করে দেওয়ার পর জগতটা পাল্টে যাচ্ছে, তাহলে এই জগতের মৌলিকত্বটা কি? বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জগতের মৌলিকত্ব নির্ভর করবে বিজ্ঞানের যে শাখাতে সে আছে তার উপর, হয় মলিক্যুল, এ্যটমস, নয়তো ইলেক্ট্রন প্রোটন, যারা আরও পেছনে যাচ্ছে তাদের কাছে কোয়ার্ক্স। বেদান্তের কাছে খুব সহজ, জগতের যা মূলভূত পদার্থ, তা মলিক্যুলই হোক আর এ্যটমই হোক, আর ইলেক্ট্রন, প্রোটন, কোয়ার্ক যাই হোক আর কিছু নাই হোক, আমি যেভাবে জগতকে দেখছি সেটা আমার জগৎ, আপনি যেভাবে জগতকে দেখছেন সেটা আপনার জগৎ। আমার জগৎ কোন দিন আপনার জগৎ হবে না, শ্রীরামকৃষ্ণের জগৎ কোন দিনই স্বামী বিবেকানন্দের জগৎ ছিল না। স্বামীজীর জগৎ কোন দিন আমার জগৎ হবে না। গীতা উপনিষদ আমরা যতই পড়ে যাই না কেন, কোন দিন কোন অবস্থায় আমাদের কাজে লাগবে না, আমার জগৎ আমারই জগৎ থাকবে। গীতা উপনিষদ সাহায্য করে আমার জগতকে সঠিক আকার নিতে। কিন্তু অন্যের জগতে ঢুকতে আমি কোন দিনই পারব না। মা তার পনের ষোল বছরের ছেলের মনের জগৎ তো দূরের কথা তার ঘরের জগতেই ঢুকতে পারে না। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের জগতকে আমরা কোথা থেকে জানব! আপনার জগৎ আপনার, আমার জগৎ আমারই জগৎ। আপনার জগতে কে ইলেক্ট্রন, কে প্রোটন, কে কোয়ার্ক হয়ে আছে তাতে আপনার কি! আপনি জগতকে কিভাবে নিচ্ছেন?

জগতের সব কিছুকে আমরা পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করছি, পাঁচটির বাইরে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নেই। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে জগতকে যেভাবে নিচ্ছি সেটাই আমার আপনার জগৎ। হাইড্রোজেনে এ্যটম থাকে তাতে আমার কি! কিন্তু হাইড্রোজনের এ্যটমকে যদি দেখতে পাই, যেভাবেই হোক, মাইক্রোস্কোপ দিয়েই দেখি আর যেভাবেই দেখি, ঐ জগতটাই আমার কাছে সত্য। যেমন লবণ আমাদের খুব কাছের মিশ্র পদার্থ যাতে সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে। সোডিয়াম ক্লোরাইড হয়ে, কিছু কেমিক্যাল প্রপার্টি, কিছু ফিজিক্যাল প্রপার্টি হয়ে লবণ হয়েছে। কিন্তু আমার কাছে লবণ জিনিষটা কি? লবণ মানে সাদা রঙ, আগেকার দিনে লালচে লবণ পাওয়া যেত, মুখে দিলে নোনতা, ঘষলে হাল্কা আওয়াজ আসে, ঘ্রাণ নিলে কোন গন্ধ পাওয়া যায় না, জল লেগে গেলে একটু চ্যাটচ্যাটে ভাব আসে। আমার আর লবণের মধ্যে লবণ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বিষয়। এরপর লবণের এই প্রপার্টি, অমুকের সাথে মিশলে এর এই এই পরিবর্তন হবে তাতে আমার কি আসে যায়, আমার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। ঠিক তেমনি জল, জল থেকে স্টিম হয়, স্টিম হতে কত ডিগ্রী তাপ লাগে এত কিছু আমার জেনে কি হবে! আমি জানি জল একটি তরল পদার্থ, হাত পা ধোওয়ার কাজে লাগে, পরিষ্কার থাকলে দেখতে এক রকম লাগে, নিজস্ব কোন রঙ নেই, কোন আকার নেই, মুখে দিলে জলের কোন স্বাদ পাওয়া যায় না। কেমেস্ট্রি পড়ানোর সময় জলের এই ধর্মগুলোই বলা হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছুই থাকুক না কেন শেষ পর্যন্ত ঘুরে ফিরে আমাদের এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করা ছাড়া আর কিছু নেই।

যে পাঁচটি ইন্দ্রিয় জগতকে ধরছে, তারা হল শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এই পাঁচটি ছাড়া জগতের কোন কিছুই থাকবে না। একটা জিনিষের শব্দ থাকতে পারে, রস থাকতে পারে, তাকে স্পর্শ করলে পাওয়া যায়। বেদান্তের কাছে ইলেক্ট্রন প্রোটন আছে কিনা, এ্যটম আছে কিনা, মলিক্যুল আছে কিনা, এর কোন দাম নেই। দাম হল, আমি জগতকে কিভাবে নিচ্ছি আর দ্বিতীয় জগতের উপর আমি কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছি। এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে আমরা জগতের জ্ঞান নিচ্ছি আর পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, হাত, পা, চোখ, কান ও জিহ্বা দিয়ে কাজ করছি। এই দশটি ইন্দ্রিয় আর মন নিয়ে একদাশ ইন্দ্রিয়। মনকে অনেকে ইন্দ্রিয় রূপে গণ্য করে অনেকে করে না। কিন্তু প্রচলিত মতে এগারোটি ইন্দ্রিয়ের কথাই বলা হয়। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে জগতকে গ্রহণ করছে, আর জগতের উপর কাজ করার সময় পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কাজ করে। বেদান্ত মানে জ্ঞান, বেদান্ত তাই প্রথমে ধরেই নেয় যারাই আধ্যাত্মিক জগতে আসছে তারা কর্মেন্দ্রিয়কে আর কাজে লাগাবে না। বেদান্ত মেনেই চলছে, হাত-পা এগুলোকে সে নিয়ন্ত্রণ করে নিয়েছে। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয় কাজ করতে থাকবে, কারণ জগৎ সব সময় আমাদের সূচনা দিয়েই যাচ্ছে। ঠিক এই জায়গা থেকেই বেদান্তের যাত্রা শুরু হয়।

জগৎ মানে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। জগতকে যদি অনুভব করতে হয় এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়েই অনুভব করতে হবে। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় তার নিজের নিজের বিষয়কেই ধরে, অন্যের জিনিষকে সে ধরবে না।

যেমন সুন্দর দৃশ্য বা মকবুল ফিদা হোসেন বা পিকাসোর চিত্রকলা, যদি বলা হয় খুব ভালো ছবি তখন কেউ ছবিকে শুঁকতে যায় না, কেউ জিহ্বা দিয়ে স্পর্শ করে ছবিটা ভালো কিনা বিচার করতে যায় না, চোখ দিয়েই দেখবে। একজন বড় গায়ক, তার গান আমরা কান দিয়ে শ্রবণ করে বিচার করব তিনি ভালো না মন্দ গায়ক, জিহ্বা দিয়ে চেটে দেখতে যাব না যে গায়কের আস্বাদ কেমন বা নাক দিয়ে শুঁকতে যাব না। যে বস্তুর যেটা গুণ সেই ইন্দ্রিয় দিয়েই তাকে ধরা হয়। এই ব্যাপারটা একটা জায়গা পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য। স্থূল জগতে এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় আর পাঁচটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সমূহ। আবার সব বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, যেমন ইলেক্ট্রন প্রোটন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, ইলেক্ট্রন প্রোটনকে জানতে হলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। বেদান্ত বলবে, এগুলো আছে ঠিকই তবে এরা বিজ্ঞানের বিষয়, এর মধ্যে নেমে তোমার লাভ নেই। ওগুলো দিয়ে কোন কিছু তৈরী হওয়ার পর তোমার ইন্দ্রিয় দিয়ে যখন ধরা যাবে তখন তোমার কাজ শুরু হবে। এখানে এসে দুটো নতুন জিনিষ যোগ হয়, একটা হল স্বপ্ন, স্বপ্নে জগতকেই দেখছি কিন্তু একটু অন্য ভাবে দেখছি, আর দ্বিতীয় যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যাকে বিভিন্ন শাস্ত্রে বর্ণনা করছে, এখানে শাস্ত্র শব্দটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, বলে যে মানুষের যদি সুকৃতি থাকে তাহলে মৃত্যুর পর সে স্বর্গে যায় আর সুকৃতি না থাকলে পাতাল লোকে বা নরকে যায়। স্বর্গলোকের দেবতারা এমন, অপ্সরারা এমন, স্বর্গলোকে এই এই হয়, অন্য লোকে এই এই হয়, নানা রকম বর্ণনা করছেন। মহাভারত ও পুরাণে আবার বর্ণনা আছে বড় বড় যোদ্ধা, যাঁরা খুব বীরপুরুষ তাঁদের বিভিন্ন প্রয়োজনে এখানে সেখানে যেতে হচ্ছে। অর্জুন জীবদ্দশায় স্বর্গলোকে চলে যাচ্ছেন, স্বর্গের অপ্সরা ঊর্বশী অর্জুনকে ভালোবাসছে আবার তাঁকে অভিশাপও দিচ্ছে। অর্জুন নাগলোকেও চলে যাচ্ছেন। আমরা জানিনা এসব বর্ণনার উৎস কোথায়, কিভাবে এসেছে, কেন এসেছে। ঋষিরা হঠাৎ স্বর্গলোক, নাগলোক, অমুক লোকের বর্ণনা করতে গেলেন কেন? বেদে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি দেবতাদের যে এত স্তুতি করা হয়েছে এগুলোকে আমরা ঋষিদের কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে পারি না। যদি ইন্দ্র, মিত্র, দেবতারা থাকেন তাহলে নাগকন্যাও থাকবে, বাদ দিতে হলে দুটোকেই বাদ দিতে হবে। স্থূল রূপে তাদের কোন সত্তা না থাকতে পারে কিন্তু নাগলোক থাকবে না, নাগকন্যা থাকবে না এই নিয়ে কখনই প্রশ্ন করা যাবে না। নাগলোক যদি না থাকে তাহলে স্বর্গলোকও থাকবে না। নাগকন্যাকে আমরা সাপই মনে করতে কেন যাব, দেবতারা যেমন আছেন তেমনি নাগকন্যাও একটা যোনি। দেবযোনি যদি থাকতে পারে তাহলে নাগযোনি কেন থাকতে পারবে না।

এই জায়গাটা কঠোপনিষদের প্রাণ, যেখান যমরাজ ব্যাখ্যা করছেন আধ্যাত্মিক সিদ্ধি কোন পথে হয়। এর অনেক সম্ভবনা থাকতে পারে, একটা সম্ভবনা হল near death experience অনেক সময় মানুষ মারা যায় কিন্তু মরার পরেও বেঁচে আসে। ইদানিং এর উপর অনেক অনুসন্ধান, গবেষণা চলছে। কিছু কিছু near death experience হতে পারে, কিছু কল্পনাও হতে পারে। কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, ধ্যানের গভীরে ঋষিরা অনেক কিছুই দেখেছেন আর ধ্যানের বাইরে এসেও অনেক কিছু দেখেছেন। ঠাকুরের জীবনে এই জিনিষটা ভালো বোঝা যাবে। ঠাকুরও ধ্যানের গভীরে অনেক কিছু দেখছেন। আবার চোখ খোলা অবস্থাতে দেখছেন দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে মা সীতা হেটে আসছেন আর হঠাৎ একটা হনুমান কোথা থেকে ঝুপ করে নেমে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। তারপর দেখছেন সীতা আস্তে আস্তে ঠাকুরের শরীরে মিলিয়ে গেলেন। ঠাকুরের এই দর্শনকে আমরা কি বলব, এটা কি ঠাকুরের কোন কল্পনা, নাকি বাস্তবিক ঠাকুর দেখছেন? বাইরের লোকেরা বলবে নিছক গাঁজাখুড়ি কল্পনা। তারা বলুক, কোন আপত্তি নেই। এই শাস্ত্র তাদের জন্য নয়। রাউলিং কল্পনার জগতে বিচরণ করে হ্যরি পটারকে নিয়ে এত এত কাহিনী দাঁড় করিয়েছেন, রাউলিংএর নামে ঠাকুরের মত এত মন্দির কেউ বানাচ্ছে না। মন্দির ঠাকুরের নামেই বানাচ্ছে। যারা মন্দির বানাচ্ছে তারা সবাই কি এতই মুর্খ! আর কল্পনার উপর ভারতবর্ষে রূপকথা, ফ্যান্টাসির ছড়াছড়ি, ভারতবর্ষে কে কার নামে মন্দির বানিয়েছে, কে কাকে আরতি করছে। অথচ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, শিব, কালী, দুর্গার নামেই সবাই মন্দির তৈরী করে, এনাদেরই আরতি করে। ঠাকুরের কল্পনাতে নিশ্চয়ই কোন তফাৎ আছে, তবেই না এত কিছু হচ্ছে। আর কাউকে তো জোর করে ধরে বেঁধে এনে ঠাকুরের নামে সন্ন্যাসী বানিয়ে বেলুড় মঠে বন্দী করে রাখা হচ্ছে না! সবাই স্ব ইচ্ছাতেই আসছে। ঠাকুরের মধ্যে তাঁরা এমন কি দেখছেন বা পাচ্ছেন যার জন্য জগতের সমস্ত ভোগ বিসর্জন দিয়ে এখানে পড়ে আছেন। তাহলে ঠাকুরের কথাতে এমন কিছু আছে, যা কিনা শুধু সত্যই নয়, অত্যন্ত শক্তিশালী কিছু জিনিষ আছে।

এবার ঠাকুরের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের দিকে তাকান। যেমন গোপালের মা, গোপালের মার জীবনে এই ধরণের অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। গোপালের মা একদিন বলছেন 'আমি শিবলোকে গেলাম সেখানে আমাকে এগুলো খেতে দিল'। আবার অন্য একদিন বলছেন 'আমি একদিন বিষ্ণুলোকে গেলাম'। ঠাকুর তখন নরেনকে জিজ্ঞেস করছে 'এগুনো তোর কি মনে হয়'? নরেন তখন এগুলোকে মনের ভুল বলতেন। নরেন তখন বলছেন 'কি করে বলি মনের ভুল, এগুলো মনের ভুল নয়'। পরে নিবেদিতাকে স্বামীজী বলছেন 'যাও গোপালের মাকে দেখে এস, এটাই আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষ, এই ভারতকে আর দেখতে পাওয়া যাবে না'। এই যে বেদে বলছে মরার পর সুকৃতি থাকলে সে দেবলোকে যাবে, কম সুকৃতি থাকলে পিতৃলোকে যাবে, আরও বেশি সুকৃতি থাকলে আরও উপরের লোকে যাবে ইত্যাদি, ঠাকুরও বর্ণনা করছেন, একদিন ধ্যানের গভীরে তাঁর মন অনেক উপরে চলে গেল, যেতে যেতে এত উপরে চলে গেছে যেখানে দেবতারাও যেতে পারেন না, সেই সপ্তর্ষি মণ্ডলে চলে গেল। বেদেও বলছে সিদ্ধদের ভূমি, সিদ্ধ মানে যাঁরা খুব উচ্চমানের ঋষি, তাঁরা যেখানে থাকেন সেখানে দেবতারাও যেতে পারেন না। ঠাকুর সেখানে গিয়ে সেই দিব্য দৃশ্য দেখছেন, একজন ঋষি ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছেন আর একটি শিশু তাঁকে গলা জড়িয়ে ডাকছে।

পুরো ব্যাপারটাকে এক জায়গায় নিয়ে এসে ঠাকুরের অনুভূতি রূপে না দেখে এভাবেও দেখা যেতে পারে – একজন মানুষ সুকৃতি করেছে, প্রচুর কাজ করেছে, তারপর মৃত্যুর পর সে দেবলোকে গেল। দেবলোক থেকে আবার নেমে এসে আবার অনেক রকম কাজ করল, তারপর বিভিন্ন লোকে গেল। এটা গেল একটা দিক, এর আরেকটা দিক হল গোপালের মা এই রকম কিছু দেখছেন। তাত্ত্বিক ভাবে যদি দেখা হয়, একজন শিবভক্ত প্রচুর শিবের ভক্তি করেছে, মৃত্যুর পর সেই ভক্ত শিবলোকে গেল। শিবের সান্নিধ্য পেল, সেখান থেকে তার পূণ্য ক্ষয় হওয়ার পর আবার তার জন্ম হল। কোন ঋষি সেই শিশুকে দেখে বলছেন এই শিশুটি তো স্বর্গলোকের দেবশিশু। শিশুদের চেহারা, সংস্কার দেখলেই বোঝা যায় যে এই শিশু দেবশিশু। ফর্সা কালোর সাথে এর কোন সম্পর্ক থাকে না, চোখমুখ দেখলেই বোঝা যায় কোন উচ্চলোক থেকে নেমে এসেছে বা কোন নীচের লোক থেকে এসেছে। উচ্চলোক থেকে যারা আসে পাঁচ ছয় বছর হতে হতে তাদের আচার ব্যবহার এক রকম হয়, যারা নিম্নলোক থেকে আসে তাদের আচার ব্যবহার অন্য রকম হয়ে যায়।

দ্বৈতবাদীরা বলে মৃত্যুর পর মানুষ সূর্যলোকে যায়। যদিও আমরা এই বাসভূমিকে পৃথিবীলোক বলছি কিন্তু বৃহৎ ভাবে নিলে পৃথিবীলোকও সূর্যলোকের মধ্যে পড়ে। সূর্যলোকের মধ্যেই মানুষ ঘুর ঘুর করতে থাকে। মারা গেল, কিছু দিন প্রেতাত্মা হয়ে ঘুরে আবার ফেরত চলে আসে। এদের থেকে যারা আরেকটু উপরের তারা মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে যায়। চন্দ্রলোক হল দেবতাদের বাসস্থান। এগুলো সবই পৌরাণিক চিন্তা-ভাবনা, কিন্তু স্বামীজীও মানতেন। চন্দ্রলোকের উপরে দ্যুলোক (Electrical Sphere)। দ্যুলোকে দেবতারা প্রবেশ করতে পারেন না, খুব উচ্চমানের ঋষিরাই যেতে পারেন। দ্যুলোকেরও উপরে ব্রহ্মলোক। যাঁরা একশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছেন, খুব পবিত্র ভাবে জীবন-যাপন করেছেন একমাত্র তাঁরাই মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে যেতে পারেন, সবাই যেতে পারে না। একদিকে শাস্ত্র বর্ণনা করছে সুকৃতি করলে মানুষ মৃত্যুর পর এই এই লোকে যায়, অন্য দিকে আমরা দেখছি ঠাকুর তাঁর জীবদ্দশাতাই এইসব লোক দেখছেন। যদি গোপালের মাকে বিশ্বাস করি, তিনিও এই জীবনেই শিবলোক, বিষ্ণুলোকে যাচ্ছেন। তিনি ধ্যানের গভীরেও যাচ্ছেন না, এমনিই চলে যাচ্ছেন, কল্পানাও নয়। তাই না, তিনি বলছেন সেখানে আমাকে অনেক কিছু খেতে দিল, খেয়ে আমার পেট ভরে গেছে এখন কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। আমাদের পক্ষে এগুলো ধারণা করা খুব কঠিন, তাই যেমনটি আছে তেমনটি মেনে নিতে হয়। মেনে নিলে এই জিনিষগুলো বুঝতে সুবিধা হয়, তার বেশি আর কিছু হয় না। বেশি চুলচেরা বিচার করতে গেলে মাথামুণ্ডু কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

স্বামীজী আমেরিকা থেকে ইটি স্টার্ডিকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। স্বামীজীর গভীর চিন্তন জগতে বিভিন্ন লোকের চিন্তাও ঠাঁই পেয়েছিল। অদ্বৈতবাদীরা বলছে লোক বলে কিছু নেই আর দ্বৈতবাদীরা বিভিন্ন লোকের কথা বলছে, ইটি স্টার্ডিকে যে চিঠি লিখেছেন তাতে তিনি এই জিনিষটাকে মেলাবার চেষ্টা করেছেন। স্বামীজী বলছেন, দ্বৈতবাদীরা বলে জীব যদি সুকর্ম করে তাহলে প্রথমে সে সূর্যলোকে যায়, এই লোককে আমরা পিতৃদের বাসভূমি বা আমাদের এই পৃথিবীলোককে মিলিয়েও বলতে পারি। আরও সুকৃতি থাকলে চন্দ্রলোকে

যায়, যে লোকে দেবতারা বাস করেন, তার থেকে আরও বেশি সুকৃতি থাকলে দ্যুলোকে যায় আর সেখান থেকে ব্রহ্মলোকে যায়। স্বামীজীর বিশ্লেষণে, আমরা যে ইন্দ্রিয়ের কথা আর তার বিষয়ের কথা বললাম, তিনি এর পরিভাষাকে পাল্টে দিচ্ছেন। পরে স্বামীজী এই নিয়ে বেশি কাজ করেননি, স্বামীজীর পরে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনেরও কেউ এর উপর কাজ করেননি, সেইজন্য এগুলো কতটা যৌক্তিক, ধর্মের দৃষ্টিতে কতটা ঠিক এর কোন নিশ্চয়তা নেই। স্বামীজীর খুব ইচ্ছে ছিল পুরোটা মিলিয়ে ধর্মের একটা নতুন সিদ্ধান্ত দাঁড় করাবেন।

স্বামীজী বলছেন, দ্বৈতবাদীরা যে বিভিন্ন লোকের কথা বলছে আবার অদ্বৈতবাদীরা বলে কেউ কোথাও যায় না, এগুলো তেমন কিছু নয়। অদ্বৈতাবাদীরা বলে, চৈতন্য সত্তা অর্থাৎ বেদান্ত যাঁকে আত্মা বলছে, তাঁর সামনে এগুলো দৃশ্য রূপে ভেসে যাচ্ছে। এই ব্যাপারটা আমাদের কাছে একটু জটিল মনে হতে পারে। কিন্তু না বোঝারও কোন কারণ নেই। ঠাকুরও সূর্যলোক, চন্দ্রলোক, দ্যুলোক সবই দেখছেন, আবার সপ্তর্ষি মণ্ডলে গিয়ে দেখছেন সেই ঋষিকে যাঁকে এক শিশু গলা জড়িয়ে আছে, ঠাকুর এখানে দ্যুলোকের কথাই বলছেন। লোক মানে যেমন যেমন লোক তেমন তেমন জিনিষটা সূক্ষ্ম, আরও সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হতে হতে সূক্ষ্মতর হয়ে যাচ্ছে। একজন লোক সুকৃতি করেছে সে মৃত্যুর পর একই জিনিষ দেখছে। মৃত্যুর পর অর্থটা কি? জীবদ্দশায় যা বোধ করছে মৃত্যুর পরেও সেই একই জিনিষ বোধ করে। তার মানে যেটা দেখছে, যেটা বোধ করছে, এই দেখা বা বোধ করা জীবদ্দশাতেই করুক, যেমন ঠাকুর করছেন, গোপালের মা করছেন, ঋষিরা করছেন বা মৃত্যুর পর করে থাকুক, মৃত্যুর পর আপনি যেন সেখানে চলে গেছেন, জিনিষটা কিন্তু একই দাঁড়ায়। যেমন জাগ্রত অবস্থায় আমরা এই জগতকে দেখছি আর স্বপ্নাবস্থায় আমাদের ইন্দ্রিয় কাজ করছে না অথচ আমরা সব কিছুই দেখছি। স্বপ্নাবস্থায় জ্ঞানেন্দ্রিয় কাজ করছে না কিন্তু মন দিয়ে সরাসরি দেখছে। এই সূক্ষ্ম জগৎ যেটা, যেখানে সূর্যলোক আছে, চন্দ্রলোক, দ্যুলোক, ব্রহ্মলোক আছে এগুলোকে ঠাকুর সাক্ষাৎ দেখছেন, অন্য মহাত্মারা এই ব্যাপারে কিছু বলেননি বলে আমরা জানি না, নিশ্চয়ই দেখেন। কারণ আমরা অনেকের মুখেই তাঁদের দেবী-দেবতা দর্শনের বর্ণনার কথা শুনেছি। দেবী-দেবতার দর্শন হওয়া মানে তিনি চন্দ্রলোকে পৌঁছে গেছেন। কারণ দেবী-দেবতা মানেই চন্দ্রলোকের বাসিন্দা, ওনারা কখনই স্থূল দেহ ধারণ করবেন না। তার মানে, যিনি দেবী-দেবতার দর্শন করছেন, তাঁর মন, ইন্দ্রিয়ের অবস্থা এত সূক্ষ্ম হয়ে যায় যে চন্দ্রলোকের মত সূক্ষ্ম জগতকে গ্রহণ করার ক্ষমতা তাঁর হয়ে যায়।

সূক্ষ্ম হওয়ার কি অর্থ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আবার আমরা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধে ফেরত যাচ্ছি। বেদান্ত, যোগ, সাংখ্য বা হিন্দু ধর্মে যত দর্শন আছে সবাই বলছেন, যে কোন বস্তু, যেমন জল, জলের উপর কেউ ধ্যান করছেন, ধ্যান করতে করতে দেখছেন জলেরও বাস্তবিক একটা জাগতিক সত্তা রয়েছে, সেই সত্তার পেছনে আরও সূক্ষ্ম শক্তি রয়েছে, যে শক্তি এই জিনিষটাকে তৈরী করে। এই সূক্ষ্ম শক্তিকে বলছেন তন্মাত্রা। তন্মাত্রা হল বস্তুর সূক্ষ্ম রূপ। মা দূর্গার প্রতিমার শাড়ি, অলঙ্কার, মাটি সরিয়ে দিলে খড় দেখা যাবে, এটাই সূক্ষ্ম। খড়কেও সরিয়ে দিলে একটা কাঠের ফ্রেম বেরিয়ে আসবে। সূক্ষ্ম মানে বস্তুর building pattern, যার উপর বস্তু বস্তু রূপে দাঁড়িয়ে আছে। কোন বস্তুকে ধ্যান করতে করতে ধ্যানের গভীরে চলে গেলে তিনি সেই বস্তুর সূক্ষ্ম রূপটা স্পষ্ট দেখতে পান। যাঁরা আরও গভীরে চলে যান তাঁরা দেখেন শুধু একটা কাঠামো। তখন তিনি আর জল দেখছেন না, জল যে জিনিষ দিয়ে তৈরী, যেটা পঞ্চ ইন্দ্রিয় গ্রহণ করে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটা জিনিষের বিভিন্ন মাত্রার সংমিশ্রণে হয়ে যে জল বস্তু রূপ পেয়েছে, বস্তুর পেছনে যে পাঁচটি শক্তির সংমিশ্রণ সেটাকে দেখতে পান। যোগীরা H^2O, হাইড্রোজেন অক্সিজেন দেখছেন না, পাঁচটির সংমিশ্রণকে দেখেন। জলের মধ্যে রস জিনিষটা বেশি মাত্রায় রয়েছে, পিওর জল যদি হয় তাহলে গন্ধ তন্মাত্র জিরো, জিরো কখনই হয় না, জগতে যত বস্তু আছে সব বস্তুতে এই পাঁচটা তন্মাত্রা থাকবে, তবে কম বেশি মাত্রায় থাকে। জলে রস তন্মাত্র বেশি। এবার রস তন্মাত্রার রসের উপরে ধ্যান করতে করতে ধীরে ধীরে আরও গভীরে চলে গেলেন, গভীরে গিয়ে দেখছেন শুধু বুদ্ধি আছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেন একটা সমষ্টি মন আছে, সেই সমষ্টি মনেই এই ভাবগুলি উঠছে। সব থেকে নীচে হল বস্তু, বস্তুর পেছনে তন্মাত্রা (রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি), তারও পেছনে মহৎ বা সমষ্টি মন। সমষ্টি মনের উপর ধ্যান করে করে আরও গভীরে গিয়ে দেখছেন, মহতের পেছনে রয়েছে শুধু মাত্র শক্তি, শক্তি ছাড়া আর কিছু নেই। যিনি যত গভীর ধ্যানে যাবেন তিনি বস্তুকে তত সূক্ষ্ম রূপে দেখবেন। তারও পারে যখন চলে যান তখন দেখেন তিনিই এই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হয়েছেন।

কিন্তু তখনও তাঁর আমি বোধটা থেকে যায়। যোগশাস্ত্রও তাই বলে, বেদান্তও তাই বলছে আর স্বামীজীও বার বার তাই বলছেন। কোন কারণে ঐটাকে যদি তিনি পার করে যান, তখন দেখেন এই জগৎ বলে কিছু নেই, যা আছে আছে। এই যা আছে আছে একেই বলছেন আত্মার অবস্থা, এটাই আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান কিন্তু সবটাই, আমি যখন জানি আমি অমুক, আমার এই শরীর, আমি সন্ন্যাসী, আমি গৃহী, আমি কঠোপনিষদের কথা শুনছি, আত্মা রূপেই সব জানছি। জগতকে যখন বস্তু রূপে না দেখে তন্মাত্রা রূপে দেখেন তখনও আত্মা রূপে দেখছেন, তখন আবার নিজেকে অন্য রকম দেখেন। হৃদয়রাম ঠাকুরকে বড় বিরক্ত করছিল, ঠাকুর তাকে ছুঁয়ে দিলেন, ছুঁয়ে দিতেই হৃদয়রাম সব আলোময় দেখছে, হৃদয়রামের দেহও আলোময় ঠাকুরও আলোময়। সে তখন চেঁচাতে শুরু করেছে 'মামা আমরা এখানে কী করছি! চল আমরা জগতকে শিক্ষা দিই'। ঠাকুর বলছেন 'ওরে চুপ কর চুপ কর, আরও কত কি আছে'। মানুষ কি কখন আলোময় শরীর দেখতে পারে? আসলে প্রত্যেক মানুষের থেকে আলোর বিকিরণ হয়, কিন্তু আমাদের চোখের দেখার ক্ষমতা হাজার গুণ কম। কারুর চোখের দৃষ্টি যদি হাজার গুণ বেড়ে যায় তাহলে সে মানুষের শরীরের আলোর বিকিরণ পরিষ্কার দেখতে সক্ষম হবে। তা নাহলে পবিত্রতার কারণেও কারুর যদি আলোর বিকিরণ বেড়ে যায় তখন কিন্তু সেই আলো দেখতে পারবে, কিন্তু সবাই দেখতে পারবে না। সে নিজের দিকে তাকালে নিজের শরীরকেও আলোময় দেখবে আর অপরের পবিত্রাজনিত আলোময় শরীরও দেখতে পারবে। আলোময় সবাই, এই কথা বিজ্ঞানও বলছে। আসলে ইনফ্রা রে মানুষের চোখ ধরতে পারে না, বেড়ালের চোখ অনায়াসে ধরে নিতে পারে। মিলিটারিতে সৈন্যরা নাইট ভিশন্স গগলস্ ব্যবহার করে, তাতে দৃষ্টি শক্তিটা বেড়ে যায়। শরীর থেকে যে তাপমাত্রা বেরোয় সেটাকে দেখে তার আকৃতিটা বুঝতে পারে। হৃদয়রাম আর ঠাকুরের যে কাহিনী আমরা শুনছি এগুলো কোন অস্বাভাবিক কিছু নয়। ঠাকুর একজনকে বলছেন তোর মুখ কালো কেন, আবার বলছেন তোর মুখের দিকে তাকাতে পারছি না, নরেনকে অন্য রকম দেখছেন, এটাই স্বাভাবিক। কারণ translucent সবারই আছে। কিন্তু আমার আপনার দেখার ক্ষমতা নেই। সাধনা করা ছিল তাই ঠাকুরের শক্তিটা অনেক বেশি ছিল। যে কেউ সাধনা করলে তারও হবে। তবে ঠাকুর হৃদয়রামকে কি করে ঐ ক্ষমতাটা দিলেন সেটা আমাদের জানা নেই। সেইজন্যই ঠাকুর অবতার, কারণ সাধারণ সাধক অন্যকে এই ক্ষমতা দিতে পারবে না। এখানে কোথাও কোন ধরণের অযৌক্তিক কিছু নেই, পুরোটাই যুক্তি সম্মত আর পুরোটাই বিজ্ঞান সম্মত। প্রত্যেক শরীর থেকেই তাপ বিকিরণ হয়, তাপ মানেই তো লো পোটেন্সির আলো। আমাদের চোখের যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতা ঐ তাপ বিকিরণকে ধরতে পারে না, সেইজন্য আমরা মানুষের শরীরের আলো দেখতে পাই না। চোখের ক্ষমতা যদি একটু বেশি হত তাহলে আমরা দেখতে পারতাম।

যোগীর মন যখন ধীরে ধীরে পেছনের দিকে যেতে শুরু করে তখন তিনি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকে আরও সূক্ষ্মতরকে দেখতে পান। জল না দেখে তার তন্মাত্রাকেই দেখছেন। জলের যে রস তন্মাত্রা, সেই তন্মাত্রার সাথে নিজেকে এক করে নিলে তিনি চাইলে জগতের সমস্ত জল পান করে নিতে পারবেন। কারণ তিনি সমস্ত জলের সাথে নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছেন। অগস্ত্য মুনি যেমন সমুদ্রের সব জল পান করে নিলেন, এগুলো কোন আজগুবি গল্প নয়, এর পেছনে পুরো যৌগিক বিজ্ঞান রয়েছে। অগস্ত্যমুনির এই কাহিনী আজকালকার ছেলেমেয়েদের কাছে গাঁজাখুড়ি বলে মনে হবে। ঠিকই, কারণ তাদের কোন প্রস্তুতি নেই। যাঁরা অনেক দিন ধরে শাস্ত্রের কথা শুনছেন তাদেরও ধারণা করতে সময় লাগবে। পুরো জিনিষটাকে সাজানো হলে দেখা যাবে সৃষ্টির একটা ক্রম আছে। সচ্চিদানন্দই আছেন, সচ্চিদানন্দ যখন একটা মায়ার আবরণ নিয়ে নেন, মায়ার আবরণ মানে সচ্চিদানন্দের মধ্যে যে শক্তি, সেই শক্তিকে প্রকাশ করে দিচ্ছেন। ঠাকুর যেমন বলছেন জল হেললে দুললেও জল, স্থির থাকলেও জল। হেলা দোলাটাই শক্তির প্রকাশ। শক্তির প্রকাশ যখন হয় তখন এটাই সৃষ্টি। এই হেলা দোলা, শক্তির যে প্রকাশ হচ্ছে এরই আরেকটি নাম মায়া। মায়া এই জন্যই বলছেন, যদিও এই মায়া সচ্চিদানন্দই কিন্তু সচ্চিদানন্দ থেকে আলাদা দেখায়, আসলে আলাদা নয়। যেমন জল আর ঢেউ, ঢেউ আলাদা কিছু নয়, জলেরই ঢেউ। কিন্তু ঢেউকে জল থেকে আলাদা বলে বোধ হয়, সেইজন্য তার আলাদা নাম, ঢেউ। আবার ছোট ঢেউ, বড় ঢেউ, এক ঢেউ আরেক ঢেউয়ে মিশে যাচ্ছে। ঠিক তেমনি সচ্চিদানন্দ থেকে যখন জগতের সৃষ্টি হচ্ছে, আর এই জগতে যে নানা রকমের জীব, দেবতা আছেন, মানুষ, পশুপাখি, গাছাপালা যত রকমের যোনি আছে এগুলো প্রত্যেকটি যেন সচ্চিদানন্দ সাগরের এক একটা ঢেউ।

কিন্তু এই ঢেউ সৃষ্টির সময় প্রথম যার সৃষ্টি হয় তার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি মানে ওর মধ্যে কোন চাঞ্চল্য নেই, pure energy। প্রকৃতির যে প্রথম বোধ আসে, তা হল সমষ্টি মন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে মন তাকে বলছেন মহৎ। যখনই মন এসে গেল তখন তার এই বোধও এসে যায় আমি আছি, অহম্ অস্মি। মহৎ থেকে তার যে প্রথম রূপান্তর হয় সেটা এই অহম্, সেইজন্য এর নাম অহঙ্কার। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে এই অহঙ্কার। কিন্তু প্রকৃতি থেকে মহৎ, মহৎ থেকে যখন অহঙ্কার এল তখন প্রকৃতির মধ্যে যে সাম্য অবস্থা ছিল সেই সাম্য অবস্থাটা ভেঙে চাঞ্চল্য এসে গেল। চাঞ্চল্য এসে যাওয়ার ফলে বাঁধ ভেঙে বন্যার জল যেমন বেরিয়ে আসে, ঠিক তেমনি প্রকৃতি থেকে এবার সব কিছু বন্যার জলের মত হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়ল। বেরিয়ে আসতেই এক অপরের সাথে মিশতে শুরু করল। মিশতে গিয়ে অহঙ্কার থেকে সৃষ্টি হয় পাঁচটি তন্মাত্রার – শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। প্রকৃতি নিজে সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটে গুণের মিশ্রণ, কিন্তু এই তিনটে পুরো সাম্য অবস্থায় থাকে, সেখানে কোন চাঞ্চল্য নেই।

এই জায়গাতে এসে অনেক জটিলতা সৃষ্টি হয়। যেটা যার থেকে বের হয় সেটার মধ্যে তার প্রভাব থাকবে। অহঙ্কার থেকে পাঁচটি তন্মাত্রা বেরিয়েছে, তাই এদের মধ্যে অহঙ্কারের সব গুণ থাকবে। অহঙ্কারের জন্ম মহৎ থেকে, আর মহৎ বেরিয়েছে প্রকৃতি থেকে, প্রকৃতি হল সত্ত্ব, রজো আর তমো। সেইজন্য প্রত্যেকটি তন্মাত্রায় সত্ত্ব, রজো আর তমো মিলে মিশে থাকবে। কোনটাতে কতটা আছে সেটা বেশি গুরুত্ব নয় কিন্তু সবটাতেই এই তিনটে গুণ থাকবে। পাঁচটা তন্মাত্রা একসাথে হওয়ার পর যেটা দাঁড়াবে তার সত্ত্ব অংশটুকু টেনে নিয়ে মনের জন্ম হয়। মানুষের মন পাঁচটি তন্মাত্রার সত্ত্ব অংশ দিয়ে তৈরী। পাঁচটি তন্মাত্রার রজো অংশটুকু টেনে পাঁচটি প্রাণ অর্থাৎ পঞ্চপ্রাণের জন্ম হয়। পঞ্চ তন্মাত্রার প্রত্যেকটির সত্ত্বগুণ থেকে জন্ম নেয় জ্ঞানেন্দ্রিয়। এর প্রত্যেকটির রজোগুণ দিয়ে তৈরী হয় কর্মেন্দ্রিয়ের। প্রাণ রজো থেকে বেরিয়েছি আর কর্মেন্দ্রিয়ও রজো থেকে বেরিয়েছে সেইজন্য প্রাণ কর্মেন্দ্রিয়ের সাথে বেশি কাজ করে, স্বভাবেও এক। আর জ্ঞানেন্দ্রিয়, চোখ, কান, নাসিকাদি এগুলো সত্ত্বগুণ থেকে বেরিয়েছে, অন্য দিকে মনের মধ্যে পাঁচটি তন্মাত্রারই সত্ত্বগুণ আছে সেইজন্য মনের সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংযোগ বেশি। হিন্দুদের মতে চোখ কান দিয়েই যে সব কিছু জানা হয় তা নয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ছাড়াও জানা যায়। তার কারণ মন হল সব কটির বাবা। চোখ রূপ তন্মাত্রার সত্ত্বগুণের অংশ দিয়ে কাজ করে, কিন্তু রূপের সত্ত্বগুণ মনের মধ্যে সরাসরি আছে, সেইজন্য চোখ বন্ধ করেও যদি প্রিয়জনের কথা ভাবে তার রূপ মনে ভেসে উঠবে। শুধু কাল্পনিক ভাবে ভেসে আসবে না, বাস্তবিক রূপেই চলে আসবে। আমরা প্রায়ই intituionsএর কথা, sixth senseএর কথা বলছি। জিম করবেটও intuitive এর কথা বলছেন, তিনি কিছু শুনতে পাচ্ছেন না, কিছু দেখছেন না কিন্তু বুঝছেন বাঘ তাঁকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে। ঘুরে দেখছেন বাঘ দাঁড়িয়ে আছে। এই জিনিষ আমাদের সবারই জীবনে দেখা যায়, একটা কিছু ভাবছি দেখছি সেটা হয়ে গেল। সব সময় চোখ, কানের দরকার পড়ে না। আমরা যে জীবন চালাচ্ছি সেখানে আমরা ইলেক্ট্রন প্রোটন, এ্যটম মলিক্যুলসকে নিই না, আমরা নিচ্ছি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটা। কিভাবে নিচ্ছি? পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে। পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সঙ্গে যুক্ত, মনেরও একই প্রপার্টি। আমরা কাজ করছি কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে, কর্মেন্দ্রিয় চালিত হয় প্রাণশক্তি দিয়ে। প্রাণও এই পাঁচটি তন্মাত্রার রজোগুণ দিয়ে নির্মিত আর কর্মেন্দ্রিয়ও একই জিনিষের রজোগুণ দিয়ে নির্মিত। এই হল সমগ্র প্রপার্টি, যেখানে ইন্দ্রিয় রয়েছে, মন রয়েছে আর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ রয়েছে।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি তন্মাত্রাই বিভিন্ন মাত্রায় মিশ্রণ হয়ে এই দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, যাদের আমরা বলছি আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী। এগুলো আবার আলাদা বিষয়, এক্ষুণি আমাদের এগুলোর দরকার নেই। যখনই কোন বস্তু তৈরী হয় তখন তাতে এই পাঁচটি তন্মাত্রা থাকতে হবে, যেমন ভূমি, ভূমি হল গন্ধ তন্মাত্রার। যে কোন বস্তুর যদি গন্ধ থাকে তখন বুঝতে হবে সেই বস্তুতে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ গন্ধ তন্মাত্রা রয়েছে আর বাকি পঞ্চাশ ভাগ আসছে বাকি চারটে তন্মাত্রা থেকে। তার মানে প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে সবটাই মিলে মিশে আছে। যেমন জলে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ রয়েছে রস তন্মাত্রা, আর বাকি শতকরা পঞ্চাশ ভাগ আসছে অবশিষ্ট চারটে থেকে। সেইজন্য সব কিছুতে স্বাদ, গন্ধ সবটাই বেশি কম মাত্রায় থাকবে। এটাও একটা সৃষ্টির মডেল, কিভাবে এক অপরের সাথে মিশ্রণে সৃষ্টি হয় তার একটা থিয়োরী। আমরা জানি না কিভাবে এক অপরের সাথে মিশ্রণ হয়। কিন্তু আমরা জানি জগতকে যখন আমরা গ্রহণ করছি

তখন আমরা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ রূপেই নিচ্ছি। আমরা এও জানি, যোগীরা ধ্যানের গভীরে বিভিন্ন লোক দেখেন আর বিভিন্ন রূপে দেখেন। স্বামীজী এর সব কিছুকে সমন্বয় করতে গিয়ে বলছেন, সূর্যলোকে যোগীরা প্রাণ আর আকাশকে পুরো আলাদা দেখেন। যেমন ইলেক্ট্রিসিটি আলাদা পাখা আলাদা। প্রাণ মানে শক্তি আর আকাশ মানে পদার্থ। সেখান থেকে ধ্যানের গভীরে মন যখন আরও সূক্ষ্ম হয়ে যায়, অন্য দিকে আমরা বলতে পারি মৃত্যুর পর যেটা দেখেন, বেদান্তের দৃষ্টিতে মৃত্যুর কোন দাম নেই, মৃত্যু মানে আত্মা এখন জিনিষটাকে অন্য ভাবে নিচ্ছে, সেইজন্য মৃত্যুর কোন দাম নেই, শুধু তার দেহটা পাল্টে যাচ্ছে। আত্মা বা সূক্ষ্ম শরীরের কোন পরিবর্তন হয় না। স্বামীজী বলছেন, সেখানে গিয়ে দেখে আকাশ ও প্রাণ অনেক সূক্ষ্ম হয়ে গেছে। প্রাণ যেন মনের শক্তিতে চলছে। তৃতীয় স্তরে অর্থাৎ দ্যুলোকে গিয়ে আকাশ আর প্রাণকে আলাদা করা যায় না। তার মানে শুধু তন্মাত্রা রূপে থেকে যাচ্ছে। সেখান থেকে যখন আরও সূক্ষ্মে যাচ্ছে তখন সে দেখে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন একটা সমষ্টি মন, বাকি যে জগতটা এতক্ষণ ছিল সেটা পরে থেকে যায়। আর তার সাথে সে নিজেকে মনে করে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় যা কিছু আছে, সমষ্টি মন সবটাই সে নিজে হয়েছে, কিন্তু তখনও তার আমি বোধটা থেকে যায়। যোগশাস্ত্রে যেখানে ধ্যানের কথা বলছেন সেখানেও ঠিক এভাবেই দেখানো হয়েছে, প্রকৃতি, প্রকৃতি থেকে মহৎ, মহৎ থেকে অহঙ্কার, অহঙ্কার থেকে তন্মাত্রা। স্বামীজী এটাকেই মিলিয়ে দিয়ে বলছেন মৃত্যুর পর যা হয় সেখানেও এভাবেই দেখতে পায়। ঋষিরাও ঐ একই জিনিষ দেখেন। প্রথমে তাঁরা জগতকে জগৎ রূপে দেখেন, সেখান থেকে ধ্যানের গভীরে গিয়ে জগতকে তন্মাত্রা রূপে দেখেন। সেখান থেকে আরও যখন গভীরে চলে যান তখন সমষ্টি বুদ্ধি রূপে দেখেন। সমষ্টি বুদ্ধি রূপে দেখার পর শেষ ধাপে প্রকৃতি অবস্থায় বা ব্রহ্মার অবস্থায় বা হিরণ্যগর্ভের অবস্থায় দেখছেন। তখন দেখেন আমিই জগতের স্রষ্টা, কিন্তু এই আমি বোধটা, আমি আর তিনি এই বোধটা থেকে যায়। ধ্যানের শেষ অবস্থায় ভগবান যদি ইচ্ছে করেন তখন তাঁর এই আমি বোধটাও মিটিয়ে দেন। আমরা জানি, ঠাকুর মা কালীকে মা বা ইষ্ট রূপে চিরদিন দেখে এসেছেন, তোতাপুরী যখন অদ্বৈত মতে ঠাকুরকে সাধনা করাচ্ছেন তখন ঠাকুর জ্ঞান অসি দিয়ে মা কালীকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন। তখন এই আমি তুমির ভেদ, প্রকৃতির সেই শেষ অবস্থায় যেখানে নিজেকে এক বিরাট পুরুষ রূপে দেখছেন অর্থাৎ মা কালীর সাথে নিজেকে যে এক দেখছেন, সেটাও এখানে উড়ে যাচ্ছে। তখন কি থাকছে? যা আছে তাই থাকছে। কি থাকছে মুখে বলা যাবে না। তার মানে, ঋষিরা যে প্রক্রিয়া দিয়ে গেছেন, কিছুটা তাঁরা নিজেদের ধ্যানের অবস্থাকে দেখে, কিছুটা চিন্তন-মনন করে পুরো একটা প্রক্রিয়া দাঁড় করিয়ে দিলেন। এটাও একটা মডেল, আমরা জানি না এই মডেল কতটা ঠিক, কতটা ঠিক নয়। কিন্তু আমরা জানি, যখন ধ্যান শুরু করা হয় তারপর থেকে তাঁর যা যা সিদ্ধি আসে আর যেমন যেমন এগোতে থাকেন তত তাঁর মন সূক্ষ্ম হতে থাকে। যত সূক্ষ্ম হয় জগতকে তিনি তত বাস্তবিক অন্য ভাবে দেখতে থাকেন। সেখানে তিনি দেবতাদের জগৎ দেখেন, সিদ্ধদের জগৎ দেখেন আর নিজেকে হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা রূপে দেখেন। শেষে দেখছেন অস্তি মাত্রম্, আছে এই বোধ, আর আনন্দস্বরূপ। তখন তাঁর সমস্ত কিছুর অজ্ঞান, যে দৃশ্যগুলি ভাসছিল সব খসে পড়ে যায়। এই পুরো ব্যাপারটা যদি আমাদের পরিষ্কার থাকে তাহলে পরের তিনটি মন্ত্রের ব্যাখ্যা বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না। দশ নম্বর মন্ত্রে বলছেন –

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ।।১/৩/১০।।

(পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় থেকে বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ, অর্থসমূহ থেকে মন শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মন থেকেও বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি থেকে হিরণ্যগর্ভ বা অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ।)

পরা মানে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু এখানে পরা সূক্ষ্মের অর্থে বলা হচ্ছে। যে জিনিষটা যত সূক্ষ্ম সেই জিনিষকে তত শ্রেষ্ঠ বলছেন। জগতের দিকে যে যাত্রা তাতে যে জিনিষ যত স্থূল সেই জিনিষ তত শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এখানে আত্মজ্ঞানের দিকে যাত্রার কথা চলছে। আত্মজ্ঞান অভিমুখী মানে জগতের বিপরীত পথ, এই পথে যে জিনিষ যত সূক্ষ্ম সেই জিনিষ তত শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ মানে পরা, তাই এখানে পরা শব্দ বলছেন।

ইন্দ্রয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা, অর্থ মানে বিষয়, বলছেন ইন্দ্রিয়সমূহের থেকে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ সূক্ষ্ম। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আর তার যা কিছু আছে, যেমন আমরা গ্লাশ, বোতল, মাইক্রোফোন দেখছি, এগুলোকে বিষয়

বলছেন। কিন্তু এখানে এই বিষয়ের কথা বলা হচ্ছে না, বিষয় বলতে তন্মাত্রার কথা বলছেন, যে তন্মাত্রা দিয়ে এই সংসার নির্মিত হয়েছে। সব থেকে স্থূল হল এই জগৎ। উদ্দেশ্য হল আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে স্থূল জগতকে নিয়ে ঋষিরা কোন কথাই বলবেন না, এনাদের কাছে স্থূল জগতের কোন দাম নেই। স্থূল জগতে বিজ্ঞানের কোন থিয়োরী চলবে, কোন থিয়োরী চলবে না তাতেও এনাদের কিছু যায় আসে না। আর স্থূল জগতের কিসের থেকে তুমি কি জ্ঞান প্রাপ্ত করবে তারও কোন দাম নেই। দাম একমাত্র আত্মজ্ঞানের, আত্মজ্ঞানেরই যখন দাম তখন তাঁরা স্থূল জগতকে ছেড়েই দিয়েছেন। কিন্তু স্থূল জগতের দুটো জিনিষকে ধরছেন, এই দুটো জিনিষই কাজ করে, একটা হল ইন্দ্রিয়, যার দ্বারা জগতকে ধারণা করছে আর দ্বিতীয় যে শক্তি এই জগতকে তৈরী করে রেখেছে। সেইজন্য এখানে বলছেন ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়ের জন্য যে বিষয়গুলো তৈরী করা আছে। অর্থ মানে হয় যেটার জন্য। এই যে বিষয়, জগৎ রূপে যেটা আমরা দেখছি, এর কোন দাম নেই, জগতের পেছনে যে শক্তিগুলো রয়েছে তারই আসল দাম, সেইজন্য বলছেন *ইন্দ্রয়েভ্য পরা হ্যর্থা*। ইন্দ্রিয়ার্থ মানে ইন্দ্রিয়ের জন্য, ইন্দ্রিয়ের জন্য হল বিষয়। বিষয় বলতে এখানে সূক্ষ্ম বিষয় অর্থাৎ তন্মাত্রাকে বলছেন। তা নাহলে যুক্তিতে দাঁড়াবে না। অনেক জায়গায় কখন সখন *ইন্দ্রিয়ার্থে* বলতে স্থূল জগতকেও বোঝায়, ইন্দ্রিয়ের জন্য যেটা আছে। আমরা যেমন বলি – কী অর্থে আসা হল, বলতে চাইছেন কিসের জন্য আসা হল। ইন্দ্রিয়গুলোকে কিসের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে? কিছু জিনিষকে ধরার জন্য। যে বস্তুগুলো ইন্দ্রিয় ধরেছে আর ইন্দ্রিয় এই দুটিকে সফল করার জন্য। তোমার জগৎ যে পরিভাষিত হয় সেটা হয় তোমার ইন্দ্রিয় দিয়েই। সেইজন্য ইন্দ্রিয়কে বলছেন সূক্ষ্ম। বাইরের চোখ, কান, নাক ইন্দ্রিয় নয়, এগুলোকে বলা হয় গোলক, গোলক মানে ছিদ্র। ইন্দ্রিয় মানে, এই ছিদ্রগুলো দিয়ে জগতের যে তথ্যগুলো সরবরাহ হয়ে মস্তিষ্কের যে কেন্দ্রে গিয়ে এর প্রসেসিং হয়, ঐটাকে বলছেন ইন্দ্রিয়। চোখ দিয়ে দৃশ্য যাওয়ার পর মস্তিষ্কের যে জায়গাতে দৃশ্যকে অনুভব করছে সেটাকে বলছেন চক্ষু ইন্দ্রিয়। মস্তিষ্কের যেখানে ঘ্রাণের অনুভব করা হয় সেটা হল ঘ্রাণেন্দ্রিয়। যার জন্য বাইরের চোখ যদি নষ্ট হয়ে যায় তাতে চক্ষু ইন্দ্রিয় নষ্ট হয়ে যাবে না। চোখ, কান, নাক এগুলো বাহ্যিক যন্ত্র। ডাক্তাররা যেমন স্টেথো, মাইক্রোস্কোপ লাগান, ঠিক তেমনি ইন্দ্রিয়ের সাথে চোখ, কান, নাক এগুলো লাগানো আছে। স্টেথো সরিয়ে দিলে তার শ্রবণ শক্তি চলে যাবে না, ঠিক তেমন কান যদি না থাকে শ্রবণেন্দ্রিয় নষ্ট হয়ে যাবে না। আসল ইন্দ্রিয়গুলো পেছনে রয়েছে কিন্তু এগুলোকে ইন্দ্রিয়ের দরকার হয়। তাই বলছেন ইন্দ্রিয় এই জগতকে ধরে, কিন্তু জগতকে এনারা প্রথমেই ছেড়ে দিয়েছেন।

ইন্দ্রিয় যেটাকে ভোগ করে সেটাই হয় ইন্দ্রিয়ার্থ। কিন্তু ইন্দ্রিয়ার্থ বলতে বহির্জগত নয়, তন্মাত্রার জগতের কথা বলছেন, যে তন্মাত্রা দিয়ে এই বহির্জগতটা নির্মিত হয়েছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ যে পাঁচটি তন্মাত্রার কথা আগে আলোচনা করা হয়েছিল, সেই পাঁচটিকে ইন্দ্রিয়ার্থ বলছেন। ইন্দ্রিয়ের তুলনায় এই পাঁচটি আরও সূক্ষ্ম সেইজন্য এরা শ্রেষ্ঠ। এর আগে আলোচনা করা হয়েছিল, যোগীরা যখন ধ্যান করেন তখন দেখেন ইন্দ্রিয় যে জিনিষটাকে ধরছে, যেমন চক্ষু ইন্দ্রিয়ে দিয়ে আমি এই জল দেখছি, তার মানে মনকে ধ্যান করতে করতে এমন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন যেখানে তার কাছে জলের কোন গুরুত্ব থাকছে না। জলকে দেখার জন্য সাংসারিক বুদ্ধির দরকার, বেদ উপনিষদ সংসারকে জানার জন্য নয়, তাই ধ্যান করতে করতে দেখেন জল রস তন্মাত্রা দিয়ে নির্মিত। ইন্দ্রিয় দিয়ে এতদিন যে জল ধরছিল সেই ইন্দ্রিয় থেকে জলের রস তন্মাত্রা আরও সূক্ষ্ম। যে জিহ্বা দিয়ে জলকে আস্বাদ করছিল, তৃষ্ণা নিবারণ করছিল, শরীরকে চালাচ্ছিল, সেই জলের কোন দাম নেই, জলের পেছনে যে রস তন্মাত্রা সেটা সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম হওয়ার জন্যই আমরা ধরতে পারছি না। কারণ আমাদের মনের সেই একাগ্রতা নেই, একাগ্রতার যে ক্ষমতা তাতে আমরা শুধু স্থূল জিনিষই দেখতে পাই। তাই চোখ দিয়ে এই জল দেখছি যার কোন রঙ নেই, জিহ্বা দিয়ে এর আস্বাদ নিচ্ছি। আমরা অত্যন্ত স্থূল বলে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোও অত্যন্ত ভোঁতা।

এবার একটা একটা করে পেছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। *ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা* বলার পর আরও পেছনে গিয়ে বলছেন *অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ*, ধ্যানের আরও গভীরে দেখছেন, যে তন্মাত্রা দিয়ে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নির্মিত, সেই তন্মাত্রা থেকেও বেশি সূক্ষ্ম হল মন। এই মন দিয়েই সব কিছুকে ধরা হয় আর মনের যে সঙ্কল্প-বিকল্প রূপ, সেটাকে সামনে এনে বলছেন, তন্মাত্রা থেকেও বেশি সূক্ষ্ম হল মন। যদি মনের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এসে যায় তখন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণও খুব সহজ হয়ে যায়।

মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ, মন থেকে বুদ্ধি আরও সূক্ষ্ম, বুদ্ধি মানে নিশ্চায়াত্মিকা। অধ্যাবসায়, লেগে থাকা এগুলো যার ধর্ম, যে সবার রাজা, সবাইকে চালাচ্ছে সেই বুদ্ধি আরও সূক্ষ্ম। এক একটা জিনিষকে জয় করে নেওয়া হচ্ছে। যে জিনিষটা যত সূক্ষ্ম সেই জিনিষকে ধরা তত কঠিন হয়ে যায়। যে জিনিষকে ধরা যত কঠিন সেই জিনিষকে নিয়ন্ত্রণ করা তত কঠিন। স্থূল জিনিষকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় কিন্তু সূক্ষ্ম জিনিষকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। ইন্দ্রিয়, তন্মাত্রা, মন এদের থেকে বুদ্ধি সূক্ষ্ম বলে একে নিয়ন্ত্রণ করা খুব কঠিন। সেইজন্য ঠিক ঠিক বুদ্ধির স্তরে থাকা লোক খুব কম দেখা যায়। যাঁরা বুদ্ধির স্তরে থাকেন, তাঁদের মন তাঁদেরকে দিয়ে সঙ্কল্প বিকল্প করাতে পারবে না।

স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ সব সময় খুব strict disciplineএর মধ্যে থাকতেন। মঠের জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন, পরে ভাইস-প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। মহারাজের সব কাজকর্ম কাঁটায় কাঁটায় বাঁধা থাকত। বিকেল পাঁচটায় হাঁটতে যেতেন। ভাইস-প্রেসিডেন্ট, ট্রাস্টির অন্যতম সদস্য তিনি। ট্রাস্টি মিটিংএ ওনাকে থাকতে হত, কিন্তু যেই পাঁচটা বাজতে যেত উনি সঙ্গে সঙ্গে বলতেন It is 5 pm, time for my walk, keep the remaining agenda for tomorrow, বলেই উঠে বেরিয়ে যেতেন। সেখানে প্রেসিডেন্ট মহারাজ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীও বসে আছেন। আগে থেকেই নির্দিষ্ট আছে মিটিং তিনটে থেকে পাঁচটা। পাঁচটা বেজে গেছে, এরপর মিটিং পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটা যতই গড়াক এখন time for walk। মহারাজের সেবক বলতেন – ভোর চারটের সময় উঠে মহারাজ ধ্যান করতেন, সেবকরাও বসে থাকত। একদিন কোন কারণে ভোর তিনটের সময় ঘুম ভেঙে গেছে, উনি কিন্তু বিছানা থেকে উঠবেন না। বিছানাতেই এপাশ ওপাশ করছেন, ঠিক চারটে বাজল বিছানা ছেড়ে উঠে বসে পড়লেন। ঘুম ভেঙে গেলেও উঠবেন না, এত ডিসিপ্লিন মেইনটেইন করতেন। বুদ্ধির উপর এমন তাঁর নিয়ন্ত্রণ যে, ট্রাস্টি মিটিং চলছে, বসব, নাকি বসব না, কোন সঙ্কল্প-বিকল্প নেই, পাঁচটা বেজে গেছে এখন আমার হাঁটার সময়। বাইরে কোথাও যাওয়ার থাকলে মহারাজ তাঁর সেবককে জিজ্ঞেস করতেন 'কটার সময় আমাদের বেরোতে হবে'? হাওড়া থেকে রাত আটটায় ট্রেন, সেবক বলে দিলেন ছটার সময়। মহারাজ চোখে ভালো দেখতে পেতেন না, তাই ঘড়িও পড়তেন না। চা খাওয়া হয়ে গেল, সেবককে জিজ্ঞেস করলেন কটা বাজল, সেবক বললেন সাড়ে পাঁচটা। আবার কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করলেন কটা বাজল, পৌনে ছটা, কটা বাজল, পাঁচটা পঞ্চান্ন, is it six, ছটা যেমনি বলে দিলেন উনি সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে আসবেন। কোন কারণে যদি গাড়ি না আসে বা ট্রেন যদি লেট থাকে উনি আর ঘরে থাকবেন না, এত বুদ্ধির উপর নিয়ন্ত্রণ, গাড়ি এলে বেরোব নাকি এখন বেরোব, ঠিক আছে গাড়ি আসেনি ঘরে গিয়েই না হয় বসি। কোথাও যাওয়ার থাকলে গাড়ি একটু দেরী হলে, ট্রেন লেট থাকলে আমরা এমন ছটফট করি যে দেখে এ্যবনর্মাল মনে হবে। সেবকদের খুব অস্বস্থি হত, উনি কতক্ষণ বাইরে বসে থাকবেন! সেইজন্য মহারাজ জিজ্ঞেস করলে সেবক বুদ্ধি করে বলতেন 'মহারাজ! আপনি এখন ঘরে থাকুন যাবার সময় আমরা এসে আপনাকে জানিয়ে দেব'। এই হল বুদ্ধির উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, শব্দ, স্পর্শ ছেড়ে দিন, সঙ্কল্প-বিকল্পই আসবে না। বুদ্ধির উপর এই ধরণের নিয়ন্ত্রণ হয় না। ঠাকুর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন, যারা তীর চালায় তারা প্রথমে কলাগাছ বেধে, সেখান থেকে অনুশীলন করতে করতে শেষে উড়ন্ত পাখিকে মারতে পারে, বুদ্ধির উপর নিয়ন্ত্রণ পাওয়া মানে উড়ন্ত পাখিকে মারা, আরও সূক্ষ্ম।

মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরা, যে বুদ্ধির কথা বলা হল, এই বুদ্ধির থেকে প্রত্যেক মানুষের ভেতরে যে প্রত্যগাত্মা আছেন তিনি আরও পরম, আরও শ্রেষ্ঠ, আরও মহৎ। প্রত্যগাত্মা মানে ভেতরে যিনি বাস করেন। আমরা যে অর্থে আত্মা জানি, যিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, সেই অর্থে এই আত্মাকে বলছেন না। এই আত্মা সর্বব্যাপী আত্মা নয়। এই আত্মা অহঙ্কারকে বলছেন, যেখানে আমি ভাব আসছে। আচার্য এর ব্যাখ্যা করে বলছেন, অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে প্রথম যার জন্ম হয়েছে সেই হিরণ্যগর্ভ তত্ত্ব আর যে আত্মা বোধাত্মক, অর্থাৎ জীবাত্মা, এই জীবাত্মা বুদ্ধি থেকেও শ্রেষ্ঠ। একটু আগেই আমরা আলোচনা করছিলাম প্রকৃতি, প্রকৃতি থেকে মহৎ, মহতের পরে অহঙ্কার, অহঙ্কারের পরে আসে তন্মাত্রা। তন্মাত্রা থেকে আসে প্রাণ আর বুদ্ধি। বুদ্ধিরই একটা অঙ্গ হয়ে যায় মন আর অন্য দিকে ইন্দ্রিয়াদি। সৃষ্টি তত্ত্বে প্রকৃতির পরে মহৎ, মহতের পরে অহঙ্কার। মহতেরই প্রথম বোধ আসে আমি আছি। এই আমি বোধই মানুষের ভেতরে প্রত্যগাত্মাতে যে আমি

বোধ সৃষ্টি করে রাখে, যে আমি বোধ দিয়ে, জ্ঞান শক্তি দিয়ে, ক্রিয়া শক্তি দিয়ে সেই সর্বব্যাপী আত্মাকে ঘিরে রেখেছে, যার নীচে বুদ্ধি কাজ করছে, মন কাজ করছে, প্রাণ কাজ করছে, সে বুদ্ধির থেকেও শ্রেষ্ঠ। অনেক দার্শনিকরা এই জায়গাতে এসে অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু এখানে বলছেন বুদ্ধি থেকে আত্মা আরও শ্রেষ্ঠ। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে বুদ্ধির থেকে সেই সর্বব্যাপী আত্মাকে শ্রেষ্ঠ বলছেন, খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হবে। কিন্তু পরের মন্ত্রকে একসাথে নিয়ে অর্থ করলে অন্য রকম হয়ে যাবে। এই আত্মাকে তাই অহঙ্কার বা মহৎ তত্ত্ব বলছেন, যেখানে সেই বুদ্ধির খেলা চলছে। পরের মন্ত্রে বলছেন –

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষায় পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।।**১/৩/১১**।।

(হিরণ্যগর্ভ থেকে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত থেকে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষ থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, পুরুষই সকলের পরাকাষ্ঠা, তিনিই পরমগতি।)

আগের মন্ত্রে বললেন বুদ্ধির থেকে শ্রেষ্ঠ আত্মা, এই আত্মা সমষ্টি মন, যেখানে আমি বোধটা এসে গেছে। স্বামীজী সূর্যলোক, চন্দ্রলোক, দ্যুলোকের কথা বলছেন, দ্যুলোকের পরেই ব্রহ্মলোক। দ্যুলোক আর ব্রহ্মলোকের দুটি অবস্থাতে সাধক নিজেকে বিভিন্ন ভাবে দেখে কিন্তু তার মধ্যে মূল ভাব হল সব ভাবকেই সে আমি বোধ নিয়ে দেখে। আমিটা থেকে যাচ্ছে আর আছি এই বোধটাও থাকে, এই বোধকেই বলে মহৎ, যেখানে তিনি পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একটা সমষ্টি বুদ্ধি বা সমষ্টি মন রূপে দেখছেন। এই সমষ্টি মনকেই আগের শ্লোকে আত্মা বলছেন। আর আমাদের সবার মধ্যে যিনি প্রত্যগাত্মা রূপে রয়েছেন তিনি নিজেকে আমি রূপে দেখেন, মহৎকেও তাই আত্মা বলা হয় কারণ তাঁর ভেতরেও আমি বোধটা আছে। যেখানেই আমি বোধ, আমি বোধ মানেই আবরণ এসে যাচ্ছে। বৃহতে যে কাজ মহৎ করে আমাদের ভেতরের জীবাত্মা সেই একই কাজ করে। জীবাত্মার উপর থেকে আবরণকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে মহৎ তার আবরণকে সরিয়ে দেওয়া হল। ঐ আবরণকে সরিয়ে দেওয়ার পর তাঁকে বলছেন *মহতঃ পরম্ অব্যক্তম্*, এই মহৎ থেকেও শ্রেষ্ঠ হল প্রকৃতি। উপনিষদ ধীরে ধীরে আমাদের পেছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সবার আগে ইন্দ্রিয়গুলিকে ছাড়ছেন, তারপরে এসে তন্মাত্রাগুলিকে ছেড়ে দিচ্ছেন, তন্মাত্রাকে ছাড়ার পর বুদ্ধিকে ছাড়ছেন, এই বুদ্ধিকে ছাড়ার পর অহম্ বোধ যে জায়গাটায় আছে, যাকে সমষ্টি মন বা মহৎ বলছেন, সেটাকেও বাদ দিচ্ছেন, সেই মহতকে বাদ দেওয়ার পর বলছেন *মহতঃ পরম্ অব্যক্তম্*।

প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলছেন, কারণ ওখানে তিনি কখনই ব্যক্ত হন না। সচ্চিদানন্দ থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি, সৃষ্টির সব কিছুই বুদ্ধির গোচর হয় কিন্তু অব্যক্ত বুদ্ধির গোচর হয় না, কারণ তিনি নিজেই সেই বুদ্ধি। তখন সেখানে সূক্ষ্ম রূপে তাঁর অস্তিত্বটুকু শুধু রয়েছে। স্বামীজী বলছেন, এখানে মানুষ নিজেকে ব্রহ্মা রূপে দেখে, হিরণ্যগর্ভ রূপে দেখে বা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে নিজেকে এক দেখে। কিন্তু আমি আলাদা তিনি আলাদা এই বোধটা থেকে যায়। ধ্যানের গভীরে বাস্তবিক এভাবেই দেখেন। *মহতঃ পরম্ অব্যক্তম্*, ধ্যানের গভীরে পরিষ্কার ঈশ্বরকে দেখছেন, কিন্তু মাঝখানে একটা ক্ষীণ আবরণ থেকে যায়। লণ্ঠনের আলো, আলোর প্রকাশ সবই দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ছুঁতে গিয়ে দেখছেন একটা কাঁচের ব্যবধাণ রয়েছে। কাঁচটা এমন স্বচ্ছ যে মনে হয় না যে কোন ব্যবধান আছে, অথচ ব্যবধান আছে। এই ব্যবধানটাই প্রকৃতি বা অব্যক্ত।

সেখান থেকে আরেক ধাপ পেছনে এসে দেখছেন *অব্যক্তাদ্ পুরুষঃ পরঃ*, অব্যক্ত থেকেও পুরুষ শ্রেষ্ঠ। যেখানে বললেন *বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ*, যদিও সেখানে আত্মা শব্দটা নিয়েছেন, কিন্তু ঠিক ঠিক শব্দ হল পুরুষ, যেটাকে এগারো নম্বর মন্ত্রে এসে বলছেন। মহতের থেকে আরও সূক্ষ্ম বা শ্রেষ্ঠ হল অব্যক্ত, আর এই অব্যক্ত থেকে আরও সূক্ষ্ম বা সূক্ষ্মতর যেখানে আর কোন কিছুর তুলনা চলে না তিনি হলেন পুরুষ, যিনি চৈতন্যময়। *পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ*, এই পুরুষ থেকে আর কোন কিছুই শ্রেষ্ঠ হয় না। যদি বলা হয় পুরুষের থেকেও শ্রেষ্ঠ কে? রাজা জনকের দরবারে পণ্ডিতদের সভায় গার্গীও এই প্রশ্নই করে যাচ্ছিলেন – ইন্দ্রিয় থেকে শ্রেষ্ঠ তন্মাত্রা, তন্মাত্রা কোথায় প্রতিষ্ঠিত? বুদ্ধিতে। বুদ্ধি কোথায় প্রতিষ্ঠিত? মহতে। মহৎ কোথায় প্রতিষ্ঠিত? অব্যক্তে। অব্যক্ত কোথায় প্রতিষ্ঠিত? পুরুষে। পুরুষ কোথায় প্রতিষ্ঠিত? তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন, গার্গী! না বুঝে শুনে প্রশ্ন করবে না, পুরুষই শেষ কথা।

কেন শেষ কথা? *সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ*, কাষ্ঠা মানে ঐটাই শেষ কথা, কাষ্ঠবৎ থেমে গেল, এরপর আর কিছু নেই, ঐটাই শেষ সীমা, শেষ কথা। তিনি অনন্ত, তাঁর পরে আর কোন কথা হয় না। ধ্যানের গভীরে যেতে যেতে প্রথমে বহির্জগতকে ছেড়ে দেওয়া হল, বহির্জগতকে ছেড়ে দেওয়ার পর দেখছে ভেতরে ইন্দ্রিয়গুলো খেলা করছে, ইন্দ্রিয় সমুদয় বাইরে কোথাও নেই সব ভেতরে, সূক্ষ্ম তত্ত্ব অর্থাৎ তন্মাত্রাগুলিকে নিয়ে খেলা করতে থাকে। খেলাটাও বন্ধ করে দিল, তখন দেখছে তন্মাত্রার পেছনেও রয়েছে বুদ্ধি, বুদ্ধিরও পেছনে রয়েছে সমষ্টি বুদ্ধি, সমষ্টি বুদ্ধিরেও পেছনে রয়েছে অব্যক্ত। এরপর অব্যক্তের পেছনে বলে আর কিছু থাকে না, যা থাকে তাই থাকে, কারণ তিনি নিত্য, সর্বব্যাপী আর আত্মার যত রকমের গুণ থাকতে পারে। সেটাকে বলছেন শেষ সীমা, *সা কাষ্ঠা*। ওখানে গিয়ে সব কিছু যেন থেমে গেল, ওটাই শেষ গতি, আসলে এরপর আর কোন গতি হয় না। নদী হিমালয় থেকে নেমে এদিক ওদিকে ঘুরতে ঘুরতে একবার সমুদ্রে এসে মিশে গেলে নদীর আর কোন গতি থাকে না। সমুদ্রে মিশে যাওয়ার আগে তার গতি ছিল। আমরা এখানে নদীর উপমা নিচ্ছি, নদী আলাদা আর সমুদ্রও আলাদা। এই জায়গাতে কিন্তু তা হয় না, এখানে *সা কাষ্ঠা*, যে শেষ সীমা এটা তুমি নিজে। তুমি এতক্ষণ ইন্দ্রিয়ের সাথে নিজেকে জুড়ে রেখেছিলে, সেখান থেকে তন্মাত্রা, বুদ্ধি, মহৎ হয়ে হয়ে দেখছ আমিই সেই পুরুষ। তুমি নিজেকে জেনে গেলে, এরপর তাই আর কোন গতি নেই।

আচার্য অব্যক্তের ব্যাখ্যা করছেন *মহতোহপি পরং সূক্ষ্মতরং প্রত্যগাত্মভূতং সর্বমহত্তরং*, সব কিছুর থেকেও প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ। গীতাতেও প্রকৃতিকে কূট বলছেন *কূটস্থোক্ষর উচ্যতে*, প্রকৃতি যেন সব কিছুর রাশি। আপেক্ষিক জগতে প্রকৃতির থেকে বড় আর কিছু হতে পারে না। কারণ সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থূল জগৎ, সূক্ষ্ম জগৎ সব জগতকে মিলিয়ে যে পুরো রাশি, সব কিছু যেখানে রাশিকৃত হয়ে আছে সেটাই অব্যক্ত। অব্যক্তকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না। কারণ ইন্দ্রিয় তন্মাত্রা থেকে বেরিয়েছে, মন দিয়েও জানা যাবে না কারণ মনেরও জন্ম ওখান থেকে, সেইজন্য প্রকৃতির আরেকটা নাম অব্যক্ত। আর বলছেন যত কার্য-কারণ শক্তি আছে সব শক্তির সমাহার এই প্রকৃতি, সব শক্তি প্রকৃতিতে মিশে আছে। যে শক্তিতে কার্য হয় সেই শক্তি আর কার্যের পেছনে যে কারণ, সব শক্তির মূলে প্রকৃতি। এই প্রকৃতিকেই আমরা মা কালী বলি, মা কালী মানে সবটাই তিনি। কার্য শক্তি যেটা সেটাও তিনি আর কারণ যত আছে সেটাও তিনি। মা কালী অসুর হয়েছেন, মা কালীই আবার দেবতা হয়ে অসুরদের বধ করছেন, কার্যটাও তিনি, কারণটাও তিনি, সবটাই তিনি। আমরা বলি ভালোটাও তিনি মন্দটাও তিনি, তাহলে পুলিশ চোরকে ধরছে, বলতে হয় তিনিই চোর হয়েছেন আবার তিনিই পুলিশ হয়েছেন। কিন্তু এগুলো ভগবান নিজে সরাসরি হন না, তাঁর ক্রিয়াশক্তি দিয়ে হন। ক্রিয়াশক্তি মানেই প্রকৃতি, প্রকৃতি হল সব কিছুর সমাহার, ঐ জায়গায় গিয়ে সব এক হয়ে যাচ্ছে। যেখানে ক্রিয়াশক্তি সেখানেই তিনি, সব কিছু তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে।

বটবৃক্ষে যে শত শত লাল লাল ফল হয়, তার একটি ফলেই হাজার খানেক বীজ থাকে। ঐ একটি ছোট্ট ক্ষুদ্র বটবৃক্ষের বীজের মধ্যে সমস্ত শক্তি ওতপ্রোত ভাবে সুপ্ত হয়ে আছে। আচার্য বলছেন, অব্যক্ত পরমাত্মাতে ওতপ্রোত ভাবে আশ্রিত হয়ে আছে। এর আগে যেখানে *তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্* বলছেন, সেখানে নির্গুণ নিরাকার আর সগুণ সাকার দুটোকে একই বলছেন, আর এখানেও প্রকৃতিকে মায়া বলছেন না। আচার্য বলছেন *পরমাত্মনি ওতপ্রোতভাবেন সমাশ্রিতং*, যিনি প্রকৃতি, যিনি অব্যক্ত, যিনি মায়া তিনি পরমাত্মার সাথে ওতপ্রতোভাবে সম্যক রূপে আশ্রিত হয়ে আছেন। আমাদের একটা প্রচলিত ধারণা শঙ্করাচার্য ঘোর অদ্বৈতবাদী, তিনি শক্তি, জগৎ এগুলো মানেন না ইত্যাদি। কিন্তু এখানে আচার্য বলছেন জগৎ, কার্য আর ক্রিয়াশক্তি পরমাত্মার সাথে ওতপ্রোতভাবে এক। আমরা বলছি শ্রীমা হলেন ঠাকুরের শক্তি, এতে কোন নতুন কথা বলা হচ্ছে না। আচার্যও একই কথা বলছেন, ক্রিয়াশক্তি বা জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি পরমাত্মার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে রয়েছে। কিন্তু ঐ শক্তি দেখা যাচ্ছে বলে এর নাম হয়ে গেল শক্তি, যতক্ষণ দেখা যাবে না ততক্ষণ পরমাত্মা। কিন্তু যেটা দেখা যাচ্ছে সেটাও বাস্তবিক নয়, বাস্তবিক হলে এর সত্তা স্বাধীন সত্তা হয়ে যাবে। পরমাত্মা ছাড়া আর কোন কিছুর স্বাধীন সত্তা থাকতে পারে না, তাই এর আরেকটি নাম মায়া। অনেক সময় লোকেরা মায়া বলতে মিথ্যা, চালবাজী মনে করে। কিন্তু তা নয়, মায়া মানে তার বাস্তবিক সত্তা নেই। বাস্তবিক সত্তা নেই, তার মানে, ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে এক হয়ে আছে। ঠাকুর যেমন বলছেন জল হেললে দুললেও জল, স্থির থাকলেও জল। এই হেলা দোলার জন্য একটা ভেদ আসছে, জলকে অন্য রকম দেখাচ্ছে। এই যে ভেদ দেখাচ্ছে বা

অন্য রকম দেখাচ্ছে এটা কি বাস্তবিক নাকি একটা উপাধি? এটাই উপাধি, সেইজন্য এর একটা পরিভাষা হল মায়া। মায়া অত্যন্ত একটা গূঢ় শব্দ, সেইজন্য লোকেরা মায়া শব্দকে ধরতে পারে না, মায়া বলতে তারা সব সময় অলীক ভাবে, মায়া বলতে জাদু মনে করে, মায়া বলতে ধাপ্পা মনে করে। কিন্তু মায়া তা নয়, মায়া মানে জিনিষটা যেমনটি দেখাচ্ছে বাস্তবিক তেমনটি নয়। পরমাত্মা বা ভগবানের মধ্যে কখন পরিবর্তন হতে পারে না, অথচ পরিবর্তন হতে দেখাচ্ছে। এই যে আছেন অথচ দেখাচ্ছেন অন্য রকম, এটাই মায়া। কিন্তু যে শক্তিতে এই সব কিছু হয় সেই শক্তি পরমাত্মার সাথে ওতপ্রোতভাবে এক হয়ে আছে। সেইজন্য আচার্যও অন্য জায়গায় বলছেন শক্তি আর শক্তিমান এক। ঠাকুর অন্য ভাবে বলছেন সাপ আর তার তির্যক গতি এক। তির্যক গতি ছাড়া সাপ ভাবা যায় না, তির্যক গতিকে কখন সাপ ছাড়া ভাবা যায় না। ঠিক তেমনি পরমাত্মা আর তাঁর শক্তি, ব্রহ্ম আর শক্তিকে আলাদা ভাবা যায় না। এই কথাই বলছেন। অব্যাক্ত কে? সেই পরমাত্মারই শক্তি, যে শক্তি তাঁর সাথে ওতপ্রোত হয়ে আছে।

অব্যক্ত পরমাত্মার সাথে ওতপ্রোত ভাবে মিশে আছে, যার ফলে জগৎ চলছে। কিন্তু অব্যক্তর থেকেও পুরুষ সূক্ষ্ম বা শ্রেষ্ঠ, পুরুষকে তাই সহজে জানা যায় না। ঠাকুর মা কালীকে জানেন কিন্তু তিনিও আত্মজ্ঞানের দিকে এগোতে পারছেন না, কারণ আত্মা আরও সূক্ষ্ম। তিনি সমস্ত কারণেরও কারণ। আগে বলা হল অব্যক্ত সমস্ত কার্য কারণের সমাহার, কিন্তু ঐ অব্যক্তেরও আরেকটা কারণ পেছনে রয়েছে। সব কিছুর প্রত্যগ্ আত্মস্বরূপ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, প্রত্যেকটি জিনিষের তার যে সত্তা সেই পরমাত্মাতেই আশ্রিত। পিঠের মধ্যে যেমন পুর থাকে, ঠিক তেমনি প্রত্যেকটি জিনিষের মধ্যে পুর দেওয়া আছে, সেই পুরে তাঁর বাস সেইজন্য তাঁর নাম পুরুষ বা এই শরীররূপী নগরে বা পুরে যিনি বাস করেন তিনি পুরুষ। সব কিছুতে তিনি পুরিত। একটা যে এ্যটম বা ইলেক্ট্রন তার মধ্যেও তিনি পুরিত হয়ে আছেন। শুধু যে মানুষের মধ্যেই আছেন তা নয়, প্রত্যেকটি জিনিষের মধ্যে তিনি পুরিত হয়ে আছেন বলে তাঁর নাম পুরুষ। এই চিদ্ঘন, যিনি চৈতন্য মাত্র, এই পুরুষ থেকে আর কোন কিছু শ্রেষ্ঠ নেই। যাবতীয় যা কিছু আছে, যত সূক্ষ্মত্ব, মহত্ত্ব সব কিছুর পরাকাষ্ঠা এই পুরুষ। সমুদ্রে গিয়ে সব যেমন শেষ হয়ে যায়, তেমনি একটা থেকে আরেকটাকে সূক্ষ্ম বলা হচ্ছে, পর বলা হচ্ছে, সব কিছুর পরাকাষ্ঠা, কাষ্ঠা মানে শ্রেষ্ঠ বা শেষ কথা হল আত্মা।

এতক্ষণ ইন্দ্রিয় থেকে শুরু করে পর পর সব কিছুকে দেখা যাচ্ছিল, সব কিছুকে অতিক্রম করা যাচ্ছিল। কিন্তু যাওয়ার মত জগতে যা কিছু আছে তার মধ্যে আত্মার প্রতি যে গতি এর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কোন গতি নেই। কারণ এখানে গেলে আর কোন দিন ফেরত আসতে হয় না। যত লোকের কথা বলা হল, সূর্যলোক, চন্দ্রলোক, দ্যুলোক, যে লোকেই যাক না কেন, সেখান থেকে সবাইকে আবার ফিরে আসতে হয়। একমাত্র সেই যে পরা গতি, ঐ জায়গাতে চলে যাওয়ার পর কাউকেই আর কোন দিন ফেরত আসতে হবে না। গীতাতেও ভগবান বলছেন *যদ্ গত্বা নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম*, যেখানে গেলে আর কাউকে ফিরে আসতে হয় না সেটাই আমার পরম ধাম। ধ্যানের গভীরে একটার পর একটা ধাপকে অতিক্রম করে যাচ্ছেন, সেখানে যতক্ষণ আমি বোধ আছে ততক্ষণ সেখান থেকে তাকে আবার ফেরত আসতে হবে। শেষে একটা মাত্র বোধ থাকে, আমি ভক্ত, সেখান থেকেও সাধারণ ভক্তকে ফেরত আসতে হবে। কিন্তু একবার শেষ জ্ঞান, আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে বাকি সব কিছু তখন খসে পড়ে যায় এরপর আর তাকে ফেরত আসতে হবে না।

কিন্তু তা কি করে সম্ভব? যেখানেই গতি সেখানেই আবার অগতি। যদি কেউ আত্মাতে পৌঁছে যেতে পারে তাহলে সে আত্মা থেকে আবার ফেরত আসবে এটাই আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে বলে। মানুষ যদি কোথাও গিয়ে থাকে সেখান থেকে তাকে একদিন না একদিন ফিরে আসতে হবে। কিন্তু বলছেন *সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ*, ওখানে গেলে আর ফেরত আসে না, *যদ্ গত্বা নিবর্তন্তে*। কিন্তু যদি গিয়েই থাকে তাহলে তো তাকে ফেরত আসতেই হবে। তাহলে পরা গতি ব্যাপারটা তো তর্কে দাঁড়াচ্ছে না। আসলে আমরা যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধরছি, দেখছি, জানছি, এগুলো সবই ইন্দ্রিয়ের কাজ। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নেও ইন্দ্রিয়গুলো কাজ করে। ইন্দ্রিয় জগৎ থেকে আরও গভীরে যাওয়ার পর আসে নিজের মনের জগৎ। নিজের মনের জগৎ থেকে দেখছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মনের জগৎ, সেখান থেকে আরও গভীরে গিয়ে নিজেই সেই পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ প্রকৃতির অবস্থায় পৌঁছে যাচ্ছে। প্রকৃতির অবস্থারও পারে শেষ হল শুদ্ধ চৈতন্য, যেখানে আরও অন্যান্য অনুভূতি আছে

কিন্তু সংক্ষেপে বলছেন *সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ*, তারপরে আর কোন কিছু নেই। এই কথাগুলো আচার্য তাঁর শিষ্যকে বলছেন আর যমরাজ নচিকেতাকে বলছেন, এটাই আত্মোপলব্ধির পদ্ধতি। এই দুটি মন্ত্রে বলে দেওয়া হল, সাধক যখন সিদ্ধির দিকে এগোয় তখন কিভাবে এগোয়। এখানে প্রত্যেকটি ধাপে যেমন যেমন বলা হল, তন্মাত্রার স্তরে যখন যাবে তখন তার অনুভূতি কিন্তু অন্য রকম হয়ে যায়। কার কি রকম অনুভূতি হবে তার বর্ণনা করা উপনিষদের কাজ নয়, যোগশাস্ত্রে যদিও একটু বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু উপনিষদের মূল উদ্দেশ্য হল আমাদের আত্মজ্ঞানের দিকে নিয়ে যাওয়া। উপনিষদ তাই সংক্ষেপে সিদ্ধির দিকে কিভাবে এগোবে বলে দিল, তার উত্থান, তার প্রগতি এই পদ্ধতিতে হয়। যত রকম দিব্য দর্শন, জ্যোতি দর্শন, যত রকমের অনুভূতি হতে পারে সবটাই এটুকুর মধ্যেই ঘোরাফেরা করবে। মন যেমন একটার পর একটা সূক্ষ্মে যায় তেমন তেমন তার সূক্ষ্ম জগতটা খুলতে থাকে, যেমন যেমন সূক্ষ্ম জগৎ খুলতে থাকে অনুভূতিও তেমন তেমন পাল্টাতে থাকে। পরের মন্ত্রে এই আলোচনাটা শেষে হবে। তখন পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এই দুটি মন্ত্রকে একসাথে নিয়ে আলোচনা করলে প্রথমেই আমাদের বলতে হয়, এর আগে প্রাপ্তব্য বা গন্তব্যকে নিয়ে যে আলোচনা করা হয়েছিল সেটা যেন একটু ভাসা ভাসা ছিল, কিন্তু এই দুটি মন্ত্রে এবার আরও বিশদ ভাবে আলোচনা করছেন। আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে বললেন ঐ প্রাপ্তব্যকে প্রাপ্ত করার পথ কি। প্রাপ্ত করার উপায় বলার সময় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিষের উল্লেখ করা হয়েছিল, যেমন বলেছিলেন *বিজ্ঞানবান্ ভবতি*। বিজ্ঞানবান মানে যার মন নিয়ন্ত্রণে আছে, যার মন শুদ্ধ বা সংযত। শুদ্ধ মনকে অনেক ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। শুদ্ধ মন বলতে আমরা খুব সহজ ভাবে বুঝি যে মন দিয়ে ঈশ্বরকে জানা যায়। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, কামজয়ী কী না করতে পারে, তাঁর কৃপায় ঈশ্বর দর্শন পর্যন্ত করতে পারে। তার মানে, যিনি কামজয়ী তিনি যেন শুদ্ধচিত্ত। শুদ্ধচিত্তের ব্যাপারটা আধ্যাত্মিক জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ। শুদ্ধচিত্ত বলতে একটা সাধারণ ধারণা হল কামনা-বাসনা রহিত মন। বারবার যে বলা হয় শুদ্ধচিত্ত দিয়েই ঈশ্বরকে জানা যাবে, আমাদের একটু গভীরে গিয়ে ভাবতে হবে, কেন বলছেন এই শুদ্ধচিত্ত দিয়েই ঈশ্বরকে জানা যাবে। বৃত্তির দিক থেকে বলা যায় যে শান্ত মনই শুদ্ধ মন। মনে হাজার রকমের বৃত্তি উঠছে, এই বৃত্তিগুলিকে শান্ত করে দেওয়ার পর যে অবস্থা হয় যোগ সেই অবস্থাকে বলছে *তদাদ্রুষ্টুঃ স্বরূপেহবস্থানম্*, এটিও শুদ্ধ মনের একটি ব্যাখ্যা। শুদ্ধ মনের আরেকটি ব্যাখ্যা হয় খুব সূক্ষ্ম মন। কঠোপনিষদের আলোচনায় শুদ্ধ মানেই সূক্ষ্ম। যদিও *নাবারিতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ*, এই ধরণের মন্ত্র আছে কিন্তু কঠোপনিষদের মূল সুরের সাথে সামঞ্জস্য করতে গেল শুদ্ধ বলতে সূক্ষ্মকেই নিতে হবে। তাই বলে *দুশ্চরিতান্, অশান্তো, অসমাহিত* এই শব্দগুলি বাদ চলে যাবে না, শুদ্ধকে সূক্ষ্ম অর্থে নিলে কাম, ক্রোধ, লোভাদি যে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে তা নয়। কঠোপনিষদের কথা যেমন ঈশ্বরীয় কথা, ঠিক তেমনি ঠাকুর যে বলছেন কামজয়ী ঈশ্বর দর্শন পর্যন্ত করতে পারে, এটাও ঈশ্বরীয় কথা। ঈশ্বরীয় কথা কখনই দু রকমের হবে না। সূক্ষ্ম মন, শুদ্ধ মন, খুব পবিত্র মন এগুলো সব একই কথা। সেইজন্য মন যার অশুদ্ধ তার মন কখনই সূক্ষ্ম হবে না। শুদ্ধ মনই একমাত্র সূক্ষ্ম জিনিষকে ধরতে পারে। শুদ্ধ মনই কেন সূক্ষ্ম জিনিষকে ধরতে পারে এই জিনিষটাকে আমাদের খুব ভালো করে বোঝা দরকার।

স্থূল জিনিষ দিয়ে শুধু স্থূল জিনিষকেই ধরা যায়। এর আগেও আমরা এই উপমা নিয়েছি, চোখ বেঁধে একট লম্বা বাঁশ দিয়ে অন্ধকার ঘরে একটা ছোট্ট গ্লাশকে মাপার জন্য আমাকে বলা হল। আমার চোখ বাঁধা, অন্ধকার ঘর এরপর লম্বা বাঁশ নিয়ে আমি গ্লাশের মাপ নিতে গেলাম, বাঁশটা গ্লাশে গিয়ে ঠেকল। আমাকে গ্লাশ কত বড় জিজ্ঞেস করলে আমি বলব বাঁশ যত বড় তত বড়, কারণ বাঁশটা গ্লাশে গিয়েই তো লেগেছে। বাঁশ যদি এক মিটার হয় তাহলে আমি বলব গ্লাশটা এক মিটারের কাছাকাছি লম্বা। একটা বড় জালাতে যদি ঠং করে লাগে তাহলে কত বড় বলব? ঐটাই বলব, এক মিটারের কাছাকাছি। তার কারণ এক মিটারের নীচে তো আমি আর ধরতে পারব না। আমার কাছে গ্লাশ আর জালা সমান হয়ে গেল। কিন্তু যদি পাঁচ সেন্টি মিটারের বাঁশ দিয়ে জালার মাপ নিতে বলা হয়, তখন আমি পাঁচ সেন্টি মিটার করে করে মাপতে থাকব, ধরা যাক পাঁচ সেন্টি মিটার করে করে চার বার লেগেছে, তখন আমি বলব চার বার লেগেছে তার মানে জালা কুড়ি সেন্টিমিটার লম্বা। আর গ্লাশে দুবারেই হয়ে গেছে তার মানে দশ সেন্টিমিটার, আমার কাছে গ্লাশ আর জালা আলাদা হয়ে গেল। আর এক মিটার না হয়ে যদি এক মাইল লম্বা রড হয় তাহলে কি হবে? তখন এক সেন্টিমিটার থেকে শুরু করে এক মাইল লম্বা যাবতীয় যা কিছু আছে সবটাই সমান হয়ে যাবে, এটাকেই ঠাকুর

বলছেন মুরি-মুরকির এক দর। যাদের সাধারণ বুদ্ধি তাদের কাছে মুরি-মুরকির এক দড়, কারণ তাদের বুদ্ধি এত স্থূল, স্থূল মানে ঢাউস মার্কা, যে কোন জিনিষকে যখন ধরতে যাচ্ছে তখন যেন ঐ এক মাইল লম্বা রড নিয়ে মাপতে যাচ্ছে। কোন জিনিষের সাথে যেমনি টোকা লাগল সেটাই এক কিলো মিটার লম্বা মনে করবে। যার ফলে সাধারণ বুদ্ধি লোকেদের কাছে গুণ্ডা, বদমাইশ, সাধু, মহাত্মা সব সমান, কোন কিছুর তফাৎ করতে পারে না। মনই জগতের সব কিছুকে মাপার যন্ত্র, কিন্তু মন এত ঢাউস যে সূক্ষ্ম জিনিষকে সে ধরতেই পারে না। সূক্ষ্ম জিনিষকে যে জিনিষ দিয়ে মাপবে সেই জিনিষকে তার থেকেও সূক্ষ্ম হতে হবে। মন আমাদের স্থূল, স্থূল মন দিয়ে আমরা সূক্ষ্ম জিনিষ মাপতে যাচ্ছি। কঠোপনিষদেই পরে বলবে ঈশ্বর হলেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, ঈশ্বরকে জানতে গেলে ঈশ্বরের থেকেও সূক্ষ্ম জিনিষ নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু আধ্যাত্মিক সত্যানুসারে ঈশ্বরের থেকে কিছু সূক্ষ্ম হতে পারে না। তাহলে ঈশ্বরকে জানবে কি করে? ঈশ্বরকে কখনই জানা যায় না, ঈশ্বরকে বোধে বোধ করে। কিভাবে বোধ করে? তিনি যেমনটি ঠিক তেমনটি হয়ে। এই টেবিল থেকে ছোট কিছু আমি পেলাম না, কিন্তু টেবিলের সমানতা পেয়ে গেলাম, তখন আমি বলতে পারব, হ্যাঁ এবার আমি জেনে গেছি, তিনি ঠিক এই রকমটি। কিন্তু তার জন্য আমাকেও তাঁর কাঁটায় কাঁটায় সমান হতে হবে।

কিন্তু ঈশ্বরকে জানার জন্য যে ধাপগুলো অতিক্রম করতে হবে, আগে সেই ধাপগুলোকে জানতে হবে, ধাপগুলো জানার জন্যও মনকে সূক্ষ্ম করতে হবে। ইদানিং স্কেল দিয়ে সব মাপা হয়, আগেকার দিনে দর্জিদের স্কেল একটা ডাণ্ডা দিয়ে হত, কিন্তু তার মধ্যেও মার্কিং থাকত, ঐ দিয়েই চটপট মেপে নিত। ডাণ্ডার মধ্যে যে মার্কিং গুলো আছে ওটাই তার সূক্ষ্মস্বরূপ, যেটা দিয়ে সে মাপছে। মার্কিং যদি না থাকে তাহলে কোন জিনিষই মাপা যাবে না। ঈশ্বরের আগে অনেকগুলো জিনিষ রয়েছে, ঈশ্বরের আগে প্রকৃতি রয়েছে, প্রকৃতির আগে মহৎ আছে, মহতের আগে তন্মাত্রা ইত্যাদি। তন্মাত্রাকে না হয় আমরা ছেড়ে দিলাম, কিন্তু তার আগে যে মন রয়েছে, আমরা কি এই মনকে মাপতে পারছি? কারণ আমাদের মন সূক্ষ্ম নয়। জ্যোতিষীদের কাছে গিয়ে বলছে আমার হাত দেখে দিন, আমার অমুক দেখে দিন, জ্যোতিষীরাও পটাপট বলে দিয়ে পাথর, তাবিচ ধরিয়ে দিচ্ছে। পরিষ্কার মানুষের চোখে ধুলো দেওয়া ছাড়া কিছু না। কিন্তু শুদ্ধ মন যখনই কোন মানুষের সামনে দাঁড়াবে, তাঁর মন এত সূক্ষ্ম যে সেই সূক্ষ্ম মন তার সামনের মানুষের মনের গঠনটা ধরে নেয়। আমাদের মন এক মিটার লম্বা রডের মত, যে জিনিষে মনকে লাগাচ্ছি সব জিনিষকে একই সাইজের মনে হয়। সূক্ষ্ম মন সব সময় দুটো জিনিষকে পৃথক করে নিতে পারে। মনের গঠনকে যদি সূক্ষ্ম মন বা শুদ্ধ মন ধরে নিতে পারে এরপর তার উপর সব prediction স্বাভাবিক ভাবেই করে দিতে পারবে। ঠাকুর বলছেন, আমার সামনে কেউ এলে কাঁচের আলমারিতে রাখা জিনিষ যেমন স্পষ্ট দেখা যায়, ঠিক সেই রকম তার ভেতরের সব কিছুকে পরিষ্কার পড়ে নিতে পারি। অন্য জায়গায় ঠাকুর আবার বলছেন, তার মনের যে ভাব সেই ভাব আমার ভেতরে আসতে শুরু হয়। দুটো একই ব্যাপার, কোন তফাৎ নেই। স্বামীজী যে ভারতকে নিয়ে, সোস্যালিজমকে নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন, আসলে স্বামীজীর মন অত্যন্ত সূক্ষ্ম কিনা, এই সূক্ষ্ম মনকে তিনি যেখানে লাগাচ্ছেন সেটারই রহস্য উদ্‌ঘাটন করে দিচ্ছেন, যে কোন মানুষের মনে লাগালে তার মনের গঠনটা ধরে নিচ্ছেন। কার মনের গঠন ধরতে পারবেন না? যাঁর মন স্বামীজীর মনের থেকেও সূক্ষ্ম। যেমন ঠাকুর নরেনকে ধরতে পারছেন, নরেন কিন্তু ঠাকুরকে ধরতে পারবেন না, কারণ ঠাকুর হলেন আরও সূক্ষ্ম।

স্থূল মন মানেই সম্পূর্ণ তমোগুণী। যতই দৌড়াদৌড়ি করি, এটা সেটা করি, সবারই মন কিন্তু একটা ছকে বাঁধা। মানুষ কেমন একটা আবর্তের মধ্যে ঘুরে চলেছে, সে নিজেও বুঝতে পারছে না। কলকাতা ও তার আশেপাশে মানুষের কথা একবার চিন্তা করুন, সবাই কি রকম highly predictable life lead করে যাচ্ছে, সকালে উঠছে, দুটি খাবার নাকে মুখে গুঁজে ছুটছে, সেই বাস, সেই ট্রেন, সেই অফিস, অফিসে বসে সেই খবরের কাগজ, সেই চা খাওয়া আর সেই পরনিন্দা-পরচর্চা। অনেকে বলবে এদের মত ভ্রমণ পিপাসু সারা ভারতে পাওয়া যাবে না। অথচ সেখানেও সেই একই pattern চলছে, পূজোর ছুটি হবে, পনের জনের একটা দল বানাবে আর সব অজানা অচেনা জায়গায় ঘুরতে যাবে। যে জায়গা ঘোরা হয়ে গেছে সেই জায়গায় কখনই যাবে না, এখানেও তাদের predictability রয়েছে, একই জায়গায় দ্বিতীয় বার কখনই যায় না। এগুলোই তমোগুণের লক্ষণ। তমোগুণের মানুষ কখনই experiment করতে পারে না, ওর পক্ষে সম্ভবই নয়। আমাদের মনে হবে সবটাই তো নতুন, কিন্তু তা নয়, ওর মধ্যেও পুরো একটা predictability রয়েছে।

বিশ্বে নতুন যা কিছু আবিষ্কারের যে পেটেন্ট হয়, সেই নতুন আবিষ্কারের ক্ষেত্রে বিশ্বে ভারতের স্থান দ্বিতীয়, দ্বিতীয় স্থান ঠিকই কিন্তু নীচ থেকে। ভারতে সেই ট্যালেন্ট কোথায়! ভারতে ডাক্তারের সংখ্যা এক লক্ষেরও বেশি। গত একশ বছরে একজন ডাক্তারের একটা সিঙ্গল অবদান আছে, মেডিক্যাল কোন জিনিষ, সার্জিক্যাল কোন জিনিষ আছে যা কিনা সারা বিশ্বে সবারই কাজে লাগছে? সেখানে আমরা জিরো। সাহিত্যে এমন কোন বই আছে যে বই বিশ্ব স্তরে গিয়ে নাম করেছে? বিজ্ঞানে কিছু নেই, সাহিত্যে কিছু নেই, নতুন আবিষ্কারের ক্ষেত্রে কিছু নেই। কোথায় গলদ? তমোগুণে। আমরা কি করে ভাবতে পারি যে এই তমোগুণী মন ঈশ্বরকে জানবে! যার আছে হেথা তার আছে সেথা।

ভারতের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে ভারতে চিন্তা-ভাবনা নিয়ে যিনি প্রথম লিখেছেন তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতের ইতিহাসে প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত শুধু চিন্তন নিয়ে প্রথম লিখে গেছেন একমাত্র স্বামীজী, ভারতের পুরো ইতিহাসের বাকিটা শূন্য। বৈদিক ঋষিরা আধ্যাত্মিক সত্যগুলোকে দিয়ে গেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। ব্যাস, বাল্মীকি অনেক কিছু দিয়েছেন তাতেও কোন সন্দেহ নেই। তারপরেই আসে আচার্য শঙ্করের নাম। এরপর চিন্তনের জগৎ থেকে যদি কেউ কিছু দিয়ে থাকেন তিনি হলেন, প্রথম স্বামীজী। আর গত একশ বছরে বাকিটা শূন্য। কারণ আমাদের মনটাই ঘোর তমোগুণী। যেখানেই তমোগুণ হিংসা, লোভ সেখানে থাকবেই। তমোগুণ মানেই স্থূল মন, তমোগুণ মানেই অশুদ্ধ মন। সেইজন্য স্থূল মন আর অশুদ্ধ মনে কোন তফাৎ নেই, দুটোই এক। স্থূল মনের বিপরীত হল সূক্ষ্ম মন, আর অশুদ্ধের জায়গায় শুদ্ধ মন, শুদ্ধ মন যা সূক্ষ্ম মনও তাই। সূক্ষ্ম মনকেই বলে সাত্ত্বিক মন, সাত্ত্বিক মন মানে শুদ্ধ মন। তিনিই সূক্ষ্ম মনের, যিনি চটপট জিনিষগুলোকে ধরে নেন। অন্যান্য উপনিষদের তুলনায় কঠোপনিষদে উচ্চমানের মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান অনেক বেশি করা হয়েছে। কঠোপনিষদের প্রত্যেকটি মন্ত্রের পেছনে এক সুগভীর তত্ত্ব লুকিয়ে রয়েছে, যার জন্য প্রতেকটি মন্ত্রকে গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আলোচনা এত দীর্ঘ হয়ে পড়ছে। কঠোপনিষদ বলছেন *বিজ্ঞানবান্ ভবতি*, তুমি বিজ্ঞানবান হও, আসলে সূক্ষ্ম মনের অধিকারী হতে বলছেন। সূক্ষ্ম মনের অধিকারী হওয়াও যা আর শুদ্ধ মনের অধিকারী হওয়াও তাই, দুটো আলাদা কিছু নয়, শুদ্ধ মনও যা, সূক্ষ্ম মনও তাই আর শ্রেষ্ঠ মনও তাই। আজকালকার ছেলেমেয়েরা যে চ্যাটাং চ্যাটাং করে সব কিছুর জবাব দিয়ে দেয় সেটাকে আমরা inteligecne মনে করি, intelligence হতে পারে কিন্তু সেটা মেধা নয়। মেধা না থাকলে কি হবে? তার নিজস্ব field বা subjectএর বাইরে কিছু দিয়ে দিলে ল্যাজেগোবড়ে হয়ে যাবে। কিন্তু একজন খুব বড় বিজ্ঞানী যখন উপনিষদের কথা নিয়ে আলোচনা করেন বা শুনতে চাইছেন তখন বুঝতে হবে তার মন অনেক সূক্ষ্ম হয়ে গেছে, ফলে তিনি শাস্ত্রের কথা ধরতে পারছেন বলে তাঁর আগ্রহ এসেছে। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, যে লবণের হিসেব জানে সে মিছরির হিসেবও জানবে। ঠিক তেমনি যে ফিজিক্স ভালো জানে, চেষ্টা করলে সে ধর্মশাস্ত্রও ধারণা করতে পারবে। এর বিপরীতও আছে, যিনি ধর্মশাস্ত্রে বিশারদ তিনি চেষ্টা করলে ফিজিক্সও ভালো করে রপ্ত করে নিতে পারবেন।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এগুলো মূলতঃ তমোগুণের লক্ষণ। তমোগুণীর মন যেন একটা বড় ইটের ঢেলা, রজোগুণীর মন সেই ঢেলার থেকে আরেকটু ছোট, সত্ত্বগুণীর মন মানে ঢেলাটা একেবারে পাউডারের মত হয়ে গেছে। একটা পাত্রের সাইজ যদি সে জানতে চায় ঐ পাউডার জলে গুলে পাত্রে দিয়ে দিলে একটা ছাঁচ বেরিয়ে আসবে। কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষেত্রে সমস্যা হল ঈশ্বর তার থেকেও বেশি সূক্ষ্ম। এমনই সূক্ষ্ম যে ওর থেকে ছাঁচ বার করাই যাবে না। তখন ঐ ইট পাটকেল, তার যে পাউডার এগুলোর পারে চলে যেতে হবে। একেবারে বিশুদ্ধের সাথে যখন একীভূত হয়ে যাবে তখনই ঈশ্বরকে বোধে বোধ করা যাবে। ঘোড়া, লাগাম, সারথী এই উপমাগুলি দিয়ে সংযত মন কেমন হয় দেখাচ্ছেন।

ভোগে মানুষের সুখ বোধের গভীরতার মাত্রা কয়েকটা জিনিষ দিয়ে বোঝা যায়, তার একটা হল মনের involvement দিয়ে বোঝা। যদি নিউরোনের ম্যাপিং করা হয় তাতে মনের কত অংশ জড়িয়ে আছে সেটা দিয়ে বোঝা যায় ভোগের সুখ কত গভীর। তবে সব থেকে ভালো বোঝা যায়, যে ভোগে যত বেশি সংখ্যক ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগানো হয় সেই ভোগ তত বেশি গভীর আর স্থূল। মানুষ যা কিছু ভোগ করছে, সেই ভোগটা বেশি স্থূল নাকি কম স্থূল বুঝতে হলে দেখতে হবে ভোগে কটি ইন্দ্রিয় জড়িয়ে আছে। মনের জগতে এই

ব্যাপারটা আরও মারাত্মক হয়ে যায়, কিন্তু আমরা এখানে একেবারে স্থূল জগতের কথা বলছি। একটা কাহিনীর প্রসঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষণকে বলছেন মানুষ যদি রমণ সুখের পারে যেতে পারে আর জিহ্বাকে সংযম করতে পারে তাহলে সে সব কিছুকেই জয় করে নেয়, সেখানে এর নামই হল শীষ্ণোদর, যার অর্থ হল রমণ সুখ আর উদর সুখ। এই দুটোর পারে যিনি চলে যান তিনি মহাপুরুষ। রমণ সুখ আর জিহ্বা এই দুটোকে কেন এক জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে? একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে প্রশ্নের খুব সহজ সমাধান বেরিয়ে আসবে। ভোজন করা এমন একটি ভোগ যে ভোগে সব থেকে বেশি ইন্দ্রিয় জড়িয়ে থাকে। যেমন সত্ত্বগুণ সব সময় জ্ঞান আর সুখ দিয়ে বাঁধে, *সুখ সঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞান সঙ্গেন চানঘ*, তার মানে যিনি সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত তাঁর আর ইন্দ্রিয়ের কোন দরকার হয় না, তিনি মনে মনেই সুখ বোধ করছেন, সুখের জন্য তাঁর কোন ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয় না। তেমনি জ্ঞানের জন্যেও কোন ইন্দ্রিয় লাগে না, খুব হলে চক্ষু ইন্দ্রিয় হলেই হয়ে যাবে, হয় কোন শাস্ত্র পড়ে যাচ্ছেন নয়তো ইন্টারনেটে পড়ে যাচ্ছেন। আর খুব হলে হাত দিয়ে পাতা উল্টে যাচ্ছেন। চোখ আর হাত এই দুটো ইন্দ্রিয় কাজ করছে, তৃতীয় কোন ইন্দ্রিয় নেই। যে কোন কাজ যদি একটি বা দুটি ইন্দ্রিয় দিয়ে চালিয়ে দেওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে সেটা সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম না হলেও কম স্থূল। কিন্তু খাওয়ার সময় অনেক বেশি সংখ্যক ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয়। খাওয়ার সময় হাতের অবশ্যই দরকার হয়, চোখ ভালো ভালো খাবার দেখতে চাইছে, পাপড় যখন ভাঙছে তার কড় কড় আওয়াজ কান দিয়ে শুনছে, পাপড়টা মচমচে, খাবারে অবশ্যই সুগন্ধ থাকতে হবে নাক দিয়ে সেই গন্ধকে আঘ্রাণ করছে, স্পর্শ সুখ চাই, খাবারটা গরম হলে এক রকম অনুভূতি, ঠাণ্ডা হলে অন্য রকম অনুভূতি, শেষ ইন্দ্রিয় হল জিহ্বা যে খাবারকে আস্বাদ করছে। খাওয়ার সময় পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় পুরোদমে লাগছে। তার সাথে হাতের ক্রিয়াও চলতে থাকে আর মাঝে মাঝে আঃ কি খাচ্ছি, বাক্যের স্ফুরণও হচ্ছে। কিন্তু রমণ ভোগে কার্যত এগারোটি ইন্দ্রিয় জড়িয়ে পড়ে। এখানে কামীদের কথা বলছেন, যাঁরা সংসার ধর্ম করেন তাঁদের কথা বলা হচ্ছে না। রমণ ভোগের ঠিক নীচেই ভোজন।

ভোগে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা যত কমতে শুরু করবে তত সে স্থূল থেকে সূক্ষ্মের দিকে এগোতে থাকবে। যেমন ধরুন একজন সেতারবাদক সেতারে একটা রাগের উপর আলাপ করে যাচ্ছেন, শুনতে শুনতে আপনার চোখ আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেল, কানের পর্দায় শুধু সারেগা সারেগা ধ্বণি এসে লাগছে, ইন্দ্রিয় এখন একটি ইন্দ্রিয়ে এসে দাঁড়িয়ে গেল, এটাই সূক্ষ্ম হয়ে যাওয়া। অন্য দিকে লারেলাপ্পা গানে একাধিক ইন্দ্রিয়ে এসে যাবে, কানে শুনছে, চোখ দিয়ে দেখছে, হাত নাড়ছে, পা ঘোরাচ্ছে, কোমড় দোলাচ্ছে আর নিজেও চেঁচাচ্ছে, ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল। বিষয় এক, দুটোই গান, একটা উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত আরেকটা রক এণ্ড রোল। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে একটি ইন্দ্রিয় কাজ করছে আর রক এণ্ড রোলে গায়কও চেঁচাচ্ছে শ্রোতারাও চেঁচাচ্ছে। তাহলে যে ঘরে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা টিভি দেখে যাচ্ছে, সেখানে টিভি দেখার সময় চক্ষু ইন্দ্রিয় আর কর্ণেন্দ্রিয় এই দুটি ইন্দ্রিয়ই মূলতঃ কাজ করে। টিভি দেখার সুখটা কি সূক্ষ্ম সুখ ভোগ হবে? টিভি দেখা কখনই সূক্ষ্ম ভোগ হবে না, কারণ ইন্দ্রিয় দুটি হলেও মস্তিষ্ক সেখানে নিষ্ক্রিয় থাকে। আমরা যে activityর কথা বলে যাচ্ছি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এগুলো passivity। জীবনে আমরা যা কিছু করছি সবটাই তমোগুণে আশ্রিত হয়ে করছি। টিভি দেখাটাও ঘোর তমোগুণের লক্ষণ, কারণ মস্তিষ্ক সেখানে কোন কাজ করছে না। যারা বটতলার উপন্যাস পড়তে ভালোবাসে তাদের শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পড়তে দিলে কিছুই বুঝতে পারবে না। কারণ কোন উচ্চমানের ক্লাশিক সিনেমা দেখতে গেলে বা রবীন্দ্রনাথ বা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়তে গেলে মস্তিষ্কের সক্রিয় যোগদান থাকে। আধ্যাত্মিক জীবনে প্রথমে passivityকে অর্থাৎ অলসতা, নিষ্ক্রিয়তাকে বাদ দিতে হবে, passivityকে তো হিসাবের মধ্যেই আনা যাবে না। মন যেখানে সক্রিয় হচ্ছে সেখান থেকে এই আলোচনা শুরু। টিভি দেখা, নিউজপেপার পড়া, আড্ডা মারা এগুলো হল passive participation। কিন্তু কাল ক্রিকেট ম্যাচ দেখার পর খুব উৎসাহিত হয়ে আবার ঐ খবরটাই পড়ছে, সেখানে কিন্তু আর passive participation হচ্ছে না, ওখানে active participation হচ্ছে, তার সব রকম চাঞ্চল্য সেখানে জড়িয়ে আছে, ইন্দ্রিয়গুলোও চঞ্চল থাকে। Passive participationকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনবে না। শুরু হয় active participation দিয়ে, খাওয়া দাওয়া হল active participation। টিভি দেখার সময় মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় থাকে কিন্তু খাওয়ার সময় মস্তিষ্ক পুরোপুরি সক্রিয় থাকে।

আমাদের বিষয় ছিল সুখ, যে জাগতিক সুখে যত বেশি সংখ্যক ইন্দ্রিয় নিযুক্ত সেই সুখ তত বেশি গভীর। সেইজন্য যদি নিজেকে বিচার করতে হয় আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, তখন দেখতে হয় ভোগে আমার কটি ইন্দ্রিয় জড়িয়ে আছে। জীবন চালাতে গেলে ভোগ সবাইকেই করতে হয়। ঠাকুর খুব সহজ করে বলছেন, ঈশ্বরের পথে যারা যান তাঁদের ঝোলভাত হলেই হয়ে যায় বা বলছেন তাঁদের খাওয়া-দাওয়াতে বেশি আড়ম্বর থাকে না। ঝোলভাত হওয়া মানে প্রথমে চোখের ইন্দ্রিয় কাজ করা বন্ধ করে দিল, কারণ ঝোলে ভাতে কোন সৌন্দর্য নেই কিনা। কান বন্ধ, নাক বন্ধ, খুব জোর মুখে একটু স্বাদ লাগলেই হয়ে যায়, তাও সাধু সন্ন্যাসীরা জানেনও না কি স্বাদ, শরীর চালাতে হবে তাই খাওয়া। খাওয়া ব্যাপারটা আর তাঁদের কাছে স্থূল ভোগের পর্যায়ে থাকছে না। যে কোন ভোগে এভাবে বিচার করতে হয়। ঈশ্বরীয় জ্ঞানের দিকে মানুষের যখন যাত্রা শুরু হয় সেখানেও ধীরে ধীরে তার ইন্দ্রিয়ের ভূমিকা কমতে থাকে। ঠাকুর যখন নির্বিকল্প সমাধিতে চলে যাচ্ছেন তখন তাঁর পুরো একাদশ ইন্দ্রিয় কাজ বন্ধ করে দিচ্ছে। সবিকল্প সমাধিতে মানুষের দশটি ইন্দ্রিয়ের কাজ বন্ধ হয়ে যায়, মন একটু কাজ করতে থাকে তাও সে একটি বৃত্তিকে নিয়ে থাকছে। রমণ সুখ আর আহার সুখের বিপরীত হল ঈশ্বর দর্শন। ঠাকুর বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ আর ব্রহ্মানন্দের কথা বলছেন। বিষয়ানন্দে বেশি বেশি ইন্দ্রিয় জড়িত থাকে, ব্রহ্মানন্দে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা শূন্য হয়ে যায়। আমরা এই দুটোর মাঝামাঝি কোথাও অবস্থান করছি। সেইজন্য আমাদের বিচার করে দেখতে হয় ভোগে কটি ইন্দ্রিয়কে ব্যবহার করা হচ্ছে। যদি দেখা যায় কম ইন্দ্রিয় দিয়েই ভোগ হয়ে যাচ্ছে তাহলে বুঝবেন এটা সূক্ষ্ম ভোগ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে, যেমন রুটি বেলছি তখন হাত, পা এগুলো লাগছে, রুটি বেলাটা তো ভোগ নয়, একটা কার্য। কিন্তু কোন জিনিষ ভোগ করার সময়, তা সে গান-বাজনাই হোক, সিনেমা দেখা হোক, স্বামী স্ত্রীর সংসার সুখভোগ করাই হোক সবেতেই ইন্দ্রিয়ের ভূমিকা কেমন দেখতে হবে। সেইজন্য বিবাহাদিতে যে মন্ত্রের ব্যবহার করা হয় তাতে বলছেন এই বিবাহ একমাত্র সন্তানোৎপত্তির জন্য, ইন্দ্রিয় সুখের জন্য নয়। স্বামীজীও বলছেন তোমার বিবাহ ইন্দ্রিয় সুখের জন্য নয়, বিবাহের মাধ্যমে তোমাকে একটা দায়ীত্ব দেওয়া হয়েছে যাতে পরবর্তী প্রজন্ম আসতে পারে। ঠাকুর যে বলছেন, কামজয়ী কিনা করতে পারে, তাঁর কৃপায় ঈশ্বর দর্শন পর্যন্ত করতে পারে। কেন বলছেন? কারণ কামী পুরুষের সব ইন্দ্রিয় রমণ সুখে জড়িয়ে পড়ে, আর যিনি ঈশ্বরের পথে যান তিনি সব কটি ইন্দ্রিয়ের পারে চলে যান। তখন যে কোন কাজে, শরীর ধারণের কার্যেও ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার কমে যায়। কিন্তু তিনি যখন সমাধিতে যান, সমাধি মানে ঈশ্বরের চিন্তায় এমন মগ্ন হয়ে যান সেখানে ইন্দ্রিয়ের আর কোন কার্য থাকে না। তাই অশুদ্ধ মন মানে ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার বেশি আর শুদ্ধ মন মানে ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার কম। কিন্তু মনে মনে যখন ইন্দ্রিয় সুখের চিন্তা করছে, অমুকের জন্ম দিনে কি দারুণ খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল, কেমন রসাল ছিল, বিরিয়ানির কি সুগন্ধ ছিল, তখন কিন্তু মনে মনে একই জিনিষ হয়ে যাচ্ছে। আগে বহিরিন্দ্রিয় দিয়ে যা যা করেছিল, মনে মনে সেই একই ইন্দ্রিয় কাজ করে যাচ্ছে, আরও গভীর ভাবে চলছে। সাধক প্রথমে যখন সাধনায় অগ্রসর হতে থাকেন তখন এই বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে ভেতরে ঢুকিয়ে দেন। শুদ্ধ মন, সংযত মন সব একই কথা।

সেইজন্য বলছেন *ইন্দ্রিয়েভ্য পরা হ্যর্থ*, ইন্দ্রিয়ের বিষয়বস্তু গুলি অত্যন্ত স্থূল। যে বস্তুকে গিয়ে ইন্দ্রিয়গুলি ধরছি সেটা আপেক্ষিক ভাবে ইন্দ্রিয়ের থেকে সূক্ষ্ম হতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্ম হলেও যে বস্তুকে আমরা জানতে চাইছি, সেই আত্মজ্ঞান বা আত্মা এত বেশি সূক্ষ্ম যে ইন্দ্রিয়ে দিয়ে তাঁকে কোন দিন ধরা যাবে না। মন ইন্দ্রিয়ের তুলনায় আরও বেশি সূক্ষ্ম হতে পারে কিন্তু আত্মজ্ঞানের তুলনায় অনেক বেশি স্থূল। এই আলোচনা আমরা আগে করেছি। একটা একটা করে দেখান হচ্ছে আত্মতত্ত্ব কত সূক্ষ্ম। আত্মতত্ত্বকে যদি ধরতে হয় তাহলে মনকে আগে শুদ্ধ পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ পবিত্র করা মানে মনকে অনেক সংযত করা, সংযত করা মানেই তমোগুণের উপরে রজোগুণ যেখানে মন খুব চঞ্চল, এই চঞ্চল মনকে সংযত করে মনকে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, এবার মন সূক্ষ্ম আর শুদ্ধ হয়ে গেল।

শুদ্ধ মন বা সূক্ষ্ম মন খুব সংবেদনশীল, অপরের দুঃখ-কষ্টকে সে নিতে পারে না। শুদ্ধ মনের ভালোবাসা সবারই প্রতি ছড়িয়ে যায়, নিজের কয়েকজনের প্রতি ভালোবাসা সীমাবদ্ধ থাকে না। ঠিক তেমনি সারা জগতের দুঃখ-কষ্ট তার নিজের দুঃখ-কষ্ট হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় যে কোন জিনিষকে বোঝার ক্ষমতা তার যেমন একদিকে অনেক বেড়ে যায় তার সাথে সব কিছুকে মনে রাখার ক্ষমতাও বেড়ে যায়। তৃতীয় অপরের

মনে কি হচ্ছে বোঝার ক্ষমতা এসে যায়। কেউ যদি বলে আমি তো কখন কোন পাপাচরণ করিনি, আমি শুদ্ধ। কিন্তু তা নয়, পাপের কিছু পরিভাষা আগে থেকেই আমরা মনের মধ্যে তৈরী করে রেখেছি, যেমন চুরি করা পাপ, পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া পাপ। এগুলো অবশ্যই পাপ, শুধু পাপ নয় অত্যন্ত গর্হিত পাপ। কিন্তু যে কোন স্থূল মন যে কোন মুহূর্তে এই কাজ গুলো করে দিতে পারে। আগামীকাল যদি তার স্বার্থে আঘাত পড়ে, তার অস্তিত্বে যদি কোন সঙ্কট এসে যায় সঙ্গে সঙ্গে সে যে কোন পাপ কাজ করতে নেমে যাবে। আজকে যে নিজেকে খুব পবিত্র বলছে কালই সে একজন মহা অপবিত্র ব্যক্তি হয়ে যেতে পারে। কারণ তার মনটাই স্থূল মন। যার শুদ্ধ মন, সূক্ষ্ম মন সে যদি জানে এই কাজ করা ঠিক নয়, গলা কেটে দিলেও সে করবে না। তাহলে মেয়েরা তো বলে শীলহানি হওয়ার আগে আমি গলায় দড়ি দিয়ে দেব। তাহলে কি তার সূক্ষ্ম মন? একেবারই নয়, ও যাকে ভালোবাসবে তার জন্য সে সব গোলমাল করবে। এগুলো হল স্থূল মনের হিংসার রূপ, হিংসাটা নিজের উপর চালিয়ে দিচ্ছে। এই জিনিষগুলো বুঝতে বা ধারণা করতে একটু সময় লাগবে। কিন্তু কঠোপনিষদে একজন সাধকের প্রস্তুতিপর্বের জন্য যে জিনিষগুলোকে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে এগুলোকে খুব ভালো করে বোঝা দরকার, ভাবতে হবে *সমনস্ক সদা শুচিঃ, বিজ্ঞানবান*, এই কথাগুলো কেন বলছেন। এই কারণেই বলছেন, যে সুখে যত বেশি ইন্দ্রিয়ের জড়িত সেই সুখ তত স্থূল, ঈশ্বরীয় জ্ঞান যত আসতে থাকে ইন্দ্রিয়ের কার্য তত কমতে থাকে, উচ্চ অবস্থায় মনের কার্যও বন্ধ হয়ে যায়। সেইজন্য জগৎ আর ঈশ্বর পুরো বিপরীত।

যারা শাস্ত্র বিরোধী কর্ম করে তাদের মন আরও বেশি স্থূল। সূক্ষ্মের যেমন তারতম্য হয় সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম, তেমনি স্থূলেরও তারতম্য হয় স্থূল, স্থূলতর ও স্থূলতম। যারা কোন মূল্যবোধকে মানে না, যাদের মধ্যে কোন মূল্যবোধ নেই, নিজের স্বার্থে হেন কাজ নেই যে তারা করবে না, এরা পশু স্তরের। অন্য দিকে মূল্যবোধে বলা হয় সৎ হতে হবে, ভালো মানুষ হতে হবে এগুলোও খুব স্থূল, এই দিয়ে কিছু হয় না। কঠোপনিষদ এগুলোকে অনেক আগেই বলে বেরিয়ে এসেছে যেখানে বলছিলেন *নাবারিতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ*, কিন্তু আসল যে জায়গা থেকে ধরছেন সেটা অনেক উচ্চ অবস্থা। চুরি না করা, মিথ্যা কথা না বলা, ধার্মিক হওয়া এগুলো মানুষকে একজন ভদ্রলোক তৈরী করে ঠিকই কিন্তু আধ্যাত্মিকতার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এখানে মেনেই চলছে যে আপনি একজন ভালো লোক, এরপর থেকে শুরু করছেন। কিন্তু যারা বলছে আমি মিথ্যা কথা বলি না, চুরি করি না, এদের বেশির ভাগই হল তামসিক। স্বামীজী বলছেন গরু মিথ্যা কথা বলে না, দেওয়াল চুরি করে না, কিন্তু গরু গরুই থাকে, দেওয়াল দেওয়ালই থাকে। এই ধরণের ভালো লোক দিয়ে কিছুই হয় না, আসলে এরা অপদার্থ, কোন কিছু করার ক্ষমতাই এদের নেই, ভালো করার ক্ষমতাও নেই খারাপ করার ক্ষমতাও নেই। ভালো লোক কে হবে, যার চুরি করার ক্ষমতা আছে কিন্তু চুরি করে না, ক্ষতি করার দম আছে কিন্তু করে না, মিথ্যা কথা বলার দম আছে কিন্তু বলে না। একটা সাপের ল্যাজ ধরে যদি একটু নাড়িয়ে দেওয়া হয় তাতেই তার মেরুদণ্ডের হাড়গুলো কিছুক্ষণের জন্য নড়ে যায়, আর নড়াচড়ার ক্ষমতা থাকে না, আধ ঘন্টার মত সে এমনিই বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকবে। মানুষ মাত্রই এই রকম, নড়ে না, চড়ে না, কামড়ায় না, কিন্তু একটু আঁতে হুল ফুটলে, স্বার্থ নিয়ে নাড়ানাড়ি হলে, কিছু ক্ষতি হয়ে গেলে সাপের ল্যাজ ধরে নাড়িয়ে দেওয়ার মত হয়ে যাবে, বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকবে। এদেরকে দিয়ে কিছুই হবে না। ঈশ্বর লাভ করতে চাওয়া মানে সব রকমের শক্তিই তাঁর আছে, চাইলে তিনি পুরো জগতকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিতে পারেন, কিন্তু তিনি তা করেন না। এই শক্তি না হলে আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হবে না।

কঠোপনিষদের এই দুটি মন্ত্র সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করছে। খুব সংক্ষেপে দেখাচ্ছেন এই স্থূল জগৎ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি থেকে কিভাবে ভেতরের দিকে গিয়ে সূক্ষ্ম হয়ে যাচ্ছে। মানুষের দৃষ্টিতে মহতই শেষ কথা, কারণ সেখানে ব্যষ্টি মন সমষ্টি মনের সাথে এক হয়ে যাচ্ছে। মহতের পরে যা আসছে তার কিছুটা ঈশ্বরীয় দিকে চলে যায়, জগতের এদিকটা আর থাকে না, শাস্ত্র অবশ্য এভাবে ব্যাখ্যা করে না। ঈশ্বর আর জগৎ আছে এভাবে যদি দেখা হয় তখন ঈশ্বর আছেন আর তাঁর শক্তি আছে, এটাই যেন একটা বস্তু হয়ে গেল, ঈশ্বরের শক্তির জন্য যখন জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে তখন সেটা যেন আরেকটি বস্তু। আমরা বোঝার জন্য এভাবে বলছি। জগতের লোক উঠতে উঠতে মহৎ পর্যন্ত এসে পৌঁছে গেল, মহৎ মানে সমষ্টি মন, সমষ্টি মনের সাথে এবার এক হয়ে গেল, এক হয়ে যাওয়াতে সে বিরাট ক্ষমতাবান হয়ে গেল। কিন্তু মহতের থেকেও সূক্ষ্ম হল অব্যক্ত। অব্যক্ত বলতে প্রকৃতিকে বোঝায়, আবার অব্যক্ত বলতে মায়া বা শক্তিকেও বোঝায়, বিভিন্ন ঋষিরা বিভিন্ন

ভাবে দেখেছেন। যেমন আমরা বললাম জগতটা যেন মহতে গিয়ে শেষ হয়ে যায়, কিন্তু সাংখ্যবাদীরা আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে প্রকৃতিতে অর্থাৎ অব্যক্তে নিয়ে গিয়ে শেষ করেন। জগতকেও প্রকৃতি বা অব্যক্ত থেকে শুরু করেন। তাঁরা প্রকৃতিকে একটা সত্তা দিয়ে দেন আর ওদিকে পুরুষকে একটা আলাদা সত্তা দিয়ে দেন। সাংখ্য মতাবলম্বীরা তাঁদের মতকে ব্যাখ্যার করার সময় এই মন্ত্রকে নিয়ে আসেন। *মহতঃ পরমব্যক্তম্*, অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতিই শেষ কথা, প্রকৃতি এক স্বাধীন সত্তা।

কিন্তু বেদান্তীরা এভাবে দেখেন না, আচার্য বলছেন *মহতোহপি পরং সূক্ষ্মতরং প্রত্যগাত্মভূতং সর্বমহত্তরং ......বীজভূতম্*, জগতে যা কিছু আছে সব কিছুর বীজভূত হল অব্যক্ত। ঠাকুর খুব সহজ ভাবে বলছেন, বাড়ির গিন্নী একটা পুটলির মধ্যে সব কিছু গুছিয়ে রেখে দেয়, শশার বীচি, কুমড়োর বীচি, সমুদ্রের ফেণা, যখন দরকার পড়ে তখন সেখান থেকে বার করে দেয়। প্রকৃতি হল সেই বীজভূত, সৃষ্টির লয়ের পর যার মধ্যে সব কিছু বীজ রূপে চলে এল, যেখান থেকে পরে আবার নতুন সৃষ্টি বেরিয়ে আসবে। প্রকৃতিকে প্রথমে বললেন সমস্ত জগতের বীজভূত, আর নাম রূপের সত্তা স্বরূপ। যেমন এই গ্লাশ, জগতে যখন আসছে তখন গ্লাশের একটা নাম আর রূপ হয়ে যাচ্ছে। এই গ্লাশই যখন অব্যক্তে চলে যাবে তখন এর নামও থাকে না রূপও থাকে না, তখন শুধু সত্তামাত্রম্ থাকে। সত্তামাত্রমকে ইংরাজী অনুবাদ করলে খুব সহজে বোঝা যায়, সত্তামাত্রমের ইংরাজী Idea। অব্যক্তে সব সময় আইডিয়া রূপে থাকছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুকে যদি নাশ করে দেওয়া হয়, সৃষ্টির যদি সংহার হয়ে যায় তাহলেও কিন্তু সৃষ্টির বাস্তবিক সংহার এইজন্যই কোন দিন হবে না যেহেতু তার যে সত্তা স্বরূপ যাকে আমরা খুব স্থূল ভাবে বীজস্বরূপ বলছি, এই সত্তা স্বরূপ থেকে যাচ্ছে। কথামৃত পড়লে মনে হবে ঠাকুর যেন বলতে চাইছেন শশার বীচি, কুমড়োর বীচি, সমুদ্রের ফেণার মত প্রত্যেকটির যেন আলাদা আলাদা বীজ আছে আর সেই বীজকে যেন প্রকৃতি রেখে দিচ্ছে। আসলে এভাবে হয় না, সত্তা স্বরূপ হয়, যেটা আচার্য বলছেন। সত্তা স্বরূপ কি রকম? যেমন ঘটত্ব, ঘটত্ব যদি থাকে তাহলে ঘটকে যতবারই নাশ করে দেওয়া হোক না কেন আবার ঘট বেরিয়ে আসবে। কারণ তার আসল জিনিষটা, আইডিয়াটা থেকে গেছে। সবাই বলে স্টিভেনসন ট্রেন আবিষ্কার করেছিলেন, কিন্তু আমাদের কাছে ট্রেন চিরদিনই ছিল। কিন্তু ট্রেনের যে ট্রেনত্ব, যদিও এটা বিচিত্র শব্দ হয়ে যাচ্ছে, ট্রেনত্ব প্রকৃতিতে সব সময়ই আছে। সেটাকেই জন স্টিভেনসন আর জেমস ওয়ার্ডেনার মিলে স্থূল রূপ দিয়ে দিলেন। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ট্রেনের আবিষ্কারক স্টিভেনসন, কিন্তু বেদান্তের দৃষ্টিতে এর কোন দাম নেই। ট্রেন একটা আইডিয়া রূপে, সত্ত্বা স্বরূপে প্রকৃতিতে চিরদিনই ছিল। আমরা বলি ডাইনাসোরাস বিলুপ্ত প্রজাতি, কিন্তু ডাইনাসোরাস কি করে বিলুপ্ত হবে, ডাইনাসোরাস আইডিয়া রূপে প্রকৃতিতে সব সময়ই আছে, কাল আবার এসে যাবে। মাঝে মাঝে খবরে বলতে দেখা যায় যে, এক বিলুপ্ত প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। এই নিয়ে মাতামাতি করার কিছু নেই! কোন প্রজাতিই কোন দিন বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে না, কারণ সত্তা স্বরূপে প্রকৃতিতে সে সব সময়ই আছে। কখন কিভাবে ঐ আইডিয়া আবার প্রস্ফুটিতে হয়ে এসে যাবে, আমরা কেউই জানি না। জগতের সব ঘটকে নাশ করে দেওয়া যাবে, অভিধান থেকে ঘট শব্দকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু আবার কেউ একজন ঘট দাঁড় করিয়ে দেবে, তখন সে হয়ত তার অন্য একটা নাম দিয়ে দেবে, যেমন ইংরাজীতে Jar বলছে। কিন্তু ঘটত্ব জিনিষটা কখন নাশ হবে না, তাকে আমরা জার বলি, ঘড়া বলি, ঘট বলি, যে নামই দেওয়া হোক ঘট আইডিয়া রূপে কোন দিন নাশ হবে না।

অব্যক্তকে কেন পরম বলছেন, কারণ শুধু সত্তা স্বরূপ থাকছে, যখন মহতে আসছে তখন আইডিয়া গুলো আরও স্থূল হয়ে গেল। যখন তন্মাত্রায় নামছে তখন শব্দ রূপে এসে গেল আর পঞ্চ মহাভূতে এসে সে একটা আকার নিয়ে নেবে, আকার, শব্দ, শব্দের যে সূক্ষ্ম রূপ আর শেষে সত্তা স্বরূপ। আচার্য শঙ্করের এই সব ভাষ্য পড়লে শুধু অবাক হয়ে ভাবতে হয়ে সত্যিই একটা মানুষে মধ্যে এত প্রতিভা থাকতে পারে! সব কিছুকে প্রখর যুক্তি দিয়ে খাপে খাপে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এরপর আর কারুর পক্ষেই ডান দিক বাম দিকে যাওয়ার উপায় নেই, কেউ বলতে পারবে না যে বিজ্ঞান এত এগিয়ে গেছে বলে এগুলো অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। অন্যান্য অনেক কিছুই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যেতে পারে কিন্তু আচার্য শঙ্করের যুক্তি কোন দিনই অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ভবিষ্যতে এমন অনেক জিনিষ আসবে যা আমাদের কাছে জানা নেই, তাহলে কোথা থেকে আসবে? সত্তাস্বরূপে প্রকৃতির মধ্যেই সব রয়েছে। ঐ সত্তাস্বরূপ যখন মহতে আসবে তখন আইডিয়া হয়ে যাবে, সেই

আইডিয়াকে কেউ না কেউ ধরবে, চিন্তক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, দার্শনিক কেউ না কেউ ঐ আইডিয়াকে ধরবেন, ধরার পর তার একটা শব্দ দেবেন এরপর কেউ তাকে আকার দেবেন।

তার সাথে বলছেন *সর্বকার্য-কারণ-শক্তি-সমাহার-রূপম্*, সমস্ত কার্য আর কারণের যে শক্তি সেই শক্তির সমাহার, সমষ্টি স্বরূপ। যে কোন কার্য আর সেই কার্যের পেছনে যে কারণ, এই কার্য-কারণের শক্তি প্রথমে কারণ রূপে পরে কার্য রূপে সামনে বেরিয়ে আসে। যেমন এই গ্লাশ আছে, গ্লাশের পেছনে একটা কারণ আছে আর তার একটা কার্য আছে, কার্যকে নাম আর রূপে দেখা যায়। এই নাম ও রূপের পেছনে সত্তাস্বরূপ রয়েছে, আর কার্য-কারণ হয়ে যে জিনিষটা সামনে এসেছে তার পেছনেও একটা শক্তি রয়েছে। শক্তি আর সত্তাস্বরূপ এই দুটো জিনিষ পাশাপাশি চলছে। শক্তিও যা সত্তাস্বরূপও তাই, কারণ দুটোই প্রকৃতি। একটা জিনিষের যে সত্তাস্বরূপ রয়েছে আর তার সঙ্গে যে শক্তি জিনিষটা রয়েছে, এই দুটো জিনিষ দুটো শাখায় বিভক্ত হয়ে কার্য-কারণ আর ওদিকে নাম রূপ হয়ে বেরিয়ে আসে। জগৎ হল নাম আর রূপ আর তার প্রক্রিয়া হল কার্য আর কারণ, এর সব কিছুর মালকিন হলেন প্রকৃতি। ঈশ্বরের ব্যাপারে আমাদের যত স্থূল ধারণা রয়েছে, তিনিই সব কিছু করছেন, তিনিই সব কিছু দেখছেন, এই স্থূল ধারণার প্রধান কারণ হল, আমরা যেমন স্থূল সেই স্থূল ভাবেই আমরা ঈশ্বরকে ভাবছি। কিন্তু তাতো নয়, তিনি প্রকৃতির সমাহার, সেখানে সব কিছু এক হয়ে গেছে। শুধু তাই না, যে কোন সত্তা যা কিনা নাম রূপে আসছে সেটা মাত্র সত্তাস্বরূপে থাকছে। তখন আর আইডিয়া রূপেও থাকছে না, নাম রূপে তো থাকবেই না, শুধু সত্তামাত্রম্ রূপে আছেন।

অব্যক্ত বা প্রকৃতির অনেকগুলো নাম বলছেন, *অব্যক্তাব্যকৃতা-কাশাদি-নামবাচ্যম্*। আর তার সাথে বলছেন *বটকণিকায়ামিব বটবৃক্ষশক্তিঃ*, বটের বীজ কত সূক্ষ্ম কিন্তু সেই সূক্ষ্ম বটবীজ থেকে বিশাল বটবৃক্ষ বেরিয়ে আসছে। বিশাল বটবৃক্ষ যে বেরিয়ে আসবে, সেই শক্তি ঐ ছোট্ট সূক্ষ্ম বীজের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে রয়েছে। বিজ্ঞান বলবে ডিএনএ আছে জিন্ আছে, ঠিকই, কিন্তু আমরা ওভাবে বলতে যাব না, আমরা বলব ঐ সূক্ষ্ম বীজের মধ্যে একটা শক্তি রয়েছে, সেই শক্তি পুরো জীবন্ত, proper nurturing করলে পুরো বটবৃক্ষ বেরিয়ে আসবে। এই শক্তিটা কোথায় রয়েছে? বিজ্ঞান বলবে ডিএনএতে রয়েছে। ডিএনএতে কি করে থাকবে! তাহলে শুধু ডিএনএকে নিলেই হয়ে যাবে? কখনই হবে না, তার যে পুরো প্রটোপ্লাজম রয়েছে, সেটাকে নিতে হবে, complete cell ছাড়া হবে না। এই complete cellএর মধ্যে শক্তিটা কোথায় আছে? কোন একটা নির্দিষ্ট জায়গাতে সীমিত হয়ে নেই, ওতপ্রোত ভাবে রয়েছে। আমার মধ্যে আমার আমিত্বটা কোথায় রয়েছে? পুরো শরীরে ওতপ্রোত ভাবে জুড়ে রয়েছে। মাটি আর জল মিশে পাঁক হয়, পাঁকের মধ্যে জল এখন ওতপ্রোত ভাবে মিশে আছে। ঠিক তেমনি যে শক্তি দিয়ে বিশাল বটবৃক্ষ দাঁড়াবে, সেই শক্তি ঐ সূক্ষ্ম বীজের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে মিশে রয়েছে। এইভাবে প্রকৃতি পরমাত্মাতে ওতপ্রোত ভাবে মিশে রয়েছে। আচার্য এই কথা বলছেন। কিন্তু এখানেই লোকেরা বেদান্ত বুঝতে গোলমাল করে বসে। অনেকে মনে করে যে আচার্য শুধু মায়ার কথাই বলছেন, কিন্তু তা নয়, আচার্য শক্তিকে পুরোদমে মেনে চলেন। কঠোপনিষদের মত কট্টর বেদান্তী গ্রন্থে আচার্য যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তাতে বলছেন, প্রকৃতি বা অব্যক্ত ঈশ্বরের শক্তি, পরমাত্মার শক্তি। এই শক্তি কোথায় থাকে? পরমাত্মাতে ওতপ্রোত ভাবে, শক্তিকে পরমাত্মা থেকে আলাদা করা যায় না, ঈশ্বর আর তাঁর শক্তি অভেদ। ঠাকুর বলছেন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি এক। ঠিক তেমনি আচার্য বলছেন পরমাত্মাও যা অব্যক্তও তাই। গীতার ভাষ্যেও আচার্য বলছেন শক্তি আর শক্তিমান এক। বীজ আর বীজ থেকে বটবৃক্ষ হওয়ার শক্তি আলাদা কিছু নয়। যেটাই শক্তি সেটাই বীজ, যেটাই বীজ সেটাই শক্তি। ঠিক তেমনি যেটাই প্রকৃতি সেটাই ঈশ্বর, যেটাই ঈশ্বর সেটাই প্রকৃতি। প্রকৃতির কোন স্বাধীন সত্তা নেই।

এখানেই সাংখ্য বেদান্ত থেকে আলাদা হয়ে যায়। সাংখ্যে প্রকৃতি হল জড় পদার্থ স্বরূপ, জড় রূপে দেখে বলে সাংখ্যবাদীরা প্রকৃতিকে জগতের সাথে এক করে দেখছে। বেদান্ত কিন্তু এভাবে দেখে না, বেদান্ত প্রকৃতিকে স্বাধীন সত্তা দেয় না, প্রকৃতি ঈশ্বরেরই শক্তি, ঈশ্বরের সাথে প্রকৃতি এক। কিন্তু মহতে যখন এসে গেল তখন জগতটা যেন প্রস্ফুটিত হয়ে গেল। একজন সাধকের শেষ অবস্থা তাই সমষ্টি মনের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। তারপর থেকে যেন ঈশ্বরের এলাকা শুরু হয়ে যায়। সেইজন্য ঠাকুর যখন মা কালী দর্শন করছেন, তখন ঐ দর্শন কিন্তু সাধারণ দিব্য দর্শন যে অর্থে আমরা বুঝি সেই অর্থে নয়। মা কালী সেই ব্রহ্মেরই শক্তি,

সেই শক্তি রূপে তিনি ব্রহ্মকে দেখছেন। কিন্তু ব্রহ্মের আরেকটি রূপ হল যেখানে ব্রহ্মের শক্তি বলে কিছু নেই, যেখানে শুধু সত্তামাত্রম্ আছে। তোতাপুরী আসাতে ঠাকুর ব্রহ্মের এই রূপেরও দর্শন করলেন। ব্রহ্ম যখন নিজের শক্তিকে পুরোপুরি ভেতরে নিয়ে নিচ্ছেন তখন এক রকম, আর শক্তির সাথে যখন ওতপ্রোত ভাবে থাকছেন, শক্তিকে দিয়েই ব্রহ্মকে জানছেন তখন তা আরেক রকম দেখায়। আচার্যও ঠিক একই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, কিন্তু অনেকে সেটাকে অন্য অর্থে নেয়। আচার্য বলছেন অব্যক্তই প্রকৃতি যেখানে নাম-রূপের সত্তাস্বরূপ থাকে, যেখানে কার্য-কারণের সমাহার, যার অনেকগুলি নাম আছে, পরমাত্মার সেই শক্তির সঙ্গে অব্যক্ত ওতপ্রোত ভাবে মিশে আছে। এটাকেই আবার মায়া বলছেন, কারণ ব্রহ্ম ছাড়া তো অন্য কিছু নেই, প্রকৃতির আলাদা কোন সত্তা নেই, পরমাত্মার সঙ্গে প্রকৃতি এক, প্রকৃতি পরমাত্মার শক্তি। অগ্নি আর দাহিকা শক্তি আলাদা কিছু নয়, অগ্নিও যা দাহিকা শক্তিও তাই, সেখানে যদি দাহিকা শক্তিকে আলাদা করে দেখা হয় তখন সেটাই মায়া হয়ে যাবে, কারণ অগ্নিই সত্য। কিন্তু সাংখ্য দর্শনে দাহিকা শক্তি আলাদা হয়ে যায়, এর অস্তিত্ব আলাদা হয়ে যায়, বেদান্তে আলাদা হয় না বলে মায়া বলছেন। মায়া খারাপ কিছু নয়, মায়া দিয়ে আসলে বলতে চাইছেন ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই।

কিন্তু তারপরেই বলছেন *অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ*, অব্যক্ত থেকেও পুরুষ সূক্ষ্মতর। মনের এলাকা মহৎ পর্যন্ত। কিন্তু প্রকৃতিতে গিয়ে কি হয় সেটা যদিও আমাদের জানা নেই, জানার কথাও নয়, আমরা যাই বলি না কেন তার কোন অর্থ হবে না। কিন্তু ঠাকুরের জীবনে আমরা দেখছি তিনি মা কালীর দর্শন পেলেন, তাঁর চেতনা লুপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু এই বোধটুকু আছে যে তিনি দেখছেন। মনের শেষ অবস্থা হতে পারে বা মনের পারে যাওয়ার আগের অবস্থাও হতে পারে, যেখানে এই বোধটুকু রয়ে গেছে যে মা আছেন। অদ্বৈত জ্ঞানে এই বোধটুকুও থাকছে না। সেইজন্য বলছেন, যেখানে প্রকৃতির ঐ বোধটুকু থাকছে, তার থেকেও সূক্ষ্ম হলেন সেই পুরুষ। ঠাকুর সমাধি থেকে বেরিয়ে এসে মা মা করছেন, এই বোধটুকুর থেকেও *পুরুষঃ পরঃ*। এই ধরণের মন্ত্রে একটা সংশয় আসতে পারে, মহৎ যতটা সূক্ষ্ম তার থেকে প্রকৃতি যেন আরেকটু সূক্ষ্ম, তার থেকেও আরও সূক্ষ্ম যেন পুরুষ। কিন্তু আসলে তা নয়, সেখানে গুণগত তফাৎ আছে। সেইজন্য আগে বলা হয়েছিল মহৎ পর্যন্তই যেন জগতের এলাকা আর তারপরেই ঈশ্বরীয় এলাকা, মহৎ পর্যন্ত জড়ের সত্তা, কিন্তু যেখানে ঈশ্বর আর তাঁর শক্তির কথা বলা হচ্ছে, ঐ জায়গাটা চৈতন্যের সত্তা। সাধনা করার সময় মন যেমন যেমন সূক্ষ্ম হতে থাকে তেমন তেমন সাধকের সত্তার অনুভব পাল্টে যেতে থাকে। শেষ অবস্থায় যখন প্রকৃতি বা শক্তির সাথে এক হয়ে যান তখন জগতকে আরেক রকম দেখেন। কিন্তু তারপরে যে সত্তা সেখানে আর কোন দেখাদেখির কিছু থাকে না, সেখানে শুধু বোধে বোধ। আমরা প্রথমে যে উপমা ব্যবহার করলাম, একটা এক মিটার লম্বা রড দিয়ে যখন মাপছে তখন সব জিনিষকে এক রকম দেখবে। রডের চারটে টুকরো করে দিলে জিনিষগুলিকে আরেক রকম দেখবে। রডকে গলিয়ে তরল করে দিলে আরেক রকম দেখবে। কিন্তু তখনও রড দিয়ে আলো বা বাতাসকে মাপা যাবে না, কারণ আলো বাতাস তার থেকে বেশি সূক্ষ্ম। জিনিষটাকে বোঝানর জন্য বলা হচ্ছে। মূল বক্তব্য হল মন দিয়ে কখনই ঈশ্বরের জ্ঞান হবে না।

পুরুষ এতই সূক্ষ্ম যে সব কিছুর মধ্যে এসে সে যেন ঢুকে যায়। যেমন বাতাস, বাতাস সূক্ষ্ম বলে সব জায়গায় ঢুকে যাচ্ছে, এই ঘরেও ঢুকে যাচ্ছে, আমাদের কানেও ঢুকে যাচ্ছে আবার জলের মধ্যেও ঢুকে যাচ্ছে। কিন্তু যেটা আরও বেশি সূক্ষ্ম সেতো আরও সব কিছুর মধ্যে মিশে যাবে। যে জিনিষ যত বেশি সূক্ষ্ম সে তত বেশি জিনিষের মধ্যে ঢুকে যাবে। মশারির নেট লাগিয়ে দিলে মশা মাছি কিছু ঢুকতে পারবে না। মশা বাতাসের থেকে স্থূল তাই বাতাস ঐ নেট দিয়ে ঢুকে যাবে। নেটের পেছনে যদি এয়ার ফিল্টার লাগিয়ে দেওয়া হয় তাহলে ধুলো আটকে যাবে কিন্তু বাতাস চলে যাবে। যে জিনিষটা যত সূক্ষ্ম সেই জিনিষ তত বেশি যাবে। বলছেন, আত্মা বা পুরুষ এতই সূক্ষ্ম যে সব জায়গায় যেতে পারেন, সব কিছুর মধ্যে ঢুকে আছেন। এটাকেই আচার্য বলছেন *সর্বপূরণাৎ*, সব কিছুর মধ্যে পুরিত করে আছেন, সেইজন্য আত্মাকে পুরুষ বলা হয়। এ্যটমিক স্পেস আমাদের কাছে কিছুই নয় কিন্তু তার মধ্যেও আত্মা বিদ্যমান। পিঠেতে যেমন পুর থাকে তেমনি সব কিছুতে পুর হলেন আত্মা, সেইজন্য তিনি পুরুষ। একটার পর একটা, স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, সেই সূক্ষ্ম থেকে আরও সূক্ষ্মে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাহলে পুরুষের থেকে সূক্ষ্ম কি হবে? বলছেন তারপরে আর কিছু নেই, *পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ*, পুরুষের থেকে আর শ্রেষ্ঠ বা সূক্ষ্ম কিছু হতে পারে না, এই কথা শাস্ত্র বলে দিচ্ছেন। কেন

পুরুষের থেকে সূক্ষ্ম কিছু হতে পারে না? এ্যটম যে এত সূক্ষ্ম কিন্তু তারও সূক্ষ্ম নিউট্রোন প্রোটন। ব্যাপারটা এভাবে হবে না, কারণ তিনি হলেন চৈতন্যস্বরূপ। পুরুষকে সূক্ষ্ম কণিকা রূপে গণ্য করা যাবে না, এ্যটমও সূক্ষ্ম কণিকা। আত্মাকেও যে একেবারে সূক্ষ্ম কণিকা রূপে দেখা হয় না তা নয়, আগেকার কোন কোন দর্শনে আত্মাকে উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় আলোর কণিকা রূপে ভাবা হত, আত্মা কিন্তু তাও নন তিনি চৈতন্য স্বরূপ, তাই বলছেন *পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ*, পুরুষের থেকে আর কোন সূক্ষ্ম হতে পারে না।

সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ, যিনি আত্মজ্ঞানে চলে গেলেন, ওটাই পরাকাষ্ঠা। কিসে পরাকাষ্ঠা? আচার্য বলছেন *সূক্ষ্মত্ব-মহত্ত্ব-প্রত্যগাত্মত্বানাং সা কাষ্ঠা*, সূক্ষ্মত্বে পরাকাষ্ঠা, মহত্বে পরাকাষ্ঠা আর *প্রত্যগাত্মত্বানাং*, সব কিছুর মধ্যে পুরিত হয়ে আছেন, এটাই পরাকাষ্ঠা। ধ্যান করতে করতে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতর থেকে সূক্ষ্মতমে যেতে যেতে শেষ তাঁর যে জ্ঞান হয় সেই জ্ঞানই শুদ্ধ আত্মার জ্ঞান। এই হল দুটি মন্ত্রের মূল ভাবার্থ। ধ্যানে কিভাবে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতরে যান এই দুটি মন্ত্রে তারই বর্ণনা করা হল। ধ্যান যেভাবে হয় সৃষ্টি ঠিক তার বিপরীত ভাবে হয়। পুরুষ আর পুরুষের শক্তি অভিন্ন, সেই শক্তিকেই অব্যক্ত বলছেন, সেখান থেকে মহৎ, মহৎ থেকে বুদ্ধি, মন, তন্মাত্রা, ইন্দ্রিয় আর শেষে ইন্দ্রিয়ের বিষয় বস্তুতে নিয়ে যাচ্ছেন।

আমাদের খুব প্রচলিত ধারণা হল যেখানেই জীবন সেখানেই তার ভেতরে অন্তর্যামী রূপে ভগবানই বিরাজ করছেন, এই দেহ যেন একটা নগর, এই নগরে যিনি শয়ন করেন তাঁর নাম পুরুষ। এটাই আমাদের প্রচলিত ধারণা। কিন্তু শুদ্ধ বেদান্ত মতে যাবতীয় যা কিছু আছে, যা কিছু আমরা কল্পনা করতে পারি সেখানেই আত্মা ওতপ্রোত ভাবে আছেন, সব কিছুর মধ্যে তিনি ঢুকে রয়েছেন সেইজন্য তাঁর নাম পুরুষ। ধ্যানের একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় সবাইকে স্থূল জিনিষের উপরই ধ্যান করা শুরু করতে হয়। গুরু দীক্ষার সময় শিষ্যকে বলে দেন ঠাকুরের উপর ধ্যান করতে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বেশির ভাগ ভক্তই ঠাকুরের ছবি বা মূর্তির উপরই ধ্যান করে। কিন্তু গুরুদেব কাউকে ছবি বা মূর্তির উপর ধ্যান করতে বলছেন না, বলছেন ঠাকুরের ধ্যান করতে। ছবি একটা জড় পদার্থ, মূর্তিও জড়, তাহলে সবাই তো জড়ের ধ্যানই করে যাচ্ছে। ঠাকুরের ধ্যান করা মানে চৈতন্যের ধ্যান করা। তাহলে কি কোথাও ভুল হচ্ছে? কোথাও কোন ভুল নেই, কারণ প্রথমে সবাই এভাবেই ধ্যান করতে শুরু করে, ছবি দিয়েই সবাই শুরু করে। কারণ আমাদের মন খুব স্থূল, স্থূল মন সূক্ষ্ম জিনিষের ধারণা করতে পারে না। যতই গুরু বলে দিন ঠাকুরের ধ্যান করতে, কিন্তু প্রথমেই কেউ ঠাকুরের ধ্যান করতে পারবে না। স্থূল মনের দ্বারা ধ্যান শুরু হবে স্থূল বস্তুকেই দিয়ে। এটাই এতক্ষণ আলোচনা করা হল, *ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা*, জগতের বিষয়বস্তু স্থূল, ইন্দ্রিয়গুলো আরও সূক্ষ্ম। ছবির উপর ধ্যান করতে করতে ধ্যান গভীরে যেতে শুরু হয়। যোগশাস্ত্রে খুব সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথমে ঠাকুরের ছবির উপর ধ্যান হয়। ধ্যান যত গভীরে যেতে শুরু করে তখন একটা অবস্থায় ঐ ছবিকে দেশ ও কাল থেকে সরিয়ে এনে ধ্যান করতে হয়। ধ্যান যদি ঠিক হয় তখন ঠিক ঠিক দেখে যে ঐ ছবি দেশ ও কালে আবদ্ধ নয়।

মনে করা যাক এই গ্লাশের উপর ধ্যান করা হচ্ছে। গ্লাশ একটা বস্তু, গ্লাশের উপর ধ্যান করা খুবই সহজ, কিন্তু তখনও গ্লাশের উপর ধ্যান হবে না, গ্লাশের যে আকৃতি তার উপর ধ্যান হবে। গ্লাশের উপর ধ্যান করার পর দেখছে গ্লাশ একটা দেশের মধ্যে আবদ্ধ। ধ্যান যখন গভীর অর্থাৎ সূক্ষ্ম হতে শুরু হয় তখন দেশ ও কালের যে একটা সীমা গ্লাশের উপর রয়েছে, সেটা খসে পড়ে যায়। তখনই ঠিক ঠিক বস্তুর ধ্যান শুরু হয়। ঠাকুরের ছবির যারা ধ্যান করছে তাদেরও একই জিনিষ হয়, যখন গভীর হতে শুরু হয় তখন ছবির দেশ কালের সীমাটা খসে পড়ে যায়। বস্তুর ভেতরের জিনিষটা তখন ফুটে ওঠে। ঠাকুরের ছবির মূল হল ঠাকুর নিজে, ছবির আলো ছায়া তাকে দেশ কাল রূপে আবদ্ধ করে রেখেছে। দেশ ও কালের সীমাটা সরে গেলে ঠাকুরের আসল রূপ বেরিয়ে আসে। ধ্যানের এটাই প্রথম ধাপ। যোগশাস্ত্রেও প্রথমে বস্তুর উপর ধ্যান করতে বলা হয়, সেখানেও সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দা ও সাস্মিতা এই সব বিভিন্ন ধাপে ধাপে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শুরু হয় বস্তুর উপর ধ্যান দিয়ে, বস্তুর উপর ধ্যান গভীর হয়ে গেলে বস্তুকে দেশ কালের সীমার বাইরে দেখতে শুরু করেন। বস্তু যে উপাদান দিয়ে নির্মিত সেই উপাদানের উপর তখন ধ্যান শুরু হয়। যাবতীয় বস্তু পাঁচটি তন্মাত্রা দিয়ে নির্মিত, তখন তন্মাত্রার ধ্যান হতে শুরু হয়। তন্মাত্রাও দেশ ও কালে আবদ্ধ, কিন্তু তন্মাত্রারও ধ্যান করে করে যখন আরও গভীরে চলে যাচ্ছে, তখন তাকে যোগশাস্ত্রে বলছেন সবিচার। তন্মাত্রারও দেশ কালের সীমা পার করে আকাশের উপরই যেন ধ্যান হতে থাকে বা শুধু অগ্নি তত্ত্বের উপরই ধ্যান হচ্ছে, মন

তখন অনেক গভীরে চলে গেছে, এটাকে বলছেন নির্বিচার সমাধি। লীলাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের সাধনার খুব সুন্দর বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, ঠাকুর যখন একটার পর একটা সাধনা করে যাচ্ছেন তখন তাঁর মন কত সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হতে শুরু করছে, বিভিন্ন ধরণের দিব্যদর্শনাদি হচ্ছে। ওখানে মনের শক্তি অন্য রকম হয়ে যায়। ঐ অবস্থাকেও অতিক্রম করে যখন এগিয়ে যায় তখন নিজের বুদ্ধির উপর ধ্যান হতে শুরু হয়, এই অবস্থাকে বলছেন সানন্দা। সানন্দা আবার দুই রকম, প্রথমে শুরু হয়েছিল গ্লাশের উপর ধ্যান করা, গ্লাশ আছে, গ্লাশকে ধরছে চোখ, চোখ একটা ইন্দ্রিয়। এটাই এখানে বলছেন *ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা*, প্রথমে গ্লাশের উপর ধ্যান হচ্ছে, ধীরে ধীরে গ্লাশ তার স্বরূপকে খুলে দিল, খুলে দিয়ে দেশ কালের সীমার বাইরে চলে গেল, থেকে গেল শুধু গ্লাশ। কি গ্লাশ? গ্লাশের যে গ্লাশত্ব, সেটাই এখন আছে। এবার এই গ্লাশত্বের উপর ধ্যান শুরু হল, ধ্যানের আরও গভীরে গিয়ে দেখছেন সমগ্র জগৎ পঞ্চ তন্মাত্রার খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। এখান থেকে যখন আরও গভীরে যেতে থাকে তখন তন্মাত্রা থেকে সরে গিয়ে এতক্ষণ তন্মাত্রাকে যে ধরছিল তার উপর ধ্যান হতে শুরু হয়। তন্মাত্রাকে কে ধরছে? বুদ্ধি তন্মাত্রাকে ধরছে। এই বুদ্ধিকেও যখন দেশ ও কালের বাইরে দেখতে শুরু করে তখন দেখছে সমষ্টি বুদ্ধি। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক মন, বৈশয়িক মন, সেই মনের উপর ধ্যান চলে যায়, এটাই সানন্দা। এরপর আসে সাস্মিতা, সাস্মিতাতে দেখে বুদ্ধির পর শুধু থেকে যায় মন, সেই মন দেখছে আমি আছি। বুদ্ধিও তখন একটু আলাদা করে থেকে যায়, সেখানে দেখে শুধু আমি। সেখান থেকে যখন আমিত্বটাও সরে যায়, সরে গিয়ে তখন দেখে একটা বৈশয়িক আমিত্ব রয়েছে, এটাই সেই প্রকৃতি। রাজযোগ এই জিনিষটাকে এক ভাবে নিয়ে গেছে, কঠোপনিষদ এখানে আরেক ভাবে নিয়ে যাচ্ছেন, পরের মন্ত্রে আবার আরেক ভাবে নিয়ে যাবেন। তার কারণ, সাধনায় শুধু একটাই পদ্ধতি নেই। যারা ঠাকুরের বা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করছে সেখানে যাদের মনের গঠন যেমন, তারা যেভাবে ধ্যান করছে সেভাবেই তারা অগ্রসর হবে। কিন্তু একটা সুনির্দিষ্ট প্রণালীতে যখন পুরো ব্যাপারটা আলোচনা করা হয় তখন এই কটি জিনিষই পর পর আসতে থাকবে, দেশ কাল সাপেক্ষ বস্তু, তারপর দেশকাল নিরপেক্ষ বস্তু, সেখান থেকে বস্তু যে জিনিষ দিয়ে নির্মিত সেই জিনিষের উপর ধ্যান হবে, তারপর হবে দেশকালের বাইরে বস্তুর উপাদানের উপর ধ্যান, সেখানে ধ্যান ধীরে ধীরে আরও অন্তর্মুখী হয়ে নিজের দিকে চলে আসে, তখন নিজের মনই ধ্যানের বিষয় হয়ে যায়। নিজের মনের ধ্যানকে আরও গভীরে নিয়ে গিয়ে মনের দেশকালের পারে শুদ্ধ মনের উপর ধ্যান হতে শুরু হয়, তখন দেখে এই মনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি মন। এখান থেকে আরও এগিয়ে গিয়ে দেখে সে নিজে সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গে এক হয়ে আছে। সেখানেও কিন্তু তার এই বোধ আছে যে, আমি এক হয়ে রয়েছি।

এটাকেই দ্বৈতবাদীরা অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করে বলছেন, মানুষ মৃত্যুর পর তার কর্মানুসারে পৃথিবীলোক থেকে সূর্যলোকে যায়, আরও পূণ্য থাকলে চন্দ্রলোকে যায়, আরও বেশি পূণ্য হলে দ্যুলোকে যায়, তার থেকে আরও পূণ্য থাকলে ব্রহ্মলোকে যায়। দ্বৈতবাদীরা এই চারটে লোক সূর্যলোক, চন্দ্রলোক, দ্যুলোক আর ব্রহ্মলোকের কথা বলেন। স্বামীজী দুটো মতবাদকেই সমন্বয় করে ব্যাখ্যা করছেন। সূর্যলোকের কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী যোগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বলছেন, সূর্যলোকে আকাশ আর প্রাণ এই দুটিই আছে। ধ্যানাদি করে যিনি সূর্যলোকে গেছেন সেখানে তিনি সব কিছুর পেছনে যে পার্টিকেলস রয়েছে, পদার্থ রয়েছে, তাকেই আকাশ রূপে দেখেন, আর তাকে চালাচ্ছে প্রাণ। কিন্তু পৃথিবীলোকে আমরা পদার্থ আর শক্তি আলাদা রূপে দেখছি, যেমন ট্রেন, ট্রেনের ইঞ্জিন আর ইঞ্জিনে ইলেক্ট্রিসিটি যা ট্রেনকে চালাচ্ছে, আমরা স্পষ্ট দেখছি ইলেক্ট্রিসিটি আলাদা ইঞ্জিন আলাদা। এখান থেকে আরও গভীরে গিয়ে দেখেন সব কিছু যেন একত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত কিছুর পেছনে যেন তন্মাত্রার শক্তিগুলি রয়েছে। তারও উপরে চলে গিয়ে দেখে মনের শক্তি দিয়েই যেন সব কিছু চলছে, স্বামীজী বলছেন psychic force বা শুধু প্রাণ চলছে। শেষ ধাপ অর্থাৎ ব্রহ্মলোক বা যোগশাস্ত্র যাকে সাস্মিতা বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলছে, এই দুটোর সাথে একটা মিল আছে, সেখানে সে নিজেকে ঈশ্বরের সাথে এক বোধ করে। যাঁরা ভাগবত ধর্ম পালন করেন, যাঁরা বিষ্ণুর উপাসক তাঁরাও এভাবেই দেখেন, সেখানে তাঁরা সাযুজ্য, সামীপ্য, সালোক্য ও সারূপ্য এই এই ভাব নিয়ে দেখেন। ব্রহ্মলোককেই বৈষ্ণবরা বিষ্ণুলোক বলছে, শৈবরা শিবলোক আর ঠাকুরের ভক্তরা রামকৃষ্ণলোক বলছে। সেখানে সে দেখে আমি আছি আর ঈশ্বর আছেন কিন্তু নিজেকে বিশ্বমনের সাথে এক দেখে, সমস্ত জীব, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন তারই মধ্যে অবস্থান করে আছে। দ্বৈতবাদ এখানে এসেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু যোগশাস্ত্র ও বেদান্ত এখান

থেকে আরেক ধাপ এগিয়ে যায়, যেখানে আমি তুমির যে শেষ একটা আবরণ, এই আবরণকেও ভেদ করে বেরিয়ে যায়। বেদান্ত এখানে অন্য রকম কথা বলে আর যোগশাস্ত্রও অন্য রকম কথা বলে। যোগশাস্ত্র বলছে, শুদ্ধ চৈতন্য সেখান থেকে যখন আরেক ধাপ এগিয়ে যায় তখন তার কৈবল্য হয়ে যায়, চৈতন্যের শুদ্ধ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বা প্রকৃতির খেলার সাথে তার আর কোন সম্পর্ক থাকে না। বেদান্ত বলে এখানে এসে সাধক আত্মার শুদ্ধ ভাবের সাথে এক হয়ে যায়, তখন আমি তুমির ভাব চলে গিয়ে থাকে শুদ্ধ অদ্বৈত, যেখানে দুই বলে কিছু নেই, এক দুইয়ের পারে, আমি আছি এই বোধটাও থাকে না। তখন সত্তামাত্রম্ থেকে যায়। আমি আছি বলতে আমার মধ্যে সব কিছু আছে তা নয়, আমিই আছি। এই জিনিষকে আবার ধারণা করা কঠিন হয়ে যায়। এটাকেই দুটি মন্ত্রে পর পর বললেন।

এই আলোচনা করার পর বলছেন *সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ*। ধ্যানের গভীরে সূক্ষ্মত্বের দিকে এগিয়ে গিয়ে যখন ব্রহ্মালোকে পৌঁছে গেল, যেখানে প্রকৃতির সাথে এক হয়ে গেল, যাকে প্রকৃতিলীন পুরুষ বলা হয় বা হিরণ্যগর্ভ বলা হচ্ছে বা বিষ্ণুলোকে বাস করা বলা হয়, এখান থেকেও সাধককে ফিরে আসতে হয়। এই নিয়ে বিভিন্ন দর্শন আবার ভিন্ন ভিন্ন কথা বলে, বেদান্ত মতে বিষ্ণুলোক থেকে ফেরত আসতে হবে। কিন্তু পরবর্তি কালের ভক্তিশাস্ত্র বলছে, কেউ যদি ঈশ্বরকে এমনই ভালোবাসে যে ভালোবাসায় সে সেই সূক্ষ্মত্বে চলে গেল, ভগবান চাইলে তাকে জগত উদ্ধারের জন্য কাজে লাগাতে পারেন বা তাকে মুক্তি দিয়ে দিতে পারেন। মুক্তি ভক্তিশাস্ত্রকেও মানতে হয়, মুক্তিকে তারা যেভাবেই পরিভাষিত করুক না কেন, তাদেরকেও মুক্তি মানতে হয়। মুক্তি মানে স্বরূপ জ্ঞান, যার মধ্যে আমিত্ব বলে কিছু থাকে না। ভগবান বলেন – তুই আমার এই রূপটা দেখলি এবার আমার অখণ্ড রূপটাও দ্যাখ। সোনার দোকানে অনেক রকম গহনা আছে, তার মধ্যে আংটি আছে, দুল আছে, লকেট, মুকুট আছে আরও নানান ধরণের গহনা রাখা আছে। এবার তাপ দিয়ে দিয়ে এত তাপ দেওয়া হল যে সব গহনা গলে ডেলা ডেলা হয়ে গেল। এবার কোনটা দুল, কোনটা আংটি কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, শুধু সোনাই আছে। ঈশ্বর দর্শন মানে ঠিক তাই। এই যে আমরা বহু দেখছি, মানুষ, বাড়ি, গাছ, পশু যত রূপ দেখছি এগুলো সব ভেঙে যায়। ঈশ্বর জ্ঞানের যে তাপ সেই তাপ এই নাম আর রূপকে গলিয়ে দেয়। নাম রূপকে গলিয়ে ডেলা থেকে যায়, সেই ঈশ্বর রূপী ডেলা, সব যেন চৈতন্যের ডেলা, এছাড়া আর কিছু থাকে না। তখন দেখে চৈতন্য ছাড়া কিছু নেই, চৈতন্যের এই বোধটাই থাকে, আমি আছি এই বোধটাও চলে যায়। ঠিক তেমনি যাঁরা আত্মজ্ঞানের দিকে যান তাঁদেরও একই জিনিষ হয়, তাঁরা দেখেন আত্মা ছাড়া কিছু নেই। নাম আর রূপের খেলা তখন বেদান্তীর কাছে মিথ্যা হয়ে যায় আর ভক্তের কাছে লীলা হয়ে যায়। যেহেতু মায়া সাধারণ ভাবে মিথ্যা একটা ভাবকে বোঝায়, সেইহেতু ভক্ত মায়া না বলে লীলা বলে। একমাত্র অদ্বয় বা অদ্বৈত জ্ঞানের পরই মানুষের আর পুনর্জন্ম হয় না। কারণ পুনর্জন্ম হওয়ার জন্য একটা individuality দরকার, একটা বস্তু রূপে যতক্ষণ থাকবে তার রূপ পাল্টাতে থাকবে, এটাই পুনর্জন্ম। কিন্তু নাম-রূপের যেমনি নাশ হয়ে গেল তখন সে ঐ ডেলার সাথে এক হয়ে গেল, তখন আর পুনর্জন্ম কোথা থেকে হবে, ওখানেই সব শেষ। সে ভক্তি ভাব নিয়েই যাক আর জ্ঞানের ভাব নিয়েই যাক, ওখানে গিয়ে সব শেষ। সেইজন্য বলছেন *সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ*।

তখন শঙ্কা করছেন, তা কি করে সম্ভব? একজন মানুষ তার কর্মানুসারে সূর্যলোকে গেল, চন্দ্রলোকে গেল, দ্যুলোকে গেল, ব্রহ্মালোকে গেল, তারপর আত্মলোকে গেল। যেখানে যাওয়া আছে, সেখানেই গতি আছে, গতিতে সেখানে গেল কিন্তু সেখান থেকে তো তাকে ফেরত আসতে হবে। আমি যদি কোথাও যাই সেখান থেকে আবার আমাকে ফিরে আসতে হবে, তাহলে কি করে বলছেন তার আর পুনর্জন্ম হবে না? খুব সহজ যুক্তি। বেদান্ত দর্শনে যুক্তি অত্যন্ত গুরুত্ব, যুক্তি যদি না থাকে বেদান্ত নেবেই না। ভক্তির আবেগ নিয়ে তুমি বলতে পার ঠাকুরের ইচ্ছাতেই সব হয়, কিন্তু বেদান্ত প্রথমেই তোমাকে বার করে দেবে। তোমার কথা আমি না হয় শুনে নেব কিন্তু বাইরে তোমার কথা কে শুনতে যাবে! দেশে এত সাধু মহাত্মা থাকতে স্বামীজীর কথাই সবাই শুনলেন। কারণ স্বামীজীর কথায় প্রখর যুক্তি ছিল, তাঁর প্রত্যেকটি কথায় দম ছিল। তোমার কথা কেন কেউ শুনতে চায় না? কারণ তোমার নিজেরই কোন কিছুর উপর বিশ্বাস নেই। তুমি নিজেই কিছু জান না, যদি জেনেও থাক সেটাকে যুক্তিতে দাঁড় করাতে পারছ না। কিন্তু যাঁরা এই ধর্মগ্রন্থ রচনা করছেন তাঁরা সেই রকম নন, তাঁরা তাঁদের প্রত্যেকটি কথার পেছনে যুক্তি দাঁড় করিয়ে দেবেন। ব্রহ্মালোকে যদি কেউ গিয়ে থাকে সে

ফেরতও আসবে, সূর্যলোক, চন্দ্রলোক, দ্যুলোকে গিয়ে থাকলে সেখান থেকেও তাকে ফেরত আসতে হবে। অন্যান্য ধর্মে যে অনন্ত স্বর্গের কথা বলে আমরা তাদের এই মত মানি না। অনন্ত স্বর্গ বলে কিছু হতে পারে না। হতে পারে যদি তার অদ্বৈত জ্ঞান হয়ে থাকে। যদি অনন্ত স্বর্গকে অখণ্ড জ্ঞানে পরিভাষিত করা হয় তখন আমাদের কোন আপত্তি থাকবে না। অখণ্ড জ্ঞান মানে আত্মলোকে যাওয়া। ব্রহ্মলোকে গেলে ফেরত আসতে হবে আর আত্মার লোকে গেলে ফেরত আসতে হবে, এ কি করে হবে? নচিকেতাকে যমরাজ বলছেন, তুমি যে প্রশ্ন করেছিলে কখন সেই অবস্থা হয় যখন আর ফেরত আসতে হয় না, আমি তোমাকে তার ধাপগুলো পর পর বলে দিলাম, আত্মাতে পৌঁছে গেল তাকে আর ফেরত আসতে হবে না। কিন্তু যুক্তিতে তা কি করে হবে? যেখানেই গতি সেখান থেকে অগতিও হয়, যেখানে গেছে সেখান থেকে ফেরতও আসবে, এটা তো সাধারণ ব্যাপার। তাহলে কেন বলছেন আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে আর পুনর্জন্ম হবে না?

তখন আচার্য বলছেন, এটা তা নয়। এই গতি উপাচার মাত্র, অর্থাৎ সব জায়গায় গতি বলা হয় বলে এখানেও গতি শব্দটা বলা হয়েছে। গতি বলতে যা বোঝায় আসলে এখানে গতি তা নয়, গতি হল জ্ঞান। আত্মজ্ঞানের অবস্থা মানে কোথাও যাওয়া বোঝায় না, আত্মজ্ঞান হল জ্ঞানের অবস্থা। দ্বৈতবাদীরা বিভিন্ন লোকের কথা বলছে আর অদ্বৈতবাদীরা বলছে এগুলো সব কল্পনা, এই দুটো মতকে সামঞ্জস্য করতে গিয়ে স্বামীজী ঠিক এই কথাই বলছেন। দ্বৈত বেদান্তের কাছে জীবাত্মা সত্য, ফলে জীবাত্মা তার পূণ্যকর্মের ফলে মৃত্যুর পর সূর্যলোকে যাচ্ছে, পূণ্য ক্ষয় হয়ে গেলে সেখান থেকে আবার নেমে আসছে। আবার শুভ কর্ম করে এবার দ্যুলোকে গেল, এইভাবে শত জন্ম তপস্যা করে শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মলোকে গেল। সেখানে কৃপা করে তিনি তাকে মুক্তি দিয়ে দিতে পারেন, যদি মুক্তি না দেন তাকে আবার ফেরত আসতে হবে। আবার তপস্যা ও শুভ কর্ম করে করে ব্রহ্মলোকে গেল, আবার তাকে ফেরত আসতে হল, এভাবেই চলতে থাকবে। কিন্তু দ্বৈতবাদে সমস্যা হল, কিছু কিছু জিনিষের ব্যাখ্যা করা যায় না, শুনতে সবারই ভালো লাগে। যেমন বলে, আমি মায়ের নাম করেছি আমার আর ভয় কী! গানে অনেক কিছুই বলা যায়। কিন্তু যখন যুক্তি দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তখন উপর থেকে নীচ পর্যন্ত যুক্তি থাকতে হবে।

বেদান্তীরা বলছেন, শুদ্ধ আত্মার কাছে নানান রকম দৃশ্য আসছে। ঘুমের মধ্যে যেমন স্বপ্ন আসে, স্বপ্নে কখন চোর হয় কখন সিপাহী হয়, কখন ভয় পায় কখন ভয় দেখায়। ঠিক তেমনি শুদ্ধ আত্মার কাছে জীবন যেন এক একটা দৃশ্য, সেই দৃশ্যে সে ভালো কাজও করছে খারাপ কাজও করছে, কখন সে হাসছে কখন কাঁদছে, মৃত্যুটাও তার কাছে একটা দৃশ্যের মত, মৃত্যুর পরে যে আবার জন্ম নিচ্ছে সেটাও তার কাছে একটা দৃশ্য। সাধনা করে সূর্যলোকে যাচ্ছে, সেটাও তার কাছে একটা দৃশ্যের মত, সেখান থেকে আবার ফিরে নতুন জন্ম নিচ্ছে সেটাও আরেকটা দৃশ্য। তিনি স্থির তাঁর সামনে এই দৃশ্যগুলি ভেসে যাচ্ছে। ব্রহ্মলোকে যাওয়ার পর দৃশ্যটা অন্য রকম হয়ে যায়, তখন দেখছেন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে তিনি এক হয়ে গেছেন, তিনি আছেন আর ঈশ্বর আছেন। কিন্তু তার পরেই যে দৃশ্যটা আসে সেই দৃশ্যে আগের সব দৃশ্যগুলি উড়ে যায়, তখন আর দৃশ্য বলে কিছু থাকে না, থাকে শুধু বিশুদ্ধ জ্ঞান। সিনেমার প্রজেক্টরে রীল ঘুরছে আর পর্দায় নানা রকমে দৃশ্য চলতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে রীলটা শেষ হয়ে গেল, রীল যেমনি শেষ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে প্রজেক্টর থেকে সাদা আলো পর্দায় এসে পড়ছে। বেদান্তের দৃষ্টিতে জীবনটা ঠিক তাই। আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য কিনা, তিনি নিজের মত ভাবছেন। তিনি তো আমাদের মত দু-চার মিনিট ভাববেন না, তাঁর যুগযুগান্তরের চিন্তন।

স্বামীজী আবার আরেক ধাপ এগিয়ে জল আর ঢেউএর উপমা নিয়ে এলেন। জলে ঢেউ উঠছে, এক একটা ঢেউ যেন এক একটা জীব, এক একটা মন। জল রূপে সব এক কিন্তু ঢেউ রূপে আলাদা। ঢেউ উঠছে নামছে, আর তার সাথে আরও শত শত ঢেউ উঠছে নামছে। জল আর ঢেউ দুটোতে কোন তফাৎ নেই, অথচ তফাৎ আছে। ঠিক তেমনি শুদ্ধ আত্মা তিনি অনন্ত আমি আপনি সবাই আমরা এক একটা ঢেউ। যিশুও একটা ঢেউ, বুদ্ধও একটা ঢেউ, মহম্মদও একটা ঢেউ। ঢেউ একটা উপরে যাচ্ছে আরেকটা নীচে নেমে আসছে, এই আছে এই নেই, এই জীবন এই মৃত্যু। হতে হতে একটা ঢেউ শান্ত হয়ে গেল, একটা জীবের যেন মুক্তি হয়ে গেল। জীবের মুক্তি হয়ে গেল মানে কিছুই হয়নি, ঢেউটা জলে মিশে গেছে। ঢেউ তো জল থেকে আলাদা কোন দিনই ছিল না। ফিজিক্সেও বলে জল কখন move করে না, it is the disturbance that moves। ঢেউ

উঠছে আমরা মনে করছি জল চলছে, কিন্তু জল চলে না। এই যে নানা রকমের দৃশ্য চলছে, আত্মা কখনও চলে না, আত্মার উপর প্রকৃতির খেলা চলছে। এই চলাটা কি রকম? এত দিন জীবন এক ভাবে চলছিল, কিভাবে কিভাবে শাস্ত্রের কথা শোনার সুযোগ এসেছে, শাস্ত্রের কথা শোনার পর মন এখন একটু ধ্যান ধারণার দিকে যাচ্ছে, হতে হতে আরও উন্নত হয়ে গেল। এবার যে দৃশ্যগুলো আসবে সেগুলো আরও উন্নত দৃশ্য। এত দিন দুটো পয়সার জন্য, শরীরের জন্য চোখের জল ফেলার যে দৃশ্যগুলো আসছিল সেই দৃশ্য বন্ধ হয়ে আরেকটু উচ্চমানের দৃশ্য আসতে শুরু করবে। আগে মৃত্যুর পর সাধারণ স্বর্গ, নরক, সাধারণ জন্ম যা হচ্ছিল এগুলো সরে গিয়ে এবার মৃত্যুর পর দৃশ্য হবে সূর্যলোকের, যেখানে সুখভোগের দৃশ্য, শান্তিতে থাকার দৃশ্য দেখতে থাকবে। ওখান থেকে জন্ম হবে সেটাও অনেক উন্নতমানের জন্মের দৃশ্য, দৃশ্যগুলো পাল্টাতে শুরু করে দিয়েছে। এরপর সাধনা করে করে এই জন্মেই হোক বা পরের জন্মেই হোক, একটা সময় তো আসবেই যখন মন এত শুদ্ধ হয়ে যাবে বা এমন সূক্ষ্ম হয়ে যাবে যে তার সামনে এবার ব্রহ্মলোকের দৃশ্য ভাসতে শুরু হয়ে গেল। এই দৃশ্যগুলো আত্মার উপর প্রকৃতির খেলা বা ছায়া। ব্রহ্মলোকের পর সে যদি আরও এগোতে চায়, মন যদি আরও সূক্ষ্ম হয়ে যায় তাহলে আর কোন দৃশ্য থাকে না, তখনই বোধে বোধ হয়, শুধু জ্ঞানই থাকে। কি জ্ঞান? আরে তাই তো! আমিই তো আছি, দৃশ্য দ্রষ্টা বলে তো কিছু নেই। এতক্ষণ জলের উপর ঢেউ উঠছিল নামছিল, সব ঢেউয়ের ওঠানামা বন্ধ হয়ে জল শান্ত হয়ে গেল। জলই এতক্ষণ নাচানাচি করছিল।

একটা জিনিষকে জানা যে অর্থে বোঝায় অদ্বয় জ্ঞান সেই অর্থে জানা হয় না। এই গ্লাশকে যখন জানতে চাইছি তখন এই জানাটা একটা ক্রিয়া। সেখানে অনেক কিছুর দরকার হয়, বস্তু দরকার, মন দরকার আর জানা এই ক্রিয়ার দরকার। আত্মজ্ঞানে তা হয় না, আত্মজ্ঞানে কোন বস্তু জ্ঞান হয় না। আত্মজ্ঞানে জ্ঞানের যে ক্রিয়া সেটাই বস্তু আর সেই জানে। আত্মা যখন আত্মাকে জানেন তখন জানা জিনিষটাও আত্মা, যিনি জানছেন তিনিও আত্মা আর জানার যে ক্রিয়া সেটাও আত্মা। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান এক হয়ে যায়, ধ্যাতা, ধ্যেয় আর ধ্যান এক হয়ে যায়। আমি যখন ঠাকুরের ধ্যান করছি তখন ঠাকুর আলাদা, আমি আলাদা আর ঠাকুরের ধ্যান আলাদা। এইভাবে চলতে চলতে ব্রহ্মলোকের অবস্থায় পৌঁছে দেখছি আর কিছু নেই, মা আছেন আর আমি আছি। গানে পরে বলছে ভাবনা কি ভাই, এই ভাবনা জগতকে নিয়ে বলছেন, কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞানে এই চিন্তাও আসবে না যে আমার ভাবনা কিছু নাই। এরপরে যে অবস্থা সেখানে আমি ঠাকুরের উপর ধ্যান করছি এই বোধটাও চলে যায়, তখন দেখে আমি ধ্যান করছি। কার ধ্যান করছি? আমারই ধ্যান করছি আর ধ্যান করাটাও আমি। কর্তা, কর্ম আর ক্রিয়া তিনটে এক হয়ে যায়। এটাই অদ্বৈত জ্ঞান। আচার্য তাই বলছেন, এই যে গতি বলা হয়েছে, কথার কথা মাত্র, উপাচার মাত্র, গতি যে অর্থে বোঝায়, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া, আত্মজ্ঞান তা নয়। আসলে কেউ কোথাও যায় না, যে যেখানে আছে সে সেখানেই আছে। কোথাও গেলে তো ফেরত আসবে, আত্মা তো কোথাও জান না। তাহলে তার আগে পর্যন্ত কি যাচ্ছিল না? সেখানেও কোথাও যাচ্ছিলেন না। তখন দৃশ্যের খেলা চলছিল বলে যেমন যেমন দৃশ্য পাল্টাচ্ছিল সেইভাবে তার মনে হচ্ছিল আসা যাওয়া করছে। এই জিনিষটা তখনই বন্ধ হয়ে যাবে যখন মন ততটাই সূক্ষ্ম হয়ে যাবে যে সূক্ষ্ম হয়ে গেলে মন সেই আত্মাতে লয় হয়ে যেতে পারবে। তখন আমি তুমি বোধটাও আর থাকবে না। আমি তুমির ভেদ যদি না থাকে তাহলে কে কার ধ্যান করবে!

আচার্য আরও বলছেন যখন গতি হয় তখন নিজের থেকে আলাদা কিছুতে গতি হয়। আমি এখানে আছি, এখানে আমি দেশ কালে বাঁধা। এখান থেকে বেরিয়ে আমি বাসস্ট্যাণ্ডে যাব, এই জায়গা আর বাসস্ট্যাণ্ড দুটো আলাদা, আমি আলাদা স্থান আলাদা সেইজন্য আমি এখান থেকে ওখানে যেতে পারব। কিন্তু আত্মজ্ঞানে কোথায় যাবে, কারণ যিনি যাবেন তিনি তো সর্বব্যাপী, সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, সেইজন্য যুক্তিতে কোথাও যাওয়া হয় না। আচার্য তখন উপনিষদ থেকে মন্ত্র উদ্ধৃত করে বলছেন *অনধ্বগা অধ্বসু পারয়িষ্ণবঃ*, যাঁরা সংসারমার্গের পারে যেতে চান সেই পুরুষের জন্য এটা মার্গরহিত, ঐ অর্থে কোন পথ নেই যে অর্থে জগতে পথ হয়। যেমন, আমি যদি সুখ চাই তাহলে সুখের জন্য আমার বস্তু দরকার, ঐ বস্তুকে পাওয়ার জন্য অর্থ দরকার, অর্থের ব্যবস্থা করার জন্য আমাকে পরিশ্রম করতে হবে, পরিশ্রম করার জন্য শরীর, মন দরকার, প্রশিক্ষণ দরকার, একটার পর একটা পথ চলছে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে, যিনি এই সংসারের পারে যেতে চান সেখানে এই অর্থে কোন পথ নেই। পথ থাকার কোন প্রশ্নই হয় না। সেইজন্য এনারা অনেক রকম উপমা নিয়ে

আসেন। সব থেকে নামকরা উপমা হল তুমি দশম, দশজন বন্ধু নদীর অপর পারে যাবে। পার হওয়ার পর বলছে আমরা সবাই এসেছি কিনা দেখতে হবে। গোণা শুরু হয়েছেন, গুণে দেখছে নজন বন্ধু। সবাই ভাবছে একজন কোথায় চলে গেল? তখন আরেকজন বলল তুমি নিশ্চয়ই গুণতে ভুল করেছ, এবার আমি গুণে দেখছি। সেও গুণে দেখছে নজনই আছে। সবাই চিন্তায় পড়ে গেল, আরেকজন কোথায় গেল। সবাই কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। ওখান দিয়ে একজন লোক যাচ্ছিল, কান্নাকাটি শুনে লোকটি দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করছে 'কি সমস্যা'? 'আমরা দশ জন ছিলাম একজনকে পাওয়া যাচ্ছে না'। 'ঠিক আছে তোমরা সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে তোমাদের একজন গুণে দেখুক'। যেই নয় পর্যন্ত গোণা হয়ে গেছে তখনই লোকটি লাঠি দিয়ে সেই বন্ধুর মাথায় মেরে বলছে *দশমস্ ত্বমসি*, তুমিই হলে দশম। তাহলে দশম কোথা থেকে এল? কোথাও থেকে আসেনি, ওখানেই সব সময় ছিল। আত্মজ্ঞান কোথা থেকে এল? কোথাও ছিল না, সব সময় ওখানেই আছে। যতক্ষণ অন্যকে গুণবে ততক্ষণ এক, দুই, তিন, চার চলবে কিন্তু নিজেকে গোণার সময় হিসাব থাকবে না। জগতে সব কিছুকে খুঁজে বার করে দেওয়া যাবে কিন্তু আত্মাকে কোথা থেকে খুঁজে বার করব, কারণ আমিই তো সেই আত্মা, আমাকে আমি কোথা থেকে খুঁজে বার করব! ছোট্ট শিশু মেলাতে হারিয়ে গিয়ে কাঁদছে। দৌড়ে এসে একজন জিজ্ঞেস করল 'তুমি কি হারিয়ে গেছ'? বাচ্চাটি বলছে 'আমি হারাইনি আমার বাবা হারিয়ে গেছে'। মানুষ নিজে কখনই হারায় না, হারায় তার নিজের লোকেরা। আমি আর আপনি একসাথে কোথাও গিয়ে আলাদা হয়ে গেলাম, সেখানে আমি হারিয়ে যাইনি, আমার জন্য আপনি হারিয়ে গেছেন, আর আপনার জন্য আমি হারিয়ে গেছি। আমি কখনই আমার জন্য হারিয়ে যাব না। ঠিক তেমনি এই জগতে মানুষ সব কিছুকে খুঁজে বার করে নিতে পারবে কিন্তু নিজেকে কোন দিন খুঁজে বার করতে পারবে না। এই হল এই দুটি মন্ত্রের ভাবার্থ। পরের মন্ত্রে বলছেন –

এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়োহহত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।।১/৩/১২।।

(এই পুরুষ জীবমাত্রেই আবৃত থাকায় আত্মারূপে প্রকাশিত হন না। কিন্তু একাগ্র ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি সহায়ে মেধাবীগণ তাঁকে প্রত্যক্ষ করেন।)

এষ, অর্থাৎ এই আত্মার কথা বলা হচ্ছে। আত্মা কি রকম? *সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়োহহত্মা ন প্রকাশতে*, আত্মা সব কিছুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন কিন্তু দেখা যায় না। আচার্য বলছেন *এষ পুরুষঃ সর্বেষু ব্রহ্মাদিস্তম্ব-পর্য্যন্তেষু ভূতেষু গূঢ়ঃ সংবৃতো*। দৃশ্য বস্তুর মধ্যে তৃণাগ্র হল সব থেকে ক্ষুদ্র আর খুবই তাৎপর্যবিহীন, সেই তৃণাগ্র থেকে শুরু করে ব্রহ্মা পর্যন্ত সব কিছুতে একমাত্র আত্মাই পরিব্যপ্ত হয়ে আছেন। বাতাস যেমন সর্বত্র বিদ্যমান, ছোট ঘর, বড় ঘর, ছোট পাত্র, বড় পাত্র সবেতেই বাতাস দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে আছে, ঠিক তেমনি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র থেকে মহৎ পর্যন্ত যা কিছু সব কিছুতেই আত্মা ছেয়ে আছেন। নীচ থেকে উপর পর্যন্ত একই সত্তা বিদ্যমান। এই আত্মার বৈশিষ্ট্য কি? আচার্য বলছেন *দর্শনশ্রবণাদিকর্মা*, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যত কার্য হয়, দর্শন কার্য, শ্রবণ কার্য সব কার্য আত্মার জন্যই সম্ভব, চৈতন্য সত্তা আছেন বলেই কার্য করা সম্ভব হচ্ছে, চৈতন্য সত্তা না থাকলে কোন কার্যই হত না। অতি সাধারণ বস্তু, যেমন তৃণাগ্রের কথা বলা হল, তারও যে অস্তিত্ব, আত্মার জন্যই এই অস্তিত্ব। আত্মার বৈশিষ্ট্যই হল অস্তিত্ব, অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছু নেই। পশুপাখিরা যা কিছু করছে, মানুষ যা কিছু করছে পেছনে আত্মা আছেন বলেই করতে পারছে। অথচ এই আত্মা *অবিদ্যা-মায়াচ্ছন্নঃ*, অবিদ্যা মায়া দিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। একদিকে তিনি সবারই অন্তরাত্মা, এ্যটমের অন্তরাত্মা তিনি, আর যিনি ব্রহ্মা তাঁরও অন্তরাত্মা সেই আত্মা, আমার আপনার সবার অন্তরাত্মাও সেই আত্মা, আত্মা ছাড়া কিছু নেই। আমাদের ঠিক ঠিক বাস্তবিকতা হল আত্মা। অথচ কারুর কাছে আত্মা প্রকাশিত হন না, কেউই আত্মার ব্যাপারে কিছু জানতে পারে না, কেউ আত্মার কথা ভাবে না, কেউই তাঁর কথা বোঝে না। আচার্য বলছেন, সত্যিই কি আশ্চর্যের, এর থেকে আশ্চর্য আর কি হতে পারে!

আচার্য যেন খুব দুঃখ করেই বলছেন, *অহো অতিগম্ভীরা*, মায়া এমনই গভীর আর *দুরবগাহ্যা*, *অবাগাহ্য দুঃ*, যেটাকে জানা বা যাকে অতিক্রম করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। আত্মতত্ত্বে আমাদের যেতে হবে, এই মায়াকে অতিক্রম করেই সবাইকে সেখানে যেতে হবে। কিন্তু মায়াকে অতিক্রম করা অসম্ভব। বিচিত্রা, মায়া

অতি বিচিত্র জিনিষ, আত্মতত্ত্বের দিকে যিনি এগোতে চাইছেন তাঁকে এমন ভাবে ফাঁসিয়ে নেয় যে সে বেচারীর কিছুই করার থাকে না। মায়াকে তাই অনেক সময় মোহিনী রূপেও বর্ণনা করা হয়। মায়ার চরিত্র অতিগম্ভীরা, এতই গভীর যে ওর মধ্যে মানুষ হাবুডুবু খেতে থাকে আর তার সাথে দুর্গম ও বিচিত্রা। উত্তর ভারতের পাহাড়ী অঞ্চলে মেয়েরাই সব কাজ করে আর পুরুষগুলো কোন কাজ করে না, সারাদিন বসে বসে বিড়ি খাবে আর তাস খেলবে। মেয়েগুলো হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে যায়। কোন বয়স্কা মেয়েকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি একা এত পরিশ্রম করেন, স্বামীকে খাটান না কেন। পাহাড়ী ভদ্রমহিলা তখন খুব দুঃখ করে বলবে, আমাদের স্বামীগুলো অপদার্থ, কোন কাজ করতে চায় না, বসে বসে তাস খেলবে আর বিড়ি খাবে। তাহলে বিয়ে করেন কেন এই অপদার্থ ছেলেগুলিকে? তখন ভদ্রমহিলা খুব গম্ভীর হয়ে বলবে, ওদের ফাঁসাতে হয়, না ফাঁসালে চলবে না। এখানে ঠিক এই কথাই যেন বলছেন, এটাই মায়া। মায়া আর মেয়ে, 'আ'কার আর 'এ'কারে শুধু তফাৎ বাকি সবটাই সমান। ঠাকুর বলছেন, ওখানে গিয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণুও খাবি খায়। এই যে মহিলা বলছেন বাঁধতে হয়, কিভাবে বাঁধবে? বিচিত্র ধরণের নতুন নতুন দৃশ্য দাঁড় করিয়ে। ঠাকুরও বলছেন, নতুন নতুন ফন্দি ফাঁদে। যোগশাস্ত্রেও প্রকৃতিকে ঠিক এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতি পুরুষের সামনে নতুন নতুন দৃশ্য দাঁড় করিয়ে যাচ্ছে। যোগশাস্ত্রে পুরুষ চৈতন্য সত্তা আর প্রকৃতি জড়ের জননী। ঋষিরা বাস্তবিক এভাবেই দেখেছেন, তাঁরা যে মেয়েদের পর্যবক্ষেণ করে এভাবে মায়াকে বর্ণনা করছেন তা নয়। ঠাকুরের কিছু কিছু দিব্য দর্শনের বর্ণনা পড়লে আতঙ্কে আমাদের গা শিউড়ে ওঠে। মাঝে মাঝে মনে হয়, আহা! এগুলো যদি ঠাকুরের মনের কল্পনা হত তাহলে কত ভাল হত! আচার্য যে বলছেন, *অহো অতিগম্ভীরা দুরবগাহ্যা বিচিত্রা*, ঠাকুরের ইচ্ছে হল দেখি এই মায়া জিনিষটা কি। দেখছেন দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাবক্ষ থেকে এক অপরূপা সুন্দরী নারী উঠে এল, ধীরে ধীরে তার উদর বড় হতে থাকল, তারপর ওখানেই দাঁড়িয়ে এক বাচ্চা প্রসব করল, রক্তারক্ত শিশুকে জন্ম দিয়ে তাকে স্তন্যপান করালে, তারপর কচ কচ করে চিবিয়ে খেয়ে নিল। এই হল মায়া। এ কোন কল্পনা নয়, ঠাকুরের দিব্য দর্শন, এটাই মায়া *অতিগম্ভীরা দুরবগাহ্যা* আর বিচিত্রা। ঠাকুরের এই দিব্য দর্শনকে আমরা কিভাবেই বা দেখব আর কিভাবেই বা বুঝব! একদিকে অপরূপা রূপসী নারী, সন্তানের জন্ম দিল, তারপর কচ কচ করে খেয়ে নিচ্ছে। প্রকৃতির এটাই একটা রূপ।

ভগবান বুদ্ধ তখন জ্ঞানের শেষ অবস্থায়, মায়া মাড়ের রূপ ধারণ করে এসে বুদ্ধকে বলছে – আপনার তো হয়ে গেল আর কি, এবার মুক্তি নিয়ে নিন। ভগবান বুদ্ধের মধ্যে তখনই করুণার উদ্রেক হল। মাড় শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে যাচ্ছে বুদ্ধকে যদি ফাঁসিয়ে নেওয়া যায়। কিভাবে ফাঁসাবার চেষ্টা করে? কখন ভয় দেখিয়ে, কখন সম্মান দিয়ে আবার কখন করুণার ভাব এনে, সব রকম ভাবে চেষ্টা করে যাবে যাতে এগোতে না পারে। ব্রহ্মলোকের পরে যেখানে ঠিক ঠিক অজ্ঞানের আবরণ খসে গিয়ে জ্ঞান আসবে, ঐ জিনিষটা মায়া কিছুতেই হতে দেবে না। ঠাকুরের জীবনীতে একটা বর্ণনা আছে, উনি একবার শ্যামবাজারে ফলুইয়ে গেছেন। ঠাকুর যাওয়ার পর চারিদিকে রটে গেল একজন লোক এসেছে যে দিনে সাত বার মরে আর সাত বার বেঁচে ওঠে। চারিদিকে লোক আর লোক। রাত্রিবেলা মেয়েরা উঠোনে শুয়ে আছে। ঠাকুর প্রস্বাব করতে যাবেন, মেয়েরা বলছে, কোথায় আর যাবে এখানেই কর। খুব অদ্ভুত বর্ণনা, দেখাচ্ছেন মেয়েগুলো ঠাকুরের প্রতি কেমন আসক্ত হয়ে আছে, প্রস্বাব করতে পর্যন্ত যেতে দিচ্ছে না। মায়া ঠিক এই রকমই করে, তোমার কি চাই আমাকে বল, তুমি কেন আমাকে ছেড়ে চলে যেতে চাইছ! মায়া সব কথাই মানবে, কিন্তু তার একটাই শর্ত, আমি তোমাকে বেঁধে রাখব। ঐ ভদ্রমহিলাও বলছিল, বাবু! এদের বাঁধতে হয়। মায়াও ঠিক তাই করে। তুমি কি চাও বল, টাকা চাও, ভোগ চাও, নাম চাও, যশ চাও সব তোমাকে দিচ্ছি কিন্তু থাকতে হবে আমার কাছে বাঁধা হয়ে।

তার পরিণাম কি? আচার্য বলছেন, *মায়া চেয়ম্‌; যদয়ং সর্বো জন্তুঃ পরমার্থত পরমার্থসতত্ত্বোহপ্যেবং বোধ্যমানোহহং পরমাত্মেতি ন গৃহ্ণাতি*, শুধু মানুষই নয় সমস্ত জীব বস্তুতঃ পরমার্থতঃ শুদ্ধ আত্মা। প্রত্যেকটি শাস্ত্র বলছে তুমি সেই শুদ্ধ আত্মা, প্রত্যেক আচার্য বলছেন তুমিই সেই শুদ্ধাত্মা কিন্তু আশ্চর্যের যে, কেউ শাস্ত্র বা আচার্যের এই কথা গ্রহণ করে না, কেউ গ্রাহ্যও করে না, *পরমাত্মেতি ন গৃহ্ণাতি*, মানুষ পরমাত্মাকে পেতে চায় না। অন্য দিকে *অনাত্মানং দেহেন্দ্রিয়াদিসঙ্ঘাতম্‌ আত্মনো দৃশ্যমানমপি ঘটাদিবদাত্মত্বেন 'অহমুষ্য পুত্রঃ' ইত্যনুচ্যমানোহপি গৃহ্ণাতি*, অন্য দিকে দেহ আর ইন্দ্রিয়ের সঙ্ঘাতকে আর ঘটাদির মত দৃশ্য পদার্থকে কোন দিন কোন শাস্ত্র, কোন আচার্য আত্মা বলেন না কিন্তু তাও লোকে মনে করে আমি অমুকের পুত্র, আমি অমুক,

আমি তমুক ইত্যাদি, ইন্দ্রিয়াদির সজ্ঘাতকে আমি মনে করছে। থেকে থেকে আচার্যের অন্তর থেকে এই ব্যাথাটা বেরিয়ে আসে। ঠাকুরেরও ব্যাথা ছিল, ঠাকুরও মাঝে মাঝে বলছেন আহা! জীবের কি দুর্দশা। আর তিনি কিছু কিছু যে কাহিনী বলছেন সেখানেও তাঁর দুঃখটা যেন বেরিয়ে আসছে। মানুষের দুর্দশার কথা ভেবে স্বামীজীও তাঁর অন্তরের ব্যাথাকে চেপে রাখতে পারতেন না। মায়া এক অতীব আশ্চর্য জিনিষ, যে জিনিষটা আছে সেই জিনিষটাকে লুকিয়ে দিচ্ছে আর যে জিনিষটা আদপেই নেই সেটাকে সামনে নিয়ে আসছে। কোন শাস্ত্র, কোন আচার্য, ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক গুরুরা কোন দিন বলছেন না যে তুমি এই দেহ, তুমি অমুকের সন্তান, তুমি অমুক। কারণ গ্লাশ, বোতল যেমন একটা দৃশ্য ঠিক তেমনি এই শরীরও একটা দৃশ্য। দৃশ্য মানে object, কিন্তু আত্মা হল subject, আমরা আসলে আত্মা, subject। যেমন এই পাখা দেখছি, বোতল দেখছি, গ্লাশ দেখছি, মানুষ দেখছি ঠিক সেই ভাবে নিজের দেহকেও দেখছি। এই জিনিষগুলোকে যেমন বোধ করছি, নিজের শরীরকেও বোধ করছি। কিন্তু কেউ কোন দিন বলছেন না যে তুমি এই শরীর, কেউ কোন দিন বলেনি তুমি দেহেন্দ্রিয়াদি সজ্ঘাত বিশিষ্ট, তুমি অমুকের পুত্র, অথচ সবাই দৃশ্য গুলোকেই সত্য বলে গ্রহণ করছি। আর যে কথা শাস্ত্র ও আচার্য প্রথম দিন থেকে প্রতিনিয়ত বলে যাচ্ছেন তুমি সেই শুদ্ধ আত্মা, তোমার মধ্যে অনন্ত শক্তি, তোমার মধ্যে অনন্ত বীর্য, তোমার মধ্যে অনন্ত জ্ঞান, কিন্তু মানুষ কিছুতেই মানছে না। এটাই মায়া, এটাই আশ্চর্যের। আচার্য দুঃখ করে বলছেন, এটাই দুঃখের কথা যে যেটা সত্য, যে সত্যের কথা সব শাস্ত্র বলছেন কেউ সেটাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে পারছে না। জীবনে অনেক দুঃখ আসে, আমরা কি কখন দুঃখের সময় একবারও ভেবে দেখি আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, আমার ভেতরে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি আমার কি করে দুঃখ হতে পারে! দুঃখের সময় কখন কি ভেবে দেখছি আমি সর্বব্যাপী, যে আমাকে দুঃখ দিচ্ছে সেও আমি! আমাদের দুঃখ কেন? নিজেকে সীমিত করে আছি বলেই দুঃখ অনুভূত হয়।

উপনিষদ কোন তাত্ত্বিক জ্ঞানের কথা বলছেন না। *গূঢ়োহহত্মা ন প্রকাশতে*, আত্মা এমন গভীরে যে তাঁকে জানা যায় না। আত্মা কিসের গভীরে আছেন? অজ্ঞানের গভীরে, অজ্ঞান এমন ভাবে আবৃত করে রেখেছে যে কেউ আমরা আত্মার ব্যাপারে জানতে পারছি না। ফলে যে জিনিষকে কোন দিন কেউ আত্মা বলে না, কেউ কোন দিন বলেনি যে তুমি এই শরীর, তুমি মন, তুমি অমুকের পুত্র, কিন্তু এগুলোকেই সত্য মনে করে সারা জীবন কেঁদেই যাচ্ছি। কিছু না কিছু বাহানা করে কাঁদছি। আর যে কথা অনবরত বলে যাচ্ছে তুমি সেই শুদ্ধ আত্মা, তোমার মধ্যে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি, কিছুতেই মানতে পারছি না। এটাই মায়া, তাই মায়াকে বলছেন *বিচিত্রা*, তার আগে বলছেন *অতিগম্ভীরা, দুরবগাহ্যা*। মায়া এতই গভীর যে তার মধ্যে সবাই হাবুডুবু খাচ্ছে। আচার্য তাঁর ভাষ্যাদিতে বিভিন্ন উপনিষদ আর গীতা, মহাভারত এমনকি পুরাণ থেকেও অনেক শ্লোক উদ্ধৃতি করে দেখাতে চাইছেন সবারই বক্তব্য এক। আচার্য তাই গীতা থেকে শ্লোক তুলে আনছেন *নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ*, আমাকে কেউ জানতে পারে না। উপনিষদে এখানে আত্মার ব্যাপারে বলছেন আর গীতায় ভগবান নিজেকে নিয়ে বলছেন, কেউ আমাকে জানতে পারে না, আসলে আত্মাও যা ঈশ্বরও তাই, দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই, গীতা ও উপনিষদ তাই একই কথা বলছে।

আচার্য বলছেন ভগবান গীতায় বলছেন *মত্বা ধীরো ন শোচতি*, আমাকে জেনে ধীর পুরুষরা আর কোন শোক মোহ করেন না। অন্য দিকে উপনিষদ বলছেন *গূঢ়োহহত্মা ন প্রকাশতে*, আত্মাকে কেউ জানতে পারে না, কিন্তু তার আগে বলছেন *মত্বা ধীরো ন শোচতি*, আত্মাকে জেনে কেউ আর শোক মোহ করে না। আচার্য বলছেন, দুটোই ঠিক বলছেন, যারা অবিবেকী, অজ্ঞানের মধ্যে যারা আছে তাদের কাছে আত্মা চিরদিন অবিজ্ঞেয় থাকে, কোন দিন তারা আত্মাকে জানতে পারে না, জানা সম্ভবও নয়, সেইজন্য আত্মা তাদের কাছে অপ্রকাশিত। যখন বলছেন *ন প্রকাশতে*, আত্মা প্রকাশিত হন না তখন বলতে চাইছেন যারা অবিবেকী, অজ্ঞান তাদের জন্য আত্মা অপ্রকাশিত।

কিন্তু তারপরেই বলছেন *দৃশ্যতে*, আত্মাকে দেখা যায়। কিভাবে দেখা যায়? *দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা*, এখান থেকে এবার বুদ্ধির কথা আসবে। এর আগে বলা হয়েছিল শুদ্ধ মন দরকার, শুদ্ধ মন যা সূক্ষ্ম মনও তাই, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিও তাই। সূক্ষ্ম মন নিয়ে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করেছি। এখন বুদ্ধির কথা বলছেন। *ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা*, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি চাই। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি না হলে আত্মজ্ঞান কোন দিন হবে না। *অগ্র্যয়াকে* আচার্য বলছেন

অগ্রমিবাগ্র্যা, ছুঁচের অগ্রভাগের মত ছুঁচলো বুদ্ধি। তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরির মত যারা সব কিছুকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে কচ কচ করে কেটে দিতে পারে তারাই পারবে। কি পারবে তারা? এই যে অতিগম্ভীরা মায়া, এই দুরবগাহ্যা মায়ার জালকে কচ কচ করে কেটে বেরিয়ে আসতে পারবে। ধার খুব তীক্ষ্ণ না হলে কিছু কিছু জিনিষকে কাটা খুব মুশকিল। খুব পাতলা সুতোকে মাঝখান থেকে লম্বা করে চিরে দিতে বলা হয়েছে। কি করে চিরবে? চিরতে গেল পাতলা সূতোর থেকে আরও সূক্ষ্ম কিছু দরকার। বুদ্ধি যাদের এই রকম তীক্ষ্ণ, তারা তখন নিজের ভেতরের সূক্ষ্ম মায়ার জালকে কুচি কুচি করে কেটে মায়ার বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসে। *সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ*, সূক্ষ্ম জিনিষকে জানার জন্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধির দরকার। আচার্য বলছেন, *দৃশ্যতে তু সংস্কৃতয়া*, আত্মজ্ঞানের সংস্কার থাকতে হবে আর তীক্ষ্ণ অর্থাৎ মন এমন একাগ্র যে আত্মচিন্তন থেকে বিচ্যুত হয়ে মন অন্য কোন বিষয়ের দিকে যাবে না। এর আগে আলোচনা করা হয়েছিল, যে কাজে বা ভোগে বেশি ইন্দ্রিয়ের দরকার সেই কাজ বা ভোগ বেশি স্থূল। একাগ্র হওয়া মানে একটি ইন্দ্রিয় দিয়ে কাজ চলছে, অন্য ইন্দ্রিয়ের কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে গেছে। যে কোন জিনিষে ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার যদি বেড়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে ওটা স্থূল। যারা স্থূল জিনিষের ভোগে পড়ে আছে তাদের আত্মজ্ঞানের পথে আসতে অনেক দেরী আছে। এখানে বলছেন, মন সূক্ষ্ম হয়ে যাচ্ছে মানে মন একাগ্র হয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য ঋষিদের পরেই কবিদের স্থান, কারণ তাঁরাই একমাত্র এমন কাজ করেন যেখানে কোন ইন্দ্রিয় লাগে না, শুধু মনের উপর দিয়ে চলছেন, এখানে মনকে একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ধরেই বলা হচ্ছে। ঠিক তেমনি যাঁরা চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানী, আইনস্টাইনের মত মানুষরাও শুধু মনের উপর চলেন। যাঁরা শুধু মনকে নিয়ে চলেন তাঁরাই শ্রেষ্ঠ পুরুষ। এটাই বলছেন, *দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা*, যাদের বুদ্ধি সূক্ষ্ম, মন একাগ্র হয়ে গেছে তারাই একমাত্র আত্মজ্ঞানের পথে যেতে পারবে।

শুরু হয়েছিল ইন্দ্রিয় থেকে যেখানে বলছেন বস্তু থেকে ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয় থেকে সূক্ষ্ম মন। একটা বস্তুর ভেতর আরেকটা বস্তু, সেই বস্তুর ভেতরে আরেকটা বস্তু, এটাকে ধরার জন্য বুদ্ধিকে প্রচণ্ড একাগ্র হতে হবে। একাগ্র হওয়া মানে ইন্দ্রিয়ের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া। কোন জিনিষকে শুধু স্পর্শ দিয়ে ভেতরে অনুভব করার জন্য অনেকে চোখ বন্ধ করে নেয়। খাবার সময়েও যদি আনন্দ উপভোগ করতে হয়, খাওয়ার রসকে যদি ঠিক ঠিক আস্বাদ করতে হয় তখনও অনেক চোখ বন্ধ করে নেয়। কারণ ইন্দ্রিয়ের কার্যকে বন্ধ করে শুধু স্বাদের উপর মনকে একাগ্র করার জন্য চোখটা বন্ধ করে। একমাত্র যাঁরা সূক্ষ্মদর্শি, যাঁদের মন প্রচণ্ড একাগ্র একমাত্র তাঁরাই আত্মতত্ত্ব গ্রহণ করতে পারেন। যাদের মন ছড়িয়ে আছে, মন অনেকগুলো ইন্দ্রিয়ে জড়িয়ে আছে, এদের দ্বারা হবে না। এর আগে বলা হয়েছিল রমণসুখ এমন একটি ভোগ যেখানে দশটি ইন্দ্রিয়ই জড়িয়ে থাকে, সেইজন্য বলছেন *ব্রহ্মচর্যং চরন্ত* । এই পথে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন না করা হলে অনেক সমস্যা সৃষ্টি হবে, রমণসুখের পরেই খাওয়া-দাওয়ার স্থান। যাঁরা ধর্মপথে এগোতে চাইছেন তাঁদের রমণসুখ আর আহার সুখ এই দুটো সংযম করতে হয়, আর তার সাথে অন্যান্য জিনিষগুলো তো রয়েছেই। ইন্দ্রিয়ের কার্য যতক্ষণ বন্ধ না করা হবে ততক্ষণ মন অন্তর্মুখী হবে না।

দশ, এগারো আর তেরো বা বারো নম্বর মন্ত্র, এই তিনটি বা চারটি মন্ত্র উপনিষদের খুব বিশেষ মন্ত্র। উপনিষদে সাধারণতঃ যোগের ভাব পাওয়া যায় না। প্রথম থেকেই আমাদের একটি সাধারণ ধারণা হয়ে আছে যে উপনিষদ মানেই জ্ঞানযোগ, জ্ঞানযোগ মানে আত্মাই একমাত্র নিত্য বাকি সব অনিত্য বা মায়া। ঠাকুর যেমন বলছেন ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, উপনিষদ যেন এর উপরেই বেশি জোর দিচ্ছে। জ্ঞানীরা সব সময় নিত্য আর অনিত্যের বিচার করেন। বিচার করা মানে, যেটাই অবস্তু তাকে ত্যাগ করে দেওয়া বা ঈশ্বর ছাড়া যা কিছু আছে তার দিকে মন না দেওয়া। জ্ঞানীরা বিচার করেন ঠিকই, কিন্তু এই নিয়ে কারুর কারুর মনে ভুল ধারণা উৎপন্ন হয় যে, শুধু বিচার করতে করতেই জ্ঞানীদের উপলব্ধি হয়ে যায়। আত্মাই সব কিছু বাকি সব মায়া, বা বিচার করে যাচ্ছে ঈশ্বরই সার বাকি সব অসার এই ভাব নিয়ে শুধু যারা বিচার করে যাচ্ছে তাদের উপলব্ধি দূরের কথা, আসলে কিছুই হয় না, সাধনার মাঝ পথেই তাদের পতন হয়ে যাবে। যারা ঠাকুরের ভক্ত, দীক্ষা নিয়েছে, তারা সবাই জানে ঠাকুর ভগবান, এতেই কি সব হয়ে যাবে! কিছুই হবে না, যেমন অপদার্থ ছিল তেমনই অপদার্থ থেকে যায়, কোথাও এতটুকু পরিবর্তন হয় না। ভেতরের সমস্ত কামনা-বাসনা, সব রকম দুর্বলতাকে পুড়িয়ে ছাই না করা পর্যন্ত কোন পরিবর্তন আসবে না। এগুলোকে পোড়াবে কঠোর পরিশ্রম, আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় জীবন কঠোর পরিশ্রম ছাড়া হয় না।

স্বামীজী যে কর্মযোগের বিধান দিয়েছেন বা ঋষিরা যে ধ্যানযোগ দিয়ে গেছেন, সেখানে এর উপরই জোর দেওয়া হয়েছে – যতক্ষণ অপরের জন্য কর্ম করা না হবে, সেবার ভাব নিয়ে কিছু করা না হবে বা ভেতরের দিকে মনকে গুটিয়ে এনে গভীর ধ্যান না করা হবে ততক্ষণ কোন কিছুই কোন কাজে লাগবে না। ঠাকুর খুব সহজ করে বলছেন, টিয়া পাখি এমনি সময় রাম রাম বলে আর বেড়ালে ধরলে ট্যাঁ ট্যাঁ করে। যতই আমরা জ্ঞানমার্গে বিচার করে যাই না কেন, যতই ভক্তির অনুশীলন করি না কেন, যতই প্রার্থনা করা হোক না কেন, বেড়ালে ধরলে মুখ দিয়ে ট্যাঁ ট্যাঁই বেরোবে। ভারতের হেন জায়গা নেই যেখানে মন্দির নেই, সব জায়গায় মন্দির আর মন্দির, সব মন্দিরেই সব সময় ভক্ত উপচে পড়ছে। যে মন্দির যত দুর্গমে সেই মন্দিরে তত ভীড়, শনি মঙ্গলবার তো ভীড় সামলানো যায় না। তাতে কি ভারতের সবাই ধার্মিক হয়ে গেছে, কিছুই তো হচ্ছে না। সেই ভোগের উন্মাদনা, সেই দুর্নীতি, সেই স্বার্থপরতা, সেই উচ্ছৃঙ্খলতা, কোথাও কোন পরিবর্তন নেই। তার একটাই কারণ, আমাদের ভেতরের আবর্জনার জঞ্জাল গুলোকে পোড়ান হয়নি। যতক্ষণ না কঠোর পরিশ্রম করছে ততক্ষণ এগুলো পুড়বে না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বেলুড় মঠে কেউ যখন এসে ঠাকুর প্রণাম করছে, সেখানে তাও তার একটা পরিশ্রম হচ্ছে, আর বাড়িতে খাটে শুয়ে বসে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দিনে একবার দুবার ঠাকুরকে একটা সেলাম ঠুকে প্রণাম করছে, এতে কিছুই হয় না। যারা ফুল তুলছে, চন্দন ঘষছে তাও অল্প একটু পরিশ্রম হচ্ছে। কিন্তু আবর্জনা ঠিক ঠিক পোড়াবার জন্য হল সেবা, সেবা না করলে হবে না। আর তা নাহলে গভীর যোগ সাধন। এই দুটোর মধ্যে একটা না হলে আবর্জন পুড়বে না।

বৈধী ভক্তির এটাই সব থেকে বড় সমস্যা। বৈধী ভক্তিতে যা কিছুই করা হয়, করতে করতে একটা নেশার মত হয়ে যায়। মদ গাঁজা খেলে মন যেমন একটা ঘোরে চলে যায়, কার্ল মার্ক্স বলছেন ধর্ম হল সমাজের আফিং, ঐ আফিং এর মধ্যে ঘুর ঘুর করতে থাকে। বৈধী ধর্মের এই ঘোর ভাব বেশি দূর নিয়ে যাবে না। সংসারে দুঃখ কষ্টের ঝড় উঠলে শ্রদ্ধা ভক্তি সব উড়ে যায়। সত্যিকারের শ্রদ্ধা ভক্তি কখন ছিলই না। উত্তরাখণ্ডে অনেক মজার মজার কাহিনী আছে। একবার এক সাধুবাবার অপারেশন করার ছিল। সাধুবাবা অপারেশন করতে দেবেন না, তিনি বলে যাচ্ছেন, আমার কোন দুঃখ-কষ্ট নেই, আমি সেই আত্মা, আত্মা অজর অমর, সাথে সাথে গীতার শ্লোক বলতে শুরু করেছেন। ডাক্তার কিছু না বলে তার অপারেশনের জায়গায় ছুড়ি চালিয়ে দিয়েছে। সাধুবাবা তো যন্ত্রণায় প্রচণ্ড চিৎকার করতে শুরু করেছেন, ডাক্তারকে গালাগাল দিচ্ছেন আর বলছেন, এ সারে বাত্ তো গীতামে হ্যায়। অন্য দিকে স্বামী তুরিয়ানন্দজী মহারাজের যখন অপারেশন হত তখন উনি মন তুলে নিতেন আর পিঠে কার্বঙ্কলে ডাক্তার ছুড়ি চালিয়ে অপারেশন করে ড্রেস করে দিতেন, উনি নির্বিকার। এগুলো যে অবাস্তব তা নয়, পুরোপুরি বাস্তবিক। সারা জীবন আমি সেই শুদ্ধাত্মা, চিদানন্দ শিবোহহম্ বুলি আউড়ে যাচ্ছে কিন্তু যেমনি জীবনে বাস্তবিক কোন আঘাত আসছে তখন সেখান থেকে ছিটকে যাচ্ছে। বাস্তব জীবনে সাধনা না থাকলে, হাড় ভাঙা খাটনি না থাকলে এই বিচার কোন কাজেই লাগবে না। ছান্দোগ্য উপনিষদেই খুব সুন্দর সুন্দর কাহিনী আছে, মহাভারতেও কিছু কাহিনী আছে। গুরুর কাছে শিক্ষার জন্য শিষ্য এসেছে, গুরু তাকে কটি গরু দিয়ে বলে দিলেন, এই কটি গরু নিয়ে জঙ্গলে চড়াতে থাক, তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। শিষ্য বছরের পর বছর গরু চড়াচ্ছে, কোন দিন খাওয়া জুটছে কোন দিন জুটছে না। এই করতে করতেই শিষ্যের চিত্তশুদ্ধি হয়ে যেত। মানুষ যখন সেবাকার্য করতে থাকে, অনেক দিন ধরে করে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে তার মনের আবর্জনাগুলো পুড়ে যায়। অর্জুন একবার কোন কারণে যুধিষ্ঠিরের উপর খুব রেগে গেছেন। অর্জুনের রাগ দেখে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, অর্জুন! তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি কোন দিন গুরুজনের সেবা করনি। শ্রীকৃষ্ণ সেখানে বৃদ্ধজন শব্দটা ব্যবহার করছেন। যার মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আছে বুঝতে হবে সে জীবনে কারুর সেবা করেনি। যে সেবা করবে তার মধ্যে এই রিপুগুলো থাকবে না। নারীদের তাই এই ধরণের রিপুগুলো অনেক কম থাকে। সন্তানকে সেবা করতে করতে মায়েদের অনেক রিপুর প্রকোপ কমে যায়, একেবারে যে চলে যায় তা নয়, কিছু থাকে। কিন্তু যাদের মধ্যে মাতৃত্বের ভাব খুব প্রবল তাদের মধ্যে এগুলো দেখা যাবে না।

সবার পক্ষে সেবা করা সম্ভব হয় না, অনেকে সেবা করার সুযোগও পায় না। সব কিছু ছেড়ে যে আলাদা থাকছে তার পক্ষেও অপরের সেবা করা সম্ভব নয়। কর্ম হল বহিরঙ্গ সাধন আর ধ্যান হল তার অন্তরঙ্গ

সাধন। মনের আবর্জনা পোড়াবার দুটো বিধি, একটা কর্ম আর দ্বিতীয় অন্তরঙ্গ সাধনা। উপনিষদে ধ্যানের কথা খুব কম বলা হয়েছে। কারণ ধ্যান গুরু শেখাতেন বলে বর্ণনা কম পাওয়া যায়, কিন্তু কঠোপনিষদ খুবই ব্যাতিক্রমী, কঠোপনিষদে প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় বল্লীর এই চারটি মন্ত্রে ধ্যানের কথা বলা হয়েছে।

ইন্দ্রিয়ভ্য পরা হ্যর্থ এই একটি মন্ত্রকে কেন্দ্র করে আলোচনা চলছে, এর উপসংহার করছেন তের নম্বর মন্ত্রে। কিন্তু উপসংহার যেভাবে করছেন, তাতে যেন যোগ সাধনার একটা নিষ্কর্ষ বার করে আনছেন। *সূক্ষ্ময়া* আর *সূক্ষ্মদর্শিভিঃ*, যাঁরা অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শি একমাত্র তাঁরাই আত্মার ব্যাপারে জানতে পারেন ও ধরতে পারেন। কবিতার রস সবাই ভোগ করতে পারে না, যারা কাব্যরসিক তারাই কবিতার রস আস্বাদন করতে পারে। কাব্যরস আস্বাদনের জন্য সূক্ষ্ম মন দরকার। শিল্পকলা বোঝার জন্যও সূক্ষ্ম বুদ্ধি দরকার, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মাধুর্যকে ভোগ করার জন্যও সূক্ষ্ম বুদ্ধি দরকার। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের হলেও খুব উচ্চমানের, সেতার বা সরোদের বাজনা শোনার পর সেই সুর মনের মধ্যে অনুরণিত হয়ে চলেছে, মন ঐ বাজনার মধ্যে হারিয়ে গেছে, কেউ ডাকলে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে, এটাই একটা স্থূল জিনিষের সূক্ষ্ম রূপ, যেখানে মন অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়ে গেছে। আধ্যাত্মিক সাধনার প্রাথমিক স্তরে সে এই জিনিষটাকেই পুরো উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে, সূক্ষ্মতম জিনিষের স্থূল রূপকে সে এখন মনন করছে। ঈশ্বর বা আত্মা হলেন সূক্ষ্মতম, তাঁর স্থূল রূপ হল ঈশ্বরের বিগ্রহ অথবা ছবি বা প্রতিমা। কিন্তু ঈশ্বরের স্থূলতম রূপ সঙ্গীতের সূক্ষ্মতমের থেকেও সূক্ষ্ম। গানের স্থূলতম রূপ হল লারেলাপ্পা হিন্দী গান বা পপ সঙ্গীত, যে গান শুনলে কান ঝালাপাল করতে থাকে, সেই সঙ্গীতের সূক্ষ্মতম রূপ হল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, বিভিন্ন রাগরাগীনির খেলা, যিনি বাজাচ্ছেন বা গাইছেন তাঁরও চোখ বন্ধ হয়ে গেছে আর যিনি শুনছেন তিনিও চোখ বন্ধ করে শুনে যাচ্ছেন, শুধু শ্রবণেন্দ্রিয় কাজ করছে। এরও সূক্ষ্ম অবস্থা হল, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেষ হয়ে গেছে, এবার চুপচাপ বসে আছে, মনে সেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুরের রেশ চলছে, ওর সাথে সে এক হয়ে গেছে। এর থেকে গানের আর সূক্ষ্মতম অবস্থা হবে না। এখানে স্থূল থেকে সূক্ষ্মে নিয়ে যাওয়া হল, ঠিক তেমনি উল্টোদিক থেকে সূক্ষ্মতম থেকে স্থূল রূপে আসছে ঈশ্বরের রূপ।

ঈশ্বরের বাস্তবিক রূপের উপর একটা জামা পড়িয়ে দেওয়া হল, সেই জামার উপর আরেকটা জামা, সেই জামার উপর আরেকটা জামা এই করে করে ঈশ্বরের যে বিগ্রহ হল সেই বিগ্রহকে নিয়ে ভক্ত চিন্তন করছে। ঈশ্বরের বিগ্রহকে নিয়ে চিন্তন করা, ঈশ্বরের গুণ নিয়ে চিন্তন করা, ঈশ্বরের লীলার চিন্তন করা এগুলোও ঈশ্বরের স্থূল চিন্তন, কিন্তু সঙ্গীতের যে সূক্ষ্মতম রূপ তার থেকেও ঈশ্বরের স্থূল চিন্তন অনেক সূক্ষ্ম। সে যেন পাহাড়ের এক চূড়া থেকে আরেক চূড়ায় লাফিয়ে চলে গেল। পাহাড়ের এক চটি থেকে আরেক চটিতে লাফিয়ে যাওয়া কত কঠিন! সেইজন্য যারা ঈশ্বর চিন্তন করে তাদের বেশির ভাগই গানের যে জায়গা সূক্ষ্মতম অবস্থা, ঐ অবস্থায় গিয়েই শেষ হয়ে যায়। প্রথমে মনের মধ্যে ঈশ্বরের বিগ্রহ বা ছবিকে বসিয়েছে, এবার সেখান থেকে আস্তে আস্তে যখন সে এগোতে শুরু করে তখন তার আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু হয়। যোগীর মন এত সূক্ষ্ম হয়ে যায় যে কোন স্থূল জিনিষকে সে আর সহ্য করতে পারে না, খাওয়া-পড়ার দিকেও তার মন আর যায় না। চিন্তন কার্যে কোন ইন্দ্রিয়ই জড়িত থাকে না, শুধু মনকে নিয়ে চলে। বেদান্ত মতে মনও একটি ইন্দ্রিয়, মনকে ইন্দ্রিয় রূপে নেওয়া হলে মন তো সব সময়ই কাজ করে যাবে, মনের কাজ কখনই বন্ধ হবে না, কিন্তু ঈশ্বর চিন্তনের ক্ষেত্রে এটাকে ধর্তব্যের মধ্যে রাখা হয় না। ঈশ্বর চিন্তন শুরু হওয়ার পর মন সূক্ষ্ম হতে থাকে, সূক্ষ্ম হতে হতে শেষে এমন জায়গায় নিয়ে যায় যেখানে মন খসে পড়ে যায়, তখন মনের পারে চলে গিয়ে শুদ্ধ আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই জিনিষটা কিভাবে হবে তারই বিবরণ পরের মন্ত্রে দিচ্ছেন –

যচ্ছেদ্ বাঙ্ মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি।।১/৩/১৩।।

(বিবেকী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়বর্গকে মনে নিরুদ্ধ করবেন, সংকল্পবিকল্পাত্মক মনকে প্রকাশস্বরূপ নিশ্চায়াত্মিকা ব্যষ্টি বুদ্ধিতে বিলুপ্ত করবেন, ব্যষ্টি বুদ্ধিকে সমষ্টিবুদ্ধিরূপ হিরণ্যগর্ভে নিবিষ্ট করবেন, সেই সমষ্টিবুদ্ধিকে সর্বক্রিয়া-রহিত মুখ্য আত্মাতে লয় করবেন।)

এটাই যোগের প্রক্রিয়া, যোগ সাধনা, ধ্যানের প্রক্রিয়া কিভাবে হয় তার কথাই মন্ত্রে বলছেন। একটি মন্ত্রেই সাধনার শেষ কথা বলে দেওয়া হয়েছে। এখানে মনে রাখতে হবে, উপনিষদ যোগবিধির বর্ণনা করে না, এখানে তাই বৈজ্ঞানিক ভাবে কোন কিছুকে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে না বা যোগের একটার পর একটা ধাপ কিভাবে

যেতে হবে তার কথাও বলা হচ্ছে না, এগুলোকে জানার জন্য আমাদের রাজযোগ বা যোগদর্শন পড়তে হবে। এখানে শুধু একটা মূল কথাতে জিনিষটা কি পদ্ধতিতে হয় বলে দিচ্ছেন।

যচ্ছেদ শব্দের অর্থ একটা জিনিষকে আরেকটা জিনিষে লয় বা উপসংহার করা। নিজামের সময় হায়দ্রাবাদে এক ধরণের খেলনা বাক্স পাওয়া যেত, খেলনার নামই ছিল হায়দ্রাবাদী বাক্স, পরে ওখান থেকে কপি করে এখন অনেক জায়গাতেই পাওয়া যায়। একটা বাক্স, সেই বাক্সের মধ্যে আরেকটা বাক্স, ঐ বাক্সের মধ্যে আরেকটা বাক্স, মনে হচ্ছে এরপর আর বাক্স নেই কিন্তু তারপরেই আরেকটা বাক্স বেরিয়ে আসে। আত্মাও এই হায়দ্রাবাদী খেলনার মত, আত্মার উপর আবরণ চাপা হয়েছে, সেই আবরণের উপরে আরেকটা আবরণ, তার উপর আরেকটা আবরণ। ঠাকুর খুব সহজ করে বলে দিলেন পেঁয়াজের খোসা, পেঁয়াজের খোসা যতই ছাড়ান হোক তারপর আরেকটা খোসা, শেষ খোসাটাও ছাড়ান হয়ে গেলে দেখছে কিছুই নেই। আত্মাও ঠিক এই রকম। আত্মার উপর উপাধি চেপে গেছে, একটা উপাধির পর আরেকটা উপাধি, সেই উপাধির উপরে আরেকটা উপাধি চেপে আছে। এবার একটা একটা করে উপাধি সরিয়ে সরিয়ে শেষ জায়গায় গিয়ে দেখা যাবে সেখানে কিছুই নেই। কিছু নেই মানে যে শূন্য আছে তা নয়। শূন্য হয়ে গেলে এটাই বৌদ্ধ দর্শন হয়ে যাবে, আসলে যা থাকে তাকে মুখে বলা যায় না, সেইজন্য বলছেন সচ্চিদানন্দ। মুখ দিয়ে বলা যায় না মানে, তিনিই জ্ঞাতা, তিনি জ্ঞেয় নন বলে মুখ দিয়ে বলা যাবে না। *যচ্ছেদ্* মানে ঢোকা, হায়দ্রাবাদী খেলনার বাক্স থেকে সব বাক্সকে বার করে দেওয়া হয়েছে, ভগবান থেকেও সব কিছু বেরিয়ে এই জগৎ দাঁড়িয়ে গেছে, এই জগৎ ভগবানের বিভূতি, তাঁর ঐশ্বর্য, তাঁর মহিমাই এই জগৎ, *এতাবানস্য মহিমা*। জগৎ ছড়িয়ে আছে, এই পুরো জগতকে এবার পেছনের দিকে যেতে হবে। কিভাবে যেতে হবে?

বাক্, মানে কথাকে মনের মধ্যে লয় করতে হবে। আচার্য বলছেন বাক্ শব্দ দিয়ে চোখ, কান, নাক দশটি ইন্দ্রিয়কেই বোঝাচ্ছে, খুব সংক্ষেপে শুধু বাক্ বলছেন। ইন্দ্রিয়গুলিকে ঢুকিয়ে দাও। কোথায় ঢোকাবে? মনে, যে কটি ইন্দ্রিয় আছে সব কটিকে মনের মধ্যে ঢুকিয়ে তালা মেরে দাও। এরপরে আরেকটি প্রসঙ্গ আসবে সেখানেও আবার আলোচনা করা হবে। দশ নম্বর মন্ত্রে *ইন্দ্রিয়েভ্য পরা হ্যর্থ* দিয়ে শুরু হয়েছিল। বিষয়বস্তু যা কিছু আছে তার থেকে ইন্দ্রিয়গুলি সূক্ষ্ম, কারণ ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়গুলিকে ধরছে। সেইজন্য স্বাভাবিক ভাবে প্রথম ধাপ হল, বিষয়বস্তু অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের জন্য যে জিনিষগুলো রয়েছে, অর্থাৎ এই সংসার, প্রথমেই সংসারকে ছাড়তে বলছেন। ইন্দ্রিয়ের বিষয় এতই নিকৃষ্ট যে এগুলোর উল্লেখ পর্যন্তও করছেন না। ঠাকুরকে সংসারীরা এসে প্রশ্ন করছেন, মহাশয়! সংসার ত্যাগ না করলে কি হবে না? ঠাকুর কি আর বলবেন, বলছেন তোমরা এও কর ওও কর। কিন্তু ত্যাগ ছাড়া কিছুই হয় না। যে মানুষ স্ত্রী-পুত্রাদিকে জড়িয়ে সংসারে আছে, কি করে সে সব কিছু ছেড়ে দেবে! এই নিয়েই সে তার জীবন চালাচ্ছে। শুরুতেই যদি তাকে বলা হয় সব কিছু ছেড়ে বেরিয়ে চলে এস, প্রথম দিনেই সে ছিটকে যাবে। একজন এসে যিশুকে বলছে, আমি আপনার শিষ্য হতে চাই। যিশু জানেন লোকটি ধনী। যিশু বললেন, তোমার সব সম্পত্তি বিক্রী করে গরীবদের মধ্যে সব অর্থ বিলিয়ে দিয়ে আমার কাছে চলে এস। কবীরের খুব নামকরা দোঁহা আছে, হাতে আগুন নিয়ে একজন দাঁড়িয়ে আছে, আর বলছে যে নিজের বাড়িতে আগুন লাগাবে সে আমার সাথে চলে এস। কে নিজের বাড়িতে আগুন লাগাতে যাবে, অর্থাৎ সংসার ত্যাগ করবে! যিশু যাকে বললেন সব বিক্রী করে গরীবদের মধ্যে দান করে আমার সাথে চল, শোনার পর লোকটি যিশুর কাছে আর ফিরে আসেনি। যিশু বলছেন, উট ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে চলে যেতে পারে, কিন্তু ধনীলোক কোন দিন স্বর্গের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। স্বর্গের দরজা মানে আত্মজ্ঞানের দিকে যেতে পারবে না। কি করে পারবে! স্ত্রী-পুত্র, ধন সম্পদের মধ্যে সে ডুবে আছে। আমাদের সবারই সংসারে কত রকমের ঝামেলা, কত কষ্ট, কত দুশ্চিন্তা, কিন্তু তার মধ্যেও আমরা এখানে প্রখর গ্রীষ্মের দুপুরে প্রচণ্ড গরমে শাস্ত্র কথা শুনতে আসছি, কিছুক্ষণের জন্য মাথা থেকে সংসারের সব ঝামেলা নেমে যাচ্ছে ঠিকই, কত হাল্কা অনুভব করছি, কিন্তু সাতটায় বাড়িতে ঢুকছি আবার পুনর্জন্মের মত আমাদের একটা নতুন শরীর এসে যাচ্ছে। এই যে এতক্ষণ শরীর থেকে সরে এসে জীবাত্মা হাল্কা ছিল সেটা চলে গেল। আমরা চাই আর নাইই চাই এই বোঝা নিয়েই আমাদের চলতে হবে, চাই বা না চাই আবার সংসার আমাদের মধ্যে ঢুকে যাবে, কিছু করার নেই। বড়লোক বা সংসারীকে কিছুক্ষণের জন্য সংসার ছেড়ে বেরিয়ে চলে আসতে বললে সে চলে আসবে। কিন্তু চিরদিনের মত ছেড়ে আসতে বললে সে মরে যাবে। গভীর জলের মাছকে পুকুরের জলে রাখলে ওর

শরীরটাই ফেটে যাবে। মাছ জলেই থাকবে কিন্তু সেও মাঝে মাঝে উপরে চলে এসে আবার নীচে ডুব মারে, জলের চাপ ছাড়া সে থাকতে পারবে না।

কিন্তু তুমি নিজে ঠিক কর তুমি কি পেতে চাও। আমি গূঢ়ো আত্মাকে জানতে চাই, আমি আত্মজ্ঞান পেতে চাই। কিন্তু আত্মজ্ঞানের কাছে সংসার এতই নিকৃষ্ট যে এর উল্লেখ পর্যন্ত করছেন না। আগে শুধু একটি কথা বলে দিয়েছেন *ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা*, বিষয়বস্তু থেকে ইন্দ্রিয় অনেক সূক্ষ্ম। আর এখানে শুরু করছেন সেই ইন্দ্রিয়কে দিয়ে, এই যে দশটি ইন্দ্রিয় আছে *যচ্ছেদ্ বাঙ্ মনসী*, এগুলোকে মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। ইন্দ্রিয়কে মনের মধ্যে কিভাবে লয় করা হবে? টিউব লাইট জ্বলছে, পাখা ঘুরছে, এগুলো আমরা কিভাবে জানছি? বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বলা হয়, বস্তুর আলো ফোটন রূপে এসে চোখে আঘাত করছে, সেখান থেকে স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কে যাচ্ছে, মস্তিষ্কে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ার পর মস্তিষ্ক জানছে বা আমরা জানতে পারছি। বেদান্ত এই দৃষ্টিভঙ্গীকে মানবে না, পরে যমরাজ বলবেন, যদি এটা সত্যিই সম্ভব হত তাহলে বস্তু বস্তুকে জানতে পারত। যদি আলো দিয়ে জানা যেত তাহলে টিউব লাইট পাখাকে জানতে পারত, পাখার বাতাস টিউব লাইটকেও জানতে পারত। কিন্তু আমরা সংসারকে যেভাবে জানি বা বুঝি তাতে জড় পদার্থ জড় পদার্থকে কখনই জানতে পারে না। তাহলে জানার মধ্যে এমন কিছু একটা জিনিষ জড়িয়ে আছে, যে জিনিষটা জড় পদার্থে অনুপস্থিত। ঐ জিনিষটা কি? খুব সহজ যুক্তি এতে আহামরি কিছু নেই, কিন্তু সমস্যা হল লোকেরা জানতে চায় না, বুঝতে চায় না, জানার চেষ্টা করলেও বুঝতে পারে না বলে পুরো জিনিষটাকে আজগুবি বলে মনে করে। জড় পদার্থের ব্যাপারে আমাদের যে অতি সাধারণ বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি দিয়ে আমরা কি মনে করছি ঢাকনা জানে সে গ্লাশের উপর আছে, গ্লাশ কি জানে তার উপর ঢাকনা আছে? যদি এভাবে জড় পদার্থ জড় পদার্থকে জানতে পারত তাহলে কি সমস্যা হত? হাড়িতে চাল দিয়ে আগুনে সিদ্ধ করতে দিলে সব চাল হাড়ি থেকে লাফিয়ে পালিয়ে যেত। একটা পোকাকে জলে সেদ্ধ করতে দিলে পোকা নিজে থেকেই পালিয়ে যাবে। তেমনি চাল যদি জানতে পারত আমার গায়ে আগুনের তাপ লাগছে তিড়িং বিড়িং করে সব চাল হাড়ি থেকে লাফিয়ে পালিয়ে যেত। হাড়িতে চাল সেদ্ধ করা আর জীবন্ত মাছকে গরম কড়াইয়ে ছেড়ে দেওয়া এই দুটোর মধ্যে কি কোন তফাৎ আছে? আমরা জানি তফাৎ আছে। এই জায়গাতেই বেদান্ত বিজ্ঞানকে আক্রমণ করছে। লেজার বিজ্ঞানীকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আমি আপনাকে কিভাবে দেখছি? বিজ্ঞানী বলবেন, আলো আপনার শরীরের উপর পড়ছে, সেই আলো প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখে আসছে, চোখ থেকে স্নায়ু কেন্দ্রে যাচ্ছে। এটাই যদি জানার পদ্ধতি হত তাহলে গ্লাশ জানতে পারবে ঢাকনাকে, ঢাকনাও গ্লাশকে জানতে পারবে। যদি এটাই জানার পদ্ধতি হয় তাহলে চাল হাড়ি থেকে পালিয়ে যাবে। কিন্তু চাল পালাচ্ছে না কেন, নিশ্চয়ই বিজ্ঞানের জানার পদ্ধতিতে কোথাও কিছু গোলমাল আছে। কেউ বলবেন নির্জীব পদার্থ আর সজীব পদার্থের মধ্যে চেতনার তারতম্য আছে। তাহলে চেতনা জিনিষটা কি? পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা তখন বলবে মনই চেতন। এই নিয়ে বিরাট যুক্তিতর্কের আলোচনা চলতে থাকবে। কিন্তু সেখানেও যুক্তি একই জিনিষকে নিয়ে বলবে আর শেষে মনও দাঁড়াতে পারবে না। সেইজন্য শেষ পর্যন্ত দেখা যায় আত্মাই একমাত্র চৈতন্যবান। হাড়ির নীচে আগুন জ্বলছে, আগুনে হাড়ির জল গরম হয়ে যাচ্ছে, সেই গরম জলে চাল সেদ্ধ হয়ে যায়, ঠিক তেমনি আত্মার জন্য মনও পুরো চৈতন্যময় হয়ে যায়, চৈতন্যময় হয়ে যায় মানে মন চেতনা পেয়ে যায়। মন চৈতন্য হয়ে গিয়ে ইন্দ্রিয়গুলিকে তারই চেতনার আলোতে আলোকিত করে দেয়। টিউব লাইটের আলো চোখে প্রতিফলিত হয়ে মস্তিষ্কে আসছে বেদান্ত কখনই অস্বীকার করছে না। কিন্তু আত্মচৈতন্য মন দিয়ে ইন্দ্রিয়ের মারফতেই কাজ করে। আমরা হাতকে এগিয়ে দিয়ে কাজ করছি ঠিক তেমনি ইন্দ্রিয়গুলো এগিয়ে এগিয়ে কাজ করে। হাত হল ধরার ইন্দ্রিয়, চলার অর্থে নয়। কিন্তু চোখ চলে, কান আরেকটু কম চলে, নাক আরও কম চলে, জিহ্বা তার থেকেও কম চলে আর ত্বক একেবারেই চলে না। বেদান্ত পুরো জিনিষটাকে যুক্তি সঙ্গত ভাবে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন।

মূল বক্তব্য হল চাঞ্চল্য ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই আছে, বস্তুর মধ্যে চাঞ্চল্য থাকে না। ঘুমন্ত অবস্থায় বা তার থেকে বেশি, মন যখন কোন কিছুতে যুক্ত থাকছে না তখনও ইন্দ্রিয় কাজ করছে কিন্তু মন যুক্ত না থাকার জন্য কিছুই জানতে পারছে না। বস্তুর মধ্যেই যদি চাঞ্চল্য থাকত তাহলে সব অবস্থাতেই সব কিছু জানা যেত। এগুলো হল ধর্ম আর বিজ্ঞানের পুরনো ঝগড়া, এই বিবাদের মধ্যে আমরা যাচ্ছি না। ভয়েস রেকর্ড দিয়ে যখন ভাষণ রেকর্ড করা হয় তখন সে সব কিছুকেই রেকর্ড করে যাচ্ছে, রেকর্ডার বলছে না যে অন্যমনস্কতার জন্য

ভাষণের এই জায়গাটা আমি রেকর্ড করতে পারিনি। তাহলে আমার কান সব কথা কেন নিচ্ছে না? পুরো পদ্ধতিটা যদি মেকানিক্যাল হয় তাহলে ভয়েস রেকর্ডার যেভাবে রেকর্ড করছে ইন্দ্রিয়গুলোও সেভাবেই সব রেকর্ড করে যাওয়ার কথা। কিন্তু আমি বলছি, আমার মন অন্য দিকে ছিল, লেকচারের এই কথাগুলো তখন শুনতে পাইনি। তার মানে, একটা জিনিষকে জানার পেছনে আমার যুক্ত থাকাটা বড় ভূমিকা নিচ্ছে। এই যুক্ত থাকাকেই বলছেন ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য, এটাকেই বলে ইন্দ্রিয় দিয়ে কাজ করা। কারণ বেদান্তের বক্তব্য বস্তু দিয়েই যদি আমার কোন জিনিষের বোধ হত তাহলে আমি যখন ঘুমিয়ে থাকি তখনও আমি জিনিষটাকে জানব, যখন আমি অমনযোগী তখনও আমি জিনিষটাকে জানতে পারব, কিন্তু আমি কিছুই জানতে পারছি না। মন যখন অমনযোগী থাকছে তখন আমি জানতে পারছি না। তার মানে আমার এই জগতটা subjective জগৎ, objective জগৎ নয়। Objective জগৎ হলে সব সময়ই সব কিছু জানতে পারতাম। রেকর্ডার মেশিনের কাছে জগতটা objective, আমি যা বলব মেশিন সবটাই রেকর্ড করবে, ওর কাছে কোন বাছবিচার নেই। কিন্তু আমাদের অনেক বাছবিচার আছে। একঘেঁয়েমির লেকচার হলে আমি শুনব না, আরও যদি একঘেঁয়েমি লাগে কিছুক্ষণ পর তন্দ্রা এসে যাবে। এই যুক্ত হওয়াকে বলছেন ইন্দ্রিয় দিয়ে কাজ করা, ইন্দ্রিয় দিয়ে জগতকে ধরা। জাগ্রত অবস্থায় আমরা সবাই সজাগ, ইন্দ্রিয়গুলোও তখন সজাগ। বাচ্চাকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে নিয়ে গেলে একটু শুনতে না শুনতেই ঘুমিয়ে পড়বে, কিন্তু তার মনের মত গান হলে নাচতে শুরু করে দেবে, যে নাচবে না তাকেও নাচাতে থাকবে। বলছেন, ইন্দ্রিয়গুলিকে আটকাও। কিসের থেকে আটকাবে? বিষয়বস্তু থেকে আটকাবে। জগৎ এই রকমই থাকবে, জগতে সৌন্দর্য থাকবে, মাধুর্য্য থাকবে, রস থাকবে, সবই থাকবে কিন্তু তোমার ইন্দ্রিয়গুলিকে ওর মধ্যে যেতে দিও না। কারণ জগতের কোন বস্তুই তোমাকে বিরক্ত করছে না, তোমার ইন্দ্রিয়ই তোমাকে বিরক্ত করে যাচ্ছে। আমরা অনেক সময়ই বলে থাকি, তোমার জন্য আমার জীবনটা শেষ হয়ে গেল। কারুর জন্যই কারুর জীবন নষ্ট হয় না, তোমার জীবন সব সময় তোমার জন্যই নষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়কে যে নিগ্রহ করে নিয়েছে কারুর সাধ্য নেই যে তাকে কষ্ট দেবে। এখানে বাগেন্দ্রিয়কে বলছেন, কিন্তু আচার্য বলছেন এই বাগেন্দ্রিয় সমস্ত ইন্দ্রিয়ের *উপলক্ষণার্থক*। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় আর আরও উচ্চ অবস্থায় মনও এসে যাবে, বলছেন সব ইন্দ্রিয়কে ভেতরে টেনে নাও।

যোগশাস্ত্র পুরোটাই মনকে নিয়ে চলে, যোগশাস্ত্রও ইন্দ্রিয়কে শুধু একটা শব্দ দিয়ে পার করে দিচ্ছেন। যেমন যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারের কথা বলার পর, প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা করে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন। যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়ামকে ব্যাখ্যা করে দেওয়ার পর বলছেন এগুলোকে অনুশীলন করতে হয়। তার সাথে আরও বলছেন, তুমি যদি যোগ সাধনা নাও করতে চাও, আধ্যাত্মিক জীবনে যদি না যাও তাহলেও সাধারণ জীবনে এগুলোকে অনুশীলন করতে হয়, সত্য ,অহিংসা, ব্রহ্মচর্য সবাইকেই পালন করতে হয়। তার সাথে স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান এগুলোও করতে হয়। সাধারণ জীবনে এগুলো অবশ্যই করবে আর নিয়মিত আসনে বসবে যাতে শরীরটা ধীর স্থির হয়, শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রাণায়াম অবশ্যই করবে। এরপর থেকে গেল একটি মাত্র শব্দ – প্রত্যাহার। প্রত্যাহার মানে, ইন্দ্রিয়সমূহকে টেনে নেওয়া। যাকে এখানে বলছেন *যচ্ছেদ্ বাঙ্ মনসি*, এটাকেই যোগশাস্ত্রে বলছেন প্রত্যাহার। প্রত্যাহার যদি না থাকে আধ্যাত্মিক জীবন শুরুই হবে না। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম এই চারটে যোগের কোন ব্যাপারই নয়, যোগ দেখিয়ে দিচ্ছে সমাজে একজন ভালো মানুষ হয়ে থাকতে গেলে এগুলোর দরকার, শরীর ঠিক রাখার জন্য এগুলো দরকার, মন শান্ত রাখার জন্য দরকার। কিন্তু যোগ সাধনা ঠিক ঠিক শুরু হয় প্রত্যাহার থেকে।

উপনিষদও তাই বলছেন, প্রত্যাহার। কিভাবে? *যচ্ছেদ্ বাঙ্ মনসি*। সংসার থেকে ইন্দ্রিয়কে গুটিয়ে নিয়ে এস। গুটিয়ে নিয়ে আসার পর এবার তোমার সাধন জীবন শুরু হল। তার আগে পর্যন্ত মুখে যতই তুমি বলতে থাক আত্মাই নিত্য বাকি সব অনিত্য, ঈশ্বরই সত্য বাকি সব অসৎ, ঠাকুরের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে, সব মুখের কথা হয়েই থেকে যাবে। এতদিন তোমার নিজের যত দুর্বলতা, মনের আবর্জনা, বদমাইশি সব ঈশ্বরের উপর চাপিয়ে দিয়ে এসেছ, এসব যা করার করেছ ঠিক আছে। কিন্তু এবার কাজে নাম, কাজে যদি না নাম তাহলে তোমার আবর্জনা কোন দিন পুড়বে না। আবর্জনা যদি না পোড়ান হয় আধ্যাত্মিক জীবন কোন দিন শুরুই হবে না। আধ্যাত্মিক জীবন যদি শুরু না করতে পার তাহলে এত দিন তুমি যা কিছু বলে এসেছ সবই মুখের কথা হয়েই থেকে যাবে, কোন কথাই তোমার কাজে লাগবে না। তুমি যতই বল ঠাকুর আছেন, যতই বল তাঁর

ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে, যতই বল আত্মাই বস্তু, সবটাই ফালতু বেকার বকওয়াস ছাড়া কিছু না, যতক্ষণ না তুমি প্রথম ধাপে পা দিচ্ছ, প্রথম ধাপ হল প্রত্যাহার বা *যচ্ছেদ্ বাঙ্ মনসি* অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহকে তার বিষয়বস্তু থেকে টেনে সরিয়ে নিয়ে আসা। টেনে নিয়ে আসার অনেক পদ্ধতি আছে, উপনিষদ সেই নিয়ে এখানে আলোচনা করছেন না, কারণ এটা এই উপনিষদের বিষয় নয়, বিভিন্ন উপনিষদের বিভিন্ন মন্ত্রে এই ব্যাপারে অনেক কিছু বলা হয়েছে। একটা সহজ পথ যেমন বলছেন *কস্য স্বিদ্ধনম্*, ঈশাবাস্যোপনিষদে বলছেন *ঈশা বাস্যমিদং সর্বং*, যা কিছু আছে সবই ঈশ্বর, সব কিছু ঈশ্বর হয়ে গেলে তোমার কাছে লোক বলে কিছু থাকবে না, লোক না থাকলে তোমার ইন্দ্রিয় কোন কাজ করবে না। একজন কামী পুরুষ যদি নিজের প্রেয়সীকে ভগবতী রূপে দেখে তখন কোথা থেকে তার মধ্যে কাম-বাসনা আসবে! ওখানেই তার ইন্দ্রিয়ের কার্য শেষ হয়ে গেল, ওখানেই তার ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার হয়ে গেল। সেইজন্য আধ্যাত্মিক জীবনে কোন একটাই পথ নেই, ধ্যান করাটাই একমাত্র পথ নয়, সেই রকম এটাও অনেক পথের মধ্যে একটা পথ।

তারপর কি করবে? ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রত্যাহার করে মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। এর আগে সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দা আর সাস্মিতা যোগশাস্ত্রের চার রকম সমাধির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। বস্তুর উপর মন একাগ্র করতে করতে মনের একাগ্র অবস্থায় ঐ বস্তুকে ত্রিকালের অতীত দেখে, মনের ঐ অবস্থাকে বলছেন নির্বিতর্ক, ইন্দ্রিয় তার কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে, ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার হয়ে গেল, ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে। ঠাকুর বলছেন, জিভে চিনি রেখে দেওয়ার পর ফুর ফুর করে আবার ফেলে দিচ্ছে, জিভে কোন ধরণের চাঞ্চল্য আসছে না। ঠাকুর আবার বলছেন, এই দেখ তেঁতুলের কথা বলতে বলতেই আমার মুখে জল এসে গেছে। ঠাকুর অবশ্য নিজেকে দিয়ে সাধারণ জীবনের উপমা দিচ্ছেন, ঠাকুর চাইলে জিভে জল আসবে না। ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এসে যাওয়ার এটা একটা লক্ষণ, চিনি জিহ্বাতে রেখে দিলে জিহ্বা রস ছাড়বে না, ফু দিলে উড়ে যাবে।

রসগোল্লা খাওয়ার খুব ইচ্ছা কিন্তু খাচ্ছে না, এটাকে কখনই ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার বলা যাবে না, রসগোল্লা না খাওয়াটা খুব সাধারণ স্তরের ত্যাগ। বাচ্চার জ্বর হয়েছে, সে এখন আইসক্রীম খেতে চাইছে। মা ভালো করে বুঝিয়ে বলল, বাবা! তোমার এখন শরীর ভালো নয় তুমি আইসক্রীম খেয়ো না। মার কথা শুনে সে আইসক্রীম খেলো না, এটা কখনই প্রত্যাহার হয়ে যাবে না। কিছু সময়ের জন্য আইসক্রীম খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। গীতায় ভগবান এটাই খুব সুন্দর ভাবে বলছেন, *বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ*, একাদশীতে উপোস করে আছে, মন খেতে চাইছে কিন্তু খাচ্ছে না, এটা নিরাহার, প্রত্যাহার নয়। ইন্দ্রিয় ছটফট করছে কিন্তু তাকে বিষয়রস ভোগ করতে দেওয়া হচ্ছে না, এটা নিরাহার। প্রত্যাহারে মন এমন হয়ে গেছে যে বিষয়রসের চিন্তা মাথাতেই আসবে না। ঠাকুর বলছেন, দেখো তো আমার এ কি হল কোন ধাতু স্পর্শ করতে পারি না। বলার পর বলছেন 'শৌচে গেলে গাড়ু ধরতেই হয়, কিন্তু গাড়ু ধাতুর জিনিষ কি করে ধরব, কাপড় জড়িয়ে তখন ধরি। ধাতু স্পর্শ হলেই মনে হয় যেন শিঙি মাছের কাঁটা বিধেছে, তখন বলি, মা এমনটি আর করব না'। এই হল প্রত্যাহার। ঠাকুরের ইন্দ্রিয় প্রত্যাহারে এমনই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, ভুলেও যদি স্পর্শ হয়ে যায় তখনও তাঁর কাঁটা বেঁধার মত লাগছে। ঠাকুরের জীবনের উপমা নিচ্ছি ঠিকই কিন্তু এই উপমা এখানে খাটে না, কারণ এখানে নেহাতই প্রাথমিক স্তরের কথা চলছে। ঠাকুরের উপমা একেবারে উচ্চতম অবস্থার। কিন্তু ব্যাপারটা এই রকমই হয়ে থাকে। প্রত্যাহার মানে, ইন্দ্রিয়কে টেনে নিয়ে আসা হয়েছে এরপর আর কোন দিন ইন্দ্রিয় ওখানে ফেরত যাবে না।

ইন্দ্রিয়কে টেনে নিয়ে আসা হয়েছে কিন্তু বিষয়বস্তু মনের মধ্যে থেকে গেছে, শুধু যে বিষয়বস্তুই থেকে গেছে তা নয়, আরও অনেক কিছু থেকে যায়। যোগশাস্ত্রে স্বপ্নের কথা, স্মৃতির কথা বলা হয়েছে, এগুলো মনের ভেতরে থেকে যায়। সেইজন্য বলছেন *যচ্ছেদ্ বাঙ্ মনসি প্রাজ্ঞঃ*, যাঁরা বিবেকী পুরুষ, যাঁরা সাধক, যাঁরা সিদ্ধির পথে এগোচ্ছেন তাঁরা এই রকম করেন আর *তদ্ যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি*, এখানে জ্ঞান মানে বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গুলি পুরোপুরি মনে লয় হয়ে যায় আর মন বুদ্ধিতে লয় হয়ে যায়। যোগশাস্ত্রের চার প্রকার সমাধি দিয়ে পুরো ব্যাপারটা আরও ভালো বোঝা যায়। তবে বিভিন্ন সাধনমার্গ বিভিন্ন পদ্ধতিতে চলে, সব কিছুকে সব ক্ষেত্রে মেলান যায় না। এর আগে বলা হয়েছিল, স্বামীজী বলছেন, দ্বৈতবাদীরা বলে শুভ কর্ম করলে মানুষ মৃত্যুর পর

সূর্যলোকে যায়, কর্ম আরও শুভ হলে চন্দ্রলোকে যায়, আরও শুভ হলে দ্যুলোকে যায় আর তার থেকেও শুভ হলে ব্রহ্মলোকে যায়। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, যাওয়া-আসা কিছুই হয় না, এগুলো মনেরই এক একটি অবস্থা, কারণ অদ্বৈতবাদীদের কাছে জীবনও যা মৃত্যুও তাই, জেগে থাকাও যা ঘুমিয়ে থাকাও তাই, সবই আত্মার অবস্থা। ঠিক তেমনি জীবন আর মৃত্যুও আত্মারই এক অবস্থা। যেমন যেমন ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার হতে থাকবে মন তত সূক্ষ্ম হতে থাকে। দশ নম্বর মন্ত্রকে, যেখানে বলছেন *ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা*, এই মন্ত্রের সাথে যোগ করলে পুরো ছবিটা পরিষ্কার বোঝা যাবে। স্থূল জগতকে ছেড়ে দেওয়ার পর এবার সে বস্তুকে বস্তু রূপে দেখছে না, বস্তুকে এখন তন্মাত্রা রূপে দেখছে। সেখান থেকে মন আরও সূক্ষ্ম হয়ে যাওয়ার পর সেই জিনিষকেই সে মন রূপে দেখে। ফলে জগতের ধারণাটাও তার পাল্টে যায়। স্বামীজীও বলছেন, প্রথমে আকাশ আর প্রাণ রূপে দেখে। সেখান থেকে আরও সূক্ষ্মে গিয়ে দেখে আকাশ আর প্রাণ যেন দুটো একই জিনিষ। স্বামীজী উপমা দিচ্ছেন, ইলেক্ট্রিসিটি তখন পদার্থ নাকি শক্তি বোঝা যায় না। বাস্তবিক এটাই তাঁরা দেখেন। স্বামীজী যখন এই উপমা দিচ্ছেন তখনও পদার্থ বিজ্ঞানীদের কাছে ইলেক্ট্রন প্রোটনের প্রপার্টি জানা ছিল না। কিন্তু আজ জেনে যাওয়ার পরেও ইলেক্ট্রন কি কোন তরঙ্গ নাকি পদার্থের কোন সূক্ষ্ম কণিকা, বিজ্ঞানীদের কাছে জানা নেই। সরাসরি ইলেক্ট্রন কেউ দেখতেও পায়নি। কিন্তু যোগীরা ধ্যানের গভীরে ঐ অবস্থায় জগতকে ঠিক সেভাবেই দেখেন। আরও গভীরে চলে যাওয়ার পর সেখানে মনও থাকছে না, মন তখন বুদ্ধিতে লয় হয়ে গেছে। মন এত সূক্ষ্ম হয়ে গেছে যে, বহির্জগৎ যে বস্তু দ্বারা নির্মিত সেই বস্তুকে না ধরে বহির্জগৎ যে শক্তি দ্বারা নির্মিত সেই শক্তিকেই সূক্ষ্ম মন ধরে নেয়। লাট সাহেবের বাড়ি দেখে ঠাকুর বলছেন ইটের ঢিপি, ঠাকুরের মন এতই সূক্ষ্ম যে বাহ্যিক প্রকাশটা আর তাঁর কাছে আসছে না, বস্তুর গভীরে যে জিনিষটা আছে তাকে ধরছেন। তিনি নিজেও গভীরে চলে গেছেন ফলে তাঁর সামনের জগতের যে গভীরতম বস্তু সেটাকে ধরছেন। পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মত বহির্জগতের খোসাগুলোও একটা একটা করে সরে যেতে থাকে। আত্মজ্ঞানের অর্থ আমিও যা তুমিও তাই, এই বোধ আসা। কিন্তু মা যে অর্থে সন্তানের সাথে একাত্ম বলছে আমিও যা আমার সন্তানও তাই, প্রেমিক প্রেমিকাকে যে অর্থ বলছে আমি আর তুমি এক, আত্মজ্ঞানের একত্ব বোধের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। দুটো পেঁয়াজেরই একসাথে খোসা ছাড়ান হচ্ছে, ছাড়াতে ছাড়াতে দুটোরই মাঝখানে বিশুদ্ধ আকাশ বেরিয়ে এল, এখন বলছে আমিও যা তুমিও তাই। আত্মার ক্ষেত্রে শুধু তফাৎ হল, সব জায়গাতেই শুদ্ধ চৈতন্য, কিন্তু এর উপর এক রকম আবরণ, ওর উপর অন্য রকমে আবরণ। সাধনা করে শুদ্ধ আত্মার আবরণগুলোকে সাধক যেমন যেমন সরিয়ে দিতে থাকে তেমন তেমন জগতের খোলস গুলো খসে পড়তে থাকে। ফলে প্রতিটি স্তরে জগতকে সে অন্য ভাবে দেখতে থাকে। শেষ অবস্থায় সাধক নিজেকেও শুদ্ধ চৈতন্য রূপে দেখে আর জগতকেও শুদ্ধ চৈতন্য রূপে দেখে।

বিষয়বস্তুকে আগেই ছেড়েই দিয়েছে এবার ইন্দ্রিয়গুলিকে টেনে মনের মধ্যে লয় করে দেওয়া হয়েছে। আচার্য এখানে বলছেন, এই যে বুদ্ধি, যে বুদ্ধির মধ্যে আত্মার চৈতন্য প্রকাশিত হয়, সেই বুদ্ধিই বিকৃত হয়ে মন আর ইন্দ্রিয় রূপে কাজ করে। ইন্দ্রিয় মনের মধ্যে লয়, আর মন বুদ্ধিতে লয় হওয়া মানে চৈতন্যের প্রকাশমান আলো আরও পরিশুদ্ধ হয়ে গেল। এই মন্ত্রকে বোঝার জন্য আমরা বাংলা সিনেমার একটা গানকে ব্যবহার করতে পারি। গানটি হল একজন বাবু গাঁজা টেনে বলছে এক টানেতে যেমন তেমন, দুই টানেতে রুগী, তিন টানেতে রাজা উজির আর চার টানেতে খুশী। শুদ্ধ আত্মা ঠিক তাই, যিনি সচ্চিদানন্দ তিনি বাবু, কারুর সাথে তাঁর কোন লেনাদেনা নেই। গাঁজার প্রথম টান দিয়ে শুদ্ধ আত্মা নিজেকে এক রকম মনে করছে, দ্বিতীয় টান দিতেই তাঁর সুখের রূপটা পাল্টে যাচ্ছে। তৃতীয় টানে নিজেকে রাজা উজীর মনে করছে, আর চতুর্থ টান মারার পর হয় নিজেকে সে বিশাল কিছু মনে করছে নয়তো সামান্য কিছু মনে করছে। শুদ্ধ আত্মা প্রথম টান দেওয়া মানে, মায়ার আবরণ দিয়ে নিজেকে ঈশ্বর রূপে দেখছেন। একটা আবরণ এসে গেল। দ্বিতীয় টান মারার পর নিজেকে মহৎ রূপে দেখছেন। তৃতীয় টান মারতেই আরও পিছিয়ে গিয়ে দেখছেন আর শেষ টান দিতে না দিতেই নিজেকে মানুষ, পশু, গাছপালা রূপে দেখছেন। মাতালরা প্রচুর মদ খেয়ে যেমন নর্দমায় পড়ে থাকে আর তার সাথে যদি গাঁজার এক আধটা টান মারা থাকে, তার আর কোন হুঁশ থাকে না। শুদ্ধ আত্মা ঠিক তাই, সংসার নর্দমায় মানুষ, পশুপাখি হয়ে পড়ে আছে। মাতালকে যদি বলা হয়, আরে মশাই আপনি একজন ভদ্র বাড়ির লোক হয়ে নর্দমায় কেন শুয়ে আছেন। সে বলবে, সুখে আছি ভাই, যদি মজা পেতে চাও

তুমিও আমার মত নেমে এস। শুদ্ধ আত্মাও মানুষ রূপে সংসার জঞ্জালের মধ্যে পড়ে আছে। সে যদি বলে আমি অনেক বেশি খেয়ে ফেলেছি আমার এই নেশাটা একটু কাটাতে হবে। তখন তেঁতুলের জল খাইয়ে খাইয়ে তার নেশাটা ছাড়িয়ে আবার আগের অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে। প্রথমে নর্দমা থেকে তাকে বার করে আনতে হবে, তারপর একটু একটু করে তেঁতুল জল খাওয়াতে হবে। তখনও তার পা টলছে, সেও বলছে আমার শরীরটা টলছে কেন? আবার একটু একটু করে তেঁতুল জল খাওয়াতে থাকছে। এবার তার হুঁশটা ফিরেছে। শুদ্ধ আত্মারও ঠিক একই অবস্থা হয়, নিজেকে শরীর, মন, বুদ্ধি মনে করে মাতালের মত জগতের পেছনে দৌড়াচ্ছে। এবার তেঁতুল জল খাওয়া শুরু হল, মানে বৈরাগ্য এসেছে। বিষয় থেকে একটু সরে এল। আরেকটু তেঁতুল জল দেওয়া হল, আরেকটু পেছনে গেল। শেষে যখন ওর নেশা ছাড়তে শুরু করল তখন সে নিজেকে মহৎ রূপে দেখছে, মহৎ মানে বিশ্ব মন, দেখছে সমস্ত মনের সাথে সে এক হয়ে আছে। আরও একটু নেশা কমার পর নিজেকে সে প্রকৃতির সাথে এক দেখছে। দেখছে সমস্ত জীবজন্তু তার মধ্যেই অবস্থান করে আছে। এখনও একটু নেশা বাকি থেকে গেছে। অনেক বাবু আবার নেশার মধ্যেই থাকতে চায়, ওটাই পছন্দ করছে। আবার বলতে পারে আমার আর নেশার দরকার নেই, তখন আরেকটু তেঁতুল জল খাইয়ে দিলে শেষ নেশাটুকুও চলে গেল, তখন নিজেকে সেই শুদ্ধ চৈতন্য রূপে দেখছে। আমি যে এতক্ষণ নিজেকে রাজা উজীর, সুখীদুখী মনে করছিলাম এগুলো তো আমি কখনই ছিলাম না। সব গাঁজার নেশার জন্য হচ্ছিল, আমি এসব কিছুই হয়নি। আমি যা ছিলাম তাই আছি, আমার তো কোন বিকার হয় না, যা কিছু হচ্ছিল সব নেশার জন্য হচ্ছিল। মাতালকে তেঁতুল জল খাওয়াতে হয়, আর শুদ্ধ আত্মার উপর নেশার আবরণ এসে গেলে প্রত্যাহার করিয়ে করিয়ে পেছনের দিকে নিয়ে যেতে হয়, *যচ্ছেদ্ বাঙ্ মনসি প্রজ্ঞাস্তদ্ যচ্ছেদ্জ্ঞান আত্মনি*। শুদ্ধ আত্মা নিজেকে প্রকৃতি মনে করছিলেন, সেখান থেকে মহৎ, মহৎ থেকে অহঙ্কার। অহঙ্কার থেকে আরও নেমে আসার পর নিজেকে বুদ্ধি রূপে মনে করছেন। এবার জগতটা তাঁর কাছে ব্যক্তি জগৎ রূপে মনে হচ্ছে। মহতে সমষ্টি জগত রূপে দেখছিল, এবার ব্যষ্টি জগৎ রূপে নিজেকে দেখছে। তারও নীচে মনের অবস্থায় যখন আসছে তখন তাঁর মধ্যে ভালো, মন্দ, এটা চাই, সেটা চাই করে সঙ্কল্প বিকল্প হতে শুরু হল। সেখান থেকে ইন্দ্রিয়ের স্তরে চলে আসার আর তাঁকে আটকানো যাচ্ছে না, চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। শুদ্ধ আত্মা যিনি, যাঁর সাথে কোন কিছুর কোন সম্পর্ক নেই, অথচ সব কিছুর সাথে নিজেকে জুড়ে নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে যাচ্ছে।

এখানে মনে রাখতে হবে, এই মন্ত্রকে প্রণালিবদ্ধ পদ্ধতি রূপে নেওয়া যায় না, একটা ধারণা দিয়ে দেওয়া হল, প্রণালিবদ্ধ পদ্ধতি রূপে জানতে হলে আমাদের যোগশাস্ত্রে যেতে হবে। মোটামুটি একটা ধারণা দিতে গিয়ে বলছেন *জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ*। চৈতন্য সত্তা নিজেকে ধাপে ধাপে নীচে নামিয়ে এনেছেন, ওখান থেকে এবার তিনি তাঁর নিজের জায়গায় ধাপে ধাপে ফেরত যেতে শুরু করেছেন, তার মধ্যে একটা ধাপ হল ব্যষ্টি মন। সেই ব্যষ্টি মনকেও ছাড়িয়ে আরেক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছেন, তখন আসছে সমষ্টি মন। সমষ্টিতে তিনি সব মনের সঙ্গে জুড়ে গেছেন। সব মনের সাথে জুড়ে গেলে তিনি সব মনের খবর জানতে পারবেন, আলাদা করে কিছু থাকছে না, সবার সাথে এক। এখানে এই কথাই বলছেন, শুদ্ধ আত্মাকে দিয়ে এই জগতের কোন কিছুই হয় না, সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কোন কিছুতেই তিনি জড়ান না। শুদ্ধ আত্মার উপর একটা মায়ার আবরণ এসে যায়, কেন এই মায়া আসে, কোথা থেকে আসে কেউ জানে না, প্রশ্নের তাই কোন উত্তরও নেই। ভক্ত বা খ্রীষ্টানরা বলে তাঁর ইচ্ছা। পুরুষ মানে শুদ্ধ চৈতন্য আর প্রকৃতি মানে মায়া। সাংখ্য মতে প্রকৃতি আর বেদান্ত মতে মায়া। মহৎ থেকেই প্রথম জগতের শুরু, এটাই বিশ্ব মন। অনেক সময় মহৎকে ব্রহ্মাও বলা হয়, মহৎই ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মলোকই জগতের শেষ ধাপ। ব্রহ্মলোকের পারে চলে গেলে শুদ্ধ আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

সৃষ্টিতে ব্রহ্মার প্রথম জন্ম, বেদান্ত মতে মহতের প্রথম জন্ম। তাই কোন মানুষ যখন নিজেকে মহতের সাথে এক করে নেয় তখন সে যেন ব্রহ্মলোকে চলে গেল। মহতে গিয়ে আত্মার কি হয় বলতে গিয়ে আচার্য বলছেন *প্রথমজবৎ স্বচ্ছস্বভাবকমাত্মনো বিজ্ঞানমাপদয়দিত্যর্থঃ*, আত্মার শুদ্ধ স্বচ্ছ স্বভাবকে সে প্রাপ্ত করে। রাজযোগে এটাই সবিকল্প সমাধি, বেদান্তে এটাই সগুণ ঈশ্বর দর্শন। এখানে একটা প্রাপ্তির ভাব আসে। প্রাপ্তির ভাব আসার জন্য বলছেন, তিনি দেখেন আমি আলাদা তিনি আলাদা। মা কালীর দর্শনে ঠাকুর নিজেকে আলাদা ও মা কালীকে আলাদা দেখছেন, সেইজন্য এখানে প্রাপ্তির ভাব থাকে, প্রাপ্তির ভাব মানে দুইয়ের ভাব। ঠাকুর একদিন হাজরাকে বলছেন, তুমি শুদ্ধ আত্মাকে ঈশ্বর কেন বল? কারণ শুদ্ধ আত্মা নিষ্ক্রিয় নির্বিকার আর

ঈশ্বর ক্রিয়াবান। মহতে এসে দেখেন পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে ঈশ্বর, তাঁর সাথে একাত্ম ভাব এসে গেছে। ভক্তিশাস্ত্রে এটাই সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ইত্যাদি। তবে ভক্তিশাস্ত্র, বেদান্তশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, পুরাণশাস্ত্রের সব কিছুকে খাপে খাপে মেলান যাবে না, মেলাতে গেলে এর ওর সাথে অনেক গরমিল থেকে যাবে।

আত্মার শুদ্ধ স্বচ্ছ স্বরূপ মহতের থেকে আর কোথাও এত ভালো হয় না। এই গ্লাশও আত্মারই একটি রূপ, একজন দাগী অপরাধীও সেই আত্মারই রূপ, জরাগ্রস্ত বৃদ্ধও সেই আত্মারই রূপ, কিন্তু এগুলো আত্মার অশুদ্ধ রূপ। যখন মনে চিন্তন করছি, ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করছি তখন আত্মার আরও শুদ্ধ রূপকে বোধ করছি। যত পেছনে যাচ্ছে তত আত্মার রূপ শুদ্ধ হতে থাকে। এগোতে এগোতে নিজের বুদ্ধিতে, যে বুদ্ধি শাস্ত্রের জ্ঞান আর গুরুর উপদেশে দৃঢ় হয়ে গেছে, যে বুদ্ধি পরিষ্কার জানে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল আর এটাই বস্তু বাকি সব অবস্তু এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কিন্তু সেই বুদ্ধিতে ব্যষ্টি ভাব থাকে। ব্যষ্টি ভাব মানে আমি ভাব কিন্তু এই আমি এখন শুদ্ধ হয়ে গেছে। তখন তিনি ধ্যানের গভীরে জ্যোতি দর্শন করেন। এর পরেও আরেকটা ভাব বাকি থাকে, এই ভাব হল যিনি আমার ভেতরে তিনিই সবার ভেতরে বিরাজ করে আছেন। এই ভাব আসার জন্য তাঁকে মহতে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সেখানে দেখেন আমার ভেতরে যিনি সবার ভেতরে তিনিই বিরাজিত। এর উপরে আর কোন উচ্চ বোধ হতে পারে না, এটাই শেষ কথা। এটাই মন্ত্রে বলছেন *মহতি নিযচ্ছেৎ*, নিজের বুদ্ধিকে যখন ঐ মহতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয় তখন তিনি বিশ্ব মনের সাথে এক হয়ে যান। কিন্তু এটাকেও মুক্তি বলছেন না। তিনি এখন ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে এক দেখছেন, ঠাকুর যে ঈশ্বরকোটির কথা বলছেন, এখানে তিনি ঈশ্বরকোটি ভক্ত হয়ে যান। কিন্তু এখানেও তাঁর মুক্তি হবে না, মুক্তির জন্য তাঁকে আরেকটা ধাপ এগোতে হবে। সেটাই শেষে বলছেন *তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি*।

ঠাকুরকে দেখে তোতাপুরী নিজের মনেই বলছেন, এত উচ্চ আধার হয়ে এ কী করছে! তিনি ঠাকুরকে অদ্বৈত সাধনায় নিয়ে গেলেন। দ্বৈতবাদীদের কাছে *মহতি নিযচ্ছেৎ* এটাই শেষ। ভক্তের ভাব হল, সারাটা জীবন আমি যাঁকে ভালোবেসে এসেছি তাঁকে তো আমি পেয়েই গেলাম, আমার আর কী লাগবে! সিনেমায় যেমন প্রেমিক প্রেমিকাকে পেয়ে গেলে বলে, আমি তোমাকেই পেয়ে গেছি আমার আর কিছু লাগবে না। যেটাই জাগতিক স্তরে হয় সেটাই ভক্তি স্তরে হয়। ভক্ত বলে, হে প্রভু! আমি তো তোমাকেই চাইছিলাম, তোমাকে পেয়ে গেছি এরপর আমার আর কিছু লাগবে না। কিন্তু অন্য রকমের সাধকও আছেন, তাঁরা বলেন এখানে আমার শেষ নয় বা তিনি কৃপা করে আমাকে অন্য দিকে নিয়ে যাবেন। ঠাকুর যেমন বলছেন, তিনি চাইলে তাকে আত্মজ্ঞান পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারেন। কারণ শুদ্ধ চৈতন্যকে যখন মায়ার আবরণের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর রূপে দেখান, তিনি তখন ক্রিয়াশীল, গতিশীল হয়ে যান। আরও সহজ ভাবে ঠাকুর কাশীতে মৃত্যুর কথা বলছেন, শিব বলেন, এই দ্যাখ্! আমার অখণ্ড রূপ। নিজের বুদ্ধিকে মহতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার পর তিনি সেই বিশ্বাত্মা বা ব্রহ্মা বা বিষ্ণুর সাথে এক হয়ে যান। কিন্তু তিনি যদি চান তাঁকে অদ্বৈত জ্ঞানও দিয়ে দেন।

অন্যান্য শাস্ত্রে বলছেন, কে যেন করে দেন, কিন্তু উপনিষদ বলছেন, না তা নয়, নিজেকেই করে নিতে হয়, *নিযচ্ছেৎ* বলছেন, মানে তখনও তাঁর চেষ্টা চলছে। *নিযচ্ছেৎ তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি*, বলছেন সেখান থেকে শান্ত আত্মাতে সেই নির্মল বুদ্ধিকে লয় করিয়ে দেবে। শান্ত আত্মাকে আচার্য ব্যাখ্যা করে বলছেন *সর্ববিশেষ-প্রত্যস্তমিতরূপেহবিক্রিয়ে সর্বান্তরে সর্ব-বুদ্ধিপ্রত্যয়সাক্ষিণি মুখ্যে আত্মনি*। আচার্য এখানে মুখ্য আত্মা এই শব্দ ব্যবহার করছেন। পরে একটি মন্ত্রে বলবেন, আত্মা একটি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর শব্দ। আত্মা মানে আমি, আমিও তো আমাকে জানি, আমি যখন বুদ্ধি স্তরে চলে যাচ্ছি তখনও জানি আমি, সন্তানকেও মা আমি দেখছে, সবেতেই আমি থাকে। কিন্তু যে আমি উচ্চতম সেই আমিকে বলছেন *মুখ্যে আত্মনি*, মুখ্য আত্মা যদিও খুব প্রচলিত শব্দ নয়। আত্মজ্ঞান সবারই আছে শুধু আত্মার পরিভাষাটা পাল্টে যায়। অত্যন্ত স্থূল প্রকৃতির মানুষ নিজের সন্তানকেই আত্মা মনে করে, যারা একটু কম স্থূল তারা নিজের দেহকে আত্মা মনে করে, এই করে করে শেষে শুদ্ধ আত্মাতে গিয়ে বলে আমি শুদ্ধ আত্মা। আচার্য বলছেন, সমস্ত বিশেষণ, সমস্ত নাম, সমস্ত ক্রিয়ার পারে যিনি তিনি *মুখ্যে আত্মনি*। মুখ্য আত্মা অবিক্রিয়, ঠাকুর যে হাজরাকে বলছেন, তুমি শুদ্ধ আত্মাকে ঈশ্বর কেন বল, কারণ শুদ্ধ আত্মা হলেন অবিক্রিয়, নির্গুণ, নিরাকার। সর্বান্তরে, সব কিছুর ভেতরে তিনিই বিরাজিত, হাতি ঘোড়ার ভেতরেও তিনি মানুষের ভেতরেও তিনি। পদার্থের দিকে হাইড্রোজেনের ভেতরেও তিনি

আর হাইড্রোজনের ভেতরে যে নিউক্লিয়াস আছে তার ভেতরেও তিনি। সেখানে যে ইলেক্ট্রন আছে তার ভেতরেও তিনি, ইলেক্ট্রনের পেছনে যে কোয়ার্ক আছে তার ভেতরেও তিনিই আছেন, সেটাই আচার্য বলছেন সর্বান্তরে। কিন্তু আবার বলছেন *সর্ব-বুদ্ধিপ্রত্যয়সাক্ষিণি*, সমস্ত বুদ্ধির যে প্রত্যয় হয়, তার যত রকম জ্ঞান বা বোধ হয় তার তিনি সাক্ষী। ঠাকুর পুরুষ আর প্রকৃতির খুব সহজ উপমা দিচ্ছেন, বিয়ে বাড়িতে কর্তা বসে ভুরুর ভুরুর করে তামাক খেয়ে যাচ্ছে আর বাড়ির গিন্নী সব কাজ দেখাশোনা করে যাচ্ছে আর মাঝে মাঝে এসে তাকে খবর দিয়ে যাচ্ছে। আত্মাও ঠিক এই রকম সাক্ষীস্বরূপ। কার সাক্ষীস্বরূপ? বুদ্ধির প্রত্যয়ের সাক্ষী, বুদ্ধি যে বোধ করছে, এক একটা অবস্থাকে বুদ্ধি যে ধারণা করছে আত্মা তার সাক্ষী। বুদ্ধি এসে মাঝে মাঝে আত্মাকে খবর দিয়ে যাচ্ছে, এই হল সেই হল। আত্মা কিন্তু নিজে কোন কাজ করেন না, এটাই শুদ্ধ আত্মার রূপ। তিনি কখন কোন কিছুতে নিজেকে জড়াবেন না, কিন্তু তিনি আছেন বলেই সব কিছু হচ্ছে। তিনি সাক্ষী রূপে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছেন। এই জিনিষটাকেই আমরা চলতি ভাষায় বলি, অন্তর্যামী রূপে তিনি সব লক্ষ্য রাখছেন, তিনি সব দেখছেন।

ভূমিকম্পে কত লোক মারা গেল তিনি রক্ষা করতে পারলেন না! কি করে তিনি রক্ষা করবেন! রক্ষা করা তো তাঁর কাজ নয়। তাহলে তিনি করেন? তিনি সাক্ষীস্বরূপ, কাজ করে প্রকৃতি। প্রকৃতি কিভাবে কাজ করছে? এই সৌরমণ্ডল রূপে। সৌরমণ্ডল কিভাবে কাজ করছে? এই পৃথিবী রূপে। পৃথিবী রূপে কিভাবে কাজ করছে? কয়েকটা স্তর আছে উপরের স্তর নীচের স্তর, একটা আরেকটার উপর চেপে বসতে যাচ্ছে তাতে ভূমিকম্প হচ্ছে, সেখানে ভগবানের কি আছে! ভালো যা কিছু আছে সব ভগবানই দিচ্ছেন বলছি, হে ঠাকুর! তুমি গরুর দুধ দিচ্ছ, বৃক্ষে ফল দিচ্ছ, নদীতে মিষ্টি জল দিচ্ছ, তাহলে ভূমিকম্পটাও তিনিই দিয়েছেন। ভগবান ওটাও দেন না, এটাও দেন না, কিন্তু তিনি সর্বান্তর, সব কিছুর তিনি আত্মা। তিনি আমার আত্মা, আপনারও আত্মা। তাহলে বেড়াল, সাপ, ইঁদুর এদের আত্মা কে? এদের সবার আত্মা তিনি। সেইজন্য সাপও থাকবে, ইঁদুরও থাকবে আর বেড়ালও থাকবে। বেড়াল ইঁদুরকে খেতে যাবে ইঁদুর পালাবে, সাপ ইঁদুর খেতে যাবে ইঁদুর পালাবে আর ইঁদুর আমাদের ঘরের জিনিষপত্র কাটবে। সবার জন্যই ঈশ্বর, আমার খাবার ব্যবস্থাও তাঁকে করতে হয়, সাপ, ইঁদুরের খাবারের ব্যবস্থাও তাঁকেই করতে হয়। মা কালী তাঁরই রূপ, মা কালী তাঁর সংহার মুর্তি নিয়ে নেপালে সংহার করলেন, এতে আপত্তির কি আছে। সৃষ্টি তাঁর, পালনও তাঁর তাহলে সংহারটা কার হবে? আমরা কেউই ধর্মকে বোঝার চেষ্টা করি না বলেই আজ আমাদের এত সমস্যা।

পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের ইয়ং ছেলে ভাবছে, আমি এখানে আছি, এরপর আমার জীবন কেমন হবে সেই ব্যাপারে সব কিছু ঠিক করে রেখেছি, আমি যেমনটি চাইছি তেমনটিই যেন চলতে থাকে। ভাবছে সে যেন কোম্পানির একজন এক্সিকিউটিভ হতে পারে, তার শিক্ষিতা, আধুনিকা সুন্দরী স্ত্রী হবে, কিন্তু বাড়িতে পাঁচ হাজার বছর আগেকার সতী-সাবিত্রী স্ত্রীর মত হবে, অন্য কারুর দিকে তাকাবে না, শ্বশুড় শাশুড়ির পদসেবা করবে। তা কি কখন হয়! পার্টিতে যাবে স্ত্রী যেন সিনেমার নায়িকা আর বাড়িতে সেই স্ত্রী তার বাবা-মার পদসেবা করবে। আর তার যেন সোনার টুকরোর মত একটি দুটি সন্তান হবে, ঠিক সময়ে তার প্রমোশন হবে, শরীরের কোন ব্যাধি থাকবে না, দামী গাড়ি থাকবে। আর যখন রাস্থা দিয়ে যাবে কোথাও কোন ট্রাফিক জ্যাম হবে না, পরিষ্কার রাস্থা দিয়ে যেন সাঁ করে চলে যেতে পারে। বেড়াতে যাওয়ার সময় রিজার্ভেশন যেন খুব সহজে পেয়ে যাতে পারে, ট্রেনে যেন বেশি ভিড় না থাকে। আর সে যখন ষাট বছরের হবে তার বাবা নব্বুই বছরের হবে, বাবা যেন অথর্ব হয়ে পড়ে না থেকে চলতে ফিরতে টুক্‌ করে একদিন মারা যান। ভগবান কি ভগবান, নাকি আমাদের বাড়ির চাকর। একটুও বাড়াবাড়ি কোথাও বলা হয়নি, ভগবানের ব্যাপারে আমাদের এই ধরণেরই বিচিত্র বিচিত্র ধারণা। আপনার দেখাশোনা করার জন্য ভগবান আছেন, আর অপরের দেখাশোনার জন্য কি ভগবান নেই? আপনার খাওয়া-দাওয়া ঠিক ঠিক হতে হবে, তাহলে অপরের খাওয়ার ব্যবস্থা কে করবেন? এই ধরণের কোন বিচিত্র ধারণা হিন্দু ধর্মে পাওয়া যাবে না। মানুষকে এদিকে আকর্ষিত করার জন্য এক আধটা অন্য রকম কথা বলা হয় ঠিকই। কিন্তু উপনিষদের কথাই আমাদের কাছে শেষ কথা। তিনি *সর্বান্তরে সর্ব-বুদ্ধিপ্রত্যয়সাক্ষিণি*, তিনি সবারই অন্তর্যামী আর সব কিছুর সাক্ষী। কাঠমাণ্ডুতে বড় বড় বাড়ি, মন্দির, হাসপাতাল নির্মাণের সময় সেটারও তিনি সাক্ষী ছিলেন, ভূমিকম্পে সেই বাড়িগুলো ধুলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে তখন সেটারও তিনি সাক্ষী। আমার আপনার নামযশেরও তিনি সাক্ষী আর অধঃপতন হয়ে যে অপযশ হচ্ছে

তখন তারও তিনি সাক্ষী। তাহলে বলবেন এই ঠুঁটো জগন্নাথকে নিয়ে আমরা কী করব! তিনি কোন কিছুতেই নিজেকে জড়ান না, কোন কিছুতে হস্তক্ষেপ করেন না, তিনি যদি তা করেন তাহলে তাঁর এই শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ বাধিত হয়ে যাবে। তখন তাঁর মধ্যে পক্ষপাত দোষ এসে যাবে, তিনি কারুকে ভালো করবেন কারুকে খারাপ করবেন, শুদ্ধ স্বরূপ অশুদ্ধ স্বরূপ হয়ে যাবে। তাহলে এই শুদ্ধ আত্মার আমাদের দরকারটা কি, দরকার হল, আমি যখন ঐ অবস্থায় যাচ্ছি তখন দেখছি, আরে তাই তো! এই যে আমার এত অশান্তি হচ্ছিল তার কারণ আমি এই শুদ্ধ চৈতন্যে অবস্থিত ছিলাম না বলে এত অশান্তি হচ্ছিল। আমার যত রাগ, দ্বেষ, দুঃখ, কষ্ট এই কারণেই হচ্ছিল। যেমন যেমন মানুষ প্রত্যাহার করবে, তেমন তেমন তার আনন্দের মাত্রা বাড়তে থাকবে, তেমন তেমন ভেতরে শান্তি আসতে থাকবে। তাই বলে আত্মজ্ঞানীর কি কোন দুঃখ কষ্ট আসবে না। অবশ্যই আসবে, কেশব সেনের অসুখ হয়েছে, ঠাকুর খুব দুঃখ করে মা কালীকে বলছেন, মা! কেশবের কিছু হলে কার সাথে কথা বলব। এই দুঃখ থাকবে, কিন্তু এই দুঃখ আর শোক করার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। খেদ করা, দুঃখ হওয়াটা আলাদা জিনিষ আর পুত্রশোক আলাদা জিনিষ।

কিভাবে ধাপে ধাপে মানুষ আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবে এখানে তার বর্ণনা করলেন – ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ করে তাকে মনে লয় কর। জ্ঞানের অবস্থায় পরিষ্কার বুঝতে পারেন ইন্দ্রিয়গুলি আর চাঞ্চল্য তৈরী করতে পারছে না। এরপর মনকে বুদ্ধিতে লয় কর, মনের মধ্যে যে নানা রকমের সঙ্কল্প-বিকল্প হচ্ছিল, মনের ভেতর যে নানা রকমের ভাবের খেলা চলছিল, যে ভাবগুলো কিছু স্বপ্ন থেকে আসছিল, কিছু স্মৃতি থেকে আসছিল, বুদ্ধিতে গিয়ে পরিষ্কার বুঝতে পারছে সব সঙ্কল্প-বিকল্প, সব ভাবের বিলয় হয়ে গিয়ে আমার যিনি শুদ্ধ আত্মা তাঁর ছবিই শুধু ওখানে ভেসে উঠছে। পরের ধাপে সেই ছবি সবারই ভেতরে দেখতে পান, এই জগতে আত্মার ব্যাপারে যে উচ্চতম অনুভূতি হতে পারে, এটাই সেই অনুভূতি। কিন্তু এরপরেও জগৎ থেকে যাচ্ছে। এই জগতের আত্যন্তিক বিলয়, শেষ যিনি তিনিই শুদ্ধ আত্মা। তখন দেখছে আমি তো কখনই এগুলো হয়নি। তাহলে এতক্ষণ কি হচ্ছিল? নেশার ঘোর এসে গিয়েছিল, গাঁজা খেয়ে যেমন বলছে এক টানেতে যেমন তেমন। আমার কোন পরিবর্তন নেই, আমি যা আছি তাই আছি, যা কিছু হচ্ছিল সব নেশার ঘোরে হচ্ছিল। এটাই আত্মজ্ঞান। তখন বলছেন এত কিছু তো জেনে গেলে, কিন্তু জানলে কি হবে! সেতো সবাই জানে, টিয়া পাখিও তো রাম রাম করে। সেইজন্য এবার কিছু কর –

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।।১/৩/১৪।।

(ওঠো! জাগো! শ্রেষ্ঠ আচার্যদের কাছে গিয়ে তত্ত্ব অবগত হও। মেধাবীগণ বলেন ক্ষুরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ যেমন দুর্গম, আত্মজ্ঞানের পথও সেই রকম দুর্গম।)

উপনিষদের কোন মন্ত্রকেই আমরা যেন ভুলেও কবিতা মনে না করি। শ্রেষ্ঠ কবিদের কবিতা খুবই উচ্চমানের হতে পারে কিন্তু সব কবিতাই কবির মন থেকে সৃজন করা। বড় বড় দার্শনিকরা খুব গভীর চিন্তা ভাবনা করে যে কথাগুলো রচনা করেন, উপনিষদ তাও নয়। উপনিষদের সব মন্ত্রই ঋষিদের ধ্যানের গভীরে ভেসে ওঠা আধ্যাত্মিক জগতের সত্য। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের সত্য যেটা তার মূল হল মনের জগৎ। মনের জগৎ যেন অনন্ত। আত্মার এই অনন্ত ভাব অন্য দিক থেকে আসে। আত্মার পরেই যদি অনন্তকে দেখতে হয় তা হল মন, কিন্তু আত্মার তুলনায় মন অনন্ত নয়। আত্মার সাথে কোন কিছুরই তুলনা হয় না, কোন কিছুই আত্মার ধারে কাছে আসবে না। কিন্তু আত্মার বাইরে বাকি যা কিছু জানছি, পৃথিবী, জল, বায়ু যাবতীয় সব কিছুর তুলনায় মন অনন্ত। অনন্ত আকাশের মাঝখান দিয়ে পাখি উড়ে যাচ্ছে, আমরা কখনই বলতে পারব না যে আকাশের এই প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে উড়ে যাওয়ার জন্য পাখির কাছে একটাই পথ আছে। কিন্তু যাঁরা ধর্মচর্চা বা অধ্যাত্মচর্চা করেন তাঁরা মনে করেন তাঁদের পথটাই একমাত্র পথ। ঠাকুর বলছেন মত পথ, সেইজন্য আমরা মনে করি খ্রীষ্টান মত, হিন্দু মত, মুসলমান মত, বৈষ্ণব মত, তন্ত্র মত সবটাই ঠিক। কিন্তু প্রত্যেকটি মানুষের সাধনার পথ আলাদা আলাদা। দুজন সাধকের সাধনা কখনই এক হবে না। দুজন একই গুরুর কাছে, একই দিনে দীক্ষা নিয়ে একই মন্ত্রে, একই পদ্ধতিতে সাধনা করছে, কিন্তু দুজনের সাধনা কখনই এক রকম হবে না। শুরু এক জায়গা থেকে হতে পারে, শেষটাও এক জায়গায় গিয়ে হবে কিন্তু মাঝখানের পথ কখনই এক হবে

না। কারণ, প্রত্যেকটি মানুষের মনের গঠন আলাদা আলাদা। মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে যাত্রা যখন শুরু করছে তখন মনে হবে যেন সবাই একই জিনিষ করে যাচ্ছে। কিন্তু একটু পরেই সবাই আলাদা হয়ে যাবে। বেলুড় স্টেশন আসতে আসতেই কর্ড আর মেইন লাইন হয়ে আলাদা হতে শুরু হয়ে যাবে। তারপর ব্যাণ্ডেল আসতেই লাইন আলাদা হয়ে গেল, বর্ধমানে গিয়ে আরও লাইন আলাদা হয়ে গেল, তারপর আসানসোল, ধানবাদে গিয়ে সব লাইন আলাদা হয়ে গেল। হাওড়া থেকে দিল্লী যেতেই লাইন আলাদা হয়ে যাচ্ছে, কত আলাদা লাইন আছে ভগবান জানেন। আর এখান থেকে ভগবান পর্যন্ত যেতে কটি রাস্তা হবে? অনন্ত রাস্তা, যত ব্যাক্তি তত রাস্তা। দুজন লোকের সাধনা যদি একই রকম মনে হয় তাহলে বুঝতে হবে দুজনের মধ্যে একজনের কিছু গোলমাল আছে। দুজনেরও হতে পারে, একজনের তো হবেই কিন্তু কার গোলমাল সেটা জানা নেই। একই উপনিষদেও তাই একই জিনিষকে বিভিন্ন ভাবে বলছেন। কারণ কারুরই সাধনা কখন এক রকম হবে না। তবে সাধনার পথকে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়, যেমন রাজযোগ শ্রেণীবদ্ধ করে দিয়েছে। সেখানে বলে দিচ্ছে যাঁরা এভাবে করবেন তাঁদের মোটামুটি এই এই হবে, তার মধ্যে ব্যতিক্রমও হবে। কিন্তু এটাই যে শেষ কথা তা নয়। উপনিষদেও যা যা বলা হয়েছে, আর যারা সেই অনুসারে সাধনা করবেন তাদের পথও যে একই রকম হবে তা নয়। তবে শ্রেণীবদ্ধ করে দেওয়া যাবে। স্বামীজী যেমন চারটি যোগের কথা বলছেন, কিন্তু চারটে যোগই সব শেষ হয়ে যাচ্ছে না, আরও অনেক যোগ আছে। গীতাতেই আঠারোটি যোগের কথা বলছেন, প্রত্যেকটি অধ্যায়কে এক একটা যোগ বলছেন। আবার ঠাকুর বলছেন, মোটামুটি জ্ঞানযোগ আর ভক্তিযোগ এই দুটো পথ। আচার্য আবার সাংখ্য আর যোগে শ্রেণীবদ্ধ করে দিচ্ছেন, সাংখ্য মানে জ্ঞানযোগ আর যোগ মানে কর্মযোগ। শ্রেণীবদ্ধ করার অনেক পদ্ধতি আছে, পদ্ধতিকে আমরা সীমা টেনে দিতে পারি না। সেই শ্রেণীর মধ্যে আবার অনন্ত পথ।

আগের মন্ত্রে ইন্দ্রিয়গুলিকে কিভাবে ধীরে ধীরে মনে লয় করতে হয়, মনকে বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে মহতে লয় করার একটা পদ্ধতি বলে দিলেন। এই জিনিষটাকেই আচার্য এবার খুব সহজ ভাবে বলছেন। সব কিছু হয়ে যাওয়ার পর এবার বিভিন্ন পথে যখন এটাকে নিয়ে চলা শুরু হল, এমনকি পরে একটি মন্ত্রে যে কথা বলবেন যেখানে পথটা একটু অন্য রকম মনে হবে, আচার্য বলছেন এই নানান রকম পথ দিয়ে যাওয়ার পর শেষে কিন্তু একটা জিনিষকেই জানা হয়। আত্মাকে নিয়ে নচিকেতা যে প্রশ্ন করেছিলেন, শেষে গিয়ে দেখছেন সেই আত্মা হলেন অবিক্রিয়, আত্মার মধ্যে কোন রকম বিক্রিয়া হয় না, আত্মার মধ্যে কোন রকম পরিবর্তন হয় না, আর অন্য দিকে আত্মা কোন ক্রিয়া করেন না, তার সাথে তিনি সর্বান্তর, সবারই ভেতর সেই আত্মাই আছেন আর তিনি সব কিছুর সাক্ষী। ঠাকুর বলছেন বই পড়ে এক রকম ধারণা হয়, চিন্তা-ভাবনা করে এক রকম হয় আর প্রত্যক্ষ হলে অন্য রকম হয়। ঠিক তেমনি এই জ্ঞান তাত্ত্বিক জ্ঞান থেকে বাস্তবিক জ্ঞান হলে কি হয় বলতে গিয়ে আচার্য বলছেন, আকাশের স্বরূপ যদি জেনে যায়, এখানে আচার্য আকাশ বলতে মাথার উপর যে আকাশ রয়েছে সেই আকাশকেই বলছেন, উপনিষদে সাধারণতঃ আকাশ মানে সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের একটি, বলছেন আকাশের যত রকমের মালিন্য, আকাশ এই নীল দেখাচ্ছে, আবার ধূসর দেখাচ্ছে, সূর্যাস্তের সময় আকাশ লাল দেখায়, এই যে আকাশ বিভিন্ন সময় রঙ পাল্টায়, যদি আকাশকে ঠিক ঠিক কেউ জেনে যায় তখন সে দেখবে আকাশের কোন রঙ হয় না। আকাশকে যে নীল দেখাচ্ছে, সেটাও একটা পরিস্থিতির জন্য দেখাচ্ছে, আবার কখন লাল, কখন হলুদ দেখাচ্ছে আসলে আকাশের বাস্তবিক কোন রঙ নেই। রাতের অন্ধকারে রজ্জুতে সর্পের ভ্রম হয়ে যাওয়ার পর যদি জ্ঞান হয়ে যায় এটা রজ্জু তখন সর্প মনে করে আঁতকে উঠবে না। মরুভূমিতে মরীচিকার স্বরূপ যদি একবার জেনে যায় তখন আর মরীচিকা দেখে ভ্রমিত হবে না। ভ্রম ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ না জ্ঞান হবে। তাত্ত্বিক জ্ঞান যতই থাকুক বাস্তবিক জ্ঞান যদি না হয় তাহলে সে বারবার ভ্রমিত হতে থাকবে। এমনকি মরীচিকার জ্ঞান যদি কারুর থাকে তারও মরুভূমিতে গিয়ে মরীচিকা দেখার পর এক দুদিন ভ্রম হবে, দুদিন পর বুঝে গেল এটাই মরীচিকা। কিন্তু তারপরেও যখন মরীচিকা আসবে তখন কি সে বুঝতে পারবে এটা মরীচিকা? বুঝতে পারবে না, আবার ভ্রম হবে। এটাই মায়া। কিন্তু যে জায়গাতে জানা হয়ে গেল সেই জায়গাতে আর কখন ভ্রম হবে না।

নানান পথ দিয়ে যেতে যেতে যখন আত্মজ্ঞান হয়ে গেল তখনই মায়ার স্বরূপ জানা হয়ে যায়। **মায়ার স্বরূপ = নাম, রূপ আর কর্ম। এটাই আবার তিনটে রূপে আসে – ক্রিয়া, কারক ও ফল।** যদিও মায়াকে অনেক ভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু বেদান্ত মায়াকে এই দুটি রূপে ব্যাখ্যা করে। প্রথমটা হল নাম, রূপ আর

কর্ম আর দ্বিতীয় ক্রিয়া, কারক ও ফল। যেখানে কোন বস্তুর নামকরণ করা হয়েছে বুঝতে হবে এটা মায়া, যেখানেই কোন রূপ বা আকার আছে তার মানে এটাই মায়া। অন্য দিকে আবার ক্রিয়া, কারক আর ফল আছে। যেখানেই যে কোন ধরণের ক্রিয়া থাকবে তখন সেটাই মায়া। আর যেখানেই কারকের বিভক্তি লেগে যাচ্ছে সেটাও মায়া আর ক্রিয়ার যে ফল সেটাও মায়া। নাম, রূপ ও কর্ম আর তার সাথে ক্রিয়া, কারক ও ফল এটাই মায়ার স্বরূপ। শুদ্ধ আত্মার উপর যখন মায়ার আবরণ এসে যায় তখন তার একটা নামকরণ হয়ে যায়, তার একটা রূপ এসে যায়, সে ক্রিয়া করতে শুরু করে দেয়, শুধু তাই নয়, ক্রিয়া করার জন্য তার নানা রকম বিভাজন হয়ে যায়, বিভক্তি হয়ে গিয়ে প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া পর পর সব হতে শুরু করে। সেখান থেকে তার ফল হতে শুরু করে। সেই ফলের আবার একটা নাম হয়, একটা রূপ হয়, অনন্ত রূপে এই খেলা চলতেই থাকে। তাহলে মায়ার বাইরে আছেটা কি? এমন কোন কিছু কি আছে যেখানে নাম নেই, রূপ নেই আর কর্ম নেই? সেইজন্য বেদান্ত বলছে জগতটা মায়া ছাড়া কিছু নয়। মন থেকে বানিয়ে, কল্পনা করে যে কিছু বলছেন তা নয়, এটাই ধ্রুব সত্য। এনারা বাস্তবিক এভাবেই দেখেন। যিনি এটা বুঝে গেলেন, আচার্য বলছেন *স্বরূপদর্শনেনৈব*, এই জ্ঞান যাঁর হয়ে যায় তখন তাঁর নিজের যে বাস্তবিক স্বরূপ, সেই স্বরূপের জ্ঞান হয়ে যায়। উপনিষদের কথার পেছনে কিছু তো সত্য আছে, এই সত্যকে যখন জানা হবে, কিভাবে জানা হবে, এর আগের আগের মন্ত্রে সবিস্তারে বলা হল, যেমন শরীর থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে টেনে সরিয়ে আনতে হয়, টেনে আনার পর সেই ইন্দ্রিয়কে মনের মধ্যে লয় করতে হয়, মনকে বুদ্ধিতে লয় করতে হয়, একটা একটা করে পেছনের দিকে যাচ্ছে, শেষে নিজের স্বরূপে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। নিজের স্বরূপে দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর কি হয় বলতে গিয়ে বলছেন *স্বস্থঃ*, স্বস্থঃ মানে নিজেতে বাস করা, নিজের স্থানে থাকা। আমরা যেমন অপরকে জিজ্ঞেস করি, সুস্থ আছেন তো, সুস্থ থাকা মানে স্বস্থ। তোমার যেমনটি থাকা উচিৎ তেমনটি আছ। মানুষ ঠিক ঠিক কখন যেমনটি থাকার তেমনটি থাকে? যখন সে নিজের স্থানে গিয়ে স্থিত হবে। নিজেতে বলতে কি বলতে চাইছেন? আত্মাই তার ঠিক ঠিক নিজের স্থান, আত্মাতে গিয়ে যখন বাস করে তখনই সেটা ঠিক ঠিক স্বস্থঃ হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের পেটের ব্যামো ছিল, হাত ভেঙে ছিল, দাঁত ভেঙে গিয়েছিল, ক্যান্সার ছিল কিন্তু ঠাকুর হলেন স্বস্থঃ। এত ব্যাধি সত্ত্বেও ঠাকুর কেন স্বস্থঃ? কারণ ওনার যে বাস্তবিক স্বরূপ আত্মা, সেই আত্মাতে তিনি বাস করছেন। বাকি যা কিছু হচ্ছিল সব শরীরের হচ্ছিল, তিনি তো শরীর নন। বাড়ি ভেঙে গেলে মানুষ ভেঙে যায় না, আরেকটা বাড়ি তৈরী করে নেবে। শরীর নষ্ট হয়ে গেলে আরেকটা শরীর দাঁড় করিয়ে নেবে।

স্বস্থঃ হয়ে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই মানুষ প্রশান্ত আত্মা হয়ে যাবে। প্রশান্ত আত্মাকে অনেক সময় প্রসন্ন হওয়াও বলে। কিন্তু প্রশান্ত মানে প্রশান্তই। সমুদ্রের একটা নামই প্রশান্ত মহাসাগর, ঐ মহাসাগরে কয়েকটা ঢেউ উঠলে তার গভীরতার কিছু আসে যায় না। আমরা চোখের সামনে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামীজীর জীবন দেখছি, এনাদের ব্যক্তিত্ব এত গভীর যে, উপর উপর অল্প একটু চাঞ্চল্য হলেও ঐ চাঞ্চল্য কখনই গভীরে যাবে না। প্রশান্ত আত্মা যাঁরা তাঁরা সব সময়ই প্রসন্ন চিত্ত হন, কখনই কোন ভাবে অবসাদগ্রস্ত হন না। ঘোড়াওয়ালা আসবে বলে আসেনি, ঠাকুর রাগ করছেন, এতে ঠাকুরের ব্যক্তিত্বে কিছু আসে যায় না। সবাই আনন্দ পেতে চায়, আনন্দের সন্ধানে মানুষ কত কি করছে, কত বই লিখছে, How to be happy, In search of peace and happy। কিন্তু মানুষ যখন নিজের মত থাকে তখন খুশী থাকে, বাচ্চাও নিজের মত থাকতে পারলে খুশী থাকে। বাচ্চার খুশী থাকার একটা পরিভাষা আছে, সে থাকবে, তার খেলনা থাকবে আর তার মা থাকবে, তাতেই সে মস্ত থাকবে। আমাদেরও খুশী থাকার একটা পরিষ্কার পরিভাষা আছে, যাকে ভালোবাসি সে পাশে থাকলে আমরা খুশী থাকি, খাওয়া-পড়া ঠিকভাবে চললে খুশী থাকি। কিন্তু আজ যাকে ভালোবাসছি সে ছেড়ে চলে যেতে পারে, মরে যেতে পারে, এটাই জগতের নিয়ম। বাবা-মা ছেলেমেয়েকে কত বুকে জড়িয়ে মানুষ করছে, কাল সেই সন্তান একটা মেয়ে বা ছেলের জন্য বাবা-মাকে গালাগালি দিয়ে বাড়ি থেকে যখন বেরিয়ে যাবে তখন সব সুখ-শান্তি উড়ে যাবে। কিন্তু ঠিক ঠিক কেউ যদি প্রসন্ন থাকতে চায়, সুখ যদি পেতে চায় এছাড়া কোন গতি নেই। আমি যেটা আসল, সেই আসলে যতক্ষণ আমি বাস না করছি কোন দিন আমি সুখী হতে পারব না। যতই বই লেখা হোক, যতই যা করে নিক সুখপ্রাপ্তি, আনন্দপ্রাপ্তি কোন দিন হবে না। সেইজন্য যে মানুষ যত বেশি আধ্যাত্মিকতায় উন্নত হয় সেই মানুষের জীবনে অবসাদ তত কম আসে। তারও দুঃখ-কষ্ট আসবে, তারও শরীরে ব্যাধির যন্ত্রণা হবে, তারও মনে বেদনা আসে কিন্তু তার shock-absorber

খুব মজবুত থাকে, কারণ সে নিজের ভেতরে ঢুকে যায়। ধর্মপ্রাণ লোক, শুধু ধর্মপ্রাণই নন, যাঁরাই ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতাকে কেন্দ্র করে নিজের দৈনন্দিন জীবনকে একটা রুটিনের মধ্যে বেঁধে রেখেছেন, ভোরে ঘুম থেকে উঠে পড়ছেন, জপ-ধ্যান করছেন, শাস্ত্র পাঠ করছেন, নিয়মিত মন্দিরে যাচ্ছেন, এইভাবে গোটা দিনকে যখন compartmentlise করে দিলেন, তাতেও কিন্তু অনেক ভালো shock-absorbers এসে যায়। একটা কিছু ধাক্কা এল, কিন্তু তখনই মনে পড়ল আমাকে তো এখন শাস্ত্র পাঠ করতে হবে কিংবা আমাকে এখন জপ-ধ্যান করতে হবে। আর যাঁরা আধ্যাত্মিক স্তরে অনেক উন্নত তাঁদের এই ধরণের কোন রুটিন হয়ত থাকে না, কিন্তু ওনাদের ব্যক্তিত্ব এত গভীর যে সেখানে কোন ধরণের চাঞ্চল্য পৌঁছাতে পারে না।

আচার্য শেষে বলছেন, যাঁরা স্বস্থঃ তাঁরা *কৃতকৃত্যো ভবতি*। আধ্যাত্মিক পুরুষের কৃতকৃত্য সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য। মানুষ যদি আনন্দে থাকতে চায় তাহলে গাঁজা খেয়ে নিলেই আনন্দে থাকতে পারে, কিন্তু কৃতকৃত্য কোন দিন হবে না। কৃতকৃত্য মানে জীবনকে ধন্য করে দিচ্ছে, এই ধন্য হওয়াতে সে নিজেও পারে যায় আর আরও অনেককে পারে নিয়ে যায়। তোমার ঈশ্বর দর্শন হয়ে থাকতে পারে, জ্যোতি দর্শনও অবশ্যই হতে পারে কিন্তু যার এইসব দর্শন হয় তার ব্যক্তিত্বে এর প্রকাশ দেখা যায়। প্রথম প্রকাশ হবে, সে মানুষকে আকর্ষিত করে নিজের দিকে টানতে শুরু করে। আমার ভেতরে যদি একটুও আসুরিক বৃত্তি না থাকে তাহলে আমি না চাইলেও সেই লোকটির প্রতি আমি আকর্ষিত হয়ে যাব। সাধারণত বিষয়ী মানুষ বিষয়ের প্রতি আকর্ষিত হয়, কামী পুরুষ বা নারী সুন্দরী মেয়ে বা সুপুরুষ দেখলে আকর্ষিত হয়। কিন্তু যাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য, ঈশ্বর জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বের দিকে তাদের মন নিজে থেকেই আকর্ষিত হয়। তোমার যদি সত্যিকারের আত্মদর্শন হয়ে থাকে তাহলে তোমার পাড়ার লোকই প্রথমে তোমার কাছে ঘুর ঘুর করতে শুরু করে দেবে। ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক পুরুষ সব সময় অপরকেও টানতে থাকেন। ঠাকুর, স্বামীজী, যিশু সবাই মানুষকে আকর্ষণ করতেন। যার ভেতরে একটু সত্ত্বগুণ আছে সে নিজেই এই ধরণের লোকের কাছে ছুটে যাবে। তার মানে কি দাঁড়ায়? তিনি তো নিজে পারে চলে গেছেন তার সাথে আরও দশজনকে টানতে শুরু করেছেন। এটাই কৃতকৃত্য হওয়া। জাগতিক জীবনেও কেউ আইএএস, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেলে আমরা মনে করি সে নিজে ধন্য হয়ে গেল আর নিজের বাবা-মাকেও ধন্য করল। ঠিকই বলছি, কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু যিনি আত্মজ্ঞানের স্তরে চলে যান, জীবনে যেটা উচ্চতম পাওয়া, সেটা তিনি পেয়ে গেছেন। তখন কি হয়? *কুলং পবিত্রং জননীং কৃতার্থা*, তাঁর বংশটাই পবিত্র হয়ে যায় আর তাঁর গর্ভধারিণী ধন্য হয়ে যান। এবার স্বামীজীর জীবনের কথা ভাবুন। কলকাতায় স্বামীজীর স্কুল জীবন অতিবাহিত হয়েছে। সেই সময় নিশ্চয়ই আরও ভালো ছেলে ছিল যাঁরা স্বামীজীর তুলনায় লেখাপড়ায় অনেক ভালো ছিলেন বা পরীক্ষায় ভালো ফল করতেন। নিশ্চয়ই তখন স্বামীজীর মা জানছেন আমার ছেলের থেকে পাড়াপ্রতিবেশীর ছেলেরা ভালো ফল করেছে, আর মা হতাশ হয়ে দেখছেন নরেন পড়াশোনা ফেলে দৌড়ে দৌড়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাচ্ছেন। স্বামীজীর দিদিমা তো আরেক ধাপ এগিয়ে। বিদেশে এত কাণ্ড করে আসার পর বাড়িতে এসেছেন, দিদিমা বলছেন 'ওরে নরেন! সবই তো হল এবার একটা বিয়ে করে ফেল'। এদিকে স্বামীজী তখন বেলুড় মঠ স্থাপন করতে যাচ্ছেন, চারিদিকে দৌড়া-ঝাঁপ করে যাচ্ছেন, ভবিষ্যতের অধ্যাত্ম পিপাসুদের কথা ভেবে তিনি সব কাজ গুছিয়ে রাখছেন। আর তার দিদিমা বলছেন, ওরে নরেন! এবার একটা বিয়ে কর। কারণ তাঁর কাছে কৃতকৃত্য হওয়া মানে একটা বিয়ে করে নেওয়া। একটা নাতবউ ঘরে নিয়ে এলে দিদিমার জীবন কৃতকৃত্য হয়ে যাবে, আর বাকিরা বলছে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার না হতে পারলে জীবনে কিছুই হল না। এরাই ঘোর সংসারী, এদের জীবনের কাহিনী অতটুকুতেই শেষ। কিন্তু স্বামীজীর মত পুরুষরা জানেন, তাঁর কাহিনী যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবে। তাঁর জীবন আদর্শ, তিনি যে বাণী দিয়ে গেছেন, সেই বাণী আর আদর্শকে পাথেয় করে ভবিষ্যতে অনেকেই এই পথে এগোতে থাকবে। এটাই আত্মজ্ঞানের ফল। তিনি নিজে স্বস্থ হয়ে যান, প্রসন্ন চিত্ত হয়ে যান আর কৃতকৃত্য হয়ে যান।

এই জিনিষটাকে কিভাবে করা যাবে, যেটা করলে মানুষ প্রসন্ন চিত্ত হয়ে যায়, কৃতকৃত্য হয়ে যায়? একটা পথের কথা বলা হল, এরপর এই জিনিষটাকেই যেন পুনরাবৃত্তি করে শ্রুতি জীবকুলকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, হে জীব! তোমাকে তো এত কথা বলা হল, এত কথা শুনলে, এত কিছু জানলে এবার কিছু করো, এবার তুমি উঠে দাঁড়াও, জাগো – এটাই এখানে বলছেন *উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত*। আচার্য বলছেন *অনাদ্যবিদ্যাপ্রসুপ্তা উত্তিষ্ঠত হে জন্তবঃ*, উপনিষদ গ্রন্থ মাতৃবৎ, মা যেমন সর্বদা সন্তানের ভালো চাইছে,

মায়ের এক চিন্তা, সন্তানের মঙ্গল কিসে হবে। সন্তান হাজার বার ভুল করলে, হাজার বার বিফল হওয়ার পরেও মা আপ্রাণ চেষ্টা করে যায় তাকে ঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য। এমনকি সন্তান এমন কিছুও যদি চেয়ে বসে যে চাওয়াটা পরিবারের ঐতিহ্য বিরোধী, মা সেটাও পূরণ করে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তার সাথে মা বলতে থাকেন তার জন্য ভালো কোনটা। মায়ের বুদ্ধি হয়ত ভালো নাও হতে পারে, কারণ তিনি বংশ পরম্পরায় দু-চারটে কথা শিখে এসেছেন, জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে অভিজ্ঞতা বশতঃ হয়ত কিছু কথা শিখেছেন, সব কিছু মিলিয়ে কিছু কথাও হয়ত সন্তানকে বলে দিচ্ছেন। কিন্তু সর্বোপরি তিনি সন্তানের মঙ্গল চাইছেন। কঠোপনিষদের মত শ্রুতি গ্রন্থ আমাদের মা, মা যেমন সব সময় ছেলের মঙ্গল চাইছে, বারবার ছেলেকে বলছে, বাবা! তুমি এবার ওঠো, উঠে পড়াশোনা কর, বাবা! ওঠো, আলস্য ছেড়ে এবার কাজে নাম। ঠিক তেমনি শ্রুতি সাধারণ জীবের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য তাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, *অনাদি অবিদ্যা প্রসুপ্তা*, অনাদিকাল থেকে অবিদ্যা বা মায়ার ঘোরে মানুষ ঘুমিয়ে আছে। কোথায় ঘুমিয়ে পড়ে আছে? অজ্ঞানের মধ্যে, এই যে নানাত্ব রূপ তার মধ্যে। একটু আগে যে নাম, রূপ, ক্রিয়া, কারক ও ফলের কথা বলা হল, তার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে আছে।

যিনি এক তিনি বহু রূপে দেখাচ্ছেন, এটাই অবিদ্যা। এই অবিদ্যা কবে থেকে চলে আসছে? অনাদি কাল থেকে, কেউ জানে না কবে থেকে, এর কালকে মাপার কোন পথ নেই। বলছেন ঐ অবিদ্যার মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। কে ঘুমিয়ে আছে? *জন্তবঃ*, সমস্ত জীবকুল। হে জীব! তুমি এবার ওঠো। উঠে *আত্মজ্ঞানাভিমুখা ভবত*, আত্মজ্ঞানের দিকে অভিমুখী হও। *জাগ্রত অজ্ঞাননিদ্রায়া ঘোররূপায়াঃ*, এই যে ঘোররূপা অজ্ঞান নিদ্রা, এই নিদ্রা থেকে এবার জাগো, *সর্বানর্থবীজভূতায়াঃ ক্ষয়ং কুরুত*, সর্ব অনর্থের যে জড় অবিদ্যা, এই অবিদ্যাকে এবার নাশ কর। এটাই স্বামীজীর বিখ্যাত উক্তি Arise! Awake। অনেকে বলবেন, আগে জাগা হবে, জাগার পরেই তো মানুষ উঠে দাঁড়াবে। আসলে তা হয় না, উত্তিষ্ঠিত, উঠে দাঁড়াও আর স্বামীজীর ভাষায় Arise এটাই সঠিক। আমরা এভাবে উপমা দিয়ে বলতে পারি, অনেক উচ্চতায় অক্সিজেন কমতে থাকে, যার ফলে পাহাড়ে বা হিমালয়ের পথে চলতে চলতে পথিকের শক্তি কমে আসে, ধীরে ধীরে সে মাটিতে পড়ে যেতে থাকে। যখন পড়ে যায় তখন তার উপর মৃত্যুরূপী তন্দ্রা নেমে আসে। অমরনাথ, মানস সরোবর যারা গেছেন তাঁরা ভালো জানবেন। পাহাড়ের উচ্চতায় অক্সিজেন কম হওয়ার জন্য শরীরের শক্তিও কমতে থাকে, তখন মৃত্যুরূপী তন্দ্রা আসে। তন্দ্রার ঘোরে সে শুয়ে পড়ে। বন্ধুরা এসে তাকে বলবে, তুমি কি করছ! উঠে দাঁড়াও। তখন শুয়ে থাকতে এত ভালো লাগে যে সে ওখান থেকে উঠতে চাইবে না। এই ভালো লাগাটাই তাকে মৃত্যুর দিকে টানতে থাকে, কিন্তু সে বুঝতে পারে না। ওকে যদি বাঁচাতে হয়, প্রথমে ওকে দাঁড় করাতে হবে।

জীবন সবারই কত মিষ্টি মিষ্টি লাগে, মিষ্টি মিষ্টি লাগছে বলেই জীবনকে আমরা কত ভালোবাসছি। মিষ্টি মিষ্টি লাগাটাই মৃত্যুর চিহ্ন, এটাই *অজ্ঞাননিদ্রায়া* বলছেন, এত মিষ্টি লাগে যে ওখান থেকে উঠে আসতে ইচ্ছে হয় না। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে ক্লান্ত হয়ে মাটিতে শুয়ে আছে। মাটিতে পড়ে আছে আর প্রচুর জোঁক এসে তার শরীরে বসে রক্ত টানতে শুরু করেছে, যত রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে তত শক্তি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। শক্তি ক্ষয় হয়ে এলে আর ওখান থেকে উঠতে ইচ্ছে করবে না। মনে করছে, আমি খুব সুখে আছি, আরামে আছি। যদি তাকে কেউ বাঁচাতে আসে তাকে বলবে, তোমার প্রাণ টেনে নিচ্ছে তুমি আগে ওখান থেকে ওঠ, উঠে আগে তোমার প্রাণটা বাঁচাও, আর তাকিয়ে দেখ তোমার প্রাণ কে টেনে নিচ্ছে। প্রাণ কে নিচ্ছে? ঐ শত শত জোঁক। উঠে দাঁড়িয়ে আগে শরীরটা ঝাড়া দাও, ঝাড়া দিয়ে ওগুলোকে শরীর থেকে আলাদা কর। ওখানে যতক্ষণ পড়ে থাকবে ততক্ষণ জোঁক, কাঠপিপড়ে, লালপিপড়ে তোমাকে ছেঁকে ধরবে। এরা তোমার জীবনের আসল যে প্রাণশক্তি সেই শক্তিকে শুষে নিচ্ছে। তোমার মনে হচ্ছে বেশ আছ, কিচ্ছু বেশ নেই, তোমার জীবনকে নিংড়ে বার করে নিচ্ছে। এখানে দুটো জিনিষকে বলছেন, তুমি যে এভাবে মাটিতে পড়ে আছ আগে সেখান থেকে উঠে দাঁড়াও, উঠে দাঁড়াবার পর তুমি বোঝার চেষ্টা কর এভাবে পড়ে থাকার জন্য তুমি কিভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছিলে, এবার এই জোঁক গুলোকে নাশ কর। জোঁকগুলো তোমার রক্ত শুষে নিচ্ছিল আর তুমি বলছিলে আমি বেশ আছি, কারণ ঐ মৃত্যুরূপী তন্দ্রা তোমাকে ঘিরে ফেলেছিল। একবার উঠে দাঁড়াবার পর এই আলোর জগতকে যখন দেখবে, মুক্তির জগতকে যখন দেখবে তখন বলবে, তাইতো! আমাকে এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তার জন্য তোমার যে ইন্দ্রিয়গুলো এতদিন তোমার প্রাণশক্তিকে নিংড়ে নিচ্ছিল সেই ইন্দ্রিয়গুলিকে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে। এটাই শ্রুতি বলছেন উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, ওঠো! জাগো!, এটাই স্বামীজী

বলছেন Arise! Awake! কোথা থেকে উঠে দাঁড়াতে হবে? এই যে নিদ্রার মোহে পড়ে আছ, মৃত্যুরূপী তন্দ্রা যে তোমাকে ঘিরে রেখেছে, এখান থেকে তুমি আগে উঠে দাঁড়াও। আর জাগো, জাগা মানে অভিমুখী হওয়া। কিসের অভিমুখী হওয়া? জ্ঞানের আলোর প্রতি, তোমার আসল যে জীবন সেই জীবনের অভিমুখী হও। এরপর তুমি চলতে শুরু কর, চারিদিকে মৃত্যু তোমাকে ঘিরে রেখেছে, ঐ জ্ঞানের আলোর অভিমুখী হয়ে এগিয়ে যাও, তা নাহলে তুমি বাঁচতে পারবে না।

সংসার-সুখ মানেও তাই, মৃত্যুরূপী তন্দ্রার সুখ। জগতে যে বস্তু বা মানুষ থেকে তুমি সুখ পাচ্ছ বলে মনে করছ আসলে সেটাই তোমার প্রাণশক্তি শুষে নেওয়ার যন্ত্র। সে যেই হোক, তোমার বাবা-মাও শুষছে, তোমার সন্তানও শুষছে, তোমার স্ত্রীও শুষছে আর তোমার বন্ধুরাও শুষছে। কিন্তু এর প্রতি সুখের অনুভব, ওর প্রতি আনন্দের স্রোত বইছে, কিছু করার নেই, এটাই মৃত্যুরূপী তন্দ্রা হয়ে সবাইকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এক চুমুক মদ খাওয়ার পর একটা কথাই বলতে থাকে, আরেকটু দাও। এর একটা বায়োলজিক্যাল ব্যাখ্যাও আছে, ওর ভেতরে যেভাবে জলের ঘাটতি কমতে থাকে তাতে তার আকাঙ্খাটা বেড়ে যায়। যতক্ষণ সম্পূর্ণ বেহুঁশ না হবে ততক্ষণ সে খাওয়াটা ছাড়বে না। জীবনের ক্ষেত্রেও একই জিনিষ হয়ে চলেছে, যতক্ষণ বিনাশ না হয়ে যায় ততক্ষণ কেউ এখান থেকে বেরোতে চাইবে না। শ্রুতি তাই কি আর করতে পারবে, ঠাকুরের বাণী, স্বামীজীর বাণী এসে আমাকে তো আর ধরে বেঁধে নিয়ে যেতে পারবে না। একটা অবস্থায় গিয়ে মানুষকে নিজের চেষ্টা নিজেকেই করতে হয়। সেটাই শ্রুতি এখানে করছেন। শ্রুতির বাক্য হল, স্বামীজী যেমন বলছেন I am voice without form আমি এক অমূর্ত বাণী, শ্রুতিও ঠিক তাই voice without form। এই বাণী সব সময়ই আছে, এ্যলার্ম ঘড়িতে যেমন টাইম সেট করা থাকে, আর ঠিক সময়ে ঘড়ি আমাকে মনে করিয়ে দেয় তুমি এবার ওঠো, তুমি এবার ওঠো। মৃত্যরূপী তন্দ্রা থেকে তো আমাদের জাগাতে পারবে না, সেখানে আমাকেই রিমাইণ্ডার দিতে হবে ওঠো, ওঠো, ওঠো। যেমন যেমন রিংটোন সেট করা হবে তেমন তেমন আওয়াজ করবে। এই বাণীই আধ্যাত্মিক জীবনের রিংটোন। তোমার একটা সময় এসেছে, তোমার এ্যলার্ম বাজতে শুরু হয়ে গেল, তুমি শুনতে শুরু করলে, এ্যলার্মে বাজছে ওঠো! জাগো! এবার তুমি ধর্মপথে এগোও। বাকিদের এখনও এ্যলার্ম বাজতে শুরু হয়নি। এ্যলার্ম বাজলে বেশির ভাগ লোক হাত বাড়িয়ে এ্যলার্ম বন্ধ করে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। এ্যলার্মের কাজ শুধু রিমাইণ্ড দেওয়া, এর বেশি কিছু করতে পারবে না। কারুর এ্যলার্ম বেজে বেজে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তাও ঘুম ভাঙছে না, আবার কেউ নিজেই ঘড়িতে চড় মেরে এ্যলার্মটা বন্ধ করে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। সবাইকেই উঠতে হবে, আজ উঠুক আর কালই উঠুক। আমাদের তো আর খ্রীষ্টান আর মুসলমান ধর্মের মত নয় যে, তুমি যদি এগিয়ে না যাও তাহলে চিরদিনের মত নরকে চলে যাবে। আমাদের তা নয়, মুক্তি সবারই হবে, কারুর একদিন আগে হবে কারুর দুদিন পরে হবে, হবে সবারই। একটা সময়ে সবারই হবে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এখন তুমি উঠতে চাইছ কিনা তুমি নিজে ভেবে দেখ। তুমি ভেবে দেখ তোমার মধ্যে এখন কোন কষ্ট হচ্ছে কিনা, থেকে থেকে তুমি অবসাদগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছ কিনা, নৈরাশ্য তোমাকে গ্রাস করে নিচ্ছে কিনা আর এই সংসারটা অসার, কিছুই নেই, শুধু দুঃখ আর যন্ত্রণা, এই বোধ তোমার আসা শুরু হয়েছে কিনা। একটা ভাত টিপেই বোঝা যায় পুরো হাড়ির ভাত সেদ্ধ হয়েছে কিনা। সমাজেও ঠিক তাই, একটা যদি বাজে লোক থাকে তাহলে সবটাই বাজে হবে। একবার যদি কেউ তোমাকে ধোকা দিয়ে থাকে তাহলে জানবে সবাই তোমাকে ধোকা দেবে। কেউই অন্য রকম হবে না। একটা মানুষ তোমাকে কষ্ট দিয়েছে তার মানে সবাই তোমাকে কষ্ট দেবে।

এই বিশ্বসংসার হল এক সর্পনগরী, এখানে সবাই সাপ, আমি একটা সাপ তুমি আরেকটা সাপ, আমি তোমাকে ছোবল দেব তুমি আমাকে ছোবল দেবে, আমরা তাই করে যাচ্ছি। সাপের শরীর সিল্কের মত মসৃন আর মখমলের মত নরম, শরীরে শীতলতার স্পর্শ। গায়ের উপর দিয়ে চলে গেলে মনে হবে কত নরম শীতল কিছু শরীরকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। অথচ একটা ছোবলেই জীবন শেষ। মানুষের তুলনা যদি কারুর সাথে করতে হয় তাহলে সাপের সাথে তুলনা সব থেকে কাছের। আমরা সবাই যার যার একটা এরিয়া ঠিক করে রেখেছি যাতে অন্য সাপ না ঢুকতে পারে, কিন্তু সব সাপ এরিয়ার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। একবার যদি তুমি এই জিনিষকে বুঝে নাও, তখন তুমি বলবে, বাপরে বাপ! এই অবস্থা! আমার ভাই কিছু লাগবে না, এখান থেকে আগে আমাকে পালিয়ে বাঁচতে হবে, বেরোও এখান থেকে, কে কখন কাকে ছোবল মারবে কে জানে। কিন্তু আমাদের

সবার এমনই স্বভাব যে, যাকেই একবার ভালোবেসে ফেলি মনে করি আর যাই হোক এ আমাকে কোন দিন ছোবল মারবে না। স্বামী স্ত্রীকে ভালোবাসছে, মা সন্তানকে ভালোবাসে, স্বামী ভাবছে আমার স্ত্রী কোন দিন আমাকে ছোবল মারবে না, স্ত্রী ভাবছে আমার স্বামী আমাকে কোন দিন ছোবল মারবে না, মা ভাবছে আমার সন্তান আমাকে কোন দিন ছোবল মারবে না। কিন্তু স্বামীও ভুলে যাচ্ছে আর স্ত্রীও ভুলে যাচ্ছে যে তারা দুজনেই সর্প। কোন দিন কার লেজে পা পড়বে আর কে কাকে ছোবল মারবে কিছু বলা যায় না। এটাই সংসারের চিরন্তন নিয়ম। যে এটা বুঝে গেল, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে শ্রুতি বলছেন, তোমার ঘুম ভেঙেছে কি, তুমি কি বুঝতে পারছ কারুর লেজে পা পড়লে তোমার কি চরম অবস্থা হবে? তুমি কাউকে ভালোবেসেছ সে হঠাৎ মরে গেল, সেও এই একই জিনিষ, মরে গিয়ে তোমাকে ছোবল দিল। ছোবল মারা মানে, তোমাকে কষ্টটা তো দিয়েই দিল। স্বামীকে স্ত্রী ভালোবাসে, একদিন দেখল স্বামী আরেকটি মেয়েকে নিয়ে ঘুরছে, ছোবল তো মেরেই দিল। ছোবল তো এক রকমের হয় না, সংসারে হাজার রকমের ছোবল হয়। যেভাবেই ছোবল মারা হোক, কষ্টটা তোমার থাকবেই। আর ভাই তুমি জেনে রাখ, জগতে তুমি যা কিছুই কর না কেন, ছোবল তোমাকে খেতেই হবে। একমাত্র মানুষ যখন আত্মজ্ঞানের দিকে যায়, তখনও ছোবল খাবে, আশপাশের লোকেরা তাকে গালাগাল দেবে, ঠাকুর বলছেন স্ত্রী আপশোষ করে বলে এমন লোকের সাথে বাবা বিয়ে দিলে যে কিনা সারাদিন ঠাকুর ঠাকুর করে যাচ্ছে, না ছেলেকে একটু ভাল খাওয়াতে পারলুম, না আমি একটু সখ-আহ্লাদ করতে পারলুম, কিন্তু সেইই ধীরে ধীরে স্বস্থ, প্রসন্নতার দিকে এগোতে থাকে।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, ওহে! তুমি কি বুঝেছ তুমি একটা সর্প নগরীতে বাস করছ, আর তুমিও একটি সর্প! হ্যাঁ! বুঝেছি। তাহলে এবার এগিয়ে চল, তুমি বোঝ আমাকে বিদ্যাভিমুখী হতে হবে, আমাকে জ্ঞানাভিমুখী হতে হবে, আমাকে জ্ঞানপ্রাপ্ত করতে হবে, আত্মজ্ঞান পাওয়া ছাড়া এর থেকে বাঁচার আর কোন পথ নেই। আর বলছেন, *প্রাপ্য বরান্, বরান্* মানে যিনি বরণীয়, আচার্য বলছেন *প্রকৃষ্টান্ আচার্যান্*, যিনি আত্মজ্ঞানে একেবারে সুপ্রতিষ্ঠ, যাঁর কথা শুনলে তোমার অন্তরাত্মা জেগে উঠবেন। *প্রাপ্য উপগম্য বরান্*, এই অনাদি অবিদ্যা, অজ্ঞান নাশের জন্য এই রকম শ্রেষ্ঠ আত্মজ্ঞানী আচার্যকে বরণ করে নিতে হবে, তাঁর কাছে গিয়ে উপবেশন করতে হবে। আর *নিবোধত*, তাঁর কাছে জান। কি জানবে? আত্মজ্ঞানের রহস্য জান। *সর্বান্তরমাত্মানম্ 'অহমস্মি'*, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় যা কিছু আছে, সব কিছুর যে আত্মা, তার যে সার, যেটা সব কিছুর মূল, সেটা আমি। আত্মা মানে তাই। আত্মা বলতে লোকেদের প্রায়ই এই ধারণা যে, আমার ভেতরে কিছু একটা আছে, সেটা জ্বলজ্বল করছে, যেটা দেখে নিলেই আত্মজ্ঞান হয়ে যায়। আত্মজ্ঞান তা নয়, আত্মজ্ঞান মানে, বস্তুর যেটা সম্পূর্ণ রূপ সেটাকে দেখা। একটা জিনিষ, তার যে একত্ব, সব কিছুর সাথে সে এক, এই জিনিষটাকে জানাই আত্মজ্ঞান। যাঁরা এদিকে এগোতে শুরু করেন তাঁরা প্রথমে দেখেন তাঁর ভেতরে যে আসল বস্তুটি রয়েছে সেটি চৈতন্য স্বরূপ, সেখানে জড় বলে কিছু নেই। তারপরে তাঁরা দেখেন যাবতীয় যা কিছু আছে সব কিছুর মধ্যে সেই চৈতন্য আর আমার মধ্যে যে চৈতন্য আর সেই চৈতন্য এক, এক চৈতন্যই আছে অন্য আর কিছু নেই। তখন তিনি বোধে ঐ সম্পূর্ণকে গ্রহণ করতে পারেন, যাবতীয় যা কিছু আছে, সাপ, বিছেও আমি হয়েছি, ভালো যা কিছু আছে আমিই, মন্দ যা কিছু আছে আমিই। আমি বলতে ব্যক্তি রূপে নাম রূপে যে আমি সেই আমি নয়, আমার যে বাস্তবিক আমি সেই আমি। প্রথমে নিজের যে বাস্তবিক আমি সেই আমিকে জানতে পারেন, তারপর দেখেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবারই যে আমি সেই আমিটাও আমি। বলছেন, প্রথমে আচার্যের কাছে গিয়ে এটাকে জান। জানলেই সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি হবে না, এরপর এই জিনিষটাকে পাওয়ার জন্য তোমাকে এগোতে হবে। শ্রুতি মায়ের মত আমাদের এই কথা বলে দিচ্ছেন। এটুকু জানার পর এবার তুমি এগিয়ে চল।

আর তুমি জেনে রাখ, তোমাকে যে পথ দিয়ে যেতে হবে সেই পথ অতি দুর্গম কঠিন পথ। কি রকম দুর্গম? বলছেন, *ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া*। একটা ক্ষুর বা তরোয়ালকে পাথরে ঘষে ঘষে এমন ধারালো করা হয়েছে যে একটু ছোঁয়া লাগলেই খ্যাঁচ করে কেটে যাবে। ঐ ধারাল ক্ষুরের উপর দিয়ে তোমাকে হেটে যেতে হবে। ক্ষুরের ধারের উপর দিয়ে চলা কত কঠিন, অসম্ভব, আধ্যাত্মিক জীবনে চলা ততটাই কঠিন। তাহলে চলবে কি করে? প্রশ্নের উত্তর জানার আগে জানতে হবে ধারালো ক্ষুর কোন জিনিষকে কাটে। প্রথম শর্ত হল, ক্ষুর যেটাকে কাটবে সেটা ক্ষুরের ধারালো অংশের থেকে মোটা হতে হবে। ক্ষুরের ধারালো অংশের থেকে সরু জিনিষকে ক্ষুর কখনই কাটতে পারবে না। উপমার জন্য ক্ষুরকে যদি একটা খুব শক্তিশালী

মাইক্রোস্কোপে ফেলে দেখা হয়, ধরুন দেখা গেল ক্ষুরের ধারালো অংশটা এক মিলি মিটার চওড়া। এক মিলি মিটার থেকে চওড়া যা কিছু হবে সব কিছুকে ক্ষুর কেটে দেবে, কারণ সে নিজে এক মিলি মিটার। পাঁচ মিলি মিটার চওড়া জিনিষকে খ্যাঁচ করে কেটে দেবে, দুই মিলি মিটারকেও কেটে দেবে, কিন্তু এক মিলি মিটার চওড়া যদি কোন জিনিষ হয় তখন সমানে সমানে ধারে ধারে লেগে যাবে। আর যদি পয়েন্ট ফাইভ মিলি মিটার বা পয়েন্ট ওয়ান মিলি মিটার হয়? আর কাটতে পারবে না। যত সূক্ষ্ম হবে তত আর কাটতে পারবে না। বুদ্ধি যদি তোমার সূক্ষ্ম হয় তাহলে আর তোমাকে কাটতে পারবে না। এই জিনিষটাকেই বোঝাবার জন্য দশ নম্বর মন্ত্র থেকে শুরু করেছিলেন আর আমরা এত দীর্ঘ আলোচনা করে যাচ্ছিলাম। *ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা* থেকে শুরু হয়ে এখানে এসে তার উপসংহার টানছেন। *ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা* দিয়ে বলতে চাইছেন, আধ্যাত্মিক জীবনে চলতে গেলে তোমাকে খ্যাঁচ করে কেটে উড়িয়ে দেবে, কারণ তোমার মন, বুদ্ধি হল ভোঁতা। আর যখন তুমি শুধু ইন্দ্রিয় নিয়ে চলছ তখনও তোমাকে খ্যাঁচ করে কেটে দেবে। কখন কাটতে পারবে না? যখন সমানে সমানে হয়ে যাবে। সমানে সমানে মানে, তুমি ইন্দ্রিয়ের জগতকে পার করে দিয়েছ, মনের জগতকে অতিক্রম করে এসেছে, বুদ্ধির জগতকেও ছাড়িয়ে গেলে, তুমি নিজেকে আরও সূক্ষ্ম করে নিলে এবার আর তোমাকে কাটতে পারবে না। এই কারণেই বলছেন *ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া*, আধ্যাত্মিক পথ অতি দুর্গম। আমরা খুব সহজে বলে দিই, আধ্যাত্মিক জীবনে চলা খুব কঠিন, কিন্তু তা নয়। তুমি যদি ঐ জিনিষটাকে পেতে চাও, কোনটাকে পেতে হবে? *নিবোধত*, যে জিনিষটাকে তুমি জেনেছ। কার কাছে? *প্রাপ্য বরান্*, শ্রেষ্ঠ আচার্যের কাছে যে জ্ঞান পেয়েছ, ঐ জ্ঞান যদি তুমি পেতে চাও তোমার বুদ্ধিকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম হতে হবে। বুদ্ধি যদি অত্যন্ত সূক্ষ্ম না হয় তাহলে তোমাকে কেটে ফেলে দেবে, আর তুমি এগোতে পারবে না। ঐ তীক্ষ্ণ ধারালো তরোয়ালের উপর দিয়ে সাধারণ মানুষ কখনই চলতে পারবে না। তাহলে কে চলতে পারবে? যার বুদ্ধি অত্যন্ত সূক্ষ্ম।

অন্য ভাবে বুঝতে হলে আমাদের সেই ওয়ান মিলি মিটার তরোয়ালের ধারকে নিয়ে আসতে হবে। এবার ঐ তরোয়ালের ধারকেও কাটতে হবে। কিভাবে কাটা যাবে? তার থেকেও সূক্ষ্ম ধারালো যদি কিছু থাকে। কে কাটবে? তোমার বুদ্ধিই সেটা কাটবে। লেজারের ধারের মাপ মিলি মিটার দিয়েও আসে না, সেটা মাইক্রোনে চলে যায়। লেজার ঐ তরোয়ালকেও মাঝখান দিয়ে চিরে দিয়ে বেরিয়ে যাবে। ব্লেড কত পাতলা, সেই ব্লেডকেও লেজার চিড়ে দেবে। তোমার যে বুদ্ধি হবে তাকেও ঐ লেজারের মত তীক্ষ্ণ ধারালো হতে হবে। দুটো তলোয়ার আছে, আর দুটো লেজার দুটো তলোয়ারের ধারের উপর দিয়ে চলছে, যেতে যেতে পরস্পর কথা বলছে, তোর পথ কেমন? একেবারে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, আর তোর পথ কেমন? আমারটা তো ন্যাশানাল হাইওয়ে, আমি তো দৌড়াচ্ছি। কিন্তু তুমি যখন যাবে তোমার পা কেটে বেরিয়ে যাবে, কারণ তোমার পা ভোঁতা। বড় গাড়ি সরু রাস্থা দিয়ে যেতে গিয়ে বলছে চলতে পারছি না, এত সরু রাস্থা। আর যে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে সে বলছে, বাবা! এত চওড়া রাস্থা। যে জিনিষটা একজনের কাছে সরু, সেটাই আরেকজনের কাছে বিরাট চওড়া। এখানে তো সত্যিকারের হাটার কথা বলছে না, বলছেন আধ্যাত্মিক পথ এত সূক্ষ্ম যে এই পথ দিয়ে হাটা যায় না। কিন্তু তোমার বুদ্ধিকে এত সূক্ষ্ম হতে হবে যে, যে পথ তোমাকে দেওয়া হয়েছে সেই পথকে তোমার রাজপথের মত মনে হবে। কেদারবদ্রী পাহাড়ের পথ কত দুর্গম, কত সরু পথ। এতই সরু যে দুটো ঘোড়া মুখোমুখি হয়ে গেলে ওখানেই থেমে যেতে হবে। আর তোমার এই ভোঁতকা শরীর, আর সেই ভোঁতকা শরীরের উপর নিজের অহঙ্কারের পুটলি, মনের পুটলি, ইন্দ্রিয়ের পুটলি নিয়ে ঐ পথ দিয়ে চলেছ। ঐ সরু পথ দিয়ে যেতে হলে তোমাকেও সরু হতে হবে। আর তুমি হাতি ঘোড়া, বড় বড় রথ নিয়ে বলছ আমি কেদারনাথ, অমরনাথ যাত্রা করব, সে কি কখন সম্ভব! একটা পা রাখতেই কত কষ্ট, সেখানে তুমি বলছ এত কিছু নিয়ে যাবে। আধ্যাত্মিক যাত্রার পথ কত দুর্গম হয় বোঝানর জন্য বলছেন *ক্ষুরস্য ধারা*। তোমার মন যদি ঐ ক্ষুরের ধারের থেকেও সূক্ষ্ম হয় তাহলে তুমি ওর উপর দিয়ে দৌড়ে যেতে পারবে।

দুর্গং পথস্তৎ কে বলছেন? *কবয়ো বদন্তি*, মেধাবী পুরুষরা বলছেন। *সূক্ষ্মত্বাৎ তদ্বিষয়স্য জ্ঞানমার্গস্য দুঃসম্পাদ্যত্বং*, যেটা জ্ঞেয়, আত্মজ্ঞান এত সূক্ষ্ম যে মণীষীরা বলেন জ্ঞানমার্গের পথ, আত্মজ্ঞানের পথ দুরূহ, যেমন যেমন এগিয়ে যেতে থাকবে তেমন তেমন পথ তীক্ষ্ণ হতে থাকে। যত সরু হবে তোমাকেও তত সরু হতে হবে। পথ আরও সরু হয়ে গেলে তোমাকে আরও সরু হতে হবে। শেষে ব্লেডের মত পথ হয়ে গেলে তোমাকে লেজার হয়ে যেতে হবে। লেজারের মত সরু হয়ে গেলে তবেই তুমি যেতে পারবে, তা নাহলে আর

যেতে পারবে না। এটাই এই মন্ত্রের বক্তব্য, *উত্তিষ্ঠত*, ওঠো! তুমি যে দুরবস্থায় পড়ে আছ, কেদারের পথে যাচ্ছিলে এক জায়গায় ক্লান্ত হয়ে তুমি বসে গেলে, ওখানেই তোমার মৃত্যু, আর তোমার এগোতে হবে না, তুমি ওঠো। *জাগ্রত*, জাগো, জানো তোমার লক্ষ্যটা কি, কোন পথে যাবে জান। কার কাছে জানবে? যিনি পথের সন্ধান জানেন তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর। আর তিনি তোমাকে বলে দেবেন এই পথ খুব সরু, এত পোটলা-পুটলি নিয়ে যাওয়া যাবে না। পোটলা-পুটলি গুলো এখানে ছেড়ে দাও, সামনে খুব দুর্গম সঙ্কীর্ণ রাস্তা। এবার তুমি তাঁর নির্দেশ মত এগিয়ে চল। এটাই হল জ্ঞানের পথ। এখানে সেই অবস্থার সাথে সংযোগ করা হচ্ছে যেখানে বলেছিলেন সাধক নিজেকে স্বস্থ মনে করছে, প্রসন্ন মনে করে আর কৃতকৃত্য হয়ে যায়। এই যে অবস্থার কথা বলা হল, ঐ অবস্থায় যাওয়া যায়, অনন্ত সুখপ্রাপ্তি হবে কিন্তু তার পথ এই রকম। কিন্তু তুমি যে এই নেশার ঘোরে শুয়ে আছ, এই নেশাকে ছেড়ে আগে উঠে দাঁড়াও, তারপর যে আচার্য সব কিছু জানেন সেই আচার্যের কাছে যাও, তিনি কি বলছেন ভালো করে অনুধাবন করে সেই অনুসারে এগিয়ে যাও। শুনে গেলে, জেনে গেলে কিছুই হবে না, তোমাকে নিজে এবার হাটতে হবে। পরের মন্ত্রে গিয়ে আবার বলছেন –

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।।১/৩/১৫।।

(যিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-বিহীন, যিনি অক্ষয় শাশ্বত অনাদি ও অনন্ত, যিনি মহত্তত্ব থেকে বিলক্ষণ ও কূটস্থ নিত্য, তাঁকে জানলে সাধক মৃত্যুমুখ থেকে বিমুক্ত হয়ে যান।)

মন্ত্রের আলোচনা শুরু করার আগে সৃষ্টির ব্যাপারটা আবার আমাদের একটু স্মরণ করতে হবে। কেউ বলে সৃষ্টি ভগবানের ইচ্ছা, বিজ্ঞানীদের সৃষ্টির ব্যাপারে একটা নিজস্ব ব্যাখ্যা আছে। বেদান্ত আবার সাংখ্য মতের উপর ভিত্তি করে সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু আমাদের জীবনকে আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যের দিকে রেখে খুব যুক্তি দিয়ে যদি সৃষ্টিকে দেখা হয় তখন দেখা যায় এই জগৎ যে রকমই থাকুক, যেভাবেই এই জগতের সৃষ্টি হয়ে থাকুক না কেন, আর বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত যত রকম উপাদানই সৃষ্টিতে থাকুক, আমি যখন জগতকে দেখছি তখন আমার ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই দেখছি। জগৎ ইলেক্ট্রন প্রোটন দিয়ে তৈরী নাকি হাইড্রোজেন অক্সিজেন দিয়ে তৈরী তাতে আমার কিছু আসে যায় না। হাইড্রোজেন অক্সিজেন দিয়ে জগৎ তৈরী হলেও আমি আমার পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়েই জগতকে অনুভব করব। অন্য ভাবেও যদি জগৎ নির্মিত হয়ে থাকে তখনও আমি এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়েই জগতের সব কিছুকে গ্রহণ করব। আগামীকাল বিজ্ঞান আরও দশটা নতুন element আবিষ্কার করুক না কেন তাতে আমার কিছু আসে যায় না। কারণ যে নতুন ধাতু আবিষ্কার হবে সেগুলিকেও এই পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়েই নেব। সেইজন্য বিজ্ঞান যতই এগিয়ে যাক বেদান্ত কখনই পাল্টাবে না, বেদান্ত যা আছে তাই থাকবে। কারণ আমাদের ইন্দ্রিয় কখনই পাল্টাবে না, যদি ইন্দ্রিয় পাল্টে যায় তখন একটা শব্দ শুধু জুড়ে দিলেই জিনিষটা যেমন ছিল তেমন থাকবে। আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে আমরা পাঁচটি বস্তুকে গ্রহণ করি, যেটাকে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বলছে। এই পাঁচটি তন্মাত্র দিয়েই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচিত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যখন ফিজিক্সের মত দিয়ে যাবে তখন অন্য ভাবে নির্মাণ হচ্ছে, তাতেও আমাদের কিছুই আসবে যাবে না। যা দিয়েই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নির্মিত হয়ে থাকুক না কেন, শেষে আমি যখন এই জগতকে নেব তখন আমার চোখ, কান, নাক দিয়েই জগতকে নেব।

বেদান্ত বলছে আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল আর জল থেকে পৃথিবীর উৎপত্তি। পৃথিবীতে এসে এই পাঁচটি তন্মাত্রাই মিশে যায় আর পৃথিবী তত্ত্বে পাঁচটি ইন্দ্রিয় এবং পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি তত্ত্ব সবটাই ওর মধ্যে মিশে রয়েছে। সেইজন্য তন্মাত্রার মধ্যে পৃথিবী সব থেকে স্থুল তন্মাত্রা। দেহেও পৃথিবী তত্ত্বের আধিক্য সব থেকে বেশি। শরীরে তাই পাঁচটি তত্ত্বকেই পাওয়া যায়। যদি এমন হয়, কারুর শরীর পাঁচটি তত্ত্বের বদলে চারটি তত্ত্ব দিয়ে নির্মিত, সে তখন জগতকে অন্য রকম দেখবে। যদি তিনটে তত্ত্ব দিয়ে তৈরী হয় সে আরও অন্য ভাবে জগতকে দেখবে। যদি কোন মানুষ পৃথিবী তত্ত্বের যে বৈশিষ্ট্য গন্ধ, এই বৈশিষ্ট্যকে যদি অতিক্রম করে যায়, সে তখন এই জগতকে অনেক সূক্ষ্ম রূপে দেখবে। যদি কেউ ইন্দ্রিয়কে

এমন ভাবে জয় করে নেয় যেখানে সে গন্ধ তন্মাত্রাকে জয় করে নিল। যে গ্ল্যাণ্ডের সাহায্যে নাক দিয়ে গন্ধ অনুভব করি, সেই গ্ল্যাণ্ডকে কেটে বাদ দিয়ে না, যোগ পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয়কে জয় করে নিয়েছে, তখন তার কাছে জগতটা পাল্টে যাবে, তখন দেখবে জগতটা আরও সূক্ষ্ম। এরপর যদি রসতত্ত্বকেও জয় করে নেয় তখন দেখবে জগতটা আরও সূক্ষ্ম। আমরা যে অর্থে গন্ধ, রস বলছি এই গন্ধ বা রস সেই অর্থে নয়। আমাদের দৃষ্টি খুব স্থূল তাই জগতকে আমরা এভাবে স্থূল রূপে দেখছি, কিন্তু মন যখন সূক্ষ্ম হয়ে যায় তখন সে এত কিছু স্থূল জিনিষ দেখে না, জগতের পেছনে যে শক্তি কাজ করছে সেটাকে দেখে। স্বামীজী বলছেন, তখন ইলেক্ট্রিসিটি কোন পদার্থ নাকি শক্তি তফাৎ করা যায় না। অর্থাৎ জিনিষটা সূক্ষ্ম হয়ে গেলে জগতের ধারণাটাও পাল্টে যাবে। আরও যখন পিছিয়ে যায় তখন দেখে সবটাই মনের শক্তি। এখানে বলতে চাইছেন, যোগীরা যখন এক একটা তত্ত্বকে জয় করতে শুরু করেন তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আরও সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর দেখতে থাকেন। প্রথমে গন্ধ তত্ত্ব পড়ে যাচ্ছে, তারপরে পড়ে যায় রসতত্ত্ব, তারপরে একে একে অগ্নি তত্ত্ব, বায়ু তত্ত্ব পড়ে যেতে থাকে। শেষ তত্ত্ব থেকে যায় আকাশ তত্ত্ব। কোন ঋষি যিনি এই জিনিষগুলোকে দেখেছেন, তিনি এক একটা তত্ত্বকে জয় করতে শুরু করার পর তাঁর মন এত সূক্ষ্ম হয়ে যাচ্ছে সব থেকে যেটা স্থূল জিনিষ ছিল সেখান থেকে আরও পেছনের দিকে চলে এসেছেন।

মনে করা যাক কয়েকটা বৃত্ত আছে। সব থেকে ভেতরের বৃত্তে বড় বড় পাথর আছে, তার পেছনে যে বৃত্ত সেখানে বালি আছে, পরের বৃত্তে জল আর শেষ বৃত্তে বায়ু। প্রত্যেকটি বৃত্তে জালি লাগানো আছে। পাথরের বৃত্তের চারিদিকে মোটা জালি, বালির বৃত্তের জালি তার থেকে আরেকটু সুক্ষ্ম, এইভাবে বায়ুতে গিয়ে একেবারে সূক্ষ্মতম জালি লাগানো আছে। জালির স্থূল আর সূক্ষ্মের তারতম্যের জন্য বায়ু পাথর পর্যন্ত চলে যেতে পারবে কিন্তু পাথর বায়ুর বৃত্তে পৌঁছাতে পারবে না। আমাদের মন এখন পাথরের বৃত্তের মধ্যেই ঘুরছে, পাথরের বৃত্তে সবটাই আছে, পাথর তো আছেই তার সাথে বালি আছে, জল আছে আর বায়ুও আছে, কিন্তু আধিক্য পাথরের। আমাদের সবারই মন এই স্থূল পর্যায়ে পড়ে আছে তাই পৃথিবী তত্ত্বকেই আমরা নিতে পারি। কিন্তু যার মন একটু সূক্ষ্ম হয়ে গেল সে এবার বালির বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করে গেল, এখন সে পাথরের বৃত্তেও যেতে পারছে আবার বালির বৃত্তেও আসতে পারছে, এতক্ষণ শুধু পাথরের বৃত্তের মধ্যেই পড়েছিল। এরপর আরও যখন সূক্ষ্ম হয়ে গেল তখন জলের বৃত্তের মধ্যে এবার সে আসতে পারছে, সে এখন তিনটে বৃত্তের মধ্যে আনাগোনা করতে পারবে। আরও সূক্ষ্ম হতে হতে বাতাসের মত সূক্ষ্ম হয়ে গেল, এখন বায়ুর বৃহৎ বৃত্ত থেকে পাথরের ছোট্ট বৃত্তে সবটার মধ্যেই সে আসা-যাওয়া করতে পারছে, জলের বৃত্তেও থাকছে, বালি মধ্যেও থেকে যাচ্ছে আর পাথরের মধ্যেও থাকছে। আমরা সবাই পৃথিবীলোকের বাসিন্দা, যে তত্ত্বের মধ্যে বাকি চারটে তত্ত্ব মিশে রয়েছে, সেই গন্ধতত্ত্বেই সবাই পড়ে আছি। পাথরের ঐ ছোট্ট এতটুকু বৃত্তের মধ্যে আমাদের জীবনের সব খেলা চলছে। আমাদের শরীরও তাই, ইন্দ্রিয়গুলিও তাই। যেমন যেমন ইন্দ্রিয়গুলি সূক্ষ্ম হতে থাকে তেমন তেমন তার মন সূক্ষ্ম হচ্ছে, যেমন যেমন মন সূক্ষ্ম হতে থাকে তেমন তেমন সে এক একটা তত্ত্বকে জয় করে নেয়। আমরা এখন কোন তত্ত্বকেই জয় করতে পারছি না, পৃথিবী তত্ত্বের মধ্যেই সবাই মিলেমিশে আছি।

মন্ত্রে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বলছেন, ভেতরটা হল গন্ধ, গন্ধের পর রস, রসের পর রূপ, রূপের পর স্পর্শ আর শেষে আসে শব্দ, এগুলো সব সূক্ষ্ম তন্মাত্রা। আচার্য এখানে এটাই বলছেন, একটা একটা করে যখন এই তন্মাত্রা গুলো খসে পড়ে যায় তখন এই পঞ্চ মহাভূতকে আরও সূক্ষ্ম, আরও মহৎ, আরও শুদ্ধ আর আরও নিত্য দেখায়। যেমন এই পৃথিবী তত্ত্ব অনিত্য, যার ফলে এই শরীর বেশি দিন থাকে না, শরীর, গ্লাশ, বোতল যা কিছু আছে সব কিছু দিন পরে নাশ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু রসতত্ত্ব আরও অনেক বেশি দিন স্থায়ী হয়। এইভাবে শেষ যে তত্ত্ব আকাশের যে শব্দ তত্ত্ব তা হল সনাতন। ভগবান যখন সৃষ্টি করেন তখন প্রথমে শব্দ দিয়েই সৃষ্টি করেন। ঠাকুর বলছেন, সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী প্রণবে আর শেষে নাদ ধ্বণি, ঐ নাদ হল আকাশ তত্ত্ব, আকাশ তত্ত্বই সূক্ষ্মতম অণু। আকাশ তত্ত্বের পারেও যদি চলে যায়, তখন সেটাই আত্মজ্ঞান। এর আগে বলা হল পথ অনন্ত, এখানে যে পথের কথা বলছেন তাতে একটা একটা করে নিজের ইন্দ্রিয়কে জয় করে নিচ্ছে ফলে এক একটা তত্ত্বকে জয় করে নিচ্ছে তখন দেখছে পরের ধাপটা আরও সূক্ষ্ম হয়ে গেল, আরও শুদ্ধ হয়ে গেল, আরও নিত্য হয়ে গেল। এইভাবে তার life spanটা বেড়ে যাচ্ছে, আকাশ তত্ত্বের life span সব থেকে বেশি। সৃষ্টির এই কল্প যত দিন থাকবে তত দিন আকাশ তত্ত্ব থাকবে। কিন্তু পৃথিবী তত্ত্ব

অনবরত পাল্টাতে থাকবে। একটা গোল জিনিষকে ঘোরালে তার বাইরের দিকটা খুব দ্রুত গতিতে ঘুরতে থাকে, কিন্তু যত কেন্দ্রের দিকে যাবে তত ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বনবন করে ঘুরছে, ওর যে খুঁটি, যেটার উপর দাঁড়িয়ে আছে সেটা হল ঈশ্বর, তিনি নড়েনও না চড়েনও না, তাঁর কিছুই হয় না। ঈশ্বর কেন্দ্রের সব থেকে কাছে আকাশ তত্ত্ব, আকাশ তত্ত্বও খুব বেশি নড়ে না। কেন্দ্র থেকে সব থেকে দূরে পৃথিবী তত্ত্ব, সেইজন্য পৃথিবী তত্ত্ব অনবরত পাল্টাতে থাকে, আমাদের শরীরে প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন হয়ে চলেছে, শুধু শরীরই নয়, এখানে সব কিছুই পাল্টাচ্ছে। পৃথিবী তত্ত্ব থেকে যত ভেতরে কেন্দ্রের দিকে যেতে থাকে তত সূক্ষ্মত্ব, শুদ্ধত্ব, নিত্যত্ব এগুলো বাড়তে থাকে। আর এর সব কিছুর পারে যেটা হবে তাহলে তাঁর কি অবস্থা হবে! বলছেন, এমনই তিনি সূক্ষ্ম যে তাঁকে কখনই জানা যাবে না, এমনই নিত্য যে তাঁর কখন কোন পরিবর্তন হয় না, এই বলে এই মন্ত্র শুরু করছেন।

আত্মা বা ব্রহ্ম, নচিকেতা যাঁকে নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, সেই আত্মার বৈশিষ্ট্য কি? তিনি *অশব্দম্, অস্পর্শম্, অরূপম্, অব্যয়ম্, অরসম্*। পঞ্চ তত্ত্ব, পঞ্চ তত্ত্বের যে গুণ, সব কিছুর পারে সেই আত্মা। যে কোন পদার্থে যদি শব্দস্পর্শাদি এই পাঁচটি তত্ত্ব থাকে, তখনই তার ব্যয় হয়। কেন ব্যয় হয়? কারণ এগুলো সবই মিশ্রিত পদার্থ, মিশ্র পদার্থকে আলাদা করা যায়। শব্দাদি থেকে শুরু করে নীচ পর্যন্ত যা গেছে, যেমন এই পৃথিবী তত্ত্বে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ পাঁচটা তত্ত্বই রয়েছে, পাঁচটা তত্ত্বের মিশ্রণ হওয়ার জন্য পৃথিবী তত্ত্ব হয়ে গেল ভারী পদার্থ। তাই পৃথিবী তত্ত্বকে সহজেই ভেঙে দেওয়া যায়। ইউরেণিয়াম, প্লুটোণিয়ামাদি নিয়ে যে এ্যাটম বোমা তৈরী করা হয়, সেখানে ওরা খুঁজতে থাকে কোনটা unstable, যে এ্যাটমগুলি unstable সেই এ্যাটমগুলিকেই গিয়ে আঘাত করে, যার জন্য ভেঙে গিয়ে এ্যনার্জি তৈরী করে। পৃথিবী তত্ত্ব খুবই unstable কারণ অনেকগুলোর জিনিষের সংমিশ্রণে পৃথিবী তত্ত্ব তৈরী। কিন্তু যেটা দিয়ে তৈরী সেটাও unstable আর ওরা যেটা দিয়ে তৈরী সেটাও unstable আর শেষে যে আকাশ তত্ত্ব সেটাও unstable, কিন্তু পৃথিবীর তুলনায় বেশি stable। বলছেন, আত্মা শব্দাদির সাথে যুক্ত নয়, সেইজন্য আত্মা অব্যয়, কখনই এর কোন রকম ক্ষয় হয় না। ক্ষয় হয় না বলে আত্মা নিত্য, গীতাতেও একই ভাব আনা হয়েছে। যে জিনিষের কোন মলিক্যুলস নেই, যার মধ্যে কোন কিছুর মিশ্রণ নেই সেই জিনিষের কোন ক্ষয় হবে না, যেটা অক্ষয় সেটাই নিত্য। নিত্য মানে যেমনটি আছে তেমনটিই চিরদিন থাকবে। জিনিষটা unstable কেন হয়? বিভিন্ন কারণে হয়, এখানে বলছেন মিশ্রণগুলো ভেঙে যায়, ভেঙে গিয়ে তার যে মৌলিক জিনিষগুলো আছে তাতে চলে যায়। মূলে চলে যাওয়াটাই নিত্য হওয়া।

আত্মা অনাদি। অনাদি কেন? অন্যান্য যত জিনিষ আছে সব কিছুই হল একটা কার্যের ফল। যখনই কোন ফল হয়, তার মানে একটা সময় তার জন্ম হয়েছে। যেমন বৃক্ষের ফল হল, ফল হওয়া মানে একদিন তার জন্ম হল। যে কোন ক্রিয়া মানেই জন্ম হওয়া। কিন্তু যে সব কিছুর ক্রিয়া তার কোথা থেকে জন্ম হবে? সেইজন্য সে অনাদি। আমি একটা ফল, আমার একটা জন্মদিন আছে, আমার বাবা তিনিও ফল, তাঁরও জন্মদিন আছে, এই করে করে সেই আদিতে গিয়ে দেখায় সবটাই একটা ফল। সবটারই একটা আদি থেকে আদি, সেই আদি থেকে আরেকটা আদি আছে। আত্মা কোন কিছুর ফল নয়, সেইজন্য আত্মা অনাদি। যে কোন কার্য কারণে গিয়ে শেষে লীন হয়ে যায়। কিন্তু আত্মা কোন কিছুর কার্য নন, সেইজন্য আত্মার লীন হয়ে যাওয়ার কোন জায়গা নেই। পৃথিবী আদি পঞ্চ তত্ত্ব দিয়ে সব কিছু তৈরী, কেউ চাইলে এগুলোকে আলাদা করে দিতে পারবে। জলের মধ্যে লবণ মিশিয়ে দিলে জল আর লবণ মিশে এক হয়ে গেল। আমি চাইলে লবণ আর জল আবার আলাদা করে নিতে পারি। ঠিক তেমনি পৃথিবী কয়েকটি তত্ত্বের সংমিশ্রণে তৈরী, পৃথিবীকে তাই আলাদা করে দেওয়া যায়। কিন্তু আত্মা কোন কিছুর মিশ্রণ নয় তাই আত্মাকে কখন আলাদা করা যায় না। লবণাক্ত জলের লবণকে আলাদা করে দিলে লবণ লবণে লীন হয়ে যাবে, জল জলে লীন হয়ে যাবে। কিন্ত আত্মা কোথায় লীন হবে? আত্মার লীন হওয়ার কোন জায়গাই নেই, আত্মা আত্মাতেই থাকে। তাই আত্মা অনাদি।

আত্মা অনন্ত। অন্ত কেন হয় না? কারণ আত্মার কোন কার্য হয় না। যেমন ধানের বীজ রোপণ করা হল, ধান গাছ হল, তাতে ফল হল, ফল হয়ে যাওয়ার পর ধান গাছ মরে যায়। আবার আম গাছ পঞ্চাশ বছর ধরে ফল দিয়ে যাবে, ফল যখন দিয়ে দিল তখন ওর অন্ত হয়ে গেল। যে কোন জিনিষের যেটা দেওয়ার ছিল,

সেটা যখন দিয়ে দিল তখন তার অন্ত হয়ে যায়। আত্মার কোন কিছুর দেওয়ার নেই, তার সঙ্গে আত্মা কোন কিছুর কার্য নন, কোন কার্যকে তিনি জন্ম দেন না। কোন কিছুর কার্য নন তাই আত্মা অনাদি আর কোন কিছুকে জন্ম দেন না সেইজন্য আত্মা অনন্ত। কারণ যে কোন জিনিষ যখন জন্ম দেবে তার মানে তখন তার শেষ। মানুষেরও কিছু কার্য থাকে, সেই কার্য যখন ফল দেয় তখন মানুষেরও সব কিছু শেষ। কিন্তু যার কিছু ফল দেওয়ার নেই তার আর নাশ হবে কি করে! আত্মার মধ্যে পঞ্চতত্ত্বের কোন বৈশিষ্ট্য বা গুণ নেই।

মহতঃ পরং, সমষ্টি বুদ্ধি খুব সূক্ষ্ম, কারণ সেখান থেকেই সৃষ্টি এগোচ্ছে, আত্মা এই সমষ্টি বুদ্ধিরও পারে। এর আগে যেখানে *মহতঃ পরমব্যক্তম্* বলা হয়েছিল সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছিল। মহৎ অত্যন্ত সূক্ষ্ম জিনিষ কিন্তু আত্মা তার থেকেও সূক্ষ্ম। বলছেন *ধ্রুবং*, আত্মা কূটস্থ, তার কারণ আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। কুমোররা চাকাতে মাটির জিনিষ তৈয়ার করে, চাকাটা ঘুরতে থাকে। চাকার বাইরের অংশ খুব দ্রুত ঘুরছে ভেতরের রিং সেটাও ঘুরছে কিন্তু ওর মাঝখানে যেটার উপর ঘোরে সেটা স্থির, ধ্রুব। আত্মা সেই রকম স্থির তাই বলছেন ধ্রুব। অন্য দিকে মহৎ থেকেও সূক্ষ্ম, মহৎ হল সমষ্টি বুদ্ধি কিন্তু আত্মা তারও সাক্ষী। যে দেখছে সে আরও সূক্ষ্ম, মহৎ আত্মাকে জানতে পারে না কিন্তু আত্মা মহতকে জানে। এই ধ্রুব, নিত্য কিন্তু আপেক্ষিক নয়। পৃথিবী যেমন নিত্য, মানুষ পড়ে যায় পৃথিবী কিন্তু পড়ে যাচ্ছে না, আত্মা সেই অর্থে নিত্য নন, সত্যিকারের নিত্য, কখন কোন ধরণের পরিবর্তন হয় না, কখন কোন ভাবে পরিবর্তিত হয় না।

ব্রহ্মকে যখন এই রূপে জানে, *নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে*, তখন সে মৃত্যুর মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করে আচার্য বলছেন *অবিদ্যা-কামকর্ম*, এটাই অজ্ঞান, আমি নিজেকে জানি না। অবিদ্যার জন্য কামনা-বাসনা রয়েছে আর কামনা-বাসনা পুর্তির জন্য কাজ করছে। যেখানে কাজের প্রবৃত্তি সেখানেই কামনা লেগে আছে। কামনা কার হয়? যার মধ্যে অপূর্ণ বোধ আছে। যার কামনা আছে সেই কাজ করবে। অপূর্ণ বোধ কেন হচ্ছে? কারণ সে নিজেকে জানে না। যত দিন অপূর্ণ বোধ থাকবে তত দিন তার অজ্ঞানও থাকবে, অজ্ঞান যত দিন থাকবে অপূর্ণ বোধও থাকবে। অপূর্ণ বোধ থাকলেই মনে কামনা থাকবে, কারণ পূর্ণ হবার ইচ্ছা আছে, তাই কাজ করতে হবে। এটাই মৃত্যুর ব্যাখ্যা, মৃত্যু মানে অজ্ঞান। আমাদের সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে মৃত্যুকে বোঝা যায় না, একমাত্র অদ্বৈত বুদ্ধিতেই বোঝা যেতে পারে। অদ্বৈত বুদ্ধিতে যিনি শুদ্ধ আত্মা, চৈতন্য স্বরূপ, কোন কারণে তাঁর মনে কোন কামনা জেগেছে, উপনিষদেই বলছেন আমি এক আমি বহু হব, এটাই কামনা, এটাই মায়া। এবার তাঁর সামনে এই দৃশ্যগুলি ভাসতে শুরু করল। যতক্ষণ তাঁর মধ্যে অপূর্ণ বোধ আছে ততক্ষণ তাঁর সামনে এই দৃশ্যগুলি ভাসছে। সে দেখছে আমার জন্ম হল, আমার মৃত্যু হল, সে দেখছে আমি দিনের বেলায় জেগে আছি রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে আছি। অপূর্ণতার জন্য সব দৃশ্য তাঁর সামনে ভেসে ভেসে আসছে। যদি কারুর এই জ্ঞান এসে যায় তখন সে দেখবে আরে! আমি তো সব সময় একই রকমই ছিলাম, আমার তো কোন পরিবর্তন হয়নি, তখনই এই যে নানান রকম চক্র চলছে, ঘুমাচ্ছে, ঘুম থেকে উঠছে, জন্মাচ্ছে, মরছে, স্বর্গে যাচ্ছে এর সব কিছু থেকে তার মুক্তি হয়ে যায়। মুক্তি হয়ে যাওয়া মানে, জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া। ব্যাপারটা আমরা এভাবেও নিতে পারি, আমি যাকে খুব ভালোবাসি, নিজের সন্তান বা কোন প্রিয়জন, তার কথা চিন্তা করতে করতে গভীর ভাবের মধ্যে চলে গেলাম। তার কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কোন মিষ্টি কথা মনে পড়ল মুখে হাসি এসে গেল, তার কোন দুঃখের কথা মনে পড়ল মুখটা একটু ভারী হয়ে গেল। আমাকে যদি কেউ দেখে সে দেখবে আমি চোখ বন্ধ করে নিজের মত কখন হাসছি কখন বিষন্ন হয়ে যাচ্ছি, নিজের মধ্যে আমি ডুবে আছি, সামনে কেউ এলে আমি জানতেও পারছি না। এমন হারিয়ে গেছি যে এখন যা কিছু আমার মনের মধ্যে হচ্ছে সবটাই আমার কাছে সত্য মনে হচ্ছে। হঠাৎ তার মধ্যে একটু দুঃখের কথা মনে এল, চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল বেরিয়ে এল। কেউ তখন হঠাৎ আমাকে বলল, তুমি এখানে বসে বসে কি করছ? চটকা ভেঙে যেতেই দেখছি কিছুই নেই। কিন্তু ঐ কল্পনার জগৎ আসতে একটু সময় লাগে, এটা একটা উপমা দেওয়ার জন্য বলা হল। শুদ্ধ সচ্চিদানন্দের মধ্যেও ঠিক একই জিনিষ হয়। আমাদের যে জীবন চলছে, যার মধ্যে জীবনও আছে মৃত্যুও আছে, জন্ম আছে, শোকও আছে, দুঃখও আছে, এর সবটাই সচ্চিদানন্দের কাছে দৃশ্য, সেইজন্য আমরা কখন হাসছি, কখন কাঁদছি। আত্মজ্ঞান হল মৃত্যুর মুখ থেকে বেরিয়ে আসা। আত্মজ্ঞানের দৃষ্টিতে মৃত্যুটাও মিথ্যা আর জন্মটাও মিথ্যা। সেইজন্য মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচার কোন পথ নেই। আমরা কতগুলি সহজ ধারণা মাথার মধ্যে বসিয়ে রেখেছি তার মধ্যে একটা হল, ঠাকুরকে

ধরে রাখ মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণলোকে চলে যাবে, সেখানে আর মৃত্যু তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু ব্রহ্মাকেই মৃত্যু টেনে নিচ্ছে সেখানে তুমি কোথায়! দ্বৈতবাদে কখনই এর সমাধান দেওয়া সম্ভব হয় না। শাস্ত্রের অনেক কথা দ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করতে পারে না। অদ্বৈতবাদীদের কাছে কোন সমস্যাই হয় না, বলছেন জন্মটাও তোমার কাছে যেমন, মৃত্যুটাও তেমন, সবটাই একই রকম, এর থেকে যদি মুক্তি চাও তাহলে নিজেকে জেনে যাও। এত কিছু বলার পর গ্রন্থস্তুতি করে বলছেন –

নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্।
উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।।১/৩/১৬।।

(নচিকেতা যা শুনলেন এবং যমরাজ যা বললেন, সেই শাশ্বত আখ্যানকে অপরকে বলে বা শ্রবণ করে বিবেকী পুরুষ ব্রহ্মাত্ম রূপে পূজিত হন।)

এই যে তিনটে বল্লীতে নচিকেতা মৃত্যুর কাছে যে কথা শুনলেন, এর সব কথা বেদের তাই এর কথা *সনাতনম্*, শাশ্বত। ঈশ্বর যেমন সত্য এই কথাগুলিও তেমনই সত্য। যমরাজের কথাকে নিয়ে কোন দিন কোন প্রশ্ন করা যাবে না। *উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী*, আচার্যের কাছ থেকে যখন কেউ এর কথগুলো শ্রবণ করে, তাদের সবাই নয়, যাঁরা মেধাবী তাঁরা ব্রহ্মলোকে গিয়ে বাস করেন আর মহিমান্বিত হয়। যাঁরাই উচ্চমানের সন্ত, মহাত্মা, ঋষি হন এনারা সবাই মহিমাবান হন। আত্মজ্ঞান হয়ে যাওয়াতে, আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার জন্য তাঁরা উপাস্য হয়ে যান, জগতের মানুষ তাঁদেরই পূজা করে। আত্মস্বরূপ হয়ে যাওয়ার জন্য ঈশ্বরের সাথে তাঁরা এক হয়ে যান কিনা, সেইজন্য এনারাও উপাসনীয় হয়ে যান, যেমন আত্মা উপাসনীয় তেমনি যিনি আত্মজ্ঞান পেয়ে গেছেন তিনিও এই জগতে উপাসনীয় হয়ে যান। অন্য দিকে আবার বলছেন –

য ইদং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি।
প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে
তদানন্ত্যায় কল্পতে ইতি।।

(শুদ্ধচিত্ত হয়ে কেউ এই অতি গুহ্য আখ্যান ব্রাহ্মণসমাজে কিংবা শ্রাদ্ধকালে শ্রবণ করালে, কথন ও শ্রাদ্ধ অনন্ত ফল প্রদান করে।)

যদি কোন পুরুষ এই নাচিকেত উপখ্যান কোন ব্রাহ্মণসভায় শ্রবণ করেন, আগেকার দিনে পণ্ডিতরা শাস্ত্রের কথা শ্রবণ করার জন্য এক জায়গায় সমবেত হতেন, সেখানে নানান রকমের আলোচনাও হত বা যদি শ্রাদ্ধকালে বা *শ্রাবয়েদ্ ভুঞ্জানান্*, শ্রাদ্ধকালে খাওয়া-দাওয়ার সময় যদি এটাকে পাঠ করিয়ে সবাইকে শ্রবণ করান হয় তখন ঐ শ্রাদ্ধ অনন্ত ফল দেয়। বলা হয় যে, উপনিষদ কখন কোন উপাচারে লাগত না কিন্তু যখন কোন উপাচার হয় তখন উপনিষদ পাঠ করলে ঐ উপাচার অনুষ্ঠান প্রচুর ফল প্রদান করে। কঠোপনিষদ পাঠে কোন জাগতিক ফল হবে না, কিন্তু শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যেহেতু বেদের মন্ত্র দিয়েই শ্রাদ্ধ হয়, শ্রাদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর এবার খাওয়া-দাওয়া চলছে, তখন কেউ কঠোপনিষদ পাঠ করে শোনাচ্ছেন, তাহলে শ্রাদ্ধ যে ফল দেয়, পিতৃগণরা যে তৃপ্তি লাভ করেন এই পাঠ অনন্ত ফল দেয়। *তদানন্ত্যায় কল্পতে*, দুবার করে বলছেন জোর দেওয়ার জন্য যে সত্যিকারের এই রকমই ফল দেয়, শ্রাদ্ধের ফল অনন্তকালের জন্য হয়, পিতৃরা, যাদের জন্য শ্রাদ্ধ করা হল, তাঁরা অনন্তকালের জন্য তৃপ্তি লাভ করেন। এখানেই তিনটে বল্লী নিয়ে কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায় শেষ হয়ে যাচ্ছে।